সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ

নারী নির্যাতনের রকমফের

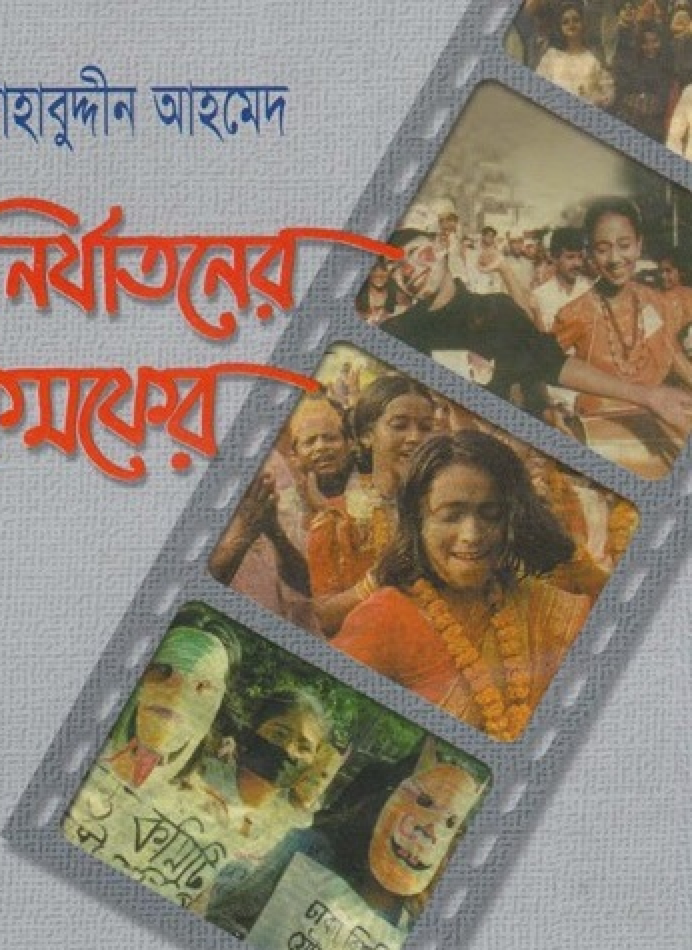

নারী নির্যাতনের রকমফের

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ

বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

নারী নির্যাতনের রকমফের

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ নূর উল্লাহ্, পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা অফিস ঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১
চট্টগ্রাম অফিস ঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

স্বত্ব ঃ
প্রকাশক কর্তৃক স্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশ কাল ঃ
৮ মার্চ ২০০১, ১৪ ফাল্গুন ১৪০৭ বাং
[আন্তর্জাতিক নারী দিবস স্মরণে]

মুদ্রাকর ঃ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ফোন ঃ ৭১১০৫৬২

প্রচ্ছদ ঃ
আরিফুর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৫৫০১০৭

মূল্য ঃ ২২৫.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা।
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

Nari Nirjatanar Rakamfar, Written by : Sarker Shahabuddin Ahmed, Published by : Muhammad Nur Ullah, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Price : Tk. 225.00, US$ 8.00 ISBN— 984-493-061-8

www.pathagar.com

শ্রদ্ধেয়া দাদী জান্নাতবাসিনী
মোসাম্মাৎ শামসুন্নাহার-
এর
পবিত্র রূহের উদ্দেশ্যে-

www.pathagar.com

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র। যিনি তাঁর সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠতম হিসাবে আমাদের ভাবতে, বলতে ও লিখতে শিখিয়েছেন। দুনিয়াতে আমাদের তাঁর খলিফা হিসাবে সকল প্রকার কল্যাণকর্ম সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করেছেন তাঁর প্রিয় রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে। আমরা এ লক্ষ্য সাধনে নিয়োজিত থাকতে চাই। আর এ চাওয়াতেই আজ আমি আমার অনুভূতি প্রকাশের মহৎ সুযোগ পাওয়ায় তওফিক আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের দরগায়ে লাখো শুকরিয়া আদায় ও প্রিয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর লাখো দরুদ পেশ করছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অধ্যাপক ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম, চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক, ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমদ, মোহাম্মদ বেনাউল ইসলাম, আ. জ. ম. শামসুল আলম, মোঃ নূর উল্লাহ, এডভোকেট শফিক আহমদ, এন. এম. হাবিব উল্লাহ, শাহাবুদ্দীন খান, মোঃ ফরিদ হোসেন, এ. টি. এম ফজলুল হক, মোঃ আবদুল ওয়াহেদ, জিয়া হাবীব আহসান, ডাঃ আখতারুজ্জামান, তোফাজ্জল হোসেন, মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান, আবদুল আওয়াল ঠাকুর, রফিকুল ইসলাম (হিরন), আবদুল ওয়াহেদ, ফরহাদ খাঁ, আলম মাসুদ, এম. এ. নোমান, হাসান মুরাদ চৌধুরী, মোঃ ইউসুফ, জেসমিন ইউসুফ, নূরুল ইসলাম, আব্দুল লতীফ, আরিফুর রহমান, রিয়াজ হায়দার, নাজমুল হায়দার, মোঃ ইমতিয়াজ মাসরুর, কে. এম. মোকতাদার হাসান (চন্দন), জাকির হোসেন, মাসুদ, আলিমুদ্দীন, আঃ কুদ্দুছ, সেলিম রেজা, মোঃ মিরাজুল ইসলাম।

www.pathagar.com

ভূমিকা

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদের *নারী নির্যাতনের রকমফের*-এর পাণ্ডুলিপি পড়ে খুশী হয়েছি। লেখক হাজারো উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে, নারী নির্যাতনের অসংখ্য প্রক্রিয়ার বিবরণ তুলে ধরে, মানব সমাজের অতি প্রাচীন ও ক্লেদাক্ত দিকের যেসব চিত্র এই বইটিতে উপস্থাপন করেছেন তা একদিকে যেমন অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক, অন্যদিকে তেমনি ভাবনা উদ্রেককারী। মানব সমাজের প্রভাত থেকেই সমাজের প্রায় অর্ধেক যে নারী, তাদের প্রতি নির্যাতনের ধারাক্রম মানব ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায় হিসেবেই টিকে রয়েছে। ঐ যে শুরু হয়েছে, এখনো তার সমাপ্তি চোখে পড়ছে না। ধারাবাহিকতার সূত্র যেন অচ্ছেদ্য ভাবে অব্যাহত। কোন কোন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের যে সমান অধিকার ও মর্যাদার কথা বিবৃত হয়েছে, মানব জাতির বৃহত্তর ইতিহাসে তা মনে হতে পারে ব্যতিক্রমধর্মী ফুটনোট। এর অবশ্য কারণও রয়েছে। সমাজে নারীর অবস্থানকে অবনমিত করে তত্ত্বগত কাঠামো পর্যন্ত রচিত হয়েছে।

অতীতের কোন কোন সমাজে নারীর পদমর্যাদা হ্রস্ব করার লক্ষ্যে নারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'মোহের মূর্ত প্রতীক' রূপে, 'মানবাত্মার নির্বাণ লাভের প্রধান অন্তরায়' রূপে। কোন কোন সভ্যতায় নারীকে বলা হয়েছে 'সকল পাপের মূল উৎস', 'নরকের সদর দরজা', 'মানবের দুঃখের কারণ', 'শয়তানের মুখপাত্র', 'তীব্র বিষধর বিচ্ছু', 'পক্ষধর ভুজঙ্গের বিদ্বেষ'। প্রাচীন কালের ধর্মেও রয়েছে নারী সম্পর্কে এক ধরনের ঘৃণ্য ধারণা। অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের গ্রীক সভ্যতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত থেকে পাশ্চাত্যের অগ্রগতির শত দ্বার উন্মোচিত করেছিল বটে, কিন্তু সমাজে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে গ্রীক পন্ডিতরাও তেমন কোন উঁচু ধারণা পোষণ করেননি। গ্রীক জনগণকে দেবতাদের নিকট অভিযোগ করতে দেখা যেত এবং অভিযোগ ছিলো, 'একই সূর্যের নিচে পুরুষের পাশাপাশি নারীর স্থান কেন তৈরি হলো'। পন্ডিতপ্রবর সক্রেটিসও বলেছেন, বিশ্বে নারীর চেয়ে আর নিকৃষ্ট কোন বস্তু নেই। রোমান আইন বিশেষজ্ঞরাও নারীর কোন উন্নত মর্যাদা কল্পনা করেননি। অন্য দশটি ভোগ্য পণ্যের মতো নারীকেও ভোগ্য বস্তু হিসেবে দেখা হতো। ক্যাটো এবং তার অনুসারীর মতে, "বিয়ের পূর্বে যথাসম্ভব নারীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়", কিন্তু এক্ষেত্রে কেউ অসংযমী হলে তাকে ভর্ৎসনা করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রাক-ইসলামী আরবে অর্থাৎ আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগেও নারীর অবস্থা ছিলো অত্যন্ত দুঃখবহ। সে যুগে আরবরা নারীকে 'ভোগের সামগ্রী' বলে গণ্য করতো। কোন ব্যক্তি যতো খুশী স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো এবং ইচ্ছামতো স্ত্রীকে তালাক দিতে পারতো। সৎ মাকেও তারা পত্নীত্বে বরণ করতে দ্বিধাবোধ করতো না। ঐ সমাজে কন্যা সন্তানের জন্ম লোক লজ্জা ও দুর্ভাগ্যের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হতো। বহু পিতা দারিদ্র্যের কারণে কন্যা সন্তানকে হত্যা করতো। শুধু তাই নয়,

www.pathagar.com

তখন স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার ছিলো না। তাই নারীর জীবন ছিলো ঘৃন্য, পাশব, অভিশপ্ত।

সুদূর চীন দেশেও নারীর অবস্থা ছিলো অত্যন্ত করুণ। হাজার দুয়েক বছর পূর্বে চীনা কবি ফু শোয়ান (Fu Hsuan) মেয়েদের সম্পর্কে এক কবিতায় লিখেন ঃ

How sad it is to be a woman
Nothing on earth is held so cheap
Boys stand leaning at the door
Like Gods fallen out of heaven.
Their hearts brave the four oceans,
The wind and dust of a thousand miles.
No one is glad when a girl is born
By her the family sets no store.
When she grows up she hides in her room,
Afraid to look at man in the face.
No one cries when she leaves her home
Sudden as clouds when the rain stops.
She bows her head and composes her face
Her teeth are pressed on her red lips
She bows and kneels countless times
[নারী হওয়া কত দুঃখের বিষয়।
পৃথিবীতে অন্য কিছু এতো সস্তা নয়।
স্বর্গ হতে আগত দেবতার মত ছেলেরা দরজায়
হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে
তাদের হৃদয় যদি সমুদ্র তুচ্ছ করে–
উপেক্ষা করে হাজার মাইলের ধূলি ঝড়।
মেয়ের জন্ম হলে কেউ খুশী হয় না।
পরিবার তার জন্যে কিছু জমিয়ে রাখে না।
যখন সে বড় হয় সে তার কক্ষে লুকিয়ে থাকে–
কোন পুরুষের দিকে তাকাতে ভয় পায়।
যখন সে বৃষ্টি শেষের মেঘের মত বাড়ী ছেড়ে চলে যায়
কেউ তার জন্যে কাঁদে না।
সে মাথা নিচু করে রাখে, চেহারা থাকে শান্ত
তার লাল ঠোঁটে দাঁত খিঁচিয়ে রাখে।
সে অসংখ্যবার মাথা নিচু করেও নতজানু হয়।]

(আকবর আলী খান, *পরার্থ পরতার অর্থনীতি*, ২০০০, পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫ থেকে)

বিভিন্ন সভ্যতায় এই ছিলো নারীর অবস্থান। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতেও সমাজে নারীর পদমর্যাদা সম্পর্কে এমনি সব বক্তব্য লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং কোনক্রমে তা

www.pathagar.com

নারীর জন্যে সম্মানজনক নয়। হিন্দু ধর্মের মূল আইন রচয়িতা মনু তার *মনু স্মৃতির অধ্যায়ে* নারী সম্পর্কে লিখেছেন, "শৈশবে নারী তার পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে এবং বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের অধীনে থাকবে। কোন সময়ে সে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনে সক্ষম হবে না।" (*মনু স্মৃতি* ৫, ১৪৫)। প্রাচীন হিন্দু আইনে বলা হয়েছে, "রোগ, মহামারী, মৃত্যু, নরক, অগ্নি এবং বিষও নারী অপেক্ষা উত্তম"। চাণক্য নীতিতে বর্ণিত হয়েছে, "নদী, সশস্ত্র সৈনিক, শিং এবং তীক্ষ্ণ নখর বিশিষ্ট জন্তু, শাসক এবং নারীকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।" (*চানক্য নীতি,* ১-১৫)। বৌদ্ধ ধর্মেও নারীর তেমন কোন উঁচু মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই ধর্মেও মনে করা হয় যে, নারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীর নির্বাণের কোন পন্থা নেই। গৌতমের দৃষ্টিতে নারীরা পুরুষের মোক্ষ লাভের অন্তরায়। তাদের সাহচর্যে থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই তিনি মোক্ষ লাভের লক্ষ্যে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রতের দিকে তাঁর অনুসারীদের আহবান জানান। অগ্নি পূজকদের ধর্মীয় নেতা জরোয়াস্ট্রিয়ানও বলেছেন, "স্ত্রী স্বামীর দাসী স্বরূপ"। তিনি আরো বলেছেন, "ধর্ম ও নারী সকল অন্যায়ের মূল"। খ্রিস্টধর্মেও নারীর অবস্থান অত্যন্ত লজ্জাস্কর। স্বয়ং যীশু কোন নারীর পাণিগ্রহণ থেকে বিরত থেকে তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। জনৈক খ্রীস্টান ধর্মযাজকের কথায়, "নারী হলো শয়তানের দোসর, নিষিদ্ধ বৃক্ষের প্রতি আহবানকারিণী এবং পুরুষের সর্বনাশকারিণী"। বাইবেলে বলা হয়েছে, "নারীদের তিনি বললেন, আমি তোমাদের প্রসব বেদনা অনেক বাড়িয়ে দেব। বেদনার মধ্যে তোমাদের প্রসব হবে, তবু তোমরা স্বামীদের চাইবে এবং স্বামী তোমাদের শাসন করবে।" ["To the woman he said, "I will greatly multiply your pain in child rearing, in pain you shall bring forth children, yet your desire shall be for your husband and he shall rule over your"]"

ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও তুলসী দাস দোঁহাবলীর মতো প্রাচীন লেখাতেও রয়েছে নারীর প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা।

"দিনকা মোহিনী রাতকা কামিনী,
পলক পলক লহু চোষে,
দুনিয়ার সব বউরা হোকে,
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।"

একমাত্র ইসলামে নারীর মর্যাদা সমুন্নত রয়েছে। পবিত্র কোরআনে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "তারা (নারী) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭)। "স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের তেমনি ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন স্বামীদের তাদের প্রতি" এবং (আল বাকারা ঃ ২২৮)। তোমরা পরস্পরের প্রতি উদারতা প্রদর্শনে ভুলিও না (আল বাকারা ঃ ২৩৭)। ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "নারী পুরুষের অংশ", নারীকে সম্মান করো, কেননা নারী পুরুষের জননী, ভগ্নি, স্ত্রী এবং নিকট আত্মীয়"। "যারা নারীর প্রতি

www.pathagar.com

অন্যায় ব্যবহার করে তারা ভ্রান্ত"। তিনি বলেছেন, "পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল বস্তুই মূল্যবান, কিন্তু নারীই সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবান সামগ্রী"। বুখারী হাদীছে আছে, "মায়ের পদতল সন্তানের বেহেস্ত"। তারপরেও কিন্তু মুসলিম সমাজে নারীর মর্যাদা সমুন্নত থাকেনি সমাজ ব্যবস্থার ক্রটির জন্যে। মুসলিম বিশ্বেও নারীরা যথোপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেনি। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবস্থান আজও সম্মানজনক হয়ে ওঠেনি।

ইসলামের নবী সত্যিই বলেছেন, নারীরা আমাদেরই অংশ। যে কোন ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনের দিকে তাকালে এক মুহূর্তেই অনুধাবন করবেন, পুরুষ যাকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করেন তিনি একজন নারী– তার মা। যাকে তিনি সবচেয়ে বেশি আদর করেন তিনিও একজন নারী– তার মেয়ে। যাকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তিনিও একজন নারী– তার স্ত্রী। পারিবারিক এই আবর্তের যে দিকে দৃষ্টি যায় সেদিকেই তিনি দেখবেন কিছুসংখ্যক নারী, তার চারদিক ঘিরে মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রেম-শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার জীবনকে পরিপূর্ণ করার জন্যে। তার সফল জীবনের মৌল চাবিকাঠি রূপে। তারপরেও কেন যুগে যুগে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, শুধু এক দেশ বা সমাজে নয়, প্রায় সকল দেশ ও সমাজে নারীদের প্রতি এতো অবহেলা, এতো উপেক্ষা, এতো ঘৃণা আর অপবাদ? বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সত্যিই লিখেছেন,

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,
অর্দ্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্দ্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রু বারি,
অর্দ্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্দ্ধেক তার নারী।"

এমন বক্তব্যের পরেও কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের দেশেও নারী নির্যাতনের মাত্রা বিন্দুমাত্র কমেনি। সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ তার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর তীর নিক্ষেপ করে বিভিন্ন সমাজের, এমন কি একই সমাজের বিভিন্ন সময়ের নিপীড়নমূলক ঘটনাবলীর সচিত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তার সুলিখিত *নারী নির্যাতনের রকমফের* গ্রন্থে। বিভিন্ন যুগে সমাজপতিরা শুধুমাত্র নিজেদের অবস্থানকে সুরক্ষিত করার জন্যে নারীদের সম্পর্কে অযৌক্তিক অপবাদ লিপিবদ্ধ করে সব সময় নিজেদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছেন। সম্ভবত এরই তীব্র প্রতিক্রিয়া হিসেবে কিছুসংখ্যক নারীবাদী নারী অধিকারের নামে সংকীর্ণ সমাজপতিদের মতোই ততোধিক সংকীর্ণ শ্লোগান তুলে ধরেছেন। সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ তাও তুলে ধরেছেন তার বইটিতে ঃ

"কিসের ঘর, কিসের বর
ঘর যদি হয় মারধর।
শাক-শুঁটকি খাব না,
স্বামীর কথা মানব না।

www.pathagar.com

আমার দেহ, আমার মন,
কথায় কেনো অন্য জন।
রাতের বেড়া ভাঙবো
স্বাধীনভাবে চলবো।”

সমাজে নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠার জন্যে এ অবস্থাও সঠিক নয়। এ জন্যে প্রয়োজন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে ব্যক্তি হিসেবে বিকশিত হবার সুযোগ দান। নারী ও পুরুষ কেউ কারো প্রতিপক্ষ নয়, নয় দুই এর সম্পর্ক কোন ধরনের প্রতিযোগিতার অথবা বৈরিতার। দুই এর সম্পর্ক পারস্পরিক সহযোগিতার, পরিপূরণ অথবা সম্পূরণের। এর চেয়ে বেশি নয়, কমও নয়। সচেতন ব্যক্তিবর্গের সমাজে এই সম্পর্কই যথোপযুক্ত। মানব সমাজে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদের এই গ্রন্থ বিরাট ভূমিকা পালন করবে– আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

(ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ)
সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

গ্রন্থ প্রসঙ্গ

বিগত শতাব্দীতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারী সমাজ অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও এগিয়ে গেছে অনেক দূর। কিন্তু নারী নির্যাতন কমেনি। নারী স্বাধীনতার পূর্ণতম বিকাশের সর্বাধিক সুযোগ রয়েছে বলে দাবীদার রাষ্ট্রেও নারী পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির শিকার।

লেখক কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে প্রাচীন সভ্যতা থেকে শুরু করে এই আধুনিককাল পর্যন্ত নারী নির্যাতনের উৎস ও কারণগুলো ইতিহাসের নিকষ কালো গহ্বর থেকে তুলে এনেছেন।

যুগে যুগে নারীর সামাজিক মর্যাদা উপেক্ষিত হয়েছে। সতীদাহ, সহমরণ, বাল্য বিবাহ প্রথার বিলোপ সাধন হলেও বহু বিবাহ থেকে এ সমাজ মুক্ত হতে পারেনি। যৌতুক, খুন, অপহরণ, পণ আদায়, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ ইত্যাদি নানা রকম কু-প্রভাবের তাড়নায় নারী সমাজ আতংকিত। আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতির পাশাপাশি নারী নির্যাতন প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে চলেছে। আর ঘরে-বাইরে, রাস্তা-ঘাটে, স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, অফিস-আদালতে কোথাও নারী নিরাপদ নয়। নিরাপত্তাহীনতা বার বার নারীকে শঙ্কিত করে তুলছে। শঙ্কিত পদ যাত্রায় নারীর অবস্থান অনিশ্চয়তায় টলটলায়মান। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে নতুন শতাব্দীতে নারী জাতি কি ন্যূনতম নিরাপত্তার নিশ্চয়তাটুকু পাবে?

এইসব জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়া যাবে সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ প্রণীত "নারী নির্যাতনের রকমফের" গ্রন্থটিতে। নারী নির্যাতনের ইতিহাস-উপকরণ, দুর্লভ ছবি, মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে গ্রন্থটিকে যেভাবে সাজিয়েছেন সে জন্যে লেখক প্রশংসার দাবী রাখে। এছাড়া একমাত্র ইসলামই যে নারীর প্রকৃত মুক্তি ও মর্যাদার বিধান সুনিশ্চিত করেছে এর বাস্তবতা তথ্য নির্ভর অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এ জন্যে লেখককে আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি আশা করি, এই মূল্যবান গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। গ্রন্থটির বহুল কাটতি, লেখকের মেহনত ও নিয়ত আল্লাহ্ কবুল করুন এই দোয়া করি।

(জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম)
প্রতিষ্ঠাতা ভাইস-চ্যান্সেলর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
সাবেক পরিচালক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলা হয়ে থাকে- "প্রকৃতি সুশৃঙ্খল। একজন আদর্শ মানুষ তারই নিদর্শন। উচ্ছৃঙ্খল মানুষ সবাই কম-বেশি অসুখী বা রোগা। তাই উচ্ছৃঙ্খল বা প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গকারীর দেহে বা মনে প্রকৃতির প্রতিবাদ চিহ্নকেই রোগ বলে।"

ঠিক তেমনি মানব সমাজের কল্যাণে আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানগুলো অত্যন্ত নিখুঁত, নির্ভুল বিজ্ঞান ও বাস্তব সম্মত। একটি আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান যথার্থভাবে মেনে চলারই নিদর্শন। মানব সমাজ যখন আল্লাহ প্রদত্ত এই বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে নিজেদের মনগড়া ভ্রান্ত মতবাদ মানব সমাজে চাপিয়ে দিয়ে তথাকথিত শান্তি অন্বেষণে মত্ত হয় তখনই দেখা দেয় সমাজে বিপর্যয়। এই বিপর্যয়কে আমরা প্রকৃতির প্রতিবাদ স্বরূপ সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় রোগ বলে চিহ্নিত করতে পারি। যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি প্রতিটি ক্ষেত্রে সমকালীন বিশ্বে।

নারী এবং পুরুষ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। সমাজ, সভ্যতা বিনির্মাণে এবং সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। নারী আন্দোলন যখন তার কর্মপন্থা প্রণয়নে মানবীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের এই মৌলিক সূত্র ভুলে বা এড়িয়ে এগুতে চেষ্টা করে তখনই সমাজ, সভ্যতায় নেমে আসে বিপর্যয় এবং অবক্ষয়। পুরুষের সাথে বৈরীতার লালন করে নারী মুক্তির চিন্তা হচ্ছে বিশ্ব জুড়ে শয়তানের আধুনিক ফেত্না। অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীকে এগুতে হবে আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধানকে মেনে নিয়ে। নচেৎ সমাজ সভ্যতার মৌল কাঠামো ভেঙে পড়তে বাধ্য।

নারীবাদ নারীর উন্নতি আনবে বলে নিরন্তর শ্লোগান দিচ্ছে। অথচ একদিকে পুঁজিবাদ আজ মুক্ত নারীকে কাঁচামাল বানিয়ে Sex Industry বা যৌন শিল্পের মাধ্যমে জাতীয় আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করেছে। নারীমুক্তির নামে নারীকে পণ্য করে তোলা হলে তা বিবেকবান মানুষের সমর্থন দাবী করতে পারে না। অন্যদিকে নারীবাদীরা স্বীয় স্বার্থে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইসলাম ধর্মকে মৌলবাদ বলে কটাক্ষ করে মৌলবাদকে তথা ইসলামকে নারীবাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছে। অথচ নারীবাদিতা আর পাশ্চাত্যের উগ্র স্বাতন্ত্রবাদ আজ ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিরাট অংশে সমকামের জোয়ার সৃষ্টি করেছে। সেখানে আজ বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে মরণঘাতী এইড্স। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, নারীবাদীরা সমকামিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার নয়, নারীবাদীরা তালাকের বিরুদ্ধে চিন্তিত নয় অথচ তারা গর্ভপাতের ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠ। নারীবাদীরা নৈতিক শিক্ষার বিরোধী, অথচ এরা বিদ্যালয়ে যৌন শিক্ষা চালু করার দাবী জানাচ্ছে। এরা আমাদের দেশে আবহমান কাল ধরে লালিত পাত্রী দেখাকে উপহাস বিদ্রূপ করে। অথচ সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে নগ্ন নারী প্রদর্শনকে উৎসাহিত করে। এইসব নারীবাদীরা একদিকে নারীর অধিকার ও মুক্তির দাবীতে উচ্চকণ্ঠ; অন্যদিকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিভিন্ন মিডিয়ায় নারী নির্যাতনের প্রক্রিয়া অত্যন্ত সুকৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে অথবা পরিবেশ ও ক্ষেত্র তৈরি করছে। আবার এরাই একদিকে সভা-সমাবেশ ও মিছিলে মরণঘাতি এইড্স-এর বিরুদ্ধে লোক দেখানো কর্মসূচী নিচ্ছে; আর অন্যদিকে যুবক-যুবতীদেরকে অবাধ

www.pathagar.com

যৌনাচারের উৎসাহিত করছে। নারীবাদীরা তাদের সন্তানের অভিভাবকত্ব এবং পরিচয় সূত্র নিয়ে পরোয়া করেনা। সন্তানেরা বিকৃত যৌন আক্রমণে আক্রান্ত হলেও তেমন কিছু ভাবছে না নারীবাদীরা। কেবলই চাচ্ছে নারী স্বাধীনতার নামে যৌন স্বাধীনতা। এই যৌন স্বাধীনতাই নারী নির্যাতনের মূল উৎস। কাজেই কঠোর আইন প্রয়োগ করে বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্নভাবে কিছু অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে নারী নির্যাতন কখনই বন্ধ করা যাবে না। এই জন্য প্রয়োজন নারী নির্যাতনের উৎসগুলো চিহ্নিত করে তা সমূলে উৎখাত করা।

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ সমকালীন প্রেক্ষাপটে বাস্তবতার নিরিখে অত্যন্ত সাহসের সাথে চমৎকারভাবে নারী নির্যাতনের উৎসগুলো চিহ্নিত এবং তথাকথিত নারীবাদীদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন "নারী নির্যাতনের রকমফের" গ্রন্থে। ইসলামই নারীকে দিয়েছে মানুষ হিসাবে পরিচয়, শুধুমাত্র নারী হিসাবে নয়। প্রত্যেক নারী বা পুরুষকে জবাবদিহি করতে হবে নিজের ক্রিয়াকর্মের। আল্লাহর চোখে নারী বা পুরুষ সবই সমান। বলা হয়েছে, নারী ও পুরুষ একজন আরেকজনের আচ্ছাদন স্বরূপ। নারীবাদীদের যুক্তি হলো পুরুষই সৃষ্টি করেছে নারী ধারণা, তৈরী করেছে তার সংজ্ঞা, নির্দেশ করেছে নারীর অবস্থান, তৈরী করেছে নৃশংস বিধিমালা। নারী-পুরুষ মিলে যে পরিবার তথা সমাজ গড়ে তোলা হয় সেখানে একে অপরের পরিপূরক। সমাজ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে যথেচ্ছাচারই সমর্থন করছে বর্তমান নারীবাদীরা।

আমি মনে করি, আজ সময় এসেছে নারীদের নিজেদের শক্তির, পারগতা-অপারগতার সীমানা চিহ্নিত করার। নারীকে আজ বুঝতে হবে- তাকে কতোদূর এগোতে হবে, কোথায় তাকে থামতে হবে। নারীই যে একটি পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু, যেখান থেকে জন্ম নেয় সমাজ, দেশ ও জাতি।

লেখক বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগের যুক্তি খন্ডন করেছেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, নানা উপমা-দৃষ্টান্ত, ঐতিহাসিক মূল্যবান তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে এবং বিভিন্ন দুর্লভ ছবি সংযোজন করে। নারী বিষয়ক এ ধরনের বই আমাদের দেশে বিরল। সঙ্গত কারণেই দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এই মূল্যবান বইটি প্রকাশ করে একটি ঐতিহাসিক ও ঈমানী দায়িত্ব পালন করেছে। জাতির জন্য বইটি একটি মূল্যবান দলিল হিসাবে কাজ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা আরও বিশ্বাস করি, নারীবাদীরা ধর্মীয় নৈতিকতার বিরুদ্ধে জনমনে যে সব অপপ্রচার চালিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে তা নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে ইনশায়াল্লাহ, এই বইটি;

আজ আটই মার্চ। বিশ্ব নারী দিবস। এই দিবসে চিন্তার খোরাক জোগানো বইটি পাঠক সমাজকে উপহার দিতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পাঠক মহলে বইটি সমাদৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা-আয়োজন সার্থক হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের আরো বই প্রকাশে আমাদেরকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

চট্টগ্রাম ৮ই মার্চ, ২০০১ সাল

(মুনাওয়ার আহমদ)
সভাপতি
বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

পূর্বাভাস

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠাতা আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর একটি চমৎকার উদ্ধৃতি এখানে প্রণিধানযোগ্য ঃ "ইতিহাসের দু'টি পর্যায়ে নারীরা নির্যাতিত হয়েছে। একবার অন্ধকারাচ্ছন্ন মূর্খতার যুগে আর একবার আমাদের আধুনিক যুগে। মূর্খতার যুগে নারীদেরকে সীমাহীন অত্যাচার করা হতো। ইসলাম এসেই নারীদেরকে তা থেকে উদ্ধার করেছিলো। পরে আবার আধুনিক যুগে এসে নারীরা নির্যাতনের শিকার। আধুনিক যুগে নারী স্বাধীনতার এবং নারী মুক্তির ধুয়া তুলে নারীদেরকে তাদের স্বীয় সম্মান ও উচ্চ আসন থেকে টেনে নিচে নামিয়ে আনা হয়। তাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়।"

অথচ যারা এ জন্যে দায়ী তারাই আজ নারী উন্নয়নের ছদ্মাবরণে নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তি এবং নরী স্বাধীনতার নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। নানা আঙ্গিকে, নানা কৌশলে মানবতার মহান ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে যাচ্ছে এবং নারী জাতির চরম সর্বনাশ করে সমগ্র মানব জাতির সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশকে বিষাক্ত করছে।

যারা এই অপপ্রচারের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সক্রিয় তাদের স্বরূপ, অপপ্রচারের জবাব এবং এ থেকে মুক্তির দিক-নির্দেশনামূলক বর্ণনা দিয়ে রচিত হয়েছে "নারী নির্যাতনের রকমফের" গ্রন্থখানি।

আমি পবিত্র কোরআন-হাদীস, বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় যা অধ্যয়ন করেছি এবং যা দেখেছি, শুনেছি, বুঝেছি, অন্তরের বিশ্বাস নিংড়ে লিখেছি এই গ্রন্থখানিতে। আমার বক্তব্য পাঠকদের কাছে সহজ ও বোধগম্য করার লক্ষ্যে সহায়তা নিতে হয়েছে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার। আশ্রয় নিতে হয়েছে সহজভাবে দেখা বাস্তব উপকরণ ও ঘটনাবলীর। সংযোজিত করতে হয়েছে বিভিন্ন দুর্লভ ছবি ও কার্টুনের। তাই সম্মানিত পাঠকদের কাছে অনেক কিছুই অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। তবে আমার বিশ্বাস, প্রয়োজন এবং ঘটনাচক্রের সঙ্গে যা এসে পড়েছে তা সঙ্গত কারণেই এসেছে। অক্ষর জ্ঞানহীন মানুষও যাতে বইটি উল্টেপাল্টে কিছু বক্তব্য নিতে পারে এ জন্যে কিছু কার্টুন সংযোজিত হয়েছে। তাছাড়া রুচিবোধের কারণে অনেক ছবি, বাস্তব ঘটনা ও উদ্ধৃতি বাদ দিতে হয়েছে।

অনেক পাঠকের মনে এই বইয়ে সংযোজিত কিছু ছবি নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। আমি ছবিগুলো অশ্লীলতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংযোজন করিনি। আগামী বংশধরদের জন্য ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এবং বর্তমান বংশধরদের জন্য বাস্তবতার দৃষ্টান্ত ও ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সংযোজন করেছি মাত্র। আমরা পাশ্চাত্যের অনুসরণে যেভাবে অধঃপতনের দিকে এগুচ্ছি, তা রোধ করতে না পারলে আমার মনে হয় জাতি হিসেবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। সেদিন হয়তো আগামী বংশধরেরা তাদের ধ্বংসের কারণগুলো খুঁজে দেখতে চেষ্টা করবে এবং অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে সংশোধনের প্রয়াস পাবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ-এর কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে সোসাইটির সভাপতি জনাব মুনাওয়ার আহমদ, সহ-সভাপতি জনাব বেনাউল ইসলাম এবং অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ বইটি প্রকাশের উদ্যোগ না নিলে তা আলোর মুখ দেখতো কি-না সন্দেহ। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্যে।

কঠিন জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সংসারের প্রতি থাকতে হয়েছে আমাকে উদাসীন। আমার এই উদাসীনতার কারণে সৃষ্ট পারিবারিক সমস্যাগুলো অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে সামাল দিতে হয়েছে আমার স্ত্রী হোসনেয়ারা বেগমকে। এ জন্যে এই ভদ্রমহিলার কাছে আমি চির ঋণী। এ ছাড়া আমার কন্যা শাহিনূর আখতার, কোহিনূর আখতার, নীলা সুলতানা ও আমার পুত্র হাসান শাহরিয়ার আহমদ এই বইটি লিখতে এবং তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ-সংরক্ষণে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির অফিস সহকারী জনাব আবদুল মতীন পেশাগত দায়িত্ব পালন শেষে আমার সাথে ছায়ার মতো থেকে বইটির প্রুফ সংশোধন ও প্রকাশে যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তা ভুলবার নয়। তার প্রতিও রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও দোয়া।

আমাদের দেশে 'ছাপাখানার ভূত' বলে একটি বহুল প্রচলিত প্রবচন রয়েছে। সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ছাপাখানার ভূতকে এড়াতে পারিনি। কিছু মারাত্মক মুদ্রণ ত্রুটি ও বানান বিভ্রাট রয়ে গেছে। এ ছাড়া সীমিত জ্ঞানে আমি যা উপলব্ধি করেছি তা প্রকাশ করতে গিয়ে ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। এ জন্য আমার সুপ্রিয় পাঠকের কাছে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি এবং পরবর্তী সংস্করণে ভুল সংশোধনার্থে সঠিক পরামর্শ প্রত্যাশা করছি। পাঠক মহলে বইটি সমাদৃত হলে শ্রম সার্থক মনে করবো।

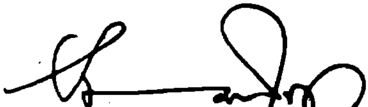

তারিখ ঃ ৮/৩/২০০১ (সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ)

www.pathagar.com

সূচীপত্র

উপক্রমিকা ১ # পশ্চিমা নারীর প্রেম (কবিতা) ৯ # বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী ১১ # বাইবেলে নারী ১৫ # খ্রীষ্টধর্মে নারী ১৮ # ইহুদী ধর্মে নারী ২৯ # পারসিক ধর্মে নারী (অগ্নি পূজক) ৩২ # বৌদ্ধ ধর্মে নারী ৩৪ # হিন্দু ধর্মে নারী ৩৫ # ইসলাম ধর্মে নারীর মূল্যায়ন ৬৫ #

★ ★ ★

ইসলামের সোনালী অতীতে নারীর অধিকার ও মর্যাদা ৭৫ # মোঘল আমলে নারীর অধিকার ও মর্যাদা ৭৯# মুসলিম শাসকদের পতন এবং বিজাতীয়দের চক্রান্ত ৯৭ # বৃটিশ যুগে এদেশের নারী সমাজ ১০৪ # বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন শিক্ষিতা মুসলমান নারী ১১১ #

★ ★ ★

আধুনিক বিশ্বে নারী ১২৩ # চীন ১২৫ # দক্ষিণ কোরিয়া ১২৫ # রাশিয়া ১২৫ # ফ্রান্স ১২৬ # সুইজারল্যান্ড ১২৭ # জাপান ১২৭ # ইতালি ১৩০ # কানাডা ১৩০ # যুক্তরাজ্য ১৩০ # যুক্তরাষ্ট্র ১৩৩ # ভারত ১৩৬ # বাংলাদেশ ১৪৩ # পাশ্চাত্য মিডিয়ায় বাংলাদেশ ১৫১

★ ★ ★

ইসলামে বহুবিবাহ ১৫৫ # পর্দা প্রথা ১৬৬ # বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বেপর্দার কুফল ১৭৬ # তালাক প্রথা ১৭৭ # ফতোয়া ১৮২ # ইসলামে নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার ১৮৪

★ ★ ★

একজন পরান্নভোজী অধ্যাপকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ ১৮৫ # তসলিমা নাসরিন ১৮৮ # আন্তর্জাতিক চক্র এনজিও ১৯৭ # নারীর মুজুরী বৈষম্য ২২৭ # ঋণের নামে নারী শোষণ ২২৮ এনজিওদের কর্মতৎপরতা মানবিক নয়; রাজনৈতিক ২৩১

★ ★ ★

নারী নির্যাতনের উৎস ২৩৭ # সুন্দরী প্রতিযোগিতা ২৪৪ # ভ্যালেন্টাইন ও 'ভালোবাসা দিবস' ২৫২ # ফ্যাশন শো ২৫৪ # বাউলবাদ ২৫৬ # যাত্রাগান ২৫৯ # গ্রুপ থিয়েটার ২৬২ # ডিস এন্টিনা ২৬৩ # অশ্লীল চলচ্চিত্র ২৬৬ # অশ্লীল সাহিত্য ২৭৪ # অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ২৭৯ # সেক্স ডল ২৮১ # বই মেলায় নারী ২৮৩ # নববর্ষে নারী অবমাননা ২৮৫ # কনসার্ট ৩০৩ # বিজ্ঞাপন চিত্র ৩০৭ # পতিতা নারীর অবস্থা ৩০৮ # নিম্নবিত্ত কর্মজীবী নারী সমাজ ৩০৮ # হোটেল ব্যবসায়ীর কবলে নারী ৩০৯ # অভ্যর্থনাকারিণী হিসেবে নারী ৩০৯ # কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সহকারিণী হিসেবে নির্যাতীতা নারী সমাজ ৩০৯ # উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত নারী সমাজের দূরবস্থা ৩১০ # বিউটি পারলার ৩১০ # সেবার নামে যৌন স্বাধীনতা ফেরী ৩১২ # যৌতুক প্রথা ৩১৪ # নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, যৌনাচার এবং এর পরিণাম ৩২০ # যুক্তরাজ্যে যৌনাচার ৩৪৩ # যুক্তরাষ্ট্রে যৌনাচার ৩৪৭ # চীনে যৌনাচার ৩৬৫ # অন্যান্য দেশে যৌনাচার ৩৬৭ # বাংলাদেশে যৌনাচার ও বিবিধ প্রসঙ্গ ৩৭২ # খোদায়ী গজব ৩৯৪

★ ★ ★

নারী শিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার রচনা থেকে ৪০২ # ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে নও-মুসলিম নারীদের প্রতিক্রিয়া এবং আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতি ও সাক্ষাৎকার ৪০৪ # আমেরিকান খৃষ্টান কে. রোল এল এনওয়ে-এর গবেষণা আমাদের মেয়েরা কেনো ইসলামের প্রতি অনুরক্ত ৪১৫ # সংযোজন ৪২১ # উপসংহার ৪২৬

★ ★ ★

পরিশিষ্ট–১ নারী সমাজের নেপথ্যে ৪২৮ # পরিশিষ্ট-২ বাংলাদেশে শিশু পতিতাবৃত্তি দেড় শ' বছর আগে ৪৪৪ # পরিশিষ্ট-৩ ইসলাম ও নারী ৪৪৬ # পরিশিষ্ট-৪ বহুবিবাহ ঃ রসূল (সাঃ)'র দৃষ্টিতে ৪৫৭ # পরিশিষ্ট-৫ নারী ৪৭১ # পরিশিষ্ট-৬ ফ্রয়েডীয় যৌনবাদ ও পাশ্চাত্য সমাজ ৪৭৫ # পরিশিষ্ট-৭ ইরানের সংবিধানে পরিবার ও নারীর অধিকার ৪৮০ # বিংশ শতাব্দীতে বাংলার নারী সমাজের কালপঞ্জি ৪৮৬ # আধুনিক বিশ্বে প্রথম নারীর কৃতিত্ব ৪৮৯ # নারী উন্নয়নে বিশ্ব কার্যক্রম ৪৯১ # সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ৪৯৪ ।

www.pathagar.com

"ওগো নারী, শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তুমি অবনীর,
গোলাপে গঠিত যেন ভিতর বাহির।
মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে তাই মনে হয়,
নারী তো গোলাপ ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

– কবি ওমর খৈয়াম

"প্রেম অক্ষুণ্ন রাখে সৌন্দর্যকে,
আর ফুল যেমন খাদ্য যোগায় মৌমাছিকে
তেমনি নারী দেহকে খাদ্য যোগায় সোহাগ।"

– আনাতোল ফ্রাঁস

"সম্রাটের সমসুখী হবে সে বিভারী
থাকে যদি গৃহে তার মনমতো নারী।
শত দুখ থাক মনে, দুখ কিরে ভাই?
নিরালয় দুখহারী সাথী যদি পাই।
গৃহে যার ধনজন, বিবি অনুগত
খোদার করুণা তাঁর উপরে সতত।"

– শেখ সা'দী

"এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল,
নারীর অংগ পরম লভিয়া হয়েছে অলংকার
নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেলো কবি প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইলো গান
নর দিল ক্ষুধা, নারী দিল সুধা, সুধায়-ক্ষুধায় মিলে,
জন্ম লভিছে মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে।'

– কাজী নজরুল ইসলাম

নারী বিধাতার ছায়া, সে নহে কামিনী
নহে সে যে সৃষ্টি, তারে স্রষ্টা অনুমানী।

–মাওলানা রুমী

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উপক্রমণিকা

পরম করুণাময় আল্লাহপাকের সৃষ্ট সেরা জীব মানুষ। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির প্রতিনিধি। কারণ অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় মানুষ জ্ঞানে-গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্পাক অন্যান্য প্রাণীকে যেমন জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন; ঠিক তেমনি মানুষকেও জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্পাক এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন– "হে লোক সকল, আপন রবকে ভয় কর, যিনি একটি প্রাণ হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন এবং তার থেকে পয়দা করেছেন তার জোড়া (স্ত্রী) এবং এই দুই হতে দুনিয়াতে বহু নর-নারী বিস্তার করেছেন। (সূরা নিসা ঃ ১)।

সুতরাং নর ও নারী একে অপরের পরিপূরক। এই নর ও নারী মিলেই মানব সমাজ। বর্তমান বিশ্বে মানব জাতির অর্ধেক হলো নারী। দু'অর্ধেক মিলেই তবে পুরো এক হয়। দু'অর্ধেক সমান না হলে পূর্ণ এক হয় না।

নারী শুধু সৃষ্টিগতভাবে পুরুষের সমানই নয়, নারীকে বাদ দিয়ে এ পৃথিবীতে শান্তি ও আরাম অকল্পনীয়, অসম্ভব ও অবাস্তব। তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন– "তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে পয়দা করেছেন এবং তার থেকে পয়দা করেছেন তার স্ত্রীকে যেন সে তার সাথে শান্তিতে আরামে বসবাস করতে পারে।" (আরাফ ঃ ১৮৯)। তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের সাথে সুখে-শান্তিতে থাকতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা ও স্নেহ-মায়া পয়দা করেছেন।" (রুম ঃ ২১)।

পৃথিবীর আরাম শান্তি ও সুখের একমাত্র শর্ত নারী। নারী সুন্দর, সৌন্দর্যের প্রতীক। পুরুষের সাথে নারীর সম্পর্ক প্রেম-ভালবাসার, স্নেহ-মমতার। দাসী-বাঁদী কিংবা দেহপসারিণী, ভোগের সামগ্রী অথবা হুকুম-বরদার, পদ-সেবিকার নয়।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেছেন– "নিশ্চয়ই তোমাদের আমি এক পুরুষ এবং এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি।" (হুজরাত ঃ ১৩)। নারী পুরুষের এবং পুরুষ নারীর অংশ। এ সম্পর্কেও আল্লাহর বাণী সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন– "তোমরা একে অপরের অংশ।" (ইমরান ঃ ১৯৫)। অংশ কখনো সমগ্র বা সমগ্রের সমান হতে পারে না। অর্থাৎ না পুরুষ, না নারী, পরস্পর উভয়ে অন্যকে বাদ দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না।

ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আল্লাহ্পাক একে অপরের উপর হয়তো কিছুটা আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন এবং হাদীসে কিছু বাণী রয়েছে। যা কতিপয় সীমাবদ্ধ জ্ঞানধারী বুদ্ধিজীবী, লেখক-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ এবং মুসলমানদের চিরশত্রু আন্তর্জাতিক চক্রের মদদপুষ্ট কতিপয় এনজিও পবিত্র কোরআন-হাদীসের বেছে বেছে কিছু বাণী উদ্ধৃত করে ইসলাম

www.pathagar.com

বিদ্বেষী অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন ঃ পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেছেন– "পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্যে যে পুরুষ ধনসম্পদ ব্যয় করে। ... স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন করো এবং তাদের প্রহার করো।" (সূরা নিসা ঃ ৩৪)

হাদিসে রয়েছে ঃ "যদি আমি অন্য কাউকে সিজদা করতে আদেশ দিতাম তাহলে নারীদেরই বলতাম তাদের স্বামীদের সিজদা করতে।" (মিশকাত, দ্রঃ রফিক (১৯৭৯, ১৮১)।

আল-কোরআনে আছে ঃ "তোমাদের স্ত্রী তোমাদের শস্যক্ষেত্র; তাই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে প্রবেশ করতে পারো।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৩)

হাদীসে আছে ঃ "পুরুষের পক্ষে নারী অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকর বিপদের জিনিস আমার পরে আর কিছু রেখে যাচ্ছি না।"

"সতর্ক হও নারীজাতি সম্পর্কে। কেননা বনি ইসরাইলের প্রতি যে প্রথম বিপদ এসেছিল তা নারীদের ভিতর দিয়েই এসেছিল। অকল্যাণ রয়েছে তিন জিনিসে– নারী, বাসস্থান ও পশুতে।"

"নারী শয়তানের রূপে আসে আর শয়তানের রূপে যায়। নারী হলো আওরত বা আবরণীয় জিনিস। যখন সে বাহির হয় শয়তান তাকে চোখ তুলে দেখে।" (দ্রঃ নূর মোহাম্মদ [১৯৮৭, ১৮৭-২০১])।

যখন কোনো রমণীকে তার স্বামী শয্যায় আহ্বান করে এবং সে অস্বীকার করে এবং তার জন্য তার স্বামী ক্ষোভে রাত কাটায়– সেই রমণীকে প্রভাত পর্যন্ত ফেরেশতাগণ অভিশাপ দেয়।

স্ত্রীগণকে সদুপদেশ দাও, কেননা পাঁজরের হাড় দ্বারা তারা সৃষ্ট। পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ওপরের হাড় সবচেয়ে বাঁকা– যদি ওকে সোজা করতে যাও তবে ও ভেঙে যাবে, যদি ছেড়ে দাও তবে আরো বাঁকা হবে।

পুরুষ নারীর বাধ্য হলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (দ্রঃ রফিক [১৯৭৯, ১৮১-১৮৩])।

হাদীসে আছে ঃ "দোজখ পরিদর্শনকালে আমি দোজখের দ্বারে দাঁড়ালাম এবং জানতে পারলাম যে, দোজখীদের মধ্যে নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ" (দ্রঃ বোখারী শরীফ, ২১৬)। পুরুষেরা বেহেশতে সুখে থাকবে নিরন্তর ইন্দ্রিয় চর্চায়। হুর চূড়ান্ত যৌনাবেদনময়ী নারী, যাদের দেহ হচ্ছে–

আল-কোরআনে আছে ঃ

ওদের সঙ্গিনী দেবো আয়তলোচনা হুর। (সূরা দুখান ঃ ৫৪)।

সাবধানীদের জন্যে রয়েছে সাফল্য ঃ উদ্যান, দ্রাক্ষা, সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পানপাত্র (সূরা নাবা ঃ ৩১-৩৪)।

সে সবের মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না যাদের এর আগে কোনো মানুষ বা জ্বীন

www.pathagar.com

স্পর্শ করেনি। (সূরা রাহ্‌মান ঃ ৫৬)।

আমি তাদের মিলন ঘটাবো আয়তলোচনা হুরের সঙ্গে। (সূরা তুর ঃ ২০)।

হাদীসে আছে ঃ

হরিণনয়না স্বর্গসুন্দরীগণ তাদের পত্নী হবে। তারা সবাই (৩৩/৩৪ বছরের পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত) সমবয়স্ক হবে।

যদি বেহেশতের কোন নারী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতো তবে তার দেহভরা মৃগনাভীর সৌরভে পৃথিবী ভরপুর হয়ে যেতো এবং তার সৌন্দর্যে সূর্য ও চন্দ্র মলিন হতো। (দ্রঃ রফিক (১৯৭৯, ৩০১)।

ইমাম গাজ্জালী এ নারীদের রূপের বর্ণনা দিয়েছেন ইন্দ্রিয় উত্তেজক বর্ণনা। (দ্রঃ রফিক [১৯৭৯, ৩০২])।

সেখানে অপ্সরাসদৃশ্য পুণ্যময়ী নারীরা রয়েছে, আল্লাহ্‌ তাদের আলোকের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তারা যেন মরকত ও প্রবালের মতো। আনতনয়না সে নারীরা তাদের স্বামী ব্যতীত আর কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, জ্বীন ও মানবদের মধ্যে কেউই তাদের ইতিপূর্বে স্পর্শ করেনি, তাদের স্বামীরা যখনই তাদের সাথে মিলিত হবে তখনই তাদের কুমারী দেখতে পাবে। তাদের গলায় থাকবে নানা রঙের সত্তরটা করে হার, কিন্তু সেগুলো তাদের শরীরে একটা কেশের মতোও ভারী মনে হবে না। যেমন কাঁচের গেলাসের লাল শরাব বাইরে থেকে দেখা যায় তেমনি তাদের অস্থি, মাংস, চর্ম ও কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়ে তাদের সর্বাঙ্গ দেখা যাবে। তাদের মাথার চুল মুক্তা ও পদ্মরাগমণি দ্বারা সুশোভিত থাকবে।

বেহেশত কল্পিত হয়েছে পুরুষের প্রমোদের জন্যে, সেখানে পার্থিব নারী বা স্ত্রীদের স্থান নেই। পৃথিবীতে তারা চুক্তিবদ্ধ দাসী, বেহেশতে অনুপস্থিত বা উপেক্ষিত। ইসলামী আইনে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই।

এভাবে পবিত্র কোরআন এবং রাসূলের (সঃ) এর বাণীকে উদ্ধৃত করে কতিপয় আরজ আলী মাতুব্বর মার্কা বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতারা সভা-সেমিনারে, পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকে বিভিন্ন অবাস্তব ও অসার যুক্তি খন্ডন করে ধর্মপ্রাণ জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি বর্তমান বংশধরদেরকে বিষিয়ে তুলছেন।

ইসলাম বিদ্বেষীদের এইসব অভিযোগের সারকথা হচ্ছে– নারী অবাধ্য, অশুভ ও কামুক– তবে নারী তার কাম চরিতার্থ করতে পারবে না, পুরুষ নারীতে চরিতার্থ করবে কাম। ইসলামে কামসামগ্রী নারীর চরম রূপ হুর বা স্বর্গের উর্বশী। পুরুষের কাম কল্পনা চূড়ান্ত রূপ ধরেছে হুর-এ। বেহেশত সম্পূর্ণরূপে পুরুষের প্রমোদপল্লী, অধিকাংশ নারী জ্বলবে দোজখে।"

মানুষ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। স্যাকুলারিজম শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্যের দালালদের কাছে তো বটেই; সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী অনেক মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। এ জন্যেই চৌদ্দশ'

www.pathagar.com

বছর আগে পবিত্র কোরআনে হযরত মূসা (আঃ)-এর সময়কালের একটি ঘটনা আল্লাহপাক মানুষদের উদ্দেশ্যে বিধৃত করেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

"সে বললো, 'তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য রাখতে পারবে না। যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে তুমি কি করে ধৈর্য ধরবে।"

মূসা বললো, "আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্য ধরতে দেখবেন আর আপনার কোনো আদেশ আমি অমান্য করব না।" সে বললো, "আচ্ছা, তুমি যদি আমাকে অনুসরণ করই তবে আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যতক্ষণ না আমি সেই সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলি।" (সূরা কাহাফ্ ঃ ৬০-৭০)।

তারপর ওরা চলতে লাগলো, যখন ওরা নৌকায় উঠল তখন সে তাতে ফুটো করে দিল। মূসা বললো, "আপনি সওয়ারিদের ডোবানোর জন্য ওর মধ্যে ফুটো করলেন।"

সে বলল, "আমি বলি নি যে তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য রাখতে পারবে না?" মূসা বলল, "আমার ভুলের জন্য আমার দোষ ধরবেন না, আর আমার উপর আর বেশি কঠোর হবেন না।"

তারপর ওরা চলতে লাগলো। চলতে চলতে ওদের সাথে এক ছেলের দেখা হলো। সে ওকে খুন করলো।

তখন মূসা বলো আপনি এক নিষ্পাপ লোককে খুন করলেন যে কাউকে খুন করেনি। আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। (সূরা কাহাফ্ ঃ ৭১-৭৪)।

সে বলল, "আমি কি বলিনি তুমি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য রাখতে পারবে না। মূসা বললো, "এরপর যদি আপনাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আপনি আর আমাকে সাথে রাখবেন না। আমার ওজর আপত্তি শেষ হয়েছে।" তারপর ওরা আবার চলতে লাগলো। যখন ওরা এক জনপদের বাসিন্দাদের কাছে পৌছাল তখন তারা তাদের কাছে কিছু খাবার চাইল; কিন্তু তারা ওদের আতিথেয়তা করতে রাজি হলেন না। তারপর সেখানে ওরা একটা পড়ন্ত দেয়াল দেখতে পেল, কিন্তু মূসার সঙ্গী ওটাকে শক্ত করে দিল। মূসা বলল, "আপনি ইচ্ছা করলে অবশ্যই এর জন্য আপনার পারিশ্রমিক নিতে পারতেন।"

মূসার সঙ্গী বললো, "এখানেই তোমার ও আমার সম্পর্ক ছেদ হলো। যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য রাখতে পারনি আমি তার অর্থ বলে দিচ্ছি।

নৌকার ব্যাপার সেটা ছিল কয়েকজন গরীব লোকের, ওরা সাগরে তাদের জীবিকা অন্বেষণ করতো। আমি ইচ্ছা করে নৌকায় ত্রুটি ঢুকিয়ে দিলাম, কারণ ওদের সামনে এক রাজা যে জোর করে সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। আর ছেলেটির বাবা-মা ছিল বিশ্বাসী। আমার আশঙ্কা হয়েছিল তার অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস তাদেরকে বিব্রত করবে। তারপর আমি চাইলাম যেন তার পরিবর্তে ওদের প্রতিপালক ওদেরকে এক সন্তান দেন যে পবিত্রতায় হবে আরও বড় ও ভক্তি ভালোবাসায় হবে আরও অন্তরঙ্গ। আর এ দেওয়ালটি ছিল শহরের দুই এতিমের। তার নিচে ছিল গুপ্তধন। আর ওদের পিতা ছিল

www.pathagar.com

এক সৎকর্ম পরায়ণ লোক। সে জন্য তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলেন যে, ওরা যেন সাবালক হয় ও তারপর ওরা ওদের ধন উদ্ধার করে। সেজন্য আমি নিজ থেকে কিছু করিনি। তুমি যে বিষয়ে ধৈর্য রাখতে পারনি এটাই তার ব্যাখ্যা।" (সূরা কাহার ঃ ৭৬-৮২)।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাকের বিধৃত এই ঘটনা থেকেই আমরা শিক্ষা নিতে পারি। আল্লাহ্পাকের একশ' ভাগ রহমতের একভাগ; আবার এই একভাগের একশ' ভাগ করে এক ভাগ রহমত সমস্ত প্রাণী জগতে বিতরণ করেছেন। সুতরাং মাছ যেমন পানিতে বেঁচে থাকে; ঠিক তেমনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী আল্লাহর রহমতের মধ্যে ডুবে আছে। আল্লাহ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব নারী জাতি তো নয়ই; প্রাণীকূলের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র প্রাণীও আল্লাহ্র রহমত হতে বঞ্চিত নয়। হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র প্রাণী আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত না হলেও আশরাফুল মাখলুকাত অনেক মানুষ আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এটা মানুষের কর্মের ফল।

পৃথিবীর ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যই শান্তি ও রহমতের মূল কথা নয়। এটা যদি মূল কথা হতো তবে পাশ্চাত্য জগত অঢেল ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে ভোগ বিলাসে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক শান্তি তাদের কপালে জোটেনি। পারিবারিক অশান্তির কারণে সেখানে প্রতিবছর আত্মহত্যার রেকর্ড সৃষ্টি করছে।

সুতরাং আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথ উপেক্ষা করে নারীর সমঅধিকার, নারী স্বাধীনতা এবং নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কোনদিন যায়নি। যারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে আল্লাহর সৃষ্টির বিষয়ে বা বিধি-বিধানে অবিচার বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করছেন, এর মধ্যেও যে সকল প্রাণীকুলসহ মানব সমাজের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী অনেক মানুষের পক্ষে তা বোধগম্য হবার কথা নয়। জ্ঞানপাপী অথবা স্যাকুলারিজম শিক্ষায় শিক্ষিত মগজ ধোলাইয়ের পাশ্চাত্য দালালদের তো নয়ই।

আল্লাহর সৃষ্টিকুলের প্রতি তাঁর চেয়ে আর কার বেশি করুণা থাকতে পারে। অথচ আল্লাহরই কতিপয় বান্দা আজ খোদার উপর খোদদারীতে নেমেছে। আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর বিধি-বিধানে বৈসাদৃশ্য তালাশ করে নারী জাতির জন্য মায়াকান্না করছে। কথায় বলে– মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ, তাকেই বলে ডাইনী।

এই ডাইনীদের পাল্লায় পড়ে বিশ্বের নারী সমাজ তার স্বকীয়তা হারিয়ে চরম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পরিণত হয়েছে পুরুষের শুধুই ভোগের বস্তুতে। নারীরা আজ সেখানে মায়ের, বোনের ও স্ত্রীর মর্যাদায় গৌরবান্বিত নয়। এরা গৌরবান্বিত যৌন ক্রীড়া শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে। বিজাতীয় কোন এক কবি বলেছেন ঃ

"গ্রন্থ রচনা, বাগ্মিতা বা চাকুরী
এসব নয় নারীর কর্ম,
পুরুষের কর্ম এসব, পুরুষেরই শোভা পায়
নারী শুধু তার অংকশায়িনী।"

যতদিন রূপ-যৌবন রয়েছে ততদিনই সে সমাজে নারীর কদর রয়েছে পুরুষদের কাছে। রূপ-যৌবন ফুরিয়ে গেলে নারীরা পরিণত হন ন্যাপকিনের মতো অপাংক্তেয়।

www.pathagar.com

অথচ এই পাশ্চাত্যবাসীরাই এদেশীয় দালালদের সাহায্যে ইসলাম ধর্মকে প্রতিপক্ষ করে নারী নির্যাতনের কাল্পনিক কাহিনী ফেঁদে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। তাদের ভাষায় নারী নির্যাতনের জন্য একমাত্র দায়ী ইসলাম ধর্ম!

প্রকৃতপক্ষে দেশে দেশে এই নারী নির্যাতনের পিছনে অসংখ্য কারণ বিদ্যমান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হলো–

১। কতিপয় ধর্মে নারীকে শুধু ভোগ্যপণ্য ও পতি দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হবার বস্তু মনে করা।

২। মানব রচিত ভ্রান্ত মতবাদ।

৩। আল্লাহর আইন সম্পর্কে উদাসীনতা, অজ্ঞতা এবং ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যা।

৪। যৌতুক প্রথার কালোগ্রাস।

৫। কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতা।

৬। সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় এবং ধর্মহীনতা।

৭। ইসলাম প্রদত্ত নারী স্বাধীনতার অস্বীকৃতি।

৮। অন্ধ কুসংস্কার ও অন্ধ অনুকরণ।

৯। যথাযথ আইন ও তার কার্যকারিতার অভাব।

১০। নারীদের নিজ নিজ দায়িত্বে কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীনতা ও সুশিক্ষার অভাব।

১১। সর্বোপরি প্রগতির নামে উলঙ্গপনা, বেলেল্লাপনা, অশ্লীলতা, অপসংস্কৃতির চর্চা, বেপর্দা এবং অবাধ যৌনাচার নারী নির্যাতনের প্রধান উৎস।

বেশ কয়েক বছর আগে জাতীয় দৈনিকের একজন সম্পাদকের নিবন্ধে পড়েছিলাম– অবাধ ও উদ্দাম যৌনতাকে ঠেকানোর রাস্তা খুঁজে পাবার জন্যে পাশ্চাত্যের গবেষকরা ইতিমধ্যে দুটো ধর্মকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ব্যর্থ হয়েছেন। লক্ষ্য ছিল যে, যদি দুটো ধর্মের কড়া অনুশাসনের দ্বারা যৌনাচার রোধের কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতো, তাহলে সংশ্লিষ্ট ধর্মের প্রতি যৌনাচারবাদীদের উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি কড়াকড়িভাবে আরোপ করার পদক্ষেপ নেয়া যেতো সে ধর্মীয় জীবনাচারের সংশ্লিষ্ট অনুশাসন। কিন্তু তারা দেখেছে এই দুটো ধর্মে তার তেমন কোন নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর পথ নেই। এর বহু কারণের মধ্যে উল্লিখিত দুই ধর্মের দু'টি দিক উল্লেখ্য। খ্রীষ্টধর্মে তাদের ধর্মগুরু যীশুকে বলা হয় সৃষ্টিকর্তার সন্তান এবং খৃস্টানদের মতে সে জন্মসূত্র হচ্ছে এক ধরনের অকথিত, অদৃশ্য যৌনাচার। ধর্মগুরুর জন্ম সম্পর্কে খ্রীস্টানদের এমনতির অবস্থান খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বীদের অনেককেই নীতিবোধ বিবর্জিত উদ্দাম যৌনাচারের উৎসাহিত করে থাকে। অর্থাৎ এরা মনে করে তাদের ধর্মগুরুর জন্মই যেহেতু অপ্রচলিত, অজ্ঞাত যৌনাচারের সূত্রে; সেহেতু তাদের জন্য উদ্দাম যৌনাচার চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অপরাধ নয়।

এরপর ঘাটা হয়েছে হিন্দু ধর্মকে। হিন্দু ধর্মের বহু দেব-দেবীর জন্মসূত্র নিয়েও যেসব কাহিনী বেদ, রামায়ন-এ উল্লেখ আছে, তা অনেকগুলোই উদ্দাম যৌনাচারেরই কল্পকথা। ফলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যারা যৌনাচারে বিশ্বাসী, তারা মনে করে যে,

www.pathagar.com

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে উদ্দাম যৌনাচার হয়তো কোন পাপকর্ম হবে না, যেতে হবে না নরকে; কেননা দেব-দেবীদের অনেকেরই জন্মসূত্র হচ্ছে এই উদ্দাম যৌনাচার।

বৌদ্ধ ধর্মকে নিয়ে উদ্দাম যৌনাচারবাদীদের আগ্রহ কম; কেননা উদ্দাম যৌনাচার রোধের কোন পন্থা সে ধর্মে গবেষণা করে যদি বেরও করা যায়, তাহলে সংকট দেখা দেবে বৌদ্ধ ধর্মের অন্যবিধ জীবনাচার নিয়ে; যে জীবনাচারের অবশ্য পালনীয় গেরুয়া বসন আর নিরামিষ খাবার-এ সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা হবে কঠিন। মজার ব্যাপার হচ্ছে এসব গবেষকরা জানে যে, উদ্দাম যৌনাচারকে কার্যকরভাবে নির্মূল করার একমাত্র নির্ভরযোগ্য ধর্ম হচ্ছে দুনিয়াতে ইসলাম। যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের মেয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য নাকি প্রায় মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তাকে এই মানসিক অবস্থা থেকে অনেক কষ্টে ফেরানো হয়েছে। যে ইসলামকে পাশ্চাত্যের মোড়লরা দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে বার বার ক্রুসেড করেছে (আনুষ্ঠানিক ক্রুসেড করেছে ৮ বার) অসংখ্যবার এবং প্রতিবারই তারা হয়েছে পরাস্ত এবং যে ইসলামকে 'মৌলবাদের' মোড়ক লাগিয়ে তারা এর গতিকে রুদ্ধ করার জন্য অহর্নিশ প্রাণান্তকর প্রয়াস চালাচ্ছে, সে ইসলামের অনুশাসনের ভাল দিকগুলো তারা এবং এদেশীয় দালালেরা মানবে কেমন করে? মূলতঃ এখানেই হয়েছে ইসলামের সাথে তাদের সংঘাত।

এদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান। কাজেই ধর্মীয় অনুশাসন কিছুটা হলেও মেনে চলার কারণে পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা পাশ্চাত্যের তুলনায় এখনো অনেকটা টিকে আছে। এদেশের অধিকাংশ নারী সমাজ তার অধিকার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করছে। আবহমান কাল ধরে এদেশের নারী সমাজ কখনো কন্যা, কখনো জায়া, কখনো জননী হয়ে অত্যন্ত মর্যাদা ও সম্মানের সাথে পারিবারিক মধুর পরিমন্ডলে বসবাস করে আসছে। বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনাকে উদাহরণ টেনে সমগ্র জাতিকে নারী নির্যাতনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় না। এখানে আর্থিক দৈন্যতা, অভাব-অনটন রয়েছে বটে; কিন্তু তা সত্ত্বেও পারিবারিকভাবে পরস্পরের প্রতি রয়েছে সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও আন্তরিকতা।

সুতরাং এদেশে নারী কখনো অবলা, অসহায় নয়। পিতা, ভাই ও স্বামীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে কেউ না কেউ নারীর দায়িত্ব নিয়ে থাকে। যা পাশ্চাত্যে কল্পনাও করা যায় না। এদেশে একজন নারীর রূপ-যৌবন অপেক্ষা তার নারীত্ব, মহত্ব, মাতৃত্ব, সতীত্ব প্রভৃতি গুণের আবেদন অনেক বেশি। কথায় বলে, 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে, সংসার ধ্বংস হয় নারীর কারণে।' কাজেই একজন নারী ইসলামী অনুশাসন মেনে চললে একটা পরিবারকে স্বর্গীয় সুখের সুবাতাস বয়ে দিতে পারে। আবার সেই নারীই ইসলামী অনুশাসন ত্যাগ করে ভোগবাদী আদর্শ গ্রহণ করে একটি পরিবারকে জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডে পরিণত করতে পারে যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি ইতিহাসের পাতায় এবং সমসাময়িককালে নারীর সমঅধিকারের নামে।

আমাদের পিয়ারা নবী (সাঃ) আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে নারীকে দিয়েছিলো সর্বোত্তম মর্যাদা। এমনতি পুণ্যবতী স্ত্রীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে ঘোষণা

www.pathagar.com

করেছেন। আবার তিনিই ঘোষণা করেছিলেন- "আমি তোমাদের জন্য একটি বড় ফিত্না রেখে যাচ্ছি, তা হলো নারী ফিত্না। সমকালীন বিশ্বে রাসূল (সাঃ)-এর এ কথার যথার্থতা সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।

কবি নজরুল ইসলাম নারী মর্যাদা ও অধিকার সমুন্নত রাখতে বহু কবিতা, গান, প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

গুণে গরিমায় আমাদের নারী
আদর্শ দুনিয়ায়
রূপ লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রীতে
হুর-পরী লাজ পায়।

আবার কবি নজরুল নারী চরিত্র সম্পর্কে তাঁর সুবিখ্যাত 'পূজারিণী' কবিতায় বলেছেন ঃ

"নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো
এরা দেবী এরা লোভী
এরা যত পূজা পায়, চায় ততো আরো
ইহাদের অতিলোভী মন
একজনে তুষ্ট নয়, এক পেয়ে সুখী নয়
যাচে বহুজন।"

এটা কবি নজরুলের তিক্ত অভিজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রের কল্যাণে আল্লাহ্পাক পবিত্র কোরআন ও রাসূলের (সাঃ) সুন্নতের মাধ্যমে কতিপয় সুনির্ধারিত বিধি-বিধান দিয়ে সীমারেখা এঁকে দিয়েছেন। কিন্তু পাশ্চাত্যবাদীরা এই সীমারেখাকে নারী অধিকারের প্রধান অন্তরায় বলে অপপ্রচার করে সমগ্র বিশ্বে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করছে। একদিকে এই ভোগবাদীরা নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে সমগ্র নারী জাতিকে জাহান্নামের রাস্তায় ঠেলে দিচ্ছে; অন্যদিকে এই নারী জাতির জন্য মায়াকান্না করে ইসলামের সুমহান মৌল কাঠামোতে কৌশলগত চক্রান্তের মাধ্যমে আঘাত হানছে।

মহাগ্রন্থ আল-কোরআন অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্ট ভাষায় আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে এসব তথাকথিত মানবতাবাদীদের মুখোশ উন্মোচন করে বলেছেন ঃ

"যখন তাদেরকে বলা হয় পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে আমরা তো সমাজ পরিশুদ্ধি ও সংশোধনের কাজ করছি। শোনো! তারাই প্রকৃত ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। অথচ তারা বুঝতে পারে না। (বাকারা)

www.pathagar.com

পশ্চিমা নারীর প্রেম

[আঠারো শতকে রচিত]

তোমার মদির ঠোটে করো চুম্বন;
তোমার এ চুম্বনে সে কি মাদকতা!
অব্যক্ত অমিয় স্বাদ তোমার ওই মিলন-মলমে।
তোমার নামেই তুমি এক স্বাদের পূর্ণতা পায়-
তাইতো কুমারী-তরুণী চায় তোমার মিলন।
জাপ্‌টে আমাকে রাখো-পশ্চাতে কেবলি যে আমি।
আনন্দের সম্মোহনে রাজ্যের এ রাজমহল আলোকিত
আমার উচ্ছ্বাসে-আমি তাই স্ফুর্তিময় তোমার পরশে।
এতে মানি সবি তুচ্ছ সব মাদকতা
পৃথিবীর যত ভালোবাসা তোমার আর যত মানুষের।

শারোনের গোলাপ আমি আর পদ্ম-উপত্যকার।
কাঁটার কাননে যেমন পদ্ম রয় ঘিরে
এমনি মদমত্ত প্রেমের আসক্তে বিভোর সে–আমি
যেমন আলাদা হয়ে পরিচিত আপেলের গাছ
বনের শ্যামল ছেপে, ঠিক তাই আমারও প্রেমিক
প্রেমের বৃক্ষতলে আমার নারীত্বের তপস্যায় ব্রতী
সেকি আনন্দ! আহা কী সিক্ত সুমধুর স্বাদে
সেতো পুরুষ সেই যার ছোঁয়ায় আমার এ আসা
বিশাল মেহমানদারীর উল্লসিত উদ্দীপন পতাকার তলে।

আমাকে শুধালো এই আমার প্রেমিক, বললো-
হে সুন্দরী এসো প্রিয়া আমার এ বুকে
এখন শৈত্য নেই–নেই যে গো বর্ষার ধারা
তবুও ফুটেছে ফুল পাখী-ঘুঘু গায় সুরে সুরে
ডুমুরের ফুল আর আঙ্গুরের সম্মোহন লোভ!
প্রিয়া এসো, চলে এসো অতিশয় কাছে।
দেখো দেখো হে সুন্দর, আহা তুমি কতই সুন্দর,
ঘুঘুর চপলা চোখ অংকিত তোমার কুন্তলে;
যেমন, গিলাভ পর্বত হতে ধেয়ে আসে ছাগলের পাল
তোমার কুন্তল সেই থরে থরে সাজানো সে রূপ।
ভেড়ার বিচিত্র চিত্র তোমার দন্তের সারি সাজে
সেই রূপ ছটা যেন সমতল।
সৌন্দর্যের পরিপাটির বিধৌত প্রবাহের ছাপে

www.pathagar.com

জমজ প্রসবিনী এরা শুধু, বন্ধ্যা নয় কেউ।
তোমার ওষ্টদ্বয় হে প্রিয়, কি যে রক্তিম তেমনি
বচন তোমার মাদকতায় আকর্ষণ চিরে ললাটে পাশ ঘেষে
শ্মশ্রুর বলয়ে, তোমার গ্রীবার উচ্চ
ডেভিডের মিনারের চূড়া যেন গোপন অস্ত্রাগার
বানানোর মতো হাজার বর্মরাখা অলক্ষ্যে
গৌরবে সুউচ্চ পৌরষিক বীরের।
তোমার হৃদপিণ্ডে আমি হবো সোনালী মোহর হে প্রিয়,
তোমার বাহুতে আঁকা আমারি মোহর, কারণ মৃত্যুর মতোই
শক্তিময় প্রেম আর সে হিংসা সেতো নিষ্ঠুর শুধুই কবরের ন্যায়।
চুলোর আগুন শিখা গ্রাসে যেন সকল কিছুই।
জানো প্রিয়, যায়না পানিতে ধুয়ে ভালবাসা
আর বন্যার তুখোর তোড়ে ভেসে লুপ্ত নয় ভালোবাসা।

পুরুষের উজার করা সব কিছু দেয় যদি শুধুই প্রেমের
আকুতির গ্রাসে সব তবু তুচ্ছ ঘৃণিত এ সব।
রাজকুমারী, হে সুন্দরী দেখো দেখো কী অপরূপা
তোমার উরুর ভাজে ঔজ্জ্বল্য মনিমুক্তো ঝরে
বিচ্ছুরিত রূপ মোহ আহা, কে এই মহা কারিগর?
কলমির বৃত্তের মতো তোমার নাভির গভীরতা যেন অতলতর,
আহা কি মাদকতার উষ্ণ প্রদাহ, গমের সুউচ্চ ডিবি তোমার উদর।
যমজ হরিণ যেন সুডোল বক্ষে ঠায় চোখের ঠাহরে।
হস্তীদন্তের গড়া প্রিয় তেমার সুউচ্চ গ্রীবা,
হেবোনের মৎসভরা পুস্করিনী বাথ-রাব্বিম দরোজার পাশে
তোমার এ দুটি চোখ; লেবাননের সেই যে মিনার
ব্যথিত মুখের মতো যা ওই দামেস্কের পানে
তোমার নাসিকা; কামেল চুঁড়োর মতো
তোমার মস্তক ভরে দণ্ডায়মান তোমার এ কোমল শরীরে।
কুচকুচে কেশদাম বেগুনী রক্তিম আভায় মাখানো মধুর;
যেন আহা রাজসিক রক্তিম প্রভায় উজ্জ্বলতর
তুমি কী ভীষণ ফর্সা চমৎকার ওহে প্রাণ প্রিয়,
আমাদের ঝর্ণাধারা প্রিয় সেতো তুমি শুধু।

মূলঃ ইংরেজী ভাষা, লেখকঃ অজ্ঞাত
বাংলা কাব্যানুবাদ ঃ সাইয়েদ আতেক (নকীব ভাই)

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর মূল্যায়ন

প্রাচীন সমাজে নারী জাতি ছিল অমঙ্গলের প্রতীক। প্রাক-ইসলামী যুগে নারীকে বলা হতো– 'শয়তানের ষষ্ঠি, অমঙ্গলের অগ্রদূতী। কন্যা সন্তানের জন্মকে মনে করা হতো অবমাননাকর ও দুর্ভাগ্যজনক। এ জন্যে তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। তারা পেতো না কোন উত্তরাধিকারী স্বত্ব। নারীদের কোন আইনগত বা সামাজিক মর্যাদা ছিলো না। তাদেরকে মনে করা হতো বাজারে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্যের মতো। যে কেউ ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অন্যের কাছে ঋণ দিতে পারতো। বিশ্বাস করা হতো নারীদের মানবীয় প্রতিভা নেই। তাই তার চেতনাও শাশ্বত নয়। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুর পর তার জীবন ধারণের আর কোন অধিকার নেই।

কোন কোন সমাজে নারীদেরকে মোহের বাস্তবরূপ এবং মানবাত্মার নির্বান লাভের অন্তরায় মনে করা হতো। কোন কোন সভ্যতায় তাদেরকে "সকল পাপের মূল উৎস" (Root of all evil), "নারী নরকের দ্বার"(Women is a door to Hell), "মানুষের দুঃখের কারণ" (Woe to man), "শয়তানের মুখপাত্র" (Organ of the devil), "তীব্র বিষধর বিচ্ছু" (Poison ous asp), পক্ষধর ভূজঙ্গের বিদ্বেষ" ইত্যাদি হীনতম বিশেষণে ভূষিত করেছেন। প্রাচীনকালের ধর্মগ্রন্থগুলো অন্বেষণ করলে নারী অধিকারের কোন কথা তো পাওয়া যাবেই না বরং দেখা যাবে তাদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য ও নারী লাঞ্ছনা তথা যেন ব্যাভিচারের অশ্লীল লোমহর্ষক কাহিনীতে ভরপুর।

অতি প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে আধুনিক দুনিয়া পর্যন্ত নারীদের ব্যাপারে সমাজে বহুবিধ দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালে গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে নারীদের ব্যাপারে সমাজে ধারণা ছিলো অত্যন্ত জঘন্য। অতীতের সভ্যতা গর্বিত গ্রীক সমাজের নারীরাও ছিলো পুরুষের দাসী মাত্র। আর নারীদের তারা দাসীর মতোই ব্যবহার করতো। সমাজের কলঙ্ক মনে করতো। জীবন্ত প্রথিত করতো। সমাজের বুকে নারীর কোন অধিকার আছে এমন কথা তারা কল্পনাও করতো না। সেখানে তারা ছিলো লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা, অবহেলিতা ও ঘৃণার পাত্রী। এমনকি সমাজে কোন মেয়ে সন্তানের জন্মও ছিলো বিষময়। সমাজের এই বিষাক্ত মানসিকতা কতো মেয়ে সন্তানেরাই না অকালে জীবননাশ করেছে তা ভাবতেও শরীর শিউরে উঠে।

সেই প্রাচীনকালেই কোথাও দেখা গেছে সমাজ নারীদেরকে দেবীর মর্যাদা দিয়েছে। নারীর মূর্তি বানিয়ে পূজা করেছে। ভাগ্য বিধাত্রী মনে করেছে, অর্থাৎ নারীদের মর্যাদা পুরুষের থেকে অনেক উর্ধ্বে মনে করেছে। আবার দেখা গেছে, এ নারীদেরকেই তারা নিছক যৌন সম্ভোগের বস্তুতে পরিণত করেছে। আসরে আসরে নারীদের উলঙ্গ নৃত্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করে পুরুষদের যৌন উন্মাদনাকে নগ্ন করে তুলেছে। বেশ্যালয় স্থাপন করে চরম পাশবিকতার চিত্রাংকন করেছে। শুধু তাই নয়, কোন কোন দেশতো

www.pathagar.com

প্রাচীন গ্রীসে দেহোপজীবনীর প্রতিকৃতি। তৎকালীন এথিয়ান সমাজে এদের অনেক মর্যাদা দেয়া হতো

প্রগতির(?) এতো চরম সীমায় পৌঁছেছিল যে, দেশের সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে শাসন ক্ষমতার সর্বোচ্চ কর্মকর্তারা পর্যন্ত নারীদের নৃত্য সাগরে ডুবে থাকতো। এমনি করে কতো সোনার সিংহাসনই না ধ্বংস হয়েছে, পতন হয়েছে কতো শহরের। কিন্তু নারীর মুক্তি আসেনি। প্রাচীন সমাজের পুরুষরা এই নারীকে নিয়ে যেমন খুশী তেমন খেলেছে। কখনও দাসী হিসেবে খেলেছে, কখনও দেবী বানিয়ে খেলেছে আবার কখনও নগ্ন করে বেশ্যালয়ে নিয়ে নৃত্য সাগরে ডুব দিয়ে খেলেছে। খেলা যখন শেষ হয়েছে এই নারীকেই তারা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আর অসহায় নারী জাতি মুক্তির আশায় নীরবে নিভৃতে কেঁদেছে, মুক্তির পথ চেয়ে থেকেছে– জুলুম আর নির্যাতন নীরবে সহ্য করেছে।

ইতিহাস বলে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতায় নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে নারী বেশ নিগৃহীত ছিল। নারীকে কোন প্রকার গুরুত্ব দেয়া হতো না। পুরুষই ছিল সর্বেসর্বা। গ্রীক পুরানে 'নারী পান্ডোরা'কে মানব সমাজের দুঃখ-দুর্দশার কারণ রূপে

www.pathagar.com

ক্যাটো ও পোর্শিয়ারের ভাস্কর্য। নারী পোর্শিয়ার প্রাচীন রোমান আইন মোতাবেক ক্যাটোর সমান অধিকার ভোগ করতেন

চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে গ্রীক সমাজে নারীর সতীত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এক ধরনের নারী পূজার ধুম পড়ে যায়। নারীরা লাভ করে দেবীর আসন। কয়েক যুগ পর তারাই আবার বিবাহ প্রথাকে সুদৃষ্টিতে দেখেনি। নারী হয়ে উঠে কামনা আর ভোগের সামগ্রী। নর-নারীর অবাধ মেলামেশা ও যৌন-সম্পর্ক অপরাধ হিসাবে গণ্য হতো না। গ্রীক পুরাণে আছে ঃ কামদেবী আফ্রোদিতি জনৈক দেবতার পত্নী হয়েও অন্য তিন দেবতা ও একজন মানব সন্তানের সাথে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করে। আর এই অবৈধ সম্পর্কের ফলে যে সন্তান লাভ হয় সেই হচ্ছে গ্রীক পুরাণের প্রেম দেবতা 'কিউপিড়'। গ্রীকদের মতে সাপে দংশন করলে বা আগুনে পুড়লে চিকিৎসা সম্ভব। কিন্তু নারীদের ছোবলে বিষ ক্রিয়ার চিকিৎসা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

প্রখ্যাত গ্রীক চিন্তাবিদ ভেবোস্তিন বলেন ঃ আমরা যৌন তৃপ্তির জন্য বেশ্যালয়ে যাই এবং সন্তান উৎপাদনের জন্যই স্ত্রী গ্রহণ করি। গ্রীক সভ্যতায় সর্বপ্রকার অত্যাচারের পাশাপাশি তারা তাদের দেবতার কাছে অনুশোচনা করতো এই বলে যে, একই সূর্যের নিচে পুরুষের সাথে নারীকে কেন দেয়া হলো। নারীর চেয়ে দুনিয়ায় আর কোন নিকৃষ্ট বস্তু নেই। এই ছিল খ্যাতনামা সক্রেটিসের বক্তব্য।

রোমান নীতিবিদগণ যৌন লাম্পট্যকে গুরুত্ব দেয়া থেকে বিরত থাকতে পছন্দ করেছে। নানা রূপ পরিবর্তনের ফলে তৎকালে বিবাহ প্রথাকে উঠিয়ে দেয়া হয়। আধুনিককালেও নাকি তা অব্যাহত আছে। ফলে একজন নারী যেমন যথেচ্ছ পুরুষ সংসর্গ ভোগ করতে সক্ষম হচ্ছে, তেমনি পুরুষের বহুগামিতায়ও আর কোন রক্ষাকবচ থাকেনি বা এখনো থাকছে না।

ক্যাটো এবং তার এক অনুসারীর মতে, "বিয়ের পূর্বে যথাসম্ভব নারীর সংস্পর্শ হতে

www.pathagar.com

দূরে থাকবে। কিন্তু কেউ যদি এ বিষয়ে অসংযম হয় তাকে অযথা নিন্দা ও ভর্ৎসনা করবে না।" এই সর্বনাশা নীতির ব্যাপক প্রচলনের ফলে বিবাহ ছাড়াই নারী পুরুষেরা অবাধ যৌন মিলনের এক ধরনের ছাড়পত্র পেয়ে যায়। রোমান সভ্যতায় নারীর মর্যাদা ধূলায় ধূসরিত হয়।

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের মতে, রোমান ও গ্রীক সভ্যতা ধ্বংসের মূলতঃ কারণ হলো নারী-পুরুষের অবাধ যৌনাচার। তাদের অবাধ যৌনাচারের নিদর্শন স্থাপত্য শিল্পেও অংকিত হতো। যার নিদর্শন এখনো সে দেশের ধ্বংসাবশেষে পাওয়া যায়।

নারীত্বের অবমাননা, অপহরণ, ধর্ষণ, নারী হত্যা, নারীর প্রতি জুলুম, নির্যাতন আজকের দুনিয়ার যেমন নিত্য দিনের চিত্র ঠিক আজ থেকে পনর শত বছর পূর্বে এর চেয়েও কালো এক অধ্যায়ের মুখোমুখি হয়েছিল নারী সমাজসহ গোটা মানবতা। মানবেতিহাসে সে অধ্যায় 'আইয়্যামে জাহেলিয়াত' বা অন্ধকারের যুগ হিসেবে কালো অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সমকালীন ইতিহাসে।

যে কোন দেশের তুলনায় জাহেলিয়াত যুগে আরবের নারী জাতির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিলো। সে যুগে আরবরা নারীকে অস্থাবর সম্পত্তি ও ভোগের সামগ্রী বলে মনে করতো এবং তাদের অত্যন্ত ঘৃনার চোখে দেখতো। একটি লোক যতগুলো খুশি স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো এবং ইচ্ছমতো যে কোন সময় যে কোন স্ত্রীকে তালাক দিতে পারতো। সৎ মাকেও তারা পত্নীত্বে বরণ করতে দ্বিধাবোধ করতো না। কন্যা-সন্তানের জন্ম লোক লজ্জা ও দুর্ভাগ্যের কারণ বলে গণ্য হতো। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে বলে সংবাদ পেলে পিতার মুখ দুঃখ, ক্ষোভে বিষন্ন হয়ে যেতো। বহু পিতা দারিদ্র্যের ভয়ে কন্যা

যৌন দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত আসপাসিয়ার প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছেন পেরিক্লিস

www.pathagar.com

সন্তানকে হত্যা করতো। অনেক সময় কন্যার হৃদয়বিদারক চিৎকার উপেক্ষা করে পিতা তাকে জীবন্ত কবর দিতো।

একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অনেকে বহু প্রণয়িনীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করতো। বিবাহিতা রমণীরা সন্তান লাভের জন্য স্বামীর কাছ থেকে পর-পুরুষের সাথে ব্যাভিচারের অনুমতি পেতো। আরবের সেই বর্বর যুগে মানুষ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে কা'বা ঘর তাওয়াফ করতো এবং এটাকে উৎকৃষ্ট এবাদত মনে করতো। নারীরাও তাওয়াফের সময় উলঙ্গ হয়ে পড়তো। মুসলিম 'কিতাবুত তফসিরে' আরবের এই প্রথা বর্ণনা করেছেন যে, একজন নারী উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করতো এবং সমবেত লোকদের বলতো, "কে আমাকে একটা কাপড় দিবে যা দ্বারা আমি আমার শরীর ঢাকবো?' এভাবে উক্ত নগ্ন নারীকে কাপড় দান করা বিরাট পুণ্য কাজ মনে করা হতো। সে সময় স্ত্রীলোকদের পোশাক এমন হতো যে, বুকের কিছুটা অনাবৃত থাকতো এবং বাহু, কোমর ও হাঁটুর নিচে কিছুটা অনাবৃত থাকতো। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশেও আমরা অবিকল এই অবস্থা দেখতে পাই। জাহেলিয়াতের সেই যুগে মৃত স্বামী, পিতা বা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজনের সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার ছিলো না। তৎকালীন নারী জাতি মুক্তির কোন স্বাদ গ্রহণ করেনি, বরং ঘৃনিত, অভিশপ্ত ও নির্যাতিত জীবন যাপন করেছে।

বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শনে ও সভ্যতায় নারীর অধিকার, সম্মান ও মর্যাদার সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনাকালে মহানবী (সঃ) প্রদর্শিত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম ধর্ম বা দর্শন নারী জাতির উন্নয়নে যে অবদান রেখেছে তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। তাই নিম্নে সংক্ষিপ্তকারে বিভিন্ন ধর্মীয় দর্শন ও সভ্যতায় নারী জাতির অবস্থানের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো ঃ

বাইবেলে নারী

বাইবেল-এর 'আদি পুস্তক'-এ নারী সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, "সদাপ্রভূ ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর তিনি তাঁহার একখান পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পুরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাঁহাকে আদমের নিকটে আনিলেন। তখন আদম কহিলেন, এবার [হইয়াছে]; ইনি আমার অস্থি ও মাংসের মাংস; ইহার নাম নারী হইবে, কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন।"

বাইবেলে সদাপ্রভু নারীকে বলে, "সে (পুরুষ) তোমার উপর কর্তৃত্ব করিবে" [মানব জাতির পাপে পতন ঃ আদি পুস্তক]। ক্যাথলিকদের বিধান হচ্ছে– "পিতাই পরিবারের কর্তা"।

বাইবেলের আদম-হাওয়ার পতনের উপাখ্যান প্যান্ডোরার উপাখ্যানেরই সংস্কৃত রূপ। এ গল্পের অসীম প্রভাব রয়েছে ইহুদী-খ্রিস্টান-মুসলমানের উপর অর্থাৎ সাম্প্রতিক সভ্যতার অধিকাংশ মানুষের উপর। হাওয়া সম্ভবত ছিলো, প্যান্ডোরার মতোই, এক উর্বরতার দেবী; তবে পুরুষতন্ত্র তাকে উৎখাত করে তার মর্যাদার অবস্থান থেকে। এর কিছুটা বাইবেলে রয়ে গেছে। তাদের পতনের আগে, বাইবেলে বলা হয়েছে, "আদম

www.pathagar.com

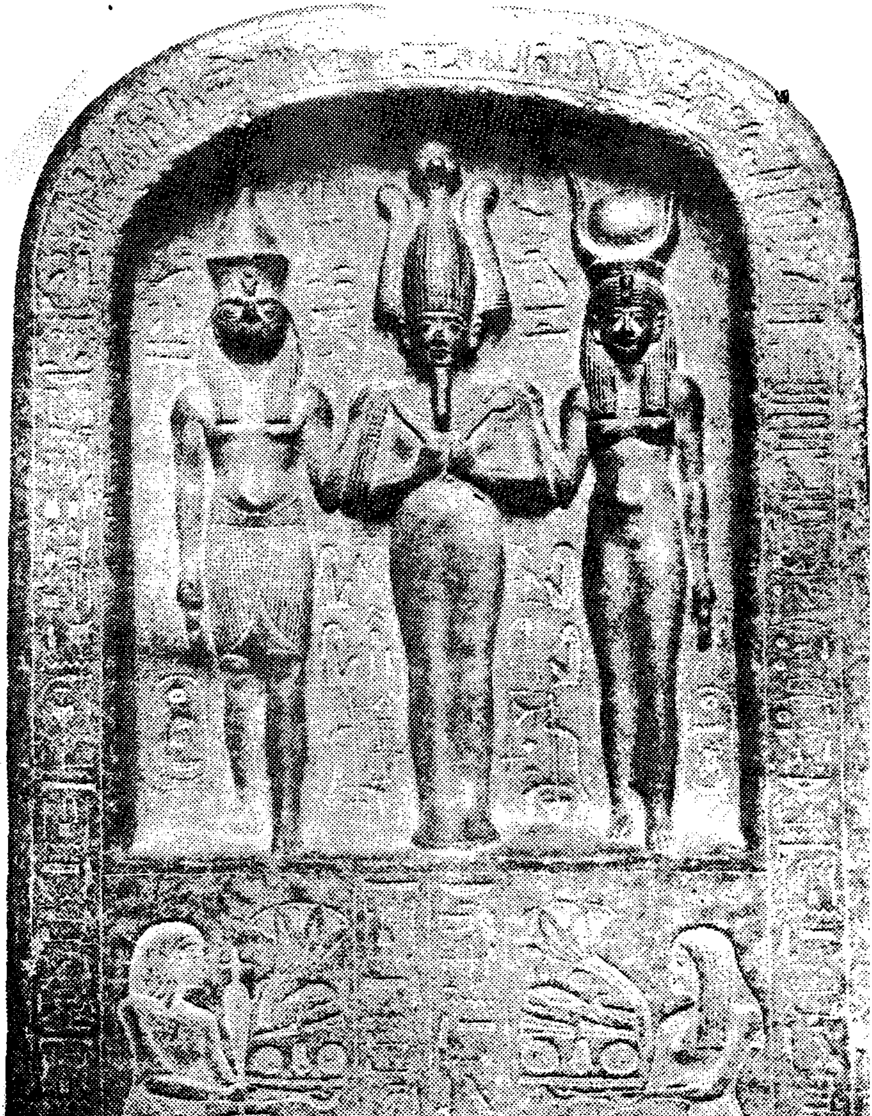

আইসিস্ মিসরের দেবী-দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ। তার পাশে ওসাইরিস্ ও তার ভাইরা, স্বামী ও পুত্র হোরাস্। তার সম্মানে যে মেলা হতো সেখানে যৌন কার্যকলাপের আধিক্য দেখা যেতো।

www.pathagar.com

আপন স্ত্রীর নাম হবা (জীবিত) রাখিলেন, কেননা তিনি জীবিত সকলের মাতা হইলেন" [আদি পুস্তক ঃ মানব জাতির পাপে পতন]। এ উপাখ্যান প্রচলিত লৌকিক কাহিনীর রূপান্তর বলে হাওয়াকে সৃষ্টি করার দু'টি বিরোধী কাহিনী বাইবেলে রয়ে গেছে। একটিতে নারী-পুরুষকে একই সাথে সৃষ্টি করা হয়, আরেকটিতে নারীকে সৃষ্টি করা হয় পুরুষের অস্থি থেকে। আদম-হাওয়ার কাহিনী মানুষের সঙ্গম আবিষ্কারের কাহিনীও। এ কাহিনীতে আরো নানা বিষয় রয়েছে, যেমন মানুষ কিভাবে হারায় তার আদিম সারল্য, জ্ঞান কিভাবে আসে বা আসে মৃত্যু। তবে এ সবই আবর্তিত কামকে ঘিরে। বিধাতা আদমকে জানিয়েছিল যে নিষিদ্ধ ফল খেলে তারা মারা যাবে, কিন্তু দেখা যায় বিধাতা সত্য কথা বলেনি, বরং শয়তানই বলেছিলো সত্য যে তারা মরবে না। নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার ফলে তারা মারা যায়নি, শুধু বুঝতে পেরেছে যে তারা নগ্ন এবং সেজন্যে লজ্জাবোধ করেছে। এতে যৌনতা সুস্পষ্ট। হিব্রু ভাষায় 'খাওয়া' বলতে সঙ্গমও বোঝাতে পারে। বাইবেলে 'জানা' আর যৌনতা একই অর্থ বোঝায়; আর বাইবেলের সাপটি শিশ্নেরই প্রতীক। বাইবেলে মানুষের দুঃখ কষ্ট ও স্বর্গ হারানোর জন্যে দায়ী করা হয়েছে কামকে। ঐ নিষিদ্ধ কামের অপরাধে পুরুষের ভাল রকমেরই অংশ রয়েছে; কিন্তু ঐ অপরাধ থেকে পুরুষকে মুক্তি দিয়ে সব অপরাধ চাপানো হয়েছে হাওয়া বা নারীর ওপর। বলা হয়েছে তারই জন্যে পতন ঘটেছে পুরুষের অর্থাৎ মানব জাতির।

প্রথম পুরুষটিও দোষ চাপিয়েছে নারীরই ওপর; বলেছে, "তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল, তাই খাইয়াছি" [আদি পুস্তকঃ মানব জাতির পাপে পতন]। হাওয়া দন্ডিত হয়েছে কামে আদমের অংশগ্রহণের অপরাধে। তারা দু'জনে শাস্তি পেয়েছে দু'রকম। আদম বা পুরুষকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে তা শাস্তিই নয়। বিধাতা আদমকে বলেছে, "তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে;" অর্থাৎ পুরুষ পেয়েছে সভ্যতা সৃষ্টির ভার। হাওয়াকে যে শাস্তি দেয়া হয়, তা রাজনীতিক। তার দন্ড হচ্ছে ঃ "আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব; তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে; ও সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করিবে।" নারীকে সাপের বা কামের সাথে চিরদ্বন্দ্বেও লিপ্ত করে দেয়া হয় ঃ "সদাপ্রভু সর্পকে কহিলেন; আমি তোমাতে ও নারীতে.... পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে" [আদি পুস্তক ঃ মানব জাতির পাপে পতন]। পুরুষতন্ত্র নারীকে করে তোলে কাম ও পাপের আধার; এবং নারীকে পুরুষের রাজনীতিক অধীনতায় নিয়ে আসে তার কল্পিত স্বর্গেই। পিতৃতন্ত্রের চোখে নারী অশুভ; অশুভের পায়ে নিবেদিত। পিথাগোরাস বলেছেন, "রয়েছে এক শুভনীতি, যা সৃষ্ট করেছে শৃংখলা, আলোক ও পুরুষ; এবং রয়েছে এক অশুভ নীতি, যা সৃষ্টি করেছে বিশৃংখলা, অন্ধকার ও নারী" [দ্রঃ দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ১১২)]। পুরুষের প্রয়োজন নারী, তাই নারীকে সমাজে স্থান দিয়েছে পুরুষ, কিন্তু তাকে মেনে নিতে বাধ্য করেছে বশ্যতা।

বাইবেলে ঋতুকে দেখা হয়েছে ভয়ের চোখে এবং ঋতুমতী নারীদের নির্দেশ করা হয়েছে নিষিদ্ধ ও দূষিত প্রাণীরূপে। বাইবেলে বলা হয়েছে, "যে স্ত্রী রজঃস্বলা হয়, তাহার শরীরস্থ রক্ত ক্ষরিলে সাত দিবস তাহার অশৌচ থাকিবে এবং যে কেহ তাহাকে

www.pathagar.com

স্পর্শ করে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকিবে" এবং অশৌচকালে যে পুরুষ তাহার সহিত শয়ন করে ও তাহার রজঃ তাহার গাত্রে লাগে, সে সাত দিবস অশুচি থাকিবে" [লেবীয় পুস্তক ঃ ১৫]।

খ্রীস্টধর্মে নারী

নারীর সাথে খ্রীস্ট ধর্মের আচরণ আরো নিন্দনীয়। এই অবলা নারী জাতিকে খ্রীস্ট

সতিত্ব রক্ষাকারী কমরবন্দ এমন একটি কষ্টদায়ক জিনিস যার সম্পর্কে রসিক লোকেরা অনেক মজার কথা বলেছে। ডিইরের একটা ছবি এঁকেছে যাতে দেখানো হয়েছে, এক স্ত্রী তাঁর স্বামীর কাছ থেকে টাকা চুরি করে সতিত্ব রক্ষাকারী কমরবন্দ খোলার জন্য আরও একটা চাবি কিনে।

www.pathagar.com

ধর্ম যতদূরে নিচে নিক্ষেপ করা সম্ভব ছিল তা করেছে। নারী সম্পর্কে খ্রীস্ট ধর্মের অনুভূতি তারতুলীনের নিম্ন বর্ণিত বক্তব্য দ্বারা অনুমান করা যায়।

"হে নারীকুল, তোমরা জানো না যে, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন হাওয়া। তোমাদের জন্য আল্লাহর যে ফতোয়া ছিল তা যদি এখনো বর্তমান থাকে তাহলে উক্ত অপরাধ প্রবণতাও তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছে। তোমরা তো শয়তানের দরজা। তোমরাই অতি সহজে খোদার প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ পুরুষদের ধ্বংস করেছো।"

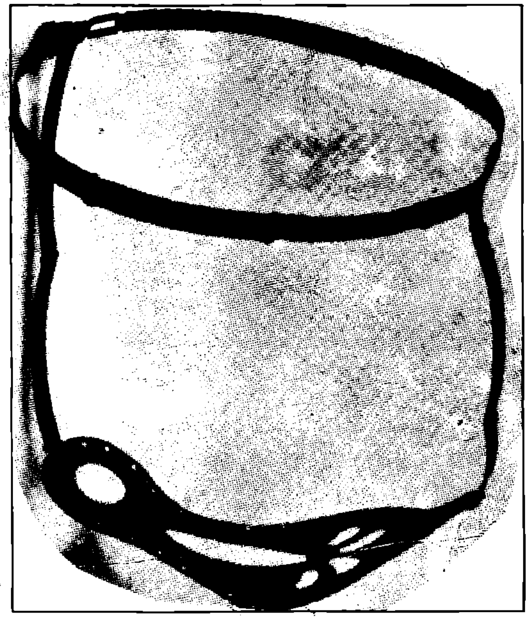

সতিত্ব রক্ষাকারী কমরবন্দ যা পুরুষেরা নারীদের পরতে বাধ্য করতো

খ্রীস্টান ধর্মে যৌনতাকে ভয়ের চোখে দেখা হয়, কারণ তারা নারীকে দেখে দানবীরূপে। ঐ ধর্মে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া হয়েছে দেহ থেকে আত্মাকে; এবং শরীরকে করে তোলা হয়েছে আত্মার শত্রু। ঐ বিশ্বাসে শরীরের সাথে সমস্ত সম্পর্কই পাপ ও অশুভ। খ্রীস্টানের কাছে দেহ আর মাংস

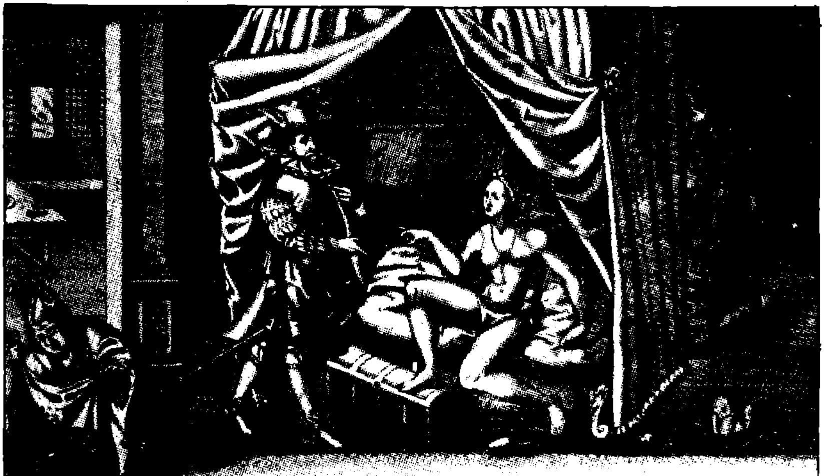

স্বামীর কাছে আসল চাবি আছে কিন্তু খাটের আড়ালে এক ভৃত্য সেই স্ত্রীর প্রেমিকের কাছে তালার নকল চাবি বিক্রি করছে।

www.pathagar.com

জাওকিমের সুন্দরী স্ত্রী সুজানা দুই প্রবীণ ব্যক্তির সাঙ্গে। এই প্রবীণদ্বয় তাকে ভোগ করার চেষ্টা করে বিফল হওয়ার পর সুজানার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনে. সে ব্যাভিচারিণী এবং এই অপরাধে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

www.pathagar.com

পাপ; তবে পুরুষের দেহ পাপ নয়; নারীর দেহই পাপ। খ্রীস্টানের চোখে নারীর শরীর প্রলোভনের সোনার কলস, তার দেহ শয়তান। নারীই পাপের পথে নিয়ে গেছে আদমকে; তাই খ্রীস্টান সাহিত্য নারী ঘৃণায় ও তিরস্কারে মুখর। তারতুলিয়ানের চোখে নারী 'পয়ঃপ্রণালীর ওপর নির্মিত প্রাসাদ'। অগাস্টিন বলেছেন, 'আমাদের জন্ম হয়েছে মলমূত্র থেকে' [দ্রঃ দ্য বোভোয়ার (১৯৪৯, ২১৯-২২০)]।

খৃস্ট সমাজেও নারীর মর্যাদাকে যথেষ্ট খাটো করে দেখা হয়েছে। স্বয়ং যীশুখ্রীস্ট কোন নারীর পাণি গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকা এবং তাদের ঘৃণার চোখে দেখার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। খৃস্টান জগতের বিশিষ্ট ধর্মযাজক সেন্ট বটুলিয়ানের মতে, "নারী হলো শয়তানের দোসর, নিষিদ্ধ বৃক্ষের প্রতি আহবানকারী খোদাই বিধানের প্রথম লংঘনকারিণী এবং পুরুষের সর্বনাশকারিণী।" এ ছাড়া নারীদের আদৌ কোন আত্মা আছে কিনা এই বিষয়ে সন্দিহান ছিল ইউরোপীয়ানদেরই, এমনকি তারা নারীদের শাস্তিদানের জন্য ইংল্যান্ডে একটি পার্লামেন্ট গঠন করেছিল।

খৃস্টলোকে আচরিত বাধ্যতামূলক কৌমার্য ও বৈরাগ্য নারীর স্বাভাবিক চাহিদা ও সম্মানের পরিপন্থী। সেন্ট পল বলতেন, "নারী নীরব থাকুক। আমি তাকে কথা বলতে দিতে পারি না। কেননা সে পক্ষধর ভুজঙ্গের বিদ্বেষ বাহিনী"। অন্য এক বিখ্যাত সন্তর কথা ছিল, "নারী এক বিষধর সর্প বিশেষ"। এন্টনীর মতে, "নারী যুগপৎ খল, ভীমরুল ও অজগরের ভীষণতার সংমিশ্রণ।" আর জেরেমী বলতেন, "নারী শয়তানের সদর দরজা, কুকর্মের পথ এবং বৃশ্চিকের দংশন।" প্রাণী জগতের মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক, এটাই ছিলো প্রাচীন খৃস্টান পাদ্রীর মত। বিবাহ-উত্তর যৌনতার কেলেঙ্কারি বহু বিখ্যাত নামের মধ্যে সম্রাট দ্বিতীয় হেনরী, রাজা এডওয়ার্ড ও স্পেনের রাজা দ্বিতীয় আল ফঁসোর নামকেও জড়িত করেছে। খৃস্টলোকে নারীর প্রতি আচরণ বাস্তবতা বিবর্জিত। বাইবেল মতে, যীশু বলেন, "কেহ ব্যাভিচার ব্যতিরেকে স্ত্রী ত্যাগ করে দারান্তর গ্রহণ করলে সে হবে ব্যাভিচারী এবং যে ঐ বর্জিতা রমণীকে বিবাহ করবে সেও ব্যাভিচারী।"

খৃষ্ট জগতে সেন্ট বার্নার্ড, সেন্ট সিপ্রিল, সেন্ট গ্রেগরী, সেন্ট জিরাম প্রভৃতি মধ্যযুগীয় মনীষীদের এক বিশেষ স্থান আছে। তাঁদের বাণী ঈসায়ীরা বিশেষভাবে পালন করে থাকে।

এই মনীষীরা নারী চরিত্রের যে লজ্জাকর ছবি এঁকেছেন, তা নিতান্তই দুঃখজনক। তাঁরা একই মর্মে লিখেছেন, 'নারী শয়তানের শক্তি, অজগর সাপের মতো রক্তপিপাসু, তার মধ্যে সাপের বিষয় নিহিত আছে, সমস্ত নৈতিক ত্রুটির মূল উৎস, শয়তানের বাদ্যযন্ত্র, দংশনোন্মুখ বিচ্ছু এবং প্রকৃতপক্ষেই আমাদের মনের ওপর শয়তানের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নারী শয়তানের সাহায্যকারিণী।" উক্ত ধর্ম যাযকরা অন্যত্র লিখেছেন, "তোদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা প্রবৃত্তি সব সময়ই পুরুষদের অধীনে থাকবে এবং পুরুষরাই তোদের ওপর প্রভুত্ব করবে।" মাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তুমি কে? আমার কাছে তোমার প্রয়োজন কি? সেন্ট সামুয়েল যখন একথা বলে গৃহত্যাগ করলেন তখন তার বাবা ছেলের বিরহ সহ্য করতে না পেরে প্রাণত্যাগ করলেন। অবশ্য তার মা

www.pathagar.com

১৪শ' শতাব্দীর ইটালির চরিত্র

তখনও জীবিত ছিলেন। দীর্ঘ সাতাশ বছর পর যখন মা ছেলের খোঁজ পেলেন তখন বনে প্রবেশ করে সেন্ট সামূয়েলকে ডাকলেন, কিন্তু সেন্ট কোন উত্তর করলেন না। মা যখন খোশামদ ও বিরহ কান্নায় ফেটে পড়লেন, তখন সেন্ট বলে পাঠালেন, তুমি ওখানে অপেক্ষা করো, আমি আসছি। বেচারী বৃদ্ধা মা ছেলের কথায় ছেলেকে দেখার আশায় সেখানে অপেক্ষা করতে করতে তিনদিন পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, কিন্তু ছেলের সাক্ষাৎ পেলেন না।

সিলভিয়া নামে আর একজন খৃষ্টান সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি বন-জঙ্গলেই বৃদ্ধ হন। ভক্তরা তাঁকে শহরে থাকার অনুরোধ করলে তিনি এমন শহরের কথা বললেন, যেখানে কোন সময় ঘটনাক্রমেও নারীর সাক্ষাৎ হবে না, এমন শহর পাওয়া যায়নি বলে তিনিও আর জঙ্গল থেকে শহরে আসলেন না। জনৈক খৃষ্টান সন্ন্যাসী তাঁর মাকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, পথে নদী পড়বে বলে সন্ন্যাসী নিজের হাত ও সর্ব শরীর কাপড় দিয়ে জড়াতে শুরু করলেন, মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেটা ও কি করছো?' সন্ন্যাসী উত্তরে বললেন, মা আপনাকে কাঁধে করে পার করতে হবে। হঠাৎ যদি আপনার শরীরের কোন

www.pathagar.com

জায়গা স্পর্শ হয়ে যায় তাহলে এতো দিনের ইবাদত বন্দেগী সব বরবাদ হয়ে যাবে! খৃষ্ট ধর্মে এ ধরনের ঘটনা একটা দুটো নয়, বহু ঘটনা আছে। মা নারী বলে তাঁর সঙ্গে যদি খৃষ্টান ধর্মযাজকের এই ব্যবহার হয় তাহলে স্ত্রীর সাথে কি ব্যবহার হবে এ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শত শত বছর ধরে নারী জাতিসত্ত্বার কোন সন্ধান পাওয়া গেলো না। পশু-পক্ষী পর্যন্ত তাদের আপন নীড়ে আরামে ঘুমোতে পারতো, অথচ বেচারী নারীর কপালে কোন রকম সুখ ছিলো না। স্ত্রীর কোন রকম ভুল-ত্রুটি হলে পর ঈসায়ী বিচারে এর কোন ক্ষমা নেই। তওবা ইস্তেগফার তাকে পাক করতে পারে না। প্রসূতি আইন অত্যন্ত কঠিন। সন্তান প্রসবের পর এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত নারীকে অস্পৃশ্য অপবিত্র বলে ধরা হতো। কন্যা সন্তান প্রসব করলে এই নির্দিষ্ট সময়টি দ্বিগুণে পরিণত হতো।

গ্রেট পোলো খৃষ্টানদের একজন পুণ্যবান নেতা বলে খ্যাত হন। তিনি বলেছেন, "পুরুষ নারীর জন্য সৃষ্টি হয়নি, বরং নারীই পুরুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।" হিন্দু ধর্মের মতো ঈসায়ী ধর্মেও তালাক প্রথা অনুমোদিত নয়। একবার বিয়ে হলে শত অসুবিধা থাকলেও এই বন্ধন ছাড়ানো যাবে না। না পুরুষ দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে, না স্ত্রী স্বামী

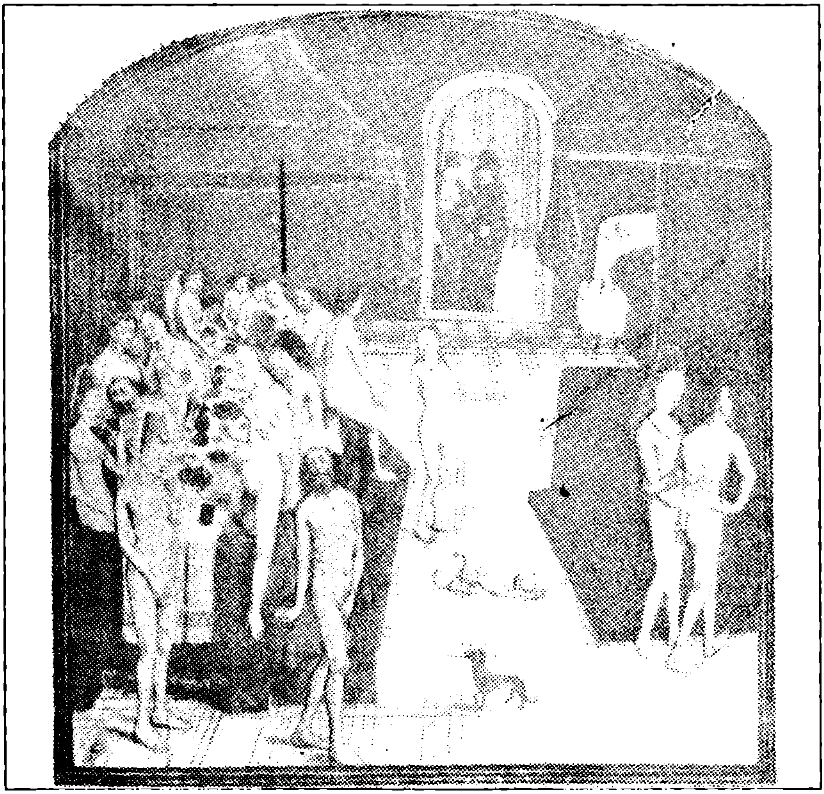

প্রাচীন রোম সভ্যতা ধ্বংসের কিঞ্চিৎ আলামত

www.pathagar.com

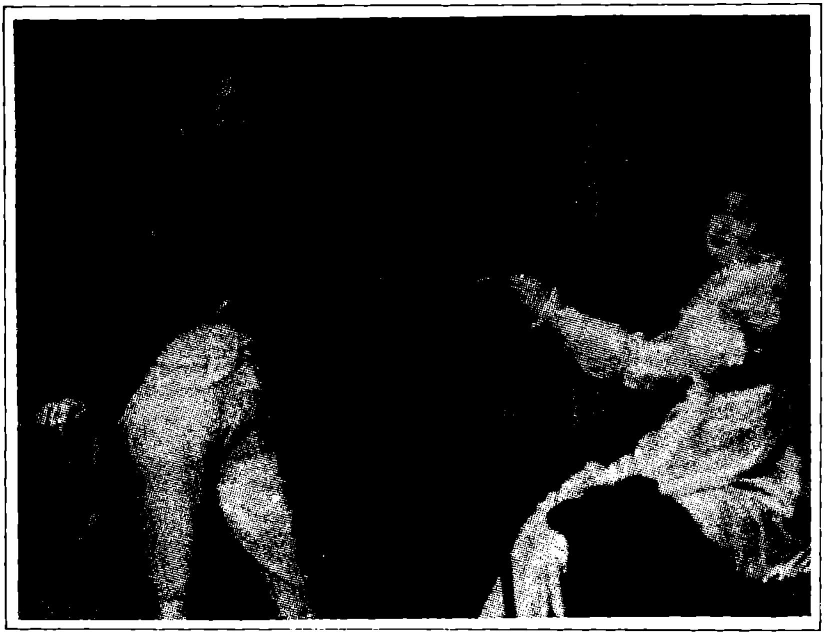

নেপোলিয়নের ছবি আঁকছেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মেরী লুইস। নেপোলিয়ন তাঁর প্রথমা স্ত্রী জোসেফাইনকে এ কারণে তালাক দিয়েছিলেন : সে ব্যভিচারিণী।

রাণী কেরোলাইন-এর বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার এক দৃশ্য। এই মামলায় রাজা চতুর্থ জর্জ রাণীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেন : রাণী ব্যভিচারিণী। কিন্তু মামলা খারিজ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। ঈসায়ী ধর্মে তালাকের ব্যবস্থা না থাকায় সম্পর্ক খারাপ হলে স্বামী স্ত্রীর 'বদকারী' করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না।

খ্রীস্টানদের চোখে নারীর শরীর এতোই পাপীয়সী যে, তারা যীশুকে জন্ম দিয়েছে কুমারীর গর্ভ থেকে। ঐ ধর্মের অনেক সন্তের মতে মেরী নারীদের মতো স্বাভাবিক রীতিতে জন্ম দেয়নি যীশুকে। অ্যামব্রোস, অগাস্টিনের মতে মেরীর রুদ্ধ দেহ থেকেই জন্ম হয়েছিল জেসাসের। খ্রীস্টানদের কাছে নারীর দেহ কলঙ্ক। তাই তারা মেরীর দেহ থেকে নিঃশেষে বের করে দিয়েছে কামকে; তাকে পরিণত করেছে এক কামশূন্য বিদেহী নারীতে। খ্রীস্টানেরা তাই দানবীকে রূপান্তরিত করেছে দেবীতে; তারা পাপী প্রলোভনকারিণী হাওয়াকে ধুয়ে-মুছে তৈরী করেছে পাপহর মেরীকে। নারীকে তারা করে তুলেছে গৃহগির্জার থাম। এ প্রক্রিয়ায় নারীর শরীর থেকে ছেঁকে ফেলে দেয়া হয়েছে কাম।

'ইংরেজী সাধারণ আইন' ও 'রোমান আইন'-এর শক্তি বাইবেল। রোমান আইনের পরে নামকরণ করা হয় 'কোড নেপোলিয়ান' বা 'নেপোলিয়নীবিধি'। এই দু'টি বিধিই নারীর জন্যে নৃশংস। খৃস্টান সন্তদের চোখে একমাত্র মেরী ছাড়া আর সব নারীই পাপিষ্ঠা। তাই তারা নারীদের জন্যে যে সব বিধি রচনা করেছেন, সেগুলো পাপিষ্ঠদের জন্যে রচিত বিধি। খৃস্টান সন্তদের কাছে নারী হচ্ছে, 'শয়তানের খেলার মাঠ'; 'বিষ্টার ছালা'। লুথার বলেছেন, 'নারী কখনো নিজের প্রভু নয়, ঈশ্বর তার দেহ তৈরী করেছে পুরুষের জন্যে। সন্তান ধারণ, লালনের জন্যে, নারীকে সন্তান বিয়োতে বিয়োতে মরতে দাও, এ জন্যেই তাদের তৈরী করা হয়েছে' [দ্রঃ মাইলস (১৯৮৮, ৭৬, ৮০)]। ইংরেজী সাধারণ আইন, রোমান আইনে নারী পুরুষের সম্পূর্ণ অধীন। ইংরেজী সাধারণ আইনে

এই ছবিটি ১৮৬৪ সালে আঁকা। এর শিরোনাম দেয়া হয়েছে সেন্ট জেমস। এতে এক অভিজাত বাড়ীতে অসভ্যতার লক্ষণাদি ফুটে উঠেছে

www.pathagar.com

স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণে থাকতে হলে পালন করতে হয় কতকগুলো শর্ত [কোভেরচার], যেগুলোর কাজ হচ্ছে নারীকে অস্তিত্বহীন করা। এ শর্তের উৎস বাইবেল-এর একটি অনুশাসন ঃ 'মনুষ্য আপন পিতা-মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, তাহারা একাঙ্গ হইবে' [আদি পুস্তক ২ঃ২৪]। শুনতে সুখকর শোনালেও আইনে এর তাৎপর্য হচ্ছে স্ত্রীর, 'ব্যবহারিক মৃত্যু'। আইনের ভাষায় এ অনুশাসন বোঝায় স্বামী-স্ত্রী এক ব্যক্তি; অর্থাৎ স্ত্রীর কোনো ভিন্ন সত্তা নেই। ধর্মের এক কথায় স্বামীর শরীরে বিলীন হয়ে গেছে স্ত্রীর অস্তিত্ব। বিচারক ব্ল্যাকস্টোন এর আইনগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ 'আইনে' বিয়ের ফলে, স্বামী ও স্ত্রী অভিন্ন ব্যক্তি; অর্থাৎ বিবাহিত অবস্থায় নারীর সত্তা বা

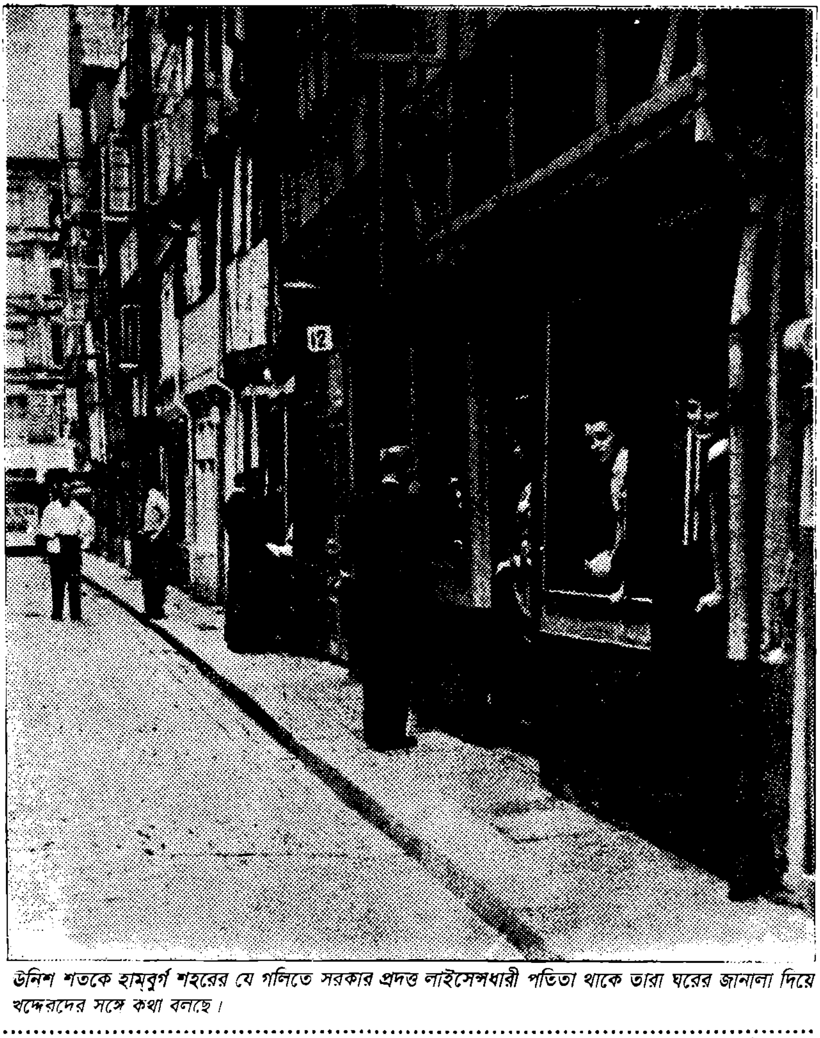

উনিশ শতকে হামবুর্গ শহরের যে গলিতে সরকার প্রদত্ত লাইসেন্সধারী পতিতা থাকে তারা ঘরের জানালা দিয়ে খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলছে।

www.pathagar.com

আইনগত অস্তিত্ব বাতিল বা অন্তত নারীর অস্তিত্ব স্বামীর অস্তিত্বে গৃহীত ও সংহত' [দ্রঃ মিলেট (১৯৬৯, ৬৯)]। স্বামী-স্ত্রীর এক দেহে বিলীন হওয়া কাম ও কাব্যিকভাবে চমৎকার, কিন্তু আইনের দিক থেকে ভয়াবহ। এতে স্বামী অর্থাৎ পুরুষের শরীর বা অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, বিলুপ্ত হয় নারীর শরীর ও অস্তিত্ব। স্বামী হয় প্রভু, স্ত্রী ভূমিদাসী। বিয়ের অনুষ্ঠানেই বধূটিকে দীক্ষা দেয়া হয় সন্ত পলের অনুশাসনে ঃ 'ঈশ্বরের প্রতি সে যেমন অনুগত থাকবে, তেমনি অনুগত থাকবে স্বামীর প্রতি।'

ইংরেজী সাধারণ আইনে স্ত্রীকে ফেলা হয় শিশু, নির্বোধ ও বদ্ধ পাগলের দলে। যে অক্ষম নিজের দায়িত্ব নিতে; যার নেই কোন বিবেচনা শক্তি। অস্তিত্বলোপের অর্থ খুবই ভীতিকর; এতে স্বামীকে দেয়া হয় স্ত্রীর শরীরের সম্পূর্ণ মালিকানা, স্বামী ঐ সম্পত্তি ভোগ করতে পারে যথেচ্ছভাবে। বেকন এই মালিকানার ব্যাখ্যা করেছেন এভাবেঃ 'স্বামী পিটাতে পারে স্ত্রীকে, তবে খুব ভয়ঙ্কর বা নিষ্ঠুরভাবে নয়। দরকার মনে করলে স্বামী স্ত্রীকে আটকে রাখতে পারে, তবে সে স্ত্রীকে কারারুদ্ধ করে রাখতে পারে না' [দ্রঃ বাঙ্ক (১৯৭৪, ১৭১)]। অস্তিত্ব লীনের মানে হচ্ছে স্বামী বা কারো বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়ার কোনো অধিকার নারীর নেই; সে কারো সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদনের অধিকারী নয়; ঋণ আদায়ের জন্যে সে মামলা করতে পারে না; কারো বিরুদ্ধে সে পারে না মানহানির অভিযোগ আনতে এবং তার বিরুদ্ধেও পারে না কেউ। অর্থাৎ বিয়েতে বাতিল হয়ে যায় তার নাগরিক অধিকার, আইনের চোখে সে নিরস্তিত্ব। তার হাত-পা বাঁধা; তার অস্তিত্ব নেই, গৃহ নেই, সহায় নেই, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নেই। সে নিজেই তো নেই; বিয়ে হচ্ছে নারীর অস্তিত্বহীনতা– কিছুদিন আগেও ইংরেজী সাধারণ আইনে বিয়ে ছিলো এতই মধুর(!) ও মর্মান্তিক। বিয়েতে নারীর অস্তিত্ব লীনের ব্যাপারটি মোটেই আধ্যাত্মিক নয়, সম্পূর্ণ বৈষয়িক; ঐ আইনে বিয়ের পর নারীর নিজের অধিকারে কিছুই থাকে না। সে নিজের মালিক নয়, সে নিজের আঁকাবাঁকা দেহখানির মালিক নয়, সে মালিক নয় কিছুরই। যে কোন কিছুর মালিক হতে পারে না, তার আবার কিসের অস্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য?

স্বামী-স্ত্রীর একাঙ্গ হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে বিয়ের পর স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তির এমনকি তার নিজের মালিক হয় স্বামী। এর বিনিময়ে স্বামী তার রক্ষণাবেক্ষণ করে, তার ভরণ-পোষণ করে। বিয়ের সময় নারীর যা কিছু স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি থাকে, তা হয়ে ওঠে স্বামীর সম্পত্তি, আর স্ত্রী হয় স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি! এমনকি বিয়ের পরও সে যা কিছুর মালিক হয়, তাও তার থাকে না, অবলীলায় হয়ে ওঠে স্বামীর। স্বামীর এ অধিকার শুধু বিবাহিত কালের নয়; ১৮৫৭-এর আগে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরও স্বামী ভোগ করতো স্ত্রীর ওপর এ অধিকার। ১৮৩৭-এর আগে সন্তানের ওপরও নারীর ছিলো না অধিকার, সব অধিকার ছিলো স্বামীর। পিতৃতান্ত্রিক রীতিতে আইন মাকে স্বীকারই করতো না; স্বীকার করতো শুধু পিতাকে। পিতার জীবনকালে মায়ের কোনো অধিকার ছিলো না; তার প্রাপ্য ছিলো শুধু 'সম্মান', আর তখন একেই মনে করা হতো নারীর গৌরব। পিতা সন্তানদের শাস্তি দিতে পারতো, মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারতো, মাকে নিষিদ্ধ করে দিতে পারতো এবং সন্তানদের নিজের রক্ষিতার কাছে রাখতে পারতো। কুমারী অবস্থায় নারীর বেশ কিছু অধিকার ছিলো, কিন্তু একাঙ্গ হওয়ার পর সে হারায় সবকিছু। ইংরেজী

www.pathagar.com

সাধারণ আইন ছিলো বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিধি; তাই এ আইন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে। এ আইন কোনো কোনো দেশে নারীকে প্রথাগত নিষ্ঠুরতর আইনের কবল থেকে কিছুটা উদ্ধার করে, যেমন ভারতে। আবার কোনো কোনো দেশে এ আইন নারীর বহুদিনের অধিকার হরণ করে, যেমন ব্রহ্মদেশে (অধুনা বার্মা বা মায়ানমার)। ব্রহ্মদেশে স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের প্রতি পালন করতে হতো পাঁচটি আনুগত্য; কিন্তু ইংরেজী সাধারণ আইনে স্বামীর আনুগত্য লোপ করে স্ত্রীকে করা হয় স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি ও দাসী।

রোমান আইনে ইংরেজী সাধারণ আইন অপেক্ষা পিতৃতান্ত্রিক হিংস্রতা আরো প্রচন্ড।

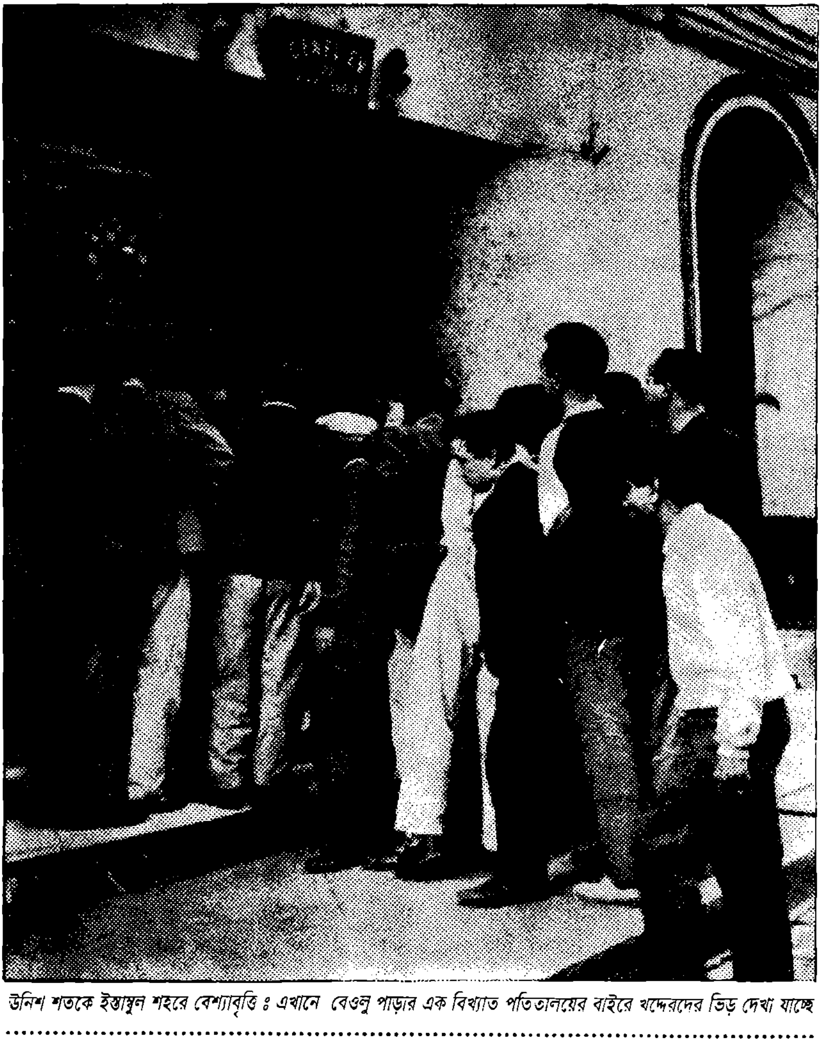

উনিশ শতকে ইস্তাম্বুল শহরে বেশ্যাবৃত্তি ঃ এখানে বেওলু পাড়ার এক বিখ্যাত পতিতালয়ের বাইরে খদ্দেরদের ভিড় দেখা যাচ্ছে

www.pathagar.com

ইংরেজী আইনে অবিবাহিত নারীদের কিছু অধিকার আছে, কিন্তু রোমান আইনে কোনো অধিকার নেই অবিবাহিতাদেরও। তাদের চিরকাল বাস করতে হয় পুরুষ অভিভাবকের অধীনে। রোমান আইন কোনো অবস্থায়ই নারীকে স্বাধীনতার যোগ্য মনে করে না। নেপোলিয়ন রোমান আইনকে মান ও বিধিবদ্ধ করে গ্রহণ করে তার সাম্রাজ্যের আইন রূপে। এর নতুন নাম হয় নেপোলিয়নী বিধি [কোড নেপোলিয়ন])। একনায়কের বিধিবদ্ধ আইনে চরমভাবে প্রকাশ পায় একনায়কের স্বৈরাচার। নেপোলিয়নের কাছে নারী এমন একটি রাজ্য, যাকে শুধু জয় করলেই চলবে না, তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত পর্যুদস্ত পদদলিত করতে হবে। তার বিধি নারীকে তাই করে; এ বিধিতে নারী হয়ে ওঠে সবচেয়ে লন্ডভণ্ড রাজ্য। নারী সম্পর্কে তার ধারণা খৃস্টান সন্তদেরই মতো। নেপোলিয়ন বলেছেন, 'প্রকৃতি চেয়েছে যে নারী হবে আমাদের দাসী। তারা আমাদের সম্পত্তি, আমরা তাদের সম্পত্তি নই। ফলবান গাছের মালিক যেমন মালী, আমরাও তেমনি তাদের মালিক। নারীর সমানাধিকার দাবী নিছক পাগলামো! নারী সন্তান উৎপাদনের কল ছাড়া আর কিছু নয়' [দ্রঃ নিউল্যান্ড (১৯৭৯, ১৩)]। নেপোলিয়নী বিধি পশ্চিম ইউরোপে ও ফরাসী উপনিবেশে চাপিয়ে দেয়া হয় এবং হঠাৎ অনেক দেশে নারী নিজেকে দেখতে পায় গৃহদাসী রূপে। এ আইনেও নারী শিশু আর নির্বোধদের শ্রেণীভুক্ত; তাই তারা কোন চুক্তি করতে পারে না, স্বামীর স্বাক্ষর ছাড়া স্বাধীনভাবে আইনসম্মত লেনদেন করতে পারে না, বাকিতে কিছু কিনতে পারে না, ব্যাংকে একটি হিসেবও খুলতে পারে না। এ আইনে স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির এবং জীবনের পরিচালক। স্ত্রী যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চায় বা চাকুরী করতে চায়, তাহলেও স্বামীর অনুমতি নিতে হয়। এ আইনে স্বামীর প্রতি আনুগত্য শুধু সামাজিক বা ধর্মীয় নয়, তা আইনগত।

ইহুদী ধর্মে নারী

হাওয়া বা ইভের ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছে আদি বাইবেলেরও আগে, ইহুদীদের প্রাচীন পুরাণে। ইহুদীদের প্রাচীন পুরাণ অনুসারে বিধাতা আদমের জন্যে একটি 'সুন্দর, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, পতিপরায়ণা, সতিসাধ্বী ভার্যা সৃষ্টির জন্যে তিন তিনবার উদ্যোগ নেয় এবং প্রতিবারই কোন না কোন বিপত্তি ঘটে। আদমের প্রথম ভার্যার নাম লিলিথ, এমন এক করালী নারী যার ওপর আরোহণের সাধ্য নেই কোন পুরুষের। আদমের সাথে তার একেবারেই মিল হয়নি, কেননা লিলিথ সঙ্গমের সময় আদমের সাথে শুতে রাজী হয়নি। তার যুক্তি ছিলো, সে ও আদম দু'জনেই ধুলোয় তৈরী; তাই সমান; সুতরাং সে কেন আদমের নিচে শোবে? উত্তেজিত আদম তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে সে মন্ত্র উচ্চারণ করে হাওয়ায় মিশে যায়। এরপর বিধাতা আদমের দ্বিতীয় ভার্যা (প্রথম হাওয়া) তৈরী করা শুরু করে। কিন্তু আকস্মিকভাবে আদম ঐ সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখে ফেলে এবং সৃষ্টির দৃশ্য দেখে প্রচন্ড ঘৃণা বোধ করে। এতে 'বিধাতা প্রথম হাওয়াকে নিরুদ্দেশ করে ফেলে এবং আদমের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করে দ্বিতীয় হাওয়াকে, যে এখন বিখ্যাত।

ইহুদী ধর্মমতে পুরুষ সৎ স্বভাব বিশিষ্ট ও সৎ কর্মশীল এবং নারী বদস্বভাব বিশিষ্ট ও

www.pathagar.com

ভন্ড। মানব জাতির প্রথম সদস্য হযরত আদম (আঃ) জান্নাতে মহাসুখে জীবন কাটাচ্ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা। কিন্তু তার স্ত্রী হাওয়া তাকে সর্বপ্রথম আল্লাহর অবাধ্য হতে প্ররোচিত করে এবং তাকে এমন একটি ফল খাওয়ায় যা খেতে আল্লাহ তাকে নিষেধ করেছিলেন। ফল স্বরূপ তিনি আল্লাহর সব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলেন এবং তার ভাগ্যলিপিতে কায়ক্লেসের জীবন লিপিবদ্ধ হলো।

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে লিপিবদ্ধ আছে যে, আল্লাহতায়ালা হযরত আদম (আঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "যে বৃক্ষের ফল ভোজন করতে তোমাকে নিষেধ করেছিলাম, তুমি কি তার ফল ভোজন করেছ?" তাতে আদম বললেন, "তুমি আমার সঙ্গিনী করে যে স্ত্রী দিয়েছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়েছিল, তাই খেয়েছি।" (আদি পুস্তক, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক ১১)। এরপর আল্লাহতায়ালা বললেন, "আমি

লুকরেটিয়া বরগিয়া নিজের বাবার সামনে অদ্ভুত পোশাকে নৃত্য করছে

www.pathagar.com

তোমার গর্ভ বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করবে এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে; ও সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে।" (আদি পুস্তক, অধ্যায়-৩, শ্লোক-১৬)।

অন্য কথায় হাওয়া আদম (আঃ)কে পথভ্রষ্ট করে যে অপরাধ করেছিল আল্লাহর তরফ থেকে তার সেই অপরাধের শাস্তি হলো সন্তান প্রসবকালীন কষ্ট এবং তার ওপর পুরুষের স্থায়ী কর্তৃত্ব। পুরুষ কিয়ামত পর্যন্ত এ কর্তৃত্ব চালাতে থাকবে।

ইহুদীরা ভোরবেলা প্রার্থনা করে, "বিধাতাকে ধন্যবাদ, যেহেতু তিনি আমাকে নারী করেননি"; আর একই সময় তাদের নারীরা কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলে, "বিধাতাকে ধন্যবাদ, যিনি আমাকে তার নিজের ইচ্ছানুসারে সৃষ্টি করেছেন।"

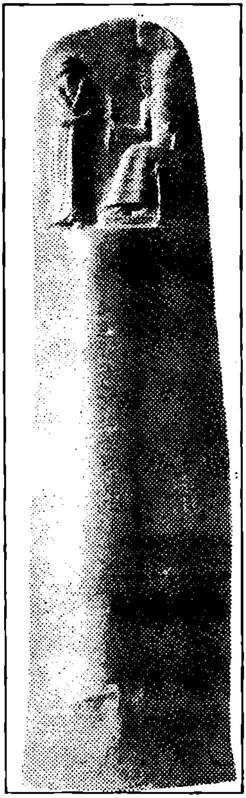

এক তখ্তির উপর হাসু-রাব্বির নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ আছে। ব্যাবিলনের সমাজের জন্য কাম, ভালোবাসা ও বিয়ে-শাদীর যাবতীয় নিয়মাবলী হাসু-রাব্বি প্রণয়ন করে দিয়েছিলো

ইহুদী ধর্মে পিতা পেয়ে থাকে পুরোহিতের অধিকার। ইহুদী ধর্মে নারীদেরকে পদে পদে বাধা দান করা হয়েছে। ইহুদী পাদ্রীদের মতে সতী নারীর চেয়ে পাপীষ্ট পুরুষও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। নারীকে সমস্ত পাপের মূল কারণ বলে ইহুদীরা মনে করতেন। তাই তারা নারীকে সেবিকার মান দিতো। নিজ কন্যাকে বিক্রয় করতে পারতো। বাইবেলের সারাহ্ তার স্বামীকে যতই 'প্রভু' (মালিক) সম্বোধন করুক না কেন নারী নাম ইহুদীদের কাছে গৃহপালিতের দলভুক্তই ছিলো। এমনকি ইহুদী আইন অনুসারে পুরুষ উত্তরাধিকারীর বর্তমানে নারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। অনুরূপভাবে নারীর দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকারও ছিলো না। ইহুদী ধর্মে ব্যাভিচারকারী ও ধর্ষিতার দন্ড ছিলো প্রস্তারাঘাতে মৃত্যু। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, উপাসনা গৃহে ধর্ষণ করলে অভিযুক্তরা খালাস পেয়ে যেতো। কোন তরুণ-তরুণীর বিয়ে অনুষ্ঠানের প্রথম যামিনীতে স্ত্রী স্বামীর শয্যা সঙ্গিনী হবার পরিবর্তে ইয়াহুদী গোত্রপতিদের বাসর শয্যায় যৌন মিলনের পর পরবর্তী পর্যায়ে স্বামীর অংকশায়িনী হবার সুযোগ পেতো। বিধবাকে বাধ্যতামূলকভাবে নিকটাত্মীয়ের শয্যা সঙ্গী করা হতো। এ ধর্মে পুত্র না থাকলেই শুধু কন্যা সম্পত্তির অংশ পেতো, নতুবা নয়। এ ধর্মে পিতাই কন্যার বিবাহ্ ঠিক করতেন এবং কন্যা পণও পিতা গ্রহণ করতেন। নারীদের এ ব্যাপারে কোন স্বাধীনতা ছিল না। কন্যার প্রথম বিবাহ বলবৎ থাকা সত্ত্বেও পিতা পুনরায় বিবাহ দিতে পারতেন। বহু বিবাহ ইহুদী ধর্মে স্বাভাবিক ব্যাপার। তারা ইচ্ছে মতো যত খুশী বিয়ে করতে এবং রক্ষিতা রাখতে পারে। তাদের মতে, "মেয়েদের গুণের চেয়ে পুরুষদের দোষও ভাল।" মেয়েদের তালাকের জন্য

www.pathagar.com

সতীত্বহীনতার অপবাদই যথেষ্ট ছিল। পিতা-মাতা কন্যার সতীত্বের নিদর্শন দেখিয়ে সন্তুষ্ট করতে না পারলে তার প্রাণদন্ড দেয়ারও বিধান ছিল।

ঊনিশ শতকে চীনের এক পতিতা

পারসিক ধর্মে নারী (অগ্নিপূজক)

কথিত আছে যে, ইরানের অগ্নি পূজকদের ধর্মীয় নেতা ছিলো যরোয়েষ্টি। তার ধর্মেও নারী জাতি সম্পর্কে লজ্জাস্কর বিধান দেখতে পাওয়া যায়। যরোয়েষ্টি বলতেন, "সন্তানবিহীন নারী পুলসিরাত পার হতে বা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। কাজেই বেহেশতের অভিলাষিণী নারী যেনো অন্ততঃপক্ষে অপর কারো সন্তান পালন করে হলেও মাতৃপদ লাভ করে।" এই ধর্মে ঋতুমতী নারীর প্রতি যুলুমের শেষ ছিলো না। যরোয়েষ্টির হুকুম ছিলো, "কোন পুষ্পবতী নারী যেন সূর্য না দেখে, কোন পুরুষের সঙ্গে কথা না বলে। আগুনের দিকে দৃষ্টি না দেয়, পানিতে অবতরণ না করে, অন্য কোন পুষ্পিতা নারীর সঙ্গে একত্রে শয়ন না করে, খাদ্য স্পর্শ না করে, কোন পাত্র ধরতে হলে হাত যেন কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নেয়। কোন ঋতুমতী নারী এর বিপরীত করলে তার জন্য বেহেশত হারাম।"

প্রসূতি ঘরের নিয়মও অনুরূপ কঠোর ছিলো। প্রসবের পর চল্লিশ দিনের মধ্যে কোন প্রসূতি নারী মাটি বা কাঠের পাত্র স্পর্শ করার অনুমতিও পেতো না। ঐ সময়ের মধ্যে কোন প্রসূতি ঘরের বারান্দায় পা দিতে পারতো না। ঋতুকাল একটি পাপকাল বলে বিবেচিত হতো, এমন কি ঐ সময়ের পাপ থেকে তওবা করার জন্য বছরে একটি মাস নির্ধারিত ছিলো। সেখানকার দুর্ভাগা নারী জাতি নিজের জীবনকে বোঝা বলে মনে করতো। নারী ছিলো স্বামীর দাসীস্বরূপ, আল্লাহর ইবাদত থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে স্বামীর দাসত্বে নিয়োজিত করা হতো।

যরোয়েষ্টির ধর্ম প্রাচীন ধর্ম। হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের পঁচিশ বছর আগের যুগটি যরোয়েষ্টির যুগ। তবে এই ধর্মে বিভিন্ন রকমের যৌন উন্মাদনা থাকায় কায়খসরু, গস্টাসপ ও কায়কোবাদের মতো প্রতাপশালী রাজারাও এই ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলো যার ফলে তাদের প্রভাব ও প্রচারণায় এই ধর্ম দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। এই ধর্মের

www.pathagar.com

অন্য নাম ছিলো মজুসিয়াত। সম্রাট পারভেজও মজুসী ছিলো। একই সময় সে বার হাজার স্ত্রীর স্বামী ছিলো। এই বার হাজার স্ত্রীর মধ্যে একশ'র অধিক ছিলো তার মা, খালা, ফুফু, বোন ইত্যাদি নিকট আত্মীয়স্বজন। পারভেজ এই বার হাজার স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট ছিলো না। যখন তার ইচ্ছা হতো বিশ পঞ্চাশ জনকে তালাক দিতো অথবা হত্যা করতো, আবার পছন্দমতো স্ত্রী সংগ্রহ করে নিতো, এমনকি সে তার বিবিদেরকে বিক্রি করতে বা অন্য কারো অঙ্কশায়িতা করতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করতো না। সে সময় নারী জাতি পণ্য দ্রব্য হিসেবে সাধারণভাবেই বেচা-কেনা হতো। ধর্মের নামে দোহাই চলতো, নিজেকে পবিত্রসত্তা বলে আখ্যা দেয়া হতো। অথচ সতীন পুত্রের সাথে সৎ মায়ের সঙ্গম করাও চলতো। এতে কোন লাজ-লজ্জার বালাই ছিলো না। এভাবে মা-বোন বা মেয়ের পার্থক্য উঠিয়ে দেয়ার ফলে মজুসী ধর্ম বহু দূর দেশেও পরিচিতি লাভ করেছিলো। এই ধর্মেই সংস্কারক হিসেবে তথাকথিত দার্শনিক মযুক এসে আরো বহু বিধি-বিধানের পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নতুন ধর্মের সৃষ্টি করে যার অনুসারী হয়েছিলো শাহ কাবাদ-এর মতো প্রতাপশালী রাজাও। মযুকের মতে, ধন ও নারী সকল অন্যায়ের মূল, তাই সে ধন ও নারীকে স্বাধীন করে দিলো অর্থাৎ ধন ও নারী কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হয়ে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হলো। মযুকের এই নীতি শাহ কাবাদের প্রচারণায় রাজ্যের সর্বত্র প্রতিপালিত হতে শুরু করলো। এক ব্যক্তির ধন সমস্ত দেশবাসীর ধনে এবং এক ব্যক্তির স্ত্রী সমস্ত দেশবাসীর স্ত্রীতে পরিণত

ইসলাম-পূর্বে আরবদের অবস্থা ঃ আলিফ লায়লার সহস্র রজনী থেকে নেয়া দৃশ্য। এই বিখ্যাত গ্রন্থে ইসলাম-পূর্ব আরবে নারীদের অবস্থা কিছুটা নির্দিষ্ট হয়েছে।

www.pathagar.com

হলো।

এই বিশৃঙ্খলতার যুগে নিজের ধন বা নিজের স্ত্রীকে অপরের উপভোগ থেকে নিষেধ করার মতো সাহস কারো ছিলো না। প্রত্যেক মানুষের যে কোন নারী বা কারো স্ত্রীর সাথেই মেলামেশা করার অধিকার ছিলো, এমন কি শাহ্ কাবাদ এই মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তার শাহী মহলের পাহারা ও বিধি-নিষেধ উঠিয়ে দিয়েছিলো। শহরের জনসাধারণ নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে বেগম মহলে প্রবেশ করে শাহজাদী ও বেগমদেরকে ভোগ করে মযুকী মতবাদকে কার্যত রূপ প্রদান করতো। সকল মানুষই একে অপরের ঘরে প্রবেশ করে 'সমবায় কার্যক্রম'-এর রূপদান করতো।

নওশেরোয়াঁর পিতা শাহ্ কাবাদের স্ত্রী কথ্য কথায় পাটরাণী বা মহারাণী বলে আখ্যায়িত হতো বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাজার হাজার পুরুষ তাকে ভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলো। ছেলে নওশেরোয়াঁ বড় হয়ে বাবার এই লজ্জাকর ঘৃণিত কাজের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠলেন, তিনি তাঁর মাকে নিয়ে বলখের দিকে পলায়ন করলেন এবং সেখান থেকে এক সৈন্য বাহিনী সংগ্রহ করে পিতা শাহ্ কাবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেন এবং এই যুদ্ধে নওশেরোয়াঁরের জয় হলো।

বৌদ্ধ ধর্মে নারী

অহিংস ধর্ম বলে কথিত বৌদ্ধ ধর্মেও নারীর তেমন কোন মর্যাদা দেখা যায় না। এ ধর্মে মনে করা হয় যে, নারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীর নির্বাণের কোন পন্থা নেই। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেও নারীর অধিকার অত্যন্ত সীমিত রাখা হয়েছে। বৌদ্ধরা কন্যার পদ যুগল ধুলি স্পর্শে মলিন হয়ে যাবে বলে তারা পদগ্রন্থি বেঁধে রাখতো। পিতা অবলীলায় সন্তান বিক্রি করে দিতে পারতেন। বৌদ্ধ ধর্মে নারীদের কোন স্বাধীন স্বত্তা ছিলো না। ছিলো না কোন অধিকার। হিন্দু ধর্মের ন্যায় তারাও নারীদেরকে 'অলুক্ষণে' মনে করতো। চীন বা জাপানী বৌদ্ধ সমাজে মন্দিরে নারীর প্রবেশাধিকার ছিলো না। বৌদ্ধরা নিজে নারী ও সংসার সান্নিধ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। সংসার বিরাগীচিত্তে নারীর মর্যাদা কতটুকু তা বলাই বাহুল্য।

বৌদ্ধরা নিজে নারী ও সংসার সান্নিধ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করলেও অবৈধভাবে কামভোগে লিপ্ত হতেন। বৌদ্ধ সংঘ, মন্দিরের অধ্যক্ষ ও শ্রমন ভিক্ষুদল 'পালে পালে দেবদাসী নিয়ে দিবারাত্র ইন্দ্রীয় চর্চায় মগ্ন থাকতেন। ভিক্ষার ছলে শ্রমন-শ্রমিনিরা লোকালয় থেকে অনতিদূরে গিয়ে কামভোগে লিপ্ত হতেন। এই ইন্দ্রিয়াতিশয্যই বৌদ্ধ শান্তিবাদীদের বিনাশকে ত্বরান্বিত করে।

গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে একজন বড় সংস্কারকের খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। তিনি শুধু সংস্কার ও মুক্তির আবেগেই রাজসিংহাসন পর্যন্ত তুচ্ছ বলে জেনে ছিলেন। তিনি যখন ধর্মীয় নেতারূপে প্রকাশিত হলেন, তখন তাঁর মধ্যে দয়া-দাক্ষিণ্যের এক আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো। তাঁর ধর্ম মতে হিন্দু ধর্মের মতো ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ধনী-দরিদ্র বা বড়-ছোটর কোন প্রভেদ ছিলো না। বংশ ও জাতির কোন বালাই তিনি মানতেন না। এই ছিলো তাঁর বৌদ্ধ সাম্যের শিক্ষা। অপরদিকে দয়া ও সহৃদয়তার উদাহরণ এই

www.pathagar.com

ছিলো যে, পশু-পক্ষীর প্রতিও কোন নির্দয় ব্যবহার করা তাঁর নীতিবিরুদ্ধ ছিলো। বৌদ্ধ ধর্মে পশু-পাখি মারা ও খাওয়া নিষিদ্ধ

দয়া ও সাম্যের মূর্ত প্রতীক অথচ এই বুদ্ধ নারী জাতির জন্য কিছু করে যাননি বা কিছু করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। একদিন বুদ্ধের এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নারী জাতির সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে?" বুদ্ধ উত্তর করলেন, "নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া ও মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী।" এভাবে অন্য এক সময়ও তিনি বলেছেন, "নারীদের সাথে কোনরূপ মেলামেশা বা অনুরাগ রেখো না। তাদের সাথে কথাবার্তাও বলবে না, পুরুষের পক্ষে নারী ভয়ঙ্কর বিপদস্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গী দ্বারা পুরুষের বিশ্বাস ধন লুট করে নেয়; নারী একটি সশরীরী ছলনা মাত্র। নারী থেকে বাঁচার চেষ্টা করো।" গৌতম বুদ্ধের শিক্ষার সারমর্ম এই যে, নারীর সঙ্গে বসবাসকারী পুরুষ পরকালের মুক্তি হতে বঞ্চিত থাকবে। যে ধর্ম বলে, "নারীর সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা বাঘের মুখে চলে যাওয়া কিংবা জল্লাদের ছুরির নিচে মাথা পেতে দেয়া উত্তম", সেই ধর্ম কখনো নারীকে শান্তি ও মর্যাদা দান করতে পারে না। গৌতমের দৃষ্টিতে নারীরা পুরুষের মোক্ষ লাভের অন্তরায়, তাদের সাহচর্যে থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভবপর নয়। এইজন্যেই গৌতম বিয়ে প্রথার বিরোধী থেকে লোকদেরকে সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসব্রতের দিকে আহবান করেছিলেন।

হিন্দু ধর্মে নারী

ভারতের হিন্দু ধর্মে নারীদের অবস্থান ছিলো অত্যন্ত করুণ। ভারতবর্ষকে একটি ধর্মভিত্তিক দেশ মনে করা হয়। এর কারণ এ দেশটি অন্যান্য যে কোন দিকের চেয়ে ধর্মীয় দিকটি সব সময় বেশি প্রভাব বিস্তার করে আছে। এই হিন্দু ধর্মীয় প্রভাবের কারণে এখানে নারী দাসত্ব ও পরাধীনতার জীবন থেকে হিন্দু নারীরা কখনো মুক্তি পায়নি। ভারতবর্ষের আইন রচয়িতা মনু নারী সম্পর্কে 'মনু স্মৃতির অধ্যায়ে' বলেছেন ঃ

> "শৈশবে নারী তার পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনে স্বামীর অধীনে থাকবে এবং বিধবা হওয়ার পরে থাকবে পুত্রের অধীনে, কোন সময়ই সে স্বাধীন থাকবে না।" (মনু স্মৃতি ৫, ১৪৫)।
>
> "নারী অপ্রাপ্ত বয়স্কা, প্রাপ্ত বয়স্কা বা বৃদ্ধা যাই হোক না কেন.... স্বাধীন যেন না হয়।" (মনু স্মৃতি ঃ ৫, ১৪৫)।
>
> "কোরবানী এবং ব্রত পালন করা নারীর জন্য পাপ। তার উচিত শুধু স্বামীর সেবা করা। স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় স্বামী গ্রহণের বিষয় মুখে আনাও নারীর উচিত নয়। বরং স্বল্পাহারী হয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দেয়া উচিত। (অধ্যায় ৫, ১৫৫-১৫৭)।

প্রাচীন হিন্দু আইনে বলা হয়েছে- "রোগ, মহামারী, মৃত্যু, নরক, অগ্নি, বিষ ইত্যাদি নারী অপেক্ষা উত্তম।"

জনৈকা ব্রাহ্মণ যিনি মনুজী মহারাজের অনুস্মৃতিতে বাচালতা থেকে মুক্ত করেছিলেন

www.pathagar.com

বিখ্যাত খুজোরাহো মন্দির (ভারত): অনেক মূর্তি আছে যাতে নর ও নারী আলিঙ্গনরত

www.pathagar.com

এবং যার শিক্ষা দীর্ঘদিন যাবত রাষ্ট্র শাসনের মূলনীতি হিসাবে কার্যকর ছিল, তিনি নারী জাতি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন ঃ

"নদী, সশস্ত্র সৈনিক, শিং ও নখর বিশিষ্ট জন্তু শাসক এবং নারীকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।" (চানক্য নীতি ঃ ১-১৫)

মিথ্যা কথা বলা, অগ্র-পশ্চাত না ভেবে কাজ করা, ধোকাবাজি, আহম্মকী, লোভ, অপবিত্রতা, নিষ্ঠুরতা নারীর স্বভাবজাত দোষ।" (অধ্যায়-২)

রাজপুত্রদের কাছ থেকে নৈতিক শুচিতা, বিদ্বানদের কাছ থেকে মিষ্টভাষণ, জুয়াড়ীদের কাছ থেকে মিথ্যা বলা এবং নারীদের কাছ থেকে প্রতারণা শেখা উচিত। মিথ্যা বলা নারীর আপন বৈশিষ্ট বলেও প্রাচীন সমাজে কথিত ছিল।

ভারতীয় ত্রিকাল-দর্শীরা নারীর দানবীরূপ আঁকায় ও ছন্দোবদ্ধ ধিক্কার রচনায় পরিচয়

আলিঙ্গনরত নর-নারীর মূর্তি

www.pathagar.com

দিয়েছেন লোকোত্তর প্রতিভার। ঐ ঋষিরা লকলকে কামুক ও নারী বিদ্বেষী। নারী দেখলেই লক্ষ বছরের ধ্যানকে আবর্জনার মতো ছুঁড়ে ফেলে তাঁরা অসুস্থের মতো উত্তেজিত হন, প্রকাশ্যে বা কুয়াশা ছড়িয়ে ধর্ষণ-রমণ করেন, যোনি না পেলে যেখানে সেখানে বীর্যপাত করে শান্তি পান এবং রচনা করেন শ্লোকের পর শ্লোক নারী নিন্দা। তাঁদের শ্রেষ্ঠ ধ্যান হচ্ছে কামধ্যান আর তারা প্রায় সবাই ছিলেন অকালস্খলন গ্রস্ত, যার পরিচয় পাওয়া যায় তাদের সামান্য উত্তেজনায় রতিস্খলনের মধ্যে। তাদের চোখে নারী কামদানবী। নারী নিন্দায় বৌদ্ধ-হিন্দু সবাই সমান। জাতক, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎ সাগর, রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, মনুসংহিতা ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ভরে আছে নারীর দানবীরূপে ও নারী বিদ্বেষে; মুক্তকণ্ঠ ঋষিদের রচিত অশ্লীল উপাখ্যান ও শ্লোকে। জাতকের গল্পে ফিরে ফিরে আসে কামচন্ডালী নারীরা, যারা কাম ছাড়া কোন নীতি জানে না। জাতকের একটি গল্পে আছে নারীরা বুড়ি জরতী হয়ে গেলেও থেকে যায় কামদাসী দানবী। বোধিসত্ত্বের মায়ের বয়স একশ' বিশ, যাকে বোধিসত্ত্ব নিজে সেবাযত্ন করে। ঐ মাও কামার্ত হয়ে ওঠে এক যুবকের জন্যে এবং উদ্যত হয় নিজের পুত্রকে হত্যা করতে। আরেকটি গল্পে রাজা শত্রু দমনের জন্যে রাজধানী ছেড়ে দূরে যায় এবং যাওয়ার পথে পথে এক এক করে বত্রিশজন দূত পাঠায় রাণীর কুশল জানার জন্যে। রাণী বত্রিশজনের সাথেই লিপ্ত হয় কামে। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাজা রাণীর কুশল জানার জন্যে পাঠায় আবার বত্রিশজন দূত; রাণী তাদের সাথেও কামে জড়িত হয়। এমনই দানবিক কামক্ষুধা নারীদের! নারীদের ক্ষুধার নানা উপাখ্যান রয়েছে পঞ্চতন্ত্র ও কথাসরিৎসাগর-এ। আর্য ঋষিদের চোখে নারী হচ্ছে সমস্ত অশুভ ও দোষের সমষ্টি। নারীকে দেখেছেন তারা একটি বিশাল অতৃপ্ত যোনিরূপে ঃ নারী হচ্ছে আপাদমস্তক যোনি, যে কাম ছাড়া আর কোনো সুখ বা নীতি জানে না। মনু [মনুসংহিতা ৯ ঃ ১৪, দ্রঃ মুরারিমোহন (১৯৮৫)] বলেছেন ঃ

> নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতি।
> সুরূপং বা বিরূপং বা পুমানিত্যের ভুঞ্জতে।

অর্থাৎ তারা রূপ বিচার করে না, বয়সও বিচার করে না; সুরূপ বা কুরূপ যাই হোক, পুরুষ পেলেই তারা সম্ভোগের জন্যে অধীর হয়ে ওঠে।

পরের শ্লোকেই [৯ঃ১৫] মনু বলেছেন ঃ

> পুরুষ দেখামাত্রই তারা ভোগে মেতে ওঠে বলে তারা চঞ্চলচিত্ত ও স্নেহশূন্য; তাই সুরক্ষিত রাখা হলেও তারা স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

মহাভারত-এ [অনুশাসন পর্ব ঃ ৩৮] বলা হয়েছে, নারী জন্মদুশ্চরিত্র ঃ 'নারীরা শুধু পরপুরুষের অভাব ও পরিজনের ভয়ে ভর্তার বশীভূত হয়ে থাকে।' তার কামক্ষুধার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় আর সব কিছু। মহাভারতের [অনুশাসন পর্ব ঃ ১৯] ঋষি বলেছেন ঃ

> স্ত্রীলোক স্বভাবতই রতিপ্রিয়। পুরুষ সংসর্গ তাদের যেমন প্রীতিকর, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও তাদের কাছে ততো প্রীতিকর নয়। সমস্ত স্ত্রীলোকের মাঝে পতিব্রতা চোখে পড়ে মাত্র এক-আধটি। যখন তাদের কামপ্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ হয়, তখন তারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কর্তা, পুত্র ও দেবরের কিছুমাত্র অপেক্ষা

www.pathagar.com

করে না। নিজের অভিলাষ পূর্ণ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে।

বলা হয়েছে, 'তারা অনায়াসে লজ্জা ছেড়ে পরপুরুষের সাথে সংসর্গ করে। পুরুষ পরস্ত্রী সম্ভোগে অভিলাষী হয়ে তার কাছে গিয়ে অল্প চাটুবাক্য প্রয়োগ করলেই সে তখনি তার প্রতি অনুরক্ত হয়' [অনুশাসন পর্ব ঃ ৩৮]।

দেবী ভাগবত-এ বলা হয়েছে ঃ

> স্ত্রীজাতি স্বভাবত নিরন্তর অভিলাষিণী-কামচারিণী, কামের আধার স্বরূপা ও মনোহারিণী হয়ে থাকে। তারা অন্তরের কামলালসা ছলক্রমে গোপন করে। নারী প্রকাশ্যে অতি লজ্জাশীলা কিন্তু গোপনে কাউকে পেলে যেনো তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। রমণী কোপশীলা, কলহের অঙ্কুর ও মৈথুনাভাবে সর্বদা মানিনী, বহু সম্ভোগে ভীতা ও অল্প সম্ভোগে অত্যন্ত দুঃখিতা হয়। স্ত্রী জাতি সুমিষ্টান্ন ও সুশীতল জলের চেয়েও সুন্দর সুরসিক গুণবান ও মনোহর যুবাপুরুষকে সর্বদা মনে মনে কামনা করে। তারা রতিদাতা পুরুষকে নিজের পুত্রের থেকেও বেশি স্নেহ করে এবং সম্ভোগপারদর্শী পুরুষই তাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম।

এসব শ্লোক থেকে ধারণা করা যায় হিন্দু মুনি-ঋষিরা নারীকে কি ভয়াবহ কামদানবীরূপে দেখতেন ও কতোটা অবিশ্বাস করতেন। তাই ঋষি গুরুরা কোথাও গেলে উদ্বিগ্ন থাকতেন ভার্যাদের রন্ধ্র সম্পর্কে, প্রহরী হিসেবে রেখে যেতেন শিষ্যদের; আবার শিষ্যদের সম্পর্কেও নিশ্চিতবোধ করতেন না। তাই বিধান দেয়া হয়েছে যে, পঞ্চমহাপাতকের একটি হচ্ছে গুরুপত্নীতে উপগমন।

ঋষি [দেবী ভাগবত, ৯ঃ১] আরো বলেছেন ঃ

> কামিনিগণ জলৌকার মতো সতত পুরুষের রক্ত পান করে থাকে, মূর্খেরা তা বুঝতে পারে না; কেননা তারা নারীদের হাবে ভাবে মোহিত হয়ে পড়ে। পুরুষ যাকে কান্তা মনে করে, সে কান্তা সুখসম্ভোগ দিয়ে বীর্য এবং কুটিল প্রেমালাপে মন ও ধন সবই হরণ করে। তাই নারীর মতো চোর আর কে আছে? রমণীরা সুখের নয়, তারা শুধু দুঃখেরই কারণ।

আরেকজন ঋষি বলেছেন, 'রমণীরা যে পর্যন্ত কোনো নির্জন স্থান না পায় এবং কোনো পুরুষের সাথে বিশেষ আলাপ করতে না পারে, সে পর্যন্ত স্ত্রীলোকের সতীত্ব থাকে' [শিব পূরাণ, ধর্মসংহিতা ঃ ৪]।

ঋষিরা পরিমাপও করেছেন দানবীর দুঃশীলতা; নির্দেশ করেছেন দুঃশীলতার ওজন। ঋষিদের পরিমাপে নারী [মহাভারত, অনুশাসন পর্ব ঃ ৩৮] ঃ

> তুলাদন্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপরদিকে স্ত্রীজাতিকে সংস্থাপন করলে স্ত্রীজাতি কখনোই ভয়ানকত্বে ওগুলোর থেকে ন্যূন হবে না। বিধাতা যখন সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হয়ে মহাভূত সমুদয় ও স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করেন, সে সময়ই স্ত্রীদের দোষের সৃষ্টি করেছেন।

www.pathagar.com

হিন্দু ঋষিরা নারীর একবার ওজন করেননি, করেছেন বারবার, দেখেছেন পরিমাপে তারা নির্ভুল ঃ 'ইহলোকে স্ত্রীলোকের থেকে পাপশীল পদার্থ আর কিছু নেই। প্রজ্বলিত অগ্নি, ময়দানবের মায়া, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও মৃত্যু এর সবগুলোর সাথে তাদের তুলনা করা যায়' [মহাভারত, অনুশাসন পর্ব ঃ ৪০]।

ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমাঃ পুমান।
তস্মাদ্‌ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকস্থানে চ ধারয়েৎ।।
যথৈব মত্ত মাতঙ্গ সৃণিমুদগর যোগতঃ।
স্ববশং কুরুতে যন্তা তথা স্ত্রীণাং প্ররক্ষকঃ।।

ভারতের খুজারাও মন্দিরে রতিক্রিয়ারত নর-নারীর মূর্তি

www.pathagar.com

অর্থাৎ

নারী ঘৃতকুম্ভসম, পুরুষ তপ্ত অঙ্গার সমান;
তাই ঘৃত ও অগ্নিকে এক স্থানে রাখা উচিত নয়।
মাহুত যেমন মুগুর দিয়ে মত্ত হস্তীকে বশ করে,
তেমনি বশ করতে হবে নারীকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এ আছে 'দুনির্বার্যশ্চ সর্বেষাং স্ত্রীস্বভাবশ্চ চাপলঃ' অর্থাৎ 'স্ত্রীস্বভাব এতো চঞ্চল যে, কারো পক্ষে সহজে নিবারণ করা অসম্ভব'। এ পুরাণ প্রণেতা আরো বলেছেন, নারী মোক্ষদ্বারের কবাট, হরিভক্তির বিরোধী। সংসারবন্ধন স্তম্ভের রজ্জু, যা ছিন্ন করা যায় না। নারী বৈরাগ্যনাশের বীজ, সর্বদা অনুরাগবর্ধনকারিণী, সাহসের ভিত্তি ও দোষের গৃহ। নারী অবিশ্বাসের ক্ষেত্র, মূর্তিমতী কপটতা, অহংকারের আশ্রয়, নারীর মুখে মধু ও অন্তরে বিষ।' পঞ্চতন্ত্র-এ বিষ্ণুশর্মা হিতোপদেশ দিয়েছেন; 'নারীর মুখে মধু ও অন্তরে শুধুই বিষ; তাই এদের মুখ পান করবে কিন্তু হৃদয় মুষ্টাঘাতে আহত করবে।' এমন দানবী কি ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন? এক ঋষি প্রশ্ন করেছেন ঃ 'বিষ ও অমৃতযুক্ত স্ত্রীরূপ যন্ত্র ধর্মনাশের জন্যে কার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে?' আরেক ঋষি বিধান দিয়েছেন, 'নার্য শ্মশানঘটিকা ইব বর্জনীয়াঃ' অর্থাৎ 'নারী শ্মশানের ঘটিকার মতো বর্জনীয়।'

হিন্দু পুরাণে চণ্ডী বা দুর্গা মহাশক্তি, কিন্তু তার শক্তিও তার নিজের নয়; পুরুষ দেবতাদের কৃপায় সে শক্তিময়ী। পুরাণে বলা হয়েছে, 'শিবের তেজে দেবীর মুখ, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণুর তেজে বাহুসমূহ, চন্দ্রের তেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জংঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল। ... মহাদেব দিলেন শূল, কৃষ্ণ দিলেন চক্র, শঙ্খ দিলেন বরুণ, অগ্নি দিলেন শক্তি.... ।' [দ্রঃ হংসনারায়ণ (১৯৮০, ১৭৫)]। অর্থাৎ পুরুষ দেবতাদের শক্তির সংকলন হচ্ছে দেবী দুর্গা, যার নিজস্ব অস্তিত্বই নেই।

মনু সংহিতায় মনু বলেছেন, 'নারী জাতি ক্ষেত্রস্বরূপ এবং পুরুষ বীজস্বরূপ; ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগেই সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হয়ে থাকে' [৯ঃ৩৩]। তিনি আরো বলেছেন, 'ঠিক সময়ে কর্ষিত ক্ষেত্রে যেমন বীজ বপন করা হয়, ক্ষেত্রে সে বীজগুণসম্পন্ন অঙ্কুরই উদ্‌গত হয়ে থাকে' [৯ঃ৩৬)।

হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দু ঋষিরা রটিয়েছেন নারীরা কামচণ্ডালী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (২৩ঃ৩২) বলেছে, 'পুরুষের থেকে নারীদের কাম আটগুণ'। সাধু-সন্তরা বলেছেন, জরায়ুর ক্ষুধা আগুনের মতোই অশেষ। নারীদের কামপ্রবণতা সম্পর্কে উপাখ্যানের শেষ নেই। মহাভারত-এ একটি উপাখ্যান রয়েছে, যাতে বলা হয়েছে পুরুষদের থেকে নারীরাই সঙ্গম উপভোগ করে বেশি। রাজর্ষি ভঙ্গাসন ইন্দ্রের ক্রোধে নারীতে পরিণত হয় এবং এক তাপসের ঔরশে নিজের গর্ভে একশত পুত্র জন্ম দেয়। পরে ইন্দ্র তাকে পুরুষত্ব ও নারীত্বের মধ্যে একটি বেছে নিতে বললে সে নারীই থাকতে চায়। কারণ হিসেবে সে বলে, 'স্ত্রী পুরুষের সংযোগকালে স্ত্রীরই অধিক সুখ হয়।'

প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সমাজে পুরুষ বিয়ে করতো বহু, তার ওপরে ছিলো বিচিত্র ধরনের বেশ্যা, যাদের শ্রেষ্ঠ ছিলো 'গণিকা'। বাৎস্যায়ন লিখেছেন ঃ 'চৌষট্টি কলায়

www.pathagar.com

উৎকর্ষ লাভ করে শীল, রূপ ও গুণান্বিতা বেশ্যা 'গণিকা' সংজ্ঞা লাভ করে এবং গুণগ্রাহীদের সমাজে স্থান লাভ করে। রাজা সর্বদা তাকে সম্মান করেন, গুণবানেরা তার স্তুতি করেন এবং সে সকলের প্রার্থনীয়া, অভিগম্যা ও লক্ষ্মীভূতা হয়ে থাকে' [কামসূত্র ঃ দ্রঃ মহেশচন্দ্র (১৯৮০)]।

যে সমস্ত বিধি দিয়ে কয়েক হাজার বছর ধরে হিন্দুনারীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তার অধিকাংশই প্রথাগত, ঐ সমাজে ঋষির পর ঋষি জন্ম নিয়েছে, ব্রহ্মার সাথে আলাপ করে এসে তারা বিধান লিখেছে এবং সবাই মিলে নারীকে করে তুলেছে পুরুষের শিকার। হিন্দু বিধানগুলো নারী পীড়নের স্বর্গীয় অনুমতিপত্র। হিন্দু আইনের প্রধান উৎস বেদ; হিন্দুরা যেমন পুরুষের তৈরী সমস্ত কিছুকেই ব্রহ্মার মুখনিসৃত বলে প্রচার করেছে,

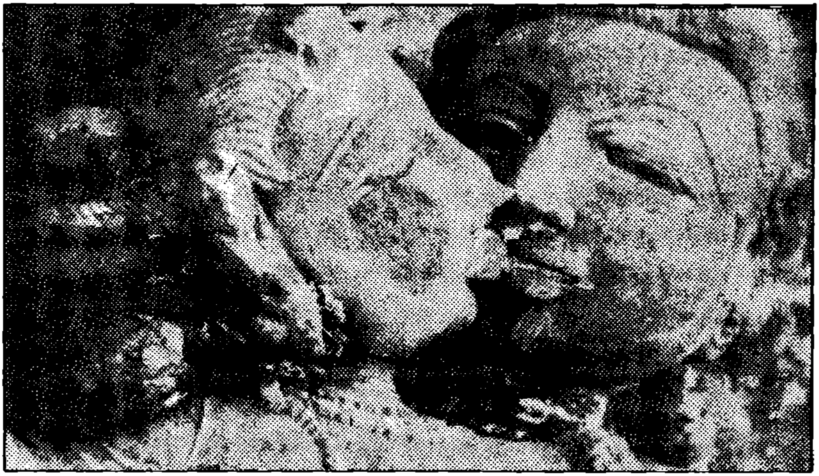

খুজারাও মন্দির গাত্রে রতিক্রিয়ারত নর ও নারীর মূর্তি

www.pathagar.com

তেমনি আইনকেও করে তুলেছে ঐশ্বরিক, চিরন্তন, শাশ্বত, অবিনাশী। হিন্দু আইনের প্রথম ও প্রধান প্রণেতা মনু। মনু দাবী করেছেন যে, ব্রহ্মা প্রথম আইন প্রণয়ন করে তাঁকে শেখায় এবং তিনি সে আইন শেখান মরীচি ও অন্য ন'জন ঋষিকে [দ্রঃ মনুসংহিতা, ১ঃ৫৮]। বেদ, শ্রুতি, ভাষ্য, প্রথার সমষ্টি হচ্ছে হিন্দু আইন। হিন্দু আইনে নারীর কোনো মূল্য নেই, নারী অস্থাবর সম্পত্তি মাত্র; নারী কোনো সম্পত্তির মালিক হতে পারে না, পারে না সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে। মনু বলেছেন [৯ঃ১২], 'নদী যেমন সমুদ্র মিলনে লবণাক্ত হয়, নারীও তেমন; যেমন পুরুষের সাথে বিবাহিত হয় তেমন গুণযুক্ত হয়।' হিন্দু ধর্মে বিয়ে হচ্ছে নারীর অস্তিত্বলোপ। মনু [২ঃ৬৭] বিধান দিয়েছেন ঃ

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌবাসো গৃহার্থোহগ্নিপরিক্রিয়া।।

অর্থাৎ

বিয়েই নারীর বৈদিক উপনয়ন,
পতিসেবা হচ্ছে গুরুগৃহবাস এবং গৃহকর্মই,
প্রভাত ও সন্ধ্যায় হোমস্বরূপ অগ্নিপরিচর্যা।

হিন্দু নারীর অধিকার নেই কোনো কিছুতে। মন্ত্রে নেই, শিক্ষায় নেই, ধর্মে নেই। ব্রাহ্মণ বালকের জীবনে উপনয়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, উপনয়ন তার সামনে বিদ্যা ও ধর্মের পথ খুলে দেয়; কিন্তু নারীর উপনয়নের অধিকার নেই, তাই নারী বেদ পাঠ করতে পারে না, পূজোয় উৎসর্গ করতে পারে না। [দ্রঃ দ্বারকানাথ (১৯১৩, ৯৬-৯৭)]।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বর্ণিত রয়েছে যে, মনু যখন নারী সৃষ্টি করে তখন সে নারীকে পুরুষের প্রতি প্রেম, রূপ চর্চা, যৌন ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকা এবং ক্রোধের প্রবণতা দান এবং মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে নারীকে নিকৃষ্টতম ব্যবহারের উপযুক্ত বলে ঘোষণা করে। সুতরাং হিন্দু সমাজে এই ধারণা খ্যাতি অর্জন করে যে, নারী হচ্ছে নোংরামীর জড় এবং তার অস্তিত্ব হচ্ছে আগাগোড়া নরক।

"অনুগত স্ত্রী হলো সে, যে তার স্বামীর সেবা এভাবে করে যেন সে তার প্রভু। তার ব্যাপারে এমন কোন কথা না বলে যা তার জন্যে দুঃখজনক হয়– তা তার স্বামী বড় লম্পট আর বদমাইশই হোক না কেন। কেননা কেবল ঐ জন্যেই নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর যখন তার স্বামীকে ডাকবে তখন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে 'হে আমার উপাস্য' বলে ডাকবে। নারী স্বামীর সাথে খাবার গ্রহণ করবে না; বরং স্বামীর উচ্ছিষ্ট সে খাবে। মনু শাস্ত্রে আরো উল্লেখ আছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই; বরং স্বামীর সাথে সাথে তাকেও আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো। এই প্রথাকে হিন্দু ধর্মে সত্য বা সতীদাহ প্রথা বলা হয়।

হিন্দু ধর্মে 'সুন্দরী নারীদেরকে দেবতার সামনে বলি দেয়া হতো যাতে দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে বৃষ্টি বর্ষণ বা রিযিক বৃদ্ধি করে দেয়। এমনকি কোন কোন এলাকায় গাছের সামনে বলি দেয়া হতো।"

www.pathagar.com

হিন্দু শাস্ত্রকার মনুর মতে, 'নারীর অন্তর নির্মল হতে পারেনা। কারণ মন্ত্র দ্বারা তার সংস্কার সাধন সম্ভব নয় এবং বেদাদি শাস্ত্রে তার কোন অধিকার নেই।' অর্থাৎ নারীর পক্ষে বেদ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ ছিল। হিন্দু শাস্ত্রে নারীকে তার ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ করতে দেয়া হতো না। মনু বলেন, 'গর্ভধারণের জন্যই নারীর সৃষ্টি'। মনু সংহিতায় আছে, 'কাম-ক্রোধ, কুৎসিত আচার, হিংসা, কোটিল্য-এ সমস্তই নারী জাতি হতে উদ্ভব হয়ে থাকে।' হিন্দু শাস্ত্রে নারীকে এর অধিক কিছু দিতে সক্ষম হয়নি। এ ধর্মে নারী হচ্ছে 'সেবাদাসী'। স্বামী যতই অত্যাচারী, অপদার্থ ও চরিত্রহীন হোক না কেন তার নাগপাশ থেকে নারীর মুক্তির কোন বিধানই ছিলো না। সর্বাবস্থায় স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে মান্য করার বিধান

বিষ্ণু দেবতা তাঁর স্ত্রী লক্ষী। নগরজুনা কোন্দা মন্দির-এর ছবি

www.pathagar.com

ছিল।

মহাভারতের শান্তি পর্বে বলা হয়েছে ঃ স্ত্রীলোকেরা স্বাতন্ত্র শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। স্ত্রীকে বাজি রেখে জুয়া, ধার দিয়ে অর্থলাভ, অনুদান, উৎকোচ প্রদান কিংবা বিক্রি করে দেবারও অধিকার রাখতো পুরুষেরা। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় দ্রৌপদীকে বাজি রেখেছিলেন আর শ্রীরাম চন্দ্র সীতাকে সমর্পণ করেছিলেন ভরতের হাতে। অহল্যা, অরজা, মমতা বা রম্ভার ন্যায় বিখ্যাত রাজদুহিতারা ধর্ষিতা হন। সীতা হন অপহৃতা। ক্রীতদাসীর গর্ভে পরপুরুষ দিয়ে উৎপাদিত সন্তান হয়ে জন্ম নেন বিদুর, পান্ডব ও অশ্মক। পতির অনুপস্থিতিতে ঋতু রক্ষার আবদার জানান গঙ্গা, শান্তনু ও জরুৎকারীর। কর্ণকে হতে হয় কুমারীর পুত্র। গুরুস্ত্রী অহল্যার সাথে ব্যাভিচারে সংযুক্ত হন ইন্দ্র (যেমন হন সূর্যের সাথে কুন্তি)। সূর্য দেব অভিশাপের ভয় দেখিয়ে দেহদানে বাধ্য করেন কুমারী কুন্তিকে। প্রাচীন তক্ষশীলার বেশ্যাগৃহ আজিকের লাসভেগাস বা ব্যাংককের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। বেশ্যাবৃত্তি উচ্ছেদই যেখানে সুমতির দাবী; পন্ডিত কৌটিল্য তখন বেশ্যাবৃত্তি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনার পরামর্শ দেন। সমাজ দেহে ব্রোথেলের অভিশাপ সেই থেকে আজও অব্যাহত রয়েছে। রমন ও প্রজনন ছাড়া নারী জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য স্বীকার করা হয়নি।

তুলসীদাস দোঁহাবলীতেও নারী জাতিকে অবজ্ঞার সাথে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

“দিনকা মোহিনী রাতকা কামিনী,
পলক পলক লহু চোষে,
দুনিয়ার সব বউরা হোকে,
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।”

তাই অনেক হিন্দু নারীরা তাদের ধর্মীয় পুস্তকে নারী জাতির প্রতি লেখা ঘৃনা ও জুলুমের অধ্যায়গুলো পাঠ করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ১৯৩০ সালের ২২শে নভেম্বর আর্য্য গেজেটে “সমাজে নারীর স্থান” শীর্ষক প্রবন্ধে এক শিক্ষিতা হিন্দু নারী লিখেছেন ঃ “হিন্দু গ্রন্থগুলো কিভাবে নারী জাতিকে হীন, পাপমূর্তি এবং বিশ্বাসের অযোগ্য বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে তা দেখে আমি আশ্চর্যন্বিত ও দুঃখিত হই।”

ভারতের সংবিধান রচয়িতা ডঃ বি. আর. অম্বেদকার রামের চরিত্র সম্পর্কে “রাম চরিত ও কৃষ্ণলীলা” শিরোনামের একটি প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

রাম, সীতা ও লক্ষণ বনবাসে থাকাকালে একদিন লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করে বিবাহের উদ্দেশ্যে নিজের রাজপুরীতে নিয়ে গেলো। রাম ও লক্ষণ সীতার অন্বেষণে বের হলেন। পথে তাঁরা বানর বংশের প্রধান স্থানীয় দুই ব্যক্তি সুগ্রীব ও হনুমানে সাক্ষাৎ লাভ করলেন। তাঁরা এদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এদের সহায়তায় তাঁরা সীতার অবস্থিতির স্থানের সন্ধান লাভ করলেন এবং লঙ্কার পথে রওয়ানা দিলেন। যুদ্ধে রাবণকে পরাজিত করে তাঁরা সীতাকে উদ্ধার করলেন। রাম ও লক্ষণ অযোধ্যায় ফিরে গেলেন। সীতাসহ যুদ্ধশেষে রাম প্রথমে রাবণের শবদেহের অন্ত্যেস্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা অতি সুচারুরূপে করলেন। তারপর তিনি বিভীষণের রাজ্যভিষেক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অতিশয় আগ্রহ দেখালেন। অভিষেকের পর তিনি সীতার নিকট

www.pathagar.com

হনুমানকে কেবল এ সংবাদটি দেয়ার জন্য পাঠালেন যে, লক্ষণ ও সুগ্রীবসহ তিনি সুস্থ আছেন এবং তাঁরা ইতিমধ্যেই রাবণকে হত্যা করে ফেলেছেন। রাবণের ব্যাপারটি সেরে নিয়েই রামের যে কাজটি সর্বপ্রথম করা উচিত ছিলো, তা করলেন না। বরং সীতার চেয়ে বিভীষণের অভিষেকের ব্যাপারেই অধিক আগ্রহ দেখালেন। এমনকি অভিষেক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার পরও নিজে না গিয়ে হনুমানকে সীতার নিকট পাঠালেন এবং যে বাণীটি পাঠালেন তা কি ছিলো? সীতাকে সঙ্গে নিয়ে আসার কথাও তিনি হনুমানকে বলে দিলেন না। তিনি তাঁকে শুধু এ বার্তাটি পৌঁছাতে বললেন যে, তারা ভালোই

বিষ্ণু দেবতা তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীর আলিঙ্গনরত। নগরজুনা কোন্দা মন্দির-এর আরেকটি ছবি

www.pathagar.com

আছেন। (সংবাদটি পাওয়ার পর) সীতাই বরং রামকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। নিজের যে স্ত্রী সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃত হয়ে দশ মাসাধিক কাল বন্দী জীবন যাপন করলেন, রাম তাঁকে একটু দেখতেও গেলেন না।

সীতাকে লঙ্কায় দেখে তিনি যা বলেছিলেন, একজন অতি সাধারণ মানবীয় দয়াসম্পন্ন ব্যক্তিও এহেন বিপদে নিজের স্ত্রীকে তা বলতে পারে না। এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত হতো- যদি না বাল্মীকির সরাসরি বরাতে তার উল্লেখ হতো। রাম তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

আমার শত্রু ও তোমার অবরোধকারীকে পরাজিত করার পর আমি যুদ্ধের উপঢৌকন হিসেবে তোমাকে পেয়েছি। আমি নিজের মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছি এবং নিজের শত্রুকে শাস্তি দিয়েছি। জনগণ স্বচক্ষে আমার সামরিক শক্তি দেখেছে। আমি আনন্দিত যে, আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। রাবণকে হত্যা করার এবং অপমানের গ্লানিকে ধুয়ে ফেলার নিমিত্ত আমি এ কষ্টটুকু স্বীকার করিনি।

সীতার প্রতি রামের এহেন আচরণের চেয়ে অধিকতর নৃশংস আর কিছু হতে পারে কি? তিনি এখানেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তাঁকে লক্ষ্য করে আরও বললেন ঃ

"তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে। নিশ্চয়ই তুমি রাবণ কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছো। তোমাকে দেখা আমার নিকট নিদারুণ কষ্টকর মনে হচ্ছে। হে জনক-নন্দিনী! তুমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পার! তোমার ব্যাপারে আমার করার কিছুই নেই। তোমাকে পুনরুদ্ধার করেছি- এতেই আমি সন্তুষ্ট। আমি ভাবতেও পারি না যে, রাবণ তোমার মতো এক অপরূপ সুন্দরীকে উপভোগ না করে থাকবে।"

সীতা রামকে 'নীচ' ও অতি স্বাভাবিকভাবেই 'ইতর' বলে অভিহিত করলেন। অতি পরিষ্কার ভাষায় তিনি তাঁকে একথাও বললেন যে, অপহৃত হওয়ার কারণে রাম তাঁকে বর্জন করেছেন এ কথাটি হনুমানের মাধ্যমে প্রথমেই তাঁকে জানালে তিনি আত্মহত্যা করে এসব ঝামেলা থেকে তাঁকে বাঁচাতেন। তাঁর কোন ওজর বা কৈফিয়তের সুযোগ অবশিষ্ট না রাখায় সীতা নিজের সতিত্ব প্রমাণের ব্যবস্থা করলেন। তিনি আগুনের কুন্ডে প্রবেশ করে অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে আসেন। তাতে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতাগণ ঘোষণা করলেন যে, তিনি সতী-সাধ্বী। তখনই কেবল রাম তাঁকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হলেন।

তিনি অবশ্য রাজা হলেন এবং সীতাও রাণী হলেন। রাম রাজাই থেকে গেলেন; কিন্তু সীতা অচিরেই রাণীর মর্যাদা হারালেন। এই ঘটনাটিতে রামের অতি জঘন্য চরিত্রেরই প্রতিফলন ঘটেছে। বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে লিখেছেন যে, রাজা ও রাণীরূপে রাম ও সীতার অভিষেক অনুষ্ঠানের কিছুদিনের মধ্যেই সীতা অন্তঃসত্তা হলেন। খবরটি জানাজানি হওয়ায় কতিপয় দুষ্ট চরিত্রের লোক এই বলে তাঁর চরিত্রে কলংক লেপন করতে লাগলো যে, নিশ্চয়ই তিনি লঙ্কায় থাকাকালে রাবণের দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে থাকবেন। সাথে সাথে তারা এহেন কুলটা নারীকে স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে আনার জন্যে রামকেও অপবাদ দিতে লাগলো। শহরে এরূপ কানাঘুষা সম্পর্কে রামকে তাঁর দরবারের ভাঁড় ভাদ্র অবহিত করলো। স্পষ্টতঃ এ অপবাদের জন্যে রাম বিব্রত বোধ করতে

www.pathagar.com

লাগলেন। একটা অপমানবোধ তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যা খুবই অস্বাভাবিক তা হলো তাঁর গৃহীত সেই ব্যবস্থা- যা তিনি এ লজ্জাজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশে অবলম্বন করলেন। সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও দ্রুততম ব্যবস্থাটি তিনি গ্রহণ করলেন। সোজা কথায়, তিনি সীতাকে পরিত্যাগ করলেন এবং সীতাকে বনবাসে পাঠালেন। অন্তঃসত্ত্বা সীতাকে খালি হাতে গহীন অরণ্যে পাঠিয়ে দিয়ে রাম যে কর্মটি করলেন তাকে আমরা কী বলবো? এটা কি অমানবিক ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণ নয়?

এসব গুণের জন্যেই রাম দেবত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাম কি সত্যিই এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যদ্দরুন তিনি দেবত্বের অধিকারী বলে বিবেচিত হতে

শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা

www.pathagar.com

পারেন?

যারা তাঁকে ভগবান হিসেবে পূজার যোগ্য বিবেচনা করেন, তাঁরা একটিবার নিম্নে বর্ণিত তথ্যগুলো সম্পর্কে ভেবে দেখুন ঃ

রামের জন্ম একটি রহস্যপূর্ণ ব্যাপার! 'ঋষ্যশৃঙ্গের তৈরী করা পায়েস থেকে তাঁর জন্ম'– একথাটা রূপক অর্থে বলে হয়তো সেই নিরাভরণ সত্যকে আড়াল করা হয়েছে যে, কৌশল্যার সাথে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও ঐ ঋষির ঔরসই কৌশল্যার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিলো। যাইহোক, আসলেই তাঁর জন্ম যদি কলঙ্কপূর্ণ নাও হয়, তবুও তা যে অস্বাভাবিক ছিলো, তাতে তো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। রামের জন্মের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু রয়েছে যেগুলোর অপ্রীতিকর হওয়ার কথা অস্বীকার করা বেশ শক্ত! (তথ্যসূত্র ঃ নতুন সদর, আগস্ট ১৯৯৫)

এই আলোচনায় জানা গেল মুনি-ঋষিদের অতীত ইতিহাস এবং বর্তমানে তাঁদের অনুসারীদের চলমান অবস্থা। আগামীকালের রামরাজত্ব প্রশাসনের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে যদি সৃষ্টিই হয় তাহলে তা হবে সভ্যতা ও আধুনিক সংস্কৃতির পরিপন্থী।

রাধাকমল চট্টোপাধ্যায় [এম.এ., পি-এইচ.ডি আমেরিকা] "Oh you hindu awake" বইয়ে লিখেছেন [বঙ্গানুবাদ] ঃ "আমি নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ হয়েও একথা আপনাদিগকে বলিতেছি। কুচক্রীগণ হইতে সাবধান।" লেখক ব্রাহ্মণ জাতিকে 'ব্রহ্মপুত্র' উল্লেখ করে বেশ বেদনা নিয়ে ভারতের হিন্দুজাতির দুর্নাম ও কলঙ্ক মুছতে যেভাবে কলম ধরেছেন তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

তিনি লিখেছেন, "মুসলমান রাজত্বকালে ইহারাই বাদশাদিগকে সুন্দরী নারী উপহার দিয়ে খোশামোদ করিত, ইংরেজ আমলে ইংরেজদের। অথচ শূদ্র শিবাজী সাম্রাজ্য দখল

কৃষ্ণ ও রাধা অরণ্যের অভিসারে

www.pathagar.com

রাধার মন খারাপ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে মিলনরত

করিয়া যখন সিংহাসনে বসিয়াছেন এই ব্রাহ্মণগণ তখন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করে নাই। পরে মন্ত্রীরূপে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্যকে পাঁচভাগ করিয়া ধ্বংস করিয়া দেয়।" [পৃঃ ৬]

হিন্দু ধর্মে উপপত্নী রাখা ছিল নিতান্ত মামুলী ব্যাপার। একেক জনের প্রচুর উপপত্নী থাকতো। তারা মানুষের চিত্তাকর্ষণের জন্য 'নগ্নবক্ষে' নৃত্য করতো। পিতা মেয়ের সাথে, ভ্রাতা-ভগিনীর সাথে যৌন ক্রিয়া করতেও সঙ্কোচ প্রকাশ করতো না।

হিন্দু ধর্মে পুত্র না হলে 'পুৎ' নামক নরক থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। এ জন্য

মধ্য ১৮শ শতাব্দীর ছবি ঃ লাখনাউ শহরে রাজকুমার এবং এক মহিলা ধূমপান ও মদ্যপানে মত্ত

www.pathagar.com

অপুত্রক রাজারা পুত্রার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন। রাণী অশ্ব লিঙ্গ স্বীয় যোনিতে প্রবেশ করিয়ে তন্মধ্যে অশ্বের রেতঃ সেক করাতেন।

"নারীদেরকে দুঃখের হেতু" বলে হিন্দু ধর্মে মনে করা হতো। বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে ১০, কন্যা প্রসবকারিণীকে ১২ ও মৃৎ বৎসা স্ত্রীকে ১৫টি কষাঘাত এবং কোন্দল প্রিয়া স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ বর্জন করা হতো। কিন্তু স্ত্রীর স্বামী ত্যাগের কোন বিধান ছিল না।

হিন্দু ধর্মে স্বামী দুশ্চরিত্র, পরদারসক্ত বা নির্গুন হলেও সাধ্বী সর্বদা স্বামীর সেবা করবে। (৫-১৫৪) স্বামী রুষ্ট হলেও স্ত্রীলোক সর্বদা তুষ্ট থাকবে। এই হচ্ছে স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য।

হিন্দু ধর্মে "স্ত্রী প্রমোদে মত্ত, পানাসক্ত বা রোগাক্রান্ত স্বামীর সেবা না করলে স্বামী তাকে বস্ত্রালঙ্কারে বঞ্চিতা করে তিন মাসের জন্য তার সাহচর্য ত্যাগ করবেন। (৯-৭৮) স্ত্রী যার অলক্ষুণে সেই অকালে মারা যায়। তাই বিধবাদের শাস্তি স্বরূপ সহমরণ বা পূনর্বিবাহ অশাস্ত্রীয়। হয় সহমরণ হবে, না হয় পুনর্বিবাহ অশাস্ত্রীয়। (৯-৬৫)

হিন্দু সাধুরা সকলেই মনে করেন নারী নরকের দ্বার। ক্রীতদাসের ন্যায় নারী যে কোন সম্পত্তি উপার্জন করবে তা তার স্বামীর প্রাপ্য হবে। সম্পত্তির উপর নারীর স্থায়ী স্বত্ব নেই। এমনকি স্বামীর মরণান্তে স্ত্রীর বেঁচে থাকার অধিকার ছিলো না। সতীদাহ প্রথার কারণে স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় মৃত্যুসঙ্গী হওয়ার মতো পাষণ্ড সতীদাহ প্রথার প্রচলনও তাকে যুগ যুগ ধরে এক জ্বলন্ত নরকে ঠেলে দিতে বাধ্য করেছে। হিন্দু ধর্মে বিবাহের নামে যে বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন আছে তা মানবতার বিরাট অন্তরায়।

হিন্দু ধর্মে কন্যা পিতার কাছে সম্পত্তির দাবী করতে পারতো না; তবে পিতা তাকে

একজন জীবন্ত হিন্দু রমণীকে তার মৃত স্বামীর সাথে পোড়ানোর দৃশ্য

www.pathagar.com

স্বামীর কাছে বিক্রি করে ধন অর্জন করতে পারতো। কন্যা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য নয়, যদি পিতার কোনো পুত্র থাকে। আদিকালে কোনো ভাই না থাকলে বোন উত্তরাধিকারী হতে পারতো পিতার সম্পত্তির। তবে ভাইহীন নারীটি পিতার সম্পত্তি পেয়ে যে সুখের সাগরে ভাসতো, তা নয়, ঐ ধন অভিশাপ হিসেবে দেখা দিতো তার জীবনে, কেননা অধিকাংশ সময় ভাইহীন নারীর বিয়েই হতো না। অপুত্রক পিতা পুত্রের শোকে কন্যাটিকেই ঘোষণা করে যেত পুত্র হিসেবে এবং নিজের বংশ রক্ষার জন্যে এমন ব্যবস্থা করে যেত যে, ঐ মেয়েটির প্রথম পুত্র চলে আসবে মাতামহের বাড়ীতে, রক্ষা করবে তার বংশ। পুত্রও স্বর্গ হারানোর ভয়ে পুরুষেরা অমন মেয়েকে বিয়ে করতেই রাজী হতো না। তবে পুত্র থাকুক বা না থাকুক মনু, বশিষ্ঠ, গৌতম কন্যার উত্তরাধিকার একেবারেই স্বীকার করেননি। যাজ্ঞবল্ক, বৃহস্পতি, নারদ কন্যার কিছুটা উত্তরাধিকার স্বীকার করেছেন। ভাই থাকলে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকারের কথাই ওঠে না, খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে হিন্দু আইনে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোনো অধিকার নেই। পিতার বাড়ী থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নারী যায় স্বামীগৃহে এবং সেখানে সে পরিণত হয় আরেকজনের সম্পত্তিতে। স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি, তাই স্ত্রীর কোনো সম্পত্তির অধিকার নেই, সে কোনো সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। মৈত্রায়ণী সংহিতায় বিধান দেয়া হয়েছে ঃ 'সম্পত্তিতে নারীর কোনো অধিকার থাকবে না'; বলা হয়েছে ঃ 'স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোনো অধিকার থাকবে না।' হিন্দু স্ত্রীর শোচনীয় পরিণতি হচ্ছে বিধবা, যার জীবনেরই অধিকার ছিলো না, তাই তার সম্পত্তিতে অধিকারের কথা ভাবাও হাস্যকর। খৃঃপূঃ ৩০০ অব্দ থেকে কন্যা ও বিধবা পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাক্ত। বেদ আর অধিকাংশ ধর্মসূত্র বিধবার উত্তরাধিকার অস্বীকার করেছে। বৌধায়ন বিধবার উত্তরাধিকার অস্বীকার

যুবক স্বামী বিয়ের আসরে। ভারতে এই সেদিনও বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল

www.pathagar.com

করেছে, আপস্তম্ব সাত স্তরের উত্তরাধিকারী বের করেছেন, কিন্তু বিধবাকে উত্তরাধিকারী করেননি [দ্রঃ আলতেকার (১৯৫৯ ২৫০-২৭০)]। বিধবার উত্তরাধিকার হচ্ছে সহমরণ, স্বামীর চিতার আগুনে ছাই হওয়া বা দুর্গত কলঙ্কিত জীবন।

Miss Mayo লিখিত Mother India'র প্রতিবাদ প্রসঙ্গে স্বামী সত্যানন্দ তার 'নারী' নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, ভারতে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত হয়েছিল মুসলমান রাজত্বের ফলেই এমন অসংযত মিথ্যা অপবাদ মুসলমান রাজত্বের উপর আরোপিত করা হিন্দুদের একটা Chronic ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। প্রাচীন ভারত ইতিহাসের দুই একটি পৃষ্ঠা খুলে দেখলেই লেখক বুঝতে পারতেন যে, ইসলামের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে বৈদিক যুগেও হিন্দু সমাজে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। অথর্ববেদে আমরা এর প্রথম আভাস পাই।

ঐতিহাসিক Strabo (64 B.C) লিখেছেন ঃ "ভারতে মৃত স্বামীর সাথে জীবন্ত স্ত্রীকে দাহ করা হয়, যেসব নারী তাতে অস্বীকৃত হয়, সমাজে সে ঘৃনার পাত্রী। ঐতিহাসিক Diodorus Siculus (44 B.C) লিখে গেছেন ঃ ভারতে বিধবাগণকে স্বামীর মৃতদেহের সাথে দাহ করা হয়। কিন্তু যার শিশু সন্তান আছে বা যারা গর্ভবতী, তাদেরকে দাহ করা হয় না। এই দু'টি কারণ ব্যতিরেকে যারা সহমরণে অস্বীকার করে, তাদেরকে আজীবন বিধবা থাকিতে হয় এবং যাগযজ্ঞাদির কার্যে তারা যোগদান করতে পারে না। বানভট্ট-এর হর্ষচরিতে দেখতে পাওয়া যায়, রাজা হর্ষের মৃতদেহের সাথে তার জীবন্ত স্ত্রীকেও দাহ করা হয়েছে। খ্রিস্ট্রীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব-বণিক সোলেমান এই প্রথা স্বচক্ষে দেখে গেছেন। শিরাফ নিবাসী ঐতিহাসিক আবুজিয়াদও এর উল্লেখ করে গেছেন (৯০৬ খ্রিঃ অঃ)। ইতালীয় পরিব্রাজক Nicolo-de-Conte পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখে গেছেন ঃ বিজয়নগর-রাজ দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃতদেহের সাথে তার দুই সহস্র স্ত্রীকেও দাহ করা হয়েছে।..... মুসলমান রাজত্বে এ ভয়াবহ প্রথা প্রচলিত হয়নি; বরং এ

বাল্য বিবাহ ঃ বর-কনে

www.pathagar.com

সময়ে সতীদাহ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয়েছিল। কারণ মুসলমান সম্রাট আকবর শাহ সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য অনেক চেষ্টা করেন।

সতীদাহ প্রথা এখন রহিত হয়েছে, কিন্তু বিধবা বিবাহ এখনও প্রচলিত হয়নি। বিদ্যাসাগর প্রমুখ মহাত্মগণ এ প্রথা প্রচলনের জন্য অনেক লড়াই করে গেছেন, কিন্তু সফলকাম হতে পারেননি। কবি হেমচন্দ্র এদের দুঃখময় জীবনের কথা করুণ উচ্ছ্বাসে গেয়েছেন ঃ

"ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি ওই রে,
না হ'লে এমন দশা নারী আর কই রে।
পুরুষ দু'দিন পরে আবার বিবাহ করে
অবলা নারীর প্রাণে এতই কি সয় রে?"

–বিধবা নারী।

বিধবা হিন্দু পিতৃতন্ত্রের দুঃস্বপ্ন, তার খড়্গের শোচনীয়তম বলি। ঋষিরা বিধবার জীবনকে অস্বীকার করেছে আর যখন সে বেঁচে থেকেছে তখন তাকে চূড়ান্ত অপমান করেছে। বিধবাকে সতী নাম দিয়ে দাহ করার ব্যবস্থা করেছে হিন্দু বিধি। যীশুখৃষ্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই একটি-দু'টি করে হিন্দু বিধবা সহমরণে ও অনুমরণে গেছে বা যেতে বাধ্য হয়েছে। ৭০০ খৃষ্টাব্দ থেকে সতীদাহ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অঙ্গিরা বলেছেন, বিধবার ধর্ম হচ্ছে সহমরণ; হারীত বলেছেন, সহমরণ বরণ করে স্ত্রী স্বামীকে চরম পাপ থেকে উদ্ধার করতে পারে। সতীদাহবাদীদের পবিত্র যুক্তি রাজা রামমোহন রায় তাঁর 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ'-এ (১৮১৮, ৩-৪) দিয়েছেন 'প্রবর্তক'-এর মুখে ঃ

> স্বামী মরিলে পর যে স্ত্রী এ পতির জ্বলন্ত চিতাতে আরোহণ করে সে অরুন্ধতী, যে বশিষ্ঠের পত্নী, তাহার সমান হইয়া স্বর্গে যায়। আর যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোক গমন করে সে মনুষ্যের দেহেতে যত লোম আছে যাহার সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি ততো বৎসর স্বর্গে বাস করে।..... যে স্ত্রী ভর্ত্তার সহিত পরলোকে গমন করে সে মাতৃকুল পিতৃকুল এবং স্বামীকুল এই তিন কুলকে পবিত্র করে।.... পতি যদি ব্রহ্ম হত্যা করেন কিম্বা কৃতঘ্ন হয়েন কিম্বা মিত্র হত্যা করেন তথাপি ঐ পতিকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করে ইহা অঙ্গিরা মুনি কহিয়াছেন।

সব বিধবা স্বামীর চিতায় ওঠেনি; কিন্তু এক সময় দাবানলের মতো জ্বলে উঠেছিলো সতীদাহের চিতা। এটা প্রথম ব্যাপক আকারে দেখা দেয় উত্তর ভারতে ও কাশ্মীরে, প্রধানত রাজপরিবারে। রাণীরা এমনকি উপপত্নীরা, দলে দলে রাজাদের চিতায় উঠে সতী হতে থাকে। উত্তর ভারতের রাজপুতদের মধ্যে সতীদাহের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিলো বর্ণাঢ্য মড়করূপে। মাড়ওয়ারের রাজা অজিত সিংহের চিতায় (১৭২৪ খৃষ্টাব্দ) উঠেছিলো ৬৪ জন সতী; পানিতে ডুবে বুন্দির রাজা বুধ সিং মারা গেলে তার চিতায় ওঠে ৮৪ জন সতী; ১৬২০ অব্দে এক রাজপুত রাজা মারা গেলে তার চিতায় উঠেছিল ৭০০ সতী!

www.pathagar.com

ভারতের মোগল সম্রাট হুমায়ুন ও আকবর সতীদাহ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। বাঙলায়ও সতীদাহ ছিলো হিন্দু সমাজের স্বর্গীয় ও পার্থিব সুখের ব্যাপার। ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত ১৪ বৎসরে মোট ৮১৩৫ জন বাঙ্গালী নারী স্বামীর চিতায় আরোহণ করে সহমরণ বরণ করে সতী হয়। এ সময়ে এতো সতী আর কোথাও হয়নি; বোম্বাই, মাদ্রাজ এমনকি রক্ষণশীল বেনারসেও হয়নি। হিন্দু বিধি বিধবাকে সম্পত্তির অধিকার দেয়নি। আর নিয়তির নির্মম পরিহাস হচ্ছে বাংলার একটি বিধিই বিধবাকে সম্পত্তির অধিকার দিয়ে তাকে ঠেলে দেয় চিতার আগুনে। দায়ভাগ আইনে বাঙলায় নিঃসন্তান বিধবারাও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতো; স্বজনেরা সম্পত্তির লোভে বিধবাদের ঠেলে দিতো স্বামীর চিতায়। হিন্দু পিতৃতন্ত্রের খড়গের ক্রোধ থেকে নারীদের বাঁচানোর প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় উনিশ শতকে, যার সূচনাকারী রামমোহন রায় [১৭৭২-১৮৩৩]।

রাজা রামমোহন রায়; সতীদাহ প্রথা বিলোপে অন্যতম ভূমিকা রেখেছিলেন

রামকান্তের পুত্র রামমোহনকে ফার্সী উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র পাটনায় পাঠান উচ্চ শিক্ষার জন্য। সেখানে তিনি ফার্সীতে পান্ডিত্য অর্জন করেন। 'কোরানে নারী জাতির প্রতি সুবিচার এবং সদ্ব্যবহারের যে সব কথা আছে সেগুলোও রামমোহনকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করে। হিন্দু সমাজে সে আমলে নারী জাতির প্রতি সুবিচার করা হতো না। পন্ডিত নামে পরিচিত এক শ্রেণীর গোঁড়া লোক তখন হিন্দু সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। এরা নানারকম বাধা-নিষেধের বেড়াজালে নারী জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, কোন নারী বিধবা হলে সমাজপতিরা জোর করে তাকে স্বামীর চিতায় তুলে দিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করতো এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই ভয়াবহ নৃশংস কার্যটি ধর্মের নামে সম্পন্ন করা হতো। কোরান পড়বার পরে রামমোহনের মন হিন্দু সমাজের এই নৃশংস প্রথার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। (শ্রী রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মাইকেল; ইন্দ্রভূষণ দাস, পৃঃ ৭)

এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখি যে, সতীদাহ প্রথার সময় জোর করে ভাং, ধুতরা পাতার রস বা ঐ রকম কোন নেশার জিনিস খাইয়ে আগুনে ফেলে বাঁশ দিয়ে টিপে ধরা হতো এবং খুব বেশি ধুপের ধোঁয়া করা হতো যাতে অন্য লোকে দেখতে না পায়। মৃত্যুর

www.pathagar.com

সতিদাহ প্রথা। ভারতে স্বামীর মৃত্যুর পর তার বিধবাকে এই কারণে পোড়ানো হতো যে, সাধারণ বিশ্বাস ছিলো স্বামী ছাড়া মেয়েলোকের জীবন অর্থহীন। বহু স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় সতীদাহ বরণ করতো।

যেদিন সতীদাহ হতো সেদিন সাধারণ জনগণ উৎসবমুখর হয়ে তা উপভোগ করতো।

ভয়াবহ করুণ আর্তনাদ ঢাকবার জন্য 'এত রাজ্যের ঢাক ঢোল কাঁশি ও শাঁখ সজোরে বাজানো হতো যে, কেহ যেন তার চিৎকার, কান্না বা অনুনয় বিনয় না শোনে।' (শরৎ রচনাবলী– নারীর মূল্য, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৫৭১-৭২), কনক মুখোপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৯)

নারীদের মর্মান্তিক পরিণতি ছিলো বিধবা, তাই বিধবাকে বাঁচিয়েই রামমোহন শুরু করেন নারী বাঁচানোর আন্দোলন। ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিষিদ্ধ করে আইন পাস করেন। সতীদাহ নিবারণে বেন্টিঙ্ক যে ভূমিকা নেন, তার জন্যে হিন্দু বিধবার কৃতজ্ঞতা বেন্টিঙ্কের বিশেষভাবেই প্রাপ্য।

www.pathagar.com

মহাত্মা রামমোহন রায় আইন দ্বারা সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দু নেতাগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে রামমোহন বাবুর সাধু উদ্দেশ্যকে ব্যহত করার বিপুল আয়োজন করেছিলেন। "স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হাতি" স্ত্রী স্বাধীনতা পেতে হিন্দু সমাজের ও হিন্দু ধর্মের মান্যনীতি। চির দাসত্ব নারীর বিধাতৃদত্ত ভাগ্য। কবি হেমচন্দ্র "ভারত মহিলা" কবিতায় ভারতের নারীর করুণ চিত্র দর্শনে মর্মাহত হয়ে নারীদের জন্য ক্রন্দন করেছেন। ইসলামে বাল্য বিবাহ আছে। কিন্তু তা অবশ্য কর্তব্য নয়। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র মতে রজস্বলা হবার পূর্বে কন্যার বিয়ে দেয়া অবশ্য

www.pathagar.com

কর্তব্য। নচেৎ তাকে পাপী হতে হবে। হিন্দু পন্ডিত কালিদাস বলেছেন, "স্ত্রীনাং: গুহমান্ বক্তব্যম" অর্থাৎ স্ত্রী জাতির নিকট মনের গুপ্ত কথা বলো না। তিনি আরও বলেছেন, "স্ত্রীনাং পাপ সন্দেহ কর্তব্যম" অর্থাৎ স্ত্রীলোক সম্পর্কে পাপ সন্দেহ কর্তব্য। এই সেদিন পর্যন্ত রাজপুতানারা কন্যা সন্তান জ্যান্ত গোরস্থ করতো। বৃটিশ সরকার তৎপর হলে পর এই মর্মঘাতি ধারার খানিক ছেদ পড়ে। লর্ড বেন্টিক আইন করে সতীদাহ ও বঙ্গ সন্তানদের আরাধ্য সলিল সমাধি বন্ধ করতে সচেষ্ট হন। বিধবা বিবাহে নারাজ হিন্দু সমাজে স্বাভাবিক যৌনতা বিকার ও ব্যাভিচারে রূপ নিয়ে গৃহত্যাগ, কণ্ঠি বদল বা বৈষ্ণব কিংবা বেশ্যাবৃত্তিতে পর্যবসিত হয়েছে।

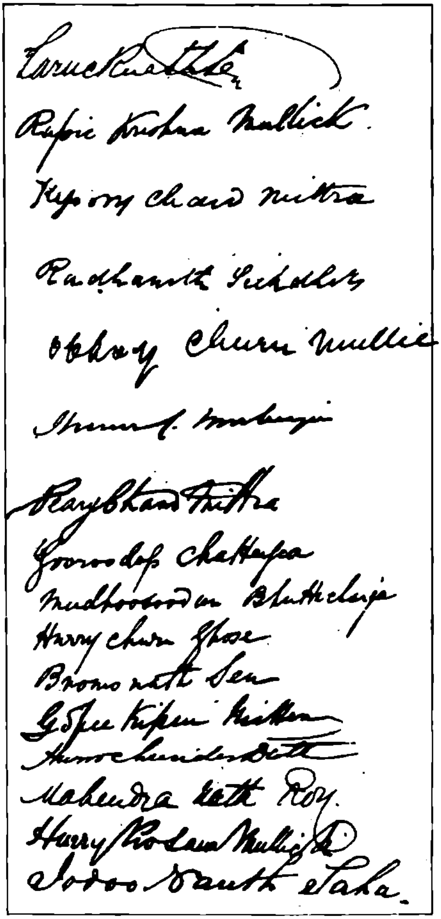

বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও অন্যান্য সামাজিক রীতি-নীতি সংস্কারের দাবীতে ইয়ং বেঙ্গল বিদ্রোহীদের গণস্বাক্ষর অভিযানে রামকৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখের স্বাক্ষর

এভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হিন্দু ধর্মে নারীর যেমন কোন ধর্ম-কর্ম ও শাস্ত্রাধিকার নেই, তেমনি তার যৌন পাপেরও কোন প্রতিকার নেই। পুরুষ যত বড় বীভৎস যৌনাচারেই লিপ্ত হোক না কেন ব্রাহ্মণ ভোজনে তার প্রায়শ্চিত হয়ে যায়। নারী বলপূর্বক ধর্ষিতা হলে বেশ্যালয় ভিন্ন হিন্দু সমাজে তার আর কোন স্থান নেই। হিন্দু আইনে পুরুষ যেখানে স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে পারে, বহু উপ-পত্নী রাখতে পারে সেখানে রমণীদের একমাত্র স্বামীর মৃত্যু হলে, এমনকি বাল্য-বিধবা পর্যন্ত গত্যন্তর গ্রহণ করতে পারতো না। ফলে নারী নির্যাতন বাড়তো, এমনকি বেশ্যা বৃত্তি অবলম্বনও তাদের পক্ষে বিচিত্র ছিল না। কন্যা হত্যা হিন্দুদের প্রথা হয়ে পড়লে লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথার সাথে এটাও বন্ধ করে দেন। মোট কথা হিন্দু ধর্মে নারীরা ছিল অপদার্থ, সকল পাপের উৎস। তাদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না।

বৃটিশ ঐতিহাসিক জেমস টেলর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "কোম্পানী আমলে ঢাকা" গ্রন্থে লিখেছেন– "১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে ঢাকা জেলায় একশত পঁচানব্বইজন

www.pathagar.com

বিধবা স্বেচ্ছায় তাদের স্বামীদের চিতায় আরোহন করে। এই সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

২০ বছরের কম বয়স্ক ছিলো	১০ জন
২১ থেকে ৩০ বছর বয়স্ক ছিলো	৪৩ জন
৩১ থেকে ৪০ বছর বয়স্ক ছিলো	৪৯ জন
৪১ থেকে ৫০ বছর বয়স্ক ছিলো	৪৬ জন
৫১ থেকে ৬০ বছর বয়স্ক ছিলো	৩৪ জন
৬১ থেকে ৭০ বছর বয়স্ক ছিলো	১২ জন

এদের মধ্যে ২৮ জনের কোনো সন্তানাদি ছিল না। ২৪ জনের ছিল না কোনো শিশু সন্তান।

রামমোহন ও বেন্টিঙ্ক হিন্দু বিধবাকে প্রাণ দিয়েছিলেন আর ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) দেয়ার চেষ্টা করেন জীবন। সব বিধবা সহমরণে যেতো না, তবে যারা বেঁচে থাকতো তারা বাঁচতো চরম লাঞ্ছনা, অপমান, কলঙ্কের মধ্যে। বিদ্যাসাগর বিধবাদের বিয়ে দেয়ার আন্দোলন শুরু করেন; হিন্দু রক্ষণশীল পুরোহিত সমাজ প্রথমে এর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করলেও ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। বিদ্যাসাগর কিছু বিধবাকে বিয়েও দেন। আজও হিন্দু সমাজ বিধবার বিয়ে সহজভাবে মেনে নেয় না। বিধবার বিয়ের কথা ভাবতে এখনো রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের রক্ত জমে বরফ হয়ে যায়। এমনকি হিন্দু নারীরাও বিধবা বিয়ের কথা শুনলে মূর্ছা যাওয়ার উপক্রম করে। সতীদাহ বন্ধ হয়েছে, কেননা প্রকাশ্য নৃশংসতা বন্ধ করা সহজ। বিধবার এখনো বিয়ে হয় না, কেননা গোপন নৃশংসতা বন্ধ করা কঠিন। বিধবাকে বোঝার মতো সংবেদনশীলতা বা মনুষ্যত্ব রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ আজো আয়ত্ত করেনি। অধিকাংশ হিন্দু বিধবার জীবনে দুর্গতির শেষ নেই; শ্বশুর বা পিতার পরিবারে তারা যাপন করে লাঞ্ছিত জীবন।

বাল্যবিবাহ সম্পর্কে আজ থেকে ৫৯ বছর আগে মোহাম্মদী পত্রিকায় মোহাম্মদ মতিয়র রহমান লিখেছেন ঃ

অনেকের ধারণা, প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতে বাল্য-বিবাহ প্রথা অজ্ঞাত ও অপ্রচলিত ছিল; মুসলিম সমাজের প্রভাবের ফলে ইহা ভারতীয় সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারি যে, বাল্যবিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত অনুজ্ঞা, প্রাচীন আর্য্য সমাজে ইহা প্রচলিত ছিল।

ঋগ্বেদে ঋষি কক্ষিবান ও তাঁহার পত্নীর মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাহাতে বৈদিক যুগে বাল্যবিবাহ প্রথার অস্তিত্বের সাক্ষ্য পাই। প্রথম মন্ডলের ১২৬শ' শ্লোকে এই কথোপকথন লিখিত আছে। ষষ্ঠ মন্ত্রে ঋষি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে যদি তাঁহার পত্নী আর একটু বয়স্কা হইতেন তাহা হইলে তিনি অধিকতর সুখী হইতেন।

www.pathagar.com

উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই, চক্রমুনির পুত্র নিতান্ত অপরিণতবয়স্কা কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন (ছান্দোগ্য ১ম ভাগ, দশম অধ্যায়, প্রথম শ্লোক)।

বাল্মিকী রামায়ণের তৃতীয় খন্ডের ৪৭শ' অধ্যায়ে সীতার বিবৃতি হইতে জানিতে পারি যে, সীতা অষ্টাদশ বৎসর বয়ক্রমকালে বিবাহের ত্রয়োদশ বৎসরে রামের বনগমনকালে তাঁহার সহিত অযোধ্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন। পাটীগণিতের সহজ হিসাব মতে দেখা যায় বিবাহকালে সীতার বয়স পাঁচ-ছয় বৎসর ছিল।

(মোহাম্মদ মতিয়র রহমান, প্রাচীন ভারতে বাল্য-বিবাহ; ১৫শ' বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৮ (১৯৪১)

১৮৯০-এর দিকে ভারতজুড়ে দু'টি বিতর্ক, রক্ষণশীলরা যে শক্তিশালী তা স্পষ্ট করে তুলেছিল। বিতর্ক দু'টির একটি ছিলো সহবাস সম্মতি আইন। সংক্ষেপে এই আইনের মূলকথা ছিলো, বারো বছরের নিচে বিবাহিত অথবা অবিবাহিত বালিকার সঙ্গে তার অনুমতি অথবা বিনা অনুমতিতে সহবাস করলে তা ধর্ষণযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। ১৮৯১ সালের ৯ জানুয়ারী ভারতীয় পিনাল কোর্ডের ৩৭৫ ধারা সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্যার এন্ড্রু স্কোবল বিল আকারে উত্থাপন করেছিলেন এই আইন। এর আগে ১৮৬০ সালে সহবাসের সর্বনিম্ন বয়স ধার্য করা হয়েছিল দশ বছর। এখন দু'বছর বৃদ্ধি করে তা উন্নীত করা হলো বারোতে। পূর্ববঙ্গে, হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ তুঙ্গে উঠেছিল সহবাস সম্মতি আইনকে ঘিরে। সতীদাহ প্রথা বিলোপের পর আর কোন বিষয় নিয়ে বোধ হয় এতো তুমুল তর্ক-বিতর্ক, আন্দোলন হয়নি।

তখন বিধবা বিবাহের প্রচলন হলেও বাল্যবিবাহ নিয়ে বেশ তর্ক-বিতর্ক চলছিল। ঐ সময় কলকাতায় জনৈক হরিমোহন মাইতির এগার বছরের স্ত্রী ফুলমণি বাঈ সহবাসজনিত কারণে মারা গেলে ভারত ও ইংল্যান্ডে বাল্যবিবাহের বিপক্ষে আবার জনমত সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এবং সেই সুযোগে ব্রিটিশ সরকার বিলটি উত্থাপন করেছিলেন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর হিন্দু নারীদের অবস্থার কাগজপত্রে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। শিক্ষিত, শহরবাসী হিন্দুরা নবগৃহীত আইন সাধারণত মেনে চলায় হিন্দু শিক্ষিত সমাজে নারীর অবস্থান আগের চেয়ে কিছুটা ভাল হয়েছে। কিন্তু অশিক্ষিত হিন্দু সমাজে পুরাকালের মুনি-ঋষিদের বিধানই প্রচলিত আছে এখনও। ১৯৫৫ সালে গৃহীত হয় হিন্দু বিবাহ এ্যাক্ট, যাতে দু'টি মৌলিক পরিবর্তন সম্পন্ন করা হয়। এতে পুরুষদের এক বিবাহ, নারীর তো চিরকালই এক বিবাহ, বিধিবদ্ধ করা হয় এবং বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকৃত হয়। সম্পত্তিতে এখন কিছুটা অধিকার এসেছে হিন্দু নারীর ঃ ১৯৫৬'র হিন্দু উত্তরাধিকার এ্যাক্ট ও ১৯৫৯'র বিবাহিত নারীর সম্পত্তি (পরিবর্ধিত) এ্যাক্ট নারীকে কিছুটা অধিকার দিয়েছে সম্পত্তির। তবু আজো হিন্দু নারী পুরনো বিধি-বিধানের শিকার।

আগেই বলা হয়েছে, হিন্দু ধর্মের প্রাচীন বিধি-বিধানে নারীকে সব সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তথাপি যুগে যুগে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারকরা কিছু কিছু

www.pathagar.com

সংশোধনী এনে নারীকে সম্পত্তিতে কিছুটা অধিকার দিয়েছে। কিন্তু সেই অধিকারও যে কতো একপেশে, নারীদের প্রতি কতোটা অমানবিক তা বুঝাবার জন্য আমরা এখানে হিন্দু সমাজে বর্তমানে প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন উদ্ধৃত করছি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের

শিল্পীর তুলিতে প্রাচীন বাংলায় নর-নারী

www.pathagar.com

হিন্দু সম্প্রদায়ে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনই প্রচলিত। ভারতে বিশেষ করে রেজিস্ট্রী বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিন্দু উত্তরাধিকার এ্যাক্ট বা বিবাহিত নারীর সম্পত্তি (পরিবর্ধিত) এ্যাক্ট-এর সুবিধেটুকু থেকেও কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দু নারীরা বঞ্চিত। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন দুটো মত পন্থী, এক. মিতাক্ষরা; দুই. দায়ভাগ। বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও মনিপুর প্রদেশের অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায় দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইনে শাসিত এবং দায়ভাগ নীতির অনুসরণকারী। দায়ভাগ আইনে একজন হিন্দু তার প্রাপ্ত পৈত্রিক সম্পত্তিতে এবং নিজ পরিশ্রমে অর্জিত স্বোপার্জিত ভিন্ন সম্পত্তিতে পূর্ণ স্বত্বাধিকারী। জীবিত অবস্থায় সে তার সব সম্পত্তি যে কোনো প্রকারে হস্তান্তর করতে পারে। দায়ভাগ আইন অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির তিন শ্রেণীর উত্তরাধিকারী ঃ সপিন্ড, সাকুল্য ও সমানোদক। যে ব্যক্তি পিন্ডদান করে, যে ব্যক্তি পিন্ড গ্রহণ করে এবং যে ব্যক্তি পিন্ডদানে অংশগ্রহণ করে তারা সকলেই পরস্পরের 'সপিন্ড'। যে আত্মীয়রা মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধের সময় পিন্ডে পিন্ডলেপ করে তারা মৃত ব্যক্তির 'সাকুল্য'। আর যে আত্মীয়রা মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে পিন্ডে পিন্ডজল দেয়, তারা মৃত ব্যক্তির 'সমানোদক'।

পিতৃকূলের তিন পুরুষে, যেমন পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং মাতৃকূলের তিন পুরুষ যেমন মাতার পিতা, মাতার পিতার পিতা ও মাতার পিতার পিতার পিতাকে সপিন্ড ধরা হয়। কারণ মৃত ব্যক্তিটি জীবিত থাকাকালে ওদের উদ্দেশ্যে পিন্ডদান করতে বাধ্য ছিল। মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধে পিন্ডদানকালে যারা পিন্ডদান করতে বাধ্য তারা সকলেই মৃত ব্যক্তির সপিন্ড। এই সকল সপিন্ড হচ্ছে পুত্রের তরফে পুত্র, পুত্রের পুত্র, পুত্রের পুত্র এবং কন্যার তরফে কন্যার পুত্র, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র। মৃত ব্যক্তি ছাড়া যে সকল ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির ওই উর্ধ্বতন পুরুষদের পিন্ডদান করতে বাধ্য, তারাও মৃত ব্যক্তির সপিন্ড। দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইনে ক্রম অনুসারে সপিন্ডগণের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবস্থান নিম্নরূপ ঃ

১. পুত্র, ২. পৌত্র, ৩. বিধবা স্ত্রী– যদি পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র জীবিত না থাকে, ৫. কন্যা– পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও বিধবা স্ত্রী জীবিত না থাকলে তার মৃত পিতার ত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে। অসতী, বন্ধ্যা, পুত্রহীনা এবং যে কন্যার কেবল কন্যা সন্তান আছে তারা পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হতে পারে না, ৬. কন্যার পুত্র– কন্যার মৃত্যুর পর কন্যার পুত্র সপিন্ড হিসাবে মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তিতে পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হয়, ৭. পিতা, ৮. মাতা– দায়ভাগ উত্তরাধিকার আইন অনুসারে অসতী মাতা মৃত পুত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না, ৯. ভাই, ১০. ভ্রাতুষ্পুত্র, ১১. ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র, ১২. বোনের পুত্র, ১৩. পিতার পিতা, ১৪. পিতার মাতা, ১৫. পিতার ভাই, ১৬. তার পুত্র, ১৭. তার প্রৌত্র, ১৮. পিতার বোনের পুত্র, ১৯. পিতার পিতার পিতা, ২০. পিতার পিতার মাতা, ২১. পিতার খুড়া, ২২. তার পুত্র, ২৩. তার পৌত্র, ২৪. পিতার পিতার বোনের পুত্র, ২৫. পুত্রের কন্যার পুত্র, ২৬. পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র, ২৭. ভাইয়ের কন্যার পুত্র. ২৮. ভাইয়ের পুত্রের কন্যার পুত্র. ২৯. খুড়ার কন্যার পুত্র, ৩০. খুড়ার পুত্রের কন্যার পুত্র, ৩১. পিতার খুড়ার কন্যার পুত্র, ৩২. পিতার খুড়ার

www.pathagar.com

পুত্রের কন্যার পুত্র, ৩৩. মাতার পিতা, ৩৪. মাতার ভাই, ৩৫. তার পুত্র, ৩৬. তার পৌত্র, ৩৭. মাতার বোনের পুত্র, ৩৮. মাতার পিতার পিতা, ৩৯. তার পুত্র. ৪০. তার পৌত্র, ৪১. তার প্রপৌত্র, ৪২. তার কন্যা পুত্র, ৪৩. মাতার পিতার পিতার পিতা, ৪৪. তার পুত্র, ৪৫. তার পৌত্র, ৪৬. তার প্রপৌত্র, ৪৭. তার কন্যার পুত্র, ৪৮. মাতার পিতার পুত্রের কন্যার পুত্র, ৪৯. তার পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র, ৫০. মাতার পিতার পিতার পুত্রের কন্যার পুত্র, ৫১, তার পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র, ৫২. মাতার পিতার পিতার পিতার পুত্রের কন্যার পুত্র, ৫৩. তার পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র।

তিপ্পান্নজন সপিন্ড অর্থাৎ উত্তরাধিকারী তবে কারা? সবই পিতা, পুত্র, পৌত্র, প্রপ্রৌত্র। স্ত্রী, কন্যা, মাতা, যদি সম্পত্তি পায় তবে পুরুষ উত্তরাধিকারীরা কেউ জীবিত না থাকলেই কেবল পাবে তাও নানা শর্তে। অসতী হলে, বন্ধ্যা হলে, পুত্রহীনা হলে সম্পত্তি পাবে না। পিতা, পুত্র, পৌত্ররা অসৎ হলেও তারা সম্পত্তি পাবে। আপত্তি কেবল নারীর বেলায়। ক্রম অনুসারে উত্তরাধিকারীদের পরিচয় দেখলে যে কোনো মানুষই সে যদি মানুষ হয় বিস্মিত হতে বাধ্য। কারণ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র সম্পত্তি পেতে পেতে কন্যা জীবিত অবস্থায় থাকে না, বিধবা স্ত্রীও থাকে না, তাদের সম্পত্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এরপর কন্যার পুত্র যদিও লাইনে আছে, কন্যার কন্যা কিন্তু নেই। ভাই আছে, ভ্রাতুস্পত্র আছে, ভ্রাতুস্পুত্রের পুত্র আছে, বোনের পুত্র আছে। কিন্তু বোন নেই, বোনের কন্যা নেই, বোনের কন্যার কন্যা নেই। পিতার ভাই, তার পুত্র, তার পৌত্র আছে কিন্তু পিতার বোন, বা তার কন্যা নেই উত্তরাধিকারের তালিকায়। এমনকি পিতার খুড়া, তার পুত্র, তার পৌত্র, পিতার পিতার বোনের পুত্র, পুত্রের কন্যার পুত্র, পুত্রের পুত্রের কন্যার পুত্র অবধি আছে কিন্তু খুড়ার কোনো কন্যা নেই, পিতার পিতার বোনের কন্যা নেই, অথবা পুত্রের কন্যার কন্যা নেই। মাতার ভাই, পিতা, মাতার পুত্র, পৌত্র, পৌত্রপ্রপৌত্রও সম্পত্তি পেতে পারে কিন্তু মাতার বোন নয়, মা নয়, মামার কন্যা নয়, দৌহিত্রি নয়। ভিন্ন গোত্রে সম্পত্তি যাচ্ছে তবু কোনো নারীর কাছে যাচ্ছে না। মাতার বোন পাচ্ছে না, কিন্তু মাতার বোনের পুত্র পাচ্ছে। মাতার পিতার পিতার পিতার কন্যা পাচ্ছে না, কিন্তু সেই কন্যার পুত্র পাচ্ছে। মাতার ন্যায় পিতার পুত্রের কন্যা পাচ্ছে না, কিন্তু সেই কন্যার পুত্র পাচ্ছে। সাকুল্য ও মানোদকও পিতার পিতা তস্য পিতা, পুত্রের পুত্র তার পুত্র, তার পৌত্র ও প্রপৌত্ররাই। কোনো নারীর চিহ্ন নেই এই উত্তরাধিকারীর তালিকায়।

প্রত্নতত্ত্ব, শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রথম যুগের পুরাণ, বৌদ্ধ সাহিত্যের পাশাপাশি বৈদিক সাহিত্যই বহন করে বৈদিক যুগের সকল ইতিহাস। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও সূত্রসাহিত্যই (শ্রৌত, গৃহ্য, ধর্মসূত্র) প্রধানত বৈদিক সাহিত্য। খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে রচিত এই সাহিত্যে সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে নারী আদৌ মানুষ হিসেবে গণ্য হয় না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সেই নারীকেই উত্তম বলে যে নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করে, পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় এবং স্বামীর কথার ওপর কথা বলে না (৩/২৪/২৭)। যে নারী

www.pathagar.com

স্বামীকে সন্তুষ্ট করে না, পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় না এবং স্বামীর কথার ওপর কথা বলে তাকে নিশ্চয়ই অধম বলা হয়। নারী উত্তম না অধম তাও নির্ভর করে পুরুষের সন্তুষ্টির উপর। শতপথ ব্রাহ্মণে লেখা আছে, সুন্দরী বধূ স্বামীর প্রেম লাভ করে (৯/৬)। শতপথ ব্রাহ্মণ নারীকে অবরোধের কথা বলেছে, তা না হলে তার শক্তি ক্ষয় হবে (১৪/১/১/৩১)। যজ্ঞে একটি দন্ডকে বেষ্টন করে থাকে দু'টি বস্ত্র খন্ড, তাই পুরুষ দু'টি স্ত্রী গ্রহণে অধিকারী। একটি বস্ত্রখন্ডকে যেহেতু দু'টি দন্ড বেষ্টন করে না, তাই নারীর দুই পতি গ্রহণ নিষিদ্ধ (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬/৬/৪/৩, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১/৩/১০/৫৮)। নারী কখনো একটির বেশি স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না। এক স্বামীর বহু স্ত্রী থাকলেও একটি স্বামীই নারীর জন্য যথেষ্ট (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৫/৫/২/৪৭)।

বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রে আছে– পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। এর অর্থ নারীকে কুমারী বয়সে রক্ষা করবেন পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্ররা নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয় (৫/১-২, ২/১, ৩, ৪৪, ৪৫)। শতপথ ব্রাহ্মণ নারীকে পুরুষের অনুপথগামিনী হতে বলে (১৩/২/২৪)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে পতিং বা অনু জায়া, স্ত্রী স্বামীর পশ্চাতে (১/৯/২/১৪)। বিয়ের অনুষ্ঠানে বরকে বলতে হয়, এসো আমরা মিলিত হই, যেন পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়, যে সন্তান দ্বারা সম্পত্তি বৃদ্ধি হবে। শেষে প্রার্থনা করা হয় পুত্র, পৌত্র, দাস, শিষ্য, বস্ত্র, কম্বল, ধাতু, বহু ভার্যা, রাজা, অন্ন ও নিরাপত্তা (হিরণ্যকেশী গৃহসূত্র ১/৬/১২/১৪)। স্ত্রীর প্রধান কর্তব্য পুত্র সন্তান জন্ম দেয়া (আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১/১০-৫১-৫৩)। নিঃসন্তান বধূকে বিয়ের দশ বছর পর ত্যাগ করা যায়, যে স্ত্রী শুধু কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় তাকে বারো বছর পর, মৃতবৎসাকে পনেরো বছর পর এবং কলহপরায়ণাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা যায় (বৌধায়ন ধর্মসূত্র ২/৪/৬)। শতপথ ব্রাহ্মণেও আছে, যে অপুত্রা পত্নী, সে পরিত্যাক্তা (৫/২/৩/১৪) এবং পুত্র সন্তান না জন্মালে স্বামী আবার বিয়ে করবে (বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র ২৮/২-৩)। নারী হোম করতে পারবে না (আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে ২/৭/১৫/১৭)। উপনয়নে নারীর অধিকার নেই। ব্রহ্মচর্য নারীর জন্য নিষিদ্ধ। আর তা নিষিদ্ধ হলে বেদ অধ্যয়নও নিষিদ্ধ; অর্থাৎ শিক্ষা লাভের পথ তার বন্ধ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে স্ত্রী, যদি স্বামীর সম্ভোগ কামনা চরিতার্থ করতে অসম্মত হয় তবে উপহার দিয়ে স্বামী তাকে কিনতে চেষ্টা করবে, আর তাতেও কাজ না হলে হাত বা লাঠি দিয়ে মেরে তাকে বশে আনবে (৬/৪/৭)। নারীকে যেমন ইচ্ছে শাসন ও ভোগ করবার অধিকার শাস্ত্রই পুরুষকে দিয়েছে। পুরুষের জন্য বহু পত্নী, উপপত্নী ও গণিকা সম্ভোগের অবাধ অধিকারের কথা বারবার বলা হয়েছে। নারীর জন্য দুটো বৃত্তিই বৈদিক সমাজে স্বীকৃত ছিল– দাসীবৃত্তি এবং গণিকাবৃত্তি। নারীর নিজস্ব কোনো সম্পত্তি ছিল না। পিতা বা স্বামীর ধনে তার অধিকারও স্বীকৃত ছিলো না। কোনো শিক্ষা পাবার, ধন অর্জন করবার এবং তা ভোগ করবার এমনকি নিজের শরীরকে অবাঞ্ছিত সম্ভোগ থেকে রক্ষা করবারও অধিকার তার নেই (মৈত্রায়ণী সংহিতা ৩/৬/৩, ৪/৬, ৪/৭/৪, ১০/১০/১১; তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬/৫/৮/২)।

মৈত্রায়ণী সংহিতা বলেছে নারী অশুভ (৩/৮/৩)। যজ্ঞকালে কুকুর, শূদ্র ও নারীর

www.pathagar.com

দিকে তাকাবে না (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩/২/৪/৬)। অতিথি সৎকারে, উৎসবে, যুদ্ধে, যজ্ঞে, যৌতুকে, দানে ও দক্ষিণায় গাভি-স্বর্ণ-রথ-গজ-অশ্বের সঙ্গে আগণন নারী দান করা হতো। নারীকে ভোগ্যবস্তু ভাবা হতো বলেই গরু-ঘোড়ার সঙ্গে নারীর উল্লেখে কেউ বিব্রত হতো না। কুকুর, শূদ্র, নারী– সবই অস্পৃশ্য। সবই সমাজের নিগৃহীত, ঘৃণিত বস্তু। কন্যা অভিশাপ (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬/৩/৭/১৩); তাই সন্তান সম্ভবা নারীর একটি অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান হলো 'পুংসবন', যেন গর্ভের সন্তানটি পুত্র হয়। নারী মিথ্যাচারিণী, দুর্ভাগ্য স্বরূপিণী, সুরা বা দ্যুতক্রীড়ার মতো একটি ব্যসনমাত্র (মৈত্রায়ণী সংহিতা ১/১০/১১, ৩/৬/৩)। সর্বগুণান্বিত শ্রেষ্ঠ নারীও তাই অধমতম পুরুষের চেয়ে হীন (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬/৫/৮/২)। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, স্ত্রী স্বামীর পরে খাবে। কারণ ভুক্তেবাচ্ছিষ্টং বধৈব দদাৎ, খেয়ে এঁটোটা স্ত্রীকে দেবে (গৃহসূত্র ১/৪/১১)। জীর্ণ জুতো-কাপড় দাসকে দেবার এবং খেয়ে এঁটোটা স্ত্রীকে খেতে দেবার বিধান শাস্ত্রে আছে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে (১/৯/২৩/৪৫) বলা হয়েছে, কালো পাখি, শকুনি, নেউল, ছুঁচো ও কুকুর হত্যা করলে যে প্রায়শ্চিত্ত, নারী হত্যা ও শূদ্রহত্যার সেই একই প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ মাত্র একদিনের কৃচ্ছ্রসাধন। এই সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে রইলো।

ইসলাম ধর্মে নারীর মূল্যায়ন

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইসলাম ধর্মই নারী জাতিকে যথার্থ অর্থে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। ইসলাম প্রাক-যুগ শুধু আরবেই নারী জাতিরা নির্যাতিত হয়নি; বিশ্বের অন্যান্য দেশে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও নারীকে সঠিক বা সুষ্ঠু মর্যাদা দানের নিয়ম-রীতি, ঐতিহ্য প্রদর্শিত হয়নি। এমনকি ইসলাম-উত্তর সময়েও অমুসলিম দেশসমূহে নারীর অধিকার, সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে যুগের পর যুগ ধরে সীমাহীন অত্যাচার লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে যুগ যুগ ধরে। প্রাচীন আরবেরা নারীকে বলতো– "শয়তানের ষষ্ঠি, অমঙ্গলের দূত"। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ ও বর্জন, কন্যা সন্তানকে পুড়িয়ে মারা, জীবন্ত কবর দেয়া, ঘোড়ার লেজে বেঁধে শাস্তিদান তথা বহুবিধ পাশবিক অত্যাচার ছিল তাদের দৈনন্দিন ব্যাপার। পরিবারের প্রধান যাকে ইচ্ছে হস্তান্তর ও বিক্রি করতে পারতো। স্বামীর উপর স্ত্রীর কোনো অধিকার ছিল না। এছাড়া স্বামী নির্বাচনেও তাদের কোনো অধিকার ছিল না। বিবাহে কোন নির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল না। বিমাতা মাতা ও ভগ্নিকে পর্যন্ত বিবাহ করা হতো। সুপুত্রের আশায় সুদর্শন বীর বা মহাপুরুষের কাছে নিজের স্ত্রীকে গর্ভবতী করার উদ্দেশ্যে পাঠাতো। পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার ছিল না। সে সময় কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তা অমর্যাদার প্রতীক বলে মনে করা হতো। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন পাকে বলা হয়েছে, "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের খবর দেয়া হতো তখন চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠতো। আর তার মন হয়ে উঠতো দুঃখ ভারাক্রান্ত। এ সংবাদে সে এতই লজ্জাবোধ করতো যে, লোক সমাজে সে মুখ দেখাতে কুণ্ঠাবোধ করতো। সে তখন ভাবতো, লাঞ্ছনা ও লজ্জাসহ এ কন্যা সন্তানকে সে গ্রহণ করবে নাকি মাটিতে সমাধিস্থ করবে।"

www.pathagar.com

জনৈক আরব কবি বলেন ঃ "নারী সেতো শয়তান, আমরা তার চক্রান্ত হতে পানাহ চাই।" সামগ্রীকভাবে সংক্ষেপে এটাই ছিল মহানবী (সঃ)-এর আবির্ভাবকালীন নারী জাতির সার্বিক অবস্থা।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মহান আল্লাহ্র নির্দেশে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার নির্দেশক। পবিত্র ইসলাম প্রচারের মাধ্যমেই বিশ্বের চির নির্যাতিত নারী পুরুষের সাথে যেমন সব অধিকার পায় তেমনি পায় শৃঙ্খল মুক্তির অপূর্ব সুযোগ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাক নারীর প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করে বলেছেন–

> "তারা (নারী) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।" (আল-বাকারা ঃ ১৮৭) "স্ত্রীদের তেমনি ন্যায় সঙ্গত অধিকার আছে (স্বামীদের উপর) যেমন আছে (স্বামীদের তাদের উপর (আল-বাকারা ২২৮) এবং তোমরা পরস্পরের প্রতি উদারতা করতে ভুলিও না।" (আল-বাকারা ঃ ২৩৭)
>
> "হে মানব জাতি! তোমরা আপন প্রতিপালককে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই প্রাণ থেকেই তার জোড় বানিয়েছেন এবং যাদের দু'জন থেকে অনেক পুরুষ ও নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহর ভয় করো, যার দোহাই দিয়ে একে অন্যের কাছে নিজের অধিকার দাবী করো, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। (৪ সূরা আন নিসা ঃ ১)

প্রাচীন ধর্মগুলো নারীকে নগণ্য এবং নিম্ন মর্যাদা এবং পুরুষকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মনে করে তাদের মর্যাদা অনুযায়ী পৃথক আইন রচনা করেছিল। কিন্তু ইসলামে নারী -পুরুষের মর্যাদা সমান এবং তাদের জন্য অভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে। ৩০ কুরআন মজীদ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে ঃ

"পুরুষ যেমন কাজ করবে তেমনি ফল পাবে এবং নারী যেমন কাজ করবে ঠিক তেমনি তার ফল লাভ করবে।" (সূরা আন্ নিসা ঃ ৩২) আরও এরশাদ হয়েছে ঃ "নারী যদি এমন অপরাধ করে যা সাধারণ আইনে দন্ডনীয় তবে সে পুরুষের সমান শাস্তিই পাবে।" (সূরা আন্ নূর ঃ ২) পাক কুরআনে অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে, "নারীর প্রতি অন্যায় আচরণ করা হলে বা তার ক্ষতি করা হলে, সে ঠিক পুরুষের সমান ক্ষতিপূরণ পাবে।" (সূরা আন্ নিসা ১৯)

বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামে নারী এবং পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। যদি কোনো মহিলা কোনো পুরুষকে হত্যা করে তাহলে তার জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তার জন্যও একই শাস্তি নির্ধারিত আছে। অর্থাৎ যে কোনো অপরাধের জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একই শাস্তি। রাসূলে করীম (সাঃ)-এর জারিকৃত আইনের একটি ধারা হচ্ছে– "স্ত্রীলোকের হত্যাকারী কোনো পুরুষ হলে শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা হবে।"

একজন ইয়াহুদী (অমুসলিম নাগরিক) একটি মেয়েকে হত্যা করেছিল। এই হত্যাকান্ডের বিচারে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। হযরত উমর (রাঃ) একজন স্ত্রীলোকের হত্যাকান্ডে কয়েকজন পুরুষ জড়িত প্রমাণিত হওয়ায় বিচারে সকলকেই মৃত্যুদন্ড দিয়েছিলেন। ইসলামী আইনে এ ব্যাপারে নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

www.pathagar.com

এক কথায় বলা যায়, পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ইসলাম নর এবং নারীকে সমঅধিকার প্রদান করেছে। কারো জন্যে স্বতন্ত্র বা ভিন্নতর কোনো ব্যবস্থা দেয়া হয়নি। নারী ও পুরুষ উভয়ে একই আদর্শের অনুসারী একই পথের পথিক একই জিহাদের মুজাহিদ। যদিও প্রকৃতি ও স্বরূপের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক ও অভিন্ন নয়। কিন্তু ক্ষেত্র ও কর্মের এই পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সর্বতোভাবে এক ও অভিন্ন।

আল্লামা ইবনুল আবেদীন হানাফী শরয়ী আইনের গোটা ভান্ডার ঘেটে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুসতাহাব, মাকরূহ নিষিদ্ধ বিষয়ে মাত্র পঁচাত্তরটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন। এগুলোর অধিকাংশই সামাজিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত নয়। উদাহরণস্বরূপ নামাজে মেয়েরা কোথায় হাত বাঁধবে, মেদের কাফনে কয়টা কাপড় দিতে হবে আর পুরুষের কয়টা। মেয়েদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার লক্ষণ কি এবং পুরুষের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার লক্ষণ কি? এর মধ্যে মাত্র ৬/৭টি বিধান সামাজিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত।

কথিত আছে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাথীদের নিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। আড়াল থেকে একটি হরিণ এসে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পায়ে সেজদারত অবস্থায় চুমো খেতে আরম্ভ করলো। তা দেখে এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বনের একটি হরিণ সেজদারত অবস্থায় আপনার পায়ে চুমো খাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছে; আর আমরা এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। তা শুনে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বললেন– "আল্লাহ যদি কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতেন তাহলে প্রত্যেক স্ত্রী প্রত্যেক স্বামীকে সিজদা করার অনুমতি দিতেন। কিন্তু আল্লাহকে ছাড়া সিজদা করার অনুমতি নেই। সেজদা একমাত্র আল্লাহই প্রাপ্য। সেজন্য কোনো মানুষকে সিজদা করা হারাম। এখানে মধুর দাম্পত্য জীবনের স্বার্থে পুরুষকে কিছুটা প্রাধান্য দিলেও সিজদা দেয়াকে রহিত করা হয়েছে। এ ছাড়া ইসলামের প্রতিটি বিধি-বিধানের মাধ্যমে নারী জাতিকে মাতা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, কন্যা হিসেবে, এতিম-অনাথ হিসেবে দাসী হিসেবে, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা হিসেবে তথা জীবনের সার্বিক অবস্থায় প্রদান করলেন তাদের প্রাপ্য ন্যায্য অধিকার। ইসলাম অবহেলিত এ নারী জাতিকে প্রদান করলেন ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত অধিকার যা ছিল তাদের জন্যে অকল্পনীয়। এর ফলে স্বীকৃত হলো বুদ্ধিবৃত্তিতে নারী সমাজের অংশগ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নারী জাতির উন্নয়নে যে অবদান রেখেছেন তা সর্বকালের সর্বযুগের সকল মানব সমাজের জন্য হচ্ছে অনুসরণযোগ্য উজ্জ্বল ভাস্কর ও নারী সমাজের মর্যাদার একমাত্র গ্যারান্টি।

প্রাক-ইসলামী যুগে নারী জাতির স্বাধীনতার সূর্য যখন ছিল প্রায় অস্তমিত, জালিম তথা শোষকের অত্যাচারে যখন নারী জাতি হয়ে পড়েছিল আকুল-ব্যাকুল, ঠিক সেই নির্মম দুরাবস্থায় নারী সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, বিশ্ব মানবতার কূল শিরোমনি রাহমাতুল্লিল আলামীনের আগমন ঘটল এ বসুন্ধরায়। তাঁর আবির্ভাবের সাথে সাথে শত যুগের ঘনীভূত অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোকিত হল পথঘাট, সুন্দর হলো সবুজ পৃথিবী।

www.pathagar.com

তাঁর এ স্বর্গীয় বারতার সামনে নীরব-নিস্তব্ধ হল জালিমের কণ্ঠস্বর, অবসান ঘটলো সকল জুলুম ও নির্যাতনের। নিয়ে আসলেন শান্তির অমীয় বাণী। স্পষ্ট এবং নির্ভিক কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন– "নারী নয় কেনা-বেচার বস্তু, নয় সে শুধু ভোগের সামগ্রী। মহানবীর এ বাণী নারীকে স্পর্শ করেছে তার জীবনের সকল স্তরে। কন্যারূপে, কিশোরীরূপে, স্ত্রীরূপে, আত্মীয়ারূপে, বিধবারূপে, তালাকীরূপে, অনাথীরূপে, বিত্তবতিরূপে, উত্তরাধিকারিনীরূপে, অনাবরোধবাসিনী রূপে, নিঃসন্তানরূপে, সন্তানবতী রূপে, গৃহসঙ্গিনীরূপে, কর্মক্ষেত্রে সহকারিণী রূপে এবং সর্বশেষে মাতৃরূপে।

মহানবী (সঃ) এসেই ঘোষণা করলেন, "শিশু-কন্যা হত্যা করো না, ইসলামে ইহা জঘন্যতম অন্যায়। এতিম-অনাথদের স্বার্থ রক্ষা করো, তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।" বন্ধ করলেন অবাধ বিবাহ বন্ধন। প্রণয়ন করলেন সুনির্দিষ্ট বৈবাহিক ও তালাকের নীতিমালা। সামাজিক শান্তির জন্য ব্যাভিচারকে করলেন নিষিদ্ধ। সন্ন্যাসবাদ প্রতিরোধ করে বিবাহের প্রতি করলেন উৎসাহিত। নারী-পুরুষের সমতা ঘোষণা করে প্রতিষ্ঠা করলেন তাদের উত্তরাধিকার হবার অধিকার। পিতার উপর কন্যার লালন-পালন, স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরন-পোষণ এবং বিবাহে স্বামীর উপর স্ত্রীর মোহরানাকে করলেন বাধ্যতামূলক। প্রদান করলেন স্ত্রীকে প্রয়োজনে তালাক দেবার অধিকার, পূর্ণগ্রহণ, পুনর্মিলন এবং পুনর্বিবাহের জন্য নির্ধারণ করলেন কতকগুলো নির্দিষ্ট নীতিমালা। তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা নারীকে প্রদান করেন তাদের ন্যায্য অধিকার। পুরুষের সাথে সাথে তাদেরকে প্রদান করলেন সামাজিক মর্যাদা। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আইনগত অধিকার, যা ছিল প্রাক-ইসলামী যুগে নারী জাতির জন্য অকল্পনীয় ব্যাপার। এভাবে নারী জাতির উন্নয়নে আনলেন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তাদের কল্যাণে রাখলেন এক অবিস্মরণীয় অবদান। সৃষ্টি করলেন এক নতুন অধ্যায়, উন্মুক্ত করলেন এক নবদিগন্তের। যার ফলে নারী জাতি পেয়েছে তাদের ন্যায্য অধিকার, রক্ষা পেয়েছে অবমাননা ও লাঞ্ছনার গ্লানি থেকে।

একমাত্র ইসলামই নর ও নারীর জন্য সমান বিধান দিয়েছে। পুরুষ যদি নারীর কাছ থেকে কিছু আদায় করতে চায়, পুরুষও নারীকে ততখানি দিতে বাধ্য।

ইসলামে স্ত্রী স্বামীর দাসী নহে– বন্ধু। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নারী জাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেছেন এবং নারী জাতির প্রতি কিরূপ আচরণ করবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করেছেন সে সম্পর্কে সংক্ষেপে তাঁর অমর বাণী হতে কিছু উদ্ধৃত করা হলো।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) নারীকে সত্যিকার সম্মান ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ

- ★ নারী পুরুষের অংশ।
- ★ নারীকে সম্মান কর; কেননা নারী পুরুষের জননী, ভগ্নি, স্ত্রী এবং নিকট আত্মীয়। যারা নারীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে তারা ভ্রান্ত। যারা নারীকে বিপথগামী হতে পরামর্শ দেয়, তারা মুসলমান নয়।
- ★ জগত এবং জগতের যাবতীয় বস্তুই মূল্যবান; কিন্তু নারীই সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যবান

www.pathagar.com

সামগ্রী।

★ তোমরা আপন স্ত্রীকে ঘৃণা করো না। যদি তোমার স্ত্রীর দোষে তুমি বিরক্ত হয়ে থাক, তাহলে তার অপর একটি গুণের জন্য আনন্দিত হও।

★ আল্লাহ এবং জগতের নিকট নির্দোষ ব্যক্তি সে- যে তার নিজ পরিবারের লোকদের প্রতি নির্দোষী।

★ তোমরা নারীকে কখনো প্রহার বা তার প্রতি অত্যাচার করিও না।

★ চরিত্রবান ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান এবং ঐ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর যে তার স্ত্রীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

★ মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত (বুখারী)।

★ যদি কোন ব্যক্তি তার দু'টি কন্যাকে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করে, তাহলে সে এবং আমি এমনভাবে আগমন করবো যেমন আমার দু'টি আঙ্গুল একত্র আছে।

★ যদি কারো কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সে তাদের প্রতিপালন করে তাহলে তারা তার জন্যে দোযখের প্রতিবন্ধক হবে।

★ যার তিনটি কন্যা সন্তান হবে, সে যদি ধৈর্য্য ধারণ করে এবং নিজের সামর্থানুযায়ী তাদের ভাল পোশাক পড়তে দেয়, তবে তারা তাদের জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে।

★ যে মুসলমানের দু'টি কন্যা থাকবে, সে যদি তাদের ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে, তারা তাকে জান্নাতে দাখিল করবে।

★ যে তার কন্যা সন্তানকে সোহাগ করে লালন পালন করবে তার জন্য বেহেস্ত। আর দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে সেই যে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করবে।

★ খিদমত তথা সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার হলো তোমার মায়ের; তোমার মায়ের, তোমার মায়ের। (তিরমিযী)

★ কোন যুবকের ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না, নারীকে জীবন সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করা ছাড়া।

★ বিবাহ আমার সুন্নাত, যে আমার সুন্নাতকে অস্বীকার করে সে প্রকৃত উম্মত নয়। আল্লাহর রসুল আরো বলেন, 'বিবাহ ঈমানের অর্ধেক'।

★ নারীর অধিকার পবিত্র তাতে হস্তক্ষেপ করো না।

★ স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের রাণী।

★ নারীকে মসজিদে আসতে বাধা দিও না।

★ তোমাদের মধ্যে যারা নিজের স্ত্রীর কাছে ভালো তারা ইসলামের কাছেও ভালো, আমি আমার স্ত্রীদের কাছে ভালো ব্যক্তি।

★ সচ্চরিত্র ও স্বীয় স্ত্রীদের প্রতি সহৃদয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই পূর্ণ ঈমানদার।

www.pathagar.com

★ যখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সাথে প্রেমের দৃষ্টিতে তাকায় তখন আল্লাহ উভয়ের দিকে করুণার দৃষ্টি দেয়; অতঃপর যখন তারা উভয়ে উভয়ের হাত ধারণ করে তখন তাদের আঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে পাপরাশি ঝরে পড়ে।

★ যে ব্যক্তি অল্প বা অধিক মোহর ধার্য করে বিয়ে করলো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার অন্তরে মোহর আদায় করার ইচ্ছে ছিলো না এভাবে স্ত্রীকে প্রতারিত করে সরে গেলো, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি যেনাকারী বা ব্যাভিচারীরূপে আল্লাহর সাথে দেখা করবে।

★ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর একটি কটূ কথা শুনে ধৈর্য্য ধারণ করবে আল্লাহতায়ালা তাকে এক হাজার শহীদের সওয়াব দান করবেন এবং তার কবরের অন্ধকার ও সংকীর্ণতা দূর করে দিবেন।

মাবিয়া জিজ্ঞাসা করলেন, "হে রাসুলুল্লাহ, আমার উপর আমার স্ত্রীর কি দাবী আছে।" হযরত মোহাম্মদ (সঃ) উত্তর করলেন– "তোমার স্ত্রীর উপর তোমার যত দাবী।"

হযরতের জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন– "নারী জাতির জন্য আল্লাহ্ কিরূপ পুরস্কার ঘোষণা করেছেন?" রাসুলুল্লাহ্ উত্তরে পবিত্র কোরানের আয়াত হতে আবৃত্তি করেন ঃ (১) হে মানবমন্ডলী, তোমরা স্বীয় স্ত্রীগণকে নিয়ে বেহেশতে প্রবেশ কর। (২) যারা সৎকার্য করে, পুরুষ হোক বা নারী হোক এবং যারা ঈমান ঠিক রাখে, পুরুষ হোক বা নারী হোক, তারা নিশ্চয়ই বেহেশতে অসীম আনন্দের মধ্যে অবস্থান করবে।

এছাড়াও ইসলাম নারীকে বেহেস্তের ফুল হিসেবে বর্ণনা করেছে। নারী প্রথম বেহেস্তে প্রবেশ করবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

কথিত আছে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে হালিমা নাম্নী ধাত্রী শৈশবে পালন করেছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে মহানবীর সাথে একদিন সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। হযরত দূর হতে তাঁর ধাত্রীমাতাকে দেখতে পেয়ে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন। হালিমা নিকটবর্তী হলে তিনি স্বীয় পাগড়ী খুলে মাটির উপর বিছিয়ে দিলেন এবং এর উপর ধাত্রীমাতাকে আসন গ্রহণ করতে বলেন।

মেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পিতা-মাতা বিয়ের ব্যবস্থা করবে, বর নির্বাচন করবে; কিন্তু বিবাহে মেয়ের সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। ইসলামের বিধান এই যে, নারী বিধবা হোক বা কুমারী হোক তার সম্মতি ব্যতীত তাকে বিয়ে দিতে পারে না।

খানসা বিনতে খাজাম আনসারিয়ার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাঁর পিতা অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিলে তিনি মহানবীর (সাঃ) নিকট নালিশ করেন। মহানবী এ বিয়ে বাতিল করে দেন।

একজন কুমারী মহানবীর দরবারে এসে নিবেদন করলো, "আমার পিতা আমাকে বিয়ে দিয়েছেন এতে আমি সন্তুষ্ট নই।" মহানবী তাকে বললেন ঃ "তোমার ইচ্ছা হলে বিয়ে বহাল রাখতে পার অথবা বাতিল করেও দিতে পার।"

নবী করীমই (সাঃ) সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি নারী সম্পর্কে শুধু পুরুষের নয়, নারীরও

www.pathagar.com

মনোবৃত্তি পরিবর্তন করে দিয়েছেন এবং জাহেলী যুগের মনোবৃত্তির পরিবর্তে এক সঠিক মনোবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন, যার ভিত্তিতে ভাব প্রবণতার উপর নয় বরং জ্ঞান বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত।

অতঃপর তিনি শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক সংস্কার সাধন করেই ক্ষান্ত হননি বরং আইনের সাহায্যে নারীর অধিকার রক্ষা এবং পুরুষের অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধেরও ব্যবস্থা করেছেন। উপরন্তু তিনি নারীদের মধ্যে এতোখানি চেতনা সঞ্চার করে দিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার বুঝতে পারে এবং তা সংরক্ষণের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

নারী স্বাভাবিকভাবেই ঋতুমতী হয়। এর ওপর তার কোন হাত নেই। নারী তা ইচ্ছা করে আনতেও পারে না, বন্ধও করতে পারে না। অথচ এমন অনেক ধর্মের কথাই আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে ধর্মে ঋতুমতী অবস্থায় নারীকে ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না এমন কি তার ধরা-ছোঁয়া পর্যন্ত স্পর্শ করা যায় না, তাকে ঐ সময় ঘরের বাইরে আলাদা কোন ঘরে থাকতে হয়। নাগা মেয়েদের রজোস্রাব হয়েছে জানতে পারলেই তাকে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া হয়। অবশ্য তার যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট আড্ডাখানা রয়েছে। সেখানে মিলন প্রার্থী ছেলেরা অপেক্ষমান থাকে। সেই আড্ডাখানায় গিয়ে মেয়েটি নিজের পছন্দমত একটি ছেলের বাহুলগ্না হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতো কালযাপন করতে থাকে। ঐ আড্ডাখানায় এমনি ধরনের বহু ছেলেমেয়ে জোড়ায় জোড়ায় বাস করে এবং নিজ খেয়াল খুশীমতো সময় সময় সঙ্গী বদলও করে।

এমনি করে বসবাসের মাধ্যমে মেয়েটির যখন গর্ভ সঞ্চার হয় তখন মেয়ের পিতা-মাতাকে সংবাদ জানানো হয়। পিতা-মাতা তখন যে ছেলেটির দ্বারা মেয়েটির গর্ভ সঞ্চার হয়েছে তার সাথে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ছেলেটি তার দায়িত্ব অস্বীকার করে না। কারণ তাহলে তাকে সামাজিকভাবে একঘরে করে দেয়ার এবং অন্য আরও বহু শাস্তির বিধান আছে। শুধু নাগারা নয়, বিশ্বের বহু স্থানে আদিবাসীদের মধ্যে এখনও এই ধরনের বিভিন্ন প্রথা চালু আছে। অথচ ইসলাম এই যুলুমকে নির্মূল করেছে। ইসলাম ঐ সময় নারীর নামাজ, রোজা ক্ষমা করে দিয়েছে। ইসলাম ঐ সময় নারীকে অস্পৃশ্য করে রাখেনি, ঐ অবস্থায় নারীর রান্না করার, খাবার, খাওয়াবার, দেখা ও স্পর্শ করার এমনকি স্বামীর সাথে সঙ্গমবিহীন শয়ন করার অধিকারও আছে।

হাদীস শরীফে আছে, নবীপত্নী হযরত মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, "আমি পুষ্পবতী অবস্থায় কিছু পানীয় পান করে তা আবার হুজুর (সাঃ)কে পান করিয়েছি। পাত্রে যেখানে মুখ রেখে আমি পান করেছি ঠিক সেই জায়গায় মুখ রেখেই হুজুর (সাঃ)ও তা পান করেছেন। আমি ঋতুমতী অবস্থায় আমার দাঁত দিয়ে হাড় থেকে গোশত বের করে খেয়ে ঐ হাড় আবার হুজুর (সাঃ)কে দিয়েছি। তিনি আমার মুখস্পর্শিত স্থানে মুখ লাগিয়ে গোশত ছিঁড়ে খেয়েছেন।" দেখুন না এমন প্রেমের নিদর্শন আর কোথায় পাওয়া যায়!

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা দু'টিও নারীরাই প্রথম জানতে পেরেছেন। ঘটনা দু'টি হলো হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি এবং

www.pathagar.com

নজীরবিহীন ও চাঞ্চল্যকর পবিত্র মিরাজ। নবুয়ত প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে ইসলামের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পবিত্র মিরাজের ঘটনার সাহায্যে আল্লাহতায়ালা তাঁর নিবিড়তম সান্নিধ্য প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে স্বীকৃতি দিয়েছেন আশরাফুল মখলুকাত হিসেবে। সেই সঙ্গে মুসলমানেরা পেয়েছে সালাতের মতো অনন্য সাধারণ স্তম্ভ। হিজরত, বদরের যুদ্ধ, মক্কা বিজয়– এ সবই অতীব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা দু'টি হচ্ছে নবুয়ত প্রাপ্তি ও মিরাজ। এ দু'টিই মানুষ জানতে পেরেছে নারীর মাধ্যমে। নবুয়তের কথা মানুষ প্রথম জানতে পারে হযরতের সহধর্মিনী বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর নিকট থেকে। অপরটি, মিরাজের কথাও জানতে পারে তাঁর ভগিনী এবং হযরত আলীর সহোদরা উম্মা হানীর মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, ইসলামের দীক্ষা গ্রহণকারী প্রথম মুসলমানও একজন নারী। ইসলাম নারীকে সত্যিকার অর্থেই স্বীকৃতি প্রদান করেছে তার চমকপ্রদ ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে।

আজ তথাকথিত নারী মুক্তির প্রবক্তারা কেট মিলেট (Kate Millet), জার্মেন গ্রীয়ার (Germain Greer) বা অ্যান নূরাকিন (Anne Nurakin)-এর কথা উল্লেখ করে থাকে। নারী জাগরণের কথা আলোচনা করতে গিয়ে মেরী উলস্টোন (Mary Wollstone), অ্যানি বেসান্ত (Annie Besant), মেরী প্যাঙ্কহার্স্ট (Mary Pankhurst), মার্গারেট স্যাংগার (Margaret Sanger), বেগম রোকেয়া, সুলতানা রাজিয়া, চাঁদ সুলতানা, জেবুন্নেসা প্রমুখ মহীয়সী মহিলাদের বিরামহীন সংগ্রামের ইতিহাস শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীর মর্যাদার জন্য যে ব্যক্তি প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন, নারীকে জীবন, সমাজ-সংসার ও জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে যে ব্যক্তি প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করেন, মানব জীবনে নারীর বৈধ অধিকার যে ব্যক্তি প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন, সত্যিকার অর্থে নারী জাগরণ ও নারী মুক্তির যিনি প্রবক্তা তিনি কোনো মহিলা নন। তিনি একজন পুরুষ– সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্তান আহম্মদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)।

মহানবী (সঃ) নারী জাতির উন্নয়নে যে এক বিরাট অবদান রেখেছেন তা আজ শুধু মুসলমানগণই শুধু স্বীকার করছে তা নয়, বরং বিভিন্ন অমুসলিম দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রখ্যাত মনীষীবৃন্দ এই ঐতিহাসিক সত্যের লিখিতভাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। কারণ তিনি এমন একটি নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন যা সর্বকালের, সর্বযুগের সকল মানুষের একমাত্র অনুসরণযোগ্য জীবনাদর্শ। তাই আজ আধুনিক বিশ্বে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে– "Go back to the ideology of Prophet Muhammad (Sm)."

বিভিন্ন অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে নারী জাতির উন্নয়নে মহানবী (সঃ)-এর অবদানের কিছু মূল্যায়ন নিম্নে প্রদত্ত হলো।

"Muhammad was probably the greatest champion of women's rights the world has ever seen. Islam conferred upon the Muslim wifeproperty rights and juridical status exactly the same as that of her husband. She is free to dispose of and manage her financial assets as she pleases without let or hin-

www.pathagar.com

drance from her husband."

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বস্‌ওয়ার্থ স্মীথ বলেন, "বর্বর শিশু হত্যা বন্ধের পর মহানবী (সঃ) নারী জাতির জন্য যে সর্বাধিক মঙ্গলজনক কাজটি করেন তা হলো পিতৃ-পুরুষ ও আত্মীয়-স্বজনের সম্পত্তিতে তাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা যা পূর্বে কল্পনাতীত ছিল।

দার্শনিক Felix তার প্রখ্যাত গ্রন্থ Spiritual Revolution in Islam গ্রন্থে কন্যা সন্তান জীবন্ত হত্যারোধের প্রশংসা করে বলেন, 'নৈতিক সংস্কারক হিসেবে তিনি আরবের এক প্রতিষ্ঠিত প্রথা যা অত্যন্ত অমানবিক, কন্যা হত্যা রোধ করেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক Smith তার লেখা "Muhammad and Muhammadanism" গ্রন্থে নারী জাতির উন্নয়নে মহানবী (সঃ) এর বিবাহের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নের প্রশংসা করে বলেন, "একজন পুরুষ যতজন খুশী ততজনকে বিয়ে করতো এবং বিবাহিত স্ত্রীদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিতো। মহানবী (সঃ) এ পদ্ধতি বন্ধ করে একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরী করেন, যা ছিল একান্ত প্রয়োজন।

J. G. R. Forlong তাঁর লেখা "Short Studies in the Science Comparative Religions" গ্রন্থে অবাধ বহু বিবাহ বন্ধের মাধ্যমে নারী জাতির উন্নয়নে মহানবীর প্রশংসা করে বলেন ঃ "মুহাম্মদ (সঃ) এর সমসাময়িক অনেক ইহুদী ও পৌত্তলিক ধনী লোকদের একাধিক বা বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। কিন্তু জিহোভা বা ঈশ্বর এ ব্যাপারে তখন কোন বিধি-নিষেধ করেনি। মুহাম্মদ (সঃ) প্রথমে তা করলেন। তিনিই প্রথমে কঠোর নিয়ম চালু করলেন যে, স্ত্রীলোকদের ন্যায্য হক আদায় করতে হবে এবং তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে হবে।

প্রখ্যাত মনীষী Leitner তাঁর Muhammadanism গ্রন্থে নারী জাতির উন্নয়নে মহানবী (সঃ) এর অবদানের প্রশংসা করে বলেন, "মুহাম্মদ নারী জাতিকে অন্যের সম্পত্তি হওয়া থেকে রক্ষা করে সম্পত্তির মালিক হবার অধিকার দিয়েছিলেন এবং তিনি নারীদেরকে প্রথমে আইনগত অধিকারী অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহাম্মদী আইনে নারী জাতির স্বার্থ তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামে একজন বিবাহিতা নারী বিবাহিতা ইংরেজ নারী অপেক্ষা অধিক আইনগত অধিকার ভোগ করে। সে জন্ম মৃত্যু বিয়ের সত্যতা যাচাইয়ের সাক্ষ্য দিতে পারে তা ফরাসী প্রজাতন্ত্রেও এ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি।

মনীষী "Forlong" নারী জাতির উন্নয়নে মহানবীর প্রশংসা করে বলেন ঃ "মহান আইন প্রবর্তক বিবাহকে একটি সামাজিক চুক্তি হিসেবে দেখেছেন দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে যা সম্পন্ন হতে পারে। নৈতিকতা বর্জিত ও দুর্ব্যবহারের কারণ দেখিয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতা একমাত্র তিনিই প্রদান করেছেন।"

ভুপালের বেগম মাতা মহানবী করীম (সঃ) উপস্থিত ইসলামের নারীর মর্যাদার প্রশংসা করে বলেন ঃ ইসলাম ধর্মীয়, সামাজিক ও বুদ্ধি বৃত্তির ক্ষেত্রে নারীদেরকে এক বিশেষ মর্যাদায় আসীন করেছেন যা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে কল্পনাও করা যেত না।

স্যার আচার্বান্ড হ্যাডিল্টন মহানবী (সঃ) নারী পুরুষের সাম্যের বিধানের প্রতি আশ্চর্য হয়ে বলেন, নর-নারী যে একই উৎস থেকে উদ্ভুত তাদের আত্মা যে একই প্রকারের এবং বুদ্ধি বৃত্তি, আধ্যাত্মিকতা ও চরিত্রের দিক থেকে যে উভয়ই সমান মহানবী

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম এ ঘোষণা দেন।

'মিঃ সরকার' তার "The Muhammadan Law" গ্রন্থে মহানবী (সঃ) বিবাহ নীতির প্রশংসা করে বলেন, ইসলামে একজন প্রাপ্ত বয়স্কা নারী স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে স্বাধীন। অভিভাবকদের জোর করে বিবাহ দেয়ার কোন এখতিয়ার নেই। কাউকে বিবাহ করা বা না করার ব্যাপারে প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর মতই চূড়ান্ত।

জর্জ বার্নাড'শ মহানবী (সঃ) এর নারী সমস্যাসহ সকল প্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করার প্রশংসা করে বলেন, "If a man like Muhammad were to assime the dectatorship of the modern world. He would succeed in solving its problems that would bring it the much needed peace and happiness" এমনকি তিনি আবেগ প্রবণ হয়ে বলেন ঃ বিশ্ববাসী তোমরা যদি নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে চাও এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর জীবন ব্যবস্থার আশা কর, তবে বিশ্বের নিয়ন্ত্রণভার মুহাম্মদ (সঃ) এর হাতে ছেড়ে দাও।

মাইকেল হার্ট বলেন, Muhammad (Sm) only man in history Who was supreamly succesful in both religion and seculer leaves.

জর্জ বার্নাড'শ মহানবী বিশ্বের সকল মানবতাবাদীদের শ্রেষ্ঠ ও মানব সমাজের সকল সমস্যা কাটিয়ে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানে বিস্মিত হয়ে বলে উঠেন, If all the world was united under one leader, than Muhammad would have been the best fitted man to lead the people of the various creeds, domas and ideas to peace and happiness.

মহানবী (সঃ) নারীদের উন্নয়নে তাদের সকল সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করে তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দিয়েছেন একমাত্র অভূতপূর্ব মর্যাদা। নারী সমাজের সকল সমস্যা সমাধানে মহানবী (সঃ) প্রদর্শিত পথই হচ্ছে একমাত্র অনুসরণ যোগ্য। একথা বুঝতে পেরেই প্রখ্যাত বৃটিশ লেখক জর্জ বার্নাড'শ বলেছেন ঃ A time Surely will come, sooner or later, when the world will be forced to admit that the only means to end all its trobles is to follow the perfect teachings and examples of the Holy Prophet (Sm).

সুতরাং "ত্বরায় হোক আর দেরীতেই হোক এমন একদিন আসবে, যখন সমগ্র বিশ্ববাসী স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, তার সকল সমস্যাবলী সমাধানের একমাত্র উপায় হলো মহানবী (সঃ) সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন কতই না যথার্থ। আজকে তাই আধুনিক সভ্যতায় নারী জাতির উন্নয়নে এবং তাদের সকল সমস্যাবলীর সমাধানের নিশ্চয়তা দিতে পারে একমাত্র মহানবী (সঃ) প্রদর্শিত জীবনাদর্শ, অন্য কোনো মতাদর্শ নয়।"

ইসলামে রয়েছে নারী ও পুরুষের ন্যায় সঙ্গত অধিকার ও মর্যাদা। হযরত (সাঃ) বিদায় হজ্জের অভিভাষণে নারীর প্রতি পুরুষের কর্তব্যে সম্পর্কিত বাণীর কথাও উল্লেখ করা যায় ঃ

"নারীদের সম্বন্ধে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি। উহাদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করার সময় আল্লাহ্‌র দন্ড হতে নির্ভয় হবে না। নিশ্চয় তোমরা তাদিগকে

www.pathagar.com

আল্লাহ্র জমিনে গ্রহণ করেছ এবং তারই বাক্যে তাদের সাথে তোমাদের দাম্পত্য স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিশ্চয়ই জানিও তোমাদের সহধর্মিনীগণের উপর তোমাদের যেমন দাবী-দাওয়া ও স্বত্বাধিকার আছে, তোমাদের উপরও তাদিগের সেরূপ দাবী দাওয়া ও স্বত্বাধিকার আছে। পরস্পর পরস্পরকে নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করবে। স্মরণ রেখ এই অবলাদিগের একমাত্র বল তোমরাই, এই নিঃসহায়দিগের একমাত্র সহায় তোমরাই।

রাসূল (সঃ)-এর বিদায় হজ্জের উক্ত বানী আমাদের বর্তমান সমাজের নারীর প্রতি পুরুষের অধিকার, পুরুষের প্রতি নারীর অধিকার সম্পর্কে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেছে। এ ছাড়া আমাদের পারিবারিক জীবনেও রাসূল (সঃ) এর উক্ত বাণী বিশেষ ইঙ্গিত বহন করেছে। পারিবারিক জীবনে ইসলাম পুরুষকে পরিবারের কর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেছে। ঘরের শৃঙ্খলা রক্ষা করার সমস্ত দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পণ করা হয়েছে। স্ত্রীকে স্বামীর এবং সন্তানকে পিতামাতা উভয়েরই আনুগত্য করবার জন্য আদেশ করা হয়েছে। যে পরিবারে কোন শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা নেই এবং ঘরের লোকদের চরিত্র ও কাজ কারবার সুস্থ রাখবার জন্য দায়িত্বশীল কেউই নেই, ইসলাম এই ধরনের শিথিল পারিবারিক ব্যবস্থা মোটেও পছন্দ করে না। ইসলাম এই দায়িত্ব পালন করার জন্য পরিবারের পিতাকেই স্বাভাবিক কর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

ইসলাম মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশতের স্থান নির্দেশ করেছে। এ গৌরবময় অধিকার পিতা, পীর-পয়গম্বরকে দেয়নি। এ একা শুধু মাকে দিয়েছে। মহানবী বলেছেন, আল্লাহর কাছে সেই বান্দা ভালো, যে তার স্ত্রীর বিবেচনায় ভালো। কোন নর কতোখানি ভালো তার সনদ দেয়ার অধিকার কোন মৌলবী, মওলানা, ওলী-দরবেশের নেই। এমনকি স্বয়ং রাসূল (সাঃ)কেও দেয়া হয়নি। দিয়েছেন নারীকে। এর চেয়ে নারীর অধিকার ও সম্মান আর কি হতে পারে?

ইসলামের সোনালী অতীতে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

চরম ইসলাম বিদ্বেষীরা অপপ্রচার করছে 'ইসলাম নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধক'। কিন্তু আমরা জানি প্রথম মহাযুদ্ধে পুরুষ নাগরিকের বেশুমার প্রাণহানির ফলে নারীকে অর্থ উপার্জন ও শিক্ষা লাভের সুযোগ দানে বাধ্য হয়েছিল ইউরোপ। অথচ নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে আজ থেকে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বেই আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে জ্ঞান চর্চাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) কে শিশু শিক্ষার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি শিশুকে তার জন্মের আঠারো বছর পূর্ব হতে শিক্ষা দেবার উপদেশ দেন। তা কি করে সম্ভব? বিস্ময়ের সাথে পুনঃজিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেন 'তার মাকে শিক্ষিতা করে তোল'।

দ্বীন ও পার্থিব শিক্ষা লাভ করার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেয়া হয়নি বরং পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রূপ প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বাণী প্রদান করেন ঃ "প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।" (ইবনে মাজাহ) তিনি ক্রীতদাসীদেরকেও

www.pathagar.com

শিক্ষার সুযোগ দিতে আদেশ করেছেন।

উপমহাদেশে প্রথম মহিলা সম্রাজ্ঞী সুলতানা রাজিয়া

নবী করীম (সাঃ) থেকে পুরুষগণ যেমন দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করতো, নারীগণও তদ্রূপ করতো। নারীদের জন্য সময় নির্ধারিত করা হতো এবং সেই সময়ে তারা নবীর (সাঃ) নিকট থেকে শিক্ষা লাভের জন্য উপস্থিত হতো। মহানবী (সাঃ) তাঁর স্ত্রী হাফসা বিনতে উমরকে লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার জন্য শেফা বিনতে আব্দুল্লাহকে নিযুক্ত করেছিলেন।

ইসলাম নারীকে চিকিৎসা শাস্ত্র, আইনসহ অন্য যে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে বাধা দেয় না। তবে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই তা পর্দার গন্ডিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইসলামী যুগেও নারীরা শিক্ষিতা ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) ছিলেন ইসলামী আইনবিদ। উম্মে ছালমা (রাঃ) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের অভিজ্ঞদের মধ্যে ১১তম স্থানাধিকারী। এছাড়াও শিক্ষিত সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন উম্মে হাবীবা, হযরত হাফসা, আসমা বিনতে আবু বকর, হযরত মায়মুনা, উম্মে হানী (রাঃ) প্রমুখ।

সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল

ইসলামের প্রথম যুগ থেকে আরম্ভ করে আব্বাস বংশীয় নরপতিগণের শেষ সময় পর্যন্ত যে গৌরবময় যুগের বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে তাতে দেখা যায়, সে সময়ে নারী জাতি বিংশ শতাব্দীর ন্যায় শিক্ষা, স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন।

শাসনকর্তা ফারুকের স্ত্রী হোমেদা সুশিক্ষিত রমণী ছিলেন। তাঁর স্বামী

www.pathagar.com

খোরাসানে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সে সময়ে বিদূষী হোমেদা স্বীয় পুত্রকে নিজ শিক্ষাধীনে রেখে নানা বিষয়ে পারদর্শী করে তুলেছিলেন। এমনকি পুত্র অন্যান্য বিষয়ের মতো মাতার নিকট আইন শাস্ত্রও অধ্যয়ন করতেন এবং পরে একজন বিখ্যাত বিধি-ব্যবস্থাদাতার পদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

সম্রাট আসাদ্‌উদ্দৌলার স্ত্রী সুশিক্ষিতা ও পরম বিদ্যোৎসাহিনী ছিলেন। তিনি কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও দীনাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। মালিক আশরফের সুযোগ্য কন্যা, 'বিদূষী খাতুন' দামেস্কে একটি উচ্চাংগের কলেজ স্থাপন করেছিলেন। হেমস্-এর শাসনকর্তা নাসিরউদ্দৌল্লার স্ত্রী জামরুদ খাতুনও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কবিতা রচনায়ও অনেক মোসলেম রমণী বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। সে সময়ে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলাগণও হাট-বাজার করবার জন্য বাইরে যেতেন, অতিথি-সৎকার করতেন, দেশ-হিতকর সর্বপ্রকার কাজে রীতিমতো যোগদান করতেন। এমনকি প্রয়োজন হলে স্বদেশ রক্ষার জন্য যোদ্ধাবেশ ধারণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতেন। প্রবল বিক্রমে শত্রু নিপাত করতেন। তাঁরা স্পার্টানদের মাতৃকূলের মতো রণ-পলাতক সৈনিককে যথোচিত ভৎর্সনা করে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করতেন।

মহাবীর খাওলার নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। রোমকগণের সাথে কোনো এক যুদ্ধে তাঁর ভ্রাতা নিহত হন। তিনি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্য কোমল হস্তে অসি ধারণ করে পুরুষের বেশে যুদ্ধ করেছিলেন।

পরবর্তী খলিফাগণ প্রকাশ্য দরবারে যে সকল বক্তৃতা প্রদান করতেন তা শুনবার জন্য দলে দলে মহিলারা তথায় উপস্থিত হতেন। অপেক্ষাকৃত উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাগণ স্বদেশের সৈন্যগণকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করবার জন্য প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা প্রদান করতেন। মহিলাদের তেজদীপ্ত বক্তৃতা শ্রবণ করে দুর্বলের প্রাণেও তড়িৎ প্রবাহ খেলে যেতো। হতাশ সৈনিকগণও চতুর্গুণ সাহসে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতো।

সে যুগে নারীদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ ছিল। পিতা ও স্বামী আপন আপন কন্যা ও স্ত্রীর জন্য সমাজের সর্বত্র গর্ব প্রকাশ করতেন। এমনকি অনেক পিতা কন্যার নাম অনুসারে নিজের পরিচয় প্রদান করতেন। যেমন আবু সাফ্‌রা (সাফ্‌রার পিতা), আবু লায়লা (লায়লার পিতা) ইত্যাদি।

খলিফা ওয়ালিদের স্ত্রীর নাম উম্মোল ওয়ালিন; তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ওমরের ভগ্নী। তিনি সেই যুগের একজন বিখ্যাত বিদূষী রমণী ছিলেন। তাঁর আধিপত্য অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি তাঁর স্বামী খলিফার উপর স্বীয় প্রভাব সর্বদাই প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য প্রযুক্ত করতেন। হাজ্জাজ নামক জনৈক অত্যাচারী শাসনকর্তা একবার খলিফা ওয়ালিদকে স্বীয় স্ত্রীর প্রভাব হতে মুক্ত হতে বলেছিলেন। খলিফার স্ত্রী উম্মোল ওয়ালিন এ কথা শুনে হাজ্জাজকে কাছে ডেকে পাঠালেন। হাজ্জাজ উপস্থিত হলে তিনি তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলেন এবং অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে তাঁর অত্যাচারের জন্য তাঁকে চরম তিরস্কারের পর তেজপূর্ণ উপদেশ দিয়ে বিদায় করলেন।

উম্মীয়া বংশের ন্যায় আব্বাস বংশীয়দের আমলেও স্ত্রীজাতির অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই অগ্রসর হয়েছিল। খলিফা মনসুরের সময় আমরা দু'জন রাজকুমারীর

www.pathagar.com

পরিচয় পাই। তাঁরা রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে বর্ম পরিধান করেন এবং বাইজাইটান যুদ্ধে যোগদান করে অশেষ বীরত্ব দেখিয়েছিলেন।

হারুন-অর-রশীদের আমলে অনেক সম্ভ্রান্ত আরব মহিলা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে যুদ্ধে গমন করেছিলেন। তাঁদের অনেকে আবার সৈন্য পরিচালনা করতেন।

খলিফা মুক্তাদিরের মাতা তৎকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আপীল আদালতের সভাপতিত্ব করতেন, তিনি সকলের আবেদন-নিবেদন শ্রবণ করতেন, সম্মানিত বৈদেশিক দূতগণের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। সে যুগে মহিলারা সর্বত্র অবাধে যাতায়াত করতেন, পরস্পর মেলামেশা করতেন। বিদ্যালোচনা ও শিক্ষাদান করতেন, প্রকাশ্য সভায় সুমধুর স্বরে কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করতেন। ফলতঃ তাঁরা সমাজের প্রত্যেক গঠনমূলক সৃজনশীল কাজে লিপ্ত থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনে তৎপর হতেন।

হারুন-অর-রশীদের মহিষী জোবেদার নাম ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বামীর ন্যায় বিদ্যা চর্চায় উৎসাহ দিয়ে স্বয়ং জ্ঞানালোচনা করে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি প্রতিভাশালিনী কবি ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে যেসব কবিত্বপূর্ণ বিবরণ লিখতেন, তা ইতিহাসের এক উপাদেয় বিষয়। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর গায়িকা ছিলেন এবং সুন্দর বাদ্য বাজাতে পারতেন।

খলিফা মতওয়াক্কিলের সময় ফজল নাম্নী একজন কবির আবির্ভাব হয়। তিনি বহুকাল রাজদরবারে রাজকবি রূপে অবস্থিত ছিলেন। তাঁর কবিতা পূর্বকালীন সু-কবিদের মতোই সমাদৃত হতো।

বিদূষী শোহাদা বাগদাদে প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা দিতেন। তাঁর হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিলো। জয়নাব নামে তার একজন নারী-ব্যবস্থাদাত্রীর নাম পাওয়া যায়। তিনি দ্বাদশ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভে বাস করতেন। তিনি সে যুগের আইনজ্ঞদের নিকট থেকে উপাধি ও পদক লাভ করেছিলেন।

সুলতান সালাউদ্দীনের সময় তাকে্হ নাম্নী একজন বিখ্যাত রমণীর সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি হাদীস সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করতেন। তিনি একজন কবি ছিলেন। সে যুগের নারী-জাতির বিস্তৃত বিবরণ আমীর ওমায়ার পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

যে সমস্ত মুসলমানগণ অন্ধ তমসাচ্ছন্ন স্পেন দেশে জ্ঞানালোকে বিস্তার করে স্পেনবাসীগণকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে পরিচালিত করছিলেন সে সমস্ত বিদূষী মুসলিম রমণী ও পুরুষদের সাথে মিলিত হয়ে জ্ঞানালোক বিস্তারে সাহায্য করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে স্পেনের নারী শিক্ষা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। সেখানে কতকগুলো নারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে বহু মুসলমান ও অমুসলমান নারী শিক্ষা লাভ করতেন। স্পেনের কিছু সংখ্যক মহান নারীর জীবন-কথা আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। নাজহুন নাম্নী একজন বিদূষী মহিলা বাগ্মীতায় প্রসিদ্ধ লাভ করেছিলেন। তিনি একাধারে কবি ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষভাগে আবির্ভূত হন। জয়নাব, কালায়াহ্, হাফ্জা প্রমুখ বিদূষী রমণী স্পেনের ইতিহাস উজ্জ্বল করে রেখেছেন। জয়নাব ও তাঁর সহোদরা হাম্দা এক পুস্তক বিক্রেতার কন্যা ছিলেন। তাঁরা গ্রানাডার নিকটবর্তী ওয়াদি আলহামা নামক স্থানে বাস করতেন।

www.pathagar.com

উভয় ভগ্নীই উচ্চ শ্রেণীর কবি ও বিজ্ঞান-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁদের গুণবেত্তার পরিচয় পেয়ে অনেক কবি-লেখক তাঁদের কাছে এসে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। তাঁরা স্ত্রীলোক হলেও জ্ঞানী পুরুষদের সাথে আলাপ-পরিচয় করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

সেভিল নিবাসিনী সুফিয়া নাম্নী আর একজন নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। বাগ্মীতা কাব্য-প্রতিভা ও সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। অনেকে তাঁর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করতেন। মারিয়া নাম্নী একজন মহিলা কবি কবিতা লিখে বিশেষ যশ অর্জন করেছিলেন। খৃস্টপূর্ব ৪৭০ সালে গ্রীস দেশে কারিনা গ্রামে একজন বিখ্যাত মহিলা কবি ছিলেন। লোকে মারিয়াকে সেই কারিনার সমকক্ষ কবি বলে উল্লেখ করতো। কেউ কেউ তাঁকে স্পেনের কারিনা বলতো।

কর্ডোভার বিখ্যাত কবি আবুল হাসানের কন্যাদ্বয়- হাসানা-আল-ইয়াতিমা এবং উম্মে আলউলা ৬ষ্ঠ হিজরীতে খ্যাতনামা বিদূষী রমণী ছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধর আশ-শারিফাও বিখ্যাত লেখিকা ছিলেন। আল-গুছানিয়া নামের আর একজন লেখিকা সে যুগের বিদ্বান ব্যক্তিদের সমকক্ষতা লাভ করেছিলেন। কর্ডোভার আরো কয়েকজন বিখ্যাত নারীর নাম ঃ আল-আয়ারুজিয়া (ইনি ব্যাকরণ ও অলংকারের জন্য বিখ্যাত), হাফ্সা আর-রুকুনিয়া, হাফ্র্জা, জয়নাব আল-মুয়ারিয়া, মরিয়ম, আসমা আল-আমারিয়া, উম্মে আলহিমা এবং বাহাজাও। এঁদের মধ্যে কেউ কবি, কেউ ব্যবস্থাদাত্রী, কেউ দার্শনিক আবার কেউ বাগ্মী ছিলেন। সেভিলের শেষ সুলতান মুতাসিদের স্ত্রী ও কন্যা উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন।

মোঘল আমলে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

ভারতে মুসলমান রাজত্বকালে অনেক বিদূষী মুসলিম মহিলার পরিচয় পাওয়া যায়। আজ থেকে একশ' বছর আগে এই উপমহাদেশে অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর কোনো অধিকারই ছিলো না। সেখানে ৭৪০ বছর পূর্বে সুলতানা রাজিয়া নাম্নী এক মুসলিম মহিলা সিংহাসনের অধিকারী হয়েছিলেন। যা ছিল তৎকালীন বিশ্বের বিস্ময়। দাশ বংশেরই বীরাঙ্গনা সুলতানা রাজিয়া উপমহাদেশের প্রথম মহিলা সম্রাজ্ঞী। কুতুবউদ্দিনের পরপরই তিনি ক্ষমতাসীন হন। তিনি ছিলেন ক্রীতদাস পরিবারের সদস্য। তাছাড়া তিনি ছিলেন মহিলা। আর তিনিই হয়েছিলেন সম্রাজ্ঞী। অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যেও চার বছর অর্থাৎ ১২৩৬-১২৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজিয়া অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন।

এর অর্ধ শতাব্দী পর সম্রাট জালালউদ্দিনের স্ত্রী এবং আলাউদ্দিনের শাশুড়ী মালিকা-ই-জাহান রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। মুহম্মদ বিন তুঘলক অবশ্য এ বিষয়ে উদার ছিলেন এবং রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে তাঁর মায়ের সাথে পরামর্শ করতেন।

তুর্কি ও লোদী সুলতানেরা পর্দা প্রথা অনুসরণ করলেও মেয়েদের শিক্ষাদানের বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। মুসলমান বিধবা মহিলারা মেয়েদের কোরান শিক্ষা দিতেন।

www.pathagar.com

অভিজাত তুর্ক মোঙ্গল মহিলা অনেকটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতেন। এ সমাজে বিধবার একটি বিশেষ স্থান ছিলো। অনেক সময় স্বামীর মৃত্যুর পর গোত্রের নেতৃত্ব অথবা নাবালক পুত্রের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতেন তুর্ক মোঙ্গল মা।

তৈমুর ও চেঙ্গিস পরিবারের রমণীরা পুরুষের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন এবং আহত যোদ্ধাদের সেবা করা ছাড়াও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। বাবরও চেঙ্গিস তৈমুরের ঐতিহ্য অনুসরণ করে পরিবারের মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছিলেন।

বাবর ভারতবর্ষের সম্রাট হওয়ার পর মাহিম বেগমই প্রথম সম্রাজ্ঞী যিনি সিংহাসনে সম্রাটের পাশে বসার সম্মান লাভ করেছিলেন। মোঘল আমলে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ছিলো উল্লেখযোগ্য। সম্রাট হুমায়ুনের মহিয়সী ও সম্রাট আকবরের মতো সম্রাজ্ঞী হামিদা বানু, সম্রাট জাহাঙ্গীরের মাতা সম্রাজ্ঞী মরয়ম-উজ-জামানী ও তাঁর মহিয়সী সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, সম্রাট শাহ্জাহানের মহিয়সী সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল ও কন্যা জাহানারা বেগম রাজনীতিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখেছেন যা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ইতিহাসে বিরল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন নূরজাহান বেগম, যাকে তিনি ১৬১১

সম্রাজ্ঞী নূরজাহান

জাহানারা

www.pathagar.com

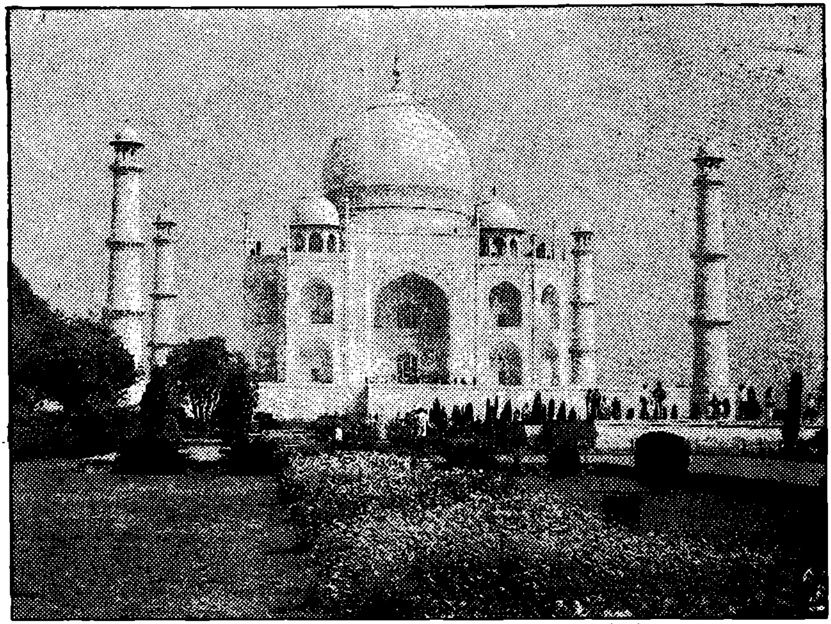

*"এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে
শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল।"*
মুসলিম শাসক সম্রাট শাহজাহান তার প্রিয়তম স্ত্রীর পবিত্র ভালোবাসার নিদর্শন হিসাবে তৈরী বিশ্বের বিস্ময় এই তাজমহল। যা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ইতিহাসে এর নজির নেই।

খ্রীস্টাব্দে বিবাহ করেন। অপরূপ রূপসী নূরজাহান ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণ মহিলা। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের সার্বক্ষণিক পরামর্শদাত্রী ছিলেন। জাহাঙ্গীরের স্বর্ণ মুদ্রায় সম্রাটের নামের সাথে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের নামও অঙ্কিত হয়। মোগল সম্রাট শাহজাহান তাঁর প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ মহলকে ভালোবেসে যে স্মৃতিসৌধ তাজমহল গড়ে তুলেছেন তা বিশ্বের বুকে একজন নারীর প্রতি একজন মুসলিম শাসনের পবিত্র ভালোবাসার প্রতীক হয়ে আছে।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যা জেব-উন্নিসার নাম বিশ্ববিখ্যাত। তিনি অশেষ প্রতিভা সম্পন্ন কবি ছিলেন। তাঁর সুমধুর কবিতায় মুগ্ধ হয়ে লোকে তাঁকে 'তুতিয়ে হিন্দ' উপাধি দিয়েছিল। সে আমলের বহু বিদূষী রমণী ও বীরঙ্গনার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায়।

ষোলশ' শতাব্দীর কোন এক সময়ের ঘটনা। পারস্য সম্রাট স্বপ্নে কবিতার একটি চরণ মুখস্থ করলেন। কবিতার চরণটি হলো "দূররে আবলাককাসে কমদিদাম মওজুদ।" অর্থাৎ "সাদা কালোয় মেশানো রঙ্গের মোতির প্রত্যক্ষদর্শী বিরল।" তিনি তাঁর রাজ্যের সমস্ত কবি-সাহিত্যিককে আহবান জানালেন স্বপ্নে পাওয়া ঐ কবিতার চরণটির সাথে সঙ্গতি রেখে- অর্থ, ছন্দ, তাৎপর্য সমমানসম্পন্ন আর একটি চরণ লিখে দরবারে পেশ

www.pathagar.com

ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের স্ত্রী

করার জন্য। অনেক কবি-সাহিত্যিক লিখলেন। কিন্তু সেগুলো সম্রাটের মনঃপুত হলো না। এখন অনেকের পরামর্শ মত সম্রাট কবিতার লাইনটি হিন্দুস্তানের কবিদের জন্য দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। মোঘল দরবারের সকল কবি যখন কবিতাটি নিয়ে চিন্তিত, তখন অন্তপুরের সম্রাট দূহিতা কবি জেব-উন-নিসা কবিতাটির চরণে একবার চোখ বুলিয়েই দ্বিতীয় ছত্র লিখলেন ঃ

"মাগার আশকে বুতানে সুরমা আলুদ।" অর্থাৎ সুরমা মাখা আঁখির বিন্দুতে ঐ মোতির প্রাচুর্য।"

কবিতাটি পারস্য সম্রাটের কাছে পৌছালে সম্রাটসহ দরবারের সকল জ্ঞানী-গুণী আনন্দে 'মারহাবা' বলে ওঠেন। তাঁরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে হিন্দুস্থানী বিদূষী কবির যশকীর্তন করেন এবং সেই সঙ্গে সম্রাটকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন ঐ মহান নারীকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য পারস্যে আমন্ত্রণ জানান। সম্রাট সে যুগের বিখ্যাত কবিদের সাহায্যে রচিত এক আমন্ত্রণলিপি দিল্লীতে পাঠালেন। লিপিতে লেখা ছিলো-

"তুর এ্যায় মহ্জেবী বে পরদা দিদান, আরজু দাবামা।" অর্থ হল "হে চাঁদ শ্রেষ্ঠা সুন্দরী, আমাদের ব্যবধান দূরীভূত হোক, পর্দার বাইরে আপনার দর্শনের আশা নিতে যেতে চাই।"

উত্তরে বিদূষী জেব-উন-নিসা পারস্য সম্রাটকে লিখলেন ঃ

"বুয়ে গুলদার বারগে গুলপুশিদাহ্, আম দরশোখন বিনাদ মোরা।" অর্থাৎ "ফুলের সৌরভের মত ফুলেই আমি লুকিয়ে আছি, আমায় যদি কেউ দেখতে চায়, সে দেখুক আমার লেখায়।"

এই পর্দানশীল, মেধাবী, মহিয়সী ললনাশ্রী দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যা জেব-উন-নিসা সারাজীবন কুমারীব্রত পালন করে, কঠোর সাধনায় কাব্যচর্চা ও গবেষণাকর্ম চালিয়ে গেছেন। কোরআন শরীফ কণ্ঠস্থকারিনী হাফেজা, অনন্য-সাধারণ পান্ডিত্যের অধিকারিণী, প্রতিভাবতী, চরিত্রবতী, গুণবতী জেব-উন-নিসার বিয়ে হলে অধ্যয়ন, গবেষণা, কাব্যচর্চা ক্ষুণ্ন হবে ভেবে তিনি বিয়ে করেননি। চিরজীবন কুমারী থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী এ পুণ্যশীলা রমণী যিনি দূর থেকে ছড়িয়ে দেয়া কাব্য সৌরভে ভারতের কাব্য গগণকে বিমোহিত করেছিলেন, এই পুণ্যবতী রমণী।

www.pathagar.com

মুসলিম শাসনামলে আর্থিক সঙ্গতি, উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে বিবাহের ফলে সমাজে মুসলমান মেয়েরা তাদের প্রতিপক্ষ হিন্দু মেয়েদের ন্যায় অতোটা অসহায় ও পুরুষের উপর নির্ভরশীলা ছিলো না। আফগানদের বিপর্যয়ের পর, মুহম্মদ আমিনের স্ত্রী তদীয় স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে অস্বীকার করেন, যেহেতু তিনি (স্বামী) তাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। তিনি ফকিরনীর বেশ ধারণ করে ধর্মীয় কাজে মনোনিবেশ করেন। ধার্মিকা ও প্রতিভাময়ী মহিলা জিন্নাতুন্নেছা এরূপ তেজস্বিনী ছিলেন যে, তিনি তার স্বামী উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্তা শুজাউদ্দিনের অত্যাধিক রমণী আসক্তির স্পৃহা সহ্য করতে না পেরে তার সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে অস্বীকার করেন। তিনি পৃথকভাবে মুর্শিদাবাদে বাস করতেন এবং তার স্বামী থাকতেন উড়িষ্যায়। আর একজন তেজস্বিনী মহিলা দারদানা বেগম। ইনি ছিলেন নবাব শুজাউদ্দিনের কন্যা এবং সরফরাজ খানের অধীনে উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খানের স্ত্রী। প্রদেশের লোকেরা তাকে খুবই শ্রদ্ধা করতো। আলিবর্দী খান সরফরাজ খানের 'মসনদ' দখল করলে, দারদানা বেগম তদীয় ভ্রাতা সরফরাজ খানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে ও 'মসনদ' পুনরুদ্ধারের জন্যে স্বামীকে উত্তেজিত করতে থাকেন। দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী খান আলিবর্দী খানের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইতস্তত করেন। এই তেজস্বিনী মহিলা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, যদি তার স্বামী নিজের ক্ষমতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি তার মতো একজন ভীরু স্বামীকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবেন এবং তিনি তার সমুদয় ধনসম্পদ ও উড়িষ্যা প্রদেশ মীর্জা বাকির খানকে প্রদান করবেন। স্বামী স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের নিকট হার মানতে হয়েছিল এবং তিনি নবাব আলিবর্দীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারেও মুসলমান নারীদের স্বাধীনতা ছিলো। এটা জানা যায় যে, হুমায়ুন হামিদা বানুকে বিয়ে করার বাসনা প্রকাশ করেন। উত্তরে হামিদা বানু জানালেন যে, একজন সম্রাট বা অন্য যে কোন অত্যধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বিয়ে করতে তিনি নারাজ। তিনি বলেন, "আমি বরং এমন লোককে বিয়ে করব যার কণ্ঠদেশ আমি ধরতে পারব, কিন্তু এমন লোককে নয় যার পায়ের কাছেও আমি পৌঁছতে পারব না।" তার মতে, একই পর্যায়ের নারী পুরুষের মধ্যে বিয়ে হওয়া উচিত। সে যুগের সাহিত্যেও একথার প্রতিধ্বনি মেলে। একটি বাংলা গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মল্লিকা নামে একজন সুশিক্ষিতা মহিলা ঘোষণা করেন যে, তিনি এমন এক ব্যক্তিকে বিয়ে করবেন যিনি তাকে তর্কে পরাস্ত করতে পারবেন। বহু বিদ্বান লোক আসেন এবং তার সঙ্গে সাহিত্যিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু প্রতিযোগিতায় সকলেই তার নিকট হেরে যান। অবশেষে ইউসুফ গদা নামক বিদ্বান ব্যক্তি তার সঙ্গে সাহিত্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে জয়লাভ করেন। এরপর বিজয়িকে মল্লিকা স্বামীরূপে বরণ করেন।

নারীদের জন্য পর্দা বা আব্রু প্রথা সমাজে আভিজাত্য ও সামাজিক শালীনতা বলে গণ্য করা হতো। সে যুগের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় নারীদের মুখে ও মাথায় আবরণহীন অবস্থায় বের হওয়া অসম্মানজনক বিবেচনা করতো। পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় পর্যটক বারবোসা বাঙ্গালা শহরে মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে বলেন যে, উচ্চশ্রেণীর লোকেরা তাদের নারীদেরকে অন্দর মহলে আটক অবস্থায় রেখেছিল।

www.pathagar.com

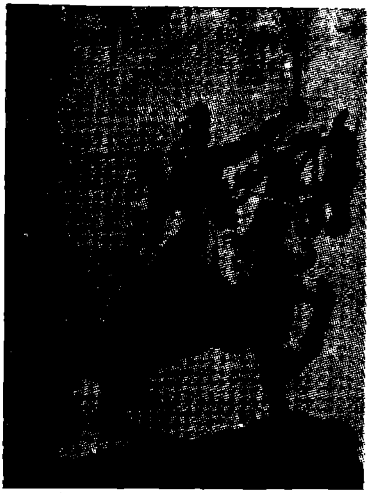

ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাঈ

মেয়েদের উল্লেখ করে তিনি আরো লিখেছেন যে, তারা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিতা এবং স্বর্ণখচিত রেশমি কাপড় এবং হিরা বসানো স্বর্ণ অলংকারে ভূষিতা। অষ্টাদশ শতকে, ইংরেজ লেখক ভেরেলস্ট লিখেছেন, "নারীদেরকে অবরোধ অবস্থায় রাখা এরূপ একটি আইন, যা অপরিবর্তনীয়। সমগ্র ভারতব্যাপী এই রীতি প্রচলিত ছিলো এবং এটা লোকদের ধর্ম ও শিষ্টাচারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলো। স্ত্রীর বে-আব্রু হওয়া হিন্দু-মুসলমান উভয়ের চোখেই অমর্যাদাজনক ছিলো। উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে পর্দা ও অবগুণ্ঠন প্রচলিত ছিলো। গোলাম হোসেনের মতে, নবাব আলিবর্দী তার বেগমের নিকট পূর্বে খবর না দিয়ে কখনও জেনানা মহলে প্রবেশ করেননি, পাছে সে সময়ে অন্যান্য মহিলারা উপস্থিত থাকেন। তিনি আরো লিখেছেন যে, নবাব আলিবর্দী, প্রাসাদে আশ্রিত আফগান মহিলাদের সম্মানার্থে অন্দরমহলে প্রবেশের পূর্বে সব সময় সংবাদ পাঠাতেন। আফগান মহিলারা যতদিন পর্যন্ত হারেমে বসবাস করেছেন, ততদিন তিনি প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাহকেও পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে তার মাতামহীর সঙ্গে দেখা করতে বারণ করে দিয়েছিলেন। এই সঙ্গে তৎকালীন সমাজে পর্দা প্রথার অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে। হিন্দু সমাজে নারীদের অবগুণ্ঠন হীনতা চরম অপমানজনক ব্যাপার ছিলো। হিন্দু. কবিদের বর্ণনায় এই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। এ ধরনের মনোভাব প্রকাশ করে, রামপ্রসাদ লিখেছেন, "আমাদের সমাজে এটা কেমন ব্যাপার যে, একজন তরুণী অবগুণ্ঠনহীনা।"

নারীদের পর্দা সম্বন্ধে ইউরোপীয় লেখকদের উল্লেখ থেকে এই ধারণা হয় যে, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের রমণীরা গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ছিলো। এই অভিমত প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। বারবোসা একদিকে মুসলমান রমণীদের অবরোধের কথা বলেছেন, আবার তিনি তাদের সৌন্দর্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। মুসলমান মহিলারা যদি সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ থাকতেন, তাহলে কিভাবে এই সমস্ত বিদেশীরা তাদেরকে দেখতে পান এবং তাদের সৌন্দর্য ও পোশাক-আশাকের বিষয় জানতে পারেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় অনেক মহিলা পুরুষদের সঙ্গে সাহিত্য-জ্ঞানে প্রতিযোগিতা করেন। মুসলমান রমণীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীদের সহগমন করেছেন। আমরা জানি যে, দারাশিকোর কন্যা ও যুবরাজ মুহম্মদ আজমের স্ত্রী জাহানজেব বানু বেগম মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। শরফুন্নেসা বেগম মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে নবাব আলিবর্দীর সহগমন করেন। গউস খানের বিধবা স্ত্রী একদল মারাঠা লুণ্ঠনকারীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভাগলপুরে তার গৃহ রক্ষা করেন। মহিলারা বিবাহ

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানাদিতে শোভাযাত্রায়ও যেতেন। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে, মুসলমান নারীরা গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তারা গৃহের বাইরেও যেতে পারতেন। কিন্তু তাদের পর্দা পালন করতে হতো এবং গৃহের বাইরে চলতে অবগুণ্ঠন ব্যবহার করতে হতো। পর্দান্তরালে বসবাস করলেও মুসলমান রমণীরা সমাজে যথেষ্ট সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। মুগল সমাজের রমণীগণ, তাদের পূর্ববর্তী ভগ্নীদের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। গুলবদন বেগম থেকে জানা যায় যে, হুমায়ুনের রাজকীয় হারেমের মহিলাগণ তাদের পুরুষ বন্ধু দর্শনার্থীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন। তারা সময় সময় পুরুষের বেশে বাইরে যেতেন, পোলো খেলতেন এবং সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করতেন। তারা তীর ধনুক ব্যবহারে ও অন্যান্য বাস্তবধর্মী বিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। আলেকজান্ডার ডোউ লিখেছেন ঃ "ভারতে নারীরা এত পবিত্র যে এমনকি সাধারণ সৈন্যরাও হত্যা এবং ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে মেয়েদেরকে কোনরূপ আঘাত করা থেকে বিরত থাকে। বিজয়ীর সমস্ত রকম উল্লাস স্বেচ্ছাচারিতা থেকে হারেম ছিলো নিষিদ্ধ এলাকা ও পবিত্র স্থান; এবং দুর্বৃত্তরা স্বামীর রক্তস্নাত হয়েও, স্ত্রীদের পবিত্র অন্দরমহল থেকে দ্বিধাভরে সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে এসেছে।

সমসাময়িক ইতিহাস লেখকদের অভিমত এই যে, দারদানা বেগমকে প্রদেশের লোকেরা তার স্বামী অপেক্ষাও অধিক শ্রদ্ধা করতো। নফিসা বেগম ছিলেন আর একজন সংস্কৃতি সম্পন্ন মহিলা, তিনি লোকের সম্মান লাভ করেন। তিনি ছিলেন নবাব শুজাউদ্দিনের কন্যা এবং সরফরাজ খানের ভগ্নী। আলিবর্দী খান যুদ্ধে তার (নফিসার) ভ্রাতাকে নিহত করে তার সিংহাসন দখল করেছেন, তবুও নফিসা বেগমের প্রতি নবাব আলিবর্দীর খুব শ্রদ্ধা ছিলো। যা ঘটে গেছে তার জন্য আলিবর্দী তার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং তাকে আশ্বাস দান করেন যে, তিনি তাকে সর্বদা সম্মান করবেন এবং তার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ও অনুগত থাকবেন। নবাব আলিবর্দীর জামাতা নওয়াজিশ মুহম্মদ খান নফিসা বেগম ও তার অধীনস্থ লোকজন এবং সরফরাজ খানের পুত্র সন্তানকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসেন এবং তিনি তাকে মাতৃরূপে সম্মান করেন; নফিসাও তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। নওয়াজিশ মুহম্মদ খান তাকে তার গৃহসংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বসময় কর্তৃত্ব প্রদান করেন। গোলাম হোসেন বলেন, "আশ্চর্য ব্যাপার হলো এই যে, এটা সত্ত্বেও তার (নওয়াজিশ খানের) সম্মুখে তিনি (নফিসা বেগম) বের হতেন না এবং তিনিও তাকে (নফিসা বেগমকে) কখনও চোখে পর্যন্ত দেখেননি। এমনকি, সংসারের কোনো হিসাবপত্র প্রদানের সময়, মাতা-পুত্রের মধ্যে কথাবার্তা হলেও উভয়ের মাঝখানে একটি আবরণ বা পর্দা অন্তরাল সৃষ্টি করে রাখতো। এমনকি নবাব আলিবর্দী খানের বেগম ও কন্যার উপরও এই নবাবজাদীর কর্তৃত্ব ছিলো এবং তার আদেশ নওয়াজিশ মুহম্মদ খানের উল্লেখ ব্যতিরেকেই কার্যকরী করা হতো।" তিনি তার খাস তালুক এবং তার পারিবারিক সম্পত্তিও তত্ত্বাবধান করতেন। "নবাব আলিবর্দী খান ও নওয়াজিশ মুহম্মদ খান উভয়েই তাকে অত্যন্ত উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতেন। এদের কেউই ভক্তিভরে মাথা নত না করে তার সম্মুখে উপস্থিত হতেন না, কিংবা বিনানুমতিতে তার সম্মুখে আসন গ্রহণ করতেন না।" বাংলাদেশে মীর্জা নাথনের ভগ্নীকে সম্বর্ধনা করা হয় তা থেকেই বুঝা যায় যে, সমাজে মেয়েরা কি রকম সম্মান লাভ করতো। তিনি তার ভ্রাতার

www.pathagar.com

জায়গিরে উপস্থিত হলে, সেখানকার শিকদার ও জমিদারগণ তার সম্বর্ধনার আয়োজন করেন এবং তাকে অর্থকড়ি ও অন্যান্য জিনিসপত্র উপহার প্রদান করেন। জাহাঙ্গীরনগরে, সুবাদার ইব্রাহিম খানের স্ত্রী তাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাকে আতিথেয়তা প্রদান করেন। মীর্জা নাথন সুয়ালকুচি থেকে আগমন করেন এবং তদীয় ভগ্নীর পদচুম্বন করেন; মীর্জা নাথনের ভগ্নীর শ্রদ্ধার দিক থেকে তার মায়ের আসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। কিছুকাল পরে, তিনি তাকে তার নিজের জায়গায় নিয়ে যান এবং সেখানে তার সম্মানে এক বিরাট সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। তিনি তাকে বহু মূল্যবান জিনিসপত্র ও দাসদাসী উপহার দেন; দাস-দাসীদেরকে তিনি এক পার্বত্য অঞ্চলের অভিযান থেকে বন্দি করে এনেছিলেন। মুসলমানগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মেয়েদেরকেও সম্মানের আসন প্রদান করেন। আসামের রাজা পরাজিত হয়ে সম্রাটের নিকট স্বীয় আত্মসমর্পণের নিদর্শন স্বরূপ এক কন্যাকে সম্রাট আলমগীরের দরবারে প্রেরণ করেন। আসামের এই রাজকন্যাকে যুবরাজ মুহম্মদ আজমের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয় এবং তার নামকরণ করা হয় রহমত আরা।

সময় সময় মুসলমানগণ নারীদের প্রতি রাজপুতদের মতো অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করতো। সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মুসলমান সেনাপতি এবং রাজকর্মচারীরা যখন দেখতেন যে, তারা তাদের স্ত্রী ও রমণীদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারছেন না, তখন তারা এদেরকে হত্যা করতেন। জনৈক বিদ্রোহী রাজকর্মচারী হোসেন খান সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় তদীয় স্ত্রী ও অধীনস্থ রমণীদের হত্যা করেন, পাছে শত্রুর হাতে তাদের অবমাননা হয়। আসাম অভিযানকালে অতি চরম অবস্থায় পড়ে মীর্জা নাথন ও তার সেনাগণ তাদের স্ত্রী ও কন্যাদের সম্মান রক্ষার্থে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মীর্জা নাথন কিছু সংখ্যক মেয়েদের হাতিতে চড়িয়ে পাঠিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন যেন অনুচরবর্গসহ এরা জওহর পান করে। এভাবে পঞ্চাশ থেকে আশিজন মেয়েলোক সম্মান রক্ষার্থে তাদের জীবন বিসর্জন দেন। বহু সেনাবাহিনীর লোকও সম্মান হারাবার ভয়ে বিষপান করেন।

নবাব আলিবর্দী খানের বেগম শরফুন্নেসা ছিলেন একজন উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন ও গুণান্বিতা মহিলা; তিনি তার গুণের মহিমায় সে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উপর গভীর ছাপ রেখে গেছেন। তিনি স্বামীর যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং তার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের কঠোরতা ভোগ করেন। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি তার স্বামীর একজন মূল্যবান উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি সর্বদা একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী ও বন্ধুরূপে নবাবকে সাহায্য করেন। আলিবর্দী স্বয়ং বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও অসাধারণ মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন; তবুও স্ত্রীর উপদেশের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিলো। সঙ্কটের সময়ে শরফুন্নেসা ছিলেন স্বামীর জন্যে আশা ও উৎসাহের উৎস স্বরূপ। মারাঠারা কয়েক বছর আলিবর্দীর মহাবিপদ ও দুশ্চিন্তার কারণ ছিলো। একটি অভিযানে নবাব আলিবর্দী যখন মারাঠা লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তার দু'জন আফগান সেনাপতি সরদার খান ও শমসের খান তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিসন্ধি করেছেন। শক্তিশালী শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালে এরূপ পরিস্থিতি খুবই মারাত্মক ছিলো। এই সঙ্কটজনক সময়ে শরফুন্নেসা স্বামীর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। গোলাম হোসেন সে সময়ে নবাবের তাঁবুতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন

www.pathagar.com

ঃ "শরফুন্নেসা নবাবকে বিমর্ষ ও চিন্তাকুল দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং তাকে ভর্ৎসনা করেন। নবাব উত্তরে জানান যে, তিনি তার নিজের লোকদের মধ্যে একটা অসাধারণ ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। স্বামীর অস্থিরতায় উৎকণ্ঠিত হয়ে বেগম শরফুন্নেসা, মুজাফফর আলী খান বাহাদুর এবং ইতিহাস লেখক হিসেবে পরিচিত হাজী আবদুল্লাহর পুত্র ফকিরুল্লাহ, এই দু'জনকে তার পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে রঘুজীর নিকট প্রেরণ করেন।" রঘুজী সন্ধি স্থাপনে রাজি হন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মীর হাবীব মারাঠাদের পক্ষে যোগদান করেন। নবাব তখন ভাগলপুরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই সুযোগে রাজধানীতে অতর্কিত আক্রমণ চালাবার জন্যে মীর হাবীব মারাঠাদেরকে পরামর্শ দেন। মারাঠাগণ সম্মুখ যুদ্ধ পরিহার করে এবং মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে লুণ্ঠন করে। ঘটনাটি হতে নবাব আলিবর্দীর সময়ের কূটনীতি ও রাজনীতিতে শরফুন্নেসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে জানা যায়।

বাস্তবিকই নবাব আলিবর্দী খানের প্রশাসনের উপর শরফুন্নেসার গভীর প্রভাব ছিলো। গোলাম হোসেন নবাবের আত্মীয় ছিলেন; তিনি লিখেছেন ঃ "নবাব আলিবর্দী খান তার স্ত্রীর উপদেশের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তার ইচ্ছার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আলিবর্দী তার তৃতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা জৈনুদ্দিনের মৃত্যুর পর তার তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সৈয়দ আহমদকে আজিমাবাদের নায়েব সুবাদার নিয়োগ করার মনস্থ করেন। শরফুন্নেসার উপদেশে, নবাব এই নিয়োগ বাতিল করেন এবং সেই পদে তার দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাহকে নিয়োগ করেন। গোলাম হোসেন লিখেছেন যে, নবাব স্বীকার করেছেন যে, শরফুন্নেসার সঙ্গে একমত হয়ে তিনি সিরাজদ্দৌলাহকে তার ভূ-সম্পত্তি ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। নবাব সিরাজদ্দৌলাহর সময়েও শরফুন্নেসার এই প্রভাব অব্যাহত ছিলো। কেবল তারই মধ্যস্থতায় নবাব কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদে আনীত হলওয়েল ও অন্যান্য বন্দিদেরকে মুক্তি দান করেন। শরফুন্নেসার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে হলওয়েল লিখেছেন যে, তিনি ছিলেন এমন একজন মহিলা যার জ্ঞান, মহানুভবতা বদান্যতা, অমায়িক ব্যবহার প্রভৃতি গুণের মধ্যে স্ত্রী জাতির উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রতিফলিত হয়েছে। সিংহাসন দখলকারী (সিরাজ) মন্ত্রণায় তার যথেষ্ট প্রভাব ছিলো এবং রাষ্ট্রের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করা হতো; কেবলমাত্র হত্যা ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কে তার সঙ্গে পরামর্শ করা হতো না; কারণ তিনি (সিরাজদ্দৌলাহ) জানতেন যে, তিনি (শরফুন্নেসা) এগুলোর বিরোধিতা করবেন এবং সব সময় করেছেন এবং বলেছেন যে এরূপ রাজনীতি পরিবারের ধ্বংসের কারণ হবে।"

অনুরক্ত স্ত্রী, বিপদে স্বামীর অকৃত্রিম বন্ধু, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ উপদেষ্টা, ধর্মপরায়ণা ও উদার হৃদয়া মহিলা, শরফুন্নেসা নারী সমাজের আদর্শস্থানীয়া ছিলেন। তিনি গরিব দুঃখীদের প্রতি দয়ালু ছিলেন। বহু অনাথ বালিকাকে তিনি লালন পালন করেন। তিনি তাদের শিক্ষা ও বিয়ের বন্দোবস্ত করেন এবং তাদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেন। এরকম একটি মেয়েকে তিনি মুহম্মদী বেগের সঙ্গে বিবাহ দেন; এই ব্যক্তি পরে মীরণের আদেশে সিরাজদ্দৌলাহকে বন্দিখানায় হত্যা করে। শরফুন্নেসা মৃত আফগান

www.pathagar.com

প্রধান শমসের খানের স্ত্রী কন্যাদেরকেও তার প্রাসাদে আশ্রয় দেন; এই বিদ্রোহী আফগান নেতা নবাবের জামাতা জৈনুদ্দিনকে হত্যা করেন এবং কন্যা আমিনা বেগমকে বন্দি করেছিলেন। বেগম শরফুন্নেসা তার পরম শত্রু আফগান প্রধানের স্ত্রী কন্যাদেরকে স্নেহ ও প্রীতির সঙ্গে আতিথেয়তা দেন এবং তাদেরকে তার প্রাসাদে সম্পূর্ণ নিরাপদ আশ্রয়ে রাখেন। তিনি শমসের খানের এক কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করেন এবং বিবাহিত দম্পতিকে মূল্যবান যৌতুক দান করেন; যাতে তারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারে সে জন্যে তিনি বর ও কনেকে দারভাঙ্গায় কয়েকটি গ্রাম দান করেন। পলাশী যুদ্ধের পর এই প্রতিভাসম্পন্না ও উদার-হৃদয়া মহিলার শেষ জীবন দুঃখ দৈন্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। বিশ্বাসঘাতক নতুন নবাব মীরজাফরের কুপুত্র মীরণ শরফুন্নেসা এবং তার দুই কন্যা ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমকে এবং লুৎফুন্নেসা ও তার শিশু কন্যাকে বন্দিরূপে ঢাকায় প্রেরণ করেন। সেখানে তারা কিছুকাল বন্দি জীবনযাপন করেন। অতঃপর মীরণের নির্দেশে ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমকে নৌকায় করে নদীতে নিয়ে ডুবিয়ে মারা হয়। তাদের জীবনের করুণ পরিসমাপ্তি হয়। ক্লাইভের হস্তক্ষেপের ফলে শরফুন্নেসাম লুৎফুন্নেসা ও তার কন্যা রক্ষা পান এবং তাদেরকে মুর্শিদাবাদে আনা হয়। ইংরেজ কোম্পানী প্রদত্ত সামান্য বৃত্তির উপর নির্ভর করে তাদেরকে জীবন ধারণ করতে হয়।

আলিবর্দী খানের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও নওয়াজিশ মুহম্মদ খানের পত্নী ঘষেটি বেগম ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা ও প্রতিভাময়ী মহিলা। তার স্বামীর সকল বিষয়ের উপর তার প্রভাব ছিলো। নওয়াজিশ বাংলার দিউয়ান ও জাহাঙ্গীরনগর প্রদেশের নায়েব-সুবাদার ছিলেন। নওয়াজিশ মুহম্মদ খানের মৃত্যুর পর, নবাব আলিবর্দী ঘষেটি বেগমকে সুবার দিউয়ানরূপে নিযুক্ত করেন। তিনি বিচক্ষণতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেন। ঘষেটি বেগম ছিলেন খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী মহিলা। আলিবর্দীর রাজত্বের শেষের দিকে, তিনি সিরাজদ্দৌলাহকে 'মসনদের' উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের পালিত পুত্র সিরাজদ্দৌলাহর ভ্রাতা ইকরামদ্দৌলাহর পুত্র মুরাদদ্দৌলাহকে মসনদের উত্তরাধিকারী করার পরিকল্পনা করেন। এভাবে তিনি মসনদের উপর স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন। আলিবর্দী খানের মৃত্যুর পূর্বে ঘষেটি বেগমের আশ্রিত নাবালক পুত্রের মৃত্যু হওয়ায় এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এরপরেও তিনি সিরাজদ্দৌলাহর প্রতি খুব বিদ্বেষভাব পোষণ করেন এবং আলিবর্দী খানের মৃত্যুর পর তিনি গোপনে মসনদের জন্য সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সৈয়দ আহমদের পুত্র এবং পুর্ণিয়ার সহকারী শাসনকর্তা শওকতজঙ্গের পক্ষ সমর্থন করেন। নবাব সিরাজদ্দৌলাহ্ শওকতজঙ্গকে পরাজিত ও নিহত করেন। ঘষেটি বেগম নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তার রাজনৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগরে তার দিউয়ান বিবেকহীন রাজবল্লভের মধ্যে একজন যোগ্য লোকের সন্ধান পান। তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন এবং এগুলো তিনি তার ভগ্নী-পুত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ব্যয় করেন। ষড়যন্ত্রে তার ভূমিকার উল্লেখ করে গোলাম হোসেন লিখেছেন, "তিনি এখন গোপনে মীরজাফরের সঙ্গে মিত্রতা করেন এবং স্বীয় প্রতিপত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি মীরজাফরের পক্ষ শক্তিশালী করতে যথেষ্ট সাহায্য করেন।" তিনি কৌশলে অর্থ বিতরণ করেন এবং এই অর্থ তিনি মীরজাফরের

www.pathagar.com

নিকটও প্রেরণ করেন যাতে নবাব সিরাজদ্দৌলাহর বিরুদ্ধে অধিক সংখ্যক সমর্থক সংগ্রহ করা যায়। এভাবে ঘষেটি বেগম তার রাজনৈতিক প্রভাব ও বিপুল অর্থের বলে তরুণ নবাবের ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব করেন এবং তার স্বীয় পরিবারের রাজত্বের উচ্ছেদে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সাহায্য করেন। এতো করেও ঘষেটি বেগম জীরমজাফরের নিকট থেকে কোনরূপ পুরস্কার পাননি। বরং তার পরিবারে অন্যান্যের সঙ্গে তাকে অকৃতজ্ঞ উপকৃতদের হাতে অসম্মান ও করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছিল।

নবাব আলিবর্দীর কনিষ্ঠা কন্যা ও সিরাজদ্দৌলাহর মাতা আমিনা বেগম তার সুরুচি ও শিষ্টাচারের গুণে সে যুগের সমাজ জীবনের উপর গভীর ছাপ রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়া মহিলা এবং অনাথ ও গরিব-দুঃখীদের আশ্রয়স্থল। এটা উল্লেখযোগ্য যে, তিনি রাজকানয়ার নাম্নী ক্রীতদাসীকে শিক্ষিতা করে তোলেন এবং পরে তাকে লুৎফুন্নেসা নাম দিয়ে স্বীয় পুত্র সিরাজের সঙ্গে বিয়ে দেন। আমিনা বেগম ও জৈনুদ্দিন মুহম্মদী বেগ নামক এক গরিব বালককে লালন-পালন করেন এবং সে বড় হয়ে উঠলে তারা বিয়ের বন্দোবস্ত করেন শরফুন্নেসার প্রাসাদে লালিতা-পালিতা এক মেয়ের সঙ্গে। এভাবে তিনি তার ভবিষ্যত পুত্র হন্তা মুহম্মদী বেগকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোমল হৃদয়া আমিনা বেগম অন্যায়কারীর প্রতিও কোনরূপ কঠোরতা সহ্য করতে পারতেন না। ইংরেজদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সিরাজদ্দৌলাহ আলিবর্দীর পীড়িত অবস্থায় প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখাশুনা করেন। সে সময় তিনি রাজস্বের হিসাবে বহু অনিয়ম এবং জাহাঙ্গীরনগরে ঘষেটি বেগমের দিউয়ান রাজা রাজবল্লভ কর্তৃক বিপুল অর্থ আত্মসাতের তথ্য আবিষ্কার করেন। রাজা রাজবল্লভ সঠিক হিসাব না দেয়ায় এবং তসরূপকৃত অর্থ রাজকোষে প্রত্যার্পণ না করায়, সিরাজদ্দৌলাহ তাকে মুর্শিদাবাদে কঠোর পাহারায় আবদ্ধ করে রাখেন। আমিনা বেগম পুত্রের নিকট তার পক্ষে মধ্যস্থতা করেন। মায়ের আদেশ রক্ষার্থে সিরাজদ্দৌলাহ রাজবল্লভকে মুক্ত করে দেন। ইংরেজ বন্দি মিঃ ওয়াটস, মিসেস ওয়াটস ও তাদের পুত্র-কন্যাদের প্রতি সহৃদয়া আমিনা বেগম খুব সৌজন্য ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করেন। ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদের শুরুতে, নবাব সিরাজদ্দৌলাহ নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক কার্যাবলীতে ইন্ধন যোগাবার অভিযোগে কাসিম বাজারের কোম্পানীর প্রতিনিধি মিঃ ওয়াটস এবং তার পরিবার পরিজনদেরকে বন্দিরূপে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসেন। আমিনা বেগম এ সকল ইংরেজ বন্দিদের জন্য দুঃখ অনুভব করেন এবং তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। এই মুক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করে ইংরেজদের একটি বিবরণে বলা হয়েছে, "বেগম (আমিনা) মিসেস ওয়াটসকে তার শিশু পুত্রদের সহ নিজ জেনানামহলে নিয়ে আসেন এবং সেখানে অত্যন্ত উদারতা ও সম্মানের সঙ্গে তার প্রতি ব্যবহার করেন। সাইত্রিশ দিন পর আমিনা বেগম মিসেস ওয়াটসকে নিরাপত্তার সঙ্গে নদীপথে চন্দননগরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন এবং সেখানকার ফরাসি শাসনকর্তা তাকে আতিথেয়তা প্রদান করেন। নবাব সিরাজদ্দৌলাহ তখন কলকাতা অভিযানে নিয়োজিত ছিলেন। পরে আমিনা বেগম তার পুত্রবধূর অনুরোধে মিঃ ওয়াটসের মুক্তির জন্য সিরাজকে উপদেশ দেন। ওয়াটস মুক্তি পেয়ে তার পরিবার পরিজনদের সঙ্গে মিলিন হন।

এই স্নেহময়ী ও মহান হৃদয়া মহিলার শেষ দিনগুলো উপর্যুপরি কয়েকটি হৃদয়

www.pathagar.com

বিদারক ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। সবচেয়ে করুণ দৃশ্য দেখা দেয় যখন আমিনা বেগম জানতে পারেন যে, তার প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র সিরাজদ্দৌলাহকে হত্যা করা হয়েছে এবং তার মৃতদেহ মুর্শিদাবাদের পথে পথে প্রদর্শিত হচ্ছে। এই ঘটনা গোলাম হোসেনের ভাষায় বর্ণনা করা যেতে পারে; তিনি লিখেছেন ঃ "সিরাজদ্দৌলাহর বিকৃত করা মৃতদেহ বহু পথ ঘুরানোর পর তার মাতার প্রাসাদের নিকট দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়; কিন্তু তার মাতা নবাব পরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলা পর্দান্তরালে বসবাস করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং তিনি এই বিপ্লব (পলাশীতে সিরাজের ভাগ্য বিপর্যয় ও হত্যা) সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। প্রাসাদের বাইরে চীৎকার ও গোলমালের আওয়াজ শুনে তিনি এর কারণ জানতে চান। তখন ঘটনার বিষয় জানতে পেরে হতভাগ্য মাতা নিজেকে ধরে রাখতে পারেন নাই। তিনি তার পর্দা, অবগুণ্ঠন ও জুতার কথা ভুলে গিয়ে পাগলের মতো ঘরের বাইরে ছুটে যান এবং পুত্রের মৃতদেহ জড়িয়ে ধরেন এবং তাকে চুম্বনে চুম্বনে ঢেকে দেন। এরপর তিনি বারংবার বুক চাপড়াতে চাপড়াতে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন। এই মর্মান্তিক শোকের দৃশ্যে পথচারী দর্শকগণও শোকে অভিভূত হয়। খাদিম হাসান খান সরল দর্শকদের উপর এই দৃশ্যের প্রভাব উপলব্ধি করেন। এই খাদিম হাসান নবাব আলিবর্দী ও সিরাজের পিতার অনুগ্রহে সামান্য অবস্থা থেকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন। সিরাজের মাতার শোকের প্রভাব দর্শকদের উপর ছড়িয়ে পড়তে দেখে খাদিম হাসান গদাধারীদেরকে ও ভৃত্যদেরকে পাঠিয়ে দেন। এরা ঘুষি ও গদা প্রয়োগে এবং অশোভনভাবে আঘাত করে হতভাগ্যা মহিলাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। শোকাতুরা মাতা পুত্রের মৃতদেহ দর্শনে আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি কোথায় তাও ভুলে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায় তাকে অনুসরণকারিণী অন্যান্য মহিলাদের প্রতিও বর্বরোচিত ব্যবহার করা হয়।" মীরজাফর ও মীরণ আমিনা এবং তার পরিবারের অন্যান্য মহিলাদেরকে অত্যন্ত অশোভনভাবে আবদ্ধ করে রাখে এবং অতঃপর তাদেরকে কয়েকটি নিকৃষ্ট নৌকায় ভরে অত্যন্ত অপমানজনকভাবে ও অবহেলার সঙ্গে জাহাঙ্গীরনগরে পাঠিয়ে দেয়। গোলাম হোসেন আরো বলেন যে, কিছুদিন পর মীরণ জাহাঙ্গীরনগরের শাসনকর্তা ও অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি দশরথ খানকে লিখিত নির্দেশ

সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে টমাস রো। এই লোকটি আনুগত্য, নানা উপহার, ভক্তি, প্রীতি ও অনুনয়ের ভান করে সম্রাটের উপর প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তীতে হেরেমে সুন্দরী ইংরেজ নারী সরবরাহ করে সুরায় আসক্ত সম্রাটের হাতের ছাপ নিয়ে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুবিধাদি চাতুর্যতার সাথে আদায় করে নেয়।

www.pathagar.com

দেয়, যাতে তিনি দু'জন হতভাগ্যা ও বয়স্কা মহিলাকে (ঘষেটি বেগম ও আমিনা) হত্যা করেন, অথচ এই মহিলাদের পরিবারের অনুগ্রহেই তার (মীরণ) মর্যাদায় আরোহণ সম্ভব হয়েছিল। এরা ছিলেন নবাব আলিবর্দীর কন্যা। এমনকি এই নির্বাসিতা, বিস্মৃতা ও দুঃখ দারিদ্রে পতিতা নারীদের সম্পর্কে সে সন্দেহ পোষণ করে এবং সেই অনুসারে সে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় দশরথ খানকে চিঠি লিখে। এই সদাশয় শাসনকর্তা এই মহিলাদের ও তাদের স্বামীদের নিকট তার উন্নতি ও অন্নের জন্য ঋণী ছিলেন। তিনি মীরণের ঘৃণ্যতম নির্দেশ পালন করতে অসম্মতি জানান। শুধু তাই নয়, তিনি অনুরোধ জানান যেন প্রদেশের শাসনকার্যে তার স্থলে একজন উত্তরাধিকারী পাঠানো হয়, কারণ তিনি এ ধরনের আদেশ কার্যকরী করা থেকে অব্যাহতি পেতে চান। মহিলাদেরকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করার অজুহাতে মীরণ তার বন্ধুদের একজনকে সেই হতভাগিনী অসহায়া রমণীদেরকে একটি নৌকায় চড়াবার নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ মতো লোকটি কাজ করে। একটি নির্জন স্থানে পৌঁছে, সে মহিলাদেরকে ওজু করতে ও নতুন কাপড় পরতে বলে। মহিলাগণ বুঝতে পারেন যে, তাদেরকে ডুবিয়ে মারা হবে। ঘষেটি বেগম ভীতা সন্ত্রস্তা হয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। আমিনা তার ভগ্নীকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেন এবং বলেন, "প্রিয় ভগ্নি কেন এই ভয় এবং কেনইবা কাঁদছো তুমি" একদিন আমাদের মরতেই হবে, আজই হোক সেই দিন।" তারা ওজু করেন এবং কাফন কাপড়ের অভাবে পরিষ্কার কাপড় পরেন। তারা ইমাম হোসেনের মাজারের (কারবালার) পবিত্র মাটি তাদের কপালে ও অঙ্গে মাখেন এবং আল্লাহর নিকট তাদের পাপের মার্জনা ভিক্ষা করেন লোকটিকে তার নির্দেশ কার্যকরী করতে বলেন। অতঃপর এই মহিলাদ্বয় একে অন্যের হাত ধরে নদীর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

সিরাজদ্দৌলাহর সহধর্মিণী লুৎফুন্নেসা ছিলেন রমণীদের আদর্শ। কিভাবে সামান্য মর্যাদার একজন নারী স্বীয় গুণাবলীর বলে মুসলমান সমাজে খুব সম্মানিত মর্যাদায় আরোহণ করতে পারেন, তা তার জীবনে প্রতিভাত হয়েছে। সামান্য পরিচারিকার অবস্থা থেকে লুৎফুন্নেসা একজন যুবরাজের সহধর্মিণী এবং নবাবের বেগমের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়া ও উচ্চ অন্তঃকরণ সম্পন্না মহিলা। লুৎফুন্নেসা মিঃ ওয়াটসকে বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিতে স্বামীকে রাজি করিয়েছিলেন। তিনি সম্পদে বিপদে সর্বদা ছিলেন স্বামীর অনুগামিনী। তিনি সমগ্র জীবনব্যাপী তার প্রতি উৎসর্গীকৃতা ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর লুৎফুন্নেসা তার জীবনের সকল স্বাদ হারিয়ে ফেলেন। কয়েক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেন। মীরজাফর এবং মীরণও তাকে বিয়ে করার বাসনা প্রকাশ করেন। একবার তাদেরকে উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "পূর্বে. হাতির পীঠে চড়ে এখন আমি গাধার পীঠে চড়তে নিচু হতে পারি না।" সিরাজদ্দৌলাহর স্মৃতিকে মূল্যবান সম্পদের মতো হৃদয়ে গেঁথে, এই সুন্দরী বিধবা যুবতী বেগম ১৭৯০ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত দুঃসহ দীর্ঘ ৩৪ বছর কাল স্বামীর জন্যে অশ্রুপাত করেছেন। চরম অমর্যাদা ও দুঃখ দৈন্যে পতিত হয়েও এবং মীরজাফর ও মীরণ কর্তৃক সকল বিষয় সম্পদ থেকে বঞ্চিতা হওয়া সত্ত্বেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসকদের প্রদত্ত সামান্য ভাতার উপর নির্ভর করে এই মহৎপ্রাণা মহিলা সকল দুঃখ কষ্ট নীরবে সহ্য করেছেন এবং স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন। তিনি স্বামীর

www.pathagar.com

বিদেহী আত্মার মঙ্গলের জন্যে কোরআন পাঠক (ক্বারী) ও একটি লঙ্গরখানার (বিনামূল্যে খাবার ব্যবস্থা) ব্যয়ভার বহন করতেন। তিনি খোশবাগে তার স্বামীর কবরের উপর ফুল ছড়িয়ে দিতেন এবং প্রতিরাতে প্রদীপ জ্বালাতেন। স্বামীর কবরের পার্শ্বে প্রার্থনারত অবস্থায় একদিন তিনি তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মুনী বেগম আর একজন মহিলা যিনি সামান্য নর্তকী থেকে মীরজাফরের হারেমে স্থান লাভ করেছিলেন এবং বাংলার নবাবের অভিভাবিকার মর্যাদাজনক পদ দখল করেছিলেন। ইনি সিকান্দারার সন্নিকটে একটি গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মুনীকে এক নৃত্য দলের ওস্তাদ বিশুর নিকট বিক্রি করে দেয় এবং বিশু তাকে নৃত্য শিক্ষা দেয়। বিশুর নর্তকীর দল নওয়াজিশ মুহম্মদ খান কর্তৃক ১০ হাজার টাকা পারিতোষিকে তার পালিত পুত্র ইকরামদ্দৌলাহর বিয়েতে মুর্শিদাবাদে নিমন্ত্রিত হয়। মুনীর সৌন্দর্য ও সঙ্গীত নৈপুণ্য মীরজাফরকে মুগ্ধ করে এবং তিনি তাকে তার হারেমে গ্রহণ করেন। স্বীয় বুদ্ধি ও গুণের বলে মুনী মীরজাফরের প্রধান মহিষীর মর্যাদা লাভে সমর্থ হন। তার গর্ভে. নজমুদ্দৌলাহ ও সায়েফুদ্দৌলাহ নামে মীরজাফরের দুই পুত্রের জন্ম হয়। মীরজাফরের নবাবী আমলেই মুনী বেগম শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে বিপুল প্রতিপত্তি বিস্তার করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর, নাবালক নবাবদের অভিভাবিকা হিসেবে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেন। বিবেকহীন ও উচ্চাভিলাষিণী হলেও মুনী বেগম খুব কর্মক্ষম, বুদ্ধিমতি ও দৃঢ়চরিত্রের রমণী ছিলেন। তিনি ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের বড় সমর্থক ছিলেন। এরাও তার উচ্চ মর্যাদা রক্ষা করে চলতেন। কোম্পানীর কর্মচারীরা তাকে উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং তার উপদেশকে এতো বেশি গুরুত্ব দিতেন যে, তারা তাকে কোম্পানীর মাতা নামে আখ্যায়িত করেন। মুনী বেগম প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল স্বীয় রাজনৈতিক প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখেন এবং ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলার মুসলমান শাসনামলে বহু রমণী ছিলেন যারা তাদের সাহস, শক্তি ও বীরত্বের জন্যে খ্যাতি লাভ করেন। নবাব সরফরাজ খানের সেনাপতি গাউস খানের বিধবা পত্নীর সাহসিকতাপূর্ণ যুদ্ধের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আলিবর্দী খানের রাজত্বকালে রঘুজী ভোসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের বিরুদ্ধে নবাবের সাহায্যার্থে. পেশোয়া বালাজি রাও যে সৈন্যদল পাঠান তারা মুঙ্গের ও ভাগলপুরে হানা দেয় ও লুণ্ঠন করে। ভাগলপুরের অধিবাসীরা গঙ্গানদীর অপর পারে পালিয়ে যায়; কিন্তু, গাউস খানের বিধবা পত্নী তার বৃহৎ পরিবারের জন্য নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করতে না পেরে, নিজের গৃহেই থেকে যান এবং শরীরে শেষ রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত হানাদার দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি গৃহের চতুর্দিকে প্রতিবন্ধকতা রচনা করেন এবং হাতের কাছে পাওয়া সামান্য কিছু মরিচা পড়া হাত বন্দুক দিয়ে তদীয় অনুচরদেরকে অস্ত্র সজ্জিত করেন। এভাবে গৃহ অবরোধকারী মারাঠা লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি নিজেদের সম্মান রক্ষা করেন। এই বিস্ময়কর ঘটনার সংবাদ মারাঠা সেনাপতি বালাজি রাওয়ের নিকট পৌঁছে। একজন রমণীর এরূপ সাহসিকতা দর্শনে তিনি অবাক হয়ে যান। তিনি তার সাহসের প্রশংসা করে উপহারস্বরূপ দক্ষিণাত্যের কিছু দুর্লভ পশমীবস্ত্র ও বুটিতোলা দুষ্প্রাপ্য রেশমীবস্ত্র তাকে পাঠিয়ে দেন এবং তার গৃহ অবরোধ পরিত্যাগ করতে মারাঠা সৈন্যদেরকে আদেশ দেন।

www.pathagar.com

পরাধীন বৃটিশ আমলে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি হাতির পিঠে হাওদার উপরে দাঁড়িয়ে রণসাজে সজ্জিতা এক মুসলিম বীর নারী বেগম হযরত মহল হাতে তাঁর তীক্ষ্ণধার তরবারি আন্দোলিত করে বক্তৃতা করছেন তিনি। হাজার হাজার উত্তেজিত জনতা। সৈন্য-সিপাই, নওজোয়ান আর প্রৌঢ়, কিশোর এবং নারী একটা আবেগ, একটা বিস্ময় নিয়ে ছুটে এসেছেন, মিশে গেছে তারা জন-সমুদ্রে। জনসমুদ্রের স্বাভাবিক শব্দ এবং বাকগুঞ্জন সহসা থেমে গেলো। সব ছাপিয়ে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো, হাওদার উপরে দন্ডায়মান অস্ত্রধারিণী সেই নারীর কণ্ঠস্বর ঃ "আমি তোমাদের মাতৃসমা। তোমাদের আর এক মা, জন্মভূমি। এই জননী জন্মভূমি আজ বেঈমান নাসারাদের হাতে বন্দিনী। তার এক প্রিয়পুত্র, যিনি একদিন ছিলেন এই দেশের শাসক, সেই অযোধ্যায় জনপ্রিয় নওয়াব আজ কলকাতায় নির্বাসিত। তাঁর শাহী মহলের বেগমেরা, পুত্র-কন্যাগণ ইংরেজের হাতে লাঞ্ছিত।...

"যাঁরা কোনোদিন বাড়ির বের হননি, সেই বেগমদেরকে মহলের ভিতর হতে জোর করে টেনে বাইরে এনে, তাঁদেরকে পীড়ন করা হয়েছে, অপমানিত করা হয়েছে, তাঁদের গহনা কেড়ে নেয়া হয়েছে, তাঁদের অঙ্গে আঘাত করা হয়েছে, চাবুক মারা হয়েছে। পুত্রগণ, তোমাদের মা-ভগ্নীদের এই অপমান কি তোমরা নীরবে সহ্য করবে? সহ্য করবে বেঈমান নাসারাদের জুলুম।

"... এই জালেম ইংরেজ ভারতবর্ষের বহু রাজ্য জোর করে কেড়ে নিয়ে সেখানে লুণ্ঠন চালাচ্ছে। লর্ড ডালহৌসী তার আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করে কেড়ে নিয়েছে অযোধ্যা রাজ্য, কেড়ে নিয়েছে সাঁতারা, ঝাঁসী, নাগপুর আর বুন্দেলখন্ড রাজ্য। গ্রাস করে নিয়েছে সম্বলপুর। আমাদের দেশের রাজ্য এবং ধন-সম্পদই শুধু তারা হরণ করেননি। ধ্বংস করে চলেছে আমাদের তাহজীব ও তমদ্দুন, আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতা; আমাদের লাখো লাখো টাকা মূল্যের সুপ্রাচীন কুতুবখানা। হরণ করেছে নারীর সম্মান, সম্ভ্রম। আজ সময় এসেছে তাদেরকে আঘাত করবার। দিকে দিকে জ্বলে উঠেছে বিদ্রোহের আগুন। আমি অযোধ্যার রাজ্যহারা বন্দী নওয়াবের বেগম, তোমাদের মা আমি, আজ বেগম-মহল ছেড়ে বাইরে এসেছি তোমাদের সাহায্য চাইবার জন্যে। সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, জনসাধারণকেও বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করতে অগ্রসর হতে হবে, অস্ত্র ধারণ করতে হবে। হিন্দু. মুসলমানকে এক হয়ে ছিঁড়ে ফেলতে হবে গোলামীর শিকর। আর দেরি নয়- হাতে হাতিয়ার নাও। বল, আমার সন্তানেরা- করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।...."

অযোধ্যার বীর বেগম হযরত মহলের উদাত্ত আহ্বান শুনে জনতা উন্মাদ হয়ে উঠলো। ধ্বনিত হলো সহস্র কণ্ঠে 'করেঙ্গে- ইয়ে মরেঙ্গে'।

বলা বাহুল্য ভারতবর্ষের নানাস্থলে তখন সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছে। বেগম হযরত মহলের মৌখিক উৎসাহ এবং আর্থিক সাহায্য পেয়ে অযোধ্যা অঞ্চলের বিদ্রোহী সেনানীরা জোর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তাদের সঙ্গে যোগ দিলো হাজার হাজার নওজোয়ান।

www.pathagar.com

ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম বীরাঙ্গনার বীরত্বের পরিচয় যেমন ভুরি ভুরি পাওয়া যায়, মুসলিম ললনাকূলের বিদ্যা-নৈপুণ্যের পরিচয়ও তেমনি তাতে অপ্রতুল নয়। তৎকালীন ইংরেজ সরকার প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানদের জেহাদী চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরকেও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করার প্রয়াস চালায়। কাজেই বৃটিশ আমল ছিলো মুসলিম নারী শিক্ষার জন্য অন্ধকার যুগ।

১৮৪৯ সালে বৃটিশেরা নিজেদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় হীন স্বার্থে এদেশে নারী শিক্ষার সূচনা করে। মে মাসে জে. ই. ভি. বেথুন কলকাতায় স্থাপন করেন ভিক্টোরিয়া গার্লস স্কুল, পরে এটি পরিচিত হয় বেথুন স্কুল নামে এই নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায় থেকেই প্রথম প্রতিবাদ উঠে। এ সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেন ঃ

আগে মেয়েগুলো ছিলো ভালো,
ব্রতধর্ম কর্তো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে।।
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন 'এবি' শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।।

বৃটিশ আমল হিন্দু নারীর শিক্ষার প্রসার ঘটলেও মুসলিম নারী শিক্ষার আলো থেকে ছিলো বঞ্চিত। চতুর ইংরেজ তাদের নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়াসে এবং ধর্মীয় কাজ সমাধা করার লক্ষ্যে এদেশে পৃথকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা চালু করে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষানীতিকে পাশ কাটিয়ে শুধুমাত্র ইংরেজদের ফরমায়েশ মতো শিক্ষানীতি চালু করার ফলে এদেশে কিছু ধর্মান্ধ কাঠমোল্লা তৈরী হয়। এদেরকে দিয়েই পর্দার নামে নারী শিক্ষার বিরোধিতা করিয়ে মুসলিম নারীকে শিক্ষা গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে এবং ইসলামী বিধি বিধান নারী শিক্ষার অন্তরায় বলে অপবাদ দিয়ে গোটা ইসলাম ধর্মকে আঘাত হানে। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকের ধারণা, একমাত্র ইসলামই নারী শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। এই ইবলিশ জাতি ইংরেজ বিভিন্ন কৌশলে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তিতে ঠেলে দিয়েছে। যা থেকে মুসলমানেরা আজও মুক্তি পায়নি।

অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন যুগে অবতীর্ণ হয়ে ইসলাম মানব জাতির মঙ্গলের জন্য যে সকল বিধান প্রচার করেছিল তন্মধ্যে নারী জাতির অধিকার রক্ষা ও উন্নতিমূলক বিধানগুলো ছিলো একেবারেই নতুন। এর পূর্বে এরূপ বিধান জগতে কোথাও ছিলো না। ইসলামের অপরাপর শিক্ষাগুলো অল্প বিস্তর সকল ধর্মেই প্রচলিত আছে। কিন্তু নারী জাতিকে ইসলাম যে আসন প্রদান করেছে, অন্য কোনো ধর্ম তা দেয়নি। ইসলাম নারী জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করে তাকে স্বাধীনভাবে প্রত্যেক কার্যের আলোচনা ও চর্চা করার অবসর দিয়েছে। পুরুষের মতো নারী জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা ইসলামের বিধান

www.pathagar.com

অনুসারে অপরিহার্য কর্তব্য। পুরুষের মতো নারীদেরকে উন্নতির শিখরে আরোহন করতে ইসলামের কোনো শাস্ত্রীয় বাধা নেই। মুসলমান সুধীবৃন্দের সাথে মুসলমান নারীরা সমান অধিকার নিয়ে বিদ্যা ও জ্ঞানচর্চা করতে পারেন।

বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের অগ্রদূত। সেই মহীয়সী নারী ছিলেন ধার্মিক মুসলিম মহিলা। দৃষ্টান্ত হিসেবে শিক্ষার উপর তাঁর একটি ভাষণের অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করছি ঃ

"বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি আয়োজিত এক সভায় সভানেত্রীর ভাষণে তিনি বলেন, 'মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরআন শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কোরআন শিক্ষা অর্থ শুধু টিয়া পাখির মতো আরবী শব্দ আবৃত্তি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কোরআনের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হইবে। সম্ভবতঃ এ জন্য গভর্নমেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাস না করিলে আমাদের সমাজ মেয়েদের কোরআন শিক্ষাও দিবে না। যদি কেউ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থাপত্র (Prescription) লয়, কিন্তু তাতে লিখিত ঔষধ পথ্য ব্যবহার না করিয়া সে ব্যবস্থাপত্রখানাকে মাদুলিরূপে গলায় পড়িয়া থাকে, আর দৈনিক তিনবার করে পাঠ করে, তাতে সে কি উপকার পাইবে। আমরা পবিত্র কোরআন শরীফের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোনো কার্য করি না, শুধু তা পাখির মতো পাঠ করি আর কাপড়ের থলিতে (জুযদানে) পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চস্থানে রাখি। কিছুদিন হলো মিসর হতে আগত বিদূষী মহিলা মিস সাফিয়া সুলেমান এলাহাবাদে এক বিরাট মুসলিম সভায় বক্তৃতাদানকালে বলেছিলেন, "উপস্থিত যে যে ভদ্রলোক কোরআন এর অর্থ বুঝেন, তারা হাত তুলুন।" তাতে মাত্র তিনজন ভদ্রলোক হাত তুলিয়াছিলেন। কোরআন-জ্ঞানে যখন পুরুষদের এরূপ দৈন্য, তখন আমাদের দৈন্য যে কতো ভীষণ তা না বলাই ভালো। সুতরাং কোরআন-এর বিধি-ব্যবস্থা কিছুই আমরা অবগত নই। (তথ্য সূত্র ঃ বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, পৃঃ ১১৭৪)

বেগম রোকেয়ার হাতে গড়া রত্ন, লেখিকা শামসুন নাহারের উদ্ধৃতি লক্ষ্যণীয়। নাহার তার 'রোকেয়া জীবনী'তে বলেন, কিন্তু সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে ধর্মের সত্যতার শিক্ষার দিকে বারে বারে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইসলামের নির্দেশকে কুরআনের পাতায় আবদ্ধ না রাখিয়া বাস্তব জীবনে কাজে লাগাইবার জন্য তিনি পাগল হইয়াছিলেন। (রোকেয়া জীবনী, শামসুন নাহার, পৃঃ ১১১-১২২)

আজকে যদি বেগম রোকেয়া বেঁচে থাকতেন আর ইসলাম ও পবিত্র কোরআন শিক্ষা সম্পর্কে এরূপ কর্ম ও বক্তব্য রাখতেন তাহলে বাম ও রামপন্থী বুদ্ধিজীবী-রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী এবং এনজিও কর্তৃক তাঁকে নির্ঘাত মৌলবাদী, ধর্ম ব্যবসায়ী ও সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করতেন। নিশ্চয়ই তাঁকে নারী শিক্ষার অগ্রদূত বলে আখ্যায়িত করতেন না এবং তাঁকে পুঁজি করে সমগ্র ইসলাম ও মুসলমানদের আঘাত করার সুযোগ পেতেন না।

www.pathagar.com

কিন্তু এদেশীয় তথাকথিত অতি নারীবাদিরা প্রত্যক্ষভাবে "বেগম রোকেয়া প্রীতি" দেখালেও পরোক্ষভাবে মুসলিম মন-মানস থেকে উপমহাদেশের নারী শিক্ষার অগ্রদূত অসামান্যা, অসাধারণ অনন্য প্রতিভার অধিকারী ধর্মপ্রাণ এই মহিয়সী মহিলাকে মুসলিম মন-মানস থেকে মুছে ফেলার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ৪র্থ শ্রেণীর বাংলা ১ম পাঠ্যসূচীতে তাঁকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ ছিলো। ১৯৯৬ (অক্টোবর) সংস্করণে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রবন্ধটি উধাও করে দিয়েছে। এমনকি ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোন পাঠ্যপুস্তকেই বেগম রোকেয়া সম্পর্কিত কোন প্রবন্ধ নেই। অথচ বেগম রোকেয়াকে রাজনীতির কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে তথাকথিত প্রগতিবাদীরা নারী শিক্ষা, নারী অধিকার ও নারী মর্যাদার প্রধান অন্তরায় মৌলবাদকে উপলক্ষ্য করে অত্যন্ত সুকৌশলে ইসলামী বিধানের উপর আঘাত হানছে। কিন্তু উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্ট যে, কোরআন ও সুন্নাহের আলোকে শাসিত মুসলিম শাসনামলেই নারীরা পেয়েছে সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা। কিন্তু এ দেশীয় মুসলিম নামধারী তাত্ত্বিকদের ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি হীনমন্যতা দেখে অশ্রু ভারাক্রান্ত নেত্রে অতীতের দিকে চেয়ে মহাকবির ভাষায় বলতে হয়-

"কুসুম দাস সজ্জিত, দীপাবলি তেজে
উজ্জলিত নাট্যশালা সমরে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরি, কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে নিবিছে দেউটী
নীরব রবার, বীনা, মুরজ, মুবলী।"

পশ্চাতে উজ্জ্বল গৌরবময় অতীত, সুম্মুখে কুহেলিকাচ্ছন্ন অনিশ্চিত ভবিষ্যত। এই উভয়ের সন্ধিস্থলে কঠোর বর্তমানের উপর দাঁড়ায়ে অতর্কিতভাবে সচেতন মানুষের মুখ হতে এই প্রশ্ন বের হয়ে পড়ে- আমাদের কি কিছু আশা-ভরসা আছে?

এ প্রশ্নের জবাবও কবি দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। তিনি লিখেছেন ঃ

পানি সে আগ জালানা হ্যায় মুশকিল
বাহতে হুয়ে সমন্দর কো ফেরানা হ্যায় মুশকিল।
মুশকিল নেহি কুচ এতনা- জেতনা-
বিগড়ী হুঈ কওম কো সুধরানা হ্যায় মুশকিল।

অর্থাৎ-

পানিতে আগুন জ্বালানো খুবই কঠিন
প্রবাহিত সমুদ্রের গতি ফেরানোও কঠিন।
তবে তার চাইতেও অধিক কঠিন-
সভ্যতা বিবর্জিত কোন জাতিকে সভ্য করে তোলা।

www.pathagar.com

মুসলিম শাসকদের পতন এবং বিজাতীয়দের চক্রান্ত

আমাদের পিয়ারা নবী (সাঃ) আজ থেকে চৌদ্দশ' ছর আগে নারীকে দিয়েছিলো সর্বোত্তম মর্যাদা। এমনকি পুণ্যবতী স্ত্রীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আবার তিনিই ঘোষণা করেছিলেন, "আমি তোমাদের জন্য একটি বড় ফিত্না রেখে যাচ্ছি, তা হলো নারী ফিত্না।" রাসূল (সাঃ)-এর বাণীর যথার্থতা আমরা প্রত্যক্ষ করছি ইতিহাসের পাতায় পাতায় ও সমকালীন বিশ্বে।

এককালে মুসলমানেরা ইউরোপের স্পেন শাসন করে সেখানকার জংলী, বর্বর ও নৌ-দস্যুদের সভ্যতা শিখিয়েছে। নর ও নারীকে শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত করার। আর পরবর্তীতে বিজাতীয়দের চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে এই নারীর কারণেই স্পেন থেকে মুসলিম শাসকেরা অত্যন্ত নির্মমভাবে বিতাড়িত হয়েছে।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাসির কবি সুকুমার রায় তাঁর একটি হাসির কবিতায় লিখেছেন ঃ   হাঁস ছিলো সজারু, / ব্যাকরণ মানিনা।

হয়ে গেলো হাঁসজারু / কেমনে তা জানিনা।

সুকুমার রায় সজারু'র ব্যাখ্যা না জানলেও তাঁর পূর্বপুরুষ প্রাচীন আর্য্য ব্রাহ্মণেরা এর ব্যাখ্যা ভালো ভাবেই দিয়েছেন। প্রাচীন আর্য ব্রাহ্মণরা মনে করতো প্রথম প্রজন্মে একজন ১০০% মুসলমানের সাথে ১০০% হিন্দু রমনী বিয়ে কিংবা মিলন ঘটলে যে শংকর সন্তান জন্মলাভ করবে, সে হবে ৫০% মুসলমান এবং ৫০% হিন্দু ভাবাপন্ন। দ্বিতীয় প্রজন্মের সেই ৫০% মুসলমানের সাথে আবার যদি ১০০% অমিশ্রিত কোন হিন্দু রমণীর বিয়ে হয়, তাহলে যে শংকর সন্তান জন্মাবে, সে হবে ১৭% মুসলমান এবং ৮৩% হিন্দু ভাবাপন্ন। এভাবে তৃতীয় প্রজন্মে সেই ১৭% মুসলমান পুরুষের সাথে যদি কোন ১০০% হিন্দু রমণীর বিয়ে বা মিলন ঘটে, তাহলে যে শংকর সন্তান জন্মাবে সে হবে ৯৩% হিন্দু এবং ৭% মুসলমান। এভাবে তিনি প্রজন্মেই একজন খাঁটি মুসলমান সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয়ভাবে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুভাবাপন্ন হতে বাধ্য হবে। তারা এই বিশেষ প্রক্রিয়ার নামকরণ করেছিল "তিন প্রজন্ম প্রকল্প।" এই তিন প্রজন্ম প্রকল্প ছিলো অনেকটা "হাসজারু' জীব ধরণের। মুখটা হাঁসের মতো অথচ দেহটা সজারুর কাঁটায় ভর্তি। এই হাঁসজারু এক ধরণের অদ্ভুত কাল্পনিক জীব।

আর্য্যরা 'তিন প্রজন্ম প্রকল্প নীতি' নামক এই 'হাঁসজারু' পদ্ধতির দ্বারা শক-হুন এবং বিশেষ করে ভারতের মুসলমান শাসনামলে নাকি অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন। সে সাফল্য ছিলো একটি শক্তিশালী জাতিকে ধ্বংস করার।

ইতিহাস থেকে জানা যায় ভারতের সমস্ত রাজা-মহারাজারা একত্রিত হয়ে ৫০০ রণহস্তী, ৮ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে মোঘল সম্রাট বাবরকে আক্রমণ করেছিলো। এতে বিপুল রণসম্ভার নিয়ে 'খানুয়া' যুদ্ধে পরাজয়ের পর তারা অনুধাবন করলো সম্মুখ যুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব নয়। তারা নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। সম্রাট হুমায়ুনের আমলে তারা মোঘলদের বন্ধু সেজে ঝাঁকে ঝাঁকে বর্ণবাদী হিন্দুরা নারী ও

www.pathagar.com

মিসরের বাদশাহ ফারুক পাশ্চাত্যের ইহুদী-খ্রীষ্টানদের লেলিয়ে দেয়া নারীর কারণে হতে হয়েছিল রাজ্যহারা

সুরার জমজমাট হেরেম গড়ে তোলে।

প্রথম জীবেন আকবর অত্যন্ত ধর্মভীরু একজন পরহেজগার মুসলমান ছিলেন বলে অনেক ইতিহাসবিদ মত প্রকাশ করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তিনি জামাতের সাথে আদায় করতেন। এমনকি কোথাও সফরে বের হলে ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বের হতেন। এসব কারণে চতুর্দিকে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র ষোল বছর বয়সে আকরব দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ষোল বছরের অশিক্ষিত বালক আকবর রাজনীতিতে ছিলেন একেবারেই অজ্ঞ। এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বর্ণবাদী হিন্দুরা সম্রাট আকবরকে সুরা-নারীতে তালিম দেয়। বাদশা শাহজাদাদের সঙ্গে বর্ণবাদী হিন্দুরা আপন ভগ্নি-কন্যাদের বিয়ে দিয়ে সঙ্গে দাসী বাঁদিব বহর পাঠিয়ে শাহী মহল দখল করে নেয়। অম্বর রাজ বিহারীমল আকবরকে আপন কুমারী কন্যা দান করেন। সেই কন্যার গর্ভেই জন্ম নেয় পরবর্তী সম্রাট সেলিম বা জাহাঙ্গীর।

ফরাসী মহিলা

জাইভার কন্যা

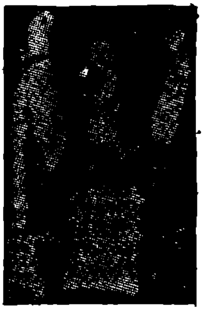

জনৈকা নর্তকী

মানসিংহের আপন ফুফু জয়পুরী বেগমকেও বিয়ে দেয়া হয় আকবরের সাথে। মানসিংহের আপন বোন রেবা রাণীকেও পাঠিয়েছিলেন আকবরের হেরেমে। কিন্তু 'মহামতি' আকবর রেবা রাণীকে নিজে গ্রহণ না করে পুত্র জাহাঙ্গীরের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। এভাবে যোধপুরের রাজা উদয় সিংহ এবং জয়সলমীরের রাজাও আপন প্রিয়তমা কন্যাদের আকবরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বিকানীরের রাজা রায় সিংহও আকবর দি গ্রেটের হাতে আপন কন্যা দান করেছিলেন, আকবর সেই কন্যাকেও পুত্র জাহাঙ্গীরের হাতে তুলে দেন। মোঘল হেরেমের এইসব রাজপুত বালারা কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। তারা মোঘল হেরেমে এসেও স্ব স্ব ধর্ম পালন এবং প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছিলেন। এই সম্পর্কে শ্রী বিশ্বেশ্বর চৌধুরী টেকনাফ থেকে খাইবার গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"বুদ্ধি-মেধা, বীর্যের দিক থেকে সম্রাট আকবর যে মুসলিম শাসকদের শ্রেষ্ঠতমদের

www.pathagar.com

মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইহা তাঁহার চরম শত্রুও স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু কুসুমে কীটের ন্যায় আকবরের চরিত্রও দুর্বলতার দানা বেঁধে উঠেছিল। বিরাট সাফল্যের বুকে সৃষ্ট চরম অহমিকায় আঁতুড় ঘরেই এ কীট জন্ম নিয়েছিল। এ কীটের রূপ ও অবয়ব গভীরভাবে পরখ করেই রাজপুতদের অবয়বে হিন্দু প্রতিভা রাজপুত সুন্দরীদের মোঘল হেরেমে প্রতিষ্ঠা করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে সততা প্রমাণের জন্য সম্রাট আকবর ইসলামের অনেক বিধি-নিষেধ অমান্য করতে শুরু করেন। মুসলমানগণ বহু ধর্মীয় অধিকার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণ দেশে মূর্তিপুজা ও অগ্নিপুজার অবাধ অধিকার লাভ করেন। শাহী মহলে মূর্তিপূজা, অগ্নিপুজা একটি নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়।

আকবরের সময়ে বেশ্যাখানা বৈধ করা হয় এবং প্রথম কর ধার্য করা হয়। বিকৃত রুচির আকবরের দাবা খেলার গুটি ছিলো জীবন্ত ষোড়শী যুবতী সুন্দরী নারী। সেই নারী নিয়ে হার-জিত হতো আর জিতে নেয়া নারীদের ব্যবহার করা হতো আনন্দের সামগ্রী স্বরূপ। সুন্দরী সুবেশা তরুণীদের দাঁড় করিয়ে ছক কাটা ঘরে পাশা খেলতেন সম্রাট আকবর।

আকবরের কাছে বিবাহ আর ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য ছিলো না। কোনো কোনো পন্ডিতও বলেছেন, বিকানীরের রাজকন্যাকে আকবর বিয়ে করেছিলেন আবার তাঁরই সঙ্গে খৃস্টানদের অবাধ মেলামেশা করার ক্ষেত্রে আকবরের যথেষ্ট উৎসাহ ছিলো। তাঁরই গর্ভে একটি সুন্দর সুস্থ সন্তান জন্মেছিল, আকবর সেই নবজাতকের নাম তাঁর মদ্যপানের সাথী মিঃ দানিয়েলের নাম অনুসারে রেখেছিলেন, দানিয়েল। (দ্রঃ দুর্গোদুর্গে)

বিলাসী জাহাঙ্গীর বলেন, রাজ্যের খবর রাখেন নূরজাহান। আমি শুধু একটু মদ আর মাংস ছাড়া আমি কিছু চাই না, রাজ্য নয়, শাসন নয়।

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোঘল বংশের উত্তরসূরীরা কিরূপ নিষ্ঠুরতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়েছিলো অসংখ্য দৃষ্টান্ত থেকে এখানে দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

১১২৪ হিজরীর জমাদিউল উলা মোতাবেক ১৭১২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যখন জাহাঁদার শাহ লাহোর থেকে দিল্লী পৌঁছলেন, তখন থেকে জাহির হতে লাগলো একজন অথর্ব বিলাসপ্রিয় লোককে সম্রাট বানানোর কি পরিণতি হতে পারে। সম্রাট লাল কানোরকে ইমতিয়াজ মহল খেতাব দিয়ে সাম্রাজ্যের কোষাগারে এবং যাবতীয় পদমর্যাদায় তাঁর ও তাঁর আপনজনদের অবাধ অধিকার দিয়ে দিলেন। মননশীল ও গুণধর লোকদের জন্য শাহী আনুকূল্যের দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন। আর লাল কানোরের আত্মীয়স্বজন যাদের সকলেই ছিলো দুষ্ট প্রকৃতির, নীরাশয়, নির্বোধ, গুন্ডা-পান্ডা ও গায়ক-বাদক– তাদেরকে পাঁচ হাজারী ও সাত হাজারী পদবী এবং অসংখ্য খেতাব, পুরস্কার ও পতাকায় ভূষিত করলেন। লাল কানোরের সহোদর ভাই খোশহাল খানকে আগ্রার এবং চাচাতো ভাই নিয়ামত খানকে মুলতানের সুবেদার নিয়োগ করেন। স্বয়ং লাল কানোরের ঘরোয়া ব্যয় নির্বারে জন্য তাকে বার্ষিক দু'কোটি রুপিয়া উৎপাদনযোগ্য ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। তাকে রাজকীয় পতাকা, বাদ্য ও অন্যান্য সরকারী উপকরণ

www.pathagar.com

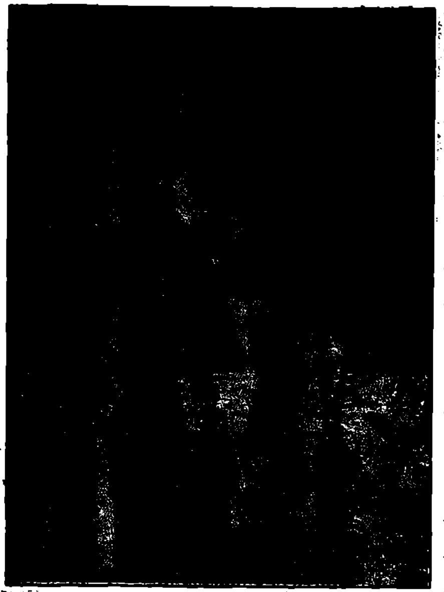
অসবর্ণ বিয়ের বিষময় ফল ঃ মোঘল পরিবারে শিব পূজা

ব্যবহারের অনুমতি দেন, তার নামে মুদ্রা চালু করেন এবং নানাভাবে তাকে এতো খুশী করেন যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরও নূরজাহানকে এত খুশী করতে পারেননি। তাঁর বাসনা পূরণে সম্রাট উন্মত্ততার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন। একবার লাল কানোর যমুনা নদীতে যাত্রীভর্তি এক নৌকা চলতে দেখে আক্ষেপ করে বললো যে, আমি আজ পর্যন্ত নৌকা ডোবার দৃশ্য দেখিনি। একথা শোনামাত্রই সম্রাট নির্দেশ জারী করলেন এবং যাত্রী ভর্তি সেই নৌকাখানি তার সামনে এনে ডুবিয়ে দেয়া হলো। আলমগীরের কন্যা এবং জাহাঁদার শাহের ফুফু জিনাতুল নেসা লাল কানোরের সামনে উপস্থিত হতে অস্বীকার করায় জাহাঁদার স্বীয় ফুফুর মুখ পর্যন্ত দেখতে চাননি। স্বয়ং জাহাঁদারের দুই পুত্র আয়াজ্জুদৌলা ও মুইজ্জুদ্দৌলাকে লাল কানোর পছন্দ করতো না বলে পিতা তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

যাবতীয় রাজকীয় রীতি-প্রথা পদদলিত করে ৫২ বছরের এই ভিমরতিগ্রস্ত বৃদ্ধ প্রেমিক স্বীয় প্রেমিকা ও তার গায়ক-গায়িকা ও বাদক বাদিকা সঙ্গীদের সাথে বসে মদ খেত ও নাচতো গাইত। সবাই মাতাল হয়ে যাওয়ার পর তার সাথে চড়-থাপ্পড় মেরেও রসিকতা করতো। লাল কানোরের সাথে রথে বসে বাজারে যাওয়া এবং পানশালায় যেয়ে মদ খাওয়া তার নিত্যকার রীতি হয়ে দাঁড়ায়। একবার দু'জনে এক পানশালায় যেয়ে আচ্ছামত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যায়। আসবার সময় পানশালার বেয়ারারকে একটা গ্রাম জাইগীর হিসেবে দিয়ে অনুকম্পা দেখানো হয়। রথে আরোহণ করে উভয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রাসাদে পৌঁছার পর লাল কানোরকে তো পরিচারিকারা তুলে নিয়ে গেলো কিন্তু সম্রাটকে তোলার কথা কারোর মনে থাকলো না। রথ চালক রথটা নিয়ে গাড়ীখানায় রেখে দিলো। রাতের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কেটে যাওয়ার পর প্রাসাদে সম্রাটের খোঁজ পড়লো। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ভারত সাম্রাজ্যের এই অধিপতিকে প্রাসাদ থেকে দু'মাইল দূরে অবস্থিত গাড়ীখানার এক রথে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গেলো। আলমগীরের মৃত্যুর পর তখনো পাঁচ বছর অতিবাহিত হয়নি। এতো অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ আকাশ-পাতাল ব্যবধান দেখে জনগণ সম্রাটের ওপর এতো বিরূপ হয় যে, সম্রাট রাস্তায় বেরুলে কেউ তাকে এতোটুকু সম্মান দেখাতো না এবং কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তার সম্মানার্থে সামান্য একটু পথও হেঁটে এগিয়ে দিতো না।

সম্রাটকে এমন ভোগের আনন্দে গা ভাসিয়ে দিতে দেখে জুলফিকার খানেরও ৫৯

www.pathagar.com

বছর বয়সে ভোগ-বিলাসে মত্ত হবার শখ জাগলো। রাজকার্যের তদারকীর দায়িত্ব সভাচাঁদের হাতে অর্পণ করে সেও খাসমহলের আমোদ ফূর্তিতে যোগ দিলো। এদিকে সভাচাঁদের অশ্রাব্য ও অশ্লীল কথাবার্তায় সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং জুলফিকার খানের স্বভাব-চরিত্র এবং আচার-ব্যবহারও আলমগীরের আমলে যেমন ছিলো, তেমন আর রইল না। সে খুবই অনুদার, সংকীর্ণমনা ও হিংসুটে হয়ে উঠলো। কারুর উপকার করতে সে খুবই মর্মযাতনা ভোগ করতো। কাউকে উন্নতির পথে এগুতে দেখলে তাকে সাহায্য করার পরিবর্তে কিভাবে পেছনে ঠেলে দেয়া যায় তাই ভাবতো। তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও মিথ্যাচার সর্বশ্রেণীর মানুষের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এক সময় এই জুলফিকার খানই আলমগীরের সর্বোত্তম সামরিক অধিনায়ক ও নামকরা দক্ষ প্রশাসক ছিলো। আর আজ তার অস্তিত্ব সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠলো এবং তার বিচক্ষণতা অথর্বতায় ও সুনাম দুর্নামে পর্যবসিত হলো।

এভাবেই হিন্দুরা বাদশাহের প্রশস্তি গেয়ে এবং শাহজাদাদের খেলার পুতুল বানিয়ে মোঘল শাহীর বড় বড় পদগুলো দখল করে সারা ভারতে পরবর্তী তিন প্রজন্মেই শক্তিশালী মুসলমান শাসকদের নির্বংশ করেন এবং মুসলিম শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য গ্রহণ করে নানা ছলচাতুরী। আর এভাবেই সদরে-অন্দরে চক্রান্তের ফলে সুরা ও নারীত্বে আসক্ত মোঘলদের পতনের পূর্ণতা পায় নৌ-দস্যু ইংরেজদের এদেশে আগমনের মাধ্যমে।

টমাস রো ছিলেন একজন ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ। 'তিনি ইংল্যান্ডের রাজা জেমসের দূত হিসেবে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে উপস্থিত হন সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজসভায়। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে সুবিধাজনক শর্তে বাংলা ও অন্যান্য স্থানে অবাধে বাণিজ্য করার অনুমতি দেন।'

টমা রো ইংল্যান্ডের পক্ষ থেকে নানা উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হন জাহাঙ্গীরের দরবারে। টমাস আনুগত্য, ভক্তি, প্রীতি আর অনুনয়নের যে অভিনয় করেছিলেন তাতে সফল হয়েছিলেন তিনি। উপঢৌকনের মধ্যে ছিলো দামী দামী মণিমুক্তার মালামালসহ চিত্তাকর্ষক নানারকমের গহনা, কিছু মূল্যবান পাথর যেগুলো গহনা বা মুকুটে ব্যবহারের উপযুক্ত। সাধারণ দরিদ্র মৃত সৈনিকের বিধবা স্ত্রী নূরজাহান একনজরেই পছন্দ করে ফেলেছিলেন টমাসের বেশির ভাগ নৈবেদ্য। জাহাঙ্গীরকে পছন্দ করানোর মতো উপহার ছিলো বিলেতি সুরা আর নেচে গেয়ে মুগ্ধ করতে পারে এমন সঙ্গীতজ্ঞ বেশ কিছু বিদেশী সুন্দরী। দিল্লীর দরবার সেদিন ঠিক করতে পারেনি ঐ সুন্দরীদের আসল পরিচয়। সুন্দরীদের প্রত্যেকেই ছিলো জটিল রাজনীতিতে শিক্ষণপ্রাপ্ত, সচেতন ও স্বদেশ প্রেমিকা। সুতরাং চিত্তবিনোদন এবং স্ফূর্তির চরম ও পরম মুহূর্তে তারা নানা কায়দায় বাদশার হাতের পাঞ্জার ছাপ আদায় করতো অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের ইচ্ছামতো সুবিধাগুলো অনুমোদন করিয়ে নিতে পেরেছিল সহজেই। জাহাঙ্গীরের পক্ষ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইচ্ছাধীন শর্তে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ অবিভক্ত বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার ইংরেজরা পেয়ে গিয়েছিল অনায়াসে। বাণিজ্য করার ও 'কুঠি' স্থাপন করার অধিকারের ভবিষ্যতে কী বিবর্তিত রূপ হবে তা টের করতে

www.pathagar.com

পারেননি মদ্যপ জাহাঙ্গীর ও তাঁর পথপ্রদর্শক পরম পিতৃদেব 'মহামতি' আকবর। বাণিজ্যের 'কুঠি'ই পরিণত হয়েছিল রাজনীতির দুর্গে। টমাস রো'র মতো একজন নেতাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে বা তাঁর শোষণের চক্রান্তের মূল্যায়নে তাঁকে ইংল্যান্ড থেকে দেয়া হয়েছিল 'স্যার' উপাধি। এই চক্রান্তের কাফ্ফারা এই উপমহাদেশের মুসলমানদের দিতে হয়েছিল একশ' নব্বই বছর। আধুনিককালে এই চক্রান্তের ফাঁদে পড়েছিলো ইরানের বাদশাহ শাহ পাহলভী। মিসরের বাদশাহ ফারুক। নারীর কারণে নীতিভ্রষ্ট হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছিল নির্মমভাবে। যা ইতিহাস তার সাক্ষী।

কাজী নজরুল ইসলামের অসাধারণ প্রতিভাকে বলা যায় আল্লাহর কুদরতি শক্তি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিকসহ সকল ক্ষেত্রে মুসলমানেরা ছিলো সর্বেসর্বা। কিন্তু বৃটিশ আমলে সকল ক্ষেত্র থেকে মুসলমানেরা বিতাড়িত হয়ে পরগাছা জাতিতে পরিণত হয়েছিল। কুসংস্কার ও পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ছিলো। কবি নজরুল ইসলাম হতাশাগ্রস্থ মুসলমানদের আশার বাণী নিয়ে উল্কার মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। এটা ছিলো সাহিত্যাঙ্গনের একচ্ছত্র সম্রাটদের জন্য চপেটাঘাত। এ আঘাত তারা সহ্য করতে পারেনি। চিরায়ত রীতিতে কবি নজরুলকে লক্ষ্যচ্যুত করার জন্য নারীকে ব্যবহার করেছিলো। যখন তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তখন তাঁকে জীবন মৃত নির্বাক করে রাখা হয়েছিলো।

সমকালীন বিশ্বে আমরা একই খেলা প্রত্যক্ষ করছি। প্যালেস্টাইনের ইয়াসির আরাফাত, পাকিস্তানের ক্রিকেট তারকা ইমরান খান, ভারতের ক্রিকেট তারকা আজহারউদ্দিনসহ অসংখ্য প্রতিভাবান ও সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্যচ্যুত করার অশুভ প্রয়াসে নারীকে ব্যবহার করা হয়েছে বা হচ্ছে। শুধু প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্যচ্যুত করেই এরা ক্ষান্ত হয়নি। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস, নির্জীব অথবা এ ধরা থেকে মুছে ফেলার বহুমুখী চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

ব্যভিচারের মানসিকতা শুধু ব্যক্তির শৌর্য, বীর্য, মেধা মননশীলতাকেই নষ্ট করে না, তদ্বারা একটা জাতির শৌর্য, বীর্য কূটনৈতিক দূরদৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তারই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন আমাদের দেশের সাংবাদিক শফিকুল কবির। তিনি তার লন্ডন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার উপর ২৫ আগস্ট, ১৯৮৯ তারিখে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটির নাম ছিলো "টিকাটুলী থেকে পিকাডেলী"। এটি ১৯৮৯ সালের আগস্ট মাসে সাপ্তাহিক বিচিন্তায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন–

"একদিন বিকেলে, বিলি ব্রাউন এর সাথে এম্বেংকমেন্ট এ টেমস" নদীর তীর ধরে হাঁটছিলাম। এখান থেকে টেমসে নৌ বিহারের জন্য স্পীড বোট ভাড়ায় পাওয়া যায়। আমরাও নৌ বিহারে যাব কিনা ভাবছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম, দু'জন আরব শেখ চারজন তন্বী-তরুণীকে বগলদাবা করে রিভারক্রুজ ঘাটের দিকে টলতে টলতে এগুচ্ছে। তরুণীরা শেখদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রকাশ্যেই চুমো খাচ্ছে, বুকের ঘর্ষণে, সেন্টের আমেজ ছড়িয়ে আনসেন্সরড ফিল্মের মতো যৌবন প্রদর্শন করছে।

বিলি আমাকে আঙ্গুলের খোঁচা দিয়ে বললো ঃ কি, দেখছ তো, পেট্রো ডলার?

জবাব দিলাম– হাঁ, বুঝতে পাচ্ছি।

বিলি বললো ঃ পেট্রো ডলার শেখ সাহেবদের গলায় যাদের হাত দেখছ, তারা কেউ এদেশের বা ইউরোপীয় কোনো দেশের মেয়ে নয়– এরা সবাই ইসরাইল থেকে আগত নটি সুন্দরী। তাদের চারজনের মধ্যে একজনকে আমি চিনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের একটি নাইট ক্লাবে সে নাচে। অনেকে তাকে ইসরাইলী গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করে।

www.pathagar.com

৩০ লাখ মানুষের ছোট দেশ ইসরাইল। কিন্তু কি মারণাস্ত্র দিয়ে ছয়টি শক্তিশালী আরব দেশকে কাবু করে রেখেছে এবং গোটা মুসলিম বিশ্বকেই তারা তোয়াক্কা করে না। সেই গোপন সামরিক শক্তিটি আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠলো।

বিলিকে বললাম, ইন্ডিয়া সাব-কন্টিনেন্টে একটা প্রবাদ আছে, হিন্দুর পয়সা হলে করে বাড়ী আর মুসলমানের পয়সা হলে খুঁজে নারী।

বিলি ব্রাউন আরব শেখদের ক্রিয়াকান্ড লক্ষ্য করে বললো, আনবিক বোমার চাইতেও শক্তিশালী একটি নারী দেহ। এমনকি এই যে তোমার কাছে আমি দাঁড়িয়ে আছি, ইচ্ছে করলে এখনি তোমাকে, তোমার দেশকে কিংবা একটি মহাদেশকে কাবু করে বুকের ব্রা-এর নিচে, এমনকি ক্ষিপ্ত হলে পায়ের তলায় পিশে ফেলতে পারি।

শৌর্য-বীর্য নষ্ট করে নিজ দেশ ইসরাইলের নিরাপত্তা বিধান করে। এ কারণেই শফিকুল কবিরের বিলি ব্রাউন ইসরাইলী মেয়েদের ব্রা-এর নিচে শক্তিশালী এ্যাটম বোমা আবিষ্কার করেছেন। এই বোমা প্রতিপক্ষকে জীবনে মারে না বটে, কিন্তু সাপুড়েরা সাপের মাথায় যেমন করে বশীকরণ হাত বুলিয়ে সাপকে বশ মানায়, ইসরাইলী মেয়েরা তেমনি ব্রা-এর ঘর্ষণ দ্বারা আরব বীরদের নিস্তেজ করে পোষ মানিয়ে রাখে। শুধু নিস্তেজ করে রাখাই নয়; ব্রা-এর ঘর্ষণ দ্বারা নীরিহ আরবীকে দিগদ্বিগ জ্ঞান শূন্য যৌন মাতালে পরিণত করে তার দ্বারা অসাধ্য সাধন করাতেও দেখা গেছে। যেমন সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সল বিন আব্দুল আজিজ ইসলামী বিশ্বের মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিভা স্ফূরণের জন্য এবং মুসলমানদের আভিজাত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য নানা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করছিলেন। বাদশাহর এ ধরনের ব্যবস্থাপনা ইহুদীদের সন্ত্রস্ত করে তোলে। হঠাৎ একদিন বাদশার নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র তাকে গুলি করে হত্যা করে। তদন্তকালে দেখা যায়, ঐ সময় ভ্রাতুষ্পুত্রটি এক ইহুদী তরুণীর প্রেমরসে মত্ত ছিলো।

ভারতীয় সিনেমা 'খল নায়িকা'র একটি সংলাপে নায়ক তার স্ত্রীর বান্ধবীর উন্নত বুকের দিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করেছিল– ব্লাউজের ভিতরে কি আছে। বান্ধবীটি বলেছিল, ব্লাউজের ভিতরে তবাহি আছে। তবাহির অর্থ ধ্বংস বা এ্যাটম বোমা। এখন দেখুন, ইসরাইলী মেয়েদের ব্রা-এর নিচের এ্যাটম বোমার সাথে সিনেমার ঐ তবাহি কথাটির কি সুন্দর মিল রয়েছে। ঐ তবাহিই ভিডিও-এর মাধ্যমে আমাদের উপর প্রয়োগ করা হচ্ছে।

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার সম্ভ্রান্ত দৈনিক 'ডেইলি নিউজ'-এ বলা হয় যে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' টার্গেট করেছে যে, ২০০৫ সালের মধ্যে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে প্রভাবসম্পন্ন মুসলিম পরিবারসমূহে অন্ততপক্ষে দশ লাখ ভারতীয় হিন্দু মেয়েকে গৃহবধূ হিসেবে প্রবেশ করাতে, যাতে সেসব দেশে ভারতের প্রভাব স্থাপিত হয়। ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে শুরু হওয়া এই 'অভিযানের' নাম দেয়া হয়েছে 'অপারেশন এঞ্জেলস্ লাভ'। 'র'-এর এই অশুভ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বিভিন্ন প্রভাবশালী পরিবারেও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার নির্বাচিত বধূবেশী এজেন্টরা প্রবেশ করে সেসব দেশে ব্যাপকভাবে ভারতীয় আধিপত্য বিস্তারে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে। এ পর্যন্ত 'র' এই অভিযানে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৭/৩/২০০১)

অতীতের ইতিহাস, ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চিরাচরিত বহুমুখী চক্রান্ত এবং বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপট থেকে মুসলমানেরা যদি তাদের পতন ও বিপর্যয়ের কারণগুলো যথার্থভাবে চিহ্নিত করে তা সংশোধনের প্রয়াস গ্রহণ না করে বা সতর্ক না হয় তাহলে মুসলমানদের জন্য আরো করুণ পরিণতি ও বিপর্যয় অপেক্ষা করছে।

www.pathagar.com

বৃটিশ যুগে এদেশের নারী সমাজ

পরাধীন আমলে বৃটিশ ও হিন্দুদের চক্রান্তের ফলে ভারতীয় মুসলমানেরা সর্বক্ষেত্রে তার গৌরবজনক স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। ইসলামের সঠিক নির্দেশিত পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে নানারূপ বিভ্রান্তিতে পতিত হন। ইংরেজ প্রবর্তিত কু-শিক্ষার ফলে নানা কুসংস্কারে নিমজ্জিত হন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে পরগাছা জাতিতে পরিণত হন। আগেই বলেছি কু-শিক্ষা এবং কৌশলগত চক্রান্তের ফলে তৎকালে ইংরেজদের ফরমায়েশ মতো একশ্রেণীর কাঠ মোল্লা তৈরি হয়। এই কাঠ মোল্লারা ধর্মের নামে ইসলাম ধর্মের সাথে সঙ্গতিবিহীন নানারূপ ফতোয়া জারি করে নারীকে পর্দার নামে চার দেয়ালে আবদ্ধ রাখে। সে সময়ে এ দেশের মুসলিম নারীদের জীবন নানা অত্যাচার-অবিচার, অশিক্ষা, কু-শিক্ষা ও কুসংস্কারের পংকিলে নিমজ্জিত ছিল তা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

হজরতমহল

নুরুন্নিসা

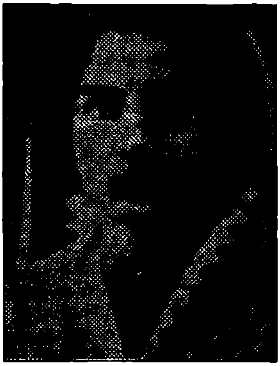

অরুণা আসফ আলি

আবেদা খান

- নারীদের জীবন সত্তার স্বীকৃতি না দিয়ে সংস্কারবদ্ধ সমাজ তাদের দেহ ও মনকে জড়পিন্ডবৎ করে রেখেছিলো।
- মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষাদান নিষিদ্ধ ছিল। তাদের বাংলা শিক্ষার বিরুদ্ধে সমাজের কঠোর নির্দেশ বলবৎ ছিল। মেয়েদের বাল্য শিক্ষা দানকে অনেক মুসলমান ধর্ম বিরোধী কাজ বলে মনে করতেন।
- অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মুসলিম পরিবারে কঠোর অবরোধ প্রথার প্রচলন করা হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস মুসলিম নারীর জন্য ছিল চিররুদ্ধ। ধর্মের দোহাই দিয়ে অবরোধের

www.pathagar.com

কঠোরতা এদের কর্মশক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছিল। মেয়েদের বাড়িতে কেউ প্রবেশ করলে পাঁচ বছরের মেয়েটিকে পর্যন্ত দৌড়ে লুকিয়ে থাকতে হতো।

★ বাল্যবিবাহ প্রথা অত্যধিক পরিমাণে চালু ছিল। ফলে অকাল মাতৃত্বের জন্য মেয়েরা স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যহীন হয়ে পড়তো। গুরুতর অসুস্থ হলেও মেয়েদের ডাক্তার বা কবিরাজ দেখানো হতো না। পর্দা নষ্ট হওয়ার এবং দোযখে যাবার ভয়ে। রোগাক্রান্ত নারীরা এভাবে বিনা চিকিৎসায় কঙ্কালসার হয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করতো অথবা অকালে তাদের জীবন অবসান ঘটতো।

★ খান্দানী এবং অর্থশালী লোকের পত্নীরা ছিলো তাদের ভোগের বস্তু। এরা সংখ্যায় ছিলো নগণ্য। আর গরীব লোকের স্ত্রীরা ছিলো ক্রীতদাসীরও অধম। পরিবারে তাদের কোন মর্যাদাই ছিলো না। তাদের দিয়ে কঠোর শারীরিক

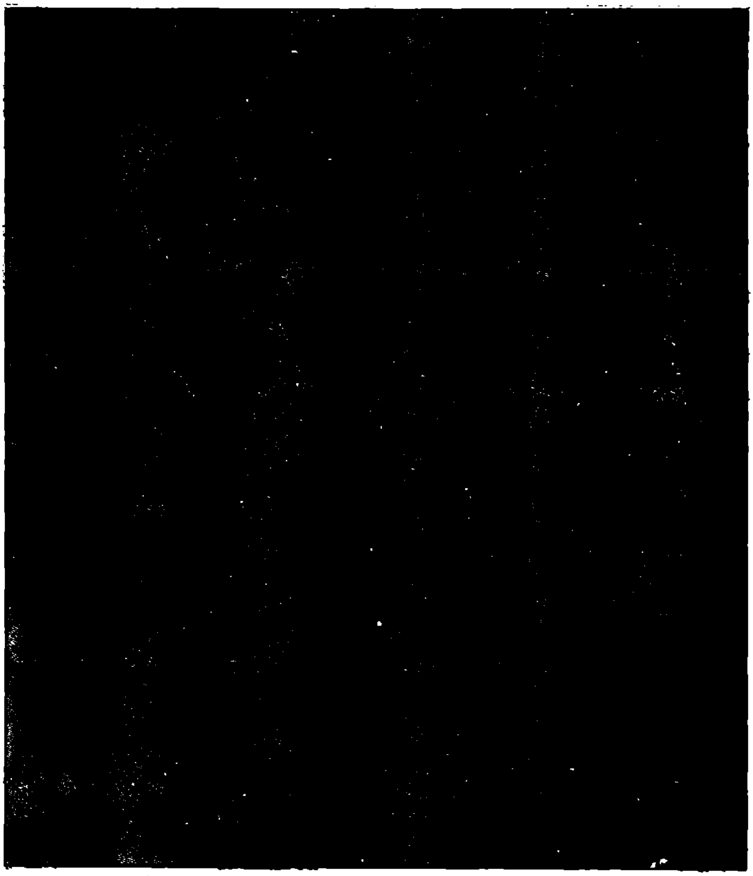

১৮৬০ সালে পূর্ব বাংলায় বাবু ও ইংরেজদের নির্মম শোষণের শিকার তিনটি নারী মুখ। ছবিটি তৎকালীন বৃটিশ সরকার লন্ডনে পাঠিয়েছিলো

www.pathagar.com

পরিশ্রমের কাজ করানো হতো। তাদের উপর চলতো নিত্যদিন অমানুষিক অত্যাচার।

* কঠোর অবরোধের নিগ্রহ ছাড়াও উৎপীড়ন, অবজ্ঞা আর লাঞ্ছনা ছিল সে যুগের নারীদের সারা জীবনের সঙ্গী। প্রতিবাদের ভাষা তাদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ। অজ্ঞানতার অন্ধকারে আজীবন অবস্থান করার ফলে নিজের দুর্গতি অনুভব করার শক্তিও তারা হারিয়ে ফেলেছিলো।

পূর্ব বাংলার প্রথম মুসলিম মহিলা এম.এ ফজিলাতুন নেসা। প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি।

* মুসলিম সমাজে নারীদের জন্য ইসলামের বিধান ছিলো কার্যতঃ অচল। সমাজে তারা গৃহপালিত এবং গৃহে আবদ্ধ জীব বিশেষ রূপে পরিগণিত ছিলো। ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও স্বাধীনতা দিয়েছে বাংলার মুসলিম সমাজ সে অধিকার থেকে জোরপূর্বক তাদের বঞ্চিত রেখেছিলো। স্বামীর খেয়াল-খুশী অনুযায়ী বিবাহিতা স্ত্রীকে তালাক দেয়া হতো। কোন মেয়ের হাতের লেখা পর পুরুষের চোখে পড়লেও তা মেয়ের বেপর্দা বলে ধরে নেয়া হতো। এ কারণে লেখাপড়া শেখাই ছিলো তাদের জন্য নিষিদ্ধ।

বৃটিশ শাসকদের কাছে মেয়েদের ভোটের অধিকারের দাবীতে মহিলা প্রতিনিধি দল

www.pathagar.com

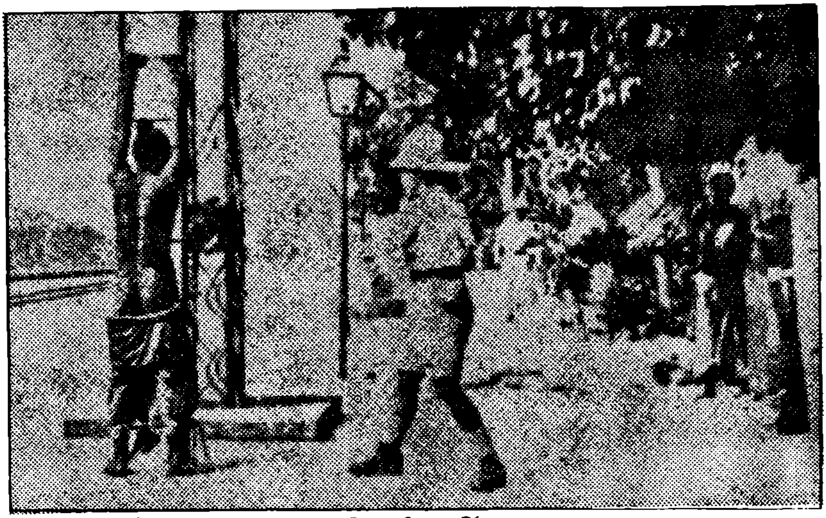

বৃটিশ আমলে একজন রাজনৈতিক মহিলা কর্মীকে উলঙ্গ করে বেত্রাঘাত করছে

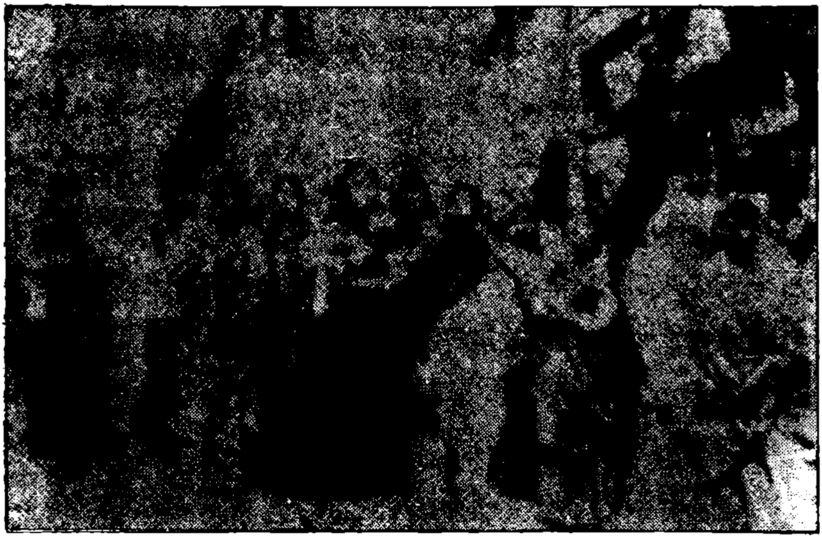

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে নারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী

www.pathagar.com

বৃটিশ আমলে বাবুদের মনোরঞ্জনে কালিঘাটের নট

★ শাস্ত্রের নামে সমাজপতিরা বলতেন– 'বন্দী জীবনই নাকি আল্লাহ্ মুসলিম নারী সমাজের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।' কিন্তু তথাকথিত শাস্ত্রের এ ধরনের নির্দেশ ছিলো পুরুষ জাতির মনগড়া তৈরী এবং পুরুষদের মুখেই তা প্রচারিত হতো।

★ সমাজের একশ্রেণীর লোক নারীর উপর অত্যাচারকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমর্থন করতেন। ইসলামের বিধানে বিবাহে কন্যার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি অপরিহার্য। কোরআনের বিধান থেকে এটাও স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় যে, পাত্র নির্বাচন করার অধিকার পাত্রীরও রয়েছে। নাবালিকার বিয়ে ইসলাম উৎসাহিত করে না। তবুও সমাজে নাবালিকা বিবাহ চলতো নির্বিঘ্নে, নির্বিবাদে এবং সংখ্যাতীতভাবে মেয়েদের কোন সম্মতি না নিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে কবুল ইজাব পর্যন্ত ভালরূপে গ্রহণ না করে বিবাহ কাজ সম্পন্ন করা হতো। নারীকে সেখানে দেহ-মন বিশিষ্ট কোন জীব হিসেবে দরে নেয়া হতো না। নাবালিকা বিবাহ, স্বামীর অত্যাচার, শাশুড়ী-ননদের অত্যাচার, অকাল মাতৃত্ব, স্বাস্থ্য বিনাশ, দুর্বল সন্তান লাভ, এসবের অন্তরালে সমাজ মনের যে ছবিটি ফুটে উঠতো তাতেও মনে হতো না না যে, নারীরা মানুষ।

ইংরেজদের মনোরঞ্জনে আরেক নর্তকী

★ প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের অভিভাবকও যার সাথে খুশী মেয়ে বিয়ে দিতেন। বিয়ের মজলিস থেকে একজন উকিল ও দু'জন সাক্ষী গিয়ে প্রাপ্ত বয়স্কার সম্মতি গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সম্মতি না

www.pathagar.com

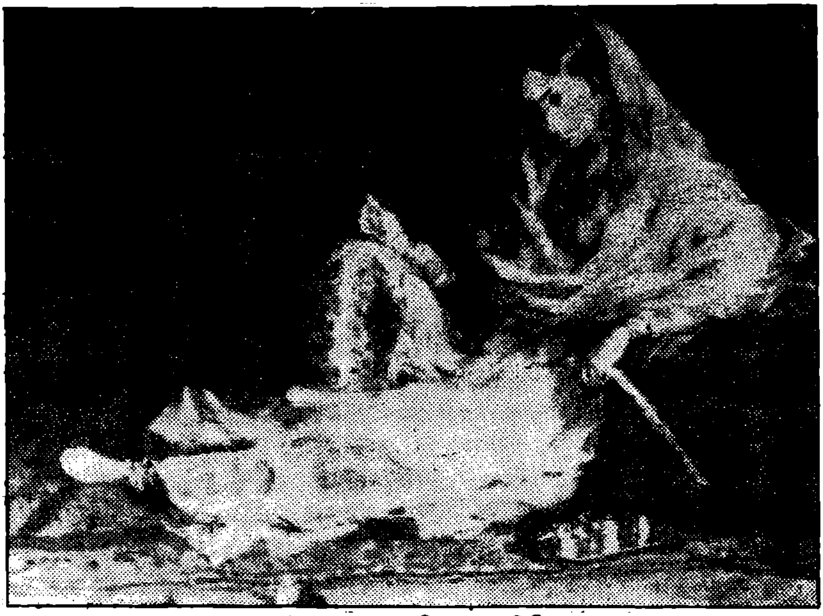

ইংরেজদের এদেশীয় শয্যা সঙ্গিনী

ইংরেজদের মনোরঞ্জনে নৃত্য পটিয়সী তিন বেশ্যা

www.pathagar.com

দেয়ার স্বাধীনতা কন্যার ছিলো না। কন্যা যদি বিয়েতে সম্মতি না দিতো তা হলে তার কলঙ্ক এতো বেশি প্রচারিত হতো যে, তার পক্ষে সমাজে বা গৃহে টিকে থাকাই ছিলো দুষ্কর। কন্যার জন্য অন্য একটি পাত্র পাওয়াও ছিলো দুঃসাধ্য। সুতরাং দেখা যায়, ইসলাম বৈবাহিক ব্যাপারে নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, বাংলার মুসলমান সমাজ তা থেকেও তাদের বঞ্চিত রেখেছিলো।

'৪৭-এর স্বাধীনতার পর ব্যাপক হারে মুসলিম নর-নারীর শিক্ষা লাভের পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে ছিটে-ফোটা যা আছে তাকে পুঁজি করে পরাধীন আমলে যারা নারীদেরকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিলো তারাই আজ এদেশীয় দোসরদের সহায়তায় নারী সমঅধিকারের নামে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে আঘাত হানছে। অপপ্রচার চালাচ্ছে। নারী কল্যাণের ছদ্মাবরণে এদেশের পারিবারিক ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলার সুগভীর চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তানীদের শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার নারী সমাজ

www.pathagar.com

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে স্বস্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন শিক্ষিতা মুসলমান নারী।

খানম ইখতিয়ার আজম

ডঃ খাদিজা কেজাবার্জ

ফাউজিয়া

নাজলী বেগম

মিসেস ফরিদা

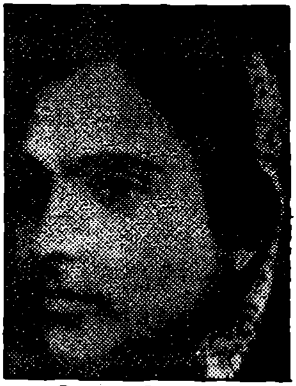

মিসেস হাসিনা মুরশিদ

শামসুন্নাহার মাহমুদ

মিসেস আসিয়া হাসান

মিসেস ইকবালুন্নিসা

www.pathagar.com

সফুরা খানম

সাহেরা খাতুন

কাজী সদরুন্নিসা

মিসেস আমিনুল হক

সৈয়দা ফাতেমা

সৈয়দা শাহজাদী

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকী

আকিকুন্নিসা

তৈয়েবুন্নিসা

www.pathagar.com

কাজী লুতফুন্নিসা

হোসনে আরা

হোসনা বানু

রওশন আরা

লায়লা হক

মিস্ নূরজাহান

ডাঃ কে. এন. খানম

মিস্ জিন্নাত মুখতার

মিসেস হিজাব ইমতিয়াজ

www.pathagar.com

মমতাজ জাহান

মিস জাফর আলী

মিস বিরজিস আবদুল্লা

বিবি মুলুক

মিস শিরীন সুজাত আলী

মিসেস হিলালী

মিসেস রহীম

ডাঃ কুমারী মাহমুদা

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

www.pathagar.com

লেডী ইমাম

লেডী মির্জা ইসমাঈল

ডঃ মিস সিরাজুদ্দিন

মিস আগা মুস্তাফা খাঁন

লেডী মহম্মদ শফী

মুওয়াইদজাদা এস. এফ সুলতান

বেগম মীর আমীরুদ্দিন

লেডী আব্বাসআলী বেগ

মিসেস কাসেম আলী

www.pathagar.com

হাসুরুন্নিসা বেগম

লেডী করিমভৈ

মিসেস হামিদা মোমেন

বেগম হবিবুল্লা

বেগম এম. এ. ফারুকী

ওয়াসিম বেগম

রো. মু. কমর সুলতান

সৈয়দা ফাতেমা খাতুন

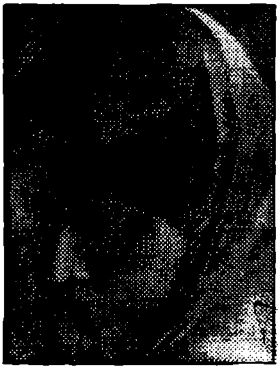
জাকিয়াহ মুনসুর

www.pathagar.com

বেগম সুফিয়া কামাল

বেগম শাহনাওয়াজ

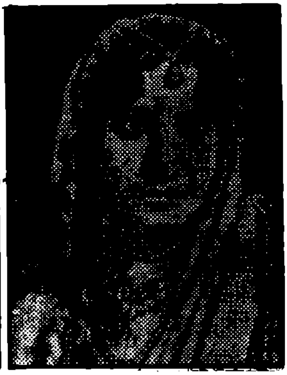

আতিয়া বেগম

লেডি আব্দুল কাদির

বেগম হামিদ আলি

দুররে শেহবার

প্রিন্সেস নিলুফার

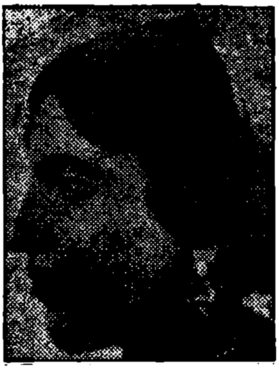

বেগম রামপুরী

ভুপালের বেগম সাহেবা

www.pathagar.com

নসিফুন্নিসা বেগম

কারওয়াই'র বেগম

মাফরুহা চৌধুরী

কাজলী লতিফা হক

জুবাইদা গুলশান আরা

সৈয়দা লুতফুন্নিসা

জেবুন্নিসা জামাল

হামিদা হাফেজ

সৈয়দা ফাতিমা বুলবুল

www.pathagar.com

শেরিফা নারগিস রেখা

আখতার বানু বেলা

রাবেয়া হায়দার

অধ্যাপিকা সাহেরা খাতুন

সালমা শহীদ চৌধুরী

দিল আফরোজ ছবি

শাহানা বেগম মলি

আসুরা খাতুন

লায়লা বিলকিস বানু

www.pathagar.com

মাহবুবা সুলতানা

ফ্লোরা নাসরীন খাঁন

মাহবুবা করিম

লিনডা রহমান

রেশমী আহমেদ রাসু

চৌধুরী মাহমুদা মইন

খোশনুর আলমগীর

ফরিদা আখতার খান

নাসিমুন্নেসা নাসিম

www.pathagar.com

সুরাইয়া চৌধুরী

কামরুন্নাজ সিদ্দীকা

সাবেরা শহীদ হাই

সৈয়দা মালেকা আকবরী

রীনা ইয়াসমিন খান

নাসরিন মাহমুদ

সাহিদা আহমদ

মাহমুদা সুলতানা

নুরুন্নিসা

www.pathagar.com

নাহরিন জান্নাত জুবিলী

রোমিতা আহমেদ

রাবেয়া বেগম

মরিয়ম রহমান

মোহসিনা আকবর

সৈয়দা শামসুন্নাহার জামী

বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে নারীরা

www.pathagar.com

বৃটিশ আমলে মুসলিম নর-নারীর শিক্ষার হার ঃ
স্যাডলার রিপোর্ট, ১৯১১

বাংলা শিক্ষার নমুনা (হাজার করা শিক্ষিতের হিসাব)

অঞ্চল	হিন্দু		মুসলমান	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষ	স্ত্রীলোক
ঢাকা	২৩৮.৮	২৯.৫	৬০.১	১.৫
প্রেসিডেন্সি	২৪৯.৮	৩৫.৫	৯৬.১	৩.২
বর্ধমান	২০৮.৪	১১.৬	১০৫.৪	৭.০
চট্টগ্রাম	২৬২.৭	২০.১	৮০.৩	২.২
রাজশাহী	১৩০.৫	৯.৪	৭৬.৭	১.৭

ইংরেজী শিক্ষার নমুনা (হাজার করা হিসাব)

ঢাকা	৩৬.৯	০.৬	৩.৭	০.০৩
প্রেসিডেন্সি	৬২.৫	১.৮	৭.৯	০.১
বর্ধমান	২৬.৫	০.৬	১২.৪	০.৪
চট্টগ্রাম	৩০.৩	০.৫	৪.৬	০.০৪
রাজশাহী	১৫.৪	০.২	৪.৪	০.০২

আনোয়ার হোসেন ঃ বাংলার মোছলমান ও প্রাথমিক শিক্ষা; ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ (১৯২৭)

আধুনিক বিশ্বে নারী

পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে দিয়ে পাশ্চাত্যবাদীরা নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলে খদ্দের আকর্ষণ করার জন্য নারীদেরকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াস পায়। এভাবে কোটি কোটি নারীকে চরিত্রহীন করেছে পুঁজিবাদী সমাজ। কমিউনিস্ট সমাজে মনে করা হতো পারিবারিক ব্যবস্থা হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীরই এক চিহ্ন। তাই স্বাধীনতার নামে পুরুষদের অধীনতা থেকে মুক্তির নামে নারীদেরকে পারিবারিক মধুর বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিভিন্ন সরকারী ও যৌথ খামারে দাসী বানিয়ে রাখা হয়।

থাইল্যান্ডে নারীকে মনে করা হতো বিষধর সাপ কিংবা নারীকে ভালবাসবে না। আর্জেন্টিনায় নারীকে মনে করা হতো একটি ভালো দরজার জন্য যেমন কাঠ দরকার তেমনি একজন নারীকে পালন করতেও কাঠ (লাঠি) দরকার। ল্যাটিন আমেরিকায় নারীকে মনে করা হতো যেখানে নারী সেখানেই সমস্যা। জার্মানীতে মনে করা হতো কোন নারী মারা যায় তখনই বিশ্বের কোন না কোন সমস্যার কিছুটা হ্রাস পায়। ফ্রান্সে নারীকে মনে করা হতো পুরুষের সাবান বিশেষ। আয়ারল্যান্ডে নারীকে মনে করা হতো নারী শয়তানকেও প্রতারিত করে। রাশিয়াতে নারীকে মনে করা হতো নারীর হৃদয় জঙ্গলের মতো। এরূপ ধারণা এখনও সেসব সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলাম পূর্ব

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্বে ক্ষমতার শীর্ষে নারী

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী
বেনজীর ভুট্টো

www.pathagar.com

ইরানে নারী ছিলো এক আপদ তবে কোন বাড়ীতেই এ আপদহীন নয়। শাহের আমলে ইরানের নারীরা ছিলো নির্যাতিত। স্বৈরাচারী শাহ নারী মুক্তির নামে নারীদের প্রতি অত্যাচার চালাতো মুক্ত হস্তে। নারীদের নৈতিক চরিত্র করেছে অপমানিত। শাহের মতে নারী হবে মোহনীয় আকর্ষণীয়। সে নারীকে কেবলমাত্র যৌন লালসা পূরণের জন্য এক জন্তু বিশেষ মনে করতো।

আধুনিক বিশ্বে নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তাগণ কি আদৌ পেরেছে তার কিয়দাংশ বাস্তবায়ন করতে? তারা কি পেরেছে নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করতে? আধুনিক বিশ্বে নারী স্বাধীনতার নামে চলছে নগ্নতা, ব্যাভিচার, বিজ্ঞাপনের মডেল, ফ্যাশন শো যার সুযোগে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার ধারক-বাহকগণ নারী স্বাধীনতার নামে তাদেরকে ভোগ বিলাসের নিষ্প্রাণ পণ্যে পরিণত করে নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে খেলছে ছিনিমিনি। যার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে অবাধ যৌনাচার, হাজার হাজার মেয়ে হচ্ছে কুমারী মাতা, দেখা দিচ্ছে ঘাতক ব্যাধি– 'এইডস'। এর নামই কি নারী স্বাধীনতা!

বর্তমানে আধুনিক সভ্যতার নামে তথাকথিত নারী মুক্তিবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে নারী জাতিকে যে নরক কুন্ডে ঠেলে দিয়েছে তার কিঞ্চিৎ খতিয়ান সংক্ষেপে তুলে ধরছি ঃ

চীন

চীনের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায় যে, সেখানে নারীর অধিকার ও মর্যাদা লুণ্ঠিত হয়েছে। চীনের অবস্থা দর্শন করে জনৈকা চীনা মহিলা বলেছিলেন, নারীর মতো দুর্ভাগা ও মূল্যহীন দ্রব্য আর কিছুই নেই। ছেলেরা দরজায় দাঁড়ানো দেবতা যেন।

কন্যা সন্তানসহ চীনে মহিলা কেনা-বেচার কথা আজ বিশ্ববাসীর অজানা নয়। সেখানে কন্যা সন্তানকে অন্ধকার ঘরে ফেলে রাখা হয়– যাতে সে মারা যায়। যৌতুকের ভয়ে চীনে শিশু-কন্যা হত্যার হিড়িক পড়েছে। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কন্যা সন্তান রফতানী করে চীন প্রতি বছর ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার আয় করে। ইচ্ছামতো খুশীতে তালাক চলছে। পাশবিক নির্যাতন চলছে। প্রতি চারটি বিয়ের মধ্যে একটি ভেঙ্গে যায়। এদিকে চীনে নারী দাসত্বের বিস্তার ঘটেছে আশংকাজনকভাবে। চীনে মহিলাদের মধ্যে আত্মহত্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দক্ষিণ কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়ায় ১০ জন মহিলার একজন প্রায় প্রতিদিন স্বামীর হাতে প্রহৃত হন। সিউলে প্রকাশিত এক জরিপ রিপোর্টে এ খবর জানান হয়। জরিপে ৩শ' ৪০ জনের ৩০ শতাংশ বলেছেন, অন্তত মাসে একবার তারা স্বামীদের হাতে লাঞ্ছিত হন। 'কোরিয়া উইমেন্স হটলাইন' এই জরিপ কাজটি পরিচালনা করেছেন। দক্ষিণ কোরিয়ায় এখনো এ ধারণা রয়েছে যে, নারীরা পুরুষের সম্পত্তি।

রাশিয়া

রাশিয়ায় তো নারীর উহ্-আহ্ করার সাধ্য নেই। সেখানে নারীদের হাতে র‍্যাকেট দিয়ে, হাফপ্যান্ট পরিয়ে মাঠে নিয়ে খেলানো হচ্ছে। স্থানে স্থানে পতিতালয় স্থাপন করে

www.pathagar.com

লেনিন যৌন কার্যকলাপকে কমিউনিজম জীবন শক্তিতে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিল কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি, ধ্বংস ধেয়ে এসেছে।

নারী জাতির মর্যাদার শক্ত চপেটাঘাত করা হচ্ছে। আর ম্যাসেজ পার্লার বানিয়ে মহিলাদের ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। চোরা পথে নারী পাচার করে অর্থ রোজগার চলছে, আর দামী দামী দেশে নারীদের সতীত্ব নষ্ট করে যে জুলুম করা হচ্ছে সেই জুলুমকে তারা প্রগতির নামে চালিয়ে দিচ্ছে।

ফ্রান্স

ফ্রান্সকে নারী স্বাধীনতার আরেক স্বর্গ মনে করা হয়। সেখানে নারীরা নাকি 'সম-অধিকার' পুরোপুরি ভোগ করেন। সেই ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদের ৪শ' ৯১ জন ডেপুটির মধ্যে মাত্র ২৫ জন নারী। এক জায়গায় ফ্রান্সে নারীদের সম-অধিকার আছে আর তা হলো নারীকে শুধু ভোগের ব্যাপারেই সম-অধিকারের ষোল আনা অধিকার দেয়া হয়। ফ্রান্সে প্রতিরাতে ১০ হাজার নারী ৪০ হাজার পুরুষকে লালসার যৌন সাহচর্য্য দিয়ে থাকে বা দিতে বাধ্য হয়।

বছর পাঁচেক আগে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী মিসরে ৬৩,৭৩১ জন মহিলা ব্যবসা-বাণিজ্য বা মজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করে, পক্ষান্তরে ফ্রান্সে ৫০ লক্ষাধিক নারী ব্যক্তিগত কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য। এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় ফ্রান্সে শতকরা ১৪ জন এবং মিসরে শতকরা আধা জন মহিলা জীবিকা অর্জনের জন্য মেহনত মজুরী করে থাকে। অর্থাৎ সর্বাধিক সুসভ্য দেশ বলে কথিত দেশের নারী সমাজ ও আমাদের প্রাচ্য দেশ মিসরের তুলনায় বহুগুণ বেশী অভাব অনটন ও আর্থিক দীনতায় জর্জরিত।

www.pathagar.com

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জনৈক বিশিষ্ট গ্রন্থকার Lo-Lyon Republican-এর সম্পাদক 'বলপূর্বক ব্যভিচার অপরাধজনক কেন?' শীর্ষক প্রবন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন ঃ

নিরন্ন দরিদ্র যখন ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে চুরি ও লুটতরাজে লিপ্ত হয়, তখন বলা হয় যে, তার অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করে দাও, চুরি ও লুটতরাজ আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেহের একটি প্রাকৃতিক চাহিদা মিটানোর জন্য যে সাহায্য সহানুভূতি করা হয়, অনুরূপ দ্বিতীয় প্রাকৃতিক এবং গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা মিটানো অর্থাৎ যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির বেলায় তা করা হয় না। ক্ষুধার তীব্র তাড়নার পরিণামে যেমন মানুষ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয়, তেমনি বলপূর্বক ব্যভিচার এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণহত্যাও যৌনক্ষুধার অনুরূপ তীব্র তাড়নার পরিণাম হিসাবেই হয়ে থাকে– যা ক্ষুধাতৃষ্ণা অপেক্ষা কম প্রাকৃতিক নয়। একটি স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ যুবক স্বীয় কামরিপু জোরপূর্বক সংযত রাখতে পারে না– যেমন সে তার ক্ষুধা এই প্রতিশ্রুতিতে নিবৃত্ত রাখতে পারে না যে, আগামী সপ্তাহে তার অন্ন জুটবে। আমাদের শহরগুলিতে সবকিছুরই প্রাচুর্য রয়েছে। কিন্তু একজন নিঃস্বের উদরান্নের অভাব যেমন মর্মন্তুদ, তেমনই তার যৌন সম্ভোগের অভাবও অতি মর্মন্তদ। ক্ষুধার্তকে যেমন বিনা মূল্যে খাদ্য বিতরণ করা হয়, তেমনই দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষুধায় যারা অতিষ্ঠ, তাদের জন্যও কিছু ব্যবস্থা করা আমাদের কর্তব্য।

মনে রাখা আবশ্যক যে, এটা কোন পরিহাসব্যঞ্জক প্রবন্ধ নয়। এটা যেমন অতি দায়িত্ব ও গুরুত্ব সহকারে লেখা হয়েছিলো, তেমনি ফ্রান্সে অতি গুরুত্ব সহকারেই এর প্রচারও হয়েছিলো এবং সে দেশে তা সার্থকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।

সুইজারল্যান্ড

সুইজারল্যান্ডে ট্রাউজার পরিহিতা সাক্ষাৎপ্রার্থীণী মহিলাদের সাক্ষাতের সুযোগ দেন না। সংশ্লিষ্ট মহিলাদের কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করতে হলে ট্রাউজারের পরিবর্তে অবশ্যই স্কার্ট পরে আসতে হবে। সেখানে নারীদের কিরূপ অবস্থা হতে পারে তা বলাই বাহুল্য।

জাপান

মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কয়েকটি দেশের মধ্যে জাপান অন্যতম হলেও সেখানে অগ্রগতির নিরিখে নারী ও পুরুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়েছে। ১৯৯৩ সালে মানব উন্নয়নের সূচকে জাপান সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছে। কিন্তু মানব উন্নয়ন সূচক যখন নারী ও পুরুষের বৈষম্য বিচার করেছে তখন জাপান নেমে গেছে সপ্তদশ স্থানে। এর কারণ হলো, উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের ভর্তির অনুপাত দু'তৃতীয়াংশ। অনুরূপভাবে কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থা অনেক খারাপ। পুরুষের আয়ের মাত্র ৫১ শতাংশ আয় করে মেয়েরা এবং মেয়েরা অনেকাংশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে যেতে পারে না। মাত্র ৭ ভাগ প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা পদে মেয়েরা নিয়োজিত আছে।

রাজনৈতিক অঙ্গনেও মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব কম। মাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই

www.pathagar.com

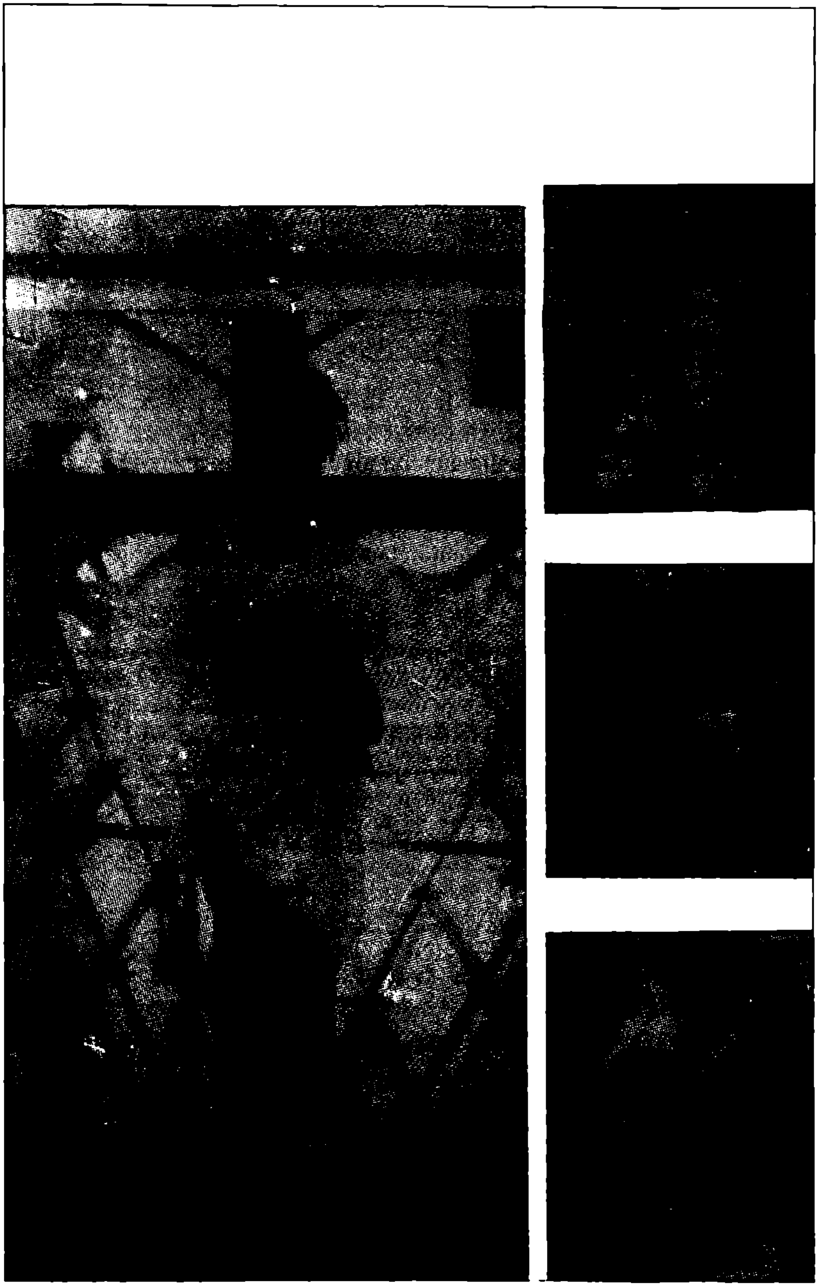

জাপান ঃ বর্তমানে সেখানে পতিতাবৃত্তির জোয়ার বইছে

www.pathagar.com

মেয়েরা ভোটাধিকার ও পার্লামেন্টে নির্বাচিত হবার অধিকার লাভ করে। মন্ত্রী পর্যায়ের কোনো পদেই নারী নেই।

আজকের জাপানী সমাজে যৌনতার ছড়াছড়ি। পতিতাবৃত্তি সেখানে আইনসিদ্ধ। তবে জোর করে কাউকে এ পেশায় নামানো নিষিদ্ধ। পতিতাবৃত্তি নিয়ে ওখানে কেউ মাথা ঘামায় না। বরং এটা জাপানী সমাজে আর দশটা প্রাত্যহিক ঘটনার মতোই স্বাভাবিক। তবে ইদানিং শিশু পতিতাবৃত্তির আশঙ্কাজনক আধিক্য দেখে জাপানীর নীতি-নির্ধারক ও সচেতন নাগরিকদের চরমভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। আর এই শিশু পতিতাদের অধিকাংশই স্কুলগামী বালিকা। একটি আইসক্রীম কেনার পয়সার জন্যও পুঁচকে মেয়েরা পতিতাবৃত্তি করে।

জাপানীরা একেবারে রোবটের মতো কাজ করে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৮ ঘন্টাই এরা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে বিধায় স্ত্রী-সান্নিধ্যের সুযোগ থাকে না। তখন বাধ্য হয়েই তাদের স্ত্রীরা 'অন্যপথ' ধরে। জাপানী বধূদের মতে, অধিকতর উষ্ণতা বা ভালোবাসা যায় যা দিতে তাদের স্বামীরা পুরোপুরি ব্যর্থ।

পতিতালয় ছাড়াও জাপানের অলিতে-গলিতে রয়েছে হরেক রকমের যৌন কারখানা। এগুলো মূলতঃ বাথ-হাউস, মেসেজ পার্লার এবং সেক্সক্লাব। এগুলোর রয়েছে নানা চটকদার নাম। যেমন ডেটক্লাব, টেলিফোন ক্লাব, ইমেজ ক্লাব, জেজে ক্লাব, ফ্যাশন হেলথ ইত্যাদি। ডেট ক্লাগুলো নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে ছেলে-মেয়েদের ডেটিংয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। আর টেলিফোন ক্লাবের অস্তিত্ব প্রায় এক দশক ধরে। এদের কাছে ডেটিংয়ে যেতে ইচ্ছুক এমন সব ছেলে-মেয়ের টেলিফোন নম্বর থাকে। আর তারা ক্লাবগুলোর ফোন নম্বর পেয়ে থাকে বিজ্ঞাপন মারফত। অনেক সময় রাস্তায় বিনা পয়সায় বিলি করা টিস্যু প্যাকেটের গায়েও ক্লাবগুলোর ফোন নম্বর থাকে। ডেটিং প্রত্যাশীরা ক্লাবে যায়। ১৫-২০ ডলারের বিনিময়ে ক্লাব তাদেরকে একটা ছোট কামরায় বসে আলাপ করার সুযোগ দেয়। তারপর পারস্পরিক বোঝা-পড়ার ভিত্তিতে এরা ডেটিংয়ে বেড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে শুধুমাত্র টোকিওতেই এ ধরনের ৩৬৪টি ক্লাব আছে। ১৯৯২তে এ সংখ্যা ছিলো ১১৩ আর ১৯৮৭তে ৮০টি।

সম্প্রতি পরিচালিত এক সরকারী জরিপে জান যায়, স্কুলগামী বালিকাদের এক-চতুর্থাংশ নিদেনপক্ষে একবার হলেও গেছে টেলিফোন ক্লাবে। আর তাদের তিন থেকে চার শতাংশ সত্যিকার অর্থেই ডেটিংয়ে গেছে। গত বছর পুলিশ ১৩টি হাই স্কুল এবং ১৮টি জুনিয়র হাই স্কুলকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছে যে, তাদের ছাত্র-ছাত্রীরা এ ধরনের ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত। ইমেজ ক্লাবগুলোতে শুধুমাত্র ওর‍্যাল ব্যবস্থা আছে। তবে এদের ব্যবস্থাপনাটা একটা উদ্ভট ধরনের। কর্তৃপক্ষ তাদের মক্কেলদের জন্য একটা মেকী কক্ষের ব্যবস্থা করে। এটা হতে পারে কোনো নার্সের অফিস কক্ষ অথবা একটা প্রাইভেট গাড়ী। তাছাড়া বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে 'সোপল্যান্ড' নামের বাথ হাউস আছে। ওখানেও সেক্সুয়াল সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। জেজে ক্লাব বা 'ফ্যাশন হেলথ'-এ বাথ শাওয়ার আছে এবং এখানে শুধুমাত্র ওর‍্যাল সেক্স অনুমোদিত। আইন অমান্য করে কাউকে যৌন সঙ্গমে বাধ্য করলে ৫ হাজার ডলার জরিমানা। এমন সতর্কবাণী ক্লাবের

www.pathagar.com

ভিতরে ঝুলানো আছে। এইসব ক্লাবে একজন জাপানী মেয়ে দৈনিক আয় করে প্রায় এক হাজার ডলার।

শিশু পতিতাবৃত্তি বৃদ্ধির জন্যও সিংহভাগ দায়ী জাপানের পত্র-পত্রিকাগুলো। ফটোগ্রাফী ওখানকার পত্রিকা জগতে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। পত্রিকাগুলো প্রায় প্রতদিন নগ্ন নারীদেহের ছবি ছাপে। 'জেনডাহ' নামক একটি এ ধরনের জনপ্রিয় পত্রিকার সার্কুলেশন নয় লাখের কাছাকাছি। এ রকম আরেকটি জনপ্রিয় পত্রিকা হচ্ছে 'উইকলী পোস্ট'। এর সার্কুলেশন দশ লক্ষাধিক। এসব পত্রিকায় যৌন উত্তেজক নগ্ন নারীর ছবি ছেপে নানা ক্যাপশন জুড়ে দেয় গ্রাহকদের আকৃষ্ট করার জন্য।

জাপানী ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই যৌনতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে বেশি। ১৯৮৪ সালের হিসাব অনুযায়ী ২২ শতাংশ স্কুল বালকের যৌন অভিজ্ঞতা রছে। মেয়েদের বেলায় এই হার হচ্ছে ১২ শতাংশ। ১৯৯৬-তে এসে এই হিসাব দাঁড়িয়েছে মেয়ে ৩৪ শতাংশ, আর ছেলে ২৯ শতাংশ। (সূত্র ঃ নিউজ উইন)

সভ্যতা-ভব্যতা আর রক্ষণশীলতার দাবীদার বলে কথিত সূর্যোদয়ের দেশ আজ আমেরিকানাইজেশনের ছোঁয়ায় তাদের আবহমান কালের সংস্কৃতি আর চিরায়তন ঐতিহ্যের সূর্য অস্ত যেতে বসেছে।

ইতালি

ইতালির খৃস্টান ধর্মের বিশপরা এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছেন যে, বিবাহ বিচ্ছেদের পরে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে এবং তাদের কর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে। তবেই তাদেরকে রোমান ক্যাথলিক গীর্জায় প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে দেয়া হবে। অর্থাৎ পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দম্পতিকে স্রেফ একে অন্যের সাথে বন্ধুরূপে বসবাস করতে হবে। ইতালিতে এ ধরনের দম্পতিকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেয়া হয় না। তারা শুধু দর্শকরূপে উপস্থিত হতে পারে। তবে তাদের অনুপস্থিতিকেই ভাল মনে করা হয়। তাছাড়া বর্তমানে প্রতি ঘন্টায় ১ জন মেয়ে তার সতীত্ব হারাচ্ছে। Raview of Reviews (একাদশ খন্ড)-এ উল্লেখ করা হয়, জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইটালিতে প্রতিবছর ৫৬১২ জন নারী আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

কানাডা

কানাডায় মহিলাদের বিরুদ্ধে সম্ভ্রমহানির মাত্রা সংকটজনক পর্যায় পৌঁছেছে। সেখানে বসবাসকারী অর্ধেকেরও বেশি মহিলা ধর্ষণ ও ধর্ষণ প্রচেষ্টার শিকার হচ্ছেন। সরকার পরিচালিত রিপোর্টে এ কথা জানানো হয়।

ফ্রান্সে প্রতি রাতে ১০ হাজার নারী ৪০ হাজার পুরুষকে যৌন লালসায় সাহচর্য দিয়ে থাকে এবং দিতে বাধ্য হয়। ফ্রান্সে কুকুর হত্যার বিচার হলেও নারী হত্যার বিচার হয় না।

যুক্তরাজ্য

বৃটিশ মহিলারা এখন পর্যন্ত পুরুষদের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগেরও কম উপার্জন

www.pathagar.com

করে। তারা পেনশন নির্ধারণ, বেনিফিট প্রদান ও প্রশিক্ষণ সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে আছে। বৃটেনের গণসংযোগ সুবিধা কমিশনের প্রধান নির্বাহী ভ্যালেরী এমম বলেন, এ সমস্যাগুলো গ্রামীণ এলাকায় বিস্তৃত। তিনি আরো বলেন, বৃটেনে খন্ডকালীন ৫০ লাখ শ্রমিকের মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ মহিলা শ্রমিক। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক মহিলা শ্রমিককে জাতীয় বীমা এবং বেকারত্ব অথবা অসুস্থ ভাতা দেয়া হয় না।

কিছুদিন পূর্বে বৃটেনে একটি পারিবারিক সমস্যার উপর জরিপ চালানো হয়েছে। জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, প্রতি ১০টি নির্যাতিতা মহিলার মধ্যে তিনজনকেই তাদের স্বামী মারধর করেছে। অথচ প্রতি ৫টি ঘটনার মধ্যে মাত্র একটি ঘটনা পুলিশকে জানানো হয়েছে। মহিলাদের উপর যেরূপ নিষ্ঠুরতার সাথে পারিবারিক পর্যায়ে নির্যাতন চালানো হয় তার উপর বৃটেনের মিডলসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ জরিপ চালায়। এ জরিপের ফলাফল ভয়াবহ।

মহিলাদের উপর পারিবারিক নির্যাতনের উচ্চ হার দেখে অনেকেই ভীষণ অবাক হয়েছেন। এ পরিসংখ্যানের প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৯শ' নারী পুরুষের উপর সমীক্ষায় সবচেয়ে নিষ্ঠুর যে দিকটি বেরিয়ে এসেছে তা হচ্ছে যৌন নির্যাতনের উচ্চ হার। যে সব মহিলা এ সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে শতকরা ৬ জন জানিয়েছেন যে, তারা বাধ্য হয়ে যৌন সংসর্গে রাজী হন। অন্যদিকে শতকরা আড়াই ভাগ জানিয়েছেন যে, তাদের জীবনে কোন না কোন এক সময় তারা তাদের স্বামী বা প্রেমিকের কাছে ধর্ষিতা হয়েছেন।

এ সমীক্ষা থেকে আরেকটি দুঃখজনক দিক যা বেরিয়ে এসেছে তা হচ্ছে প্রতি ৩ জনের মধ্যে ২ জন পুরুষ তাদের প্রেমিকা বা স্ত্রীকে মারধর করে এবং তা ঘটে পারিবারিক কলহের কারণে বা যদি তাদের প্রেমিকা বা স্ত্রী অবিশ্বাসী হয়। এ সমীক্ষায় অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকও বেরিয়ে এসেছে।

বৃটেনে মহিলা পুলিশদের উপর যৌন নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র পাওয়া গেছে। জানা গেছে, মহিলা পুলিশদের উপর সহকর্মী পুরুষ পুলিশদের যৌন উৎপীড়ন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ৮ শতাধিক মহিলা পুলিশ সহকর্মীদের হাতে মারাত্মক যৌন হামলার শিকার হয়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আরেকটি জরিপে এ সকল তথ্য পাওয়া যায়।

১০টি বাহিনীর ১ হাজার ৬শ' মহিলা পুলিশ অফিসারের উপর পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, এদের ৬ শতাংশ ধর্ষণ এবং ধর্ষণ প্রচেষ্টাসহ গুরুতর ধরনের যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। মহিলা পুলিশ পিসি এলেন ওয়ার্টস গার্ডিয়ান পত্রিকায় গুরুত্বের সাথে একটি অভিযোগ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন সহকর্মী দ্বারা তিনি ধর্ষিতা হন কিন্তু তার অভিযোগের কারণে উল্টা তার বিরুদ্ধে মানহানি প্রচারণা শুরু হয়।

এই জরিপের ফলে সিনিয়র পুলিশ অফিসারদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। হ্যামশায়ার কনস্টার লারির গবেষণা ব্যবস্থাপক ডঃ জেনিফার ব্রাউন এবং সারে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলিজাবেথ ক্যাম্পবেল এই জরিপ পরিচালনা করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

www.pathagar.com

জরিপের বিষয় নির্ধারণ করে দেয়। ধর্ষিতা মহিলা পুলিশের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই তাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

রাণী এলিজাবেথের ইন্সপেক্টরেট অব কনস্টাবুলারির পক্ষ থেকে পরিচালিত অপর এক জরিপে অনেক মহিলা পুলিশ অফিসারের গুরুতর ধরনের অভিযোগ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণের উল্লেখ রয়েছে। '৯২ সালে পুলিশ রিভিউ ম্যাগাজিনে পূর্ববর্তী জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে যেসব মহিলা পুলিশের জরিপ করা হয় তাদের ৮ শতাংশ জানায়, তাদের সহকর্মী পুরুষ পুলিশদের দ্বারা তারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। আর '৯২ শতাংশ জানায়, তাদের উদ্দেশ্যে কুৎসিত কথাবার্তা বলা হয়।

ডঃ ব্রাউন বলেন, তার গবেষণা থেকে প্রমাণ হয় মহিলা পুলিশের ধর্ষিতা হওয়ার ঘটনা কম নয়। অনেকে ধর্ষিতা হওয়ার কথা জানাতে চায় না। কেননা তাদের ধারণা এতে কিছুই হবে না। বরং তাদেরকে আরো উৎপীড়নের শিকার হতে হবে। একজন মহিলা পুলিশ গার্ডিয়ান পত্রিকাকে জানান, সহকর্মী পুরুষ অফিসারদের উৎপীড়নের কারণে তিনি আত্মহত্যারও চেষ্টা করেছেন।

আরেকটি সরকারী জরিপে বৃটেনের নারী নির্যাতনের আরো কিছু ভয়ংকর চিত্র পাওয়া গেছে। বৃটেনের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিস ২৪তম বার্ষিক সংখ্যায় জানায়, ১৯৯২ সালে বৃটেনে প্রতি ৩টি শিশুর মধ্যে একটি শিশু বিবাহ বহির্ভূতভাবে জন্মগ্রহণ করে। গত দু'দশকে বিবাহের ১৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং একই সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। জরিপে আরো বলা হয় যে, ১৯৯১ সালে প্রতি দু'টি বিয়ের মধ্যে একটিই ভেঙে যেতো। মোট বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লাখ ৭১ হাজার ১শ'। বিয়ের প্রথম দু'বছরের মধ্যে ১০ শতাংশ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। উল্লেখ্য, এ সংখ্যা ১৯৮১ সালের তুলনায় ৬ গুণ বেশি। ১৯৮৪ সালে বৈবাহিক অনৈক্যের কারণে এক বছর পরে বিচ্ছেদের আবেদন জানানোর জন্য দম্পতির অনুমতি দেয়ার সুযোগের ফলে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে বৃটেনের আদমশুমারি ও জরিপ অফিস তার এক পরিসংখ্যানে এই প্রথমবারের মতো বলেছে যে, ইংল্যান্ড ও ওয়েলস-এ সকল মহিলার মধ্যে প্রায় অর্ধেকই অবিবাহিত অবস্থায় গর্ভবতী হয়ে থাকে। তবে তাদের মধ্যে প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বৈধ উপায়ে গর্ভপাত ঘটিয়ে থাকে। জরিপে বলা হয়েছে, ৪৪ ভাগ তরুণী অবিবাহিতাবস্থায় গর্ভবতী হয়ে পড়ে এদের মধ্যে ১৯ ভাগ বৈধভাবে গর্ভপাত ঘটায়। এই হার ১৯৮১ সালের চেয়ে ২ ভাগ বেশি। (সূত্র ঃ সাপ্তাহিক বিক্রম, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৫, ১৫-২১ আগস্ট '৯৪)

একজন ইংরেজ মহিলা আক্ষেপ করে বলেছেন, "আমার কামনা যদি আমাদের দেশটিও মুসলিম দেশগুলোর মতো হতো যেখানে দয়া ও পবিত্রতার একটি ছাপ পড়ে আছে এমনকি একটি ক্রীতদাসীর উপরেও। কেন এ পরিবেশ আমাদের দেশে উৎসাহিত হচ্ছে না, যে পরিবেশে নারীরা ঘরের বাইরের কাজগুলো পুরুষদের হাতে দিয়ে তাদের

www.pathagar.com

প্রকৃতি অনুযায়ী গৃহস্থালীর কাজে নিয়োজিত হবে এবং নিজেদের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করবে?”

যুক্তরাষ্ট্র

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও দৈনিক পত্রিকা হতে জানা যায়, নারী নির্যাতনের যুক্তরাষ্ট্রের স্থান এখন শীর্ষে, দ্বিতীয় ইংল্যান্ড, তৃতীয় কানাডা, চতুর্থ জার্মান, পঞ্চম ফ্রান্স। এ শুধু ১৯৯৪ সালের পরিসংখ্যান।

১৯৯৪ সালের ১১ জুলাই রয়টার পরিবেশিত খবর ছিলো এই– যুক্তরাষ্ট্রে গৃহিনীরা হরহামেশা পারিবারিক হত্যাকান্ডের শিকার হয়ে থাকেন। দাম্পত্য কলহে নিহতের মধ্যে ৬০ শতাংশ স্ত্রী স্বামীর হাতে নিহত হন। আমেরিকার নারীদের অবস্থা নিউজ উইক (৬/৭/৯০)-এর জরিপে ১৯৯০ সালে ছিলো এরকম ঃ

প্রতি ঘন্টায় ১৬ জন নারীকে ধর্ষণকারীর মোকাবিলা করতে হয়। প্রতি ৬ মিনিটে একজন ধর্ষিতা হয়। ৪০ লাখ নারী প্রতি বছর নির্যাতনের শিকার হয়। প্রতি ১৮ সেকেন্ডে ১ জন নারী নির্যাতিতা হয়। প্রতি ৪ জন নারীর মধ্যে ৩ জনই জীবনে কমপক্ষে একটি গুরুতর অপরাধ করে থাকে। প্রতি বছর ১০ লক্ষাধিক নারী নির্যাতন আঘাতের চিকিৎসা নেয়। আমেরিকায় ধর্ষণ ঘটনা বৃটেনের চেয়ে ১৩ গুণ বেশি। জার্মানি থেকে ৪ গুণ এবং জাপান থেকে ২০ গুণ বেশি। (তথ্য সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ৭/৫/৯৫ইং)

তথাকথিত সভ্যতার দাবীদার ১৯৭৭ সালে নিউইয়র্ক শহরে বিদ্যুৎ কিছুক্ষণ ছিলো না। নারী স্বাধীনতার ‘মহান’ দেশের এই মহানগরীতে প্রায় ৭০ হাজার মহিলা ‘আলোহীন ক্ষণকালে’ ধর্ষণের শিকার হন। ১৯৭৯ সালে মার্কিন মুলুকে ৪ লাখ অবৈধ শিশু জন্ম নিয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, কোটি ডলার পুরস্কার ঘোষণা করলেও নাকি গোটা মুলুকে ১৩ থেকে ১৬ বছরের একজন কুমারীও খুঁজে পাওয়া যাবে না। নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতার নামে সে দেশে যৌন কেলেঙ্কারী বেড়েই চলেছে। পেরুতে পুলিশের কাছে যেসব অপরাধের রিপোর্ট করা হয় তার ৭০ শতাংশই স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রহারের ঘটনা।

১৯৮৩ সালের বর্ষপঞ্জী অনুসারে ১৯৭৯ সালে আমেরিকায় ২৩,৩১,০০০ সংখ্যক বিয়ের পাশাপাশি ১১,৮১,০০০টি তালাক সংঘটিত হয়েছে। প্রত্যেক বছরই তালাকের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হেরাল্ড ট্রিবিউন লিখেছে ঃ পোশাকে আর সংস্কৃতিতে মন-মানসিকতা ও চিন্তায় হয়ে গেছেন পুরোদস্তুর পশ্চিমা, লর্ড ম্যাকলের ভাষায়– Britishers in culture and in taste (কৃষ্টি ও রুচির দিক দিয়ে যারা হয়েছে বৃটিশ) তারা দেখেও দেখে না শুনেও শুনে না ইংল্যান্ড-আমেরিকার নারীদের বুক-ফাটা কান্না আর আর্তনাদ। শকুনরা মরা গরুর গোশত যেভাবে টেনে টেনে খায়, সেভাবেই তাদের সমাজে নারীকে নিয়ে ভোগের টানাটানি চলে। এই টানাটানিতে যারা আরামবোধ করে তারা হয়তো পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপ দেয় আগুনকে আগুন জেনেও। কিন্তু যারা এসব পছন্দ করে না, তারা সেই

www.pathagar.com

সমাজের নারী হয়েও রাজপথে মিছিল করে এমনকি প্রকাশ্যে দিন-দুপুরে চিৎকার করে মরা কান্না জুড়ে প্রতিবাদ করে। এই তো ১৯৯০ সালের ঘটনা। যুক্তরাষ্ট্রে একটি কলেজের ছাত্রীরা অবাধ নারী স্বাধীনতা ভোগের বিষময় ফল কিভাবে অস্থির হয়ে উদ্‌গীরণ করেছিলো, বমি করে রাস্তায় ফেলেছিল তা বোধ হয় আমরা ভুলিনি। ক্যালিফোর্নিয়াতে ওকল্যান্ড শহরের মিলস মহিলা কলেজে সহশিক্ষা চালু হবে, এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কলেজের ছাত্রীরা মরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তারা রাস্তায় বের হয়ে মিছিল করে বলেছিলো– 'সহশিক্ষার চেয়ে মরণ অনেক ভাল। আমরা আর ভোগের শিকার হতে চাই না। অবাধ নারী স্বাধীনতার ধকল আর আমরা সহ্য করতে পারছি না। যতক্ষণ কলেজে থাকি ততক্ষণই হামলা মুক্ত থাকি (হেরাল্ড ট্রিবিউন, ৬/৫/১৯৯০), (তথ্য ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ৭/৫/৯৬)

এখন যে খবর পরিবেশন করবো সে খবর হলো যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ড শহরে এক মহিলা কলেজের। এই কলেজে ১৯৯১ সালের সেশন থেকে সহশিক্ষা শুরু হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৯৯০ সালে যখন কলেজে সহশিক্ষার সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেন, তখন এই কলেজের ছাত্রীরা সহশিক্ষা চালুর কথা শুনে রীতিমতো বিলাপ, আর্তনাদ ও মরা কান্না জুড়ে দেয়। ১শ' ৩৫ একর পরিমাণ আয়তন বিশিষ্ট কলেজ ক্যাম্পাসের দেয়াল সহশিক্ষা বিরোধী দেয়াল লিখনে ভরে গিয়েছিল। বহু ছাত্রী এমন সব টি-শার্ট পরে, তাতে লেখা ছিল 'সহশিক্ষার চেয়ে মরণও ভালো'। এই কলেজের ক্রন্দনরতা ছাত্রীদের ছবিসহ বিস্তারিত খবর ছাপা হয় ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকায়ও। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্রে আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগেও সহশিক্ষাকে উৎসাহিত করা হতো। মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬০ সালেও মেয়েদের জন্য ছিল ২শ' ৯৮টি কলেজ। পরবর্তী ৩০ বছরে তা কমতে কমতে এসে দাঁড়ায় মাত্র ৯৩টিতে। অর্থাৎ বছরে গড়ে প্রায় ৭টি করে মহিলা কলেজে সহশিক্ষার প্রচলন ঘটে। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত সেই হারে মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা চালু হলে এতদিনে আরো ৪০/৫০টি একই ভাগ্য বরণ করেছে। যার পরিণতি স্বরূপ আমেরিকার আজকের এই চেহারা। হোয়াইট হাউস পর্যন্ত হয়েছে আক্রান্ত। সহশিক্ষা বিরোধী ছাত্রীদের বক্তব্য ছিল এই এমনিতেই সমাজে চলাফেরা দায়। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং বিভিন্ন প্রকার উৎপীড়ন সমাজে ক্রমশ বাড়ছে। কলেজে একটুখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। এখানে যদি সহশিক্ষা শুরু হয় তাহলে আমাদের পক্ষে এতো চাপ সহ্য করা সম্ভব হবে না। এমনিতেই আমরা হাঁপিয়ে উঠছি। যারা সুন্দর জীবন যাপন করতে চায়, পরিচ্ছন্ন নৈতিক জীবন নিয়ে যারা বাঁচতে চায়, ভাল চরিত্র নিয়ে যারা ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে চায়, তাদের অন্তত সুযোগটা দেয়া উচিত। বলা বাহুল্য, সহশিক্ষার বিরুদ্ধে তাদের কান্নার এটাই ছিল একমাত্র কারণ। তারা আমেরিকার মেয়ে, সেই সমাজে জন্মগ্রহণ করেছে বড় হয়েছে, সেই কালচার ও জীবন ধারায় তারা গঠিত, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তারা সহশিক্ষা চায় না, কেনো চায় না আমাদের দেশের শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট মাথাওয়ালারা কি চিন্তা করে দেখেছেন? যে

www.pathagar.com

আমেরিকা সহশিক্ষার কুফলের চিন্তা করে নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, সুফলও ভোগ করেছিল, কিন্তু এই সুফল তারা ধরে রাখতে পারেনি। ফলে উভয় শ্রেণীকে একাকার করে যে ফল ভোগ এখন করছে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সহশিক্ষার প্রসার যত ঘটছে, ধর্ষণও ততো বাড়ছে। এসব পরিসংখ্যান নিশ্চয়ই আমাদের সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বা বিভাগে আছে। আমেরিকার প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানীরা বলছেন, আমেরিকার সমাজ নৈতিকতার ক্ষেত্রে গোল্লায় যাচ্ছে যেসব কারণে তন্মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো সহশিক্ষা।

সহশিক্ষার সংজ্ঞা হচ্ছে এই– The practive of instructing or teaching both sexes in the same classes, in the same institution. অর্থাৎ একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই ক্লাসে নর ও নারীকে শিক্ষা দান পদ্ধতিই সহশিক্ষা। এই সহশিক্ষা শিশু পর্যায়ের স্তর পর্যন্ত নির্দোষ ও নির্মল কিন্তু সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর থেকে খান্নাসের ওয়াসওয়াসা শুরু হয়। বিভক্তি রেখা টানা দরকার সেই স্তর থেকে। অক্সফোর্ড জুনিয়র এনসাইক্লোপেডিয়ায় উল্লেখ করা হয়– Co-education is suitable for children until they are about 10 অর্থাৎ ১০ বছর বয়স পর্যন্ত এ শিক্ষা উপযোগী। এ তথ্যে জানা যায়, ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে যুবকদের সঙ্গে যুবতীদের কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান সর্বপ্রথম ওবারলিন কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৪১ সালে এই প্রতিষ্ঠান ছেলেদের সাথে তিনজন মহিলাসহ সহশিক্ষার মাধ্যমে স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করে। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৯ সালে প্রতিটি বিভাগে সহশিক্ষার রীতি প্রবর্তন করে। পশ্চিম ইউরোপে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত সহশিক্ষা মোটামুটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সীমিত ছিল। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে সীমিত ছিল এই সহশিক্ষা। জার্মানিতে সে সময় সহশিক্ষা ছিল না। বরং মেয়েদের জন্য সে দেশে পৃথক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সহশিক্ষার প্রসার ঘটার পর যখন দেখা যায় যে, অবস্থা তো খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে তখন মেয়েদের জন্য আলাদা কলেজ প্রতিষ্ঠা শুরু হয়। এই প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়া বহু বছর অব্যাহত ছিল, কিন্তু পরে সহশিক্ষার ভূত তাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়। এখন দ্রুত গতিতে নারী পুরুষের পৃথক শিক্ষা বিলুপ্ত হচ্ছে। শুরু হয়েছে সহশিক্ষার প্রবল জোয়ার। এর কুফল সম্পর্কে রয়টার পরিবেশিত একটি সংবাদই যথেষ্ট। সে সংবাদ ১৯৮২ সালে বিভিন্ন সংবাদপত্রেও ছাপা হয়। তাতে বলা হয়, "অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রী Sex harassment-এর বিনিময়ে ডিগ্রী পাচ্ছে।" উল্লেখ্য, অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে ১৯২০ ও ১৯৪৭ সালে সহশিক্ষা ব্যবস্থাকে অনুমোদন করা হয়। আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে সহশিক্ষা চালুর পর স্কুল পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৭৫ ভাগ যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হয়, অনেকে হয় কুমারী মাতা আর লিভ টুগেদার তো এই সহশিক্ষার বিষময় পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। (তথ্য সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ৬/১০/৯৮)

সহশিক্ষা এক বিষধর সর্প, যার ছোবল থেকে আত্মরক্ষা খুবই কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব। দেহকে হেফাজত করতে পারলেও পর-পুরুষের কু-নজর থেকে দেহকে রক্ষা করা যাবে না।

www.pathagar.com

ভারত

১৯৯৩ সালে একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে ঢাকার একটি জাতীয় পত্রিকায় 'ভারতে যা ঘটছে' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। প্রতিবেদনটি হুবহু পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো ঃ "তোমাদের মেয়ে শিশুদের হত্যা করো না। তাদের ফেলে দিও না! ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় সালেম জেলার কর্মকর্তারা মা-বাবাদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা প্রচার করে। পুরুষ শাসিত ভারতীয় সমাজে লাখ লাখ দরিদ্র পরিবার কোন মতে বেঁচে আছে। এসব পরিবারের মেয়ে শিশুদের বোঝা হিসেবে দেখা হয় এবং প্রায়ই তাদের হত্যা করা হয়। সারা ভারতেই কম-বেশি এই চিত্র। ১৯৯২ সালে তামিলনাড়ুতে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, সেখানে প্রতি দু'টি পরিবারের একটি পরিবারে মেয়ে শিশুকে হত্যার ঘটনা ঘটছে। সেখানকার একজন মহিলা বলেন, অকর্মা এঁড়ে বাছুর বিক্রি করে দেয়া হলেও ১শ' রুপি আসে। কিন্তু সংসারের মেয়ে শিশু বাড়তি বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়।'

কর্তৃপক্ষ হাসপাতালগুলোর বাইরে সাদা রঙের অনেক দোলনা রেখেছে যাতে মায়েরা শিশুদেরকে যেখানে সেখানে ফেলে না দিয়ে দোলনায় রেখে যেতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় মায়েরা তাদের কন্যাদের নিয়ে দ্রুত সেখানে যায় এবং মেয়েটিকে দোলনায় রেখে চিরদিনের মতো চলে আসে। অথচ একটিবারও পেছনে তাকায় না। সালেম জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা পি. এ. রামিয়াহ বলেন, এসব মহিলাদের পথ কেউ রোধ করে না, তাদেরকে কেউ প্রশ্নও করে না। মাত্র দু'মাসে মা-বাবারা তাদের ১৮টি সন্তান এভাবে দোলনায় রেখে যায়। এসব শিশুদের বয়স ক'দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ হবে। ভারতে মেয়েরা সবচেয়ে অবহেলিত। মেয়ে শিশুদের প্রতি যত্ন নেয়া হয় না। মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা দেয়া হয় না, বালিকা অবস্থায়ই বিয়ে দেয়া হয়। ভারতে বিয়ে দেয়ার অর্থই হচ্ছে বাধ্যতামূলক যৌতুক প্রদান। অনেক পরিবার বিয়েতে যৌতুক প্রদানে অসামর্থ। এমনকি জীবিকা নির্বাহ করাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর এসব পরিবারেই কন্যা সন্তান হত্যার ঘটনা

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নির্মলা নামের ১৩ বছরের এই মেয়েটি নির্মম নির্যাতনের শিকার। নিম্নবর্ণের এই হিন্দু মেয়েটি যন্ত্রণায় কাঁদছে আর শরীরে আগুনে পোড়া ক্ষত চিহ্ন এবং কালশিটে দাগ সাংবাদিকদের দেখাচ্ছে। এক মধ্যবিত্ত দম্পতির বাসায় সে গৃহ পরিচারিকার কাজ করতো। সামান্য অজুহাতে তার ওপর নেমে আসতো নিষ্ঠুর ও বর্বর নির্যাতন। নিষ্ঠুর নির্যাতনের এই কাহিনী কয়েক বছর আগে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ভারতের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রচারিত হয়। পাশে মেয়েটির পিতা। ইউএনবি/এএফপি

www.pathagar.com

ভারতের অভিনেত্রী মনিষা কৈরালা যৌন কার্যে ব্যবহারের জন্য পাচারকৃত নারী ও শিশুদের দুঃখ-দুর্দশার বিরুদ্ধে নয়াদিল্লীতে পার্লামেন্ট ভবনের কাছে একটি মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন

বেশি ঘটে থাকে। ভারতে লিঙ্গ চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি শুরু হবার পর গর্ভ সনাক্ত করা হয় সন্তানটি মেয়ে না ছেলে। মেয়ে শিশু হলে গর্ভেই তাকে হত্যা করা হয়। অথবা গর্ভপাত ঘটানো হয়।

মিঃ রামিয়াহ বলেন, দরিদ্র পরিবারগুলো মেয়ে শিশুদের হত্যা করে মাটি চাপা দিয়ে দেয়। একটি জরিপে ১ হাজার ২শ' ৫০ জন মহিলাকে প্রশ্ন করা হয়, তদের মধ্যে ১শ' ১১ জন মহিলা স্বীকার করেছেন যে, তারা অন্তত ১টি করে মেয়ে শিশুকে হত্যা করেছেন। ৫শ' ৪৭ জন জানান যে, তাদের পরিবারে শিশু কন্যা হত্যার ঘটনা আছে। আর ৮শ' ৩৭ জন জানান যে, কন্যা সন্তান হত্যা করা তাদের গ্রামে একটা সাধারণ ব্যাপার।

পুলিশ জানায়, দুধের সাথে বিষ মিশিয়ে শিশু কন্যা হত্যার ঘটনাও ঘটছে। ভারতে অবশ্য শিশু হত্যার সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছরের কারাদন্ড। কিন্তু আইনের ধমক, সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ে কতোটুকু সফলতা আনবে? শুধু তাই নয়, ভারতে মাদ্রাজ ও গুজরাটসহ অনেক এলাকায় মেয়ে শিশুদের চেহারা বিকৃতি করে দেয়া হয় যাতে তারা পালিয়ে যেতে না পারে। এখানে মেয়ে সন্তান বিকিকিনি হয়।

'আমাদের প্রতি রহম কর' পুলিশ ও গুন্ডা বাহিনীর কাছে মুসলিম মহিলাদের কাতর অনুনয়

অবস্থাশীল লোকেরা ডজনখানেক বিয়ের নামে নারী ভোগ করে থাকেন বলেও পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে প্রকাশ। এ হত্যার কারণ একটাই নারীরা বোঝা স্বরূপ তাদেরকে পাত্রস্থ করতে যৌতুক দিতে হয়। এরা নিষ্কর্মা, অমানুষ।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে

www.pathagar.com

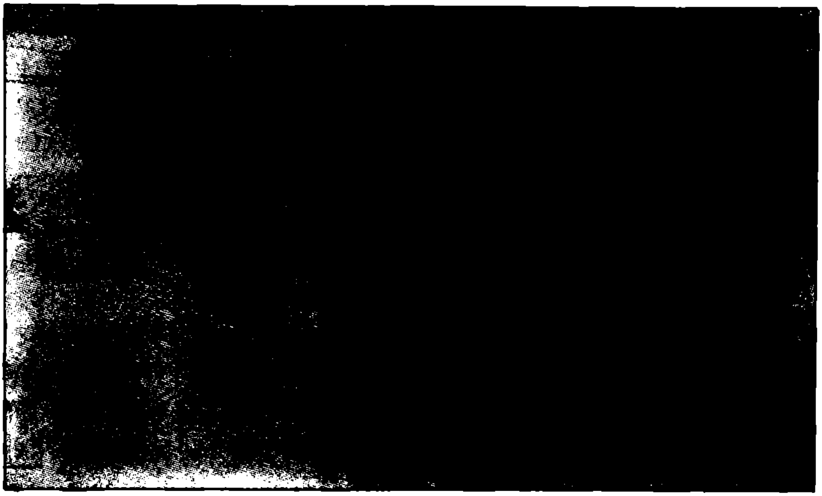

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতে নিহত এক দলিত নেতার শোকে বিলাপরত দলিত নারীরা

অর্ধেক নারীই প্রায় দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। ন্যাশনাল ক্রাইম রিচার্স ব্যুরোর রিপোর্ট মতে, প্রতি ৩৩ মিনিটে ভারতে একজন নারী নিগৃহীত হয়। ১৯৯১ সালে নারী নিগ্রহে শীর্ষস্থান মহারাষ্ট্রের, দ্বিতীয় স্থান ছিল পশ্চিমবঙ্গের।

১৯৯১ সালে প্রতি ৫৪ মিনিটে একজন করে নারী ধর্ষিতা হয়েছেন। প্রতি দু'ঘন্টায় ধূমপানের জন্য একজন নারী খুন হয়েছেন। প্রতি ৩৩ মিনিটে হয়েছে একজন অপহৃতা। ৬ মিনিটে একজন লাঞ্ছিতা হয়েছেন। প্রতি ৫২ মিনিটে একজন মেয়ে এই সভ্য সমাজে ইভটিজিংয়ের শিকার হয়েছে।

সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে তারা সমান অধিকার পায় না। প্রতি ঘন্টায় একাধিক মেয়ে ধর্ষিতা হচ্ছে। ১৯৯০ সালে ৯৫১৭টি এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে এবং যৌতুকজনিত বধূ হত্যা হয়েছে ১৩৫৭টি। ১৯৯১ সালে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে ৮৪৬ জন। ১৯৯০ সালে নারী অপহরণের ঘটনা ঘটেছে ১১৬৮৯টি। সারা ভারতে শুধুমাত্র গর্ভপাতের ফলে বছরে ৫ লাখ মহিলার মৃত্যু হয়। ১৯৮১ সালে ভারতে পুরুষ ও নারীর অনুপাত ছিল ১০০০ঃ৯৩৪, ১৯৯০ সালে ১০০০ঃ৯২৯। ভারতের উচ্চতর প্রশাসনিক পদে মহিলাদের অংশগ্রহণ মাত্র ৫ শতাংশ, অর্থাৎ ৯৫ ভাগই পুরুষ। ভারতে ৭৬ লাখ নারী শিশু শ্রমিক আছে। জীবিকার ক্ষেত্রে কর্মপ্রার্থী মহিলার সংখ্যা সেখানে মাত্র ৯.৫ শতাংশ। পৃথিবীর সব দেশেই নারীদের পুরুষদের তুলনায় বেশি কায়িক ও মানসিক শ্রম করতে হয়।

ভারতের দিল্লীতে নারী নিগ্রহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৩ সালের ৭ অক্টোবর নয়াদিল্লীতে এক কনভেনশনে দেশে ধর্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় আইন দপ্তরের সাবেক রাষ্ট্র মন্ত্রী এইচ আর ভরদ্বাজ পর্যন্ত বলেছেন যে, এ ব্যাপারে অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তির জন্য ভারতীয় দন্ডবিধি সংশোধন প্রয়োজন। শিশু ধর্ষণকারীদের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা রাখা উচিত। উল্লেখ্য,

www.pathagar.com

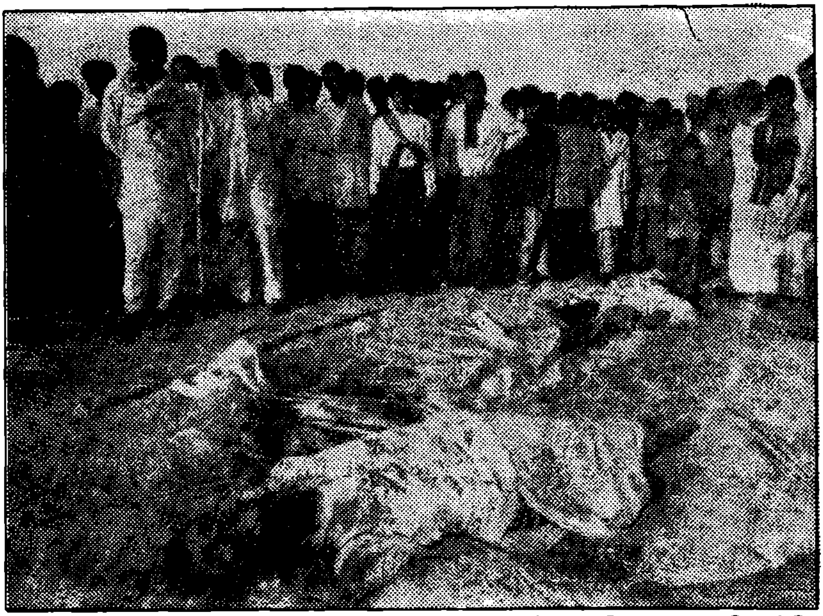

বিহারে বর্ণ সহিংসতার শিকার হয়ে লক্ষণপুর বাটগ্রামে উচ্চবর্ণের ভূ-স্বামীদের বেসরকারী বাহিনীর হামলায় ৬৪ জন নিম্নবর্ণের হিন্দু নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে ৩৫ জন মহিলা ও ১৯ জন শিশু রয়েছে। ছবিতে নিহতদের লাশের পাশে জড়ো হওয়া গ্রামবাসীদের দেখা যাচ্ছে – রয়টারস।

ভারতীয় আইনে প্রাপ্ত বয়স্কদের ধর্ষণ এবং শিশু ধর্ষণের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখা হয়নি। এই কনভেনশনে বিভিন্ন মহিলা বক্তা কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, নিছক উপদেশ বর্ষণ করে কোন কাজ হবে না। সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিতে হবে। মন্ত্রী শেষ পর্যন্ত এই বলে পাশ কাটানোর চেষ্টা করেছিলেন যে, বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক্তিয়ারে। কিন্তু কনভেনশনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা পাল্টা দাবী জানান– তাহলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এখানে আসা উচিত। তাদের বিবৃতির সময়ে রাষ্ট্রমন্ত্রী ভরদ্বাজ উঠে যাবার তোড়জোড় করছিলেন। মহিলারা প্রতিবাদ জানালেন। তাদের দাবী পুরোটা শুনে তবে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীকে কনভেনশনে থেকে যেতে হলো।

এখানে ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন্স-এর চেয়ারপারসন জয়ীপট্রিগয়েক উল্লেখ করেন, দেশে ধর্ষণের সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৮৯ সালে ধর্ষণের ঘটনার সংখ্যা ছিল ৯৫৭৯টি। ১৯৯১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯৭৯৪টিতে। এই সংখ্যা আরো বেশি হবারই সম্ভাবনা। কারণ বহু ঘটনা পুলিশকে জানানো হয় না লোকলজ্জার ভয়ে।

'ক্রাইম অ্যাগেইনস্ট উইমেন' সেলের ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ শ্রীমতি যামিনী হাজারিকা চাঞ্চল্যকর এক তথ্য পেশ করে বলেছেন, ধর্ষিতাদের মধ্যে ৭৫ শতাংশই শিশু। অপর এক বক্তা রিতু সাবিন বলেন, দিল্লীতে ১৮ বছরের নিচে ধর্ষিতাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বেশির ভাগেরই বয়স ১২ পর্যন্ত হয়নি। দিল্লীতে শতকরা ৬৮টি ক্ষেত্রে দেখা গেছে নিগ্রহকারীরা একই পরিবারের লোকজন। বৃন্দা কারাত তার ভাষণে বলেন,

www.pathagar.com

মহিলাদের উপর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য আইনী পথ নেবার পাশাপাশি জনমতও গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান আইনে অনেক ত্রুটি আছে যেগুলোকে দূর করতে হবে। এই হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এ বছরের প্রথম ছ'মাসেই নয়াদিল্লীতে ৪৫টি শিশু ধর্ষণের খবর পাওয়া গেছে। আর এবার প্রায় ছ'মাসেই তা ঘটলো। অর্থাৎ দিল্লীতে এই জঘন্য অপরাধের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। (তথ্য সূত্র ঃ সাপ্তাহিক বিক্রম, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৫, ১৫-২১ আগস্ট '৯৪)

সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য অরুনাচলে। অরুনাচলের সমাজ ব্যবস্থা এখনও বহুগামী। নর-নারীর বিশেষ করে পুরুষের বহুগামিতা এখানে আইনের চোখে অপরাধ নয়। অরুনাচলের মহিলারাও পুরুষের একাধিক নির্বিচারে নারী সঙ্গমকে খারাপ চোখে দেখে না। কোন ব্যক্তির ৬০, ৭০ কি ৮০ বছর বয়সেও বিয়ে করার জন্য বিবেচনার কোন বিষয়ই নয়। অথবা ৮০ বছরের বৃদ্ধের ১০/১২টি স্ত্রী বর্তমান থাকলেও পাত্র হিসেবে সে মোটেই খারাপ বা অযোগ্য নয়। অথবা প্রতি রাতে সে যদি নিত্য-নতুন রমণী সম্ভোগ করে থাকে তাহলে সেটিও সেই অবস্থার জন্য শিথিলযোগ্য। পাত্র হিসেবে তার হবু শ্বশুরের কাছে যেটা প্রধান বিবেচ্য সেটা হলো, তার হবু জামাই তাকে কতগুলো বাইসন (বুনো মহিষ) দিতে পরবে। এমনকি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়েই কন্যা সন্তানের বিয়ে হয়ে যাওয়ার প্রচলনও বিদ্যমান এ সমাজে।

নয় বছরের বালিকা বেঙ্গা মাহতা হয়েছিল ৬৮ বছর বয়স্ক বৃদ্ধের জন্য ঘরণী। কিশোরী বেঙ্গার এই বুড়ো হাবড়ার ঘর থেকে তিনবার পালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনবারই সে ব্যর্থ হয়। এরপর বেঙ্গার বুড়ো হাবড়া স্বামী তার দুই পায়ে বাঁশের খুঁটি লাগিয়ে দেয় যাতে সে আর পালাতে না পারে। কিন্তু তারপরেও কোন এক ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেঙ্গা বিন্নি মায়ার আশ্রমে পৌছায়। আজ সে এই আশ্রমে মুক্ত বায়ু সেবন

ভারতের বিহার রাজ্যে পঞ্চায়েত গণআদালতের মাধ্যমে প্রকাশ্যে শাস্তি কার্যকর করছে। এমনকি বছর দু'য়েক পূর্বে প্রেমিকের সাথে ঘরছাড়া হবার অপরাধে প্রেমিকা গণধর্ষণের শাস্তি পেয়েছে

www.pathagar.com

করছে।

অরুনাচলের অপতানি গোত্রের অমানবিক ও নিষ্ঠুর রীতি-নীতি হলো যাদের দশ বছর বয়সও পূর্ণ হয়নি তাদের মুখে আনারসের অনেকগুলো কাঁটা চুবিয়ে সেই তীক্ষ্ণ ধারালো কাঁটা দিয়ে পাঁচ বছরের ছোট মেয়েদের নাকে এবং গালে রক্তের আখরে আঁকিবুকি কেটে দেয় যাতে পাশের গোত্রের পুরুষরা সুন্দরী মেয়েদের চুরি করে নিতে না পারে। সেই জন্য মেয়েদের নাক মুখ এমন বিকৃত বীভৎস করে দেয়া হয়। দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারত এবং পশ্চিম ভারতের হাজার হাজার গ্রামে নারী-পুরুষের আদিম রিপুর খেলার সামগ্রী মাত্র। বিয়ে মানেই যৌতুকের বিনিময়ে ক্রীতদাসী ঘরে আনা। (তথ্য ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২০ ফেব্রুয়ারী '৯৫)

ভারতে প্রতি বছর পাঁচ কোটি কন্যা সন্তানকে বিভিন্নভাবে হত্যা করা হয়। যা বিশ্বের অধিকাংশ দেশেরই সর্বমোট জনসংখ্যা ৫ কোটির কম। বিহারে মেরুদন্ড ভেঙ্গে, মধ্য প্রদেশে তামাক পাতার রস খাইয়ে এবং রাজস্থানে জীবন্ত পুঁতে মেরে ফেলা হয় কন্যা সন্তানকে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে মাতৃগর্ভে শিশু লিঙ্গ নিরূপন করার ফলে ভারতে আজ মাত্র পাঁচশ' টাকার বিনিময়ে অবাধে কন্যা সন্তানের ভ্রূণ নষ্ট হচ্ছে। পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশের বর্তমানে শিশু কন্যার জন্ম হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ভারতের এ প্রবণতাকে অনেকেই 'আইয়ামে জাহিলিয়াত' যুগের সাথে তুলনা করছে। একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় ভারতে মহিলাদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এই ক্রমহ্রাসের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, সেখানে গর্ভপাত ঘটিয়ে অনেক শিশু কন্যার ভ্রূণ নষ্ট করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ কন্যা সন্তানকে বিষ প্রয়োগে বা অন্য কোনো উপায়ে হত্যা করা হচ্ছে। কন্যা সন্তান হত্যার কারণ সম্পর্কে খবরে বলা হয়েছে, আর্থিক অস্বচ্ছলতা তথা মেয়ের বিয়ের খরচ ও পণ প্রদানে অসমর্থ্যই এ জন্য দায়ী। আর এক খবর থেকে জানা গেছে, খোদ রাজধানীতে এক যুবক গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে। মরার আগে মায়ের উদ্দেশ্যে লেখা এক চিরকুটে সে বলেছেন ঃ তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিক্রি করে যেন তার দু'বোনের যৌতুকের

নিহত ইয়াসমিনের লাশ

www.pathagar.com

টাকা জোগাড় করা হয়। ভারতের এক পত্রিকায় একটি ভারতীয় হিন্দু সমাজে স্বামী পরিত্যক্ত নারীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ 'বিবাহ বিচ্ছেদ কঠিন বিধায় স্বামীরা আইনগত ডিভোর্সের পথে যান না; বরং অসহায় স্ত্রীকে শিশুপুত্রসহ ত্যাগ করাকেই শ্রেয় মনে করেন। স্বামী পরিত্যাক্তা এসব নারী ও তার শিশুপুত্ররা অনেক ক্ষেত্রেই করুণ পরিণতির সম্মুখীন হচ্ছেন। আইন ও সমাজ কেবল নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করছে।'

ধর্ষণের শিকার সীমা রাণী

ভারতীয় সমাজে নারীদের এই দূরবস্থা অবলোকনকারী একজন মহিলা সমাজকর্মীর খেদোক্তি তুলে ধরা হয়েছে রিপোর্টের শেষাংশে। যেখানে তিনি বলেছেন, 'একদিক থেকে বিচার করলে মুসলমানদের প্রথা অনেক উন্নত। সাগরিকার মতো যে হাজার হাজার স্ত্রী পরিত্যক্তা মেয়ে আমাদের সমাজে রয়েছে, তারা না পায় খোরপোষ, না পায় পুনর্বিবাহের সুযোগ। আইন শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ রয়েছে। সমাজের বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের আইন সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন।'

সম্প্রতি জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল বাংলাদেশ প্রতিনিধি মিস জ্যান্টে ই. জ্যাকশন প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন- "ভারতে প্রতি ঘন্টার ১ জন নারী ধর্ষিতা হয়। প্রতিদিন ১৪ জন বিবাহিতা মহিলা তাদের স্বামীর পরিবারে খুন হয়। (জনকণ্ঠ, ২১/৯/২০০০)

ধর্ষণের পর নিহত সীমা রাণী

এই হলো গণতান্ত্রিক দেশ বলে কথিত ভারতের নারীদের সার্বিক অবস্থা। এদের এই অবর্ণনীয় অবস্থার জন্য কে দায়ী? ইসলাম নিশ্চয়ই নয়। কারণ ঐ সমাজ মুসলিম সমাজ নয় এবং দেশটিও মুসলিম দেশ বলে পরিচিত নয়। অমুসলিম ও পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে মহিলারা অনেকে শোষিত-বঞ্চিত, নিগৃহীত অনিরাপদ জীবন-যাপন করছে; তার জন্যই বা দায়ী কে? এদেশে যারা সব অনর্থের জন্য ইসলামকে দায়ী করতে চায় তাদের কাছে এর কোনো জবাব আছে কি? জানি, নেই। কারণ যারা বিবেক বিক্রি করেছে, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, দালালের খাতায় নাম লিখিয়েছে তাদের কোনো জবাব থাকতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা পরিষ্কার যে, ইউরোপসহ গোটা অমুসলিম দেশসমূহে তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। নারী স্বাধীনতার অবাধ উদারনীতির ফলে ঐসব দেশগুলোর

www.pathagar.com

নর-নারীরা পতঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সম্পদের প্রাচুর্যতা থাকা সত্ত্বেও পারিবারিক অশান্তির কারণে আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়ছে বিপদজনক হারে এবং বর্তমান বিশ্বে সংখ্যাধিক্যে এরাই এগিয়ে।

তথাকথিত সভ্যতার দাবীদার ইউরোপ আমেরিকা ৭০% দম্পত্তির ক্ষেত্রেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন জোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমালে বা টুথব্রাস ঠিকমতো ধুয়ে না রাখলে পাশ্চাত্য সমাজে হয় অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতা। এরূপ তুচ্ছ কারণে পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী আদালতের রায়েই তালাকপ্রাপ্ত হয়। সেখানে ব্যাপক হারে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে ৭০% শিশুই পিতা-মাতার স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়। নিরাপরাধ শিশুকে পার্কে ফেলে রেখে বাবা-মা উধাও হয়ে যায়। শতকরা ১৮ জন কন্যা পিতার যৌন লালসার শিকার হন। শতকরা ৪ জন মাতা পুত্রের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অথচ এরা মানবতার, সভ্যতার নামাবলী গায়ে জড়িয়ে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে নারী নির্যাতন তালাশ করে। আমাদের দেশের শিশু ও নারীদের কল্যাণ নিয়ে তাদের চিন্তা ও গবেষণার অন্ত নেই। তাদের শত শত এনজিও এবং তাদের এদেশীয় দালালেরা অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে বাংলাদেশে মৌলবাদী ও ফতোয়াবাজদের নারী নির্যাতন (?) হন্যে হয়ে অনুসন্ধান করে। ওদের চোখে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের আদিম অমানবিক কারবারও চোখে পড়ে না? ভারতের জন্মের পূর্বেই কন্যা সন্তানের বিয়ে দেয়া, পাঁচ বছরের কন্যার মুখে আনারসের কাঁটা দিয়ে বীভৎস করা, নয় বছরের বালিকার সাথে আশি বছরের বৃদ্ধের বিয়ের অমানবিক ঘটনা পাশ্চাত্যের তথাকথিত মানবতাবাদী ও তার দালালদের মাথা ব্যথা নেই। এদের মাথা ব্যথা বাংলাদেশের নারীদেরকে নিয়ে।

অথচ নামী-দামী একজন প্রাচ্যবিদ বলেছেন ঃ "মুসলমান তার সন্তানকে চুম্বন করে যে আনন্দ উপভোগ করে পশ্চিমা কোন মানুষ তা কল্পনাও করতে পারবে না। কারণ 'এ সভ্য' জগতে খুব কম লোকই বিশ্বাস করে যে, তার সন্তানগুলো তার নিজেরই ঔরষের। তিনি আরো বলেন, পশ্চিমা সভ্যতার লোকজন প্রাচ্যবাসী (মুসলমান)দের এসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ বেশি দিন সহ্য করতে পারবে বলে মনে হয় না। সম্ভবত শীঘ্রই তারা তা ছিনিয়ে নিচ্ছে।

বাংলাদেশ

ফুল সুন্দর, নারী সুন্দর। কে বেশি সুন্দর তুলনা করতে গিয়ে কবি দ্বিধান্বিত। সৌন্দর্যের প্রতি বিশেষ করে ফুল ও নারী প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন সহজাত। সমাজে প্রবচন রয়েছে সুন্দর নারী মুখ ও সুগন্ধযুক্ত বাহারী ফুল ভালোবাসে না এমন লোক বিরল। ফুল ও নারী এই দুই বস্তুর প্রতি অপার আগ্রহ ও বল্গাহীন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি এমন কবি, শিল্পী বা সঙ্গীতকার পৃথিবীতে কখনোই জন্মাননি। শেক্সপীয়ার বলেছিলেন, যে ফুল ভালোবাসে না, সে মানুষ খুন করতে পারে। কিন্তু যে ফুল ভালোবাসে, সে যে মানুষ খুন করতে পারে না, এ কথাও ঠিক নয়। বাস্তবে দেখা যায়, সমাজে যারা পাপী-বদমাশ, খুনী, ক্রিমিনাল তাদের বাড়ীতেও ফুলের আবাদ থাকে।

www.pathagar.com

তাদের বাসর শয্যাও সাজানো হয় ফুলে ফুলে। আসলে ফুল বোধ হয় ভালোমন্দ নির্বিশেষে সকল মানুষই ভালোবাসে। তেমনি নারীও। পার্থক্য শুধু মহৎপ্রাণ ব্যক্তিরা নারীকে ভালোবেসে স্বর্গীয় শান্তির নীড় রচনা করে। আর ভোগবাদী ব্যক্তিরা নারীকে ভালোবাসে শুধু জৈবিক চাহিদা মেটায়। নারীর প্রতি এদের ভালোবাসা দৈহিক। শুধুমাত্র এই দৈহিক ভালোবাসার কারণেই নারীরা পরিণত হয়েছে ভোগের বস্তুতে।

ধর্ষণের শিকার ৭ বছরের শিশু মৌসুমী

আহার, নিদ্রা, ভোগ, মৈথুন জীব ধর্মের এই চারটি বৈশিষ্ট্যের মুখে লাগাম এঁটে মানুষকে পশুত্বের লানত থেকে মানুষের মর্যাদায় উন্নীত করেছিলো যে ইসলাম ধর্ম, সে ধর্মকে মৌলবাদ আখ্যায়িত করে দূরে সরিয়ে দেয়ার ফলে আমাদের সমাজে পাশবিক প্রবণতা পাশ্চাত্যের ন্যায় ক্রমান্বয়ে আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন ধর্মীয় অনুশাসন নয়; ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতিকে অনুসরণ অন্যতম কারণ। সমগ্র বিশ্বে আজ নারীত্বের অবমাননা, নারী নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষণ, নারী পাচার, অবৈধ যৌনাচার, অশ্লীলতা, বেহায়াপনায় নারীদেহের নগ্ননৃত্য যখন স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, তখন বাংলাদেশ এর কুপ্রভাব থেকে মুক্ত নয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশেও ক্রমান্বয়ে নারী নির্যাতনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের সমাজে আজ

ধর্ষিতা ৬ বছরের শিশু তানিয়া

www.pathagar.com

চারিদিকে নারী নির্যাতন, কিশোরী ধর্ষণ, ছাত্রী অপহরণ, নারী পাচার, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক সমস্যা প্রভৃতি বিবেকবান মানুষকে আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলেছে।

নির্যাতিতা কাজের মেয়েরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল করছে

বাংলাদেশে কি হারে, কিভাবে ধর্ষণের আধিক্য আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে '৯৮ সালের আগস্ট মাসের কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের প্রকাশিত সংবাদই প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এক মাসের ধর্ষণজনিত সংবাদ নিম্নরূপ ঃ

(১) পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে একজন কিশোরীসহ ৯ জন তরুণীকে গণধর্ষণ–এনজিও স্টাইল (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল, ১৯/৮/৯৮); (২) ছাতক থানার শিবনগর গ্রামে ১২ বছরের কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে এক নরপশু (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৮/৮/৯৮); (৩) জামালপুর শহরের ছোনকান্দা গ্রামের বালুরঘাটে মোর্শেদা বেগম নামের এক গার্মেন্টস কর্মীকে চার নরপশু রাতভর পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল, ১২/৮/৯৮); (৪) দেবীগঞ্জে আরেকটি ধর্ষণ। এবারও এনজিও কর্মী–

এসিডদগ্ধ কয়েকজন নারী। এরকম হাজারো এসিডদগ্ধ নারীর করুণ আর্তনাদ এবং অভিভাবকদের আহাজারিতে বাংলাদেশের বাতাস ভারী হয়ে আছে। প্রশ্ন জাগে এই এসিড নিক্ষেপকারী ও ধর্ষণকারী কারা? এদের রাজনৈতিক পরিচয় কি? নিশ্চয়ই তথাকথিত ফতোয়াবাজ বা মৌলবাদী নয়।

www.pathagar.com

দেবীগঞ্জ থানায় সুন্দর দিঘী ইউনিয়নে এনজিও কর্মী গোলাম মাহমুদ ধর্ষণ করেছে জাহেদা পারভীনকে (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২১/৮/৯৮); (৫) গোয়াইন ঘাটে মোহাম্মদপুর গ্রামে ৯ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করেছে নরপশু আজাদ মিয়া (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল, ২৩/৮/৯৮); (৬) যশোরের রূপদিয়া গ্রামের গৃহবধূ মাকসুদা বেগম গণধর্ষণের শিকার (সূত্র ঃ দৈনিক মানবজমিন, ২৪/৮/৯৮); (৭) ১৭/৮/৯৮ তারিখের জাতীয় দৈনিকের প্রায় সবকটি দৈনিকের সংবাদ ছিলো এ রকম– ছাত্র ক্যাডারেরা ধর্ষণ করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্রীকে; (৮) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রেহনুমা ছাত্রলীগ ক্যাডারের হাতে লাঞ্ছিত (সূত্র ঃ দৈনিক মানবজমিন, ২৪/৮/৯৮); (৯) রংপুর কামার পাড়ায় ২১/৮/৯৮ তারিখে কাকনা নামে ৫ বছরের শিশু ধর্ষিতা হয়েছে আবুল কাশেম নামের এক নরপশু দ্বারা (সূত্র ঃ দৈনিক মানবজমিন, ২৪/৮/৯৮) (১০) ৭ আগস্ট চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া থানার দক্ষিণ পোমরা গ্রামের সাত নরপশু গৃহবধূ আয়েশাকে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে (সূত্র ঃ দৈনিক মানবজমিন, ২৪/৮/৯৮); (১১) সিলেট জেলার জকিগঞ্জ থানার জনৈক এনজিও কর্মকর্তা কর্তৃক এক তরুণী ধর্ষিত (সূত্র ঃ ভোরের কাগজ, ২৪/৮/৯৮); (১২) নগরীর উত্তরায় বখাটে যুবকদের হাতে ৯ জন তরুণী নিগৃহীত (সূত্র ভোরের কাগজ, ২৪/৮/৯৮); (১৩) ২১/৮/৯৮ তারিখে বরিশাল শহরের নিউ সার্কুলার রোডে গৃহবধূ ফরিদাকে একদল নরপশু ঘুমন্ত অবস্থায় অপহরণ করে ধর্ষণ করেছে (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল ২৫/৮/৯৮); (১৪) যশোরের ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানার দমোদরপুর গ্রামে মায়ের গলা কেটে কিশোরী কান্তাকে অপহরণ করেছে একদল সন্ত্রাসী (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২৫/৮/৯৮); (১৫) সিলেটে এনজিও 'তেরেসায়' কর্মরত মহিলা কর্মীর অবৈধভাবে গর্ভপাত ঘটানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে এনজিওর দুই সহকর্মী দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিলো মহিলা কর্মী নিকুলা ইয়াসমিন (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২৫/৮/৯৮); (১৬) প্রকাশ্য দিবালোকে জনসম্মুখে নওগাঁয় গৃহবধূ মাকসুদাকে উলঙ্গ করে গোপনাঙ্গে হাত বুলিয়ে সন্ত্রাসীদের

সৃষ্টিগত পরম সত্য-বিমুখ তথাকথিত প্রগতিবাদীদের নারী স্বাধীনতার সস্তা শ্লোগানে নারী-পুরুষের অবস্থান টলিয়ে নারী জীবনের পবিত্র আঙ্গিক ভূলুণ্ঠিত করে পুরুষের কামনার দক্ষিত শিকারের ঘটনায় সমাজ এমন কি জাতীয় জীবনকে ক্লেদ-কলুষিত করে তুলছে। সম্প্রতি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে শোয়ারীঘাট এলাকায় এ তরুণীকে ধর্ষণের পর হত্যা করে বর্বররা নৌকা দিয়ে তার লাশটি ঢেকে রেখে যায়। ছবিটি এমনি হাজারো নারীর ঘটনার একটি বাস্তব আলেখ্য।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক বলয়ে আশ্রিত সন্ত্রাসীদের ধর্ষণের শিকার দু'বোন। এভাবে হাজার হাজার নারী প্রতিবছর ধর্ষিতা হচ্ছে

আদিম উল্লাস। পরে মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে পালিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল, ২৬/৮/৯৮ এবং মানবজমিন ২৭/৮/৯৮); (১৭) নরসিংদী সদর থানার ইউএসসি জুট মিলের পুরাতন কলোনীতে তসলিমা আক্তার নামে ৫ বছরের শিশু ধর্ষিত হয়ে এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল, ২৬/৮/৯৮ এবং দৈনিক ইনকিলাব ২৭/৮/৯৮); (১৮) ২৪/৮/৯৮ সোমবার বিকেলে ডেমরার ধলপুরের বাসার সামনে থেকে সরিফা বেগম নাম্নী এক যুবতীকে ৫ দুর্বৃত্ত অপহরণ করে গণধর্ষণ চালায় (সূত্র দৈনিক দিনকাল ২৬/৮/৯৮); (১৯) বরিশাল

নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

www.pathagar.com

শহুরে মেয়ে ও বাবাকে এসিড নিক্ষেপ, ঝলসে যায় দু'জনেরই সমস্ত শরীর (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল, ২৬/৮/৯৮); (২) পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে হাজীডাঙ্গা গ্রামে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী আছিয়া বেগমকে ধর্ষণ করেছে নরপশু আনার আলী (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২৭/৮/৯৮); (২১) ঝালকাঠিতে চার বছরের শিশু কন্যা ধর্ষণের চেষ্টার দায়ে জুতাপেটা জরিমানা ও মামলা (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২৭/৮/৯৮); (২২) এনজিওদের আরেকটি ধর্ষণজনিত চাঞ্চল্যকর সংবাদ ছিলো এরকম– ৯ জন এনজিও কর্মী ধর্ষিত হওয়ার পর রংপুরের চার এনজিও কর্মকর্তা তাদের এক সহকর্মীকে জোরপূর্বক অফিসকক্ষে ধর্ষণ করেছে (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২৭/৮/৯৮); (২৩) নারায়ণগঞ্জ বন্দর থানার ঋষিপাড়ায় ৩ নরপশু ১২ বছরের কিশোরী গার্মেন্টস শ্রমিককে পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৭/৮/৯৮); (২৪) পাবনায় এক নরপিশাচ চিকিৎসক ও তার দুই সহযোগী কর্তৃক গণধর্ষণের শিকার হয়ে এক রোগিনী পাবনা হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল, ২৭/৮/৯৮); (২৫) একজন কর্মজীবী মহিলাকে তেজগাঁও থেকে অপহরণ করে নিয়ে এসে রাজধানীর উত্তরার আজমপুর এলাকায় তিনদিন ধরে ধর্ষণ করেছে কয়েকজন নরপশু (সূত্র ঃ দৈনিক দিনকাল, ২৭/৮/৯৮); (২৬) ক্রীড়াবিদ লাভলীর ইজ্জত হরণ (সূত্র ঃ দৈনিক মানবজমিন, ২৬/৮/৯৮); (২৭) নগরীর হাইকোর্টের লিফটম্যান আলী আকবর ১০ বছরের সেলিনা নাম্নী এক কিশোরীকে লাঞ্ছিত করে (সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন, ২৬/৮/৯৮); (২৮) টঙ্গী-আশুলিয়া বাজারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্বের ২য় বর্ষের ছাত্রী ক্যাম্পাসে ফেরার পথে ৩/৪ জন স্থানীয় অস্ত্রধারী যুবক অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে একটি পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে তার উপর গণধর্ষণ চালায় ৪ জন নরপশু (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২৮/৮/৯৮); (২৯) মানিকগঞ্জের আশ্রয় কেন্দ্রে ৮ বছরের বালিকাকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে ইদ্রিস ও সহিদুল নামে দুই নরপশু ধর্ষণ করেছে

মায়ের সাথে সন্তান কোলে কুমারী মা মাহমুদা

www.pathagar.com

'সম্মিলিত নারী সমাজ' নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে মিছিল করছে

(সূত্র ঃ দৈনিক জনকণ্ঠ ৩১/৮/৯৮); (৩০) লালমনিরহাটের কালিগঞ্জে নবম শ্রেণীর ছাত্রী এবং দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে এক যুবতী ধর্ষিত হয়েছে (সূত্রঃ দৈনিক দিনকাল, ৩০/৮/৯৮); (৩১) ১৬/৮/৯৮ তারিখে সৈয়দপুরে স্কুল ছাত্রী সাবিয়া খাতুনকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে আশরাফুল নামে এক নরপশু। সূত্র ঃ মানবজমিন, ১/৯/৯৮); (৩২) রাজধানীর মনিপুরি পাড়ার একটি বাসায় ১৭ বছরের একজন যুবতী ধর্ষিত হয়েছে গৃহকর্তা দীপক বিশ্বাস নামে এক নরপশু দ্বারা (সূত্র ঃ ভোরের কাগজ, ২/৯/৯৮); (৩৩) ২৭ আগস্ট ইডেন কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীকে বিয়ের কথা বলে তার কথিত প্রেমিক ইকরামুল্লাহ বাবুল ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ আসার পথে রিং রোডে মিজমিজি এলাকায় ধর্ষণ করে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় (সূত্র ঃ ভোরের কাগজ, ২/৯/৯৮); (৩৪) রাজধানীতে লালবাগ এলাকায় নাজিমুদ্দিন রোডে স্বামী আবুল হোসেনের নিক্ষিপ্ত এসিডে দগ্ধ হয়েছে আলেয়া বেগম নামে এক মহিলা (সূত্র ঃ ডেইলি স্টার, ২৭/৮/৯৮)।

শুধু ১৯৯৮-এর আগস্ট মাসে পঞ্চগড়ে ১৯টি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। দেবীগঞ্জে ৯ জন মহিলার ধর্ষণকারীদের নায়ক ছিলেন এনজিও কর্মকর্তা আতাউর রহমান এবং খলনায়িকা ছিলেন লায়লা বেগম। ধর্ষিতারা থানায় মামলা করতে গেলে ওসি প্রদীপ কুমার রায় মামলা নিতে গড়িমসি করে। এক পর্যায়ে এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে টিএনও মামলা নিতে বাধ্য করে তাও ১১ দিন পর।

উল্লেখ্য, আতাউর এনজিও'র ব্যানারে চাকরি দেয়ার নামে চালিয়েছে নারী পাচার ও নারী ধর্ষণের মতো নোংরা কর্মকান্ড। এনজিও'র প্রভাব যেখানে বেশি সেখানেই ধর্ষণজনিত ঘটনা বেশি ঘটতে দেখা গেছে। দুঃখজনক যে, আমাদের দেশে এনজিওগুলো ইদানিং নারীদের চাকরি প্রদানের নামে সম্ভ্রমহানি ঘটাচ্ছে বহুক্ষেত্রে।

www.pathagar.com

৩১/৮/৯৮ তারিখে দৈনিক ইনকিলাব খুলনা ব্যুরো সংবাদদাতা খবর দিয়েছে, শুধু কালিগঞ্জ থানায় বিগত ৭ মাসে শিশুসহ ১০ জন মহিলা ধর্ষিত হয়েছে। গত ৪ মাসে চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৭০টি। এর মধ্যে ধর্ষণ ২৯টি, খুন ২১টি, নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ১২টি, অপহরণ ১০টি, এসিডি নিক্ষেপ ১টি এবং অন্যান্যভাবে নির্যাতিত হয়েছে আরো ৫ জন নারী। শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র চট্টগ্রামের স্থানীয় পত্র-পত্রিকা থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করেছে (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৯/৮/৯৮)। দি ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেটিক রাইট (আইডিআর)-এর এক জরিপে দেখা গেছে, শুধু আগস্ট মাসে সারাদেশে ১২৬টি খুন এবং ৮৯ জন শিশু ও নারী ধর্ষিত হয়েছে। ধর্ষিতাদের ৪৯ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ঘটেছে ৭টি। ধর্ষিতাদের বয়স ৪ থেকে ৪৫ বছর (সূত্র ঃ ভোরের কাগজ ২/৯/৯৮)। এক মাসের পরিসংখ্যান তাও মাত্র ৩/৪টি জাতীয় দৈনিকের রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে ৭০-এর উর্ধ্বে ধর্ষণের সংবাদ ছাপানো হয়েছে। জেলাভিত্তিক জাতীয় দৈনিকের রিপোর্ট ধরলে এ সংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি হবে।

১৪/১০/২০০০ তারিখে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত আরেকটি তথ্যে জানা যায়, ১৯৯১-৯৪ পর্যন্ত নারী নির্যাতন হয়েছে ৫৪৮৩ টি, শিশু নির্যাতন ২৩টি এবং ধর্ষণ হয়েছে ১৭০২৩টি। আর ১৯৯৬-৯৯ পর্যন্ত নারী নির্যাতন হয়েছে ২৪,২৬৩টি, শিশু নির্যাতন ৮১০১৬টি এবং ধর্ষণ হয়েছে ৮১০৩৭টি। সংবাদ হয়ে আসেনি এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে এমন ঘটনা রয়েছে প্রচুর। মোট কথা দেশে নারী শ্লীলতাহানি এখন উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১০/৯/৯৮)

এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ৬টি বিভাগে ৬টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবীতে মানবাধিকার কমিশন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতীক অনশন কর্মসূচী পালন করছে

www.pathagar.com

প্রতিদিন Acid burn রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলছে। ১৯৯৬তে ৪৭টি Case, ১৯৯৭তে ১৩০টি, ১৯৯৮তে ২০০টি এবং ১৯৯৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত ১০২টি Case Record করা হয়েছে। (Source : ASF, The Daily Star, Oct. 8, 1999) এক একজন এসিড আক্রান্তের কিরূপ বীভৎস অবস্থা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মানবতা যেখানে প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। ছোট ছেলে-মেয়েরা এসব রোগীদের দেখলে ভূত মনে করে হার্টফেল বা মূর্ছা যাবে নিশ্চয়।

উক্তরোক্ত ঘটনা প্রবাহ দেশে নিত্য ঘটে যাওয়া শত সহস্র ঘটনার প্রতীকী প্রকাশ মাত্র। কিন্তু কেন আজ এতো আইন করেও অপরাধ দমনে কাংক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না? চিন্তাশীল সমাজ বিজ্ঞানীদের আজ তা ভাবার সময় এসেছে। একদিকে নতুন প্রজন্মের কাছে চরিত্র বিধ্বংসী তামাম উপাদানগুলোকে সহজলভ্য করা শুধু নয় বরং উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে অন্যদিকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করে অপরাধ নিবৃতির প্রয়াস মূলত হাস্যকর তামাসা বৈ কিছুই নয়।

মূলত অপরাধ দমনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো নিজের মধ্যে অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, তীব্র আত্মোপলব্ধির জাগ্রতি এবং সে জন্যে কাংখিত পরিবেশ গড়ে তোলা। এ জন্যে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটা হলো নৈতিক মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় শিক্ষাদান। অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুতীব্র ধিক্কার ও ঘৃণার জন্ম দেয়া। সরকার বড় বড় রাজনৈতিক নেতা এবং দলগুলোর কি এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই? আমাদের সমাজ চিন্তকরা কি এ ব্যাপারে দ্রুত এগিয়ে আসবেন না?

পাশ্চাত্য মিডিয়ায় বাংলাদেশ

বর্তমানে বাংলাদেশের নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকার সম্পর্কে বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করছি।

ফ্রান্সের সর্বাধিক প্রভাবশালী পত্রিকা 'লেমঁদ' ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের নারীরা বেশি মর্যাদা ভোগ করেন' শিরোনামে লিখেন– প্রতিবেশী দেশ ভারতের নারীদের তুলনায় বাংলাদেশের নারীদের সামাজিক অবস্থান যথেষ্ট উন্নত, তারা অনেক বেশি মর্যাদা ভোগ করেন। গত ৪ জুলাই '৯৫ ফ্রান্সে সর্বাধিক প্রভাবশালী পত্রিকা 'লেমঁদ'-এ প্রকাশিত এক পূর্ণ পৃষ্ঠা প্রতিবেদনে এ অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। 'ফেমে রেবেলে দু'বাংলাদেশ' শিরোনামে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনটি লিখেছেন খ্যাতনামা অনুসন্ধানী সাংবাদিক কোরিন লেসনে। তিনি নিজে একজন নারী হিসেবেও বাংলাদেশে নারীর মর্যাদা প্রত্যক্ষ করেছেন সরাসরি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

কোরিন লেসনে লিখেছেন, ১৯৯০ সালে ভারতে পাঁচ হাজার বধূকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। সবগুলো হত্যাকেই দেখানো হয়েছে দুর্ঘটনা হিসেবে। বাংলাদেশের হিন্দু নারীরাও একইভাবে তাদের ধর্মীয় রীতি-প্রথার শিকার। মুসলিম নারীরা নির্যাতিত হয় যৌতুকের কারণে। ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে এই নির্যাতনের মাত্রা অনেক কম উল্লেখ করে তিনি গ্রামাঞ্চলে নিয়োজিত শ' শ' মহিলা সমাজকর্মীর ভূমিকার প্রশংসা

www.pathagar.com

করেছেন। তিনি লিখেছেন, গ্রামীণ সমাজে তাদের প্রভাব ও মর্যাদা রয়েছে যথেষ্ট। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৫/৭/৯৫)

১২/৭/৯৫ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে "বাংলাদেশেই নারীর উপযুক্ত মর্যাদা দেয়" শিরোনামে আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ

আগের লোকের কাছে জানা যায়, আগে নাকি খৃষ্টধর্ম প্রচারকরা এদেশে এসে কিছু লোককে প্রচুর টাকা-পয়সা দিয়ে 'ছিগলী' শিখিয়ে দিতো। (ছিগলী হচ্ছে একই কথা বা বাণী বার বার বলা ও প্রকাশ করা)। আর টাকা খেকো লোকগুলো টাকার বিনিময়ে খৃস্টানদের পক্ষে মুসলমানের বিপক্ষে ছিগলী গেয়ে বেড়াতো। বাংলাদেশের আজকের অবস্থায় কিছু মানুষের বেহিসাবী আচরণ ও কথা প্রসঙ্গে আগের মানুষেরা বলেন- 'এগুলো ছিগলী শিখানো হয়েছে'। সত্যিই গায়ের যোগী ভিখ্ না পেয়ে বিদেশীদের স্বার্থে, তাদের অর্থের জোরে আজ ছিগলী গাইছে দেশে-বিদেশে। কি-না, বাংলাদেশে মানবাধিকার নেই, বাংলাদেশে মেয়েরা বন্দী দাসী।

একজন বিদেশ ফেরত ভদ্র মহিলা বললেন, একটি দেশের টিভিতে নাকি বাংলাদেশের অবস্থা প্রতিফলিত করতে দেখানো হয় একজন বন্দী নারীর মুখ আর সেই সাথে আযান। তার মানে ধর্মই নারীকে বাংলাদেশে বন্দী করেছে। তার জন্য মায়া কান্না কাঁদছে তারাই যাদের ধর্মের চেয়ে মুসলমানের ধর্ম বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক এবং মেয়েদের ব্যাপারে সবচে বেশি উদার।

অনেক প্রবাসীরা বলেন, আজ বাংলাদেশ সম্পর্কে বহির্বিশ্বে গিয়ে অপপ্রচার চালায় সরকার বিরোধী দলীয় কর্মীরা, কিছু কিছু নারী সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং এদেশে মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যারা চায় না। এরা দেশের বাইরে গিয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথম কথাটি বলে বাংলাদেশে মানবাধিকার নেই। সাম্প্রদায়িক শক্তি নারীদের রাস্তাঘাটে বেরুতে দেয় না।

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষিত, চাকরিজীবী এবং গৃহবধূ নারীরা বিষয়টির প্রতিবাদ করেন। তারা বলেন, অন্ধের মতো শুধু বললেই তো হবে না, দেখতে হবে এদেশে দেশের বড় বড় আন্দোলন এগিয়ে নেয়া হলো নারী নেতৃত্বে। এ দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা। একটি বড় বিরোধী দলও একজন মহিলার হাতের ইশারায় উঠে-বসে। এদেশের শিল্প কারখানার শ্রমিক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপক। বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পে। এ দেশের নারীও বিমান চালাতে জানে, আন্তর্জাতিক রুটে বাংলাদেশী নারী বৈমানিকের সগর্ব চলাফেরা নারীর স্বাধীনতার সফল সংযোজন। এদেশের নারী ক্রমান্বয়ে দক্ষ প্রকৌশলী হচ্ছেন। চিকিৎসা বিদ্যায় তারা উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে একের পর এক বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন? এদেশের মেয়ে শিশু এখন আর অবহেলিত নয়। তারা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাথা উঁচু করে চলছে। তারা হচ্ছেন গর্বিত সাংবাদিক, লেখক, কবি-সাহিত্যিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, এক্সিকিউটিভ, ব্যবসায়ী, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিকা, নিপুণ গৃহবধূ, সুসন্তানের মা। যখন বাংলাদেশের নারী পৃথিবীর যে কোন দেশ বা স্থানের নারীর চেয়ে মর্যাদা ও মূল্য পাচ্ছে বেশি তখনই বাংলাদেশের নারী সম্পর্কে মিথ্যে প্রচার প্রপাগান্ডা চলছে অত্যন্ত সুকৌশলে।

www.pathagar.com

উন্নত বিশ্বের নারী সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তাতে একজন কিশোরী স্কুলে পড়াকালেই সহপাঠী দ্বারা উত্যক্ত হতে শুরু করে, এরপর কর্ম ও ব্যক্তিজীবনে পুরুষ দ্বারা হয়রানির কোনো সীমা নেই। জীবনাচার উচ্ছৃঙ্খলাপূর্ণ হওয়ায় যেখানে মেয়েদের লিভিং টুগেদার-এর ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কের বিষময় ফল তাদের সন্তান। পারিবারিক জীবন ওখানে ভেঙ্গে গেছে। গণতান্ত্রিক দেশ হলেও গন্ডায় গন্ডায় সেখানে মহিলা প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী আসে না। মেয়েদের নিজেদের দায়িত্বভার নিজেকেই পালন করতে হয় আত্মনির্ভরশীলতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার চূড়ায় হলেও মেয়েরা ওখানে বেশি অসহায়, বেশি নিঃসঙ্গ। শুধুমাত্র পুরুষ দ্বারা আক্রান্ত হবার ভয়ে অনেক মেয়ে অস্ত্র হাতে রাখে আর নখকে করে শাণিত। তাহলে সেসব দেশ নারীকে মুক্তি ঠিকই দিয়েছে কিন্তু নিরাপত্তা দিতে পারেনি।

আমাদের দেশে যারাই সভ্য হয়ে চলতে পারে না ব্যর্থ হয়, তারাই এদেশের বদনামী করে। নারীত্বকে উপলব্ধি করতে পারে না বলেই নারীর মূল্যকে ভুল ব্যাখ্যায় কন্টকিত করে।

এদেশে কখনোই নারী আর দাসী নয়। সে যদি ঘর ভালবাসে তবে ঘরই তার আশ্রয়। সে যদি কর্ম ভালবাসে তবে কর্মক্ষেত্রও খোলা। সেই সাথে ঘরও তাকে নিরাপত্তা দিতে কসুর করে না। এতে আর নারীর জন্য মিথ্যে মায়া কান্না কেনো? তোমরা যদি জান বাংলাদেশে নারী বন্দী তবে তা ভুল। মিডিয়া মিথ্যা জানিয়েছে। অপার স্বাধীনতার কুফল বইয়ে দিচ্ছে কলম ও তথাকথিত পত্রিকাবাজরা। আর তাই এতো মিথ্যার বেসাতি।

এদেশে মুসলিম মেয়েরা খেয়ে পরে সুখে আছে। এরা বন্দী নয় কোনো মতেই ক্রীতদাসী তো নয়ই। কারা কাদের ক্রীতদাসী হয়ে কাজ করছে মেয়েদের বিরুদ্ধে তা মহিলারা বুঝে গেছে। তারা আজ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার, প্রতিবাদী। সব স্থানেই মেয়েদের এক আলাপ বাংলাদেশী নারীরা উচ্ছৃঙ্খলা প্রশ্রয় দেয় না। বাঁধনহারা জন্তুর মতো মুছে দিতে চায় না ঘরের সীমানা। তারা ভাল আছে। তাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত বিছাবার প্রয়োজন নেই।

আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ মুসলিম সম্প্রদায়। ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে এ দেশের জনগণ নারীকে সম্মান ও অধিকার দেয়। এখানে প্রতিদিন বিদ্যুৎ চলে যায়। কিন্তু আমেরিকার ন্যায় পাইকারী হারে নারীরা ধর্ষিতা হয় না। আমাদের দেশে বিবাহযোগ্যা মেয়েকে বিয়ে দিতে পিতা সর্বস্বান্ত হয়। পিতার অবর্তমানে ভাই দায়িত্ব নেয় বোনকে পাত্রস্থ করতে। পশ্চিমা দেশগুলোতে যা কল্পনাও করা যায় না।

একজন অসভ্য ব্যক্তি আরেকজন সভ্য ব্যক্তিকে অধিকার নিরাপত্তা দিতে পারে না। ঠিক তেমনি একটি অসভ্য জাতি আরেকটি সভ্য জাতিকে নিরাপত্তা-অধিকার দিতে পারে না। পাশ্চাত্যে আজ প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। অথচ এরা আমাদের দেশে এনজিওদের মাধ্যমে নারী মুক্তির চটকদার বুলি আওড়াচ্ছে।

বর্তমানে যে হারে নারী নির্যাতন হচ্ছে এ জন্যে ধর্ম দায়ী নয়। দায়ী ইসলামী অনুশাসনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্য বেহায়াপনা সংস্কৃতিকে অনুশীলন এবং

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কর্তৃক সন্ত্রাসবাদীদের লালন।

আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ ইসলাম ধর্মের রীতি-নীতি ও অনুশাসন কিছুটা মেনে চলার কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন এখনো টিকে আছে। পাশ্চাত্য ও ভারতের তুলনায় আমাদের দেশে তুলনামূলকভাবে নারী নির্যাতনের হার সবচেয়ে কম। তবে পুরুষ নির্যাতনের হার নারী নির্যাতনের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি। পারিবারিক মান-সম্মান ক্ষুণ্ন হবার ভয়ে সমাজে তা প্রকাশ পায় না।

এ সম্পর্কে দৈনিক সংবাদ-এ একটি রিপোর্ট গত ৩/৫/৯৬ তারিখে "তালাক ঃ স্বামী নয়, স্ত্রীরাই বেশি দিচ্ছে" শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি হুবহু উদ্ধৃত হলো।

তালাক। এ শব্দটি শুনলেই মনে হয় কোন স্বামী তার স্ত্রীকে তালা দিয়েছে। অর্থাৎ দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। ভেঙ্গে গেছে একটি সাজানো সংসার। তালাক দেবার বিষয়টি বেশির ভাগই পুরুষ কর্তৃক তার স্ত্রীকে দেয়া হয় বলেই জনমনে ধারণা রয়েছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কিন্তু তা নয়। সম্প্রতি ঢাকা সিটি করপোরেশনের সালিশী পরিষদের হিসেব অনুযায়ী দেখা গেছে, পুরুষদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে মহিলারা বেশি তালাক দিচ্ছে। স্বামীকে ফেলে চলে যাচ্ছে অন্য পুরুষের কাছে।

সিটি করপোরেশনের হিসেব অনুযায়ী গত চার বছরে রাজধানীতে মোট তালাকের ঘটনা ঘটেছে ৫ হাজার ৬১টি। এর মধ্যে মহিলা কর্তৃক স্বামীকে তালাক দেয়া হয়েছে ৪ হাজার ৩শ' ২টি এবং পুরুষ কর্তৃক স্ত্রী তালাক হয়েছে ১ হাজার ৬শ' ৫৯টি। অর্থাৎ মহিলারা পুরুষের চেয়ে দ্বিগুণ হারে তালাক দিয়ে চলেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, রাজধানীর উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মধ্যে তালাকের সংখ্যা বাড়ছে। উচ্চবিত্ত পরিবারের মধ্যে মহিলারাই নানা কারণে পুরুষদের বেশি তালাক দিয়ে থাকে। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের তুলনায় মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বামী-স্ত্রী দ্বন্দ্ব, পারিবারিক কলহের কারণেই তালাকের সংখ্যা বাড়ছে। অপরদিকে নিম্নবিত্ত পরিবারে তালাকের সংখ্যা বাড়ছে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে। উচ্চবিত্ত পরিবারে চাকরিজীবী এবং ব্যবসায়ী মহিলারাই অধিকহারে স্বামী তালাক দিচ্ছে। সালিশী পরিষদের হিসেবে মোতাবেক প্রতিবছরই তুলনামূলকভাবে বাড়ছে তালাকের সংখ্যা। '৯২ সালে রাজধানীতে মোট তালাক হয় ১ হাজার ৪শ' ৪২টি। এর মধ্যে পুরুষ কর্তৃক ৩৫২টি ও মহিলা কর্তৃক ৭৯০টি। অর্থাৎ পুরুষ ৩১ ভাগ আর মহিলারা ৬৯ ভাগ তালাক দেয় ঐ বছর।

১৯৯৪ সালে মোট তালাক হয় ১৪শ' ৭৯টি। এর মধ্যে স্বামী দিয়েছে ৪শ' ১১টি এবং স্ত্রী দিয়েছে ১ হাজার ৬৮টি। চলতি বছরের ১০ এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৪শ'টি তালাক হয়েছে। এর মধ্যে স্বামী দিয়েছে ৮১টি ও স্ত্রী দিয়েছে ৩১৯টি। (দৈনিক সংবাদ, ৩/৫/৯৬)

বাংলাদেশে যদি ১ কোটি স্বামী এবং ১ কোটি স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের কয়জন তাদের বউ পেটায়? এদের সংখ্যা কি দশ হাজারের বেশি হবে? যদি দশ হাজার হয় তাহলে তাদের শতকরা হার মাত্র ০.১। এমনকি বউ পেটানো স্বামীর সংখ্যা যদি ৫০

www.pathagar.com

হাজারও হয় তাহলেও সেটা ০.৫ শতাংশের বেশি হবে না। তাহলে সারা বাংলাদেশের সব স্বামীর মধ্যে যদি মাত্র ০.১ শতাংশ বা উর্ধ্বের ০.৫ শতাংশ স্বামী স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি নগণ্য।

গত ৭/৭/৯৫ তারিখে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় বাংলাদেশে তালাক সম্পর্কে মিডিয়া সিন্ডিকেট পরিবেশিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এ রিপোর্টে বলা হয় দেশে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের মাত্রা গত বছরের চেয়ে এ বছর ৫ শতাংশ বেড়েছে। গত বছর ১৯৯৪ সালে সারাদেশে তালাকের হার ছিল ১১.০৫ শতাংশ, তা এ বছর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬.০৫ শতাংশ। সমাজকল্যাণ অধিদফতর এবং পারিবারিক আদালতগুলোর সূত্রে পাওয়া পরিসংখ্যান থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। কর্মজীবী মহিলাদের মধ্যে দাম্পত্য সংকটের মাত্রা বেশি। বস্তুত কর্মজীবী মহিলাদের ৮ শতাংশই তালাকপ্রাপ্তা। সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক কারণে তালাকপ্রাপ্ত হয়েছে .০২ শতাংশ মহিলা। পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও জেদের কারণেও অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারাও তালাকের শিকার হয়ে থাকেন। বেশিরভাগ প্রেমঘটিত বিয়ের সমাপ্তি ঘটে তালাকের মাধ্যমে। উভয় ক্ষেত্রে এই হার .০২ শতাংশ করে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ ও নেশার কারণে অনেক সময় বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে। পাত্র বা পাত্রী পক্ষ বিয়ের আগে চরিত্রগত দোষ গোপন করে, পরে তা প্রকাশিত হয়ে পড়লেও পরিণতি তালাক পর্যন্ত গড়ায়। এ ছাড়া যৌতুকের কারণেও অনেক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে। (দৈনিক ইনকিলাব ৭/৭/৯৫)

এ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সারাদেশে তালাকের হার ছিল ১১.০৫ শতাংশ। তা বেড়ে ১৯৯৫ সালে দাঁড়িয়েছে ১৬.০৫ শতাংশ। এর মধ্যে কর্মজীবী মহিলারা তালাক প্রাপ্ত হয়েছে ৮ শতাংশ। সুতরাং আমাদের দেশে তালাকের আধিক্য সামাজিক বা ধর্মীয় নয়। অথচ পাশ্চাত্যের এনজিও ও প্রচার মিডিয়াগুলো তালাকের ব্যাপকতাকে ধর্মীয় ও সামাজিক কারণ বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

ইসলামে বহু বিবাহ

ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ সমালোচকরা অপপ্রচার করে থাকে যে, বহু বিবাহ প্রথা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রবর্তন করেন। এ অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন, অজ্ঞতা অথবা বিদ্বেষপ্রসূত। কারণ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই সমগ্র জগতে বহু ধরনের বহু বিবাহ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো।

প্রাচীনকালে অনেক রকম বহু বিবাহ প্রচলিত ছিলো। একজন পুরুষ একই সময়ে একাধিক স্ত্রী এবং একই নারী একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণ করতো। বহু স্বামী গ্রহণের প্রথা পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রচলিত ছিলো। বিভিন্ন কারণে তা এখনো ভুটান, আসাম ও ভারতে প্রচলিত আছে। বহু স্বামী গ্রহণের প্রচলিত নিয়ম ছিলো ঃ

বড় ভাই এক নারীকে বিয়ে করলে সে গোটা পরিবারের স্ত্রী হয়ে পড়ে। স্বামীর অন্যান্য ভাই ও অতি নিকট আত্মীয়রা তার উপর স্ত্রীত্বের অধিকার লাভ করে। স্ত্রী সঙ্গলাভের অগ্র-পশ্চাৎ প্রশ্নে তাদের মধ্যে কখনো কোনরূপ মতানৈক্য, হিংসা-বিদ্বেষ ও

www.pathagar.com

মন কষাকষির উদ্রেক হলে সকলের কল্যাণ কামনায় তারা তা বিসর্জন দিয়ে দিতো। পরস্পরের সহনশীলতা ও সমঝোতার মাধ্যমেই তারা স্বামীত্বের অধিকার ভোগ করতো। তবে এ স্ত্রী সন্তান প্রসব করলে কখনো কখনো বিবাদ বেধে যেতো। কারণ প্রত্যেকেই নবজাত শিশুকে নিজ সন্তান বলে দাবী করতো। অনেক সময় শিশুর আকৃতির সাথে তাদের আকৃতি মিলিয়ে দেখা হতো। সন্তানটির পিতা কে, এ সিদ্ধান্তের ভার কোনো কোনো সময় স্ত্রীর উপর অর্পণ করা হতো। পান্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের একই স্ত্রী ছিলো। পূর্বকালে এ প্রথা আরবেও ছিলো। বহু বিবাহের অপর প্রথা হলো, একই পুরুষের একই সময়ে বহু স্ত্রী গ্রহণ করা। এর নিয়ম হলো ঃ একজন পুরুষ যখন কোনো পরিবারের বড় কন্যাকে বিয়ে করলো তখন সে তার ছোট সব বোনের উপর স্ত্রীত্বের পূর্ণ অধিকার পেলো। কেউ যদি পরিবারের কোনো ছোট বোনকে বিয়ে করে তবে সে তার পরবর্তী ছোট বোনদের উপর স্ত্রীত্বের অধিকার পাবে; কিন্তু তার বড় বোনদের উপর নয়। এ রীতি চীন ও ভারতে প্রচলিত ছিলো।

হিন্দু ধর্মের সর্বত্র বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহের পক্ষে নানারকম আদেশ ও উপদেশ বর্ণিত আছে। যেমন কাশ্যপ বলেছেন– যে কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে রজঃস্বলা হয়, তাহার পিতা ভ্রূণ হত্যা পাপে লিপ্ত হন। সেই কন্যাকে বৃষলী বলে। যে জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ সেই কন্যার পাণি গ্রহণ করে, অশ্রাদ্ধেয় (যাহাকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাইলে শ্রাদ্ধ পন্ড হয়) ও অপাংক্তেয় (যাহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতে নাই) ও বৃষলীপতি (উদ্বাহতত্ত্ব)। যমসংহিতায় এও বলা হয়েছে, কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় রজঃস্বলা দেখিলে মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই তিনজন নরকগামী হয়। যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানাবদ্ধ হইয়া সেই কন্যাকে বিবাহ করে, সে অসম্ভাষ্য (যার সাথে সম্ভাষণ করলে পাতক জন্মে) অপাংক্তেয় ও বৃষলীপতি। জীমূতবাহন প্রণীত দায়ভাগ-এ আছে, 'স্তন প্রকাশের পূর্বেই কন্যাদান করিবেক। যদি কন্যা বিবাহের পূর্বে ঋতুমতী হয়, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে নরকগামী হয় এবং পিতা পিতামহ প্রতিতামহ বিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করে। অতএব ঋতুদর্শনের পূর্বেই কন্যাদান করিবেক।' 'যে ব্যক্তি তিন বিবাহ করিয়া চতুর্থ বিবাহ না করে সে সাত কুল পাতিত করে, তাহার ভ্রূণ হত্যা প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক' (উদ্বাহতত্ত্ব) অথবা 'ধর্মকর্মোপযোগী ব্যক্তিদের এক ভার্যা স্বীকার করা কর্তব্য, কিন্তু উপযাচিত হইয়া কেহ কন্যা প্রদানেচ্ছু হইলে অথবা রতিবিষয়ক সাতিশয় অনুরাগ থাকিলে তাহারা অনেক ভার্যাও গ্রহণ করিবেক'– শাস্ত্রের এই প্রশ্রয় পেয়ে হিন্দু সমাজের কুলীনেরা নির্দ্বিধায় বহু বিবাহ প্রথার সযত্ন চর্চা করতেন।

বৈদিক যুগে এবং এর পরবর্তী কালেও ভারতে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিলো। একজন পুরুষ একই সময়ে যতো ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো। মনুর যুগেও বহু বিবাহ প্রচলিত ছিলো। রাজা দশরথের তিন স্ত্রী ছিলো। মহারাজা ধ্রুবের পাঁচজন, পান্ডুর দুই ও অর্জুনের তিন স্ত্রী ছিলো। একজন ব্রাহ্মণ চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো। একজন ব্রাহ্মণ গোত্রের এবং অপর তিনজন বাকি তিন গোত্রের। ক্ষত্রীয় তিন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো। একজন নিজ গোত্রের এবং অপর দুইজন পরবর্তী দুই গোত্রের। বৈশ্য দুই স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো। একজন তার নিজ গোত্র হতে এবং অপর একজন শূদ্র

www.pathagar.com

গোত্র হতে। একজন শূদ্র কেবল তার গোত্র হতে একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো।

রাজা দশরথের তিন স্ত্রী ছিলো। মহারাজা ধ্রুবের পাঁচজন, পাণ্ডুর দুই ও অর্জুনের তিন স্ত্রী ছিলো। এ ছাড়া হিন্দুদের মধ্যে একজন নারী একাধিক স্বামী গ্রহণেরও বিধান ছিলো। পান্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের একই স্ত্রী এর প্রমাণ। তাছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের ১০৭টি এবং কিশোরী মোহনের ৬৫টি স্ত্রী ছিলো। এক একজন কুলীণ ব্রাহ্মণ ৮০টি পর্যন্ত বিবাহ করেছেন এমন বর্ণনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা বইয়ে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাল হতেই চীন দেশে কোনো না কোনো ধরনের বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো। একজন প্রধান মহিষীর পর স্বামী যতো ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো। তাদের সকলের গর্ভজাত সন্তানই পিতার বৈধ সন্তান বলে পরিগণিত হতো। দরিদ্র পরিবারের কারো কোনো কন্যা সন্তানকে আপন পরিবারভুক্ত করে লওয়া সাধারণ রীতিরূপে প্রচলিত ছিলো এবং এ কন্যাই পরিশেষে পরিবারের কোনো ছেলের স্ত্রীরূপে পরিগণিত হতো।

ইয়াহুদী ধর্মে একই সময়ে একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী রাখতে পারবে, ইয়াহুদী ধর্মে এর সংখ্যা নির্ধারিত ছিলো না। তবে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রীতিই সাধারণত প্রচলিত ছিলো।

আমেরিকায় প্রায় প্রতিটি পুরুষের বহু নারীর সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক রয়েছে। সেখানকার প্রায় গৃহগুলোই নিকৃষ্টতম বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। বেশ্যাবৃত্তি অবাধে সর্বত্র চলছে। জারজ সন্তানে দেশ ভরে গেছে। এমনকি সে দেশের প্রেসিডেন্টেরও বহু নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক থাকার সংবাদ প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র যদি এই হয় তাহলে তাদের কলঙ্ক রাখবার আর স্থান নেই। এমতাবস্থায় আইনসঙ্গতভাবে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে একাধিক স্ত্রী রাখা অনেক ভালো।

আফ্রিকা, জার্মান, গ্রীস, ব্যাবিলন, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে বহু বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিলো। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক দেশে বহু বিবাহ রোধ করার ফলে বহু নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর অনেক দেশে বহু বিবাহের প্রথা এখনো বহাল রয়েছে।

হিন্দু ধর্মে যৌন ক্রিয়া সম্পর্কিত অনেক অনাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে যা পরবর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান ধর্মের ধর্মীয় অনাচার নিয়ে তথাকথিত প্রগতিবাদীরা মাথা ঘামায় না। তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। মুসলমানদের পর্দা প্রথা, বহু বিবাহ, তালাক, হিলা প্রথা ও কন্যার সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লের' মতো আচরণ করেন। বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে এরা একতরফাভাবে দায়ী করছে মৌলবাদ ও ফতোয়াবাজদের। এরাই নাকি নারী উন্নয়নের, নারী মুক্তির একমাত্র অন্তরায়। এসব আন্তর্জাতিক চক্র নিজ দেশে নারীদেরকে জাহান্নামের রাস্তায় ঠেলে দিয়ে আমাদের দেশের নারীদেরকে নিয়ে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করছেন। আমাদের দেশের দালালদের সাহায্যে এসব এনজিও নামধারীরা কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক আইন-কানুনকে নিয়ে পত্র-পত্রিকায় রেডিও-টিভিতে

www.pathagar.com

বক্তৃতা-বিবৃতিতে ও নাটকের মাধ্যমে হাসি-ঠাট্টা, কটাক্ষ, অপব্যাখ্যা ও অপবাদ দিয়ে যাচ্ছে। এরা ইসলামকে চতুর্থ শ্রেণীর ধর্ম হিসেবে মনে করে।

তথাকথিত নারীমুক্তিবাদীদের 'নারী স্বাধীনতা'র সংজ্ঞা হলো যখন খুশী, যাকে ইচ্ছে শয্যাসঙ্গিনী করা এবং আনন্দ-ফূর্তি করে ন্যাপকিনের মতো ছুঁড়ে ফেলা। যত্রতত্র পথে-ঘাটে জন্তু-জানোয়ারের মতো যৌন ক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে পিতৃ পরিচয়হীন অবৈধ গর্ভপাত ঘটানো।

কিন্তু ইসলাম তথাকথিত নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয়। সামাজিক শৃঙ্খলা ও পুরুষদেরকে বহুগামী ও সামাজিক ব্যাভিচার হতে বিরত রাখার স্বার্থেই ইসলামে চারটি বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে শর্ত থাকে যে, অবশ্যই একের অধিক বিবাহকারী পুরুষদেরকে প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতি সমব্যবহার করতে হবে। কাজেই আল্লাহ ভীরু পুরুষেরা একের অধিক বিবাহে উৎসাহী নয়। এর ফলে বহু বিবাহকে রোধ করা হয়েছে। সামাজিক শৃঙ্খলার স্বার্থে একের অধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি ইসলাম নারীদেরকে দেয়নি। যদি অধিক স্বামী রাখার অনুমতি স্ত্রীদেরকে দেয়া হতো তবে সমাজে সন্তানের উত্তরাধিকার নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হতো। তবে তসলিমার আক্ষেপ সন্তান পিতৃ পরিচয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলে; মাতার পরিচয়ে সন্তান সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে না কেনো? তসলিমার সূত্র অনুযায়ী যদি সন্তান মাতৃ পরিচয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে পুরুষদের জন্য আরো পোয়া বারো। কিছু সংখ্যক কামুক পুরুষ এ সুযোগ গ্রহণ করবে। যেমন পাশ্চাত্যের পুরুষেরা এ সুযোগ গ্রহণ করে। যত্রতত্র পথে-ঘাটে যৌন ক্রিয়া সম্পাদন করে পিতৃ পরিচয়হীন অবৈধ গর্ভপাত ঘটায়। এসব অবৈধ শিশু মেটারনিটি হসপিটালে জন্ম হয়। চাইল্ড হোমে লালিত-পালিত হয়। বড় হয়ে চাকরি অথবা ব্যবসা বাণিজ্য করে হোটেলে বসবাস করে। জীবন সায়াহ্নে ওল্ড হোমে নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করে হাসপাতালে মারা যায়। এটাই হলো তাদের জীবন ব্যবস্থা।

নারীদেরকে নিয়ে ফূর্তি করবে অথচ তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে না এমন অধিকার পুরুষদেরকে ইসলাম দেয়নি। তথাকথিত প্রগতিবাদীরা নারী স্বাধীনতার নামে কোটি কোটি নারীকে জাহান্নামের রাস্তায় ঠেলে দিচ্ছে এটা দোষের নয়; এদের নিকট দোষের হচ্ছে ইসলামের চারটি বিবাহ প্রথাকে নিয়ে। বাম ও রামপন্থী দালালেরা বহু বিবাহকারী হিসেবে চিহ্নিত করছে মোল্লা-মৌলভীদেরকে। কিন্তু সঠিক পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে যে, মোল্লাদের চেয়ে তথাকথিত বিবৃতিবাদী ও তার দোসরেরা বহু বিবাহে অভ্যস্ত। বিয়ের নামে প্রতারণা এবং অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে কতো মেয়ের, কতো পরিবারের সর্বনাশ করেছেন কে জানে?

এ সম্পর্কে অমুসলিম নারী মিসেস এ্যানি বেসান্ত বলেন, "কোনো কোনো দেশে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সত্যিকার অপরাধমুক্ত যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলার আদর্শ প্রচার করা হয় কিন্তু প্রতিপালিত হয়না কোথাও। বহু বিবাহকে ইসলাম অনুমতি দেয় আর খৃষ্টধর্ম তা নিষেধ করে। তারা (খৃষ্টানেরা) গর্ব করে যে তাদের মধ্যে একটার বেশি আইন সিদ্ধ বন্ধন কারও সঙ্গে নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্যে রয়েছে লোক দেখানো প্রকাশ্য এক বিবাহ আর গোপনে দায়িত্বহীন বহু বিবাহ। এইসব চোরা ব্যবস্থার

www.pathagar.com

অবসান ঘটানো এবং বাদী দাসীদের মানুষের মর্যাদা দেয়ার উদ্দেশ্যেই ইসলামে একাধিক বিবাহের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু একথাও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গে সম-ব্যবহার করতে না পারলে তার জন্য এক বিবাহ উত্তম।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী বিধি বিধান বহু বিবাহে নিরুৎসাহিত করেছে। যৌন কাতর পুরুষেরা যাতে সমাজকে কলুষিত করতে না পারে অথবা যৌন দুর্বল নারী যাতে বিবাহ বিচ্ছেদের শিখার না হন ইত্যাদি কারণে ইসলামে বহু বিবাহ অনুমোদন করেছে শর্ত সাপেক্ষে। কিন্তু ইসলামের দোহাই দিয়ে যারা শুধু আনন্দ-ফূর্তি করার জন্য একাধিক বিয়ে করেন এরা সামাজিকভাবে নিন্দিত। এ ছাড়া পারিবারিক অশান্তিও তো আছেই। এ নিয়ে আবহমানকাল ধরে রচিত হয়েছে নানা বৈচিত্রের কবিতা, গান, চুটকি, ছড়া। তেমনি একটি কবিতা হলো ঃ

"শুনি মজুমদার বড় উন্মনা হইল।
কার ঘরে আগে যাবে ভাবিত লাগিল।।
যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ।
বড় কৈলা বাদহাটা আগুলিয়া পথ।।
এক চক্ষু কাতরায় ছোট ঘরে যায়
আর চক্ষু রাঙ্গা হয়ে বড়জনে চায়।।
... দু'জনার ঘরে গিয়া দুই জনা থাক।
ডাকাডাকি না কর সহিতে নারি ডাক।
কামের করাতে ভাগ করি কলবরে।
সমভাবে রব গিয়া দু'জনার ঘরে।।
...ছেলে পেলে নিদ্রা গেলা...
রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
যাইতে ছোটর কাছে মনের বাসনা আছে
সমাপিলা বড়র বাসর।
রাত্রি শেষে গেলে তথা ক্রোধে না কহিবে কথা।
খন্ডিতা হইবে পদ্মমুখী।
খেদাইতে কটূ কয়ে কলহান্তরিতা হয়ে।
কান্দিবেক হয়ে বড় দুঃখী।"

এছাড়া বহু প্রবচন রয়েছে। যেমন ঃ

"নিম তিতা, নিশিন্দা তিতা,
আরো তিতা ক্ষর
তারো চাইতে বেশি তিতা
দুই সতীনের ঘর।"

ইসলামে বহু বিবাহ প্রথার সুযোগে আমাদের দেশের কতিপয় কামুক ও লম্পট এ বিধানের অপব্যবহার করে। আবার এরাই অতি সহজে বেহেস্তে যাবার লোভে শেষ বয়সে দাড়ি-টুপি ও ইসলামী লেবাস পরে অতি ধার্মিক বনে যায়। প্রকৃতপক্ষে এরা

www.pathagar.com

অনেকেই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। এদের বহু বিবাহসহ অন্যান্য অপকর্মগুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে মোল্লা-মৌলভীদের উপর চাপিয়ে অপপ্রচার করে মূলতঃ ইসলামের রীতি-নীতিকে অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

এটি দুঃখজনক যে, নবী করিম (সাঃ) এর স্ত্রীদের সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে অনেক মুসলমানই সংকোচবোধ করেন, দ্বিধাবোধ করেন। কিন্তু এতে জড়তা, দ্বিধা বা সংকোচের আদৌ কোন অবকাশ নেই। নবীর অনুপম চরিত্রে কোন দুর্বলতা ছিলো না। সুতরাং তাঁর জীবনের কোন অংশের আলোচনা এড়িয়ে যাবার প্রয়োজন ঘটে না। একটু কষ্ট স্বীকার করে জানার চেষ্টা করলেই উপলব্ধি হবে– কেন, কখন, কাকে, কি পরিবেশে এবং কি কারণে তিনি বিবাহ করেছিলেন। এতে সহজেই এই বিবাহসমূহের যৌক্তিকতা, সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। সত্যসন্ধভাবে ইতিহাসকে জানলে আমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে না। এসব বিবাহ সম্পর্কে যদি কেউ বিদ্রূপাত্মক বাখ্য উচ্চারণ করেন কিংবা এর মধ্যে কোন ত্রুটি, বিকৃত রুচি অথবা অস্বাভাবিক মানসিকতার পরিচয় আবিষ্কার করেন; তাহলে একথা সুপ্রত্যয়ের সঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বাস্তবিকপক্ষে তিনি ইতিহাসকে সঠিকভাবে অধ্যয়ন করেননি এবং নবী করিম (সাঃ)-এর জীবন সুষ্ঠু এবং পরিপূর্ণ বিশ্লেষণে সক্ষম হননি।

তাছাড়া, ইসলামের নবীকে সঠিকভাবে না জানতে পারলে ইসলামকে জানা সম্ভব নয়। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন প্রতিটি মুসলমানের আদর্শ ও পথিকৃৎ। তাঁর জীবনের প্রতিটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানবার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহামানবের জীবন মহাসাগরের মতোই বিশাল ও রত্নগর্ভ। শুধুমাত্র একবার মন্থন করলেই এই মহাসাগরের সকল রত্নের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হবে না। বারংবার চেষ্টা করতে হবে তাঁকে জানবার– তাঁকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার এবং তাঁর আদর্শকে পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার।

ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মোট ১২ জন পত্নী ছিলেন। এই সংখ্যা সম্পর্কে অবশ্য কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে।

ইসলামী চিন্তাবিদ মৌলানা আশারাফ আলী থানভী তাঁর বিখ্যাত 'বেহেশতী জেওর' গ্রন্থে ১১ জন স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন। কবি গোলাম মোস্তফা বিরচিত বহুলপঠিত 'বিশ্বনবী' গ্রন্থে ১৩ জন স্ত্রীর নাম লিপিবদ্ধ আছে। ইবনে হিশামও ১৩ জন স্ত্রীর উল্লেখ রেখেছেন। অন্যান্য কিছু গ্রন্থে ১৫ কিংবা ১৬ জন স্ত্রীর নামও পাওয়া যায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও গবেষকের মতে নবী করিম (সাঃ)-এর সর্বমোট ১২ জন পত্নী ছিলেন। 'উম্মাহাতুল্ মু'মিনীন' এই ১২ জন সহধর্মিনী হলেন ঃ

১. হযরত খাদিজা (রাঃ) বিনতে খালিদ বিন আসাদ (ইনি প্রথমে তাহিরা বা 'পবিত্র' নামে পরিচিত ছিলেন)
২. হযরত সাউদা (রাঃ) বিনতে জামাহ ইবনে কায়েস
৩. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) বিনতে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)
৪. হযরত হাফসা (রাঃ) বিনতে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)

www.pathagar.com

৫. হযরত জয়নব (রাঃ) বিনতে খুজাইমা
৬. হযরত উম্মে সালমা হিন্দ (রাঃ) বিনতে আবু উমায়আহ্ ইবনে আল মুগিরাহ
৭. হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ) বিনতে আল-হারিস (এঁর আসল নাম ছিলো বাররাহ্)
৮. হযরত জয়নব (রাঃ) বিনতে জাহ্‌শ
৯. হযরত উম্মে হাবিবা রমলা (রাঃ) বিনতে আবু সুফিয়ান
১০. হযরত সাফিয়া (রাঃ) বিনতে হুয়াই বিন আখতাব (এঁর আসল নাম ছিলো জয়নাব)
১১. হযরত মায়মুনা (রাঃ) বিনতে আল-হারিস
১২. হযরত মারিয়া (রাঃ) বিনতে শিমুন (ইনি মারিয়া কিবতিয়া নামেও পরিচিত)।

নবী করিম (সাঃ) এর উপরোক্ত সম্মানিতা ১২ জন স্ত্রী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যবহুল ও মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায় ফিদা হুসেইনের "Wives of the Prophet" গ্রন্থে।

এটি বিস্ময়কর যে, মৌলানা আশরাফ আলী থানভীর মতো প্রাজ্ঞ মনীষী হযরত মারিয়া বিনতে শিমুনের প্রসঙ্গ একেবারেই উল্লেখ করেননি। রসুল আল্লাহ (সাঃ) এর পুত্র ইব্রাহিমের মাতা মারিয়া কিবতিয়া নিঃসন্দেহে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'বিশ্বনবী' গ্রন্থেও ১২ জন স্ত্রীর কথাই যথার্থ বলে মনে করা হয়েছে। 'বিশ্বনবী'তে সুস্পষ্টভাবে দাবী করা হয়েছে যে, ত্রয়োদশ স্ত্রী রায়হানা সম্পর্কে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকই রায়হানার উপাখ্যানটি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করেন। "The Spirit of Islam" গ্রন্থে সৈয়দ আমীর আলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"The story about Raihana becoming a wife of the Prophet is a fabrication, for, after this event, she disappears from history and we hear no more of her, whilst of others we have full and circumstantial accounts."

শুধুমাত্র মুসলমান ঐতিহাসিকবৃন্দই নন, M. Berthelemy, St. Hilaire, Dr. Johnson, Stanley Lane-Poole- এর মতো বিশ্ববিখ্যাত অমুসলিম ঐতিহাসিকগণও রায়হানার উপাখ্যানটি সম্পূর্ণরূপে অলীক ও কল্পনাপ্রসূত বলে বিবেচনা করেছেন।

অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের কতিপয় লেখক-বুদ্ধিজীবী বহুদিন পূর্ব থেকেই মহানবী (সাঃ)-এর বহু বিবাহের বিষয়টি নিয়ে অপপ্রচার করে আসছে। যেমন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের কলকাতা মহানগরীর বুকে ১৯২৭ সালে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বহু বিবাহ নিয়ে রাজপাল নামক একজন বিধর্মী লেখক 'রঙিলা রাছুল' শীর্ষক একটি গ্রন্থ লিখে মুসলমানদের ঈমান-আকিদায় আঘাত হানে। এই গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে কৃষ্ণ ও নারায়ণের সমতুল্য হিসেবে চিত্রিত এবং একাধিক স্ত্রীর জন্যে তাঁর চরিত্রের উপর কলঙ্ক লেপন করে। সে সময়ে 'রঙিলা রাছুল' গ্রন্থের লেখক নরাধম রাজপালকে নির্মমভাবে হত্যা করেন আমির আলী ও আবদুল্লাহ্ নামক দু'জন ঈমানদার মর্দে মুমিন। পরবর্তীতে এ অপরাধে এঁদের দু'জনকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করে। বর্তমানে আমাদের দেশে

www.pathagar.com

নরাধম রাজপালের ন্যায় মুসলিম নামধারী লেখকের জন্ম হয়েছে।

১৯৯৭ সালের ১ জুন শিশু একাডেমিতে রেনেসাঁ সাহিত্য সাংস্কৃতিক দলের উদ্যোগে 'সমাজের অবক্ষয়' নাটকে নায়কের একটি সংলাপ ছিলো- "এই তোর বিয়ে হবে কয়টারে"। এ কথার জবাবে বলা হয়, "পবিত্র কুরআনে আছে ৭টা। আমি ৬টা করেছি। সুতরাং আরো একটি বাকি আছে।" এই বক্তব্যের পর পরই উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পরবর্তীতে একজন নেতা এ সময় '৭টার জায়গায় ৪টি হবে' এই সংশোধনী দেন। এতে দর্শকরা আরো ক্ষুব্ধ হলে অবস্থা বেগতিক দেখে তারা নাটক না করেই বিদায় নেয়।

এখানে প্রশ্ন হলো- শিশুদের নাটক, শিশুদের উপযোগী এবং মান অনুযায়ী কাহিনী ও সংলাপ থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা পাশ কাটিয়ে পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি ও ইসলামের রীতি-নীতি ও পদ্ধতি নিয়ে এরূপ হাস্য-কৌতুকের সংলাপ জুড়ে দেয়ার হেতু কি। হেতু পরিষ্কার। শিশুর কচি মনে ইসলাম বিদ্বেষী ভাবধারা অত্যন্ত সুকৌশলে এবং সংলাপের মাধ্যমে মন ও মগজে ঢুকিয়ে দেয়া। প্রকারান্তরে বিদেশী প্রভুদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন।

এরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যেমন অন্যের বেলায় চার বিবি আর নিজের বেলায় এগার বিবি কেনো? এই ছিলো প্রশ্ন। প্রশ্নটির উত্তর দেয়া প্রয়োজন।

বিবাহ উপভোগ্য হয় যদি পাত্র-পাত্রী উভয়ই হয় ভরা যৌবনের। এর ছন্দপতন ঘটলে আর তা উপভোগ্য হয় না, হয় দায়িত্ব পালন। নবীজী (সঃ) যখন পঁচিশ বছরের যুবক তখন তিনি বিয়ে করলেন ৪০ বছরের পৌঢ়া হযরত খোদায়জাকে। পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ এই সুদীর্ঘ সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ একমাত্র ধর্মপত্নী হযরত খোদায়জার সাথে অতিবাহিত করেন। এরপর দুই বছর তিনি একমাত্র বিবি সওদার সাথে কাটান। এই সময়ে তিনি হযরত আবু বকরের অনুরোধে জননী আয়শার পাণিগ্রহণ করেন। আয়েশা তখন ছয় বছরের বালিকা। উল্লেখ্য, নবীজীর (সঃ) এগার বিবির মধ্যে একমাত্র আয়েশা ছিলেন কুমারী আর সবাই ছিলেন বিধবা। অনন্তর বায়ান্ন বছর বয়সের পরে যখন তিনি বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত- নানা আপদ-বিপদ, অভাব-অনটন ও যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের রক্ষণাবেক্ষণের গুরুভার যখন একমাত্র তাঁরই উপর ন্যস্ত, তখনই তিনি অল্প সময়ের মধ্যে হাফসা, উম্মে হাবিবা, উম্মে সালমা, সফিয়া, ময়মুনা, জয়নব বেন্তে জাহান, জয়নব বেন্তে খোযায়মা ও যুরয়ায়রিয়া নামক আটটি মহিলার পানিগ্রহণ করেন। সুতরাং নবীজী (সঃ) কোনো অবস্থায় এবং কি উদ্দেশ্যে কাকে বিয়ে করেছিলেন তা জানা দরকার।

ঐতিহাসিক ও তফসীরকারকগণ দাবি করেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই বিবাহগুলো সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ও অপরিহার্য রাজনৈতিক ভিত্তির উপর সুসম্পন্ন হয়েছিল। এর সাথে ভোগ বিলাস বা ইন্দ্রিয় পরায়ণতার কোনো সংশ্রব ছিলো না।

আধ্যাত্মিক কারণ ঃ হযরত রাসুলুল্লাহই জগতের শেষ নবী এবং তারই দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার স্বীয় মনোনীত পবিত্র ইসলাম ধর্মের পূর্ণতা সাধন করেছেন। সুতরাং

www.pathagar.com

জগতের পুরুষ জাতির মতো তিনি সমগ্র নারী জাতিরও শিক্ষাদাতা ধর্মগুরু ছিলেন। পুরুষ জাতির মধ্যে বহু শ্রেণীর বহু লোক যেভাবে তাঁর পবিত্র সংসর্গ ও শিষ্যত্ব লাভের সুযোগ সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হয়েছেন, নারী জাতির মাধ্যমে হযরত রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) সুপবিত্রা সহধর্মিনীগণ ব্যতিত অন্য কারো সেরূপ কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। কারণ ইসলামের পরস্ত্রীর সংসর্গ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে নর জাতির মতো বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বয়সের নারী জাতির শারীরিক, মানসিক, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হয়ে তদানুযায়ী বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হযরত রাসুলুল্লাহ্র পক্ষে তখন একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। অথচ পরস্ত্রীর সাথে ঐ সকল বিষয় আলোচনা করা অথবা তাদেরকে ঐ সকল বিষয় শিক্ষাদান করা কখনই সম্ভবপর বা নীতিসঙ্গত হতো না। সামাজিক সভ্যতা নিষ্ঠতা এবং সুরুচির দিক দিয়েও তা বিশেষ আপত্তিকর। সুতরাং এই মহান উদ্দেশ্যই যে হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েও বিভিন্ন অবস্থা, বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন প্রকৃতি একাধিক মহিলার পাণিগ্রহণ করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন তথা শুধু ঐ শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যে তিনি এই সকল বিয়ে করেছিলেন, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই।

রাজনৈতিক কারণ ঃ হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বিবাহের রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণগুলো আরও সুস্পষ্ট এবং তা তাঁর অসাধারণ দূরদর্শিতা, অপরিসীম উদারতা ও মহানুভবতার পরিচায়ক। হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) মদিনা আগমণের পর কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রায় যুদ্ধ হতো। মুসলমানেরা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে শহীদ হতেন। ঐ সকল মহান প্রাণ শহীদদের অসহায় ও ধর্মপ্রাণা পত্নীদিগকে আশ্রয় দান করা তখন হযরত রাসুলুল্লাহ্ এবং বিশ্বাসী মুসলমানদিগের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়েছিল।

বদরের যুদ্ধে হোজায়ফার পুত্র খোনায়েম শহীদ হলে হযরত ওমরের কন্যা বিবি হাফসা বিধবা হন। হযরত ওমর হাফসাকে পুনর্বিবাহ করার জন্য যথাক্রমে হযরত ওসমান ও হযরত আবু বকরকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ওমর দুহিতা হাফসা অত্যন্ত তেজস্বিনী ও মুখরা ছিলেন বলে তারা কেউই তাকে বিয়ে করতে রাজী হননি। ধর্ম ভাইদের এই সহানুভূতিহীনতায় অনন্ত অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে হযরত ওমর হযরত রাসুলুল্লাহর নিকট এ সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থাপন করেন। হযরত রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে নিজেই বিবি হাফসাকে বিয়ে করে হযরত ওমরকে শান্ত, সুষ্ঠু ও গৌরবান্বিত করেছিলেন। হিজরী তৃতীয় বর্ষে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। অনন্তর ওহুদ যুদ্ধে মহাবীর আবদুল্লাহ শাহাদাতপ্রাপ্ত হলে হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁর বিধবা পত্নী জয়নবকে বিয়ে করে আশ্রয় প্রদান করেন। হিজরী চতুর্থ বর্ষে নববিশ্বাসী আবু সালমা মৃত্যুমুখে পতিত হলে হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) আন্তরিক সহানুভূতি বসে তার বিধবা পত্নী উম্মে সালমাকে স্বীয় পত্নীত্বে পরিগ্রহণ করেন। অনন্তর পঞ্চম হিজরীতে জাহান তনয়া জয়নব পূর্ব স্বামী জায়েদ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে হযরত রাসুলুল্লাহ'র পত্নীত্বে পরিগৃহীত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী ওবায়দুল্লাহর 'মুরতাদ' হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলে তার বিধবা পত্নী এবং হযরত

www.pathagar.com

রাসুলুল্লাহর (সঃ) অন্যতমা প্রাথমিক প্রিয়শিষ্যা উম্মে হাবিবা হযরতের সেবায় স্বীয় জীবন অতিবাহিত করার ইচ্ছা জ্ঞাপন করলে হযরত তাঁকে যথারীতি বিয়ে করে তার আন্তরিক সদিচ্ছা পূর্ণ করেন। হিজরী ৭ম বর্ষে এই বিবাহ হয়।

অতঃপর হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর পরাক্রান্ত শত্রুদিগকে বশীভূত করে দেশের শান্তি স্থাপন করার আশায় শত্রুপক্ষ থেকে সফিয়া, জুয়ায়রিয়া ও ময়মুনা নামে তিন মহিলার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। এই বিবাহের ফলে বনি মোস্তালিব ও অন্যান্য বংশের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তথা মহাবীর খালেদ প্রমুখ হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আত্মীয়ে পরিণত হওয়ায় ইসলামের প্রচারও ত্বরান্বিত হয়েছিল।

হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক কারণ এবং নববিশ্বাসী মুসলমানগণের সামাজিক ও পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষণের জন্য একান্ত বাধ্য হয়ে এ সকল বিয়ে করেছিলেন, তখন জগতে একাধিক বা বহু বিবাহ আদৌ নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় ছিল না। হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তখন বহু মহানুভব ও উদারপ্রাণ মুসলমান শহীদ ধর্ম ভাইদের বিধবা পত্নীগণকে বিয়ে করে তাদেরকে আশ্রয় দান করেছিলেন। অন্যথায় নববিশ্বাসী মুসলমান সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং তাদের সামাজিক ও পারিবারিক পবিত্রতা সংরক্ষণ করা তখন সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) এই সকল কল্যাণকর বিধি ব্যবস্থার ফলেই মুসলিম জগতে 'ওয়্যার ব্যাবিজ' বা যুদ্ধকালীন জারজ সন্তানের অস্তিত্ব কেউ কোনোদিন আবিষ্কার বা কল্পনা করতে সমর্থ হয়নি। তথাকথিত সভ্য সমাজে এই জারজ সন্তানেরাই সমাজের দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। মুসলিম সমাজ জারজ সন্তানের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে পবিত্র রয়েছে এই বিধি ব্যবস্থার ফলে।

হযরত রাসুলুল্লাহর (সঃ) বিবাহ সম্পর্কে আল-কোরআনের নির্দেশ হলো ঃ

"হে নবী নিশ্চয়ই আমি আপনার জন্য আপনার ঐ সকল পত্নীকে বৈধ করেছি- আপনার নিকট আনয়ন করেছেন, তন্মধ্যে আপনার দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী হয়েছে এবং আপনার পিতৃব্য কন্যাগণ ও আপনার ফুফুর কন্যাগণ তথা আপনার মাতুল কন্যাগণ ও আপনার খালার কন্যাগণ যারা আপনার সাথে দেশ ত্যাগ করেছে এবং বিশ্বাসীনী স্ত্রীলোক যে নবীর উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করেছে- যদি নবী তাকে বিশুদ্ধভাবে বিবাহ করতে ইচ্ছা করে, ইহা বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে শুধু আপনারই জন্যে, নিশ্চয়ই আমি তাদের ওপর তাদের পত্নীগণের ও তাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের অধিকারী তাদের সম্বন্ধে যা নির্ধারণ করেছি তা অবগত আছি- যাতে আপনার কোনো সংকোচ না থাকে তথা আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময়। (আয়াত-৫০, সূরা আহ্যাব, আল-কোরআন)

খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় যে অবদান রেখেছেন তা সর্বজনবিদিত। বদর যুদ্ধের পর তাঁর বিধবা কন্যা হাফসাকে বিয়ে করতে হযরত ওসমান ও হযরত আবু বকর কেউই রাজি হলেন না। মুখরা রমণী সম্পর্কে তাঁরা আতঙ্কিত ছিলেন। সেই সময় অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হযরত রাসুলুল্লাহ্ যদি বিবি হাফসাকে বিয়ে করে হযরত ওমরকে শান্ত, সন্তুষ্ট ও গৌরবান্বিত না করতেন তাহলে পরবর্তীতে হযরত ওমরের (রাঃ) দ্বারা ইসলামের ইতিহাসও আর গৌরবান্বিত হতো কি-

www.pathagar.com

না সন্দেহ।

হযরত রাসূলুল্লাহ'র প্রতিটি বিবাহ ইসলামের স্বার্থে হয়েছিল। হযরত আবু বকরের অনুরোধে মাত্র ছয় বছরের বালিকা জননী আয়েশাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আরবের সর্বাপেক্ষা বিদ্বেষী মহিলা ছিলেন এবং দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। অধিকাংশ হাদীস জননী আয়েশার নিকট থেকে পাওয়া। এক কথায় নবীজীর (সঃ) প্রতিটি বিবাহ ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ব্যক্তিস্বার্থে তিনি কোন বিয়ে করেননি, এসব বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা।

ইসলাম ধর্মের বহু বিবাহের প্রকাশে অমুসলিম চিন্তাবিদ সমর্থন করে ইতিবাচক বক্তব্য রেখেছেন। এখানে কয়েকজন মনীষীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি ঃ

'জনসন' মহানবী (সঃ) এর বিধিবদ্ধ বহু বিবাহের সমালোচনাকারীদের জবাবে বলেন ঃ "প্রাচ্যের পুরুষদের বহু বিবাহের দাবী অপ্রতিরোধ্য ছিল। প্রকৃত পক্ষেই তা ছিল সামাজিক অবস্থার ফলমাত্র। এ বিষয়ে মহানবী (সঃ) শর্ত সাপেক্ষ অনুমতি এর প্রসারে কোনরূপ সহায়তা করেননি।

ডঃ গষ্টার্ড উইল জার্মানী মহানবীর অবলা নারী জাতির উন্নয়নের প্রশংসা করে বলেনঃ তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি ক্রীতদাস-দাসীদের কঠোর জীবনকে করেছিলেন নমনীয় এবং দরিদ্র বিধবা ও ইয়াতিমদের দেখিয়েছিলেন পিতৃসুলভ যত্ন।"

"Times" পত্রিকার সম্পাদক ১৮৮৭ সালের অক্টোবর সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করেন ঃ মুহাম্মদ (সঃ) বহু বিবাহের অবাধ প্রসার রোধ করেন। বহু বিবাহের প্রথার ফলেই শিশু হত্যা বন্ধ হয়েছিল। নারী জাতিকে আইনগত সমর্থন দিয়ে তাদেরকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এর ফলে মুসলিম দেশগুলো পেশাদার বারবনিতা থেকে মুক্ত মুসলমানদের নিয়ন্ত্রিত বহু বিবাহ খ্রীস্টান জাতির বহু বিবাহের চেয়ে অনেক উত্তম।

W. Litner তাঁর লেখা "Muhammadanism" নামক গ্রন্থে মহানবীর (সঃ) অবাধ বহু বিবাহ বন্ধনের উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, "বহু বিবাহ প্রতিরোধে মুহাম্মদ (সঃ) উদ্যোগী হলেন। তিনি সমান আচরণ সাপেক্ষে এক সাথে দু'তিন বা চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি প্রদান করেন। অন্যথায় কেবল একজন স্ত্রী রাখতে পারবে। বস্তুতঃ কোনো পুরুষই এক সাথে দু'জন স্ত্রীকে সমান আচরণ বা সমান ভালবাসা দেখাতে পারে না। সেহেতু মুহাম্মদী আইন এক বিবাহের পক্ষে।

তিনি বহু বিবাহের পক্ষে মত ব্যক্ত করে আরো বলেন ঃ "যেহেতু মুসলমানদের কোনো মদ্যশালা, জুয়ার আড্ডা বা পতিতালয় নেই তাই বহু বিবাহ (শর্ত সাপেক্ষ) অযৌক্তিক নহে।

প্রখ্যাত মনীষী 'ম্যাক্স মুলার' মহানবীর বহু বিবাহ প্রথার সমালোচনার জবাবে বলেনঃ "মুসলমানদের বহু বিবাহ প্রথাকে অনেকে পাপাচারের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করে এবং তাদের সে বিবেচনা অসত্য নয়। সেই মহান নেতার সমাজ ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদেরকে সেদেশ, মরুবাসীদের জীবন পদ্ধতি ও তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির কথা ভেবে দেখতে হবে।

www.pathagar.com

প্রখ্যাত মনীষী A. G. Lionard তাঁর "Islam-her Moral and Spritual Value" নামক গ্রন্থে মহানবীর (সঃ) নিয়ন্ত্রিত বহু বিবাহের ফলে নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে– এমন সমালোচনাকারীদের জবাবে বলেন, "মুসলিম সমাজকে ইউরোপীয় সমাজের সাথে অনায়াসেই তুলনা করা যেতে পারে। বহু বিবাহের অনুসারীরা সম-সাময়িক ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মানীদের ন্যায় চরিত্রবান হয়তো বা বেশি।

মনীষী "Furlong" বলেন ঃ মুহাম্মদ (সঃ) বিভিন্ন উপজাতীয়দের মধ্যে যথেচ্ছ বহু বিবাহের প্রসার যথাসাধ্য প্রতিরোধ করে একজন দেশপ্রেমিক ও রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি জীবন্ত হত্যা বন্ধ করেছেন, নারীকে কেবল পণ্য হিসাবে গণ্য করা থেকে মানুষকে বিরত করেছেন, দাস প্রথার সেই যুগে নারীর অবস্থা পশুর চেয়ে ভাল ছিল না, বহু বিবাহ প্রথা তাদেরকে বিশেষ মর্যাদার আসন দিয়েছিল।

পর্দা প্রথা

১৩৩৯ সালের 'মাসিক মোহাম্মদী'র শ্রাবণ সংখ্যায় (পৃঃ ৬৬৬) শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'সমাজ সমস্যা ও নারী' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ "ইসলাম ধর্মের প্রভাবে আমাদের সামাজিক জীবনেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নারীর ভিতরে অবরোধ-প্রথা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

এই মতটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক। ইসলাম ধর্মের ফলে ভারতে অবরোধ প্রথার প্রচলন হইয়াছে, ইহা কি সত্য? না, হিন্দু ধর্মের প্রভাবে ভারতে অবরোধ প্রতিষ্ঠিত হইল? প্রথমোক্ত মতালম্বী পাঠকের জন্য আমার উত্তর এই যে ঃ যদি সে কথাই সত্য হয়, তবে ভারতের বাহিরেও যে সব দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচলিত আছে, সেখানে

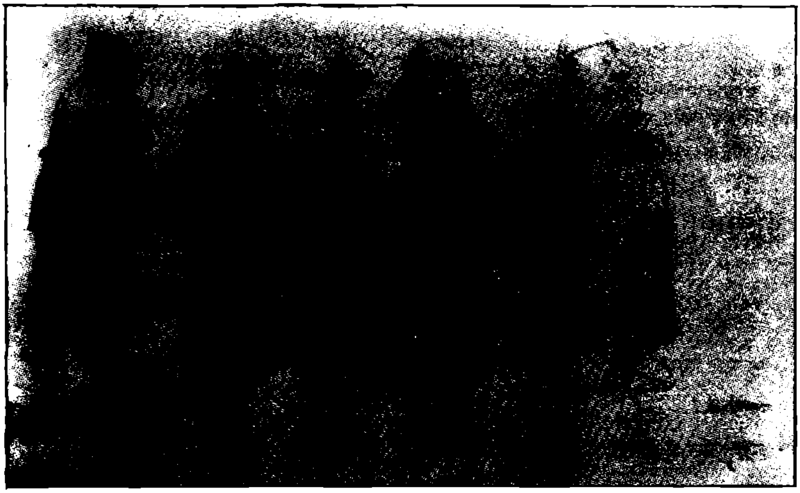

এসকাপ-এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘের তথ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত কার্টুন প্রদর্শনীতে এই ব্যঙ্গ চিত্রটিও স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনী স্থলে প্রবেশ পথের পাশেই স্থাপিত এই কার্টুন দেখে দর্শকদের প্রশ্ন ছিলো– ইসলামী মূল্যবোধকে হেয় করা ছাড়া এর পেছনে আর কোনো উদ্দেশ্য আছে কি?

www.pathagar.com

অবরোধ ও পর্দা প্রথার এত কঠোরতা নাই কেন? ইসলাম এ বিষয়ে বিশেষ কোন কঠোরতা অবলম্বন করে নাই। এদিকে আবার দেখিতে পাওয় যায়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনেক স্থানে পর্দা ও অবরোধের কথা আছে। যেমন বর্তমান ভারতে সমাজ ও পরিবার বিশেষে অবরোধ ও পর্দার শৈথিল্য ও কঠোরতা উভয়ই পরিলক্ষিত হয়, প্রাচীন ভারতেও তদ্রূপ ছিল। 'অন্তঃপুরঃ ও 'অসূর্যস্পশ্যা' শব্দ দুইটি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য হইতেই গৃহীত হইয়াছে। কুলকামিনীগণের বাসস্থানের জন্যে যে বাসগৃহ, তাহাই অন্তঃপুর, আর সেই অন্তঃপুরবাসিনী সে কুলকামিনী জন্মেও সূর্যকিরণ দেখে নাই, তাহাকেই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যিকগণ বলিয়াছেন ঃ অসূর্যস্পশ্যা রমণী। রামায়ণে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ

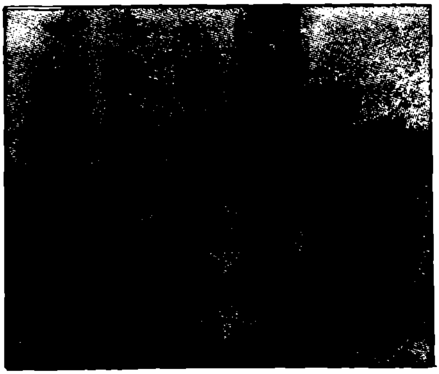

• গবেষণারত একজন ইরানী মহিলা

"এত যদি রঘুনাথ হ'লেন নিষ্ঠুর।
কাঁদিতে কাঁদিতে তা'রা গেলো অন্তঃপুর।

চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রেও ইহার অনেক উল্লেখ আছে। মনুসংহিতায় এই অবরোধ-প্রথার বিশেষ কঠোরতা দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাস কৃত মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থেও এই অন্তঃপুর ও অসূর্যস্পশ্য রমণীগণের অনেক উল্লেখ আছে। ইসলামের প্রভাবে ভারতে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত হয় নাই– ইসলামের আগমনের বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই ইহা এদেশে প্রচলিত ছিল। বর্তমান কালের ন্যায়

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মহিলা সাংবাদিক সাক্ষাৎকার নিচ্ছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

www.pathagar.com

সে যুগেও অনেক পরিবার এ প্রথা মানিত না। (মুজীবর রহমান ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নারীর স্থান (প্রাচীন ভারতে অবরোধ ও পর্দা প্রথা); ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪০ (১৯৩৩)

বৃটিশ আমলেও হিন্দু সমাজে কঠোরভাবে পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারে এ প্রথা আরো ছিলো কঠোর। এ সম্পর্কে এই বইয়ের পরিশিষ্ট-১ এ বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

যৌবনে কোনো নারীই অসুন্দরী নয়। আর প্রাচ্য-প্রতীচ্যে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে- "নিজ স্ত্রী ব্যতীত সব নারীই পুরুষের চোখে সুন্দরী।" তাই অবৈধ যৌনাচার রোধে নারীর অধিকার, দাম্পত্য জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে আল্লাহপাক বিধান দিয়েছেন কঠোর পর্দা প্রথার। অথচ ইসলামের শত্রুরা পর্দাকে নারী মুক্তির অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করে ইসলামের বিধি-বিধান ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

'৯৮ সালে ঢাকায় জাতিসংঘের একটি কার্টুন প্রদর্শনী হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, ঈমান-আকীদাকে কটাক্ষ এবং ইসলামী বিধি-বিধানকে অবমাননা করে।

মাথায় গোল টুপি, পরনে লম্বা কোর্তা, মুখভর্তি দীর্ঘ চাপদাড়ি- এমন এক ব্যক্তি আপাদমস্তক বোরকাবৃতা চারজন মহিলাকে একসারিতে বেঁধে তাদেরকে গরুর মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মহিলাদেরকে দড়ি বা রশি দিয়ে নয়, বিরাট এক তসবীহ দিয়ে বেঁধে

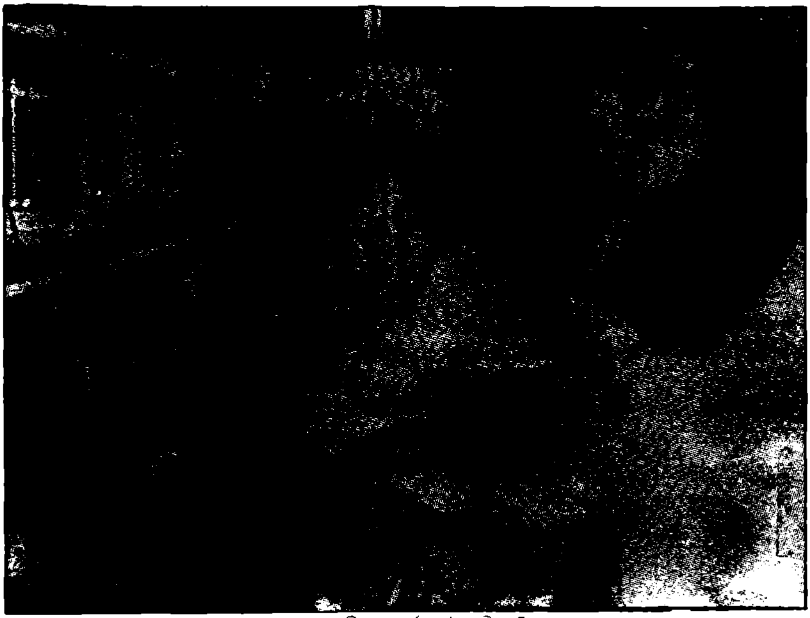

ল্যাবরেটরীতে কর্মরত ইরানী মহিলা

www.pathagar.com

রাখা হয়েছে। আর লোকটির বক্তব্য হলো– 'এটা আমার অধিকার'।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশে জাতিসংঘ কার্যক্রমের সমন্বয়কারী ডেভিড ই লকউড অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। পরিচালনা করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের জাতীয় তথ্য কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে এরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং পোস্টারিং করায় অনেক সচেতন ধর্মপ্রাণ মানুষ ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হয়েছে।

ইসলামে পর্দা প্রথার প্রচলন হয়েছে সর্বপ্রকার অশ্লীলতাকে পরিহার করার জন্যেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন, "হে নবী আপনার স্ত্রীগণ ও আপনার কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মুমিন নারীদিগকেও (৩৭ঃ৬৪) বলে দিন যে, বাইরে চলাফেরার সময় তারা যেন নিজ নিজ চাদর দ্বারা তাদের শরীর (৩৭ঃ৬৫) আবৃত রাখে, এতে তারা সর্বাধিক সুবিধা ভোগ করবে, আর সে ক্ষেত্রে তাদের পরিচিতিও (৩৭ঃ৬৬) প্রকাশ পাবে এবং উৎপীড়নের শিকার হবে না। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল (৩৭ঃ৬৭)। পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থেই আল্লাহ্তায়ালা মানব জাতিকে পর্দার বিধান দিয়েছেন। পর্দা মানে জেলখানা বা ঘরে ঘুপটি মেরে বসে থাকা নয়। সমাজের ভারসাম্য রক্ষার্থে পর্দার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। পর্দা প্রথায় মহিলাদের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করার কোনো অবকাশ ছিল না বরং সে সময় মদিনার বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মহিলাদেরকে উৎপীড়ন হতে রক্ষা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। পর্দা কোনো অবরোধ প্রথার নাম নয়। মেয়ে-পুরুষের নৈতিক চরিত্রের হেফাজত ও সামাজিক শৃঙ্খলা এবং পবিত্রতা রক্ষার জন্যই এটি একটি সুন্দর পদ্ধতি।

মেয়েদের বোরখা পরাটা আগে মুসলিম সমাজে প্রচলিত ছিল না। ঐতিহাসিকদের মতে, বোরখা পরার রেওয়াজ ছিল সিরিয়ার নেস্টারিয়াক খৃস্টানদের মধ্যে। তা থেকে

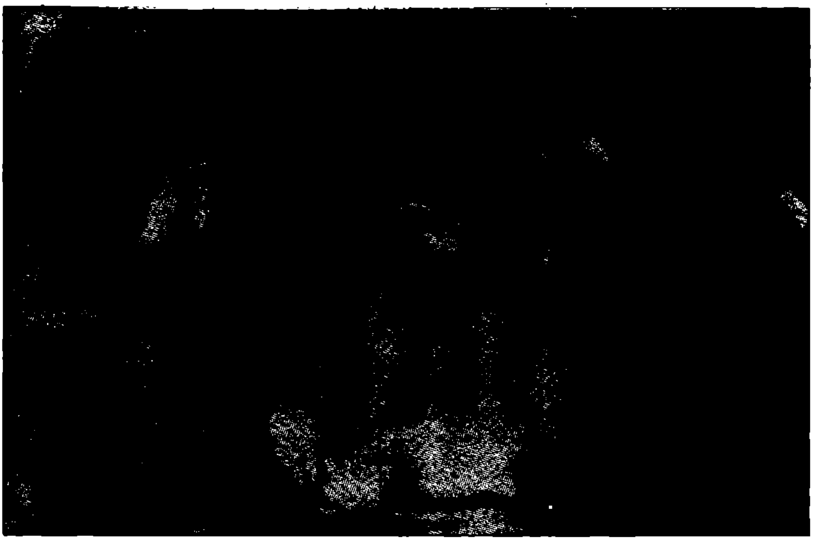

অপারেশন থিয়েটারে ইরানের মহিলা ডাক্তাররা

www.pathagar.com

আব্বাসী খলিফাদের সময় এই প্রথার বিস্তার ঘটে মুসলিম সমাজে। ক্যাথলিক মেয়েদের এখনও গীর্জায় ঢুকবার সময় চোখের উপর পর্যন্ত ঢেকে নিতে হয় জাল দিয়ে। হাদীস অনুসারে, মুসলমান মেয়েরা জিহাদে যোগ দিতে পারে। আহতদের সেবা করতে পারে। এসব কাজে কোনো বাধা নেই। কিন্তু বোরখা পোশাকটা এমন যে, মনে হয় না তা পরে জিহাদে যাওয়া চলে। মুসলমান মেয়েদের শরীর ঢেকে চলতে বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে ঘোমটা দিতে। কিন্তু বোরখা না পরেও চাদর দিয়ে সেটা করা যায়। মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে খামারে খেটে খাওয়া মেয়েদের জন্যে কখনই পর্দা প্রথার কড়াকড়ি ছিল না। মেয়েরা যাতে সহজে অপমানিত না হয়, তার জন্যেই শরীর ঢেকে ভদ্রভাবে চলতে বলা হয়েছে।

আজকাল জীবিকার প্রচন্ড তাগিদে মেয়েদেরকেও যখন বাইরে বেরুতে এবং রোজগার করতে হচ্ছে, মোট কথা শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজসেবা, সংসার পরিচালনা, দেশসেবা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই যখন পুরুষের পাশাপাশি তাদেরকেও এগিয়ে আসতে হচ্ছে, তখন পর্দা একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর যুগে বহু মুসলিম মহিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। এমনকি যোদ্ধাদের সেবা শুশ্রূষাও করেছেন। উম্মে আম্মারা (রাঃ) ছিলেন একজন মহিলা সাহাবী। ওহুদে যে কতিপয় মুসলিম সৈন্য মহানবীর চারপাশে বেষ্টনী তৈরী করে তাঁকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার চেষ্টায় প্রাণপণ যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন উম্মে আম্মারা। বর্শা ও তরবারির বারটি আঘাতে জর্জরিত দেহ নিয়ে শত্রুতে বাধা দিতে থাকেন।

ইসলাম পর্দা প্রথার নামে মেয়েদেরকে গৃহবন্দী করতে চায়নি বরং শালীনতা বজায় রাখার মাধ্যমে তার অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। নারী-পুরুষ সকলের শিক্ষার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামী প্রজাতন্ত্রে ইরানের মেয়েরা ইসলামী পরিবেশে জীবনযাপন করে ও সেবাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে

www.pathagar.com

রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইকরিমা ইবনে আবু জাহেলের স্ত্রী উম্মু হাকিমও শরিক হয়েছিলেন এবং তাঁবুর একটি মোটা খুঁটি দিয়ে রোমানদের ৭ জনকে হত্যা করেছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় মেয়েদের শিবির আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হলে মহানবীর ফুফু সাফিয়া এক ইহুদী গুপ্তচরকে হত্যা করে তার মাথা কেটে দুর্গের পাদদেশে নিক্ষেপ করলে ইহুদী সাথীরা ভয় পেয়ে সরে যায়। তাদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ, তারা মনে করে যে, দুর্গে পুরুষ যোদ্ধারা রয়েছে।

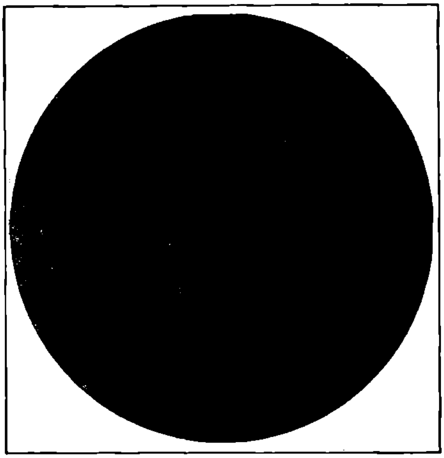

ইসলামী আদর্শের প্রতিরক্ষায় মিছিলে অংশগ্রহণ করছেন একদল বিপ্লবী নারী

উম্মে আতিয়া বলেন, আমি মহানবীর (সাঃ) সাথে ৭টি যুদ্ধে যোগদান করেছি। সেখানে আমি মুজাহিদদের জিনিসপত্র ও সার-সরঞ্জামের তত্ত্বাবধান করতাম, তাদের খাবার তৈরী করতাম, আহতদের ওষুধ ও পথ্য দিতাম এবং অসুস্থদের সেবা ও শুশ্রূষা করতাম।

ওহুদের যুদ্ধে আহতদের মলম লাগানো, ব্যান্ডেজ করা ও অন্যান্য কাজের জন্য কতিপয় মহিলা সাহাবী যুদ্ধের পর মদিনা থেকে সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন নবী দুলালী বিবি ফাতিমা। তিনি মহানবীর ক্ষতস্থান চাটাই পুড়িয়ে তার ছাই দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলেন। হযরত আয়িশা (রাঃ) ও উম্মে সুলাইম মশক ভর্তি পানি এনে মুজাহিদদের পান করাচ্ছিলেন। অন্য যারা সেবা কাজের জন্য গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উম্মে সামিত, হামনা বিনতে হাজাস।

কিছুসংখ্যক মহিলা খাইবারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সেবা কার্য পরিচালনা করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হাসরাজ ইবনে জিয়াদের দাদী, আবু রাফের স্ত্রী সালমা, আশহাল গোত্রের উম্মে আমের এবং আনসারী মহিলা উম্মে খালা ও কুআইবা বিনতে সা'দে। হযরত হোসাইনের কন্য জয়নব কারবালার হত্যাকান্ডের পর উমাইয়াদের কবল থেকে তাঁর তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর অপ্রতিরোধ্য মনোভাব নরপিশাচ আবদুল্লাহ বিন জিয়াদ ও নির্দয় ইয়াজিদকে সমভাবে হতবাক করেছিল।

সবচেয়ে বড় কথা, এই মহিলারা কোনো বাহ্যিক চাপে পড়ে যুদ্ধে যোগদান করেননি এবং এসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ তাঁরা কোনোরূপ বৈষয়িক প্রলোভনে পরেও করেননি। বরং তাঁরা দ্বীন ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানকে নিজেদের জন্য বিশেষ সম্মানজনক ও পরকালে মহা কল্যাণ লাভের উপায় মনে করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এইসব কাজে অংশগ্রহণ করেছেন।

ইসলাম নারীকে প্রয়োজনে বাইরের কাজে আত্মনিয়োগ করতে অনুমতি দিয়েছে। জবের ইবনে আবদুল্লাহর কন্যাকে তাঁর স্বামী তালাক দেয়। তালাকের পর ইদ্দতকালে

www.pathagar.com

কয়েক কাঁদি খেজুর কেটে বিক্রি করার ইচ্ছা করলে এক ব্যক্তি তাকে নিষেধ করে এই বলে যে, ইদ্দতের সময় বাইরে যাওয়া জায়েজ নয়। বিষয়টি মহানবীর কাছে উত্থাপন করা হলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেন বাগানে গিয়ে খেজুরের কাঁদি কাটতে এবং বিক্রি করতে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলারা প্রয়োজনে বাজারে এবং খেত খামারে যাতায়াত করতো। হযরত আয়িশা পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

একদিন মহানবীর (সাঃ) স্ত্রী হযরত সওদাকে বাইরে যেতে দেখে হযরত উমর (রাঃ) তীব্র সমালোচনা করলে তিনি ঘরে ফিরে আসেন এবং মহানবীকে এই বিষয়টি জানান। উত্তরে মহানবী (সাঃ) বললেন, "প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন।" সহল ইবন সা'দ এক মহিলার কথা বলেছেন। সে মহিলার একখন্ড কৃষি ক্ষেত ছিলো এবং তিনি কৃষি ক্ষেত্রের সেচ খালের পাড় দিয়ে গাজরের চাষ করতেন।

হযরত আবুবকরের কন্যা আসমার বিয়ে হয় হযরত যুবাইয়ের সাথে। প্রথম দিকে তাঁদের আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল ছিলো। তাঁদের মাত্র একটি ঘোড়া ও একটি উট ছিলো। আসমা নিজেই ঘোড়াকে ঘাস ও পানি দিতেন। দূরে তাঁদের একখন্ড জমি ছিলো। তিনি সে জমি থেকে খেজুরের আঁটি সংগ্রহ করে আনতেন। একদিন খেজুরের আঁটি ঝুড়িতে ভর্তি করে মাথায় করে আনবার সময় মহানবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়।

হযরত উমরের (রাঃ) খেলাফত আমলের একটি ঘটনা। আসমা বিনত মুহাররমা

ইসলামী বিপ্লবে উজ্জীবিত হয়ে ইসলামের সুরক্ষায় রাজপথে মিছিল করছেন একদল মহিলা।

www.pathagar.com

(রাঃ) নাম্নী এক মহিলা সাহাবী আতরের ব্যবসা করতেন।

উমারা বিনতে তবীযা (রাঃ) একজন দাসী সাথে নিয়ে বাজারে গিয়ে বড় আকারের একটি মাছ ক্রয় করে বাড়ী ফিরে আসছিলেন। পথিমধ্যে হযরত আলী (রাঃ) তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কত দিয়ে কিনলে? মাছটা তো বেশ বড়। ঘরের সকলে পেট ভরে খেতে পারবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর বেগম নিজে ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রি করে ঘর-সংসারের খরচাদি চালাতেন। একদিন তিনি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমি একজন কারিগর মেয়েলোক। আমি তৈরী করা দ্রব্য বিক্রি করি। এছাড়া আমার স্বামী এবং আমার সন্তানদের জীবিকার অন্য কোনো উপায় নেই।' রাসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ 'এভাবে উপার্জন করে তুমি তোমার ঘর-সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছো। এতে তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।' এমনকি মহানবী (সাঃ) একজন মহিলা সাহাবাকে মদিনায় বাজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন।

মহানবী (সাঃ) উবাদা ইবনে সামেতের স্ত্রী উম্মে হারামকে জিহাদের জন্য সমুদ্র যাত্রার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই অনুমতি প্রদান থেকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা যায়। ইসলাম চায় না যে, সামাজিক ক্রিয়াকান্ড থেকে নারী সম্পূর্ণ দূরে থাকুক। তবে সামাজিক ক্রিয়াকান্ডে সফলতা লাভের জন্য যেসব গুণাবলীর প্রয়োজন যেমন দৈহিক যোগ্যতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা ইত্যাদি নারীর মধ্যে কম থাকায় উম্মে হারামকে প্রদত্ত অনুমতি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়নি। এছাড়াও সামাজিক ক্রিয়াকান্ডে শরীর হওয়ার মধ্যে নারীর জন্য আরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা উপেক্ষা করা সমীচীন নয়। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, কোরআন হাদীসে পর্দা সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্ক করা হলেও অবরোধ প্রথার কোথাও কোনো উল্লেখ নেই। বরং তার বিপরীত কথাই বলেছেন হযরত মোহাম্মদ (সঃ)। তিনি বলেছেন, "তোমার যদি বোরখা না থাকে তবে অপরের কাছ থেকে চেয়ে নেবে। তথাপি বিশ্বাসীগণের মিলনক্ষেত্রে উপস্থিত হতে কুণ্ঠিত হবে না।" পর্দার সাথে অবরোধ ভাঙ্গার এই সুন্দর ডাক কি আমরা আজ শুনতে পাই? আজকে আধুনিক বিশ্বে অনেক ইসলামী রাষ্ট্র রয়েছে। যেমন পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, লিবিয়া, সৌদি আরব প্রভৃতি। এসব দেশের মহিলারা পর্দা করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, অধ্যাপক হচ্ছে। পুরুষের পাশাপাশি চাকরি করছে। টিভিতে অংশগ্রহণ করছে। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দা কোনোমতেই অবরোধের শামিল হতে পারে না।

আল্লাহপাক নারীর মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, জীবন ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে পর্দা প্রথা নাযিল করেছেন। পর্দা প্রথা নারী-পুরুষের নৈতিক চরিত্রের হেফাজত করে। নর-নারীর অবাধ মেলামেশার ফলে সমাজে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি উদ্ভব হয় তা প্রতিহত করে। পারিবারিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সংরক্ষিত করে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যবস্থার মূল বুনিয়াদকে শক্তিশালী করে।

আমাদের দেশে এই পর্দা প্রথাকে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষবাদী এবং কতিপয় মোল্লা-

www.pathagar.com

মৌলভীরা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। যেমন নাস্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষবাদী পাশ্চাত্য ভাবধারায় আচ্ছন্ন বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের ধারণা এই যে, পর্দা প্রথা নারী প্রগতির মারাত্মক অন্তরায়। তারা প্রচার করে থাকে ইসলাম নারীকে ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রাখতে চায়। সুতরাং নারীর অধিকার ও মুক্তির জন্য পর্দা প্রথা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে হবে।

আমাদের দেশে কতিপয় অল্প শিক্ষিত (সবাই নয়) আলেম রয়েছেন, যারা উল্টা-পাল্টা ফতোয়া দিয়ে থাকেন যে, "মেয়েদের ঘরের বাইরে যাওয়া চলবে না, বাইরে লেখাপড়া করতে যেতে পারবে না।"

তাদের মতে–

"নামাজ পড়, রোজা কর
বেপরদায়ী কর মানা,
দু'রোজকে লিয়ে হ্যায় দুনিয়া
আখের ফানা, আখের ফানা।"

কয়েক বছর আগে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় দেখলাম ঢাকার বেইলি রোড অফিসার্স কোয়ার্টার মসজিদে একবার এক আলেম জুম্মার দিন খুতবা-পূর্ব আলোচনায় বলেছেন, মেয়েরা ঘরের বাইরে যাবে না, যদি একান্তই যেতে হয় তবে ময়লা কাপড় পড়ে বেরুবে। তিনি আরো বলেছেন, মেয়েরা এমন বোরখা পড়বে যে, শুধু এক চোখে দেখার জন্য একটা ছিদ্র রাখবে। এখানে এ ঘটনাটি আমি শুধু দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করেছি। এ ধরনের উল্টা পাল্টা বক্তব্য অনেক অনভিজ্ঞ আলেম দিয়ে থাকেন।

এসব তথাকথিত অশিক্ষিত আলেমধারীর কারণেই আজকে ইসলাম বিদ্বেষীরা ইসলামী রীতি-নীতিকে নিয়ে সাহিত্য, নাটক ও বক্তৃতা-বিবৃতিতে ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস করার সুযোগ পাচ্ছে। ইসলামের প্রতিটি বিধি-বিধান ও রীতি-নীতিতে মানব জাতির কল্যাণ ও সৌন্দর্যবোধ রয়েছে (যা বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত)। ঠিক তেমনি পর্দা প্রথায়ও রয়েছে কল্যাণ ও সৌন্দর্যবোধ। আমরা এর দৃষ্টান্ত নিতে পারি পাকিস্তান, সৌদি আরব, ইরান, লিবিয়া, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের মেয়েদের বোরখার ব্যবহার থেকে। সে দেশের নারীরা এমন ময়লা ও একচোখা কিম্ভূতকিমাকার বোরখা পরে রাস্তায় বের হয় না। এদের বোরখা বা পর্দা ব্যবহারের রুচিশীলতা লক্ষ্য করা যায়।

ইমাম সাহেবের ফতোয়া অনুযায়ী বোরখা পরে মেয়েরা রাস্তায় বের হলে স্বাভাবিকভাবেই পাগল বলে উপহাস করবে। ইসলামের নামে এসব বাজে কথা চালিয়ে দেয়ায় এবং ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচারে আমাদের দেশের মেয়েরা পর্দা ব্যবহারে নিরুৎসাহিত হন। ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে গুরুত্ব দেয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তথা পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক বলে অভিহিত করেছেন। অথচ মেয়েরা ময়লা-নোংরা কাপড় পরে বাইরে বেরুবে এরূপ ফতোয়া ইমাম সাহেব কোথায় পেয়েছেন তিনিই জানেন। পর্দা সম্পর্কে ইসলামের মূল কথা হচ্ছে–

www.pathagar.com

(১) মুখমন্ডল, হাত ও পা বাদে সমস্ত দেহকে আবৃত্ত করা। (২) দেহের অন্যান্য অংশের সাথে মুখমন্ডল, হাত ও পা আবৃত করা। (৩) সমস্ত দেহসহ মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদের উপরও যেন কোনো বেগানা পুরুষের দৃষ্টি না পড়ে সে জন্য পোশাককেও আবৃত করা। তবে মেয়েরা অবশ্যই ময়লা-নোংরা কাপড় পরবে না। তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরবে। তবে তা জাঁকজমকপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হবে না যা পুরুষদের প্রলুব্ধ করতে পারে। শরীরের রূপকে আচ্ছাদিত করে রাখতে হবে। সে ক্ষেত্রেও হাত ও মুখমন্ডল খোলা রাখার বিধান রয়েছে। আবার হিযাব রাসুলুল্লাহর (সঃ) সহধর্মিনীদের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য অন্যান্য সবার জন্য তা নয়।

বাংলাদেশে লক্ষ কোটি নারী ছিন্নমূল। যাদের ইজ্জত-আব্রু রক্ষার জন্য নেই বাসস্থান বা কাপড়-চোপড়। অসংখ্য নারীকে সাধারণ দিন মজুরের কাজ করতে হয় পুরুষদের সাথে। আবার এরা অশিক্ষিত মূর্খ। বেঁচে থাকার সংগ্রামই যাদের জীবনের একমাত্র তাদের ধর্ম-কর্মের মূল্যই বা কতোটুকু। তাই ইসলাম প্রথমে অগ্রাধিকার দেয় প্রতিকারের। প্রতিকারের পর ইসলাম তাগিদ দেয় প্রতিরোধের। প্রতিরোধের পর প্রতিবাদের শিক্ষা দেয় ইসলাম। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে প্রতিকার বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কতিপয় আলেম শুধু প্রতিবাদ জানায়। ফলে ইসলামের সুন্দর ও যুক্তিনির্ভর বিধি-বিধান নিয়ে জনমনে নানারূপ বিভ্রান্তির জন্ম নিচ্ছে।

ইসলাম নিজ স্ত্রীকে প্রকাশ্যে অবাধ প্রদর্শনে অনুমতি দেয় না। কারণ এতে এক পুরুষ অন্য নারীর প্রতি অন্য নারী অপর পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। অন্য স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে জন্ম নেয় পরকীয়া প্রেম। পরকীয়া প্রেমের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিনষ্টের ফলে সমাজে দেখা দেয় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। এর ফলে গোটা সামাজিক ও পারিবারিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। যার নজীর আমরা পাশ্চাত্যে দেখতে পাই।

এনজিওদের বদৌলতে আমাদের দেশে ইতোমধ্যেই এর আলামত দেখা যাচ্ছে। তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে এরা আমাদের নারী সমাজকে রাজপথে টেনে এনেছে। উগ্র ও বেপর্দাভাবে জীবন-যাপনকে তথাকথিত প্রগতিবাদীরা 'নারী স্বাধীনতা' বলে উল্লেখ করে থাকে। এ তথাকথিত 'নারী স্বাধীনতা' অভ্যস্থ ডলি ইব্রাহীম ও সুমী নামক অভিনেত্রীর কথা আমরা জানি। নারী স্বাধীনতার ঠেলায় অভিনেতা সালমান শাহ, ডলি ইব্রাহীম ও সুমির মতো অনেকেরই কপালেই পারিবারিক শান্তি জোটেনি। পারিবারিক অশান্তির কারণে এরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। তথাকথিত নারী স্বাধীনতার কারণেই খুকুর মতো মেয়েদের আবির্ভাব হয়। আবার তাদের কারণেই মুনীরের মতো ছেলেরা নৈতিক চরিত্র হারিয়ে পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়ে। পরকীয়া প্রেমের ফলে শারমিনকে স্বামী মুনীরের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে এবং মুনীরকে ঝুলতে হয়েছে ফাঁসির কাষ্ঠে। এ তথাকথিত নারী স্বাধীনতার কারণেই তসলিমা নাসরিন চার চারটি বিয়ে করেও পারিবারিক শান্তি কপালে জোটেনি। জুটেছে সিফিলিস রোগী অথবা তসলিমাকে যৌন তৃপ্তি দিতে অক্ষম পুরুষ।

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বেপর্দার কুফল

নারীর দেহ অম্লীয় ও চুম্বকধর্মী এবং পুরুষের দেহ ক্ষারীয় ও বিদ্যুৎধর্মী। অম্লের সাথে ক্ষারের একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে 'এফিনিটি' বলা হয়। এ আকর্ষণ এতো তীব্র ও সূক্ষ্ম যে তা রোধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এটা নিরেট সত্য যে, ক্ষারধর্মী দেহ ও অম্লধর্মী দেহের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক আকর্ষণ আছে। ক্ষারের আরেকটি গুণ এই যে, এটা অম্লের সংস্পর্শে আসলে অম্লের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। যাকে রসায়ন শাস্ত্রের ভাষায় নিরপেক্ষীকরণ বা Neutralization বলা হয়। তার জন্য অনাবৃত অম্লধর্মী ও চুম্বকধর্মী নারী দেহের উপর বিভিন্ন পুরুষের ক্ষারধর্মী ও বিদ্যুৎধর্মী দেহের ঘন ঘন প্রতিফলন হতে থাকলে নারীদেহের অম্লত্ব ও চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায় এবং ক্রমে ক্রমে নারীদেহ পুরুষালী আকার বিশিষ্ট হয়ে 'পুরুষ রূপ' ধারণ করে। নানা জাতীয় পুরুষের দেহের ঘন ঘন প্রতিফলন নারী দেহের সূক্ষ্ম ও কোমল কোষগুলোর উপর যে সংঘাত সৃষ্টি করে তা শরীরের প্রত্যেকটি কোষ, এমনকি নারীর ডিম্বকোষকে পর্যন্ত সূক্ষ্ম 'এটমিক' ক্রিয়া দ্বারা বিধ্বস্ত করে ফেলে। এতে নারী দেহের অম্লত্ব ও চুম্বকত্ব নষ্ট হলে নারী দেহ ক্ষারধর্মী ও বিদ্যুৎধর্মী হয়ে পুরুষ রূপ ধারণ করে। এ কারণেই বোধ হয় হাদীস শরীফে আছে পর্দানশীল মেয়েদেরকে বেপর্দা মেয়েদের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা হয়েছে।

অম্লত্ব ও চুম্বকত্ব হারিয়ে নারী দেহ পুরুষরূপ ধারণ করলে তাদের সৌন্দর্য্য ও নারীত্বের হানি ঘটে। নারীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হওয়ার অর্থ শরীরের প্রত্যেকটি কোষসহ ডিম্বকোষের গঠন ও গুণ বিকৃত হয়ে যাওয়া। অতএব, নারীর সৌন্দর্য্য ও যৌন আকর্ষণ রক্ষা করার জন্য পর্দার আবশ্যকতা রয়েছে। পুরুষের জন্য কোন পর্দার আবশ্যকতা নেই এ জন্য যে, নারী দেহের মতো পুরুষের দেহ চুম্বকধর্মী ও অম্লধর্মী নয়। এ জন্য তাদের উপর অন্য কোন দেহের প্রতিফলন হতে পারে না। এসব কারণে আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে নারীদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, "তোমরা যখন বাইরে যাবে, তখন শরীর ঢেকে আবৃত হয়ে যাবে।" (সূরা- আহযাব)। কাপড় পরিধানের ফলে এই কাপড়ের আবরণ অম্লত্বের উপর ক্ষারত্বের প্রতিফলন রোধ করে থাকে। চুম্বকধর্মী দেহের উপর যে বিদ্যুৎধর্মী দেহের প্রতিফলন হয় এবং দু'জাতীয় দেহের মধ্যে যে আকর্ষণ স্বভাবজাত তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

সুতরাং বাস্তব বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষায় প্রমাণিত হলো যে, শুধু ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা হিসাবে নয় বরং গোটা নারী জাতির দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা ও পরিপূর্ণতার জন্যেই নারীর একান্ত নিজ স্বার্থেই পর্দা অত্যন্ত জরুরী। আর এ বৈজ্ঞানিক সত্যতা আধুনিক বিজ্ঞানের ধারার প্রমাণিত হলেও এর মূল তত্ত্ব প্রায় চৌদ্দশত বছর আগেই মহাবিজ্ঞানী আল্লাহতায়ালা তাঁর কালামে পাকে উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। অতএব, নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো যে, ইসলামের প্রতিটি বিধানই পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত। তাই পর্দা প্রথা মেনে চললে এবং একে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করলে সকল মানুষের কাছেই ইসলামের এ বিধানটি বিজ্ঞানসম্মত হিসাবে পরিগণিত হবে।

www.pathagar.com

তালাক প্রথা

ইসলাম অর্থই শান্তি। এই শান্তি ব্যাহত হতে পারে এমন কোনো বাধ্যতামূলক আইন ইসলামে নেই। অথচ অন্যান্য ধর্মে বিশেষ করে হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্মে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যতই মনোমালিন্য হোক না কোন, আর পারস্পরিক তিক্ত সম্পর্কের কারণে সংসার জীবন যতোই নরকতুল্য হোক না কেন ধর্মীয় আইন তাদের স্বামী-স্ত্রীর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে থাকতে বাধ্য করে। আর খৃষ্টধর্মে অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর এই শর্তে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেয় যে তারা কেউই আর পুনরায় বিবাহ করতে পারবে না। এ অবস্থা বরং পূর্ব অবস্থার চাইতেও কঠোরতর। কারণ যৌবনে যৌন সম্পর্কের বৈধ দ্বার খোলা না থাকলে চোরা দ্বার অবশ্যই খুলে যায়। এই চরম সত্য অস্বীকার করা যায় না। এইসব কারণে অর্থাৎ সংসার জীবনকে নরক যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দেয়া এবং অবৈধ যৌন আচরণ থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যেই প্রয়োজন বোধে তালাক ও পরে দ্বিতীয় বিবাহ এই দুইটিই ইসলাম সমর্থন করে। এর বিপরীত ব্যবস্থা যা ভিন্ন ধর্মে রয়েছে তার কুফল তারা ভোগ করছে আর আমরা নীরবে তা দেখছি। দ্বিতীয়ত স্বামী গ্রহণের অনুমতি না থাকায় কতো হিন্দু নারীদের একতারা হাতে নিয়ে বাউলদের পিছু পিছু ঘুরে তাদেরকে ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট জীবন যাপন করতে হয় অথবা পতিতালয়ে নাম লেখাতে হয়।

ইসলামে তালাক একটি ঘৃণ্য কাজ। পবিত্র বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে দু'টি অপরিচিত মুখ একে অপরের সবচেয়ে কাছাকাছি আসে। তালাকের মাধ্যমেই সেই সম্পর্কের ইতি ঘটে। আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) বলেন, "যখন কেউ স্ত্রীকে তালাক দেয় আল্লাহ্র আরশ তখন কেঁপে উঠে।" তিনি আরো বলেছেন যে, "তালাক ইসলামের বৈধ প্রথার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রথা।" তবুও ব্যক্তি ও পারিবারিক কল্যাণের স্বার্থেই ইসলাম তালাক প্রথার বিধান করেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন পুরুষের বিবাহের পর পরই দেখা গেলো তার নববিবাহিতা স্ত্রী, স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাসুর কাউকেই মান্য করছে না। সে নিজের খেয়াল খুশি মতো চলাফেরা করছে অথবা একজন মেয়ের বিবাহের পর দেখা গেলো তার স্বামীটি উচ্ছৃঙ্খল, মাতাল অথবা অসৎ চরিত্রের অধিকারী। এ অবস্থায় যদি তালাক প্রথা না থাকতো তবে দু'জনের জীবনই দুর্বিষহ হয়ে যেতো। এ থেকে পরিত্রাণের জন্যেই তালাক প্রথার বিধান রয়েছে। এই তালাক প্রথাকে নিয়েও ইসলামের শত্রুরা বিভিন্নভাবে অপপ্রচার করছে। বিবাহের সময় বর বা কনেকে তিনবার কবুল বলতে হয়। তিনবার মাত্র উচ্চারণের মাধ্যমেই বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি মাত্র শব্দই যদি সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট হয়, একটি মাত্র শব্দ সম্পর্ক ভঙ্গের জন্য যথেষ্ট হবে না কেনো? তা সত্ত্বেও ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে একবার মুখে তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হয় না।

এ নিয়ে আমাদের সমাজে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। যা ইসলাম বিদ্বেষীরা বিভিন্ন মিডিয়ার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে মুসলমানদেরকে বিষিয়ে তুলছে।

এক ব্যক্তি একই সময় তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার কথা রাসূল (সাঃ)কে জানালে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে এখনও আছি, তোমরা আল্লাহর

www.pathagar.com

কোরআন নিয়ে খেলা করছো? তখন এক ব্যক্তি উঠে বললেন, তাকে কি আমি হত্যা করবো না? (নেসারী)

স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক আজীবন মধুর হোক এটাই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। বিচ্ছিন্ন হওয়াটা আল্লাহর অপছন্দ, তবুও নেহাত প্রয়োজনেই শুধু তা করার অনুমতি আছে। নারীদের ব্যাপারে কোমল হওয়ার জন্য আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন, (তফসীরে ইবনে কাসীরের ব্যাখ্যা অবলম্বনে) "আর তোমরা যে সকল স্ত্রীর অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারিতা, ক্রোধপরায়ণতা বা উত্তেজনাপ্রবণতার ভয় কর, তাদের ঐ সকল দোষ প্রকাশ হওয়ার আগেই তাদেরকে স্বামী ভক্তি, স্বামীর প্রাপ্য অধিকার, আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ-নিষেধ ও শাস্তি-পুরস্কার সম্বন্ধে উপদেশ দান করো। যদি এতে নারীরা ঠিক হয়ে যায় তবে তো ভালো কথাই, আর যদি ঠিক না হয়, বরং ঐসব অন্যায় কাজ করতে আরম্ভ করে, তবে তাকে ঠিক পথে আনার উদ্দেশ্যে শোবার সময় তার প্রতি অসন্তুষ্টির ভাব দেখাবে অর্থাৎ তার সাথে সংগম করবে না, তার দিকে পিঠ ফিরে শোবে, তার সাথে কথা বলবে না, এমন কি প্রয়োজনবোধে এক ঘরে থেকে ভিন্ন বিছানায় শোবে। যদিও এতেও স্ত্রী ঠিক না হয়, তবে তাকে আদব শেখাবার উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ প্রহার করবে। তবে দেখবে যেন প্রহারের দাগ শরীরে বসে না যায় বা হাত না ভাঙ্গে অথবা মুখমন্ডলে প্রহার না পড়ে। যদি এতে স্ত্রী অনুগত হয়ে যায়, তবে ক্লেশের অন্য কোন পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা মহোচ্চ ও মহাপ্রধান। তোমরা যদি তোমাদের স্ত্রীর প্রতি অযথা যুলুম কর তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।"

অন্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হলে স্বামীর পক্ষ থেকে একজন সালিশ নির্দিষ্ট করে দেয়ার জন্য আল্লাহপাক সর্দার মাতব্বরদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে করে দুই সালিশ বসে তাদের মধ্যে একটা সুন্দর মীমাংসা করে দিতে পারে এবং দাম্পত্য জীবন তাদের সুন্দর থেকে আরো সুন্দর হতে পারে। নারীদের জন্য এতো সুন্দর ব্যবস্থা স্বয়ং কোরআন পাকে তার ঘোষণা করে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালা ইসলামে নারী মুক্তির যে নিদর্শন রেখেছে, এতে সত্যিই আল্লাহর প্রশংসাই করতে হয়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইসলাম তালাক প্রথাকে অনুমোদন করলেও নানান শর্ত ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে তালাকের ক্ষেত্রটিকে সংকীর্ণ করে দিয়েছে। বিনা কারণে বা আনন্দফূর্তির জন্য স্ত্রীকে তালাক দেয়া ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ। তালাক সম্বন্ধে আল-কোরআনে সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষিত আছে। শুধু এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক মুখে বললেই (যেমন নাটক-সিনেমাগুলোতে দেখানো হয়ে থাকে) তালাক হয়ে যাবে না। ইসলাম মুসলমানদের জন্য নিয়ম করে দিয়েছে। তিন তালাক এক সাথে বা একবারে নয়, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দিতে হবে। যেমন তুহরে বা পবিত্রাবস্থায় অর্থাৎ স্ত্রী সঙ্গম হয়নি এমতাবস্থায় এক তালাক দিয়ে স্ত্রীকে ঘরেই রেখে দিতে হবে। এভাবে ইদ্দতকাল অর্থাৎ চার মাস একসঙ্গে থাকার পর যদি পরস্পর আবার আকর্ষণ অনুভব করে এবং মিলিত হতে চায় তবে মিলিত হতে পারবে। কিন্তু মিলিত হবার পর পুনরায় যদি মনোমালিন্য শুরু হয় তবে দ্বিতীয়বার তালাক দিতে পারবে। দ্বিতীয় তালাকের পর

www.pathagar.com

স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে হলে আকদ করে গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় তালাকের পরও যদি স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা না হয় তাহলে প্রমাণিত হবে যে, উভয়ের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ এতোই তীব্র যে, তাদের পক্ষে আর মিলেমিশে সংসার করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় তিন তালাকের বিধান দিয়ে স্ত্রীকে মুক্ত করে দেবার কথা বলা হয়েছে। তিন তালাক দেবার পর স্বামী আর স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারে না। এখন ঐ স্ত্রী স্বামীর জন্য আর হালাল নয়, যতক্ষণ না সে অন্য কোনো স্বামী গ্রহণ করে তার সংসার করেন। ইসলাম তিন তালাকের পর পুনরায় সেই স্ত্রীকে গ্রহণের বিধানটি কঠোর করেছে এই জন্য যে, স্বামী বা স্ত্রী তৃতীয়বার তালাক দেয়ার আগে যেনো বারবার পরিণতির কথা চিন্তা করার অবকাশ পায়। তালাক দেয়ার এটাই হচ্ছে ইসলাম সম্মত পদ্ধতি।

তালাক সম্বন্ধে পঞ্চাশের দশকে হিন্দু বুদ্ধিজীবী তুলসী লাহিড়ী "ছেঁড়া তার" নামে একটি নাটক লিখেছেন। নাটকটির বিষয়বস্তু ছিলো যুদ্ধ এবং মন্বন্তর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ নাটকটি রচিত হয়েছিল মুসলমানদের তালাক প্রথাকে অবলম্বন করে।

নাটকটির গল্পে বলা হয়েছিল মহিমবাবু ও রহিমদ্দি বাল্যকালের দুই সহপাঠি। স্বাভাবিক নিয়মেই মহিমবাবু উচ্চ শিক্ষিত। শহরনিবাসী এবং ভদ্রলোক। রহিমদ্দি অশিক্ষিত, চাষা। মহিবাবু উদারপ্রাণ। তাই চাষা হলেও বাল্যসহপাঠি রহিমদ্দিকে নিজের ঘরে বসিয়ে খাওয়ান (যদিও এ ধরনের আচরণ সেদিনের হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিলো না) এবং রহিমদ্দির জন্য একটা দোতরা ও তার স্ত্রী-পুত্রের জন্য নানান উপহার সামগ্রী কিনে দিয়ে নিজ চরিত্রে উদারতা এবং অসাম্প্রদায়িকতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

এদিকে আর এক গ্রাম্য মুসলমান হাকিমদ্দি ষড়যন্ত্র করে রহিমদ্দির জমিজমা, গরু-ছাগল সব কিছু গ্রাস করে নেয়। রহিমদ্দি স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনেরও ব্যবস্থা করতে পারে না। দেশে তখন যুদ্ধ ও আকাল। এমনি এক সময়ে অসহায় রহিমদ্দি ক্ষুধার্ত পুত্রের কান্না সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী ফুলজানকে পুত্রসহ হাকিমদ্দির বাড়ির লঙ্গলখানায় খাবার খেতে পাঠায়। হাকিমদ্দি ফুলজানকে রহিমদ্দির স্ত্রী হওয়ার কারণে লঙ্গরখানায় বসতে না দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। ক্ষুধার্ত স্ত্রী পুত্রের করুণ অবস্থা সহ্য করতে না পেরে অসহায় রহিমদ্দি টুকরো কাগজে 'তালাক' কথাটা লিখে দিয়ে স্ত্রীকে বলে আমি তোকে তালাক দিলাম।

এই তালাকনামা দেখিয়ে তুই লঙ্গরখানায় বসে খেয়ে আয়। এরপর নাট্যকার দেখিয়েছেন, হাদীস খেলাপ হওয়ার অজুহাতে ফুলজান আর রহিমদ্দির ঘরে ফিরে আসতে পারেনি। পুত্রের মা ডাকে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে, তবু ফুলজান সমাজের ভয়ে পুত্রকে বুকে তুলে নিতে পারেনি। স্ত্রী বিচ্ছেদে রহিমদ্দি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তবু 'তালাকের' ফাঁস ফুলজান-রহিমদ্দিকে আর একত্রিত হতে দেয়নি। কোরআন-হাদীসে বর্ণিত 'তালাক' প্রথা নাকি এতোই বর্বর, এতোই অমানবিক। নাটকটিতে নাট্যকার ইসলামের তালাক প্রথাকে যেমন অমানবিক হিসেবে চিত্রিত করেছেন, তেমনি ইসলামের বিধানকে অমান্য করার জন্য মহিম বাবুর মারফত নসিহত করে বলেছেন শাস্ত্র অপেক্ষা হৃদয়ের শক্তি বড়। নাটকটি ছিলো ইসলামী তালাক প্রথা সম্বন্ধে তুলসীবাবুর অজ্ঞতারই ফসল।

www.pathagar.com

তুলসীবাবুর মত ও পথকে অনুসরণ করে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস প্রযোজিত মামুন রশিদ গংদের রচিত বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে প্রায়ই দু'টি প্রচার নাটিকা প্রচারিত হচ্ছে। নাটকের বিষয়বস্তু 'তালাক' ও 'হিললা'। নারী অধিকারের গীত শোনাতে গিয়ে নাটিকাটিতে দেখানো হয়েছে এক মুসলমান চাষা বাড়ি ফিরে ভাত বেড়ে দেবার জন্য বৌ-এর উপর হম্বিতম্বি করে। বাড়িতে চাল না থাকায় ভাত রাঁধতে দেরি হয়েছে, স্ত্রীর এই কথা শুনে স্বামী তাকে গালমন্দ করে এবং এই তুচ্ছ অজুহাতে ক্রুদ্ধ চাষা এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক উচ্চারণ করে স্ত্রীকে তালাক দেয়। অসহায় স্ত্রী আর্তনাদ করে ওঠে। তুলসী বাবুর মতো বাংলাদেশের রহিমদ্দির বংশধর মুসলমান বাবুটিও ইসলামের তালাক ও মহিলা প্রথাকে অমানবিক ও বর্বরোচিত হিসেবে চিত্রিত করে পরোক্ষভাবে ইসলামী মূল্যবোধে আঘাত হানতে চেয়েছেন। এনজিও'র অর্থানুকূল্যে নির্মিত এই নাটিকাটি ৯০ ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রায়ই প্রচারিত হচ্ছে।

সূরা বাকারার ১৩১ নং আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, পরে তারা ইদ্দত যখন শেষ করে দিলো সেই পর্যন্ত ভালোভাবে তাদের ফিরিয়ে রাখ, অথবা ভালোভাবে তাদের বিদায় করে দাও। কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের আটকে রেখো না।

আমাদের মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ "দাসকে মুক্ত করার চেয়ে অন্য কিছুই আল্লাহকে পরিতৃপ্ত করে না আর বিবাহ বিচ্ছেদের চেয়ে অন্য কিছু তাঁকে অধিক অসন্তুষ্ট করে না।" তারপরও ইসলাম সামাজিক শৃঙ্খলা, দাম্পত্য জীবনে স্থিতিশীলতা এবং নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য তালাক প্রথাকে অনুমোদন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে এর যথেচ্ছ ব্যবহার যাতে না হয় সে জন্য সতর্কতামূলক কিছু শর্তও আরোপ করেছে।

এহেন একটি সুস্থ-সুন্দর জীবন বিধানকে হিন্দু সাহিত্যিক-নাট্যকারগণ যেমন বিকৃত করে দেখাতে চেয়েছেন তেমনি মুসলমান নামধারী কিছু পরজীবী নাট্যকার ও সাহিত্যিকও তাদেরই পথ অনুসরণ করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জাতীয় টেলিভিশন মিথ্যাশ্রয়ীদের সেই সব বিকৃত, মিথ্যা, ইসলাম বিরোধী প্রচার নির্দ্বিধায় প্রচার করে চলেছে এবং বাংলাদেশের বারো কোটি মুসলমান ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি এই মিথ্যা প্রচারকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিচ্ছে।

প্রখ্যাত ফরাসী চিন্তাবিদ-বিজ্ঞানী ডঃ মরিস বুকাইলি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করছেন যে, পবিত্র কোরআনই একমাত্র আসমানী কিতাব, যা সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

জর্জ বার্নাডশ' বলেছেন, "আমি বিশ্বাস করি, হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর মতো কোনো ব্যক্তি যদি আধুনিক বিশ্বের একনায়কত্বের পদ গ্রহণ করতেন তাহলে তিনি এমনভাবে বিশ্ব সমস্যার সমাধান করতে পারতেন, যাতে বহু আকাঙ্ক্ষিত সুখ ও শান্তিতে বিশ্ব ভরপুর হয়ে উঠতো।"

কোরআনের বিধান, হাদীসের নির্দেশাবলীই যে একমাত্র আল্লাহতায়ালার নিজস্ব বিধান– এ কথা বিশ্বের তাবৎ শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদগণ স্বীকার করলেও কিছু পিপীলিকা মাঝে

www.pathagar.com

মাঝে ডানা ঝাপটে আকাশ অতিক্রম করতে চায়। এটা সত্যই হাস্যকর।

ইসলামে তালাক প্রথা সহজ হলেও শতকরা মাত্র ১৬ জন মহিলা তালাক প্রাপ্ত হন। এর মধ্যে শতকরা ৮ শতাংশ কর্মজীবী মহিলা! আর ইউরোপে তালাক প্রথা কঠিন থাকা সত্ত্বেও সেখানে শতকরা ৭০ ভাগ দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।

এক সময় পুরুষেরা ইচ্ছামতো স্ত্রীদের তালাক প্রদান করতে পারতো এবং ইচ্ছামতো আবার গৃহে ফিরিয়ে আনতো। ফলে কোনো স্ত্রীই অত্যাচারী স্বামীর কবল হতে নিষ্কৃতি পেতো না। এ ছাড়া 'হিললা' প্রথায় কোনো পুরুষ স্ত্রীকে আর স্পর্শ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে যদি চার মাস সহবাসে বিরত থাকে তাহলে তালাকে পরিণত হতো। কোনো স্বামী স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে মাহরুমা কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে তুলনা করলে স্বামী কাফ্ফারা না দেয়া পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস করতে অস্বীকার করতে পারতো এবং এভাবেই তালাক হয়ে যেতো। একে 'যিহার' প্রথা বলা হতো। 'খুলা' তালাক ব্যবস্থায় স্ত্রী স্বামীকে বিনিময় মূল্য দিয়ে মুক্তি দেয়ার অনুরোধ করতো এবং এভাবেই তালাক হয়ে যেতো। এই সমস্ত অগ্রহণযোগ্য এবং অত্যাচারমূলক প্রথা হতে ইসলাম ধর্ম নারী-পুরুষ উভয়কেই মুক্তি দিয়েছে। কোনো স্ত্রী বিনিময় মূল্য দিয়ে মুক্তি চাইলে যেমন সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া ইসলাম সে ব্যবস্থাকে সমর্থন করেনি, তেমনি পুরুষের খামখেয়ালীপূর্ণ তালাকও মেনে নেয়নি।

তালাকুল আহসান এবং তালাকুল হাসান ব্যবস্থায় যে স্বামী-স্ত্রী কোনোভাবেই নিজেদেরকে পারস্পরিক সমন্বয় করতে পারেন না– সে ক্ষেত্রেই প্রতিফলন ঘটে থাকে। অর্থাৎ অত্যন্ত ঠান্ডা মেজাজে এবং ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেই উভয়ের মঙ্গলার্থেই এ ধরনের তালাককে ইসলাম ধর্ম স্বীকৃতি দিয়েছে। আবার ইচ্ছাকৃতভাবে খামখেয়ালীর বশবর্তী হয়ে তালাক দিয়ে ইচ্ছামতো স্ত্রীকে ঘরে আনবার প্রাচীন প্রথাকেও ইসলাম ধর্ম সীমায়িত করেছে। তালাক দিলে স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ করতে হবে এবং এরপরই পূর্বের স্বামী ইচ্ছা করলে পরবর্তী স্বামীর তালাক সাপেক্ষে গ্রহণ করতে পারে। এই কঠিনতম ব্যবস্থা দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র গভীর সম্পর্ককে অটুট রাখাই ধর্মের প্রয়াস। তিন 'তালাক প্রাপ্তা' রমণী অন্য পুরুষের সাথে বিবাহিতা ও সম্মিলিতা হবার পর পূর্ব স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহিতা হতে পারে, এটি সর্বসম্মতিক্রমে স্থিরিকৃত হলেও ঐ উদ্দেশ্যে শর্ত করে বিয়ে করা সঙ্গত হবে না। কারণ হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঐ অবস্থায় উভয়ের প্রতি ধিক্কার দিয়েছেন। বস্তুতঃ কোনো রমণীকে ভবিষ্যতে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবার প্রলোভনে তাকে অপরের সাথে বিবাহ দিয়ে উচ্ছিষ্ট করে আনা কিংবা যাকে ধর্ম পত্নীরূপে গ্রহণ করা হবে, অপরের উপভোগের জন্য তাকে বর্জন করা– এ উভয়ই অতি লজ্জাকর ও বীভৎস্য ব্যাপার এবং নিন্দনীয় পাশবিকতার পরিচায়ক। হযরত ওমর (রাঃ) তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করবার যোগ্য বলেছেন এবং হযরত ইবনে আব্বাস 'মলউন' বলে অভিহিত করেছেন। বিশেষতঃ যদিও কেউ কোনো রমণীকে হালাল শর্তে বিবাহ করে, তাহলেও সে তাকে তালাক দিতে বাধ্য নহে। কারণ ইসলামে অস্থায়ী বা সাময়িক বিবাহ অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে।" (তঃ হক্কানী, মঃ আঃ ও মোঃ কোঃ। নূঃ

www.pathagar.com

তফসীর পৃঃ ১০৩-১০৪)

টিভিতে প্রচারিত 'হিললা' নাটিকার মূল বক্তব্য এই যে, ১৯৬১ সালে একটি আদেশ জারি করা হয়, এই আদেশ অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি থাকলে হিললার প্রয়োজন নেই, তালাক হয়ে যাওয়ার পর একই যুগল দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারবে।

১৯৬১ সালের কোন আইন দিয়ে কোরআনকে ব্যাখ্যা করা চলে না, কোরআনের আইন ব্যাখ্যা করতে হবে কোরআন ও হাদীস দিয়ে। উক্ত বিশ্লেষণটিতে প্রকৃতপক্ষে কোরআনকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের জন্য তিনিই আইন তৈরি করেছেন যা সম্মানজনক ও সর্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই রাসুল (সাঃ)-এর মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর দেয়া বিধান কখনো ভুল হতে পারে না। গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত কোরআনের আইনের বাস্তবায়ন আমাদের জীবন সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সহজতর করবে।

ফতোয়া

এদেশের ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রের নামে বিভিন্ন দোহাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেছেন। যেমন ব্রাহ্মণ ভোজন, দক্ষিণা, কন্যাদান, দেবদাসী ইত্যাদির মাধ্যমে পাপ মোচনের নামে অর্থ কামিয়েছেন এবং নিজেদের জৈবিক ক্ষুধা মিটিয়েছেন; ঠিক তেমনিভাবে ব্রাহ্মণদের অনুকরণে কতিপয় অপূর্ণাঙ্গ ইসলামী জ্ঞানধারী মোল্লা-মৌলভী বিভিন্ন মাছলা-মাছায়েলের নামে বৃটিশ আমল থেকে জীবিকা অর্জন করছেন। যা ইসলামের প্রকৃত বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক।

ইসলামী মতে ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞাসাকে ফতোয়া বলে। সমাজের সাধারণ মুসলমানেরা যে সব ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত নন, তারা এ সম্পর্কে জানতে চাইলে আলেম ওলামা এবং জ্ঞানী ইমামদের দ্বীনি কর্তব্য তাদেরকে শরীয়তের সঠিক ফয়সালা জানানো।

মুসলিম শাসনামলে সরকারের পক্ষ থেকে যোগ্য আলেমকে (বাংলা অর্থ বিশেষজ্ঞ) ফতোয়া প্রদানের জন্য নিয়োগ করতেন। কিন্তু বৃটিশ প্রভাবের পর থেকে আমাদের উপমহাদেশে এর প্রচলন না থাকার কারণে দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলো শরীয়ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মুফতি হিসেবে নিয়োগ করে থাকে।

মূলতঃ ফতোয়া হলো শরীয়তের সঠিক হুকুম জানিয়ে দেয়া। তবে সে হুকুম বাস্তবায়িত করা সরকারের দায়িত্ব। যেমনঃ মৃত্যুদন্ড প্রদান বা বিশেষ অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ড দেয়া হয়। শরীয়তের পরিভাষায় 'হদ' বলে। এটি কার্যকরী করা একমাত্র সরকারের উপর ন্যস্ত, মুফতি বা কোন ইমাম তা কার্যকর করতে পারে না।

কিন্তু আমাদের দেশে কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজ হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে কিছু অর্ধশিক্ষিত আলেমদেরকে ব্যবহার করে ফতোয়া দিয়ে শাস্তি কার্যকর করছে। যা ইসলামী আইন সমর্থন করে না।

দেশে প্রতিদিন নারী ধর্ষণ, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, হত্যা, নির্যাতনের মতো জঘণ্য ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এ নিয়ে একটি বিশেষ শ্রেণীর তেমন একটা

www.pathagar.com

মাথা ব্যথা নেই। প্রভাবশালীদের সহায়তায় অপরিপক্ক আনাড়ী আলেমদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ফতোয়াবাজীর ঘটনাকে পুঁজি করে প্রচার মিডিয়ায় মানুষের দ্বীনি আকিদা ও বিশ্বাসকে নষ্ট করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করছে এই বিশেষ শব্দ 'ফতোয়াবাজ'কে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম শাস্তি নয়, প্রতিরোধে উৎসাহী। নারী নির্যাতনের উৎস বা প্রক্রিয়াগুলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে অপরাধীদের শাস্তি দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অমানবিক।

উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত তফসিরকারক ইসলামী আইনে শাস্তির বিধান সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"ইসলামী দন্ডবিধির ব্যাপারে সর্বপ্রথম এই মূলনীতি হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে, হাত কাটার শাস্তি এবং শরীয়ত প্রবর্তিত অন্যান্য দন্ডবিধি শুধুমাত্র সেই জায়গায় কার্যকর করার জন্য রচিত হয়েছে যেখানে রাষ্ট্রের প্রশাসন ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় সমাজ ব্যবস্থা ও নাগরিক জীবন সংগঠিত ও বিন্যস্ত থাকে। ইসলামের নীতিমালা ও আইন-কানুন বিভাজ্য বা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিছু নীতিমালা ও আইন-কানুন কার্যকর করা হবে আর কিছু বাদ থাকবে এটা ঠিক নয়।

উদাহরণ স্বরূপ ব্যাভিচার ও ব্যাভিচারের অপবাদ রটনা সংক্রান্ত দন্ডবিধির কথাই ধরা যাক। বিয়ে, তালাক ও পর্দা সংক্রান্ত ইসলামী আইনবিধি এবং নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ সংক্রান্ত ইসলামের নৈতিক শিক্ষার সাথে এই দন্ডবিধির অত্যন্ত গভীর ও অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে। আল্লাহতায়ালা ব্যাভিচারকারী ও ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীর জন্য এমন কঠোর সাজা নির্ধারণ করেছেন একটা বিশেষ সমাজে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে যে সমাজে মহিলারা সেজেগুজে অবাধে ও খোলাখুলিভাবে বিচরণ করে না, নগ্ন, অর্ধ নগ্ন ছবি, প্রেম-ভালোবাসা সম্বলিত কিচ্ছা-কাহিনী, যৌন আবেগে ক্রমাগত সুড়সুড়ি দেয়া অনুষ্ঠান ও উৎসবাদির প্রচলন থাকে না, যে সমাজে বিয়ে করা সহজসাধ্য এবং বিয়ে বিচ্ছেদের ইসলামী বিধিসমূহ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় কেবলমাত্র সেই সমাজেই এই দন্ডবিধি প্রযোজ্য। এ ধরনের সমাজ স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্তভাবেই এ দাবী জানাতে থাকে যে, সামাজিক আচরণের জন্য যে ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলা সে ধারণ করছে, তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কঠোর দন্ড প্রবর্তন করা হোক। বস্তুত যেখানে বৈধ উপায়ে যৌন লালসা চরিতার্থ করার সহজ ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সামাজিক পরিবেশকে ব্যাভিচারের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও অস্বাভাবিক উত্তেজনা সৃষ্টির উপকরণাদি থেকে পবিত্র ও মুক্ত করা হয়েছে, সেখানে এ ধরনের কঠোর সাজা প্রবর্তন মোটেই অন্যায় নয়। এ ধরনের নির্মল পরিবেশেও যৌন অপরাধে লিপ্ত হওয়া কেবলমাত্র জঘণ্যতম অসচ্চরিত্রের লোকদের পক্ষেই সম্ভব, যাদের অনাচার থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে রক্ষা করার জন্য ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

www.pathagar.com

কিন্তু যে সমাজে এ ধরনের পবিত্র পরিবেশ বিরাজ করে না, যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা রীতিসম্মত, যেখানে বিদ্যালয়ে, অফিস-আদালতে, ক্লাবে ও প্রমোদ কেন্দ্রে, গোপন ও প্রকাশ্য অঙ্গনে সর্বত্র এসব উদ্দাম ও উচ্ছৃংখল স্বভাবের পুরুষ ও বিচিত্র সাজে সজ্জিত নারীদের লাগামহীন মেলামেশা ও একত্রে ওঠা-বসার সুযোগ রয়েছে, যেখানে চারদিকে অগণিত কামোদ্দীপক উপকরণ ছড়ানো রয়েছে এবং বৈবাহিক বন্ধন ব্যতিরকে কামবাসনা চরিতার্থ করার সব রকমের ব্যবস্থা রয়েছে এবং যেখানে মানুষের নৈতিক মানের এতো অধোপতন ঘটেছে যে, অবৈধ সম্পর্ক মোটেই দূষণীয় মনে করা হয় না। এ ধরনের সমাজে ব্যাভিচার ও ব্যাভিচারের অপবাদ রটানোর শাস্তি প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে জুলুমের শামিল হবে। কেননা এ ধরনের পরিবেশে একজন সাধারণ মানের মধ্যম স্বভাবের ও সুস্থ মানসিকতার অধিকারী মানুষের পক্ষেও ব্যাভিচার থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কারো পাপে লিপ্ত হওয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় যে, ঐ লোকটা অস্বাভাবিক ধরনের নৈতিক অপরাধী। প্রকৃতপক্ষে পাথর মেরে হত্যা ও বেত মারা শাস্তি এমন নোংরা ও ঘৃণ্য পরিস্থিতির জন্য আল্লাহ্ নির্ধারণই করেননি।”

ইসলামে নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার

পৃথিবীতে অন্যান্য ধর্মে পিতার সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের অধিকার নেই। কিন্তু ইসলাম ধর্মে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। ইসলামে পিতার সম্পত্তিতে নারীকে যেমন হকদার করেছে। তদরূপ স্বামীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিতে বানিয়েছে তাকে অংশীদারী। কিন্তু তার মহরানায় কাউকে শরীক করেনি।

আল কুরআনে আল্লাহ্পাক ঘোষণা করেছেন ঃ “একটি মেয়ে সন্তান যা পাবে একটি ছেলে সন্তান তার দ্বিগুণ সম্পত্তির অধিকারী হবে।” আমাদের তথাকথিত প্রগতিবাদীরা বলে থাকেন যে, এক্ষেত্রে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ প্রগতিবাদীদের জ্ঞাতার্থে বলতে চাই যে ইসলাম ধর্ম তিন দিক থেকে নারীকে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী করেছে। পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কন্যার চেয়ে ছেলের উত্তরাধিকার হিস্যা দ্বিগুণ করেছে। এ জন্য যে, কন্যা সন্তানের জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত সমস্ত খরচ পিতার উপর বর্তায়; আবার স্বামীর বাড়িতে স্ত্রীর সমস্ত ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তায়। আবার স্ত্রী বৃদ্ধকালে সমস্ত ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বর্তায় পিতা, স্বামী ও ছেলেদের উপর। সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা ছেলেদের অংশ মেয়েদের অংশ থেকে বেশি বরাদ্দ করেছেন। তাছাড়া ছেলেরা শুধুমাত্র পিতার সম্পত্তিতে অধিকার পায়; অন্যদিকে মেয়েরা যথাক্রমে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারী হয়। এছাড়াও নির্দিষ্ট পরিমাণ মহরানা পুরুষের জন্য অবশ্যই পালনীয়। মহরানার উপর স্ত্রীরই রয়েছে একমাত্র স্বত্বাধিকার। মহরানার অর্থ স্ত্রী তথা নারী যে কোন সৎকাজে ব্যয় করতে পারে। স্ত্রী ইচ্ছে করলে ব্যবসার কাজেও তা খাটাতে পারে এবং তার লভ্যাংশ সে একাই ভোগ করার অধিকার রাখে। তাতে হাত বাড়াবার কোনো অধিকারই স্বামীর বা অন্য কারো নেই। মেয়েদের আর্থিক নিরাপত্তার এর চেয়ে সুন্দর বিধান অন্য কোনো ধর্মে আছে কিনা আমার জানা নেই।

www.pathagar.com

একজন পরান্নভোজী অধ্যাপকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ

আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফোকলোর এন্ড ফোকলাইফ' বিভাগের সাবেক অধ্যাপক চেয়ারম্যান এবং ব্লু মিল্টনের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হেনরি গ্লাসি ১৯৯৫ সালে ঢাকা এসেছিলেন। ঢাকায় আসার পর এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, "আমি 'নারীবাদ'-এর ফিলোসফি অথবা ডিকনস্ট্রাকশন কোনোটাই বুঝি না।"

"আমেরিকার মেয়েরা তো অনেক স্বাধীন?" এ প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর হেনরি গ্লাসি বলেন ঃ "কে বলেছে? মিডিয়াতো এমনিতেই বহু কথা প্রচার করে, তার অধিকাংশ ডাহা মিথ্যা। আমেরিকায় মেয়েদের কোনো ক্ষমতা নেই, রাজনীতিতেও নয়, অন্যত্রও নয়। রাজনীতিতে যদি কারো কোনো প্রভাব হঠাৎ চোখেও পড়ে, দেখা যাবে প্রভাবের পেছনে ঐ মহিলা নন; বরং পুরুষেরা আছেন। পুরুষেরাই মদদ দিচ্ছে। নারীর প্রতি কোনো সম্মানবোধ আমেরিকার সমাজে নেই। আর স্বাধীনতা? বক্ষ উদোম কিংবা পাশ্চাত্যের কাপড় তুলে ঘুরে বেড়ালেই স্বাধীনতা হয়না। এসব দেশে পরিবার আছে, ঘর-সংসার আছে এবং এসব দেশের মেয়েরা যে আমেরিকায় স্বাধীন মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি সুখী সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।" (সূত্রঃ সংগ্রাম, ৬/১১/৯৬)

এই হলো আমাদের নারী সমাজ সম্পর্কে আমেরিকার একজন অধ্যাপকের মূল্যায়ন। এবার আমাদের দেশের সমাজ সম্পর্কে একজন পরান্নভোজী অধ্যাপকের অবমূল্যায়ন। আমেরিকার পক্ষে সাফাই গেয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর এবং বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক ডঃ মাযহারুল ইসলাম একটি জাতীয় দৈনিকে "আসুন, বাংলাদেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করি" শিরোনামে উপসম্পাদকীয়তে লিখেছেন ঃ

"বিগত পাঁচ/ছয় বছর যাবত প্রতি বছরই আমাকে অন্ততঃ একবার করে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হয়েছে। কখনও আন্তর্জাতিক কোনো সম্মেলনে যোগ দিতে, কখনও কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে, কখনও বা চিকিৎসার্থে। প্রতিবারই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি দেশে ফিরি। এবারের অভিজ্ঞতায় আনন্দের চেয়ে বিমর্ষতাই ছিলো অর্ধেক। প্রায় মাসখানেক অবস্থান করে কয়েকদিন আগেই আমি ফিরেছি। যুক্তরাষ্ট্রে এবার টেলিভিশনে বার বার একটি ছবি দেখতে হয়েছে। ছবিটি বাংলাদেশ সম্পর্কে এবং তা গ্রামের। একটি গ্রামে একদল নারী-পুরুষ এবং বালক-বালিকা সমবেত হয়েছে। সমবেতদের মধ্যে একজন গৃহবধূ তার ব্লাউজের বোতাম খুলে তাতে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ইনজেকশন নিচ্ছে। ইনজেকশন দিচ্ছে জন্ম শাসনের জনৈক মাঠকর্মী মহিলা। যে মহিলা ইনজেকশন নিচ্ছে তার মাথায় ঘোমটা এবং সমস্ত শরীর শাড়ি দিয়ে ঢাকা। যে ইনজেকশন নিচ্ছে এবং অন্যরা হো হো করে হাসছে। ইতিমধ্যে সেখানে এক টুপিওয়ালা ফতোয়াবাজ মৌলভী এসে চিৎকার করে বলছে, এসব নাজায়েজ কাজ, এসব বেয়াদবি কাজ- এসব বন্ধ কর। তখনও অন্যেরা সবাই হো হো করে হাসছে। দৃশ্যটির মধ্যে মিথ্যে বা অতিরঞ্জিত কিছু নেই। বাঙালী যে হাসতে জানে না এই দৃশ্য

www.pathagar.com

দেখলে তা মনে করবার কোনো কারণ নেই। গ্রামে গ্রামে এমন দৃশ্য নিত্য-নৈমিত্তিক। সেখানে আমরা কারণেও হাসি, অকারণেও হাসি, কোনো কিছুর পক্ষেও হাসি, বিপক্ষেও হাসি। আমরা সুখেও হাসি, দুঃখেও হাসি। যাদের হাসবার তারা হাসুক। কিন্তু যে দৃশ্যের কথাটি উল্লেখ করলাম, আমার জন্য তা বড়ই মর্মান্তিক মনে হয়েছে। কেননা যে মেয়েটি স্বতোপ্রবৃত্ত হয়ে জন্ম শাসনের ইনজেকশন নিতে এসেছে তাকে সর্বপ্রথমে উৎসাহিত করা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব ছিলো। আমরা তা না করে তার এই আগ্রহকে হাসির বিষয় মনে করে তার মহত্ত্বকে ছোট করেছি। তার এই মহত্ত্বকে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা গ্রামে খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যেই আছে। এই অবস্থার মধ্যে সেখানে ফতোয়াবাজ মওলানার উপস্থিতি ও তার তর্জন-গর্জন গ্রামের প্রকৃত চিত্রকে তুলে ধরেছে। গ্রামে গ্রামে ফতোয়াবাজ মাওলানারা যে সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করে চলেছে তা সমগ্র জাতির জন্য এক অশনি সংকেত।" (দৈনিক আজকের কাগজ, ১৩ সেপ্টেম্বর '৯৪)

এখানে লক্ষ্যণীয় অধ্যাপক সাহেব যুক্তরাষ্ট্রের টিভিতে এই ছবিটি বার বার প্রচারিত হতে দেখেছেন। বাংলাদেশের মুখে এভাবে চুনকালি মাখা হচ্ছে আর বাংলাদেশী দূতাবাস নীরবে নিঃশব্দে তা অবলোকন করে যাচ্ছে। অথচ ঐ বিষয়ে অধ্যাপক সাহেবের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। বরং অগণিত গুণাবলীর অধিকারী এই অধ্যাপক সাহেব যখন বলেছেন, "গ্রামে গ্রামে ফতোয়াবাজ মাওলানারা যে সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করে চলেছে তা সমগ্র জাতির জন্য এক অশনি সংকেত।"

সুতরাং সচেতন জাতির জন্য এ উক্তি অত্যন্ত বিস্ময়কর। বুঝতে কষ্ট হয়না এরা কোন কাননের ফুল। আর এ দেশের আলেমদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্রের মেইন

www.pathagar.com

সুইচ কোথায়। যারা আমাদের সমাজের চালচিত্র নিয়ে তিলকে তাল করে প্রামাণ্য চিত্র বানিয়ে তাদের দেশের টিভিতে প্রচার করছে তাদের নগ্ন স্বরূপ বিশ্বের প্রতিটি দেশে আজ উন্মোচিত।

আমেরিকা নেপথ্যে থেকে সার্বিয়াকে সমর্থন দিয়ে বসনিয়াতে চালিয়েছিলো ইতিহাসের জঘন্যতম নারকীয় হত্যাকান্ড, দানবীয় উন্মত্ততা আর পৈশাচিক নিপীড়ন-নির্যাতন। সার্ব নরঘাতকরা মুসলিম শহর ও জনপদকে অবরোধ করে সেখানে খাদ্য, পানি, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিলো। আগুন লাগিয়ে মুসলমানদের ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা পুড়ে ছারখার করে দিয়েছিলো। পুড়িয়ে হত্যা করেছিলো অগণিত নারী, শিশু, বৃদ্ধ, তরুণ ও যুবককে। অন্যান্যদের নিয়ে আটক করেছিলো বন্দী শিবিরে। সেই শিবির থেকে শত শত মুসলিম যুবতী মেয়েকে রাজপথে এনে উলঙ্গ করে ছেড়ে দিয়েছে। এরপর তাদের নগ্ন দেহের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে খৃস্টান সার্ব কামুক কুকুরেরা। এরা প্রকাশ্যে এক সঙ্গে মুসলিম যুবতীদের উপর গণধর্ষণ চালিয়েছে। অসহায় পিতা-মাতা, ভ্রাতা, স্বামীর সামনে নির্মম ধর্ষণ চালিয়েছে তাদের কন্যা, বোন ও স্ত্রীদের উপরে। গর্ভবতী মুসলিম মহিলাদের পেটে বেয়নেট চালিয়ে চিড়ে বের করে এনেছে বাচ্চা। তারপর তাদের হত্যা করেছে। কুচি কুচি করে কেটে তা খাইয়েছে কুত্তা দিয়ে। শুধু সার্ব নরপিশাচরাই মুসলিম মহিলাদের ধর্ষণ করেনি, কোথাও কোথাও উলঙ্গ করে, হাত-পা বেঁধে তারপর সার্বদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিকারী কুকুর দিয়ে ধর্ষণ করিয়েছে অসহায় মুসলিম নারীদের। এভাবে ধর্ষণ করেছে ওরা পঞ্চাশ হাজার মহিলাকে। হতভাগ্য কাশ্মীরী মুসলমান নারীদের কথা আর নাইবা বললাম। হাজার হাজার কাশ্মীরী মহিলা আজ ধর্ষণ ও নির্যাতনের শিকার। আর এই মুসলিম মহিলাদের যখন পাইকারী

www.pathagar.com

হারে ধর্ষণের জন্য কোনো নেতা তার অনুসারীদের নির্দেশ দেয় তখন এরা মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত হয় না। এসব কাহিনী আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের অজানা থাকলেও অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীদের অজানা থাকার কথা নয়। আমাদের দেশে যেসব মারাত্মক অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এসব অপরাধের নাটের গুরু কারা তাও অধ্যাপক সাহেবদের অজানা থাকার কথা নয়। অথচ এগুলো নিয়ে অধ্যাপক সাহেবদের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, কোনো দুঃখবোধ ও লজ্জাবোধ নেই। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় কোনো বিবৃতি বা উপসম্পাদকীয় চোখে পড়েনি। তাদের বিবেক দংশিত হয়নি। জানিনা তাদের বিবেক নামের বস্তুটি তখন কোন গামছায় বাঁধা থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের গুরুতর অপরাধের চিত্রকে পাশ কাটিয়ে দূরবীন দিয়ে ফতোয়াবাজদের অপরাধ তালাশ করে সুদূর আমেরিকার টেলিভিশনে বার বার দেখায় এবং তা দেখে অধ্যাপক সাহেবরা যখন ফতোয়াবাজদের নিয়ে শংকিত হন তখন বলতেই হয়– "সব শিয়ালের এক আওয়াজ, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া।"

তসলিমা নাসরিন

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রের লেলিয়ে দেয়া কুখ্যাত বিকৃত রুচির তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করছি। তসলিমা নাসরিন কিছু সনাতন বিষয়কে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার জন্যে হুট করে আলোচনায় আসেন। আদতে সাহিত্য গুণে তার অবস্থান শূন্যের কোঠায়। লেখালেখির বিষয় হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন ধর্ম ও পুরুষকে। পুরুষ বিদ্বেষী তসলিমা এক জায়গায় লিখেছেন, "ওরা জেরুজালেমে, হিমালয়ে, হেরা পর্বতে বসে ধর্ম রচনা করছে। এই ধর্মকে ওরা পবিত্র ঘোষণা করেছে। ওরা তোমাকে শয্যায় উঠাচ্ছে, শয্যা থেকে যখন ইচ্ছে নামাচ্ছে। ওরা তো মানুষ নয়, ওরা পুরুষ।"

নারী ধর্ষণ করতে শিখুক ব্যাভিচার করতে অভ্যস্থ হোক... এখন ভাল কথার যুগ নয়, নীতি বাক্যের সময় নয়... নারী যতোদিন ছিড়ে খুঁড়ে পুরুষ না খাবে, নারী যতোদিন পুরুষ শরীরকে একদলা মাংসপিন্ড হিসেবে ভোগের নিমত্তি গ্রহণ না করবে ততোদিন নারীর রক্ত-মাংস-মজ্জায় নিহিত পুরুষকে প্রভু ভাবার সংস্কার দূর হবে না।

বাড়ীর আঙ্গিনায় খেলোয়াড়ের ভঙ্গিতে তসলিমা নাসরিন

সুলেখক আবদুল মবিন প্রণীত 'নষ্ট দর্শন' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, অন্নদা মঙ্গল কাব্যে বলা হয়েছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের

www.pathagar.com

আমলে রাজা প্রতাপাদিত্যের সাথে মানসিংহের যুদ্ধকালে ভবানন্দ মজুমদার নামে এক ব্রাহ্মণ মানসিংহকে সাহায্য করেন। যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রতিদান হিসেবে মানসিংহ ঐ ব্রাহ্মণকে একটি জায়গীর দেওয়ার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরকে অনুরোধ করেন। কিন্তু বাদশাহ জাহাঙ্গীর প্রথমে ঐ অনুরোধ রক্ষা করেননি। ফলে ব্রাহ্মণ পূজাদ্বারা অন্নপূর্ণা দেবীকে খুশী করলে অন্নপূর্ণা জ্বীন-ভূত-প্রেত ও পিচাশের বলে বলিয়ান হয়ে রাজমহলে বেগমদের উপর সওয়ার হয়ে উৎপাত শুরু করলে সম্রাট পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হন।

যিনি পর পর তিনটি পতি দেবতা বদল করেও ক্ষ্যান্ত হননি; স্বয়ং এমবিবিএস পাস করেও যিনি যৌন স্বাধীনতার উকিল সেজেছেন, সেই তসলিমা নাসরীনের লজ্জা যদি আদৌ থেকে থাকে, যেখানে যা আছে সে সবই ঢেকে দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন মুসলিমমুক্ত হিন্দু উপমহাদেশকামী আদভানিজীরা

অন্নদা মঙ্গলকাব্যে এই উৎসবের বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে–

“বিবিরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল
ওঝার ধর্মকে বিবির ইজার ছিড়িল
ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত
বিবিরে লইয়া ভূতের খুশী বাড়ে ততো।
বিবি ছাড়ি বান্দিরেও যেই ধরিল ভূতে
ওঝারে কিলায় কেহ কেহ মুখে মুতে

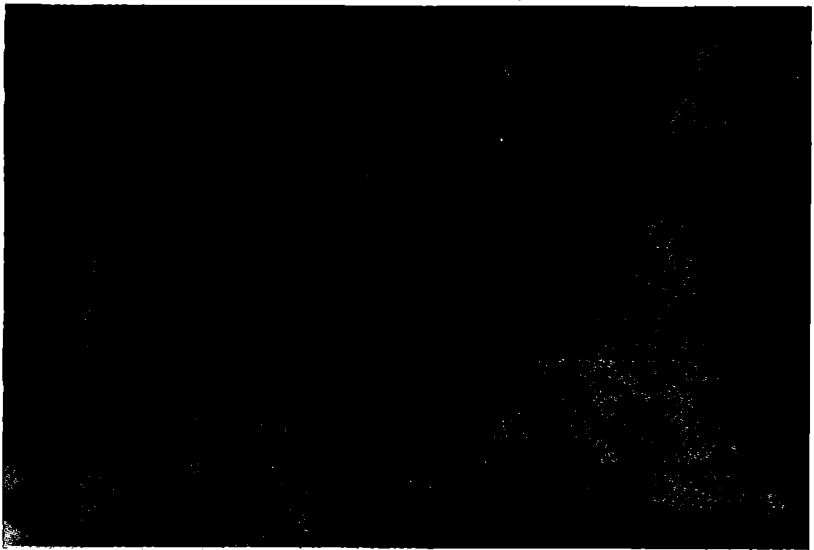

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন থেকে প্রকাশিত 'দি এজ' পত্রিকায় ধিকৃত মুরতাদ লেখিকা তসলিমা নাসরীনের একটি কার্টুন চিত্র। হাতে তার পবিত্র কোরআন। একজন সিজদারত মুসল্লীকে সে পদাঘাত করছে

www.pathagar.com

এখন খবিস কাম না শুনি কোথায়
তাবিজ ছিঁড়িয়া বিবি ওঝারে কিলায়।

ব্রাহ্মণ ভবানন্দ মজুমদারের লেলিয়ে দেয়া অন্নপূর্ণার ঐ উৎপাত ছিলো সম্রাটে বিরুদ্ধে আর পাশ্চাত্যবাদী ও নব্য ব্রাহ্মণদের লেলিয়ে দেয়া তসলিমার উৎপাত হচ্ছে ইসলাম ও সভ্যবোধের বিরুদ্ধে।

এই উগ্র নারীবাদী, নাস্তিক এবং উচ্ছৃংখল যৌনাকামী এই তসলিমা নাসরিন প্রথম স্বামী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, কবি রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহকে। তসলিমা নাসরিন নিজেই গর্বের সাথে এই স্বামী সম্পর্কে বলেছেন- রুদ্রের কুৎসিত সিফিলিস ছিলো এবং রুদ্র তা তসলিমার দেহে অবলীলায় ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন। এরপর তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বামী ছিলেন যথাক্রমে- সাংবাদিক নাইমুল ইসলাম ও সাংবাদিক মিনার মাহমুদ। সুইডেনে কিছুদিন লিভ টুগেদারের পর তিনি 'পেন'-এর প্রায় বৃদ্ধ কর্মকর্তাকেও বিয়ে করেছিলেন ৪র্থ স্বামী হিসেবে। কিন্তু চার চারটি বিয়ে করেও টগবগে যৌবনবতী তসলিমার উদ্দাম শরীরী চাহিদা পূরণ করতে

From:Christiane BESSE

Ms Taslima NASRIN
Fax 880 2 863 360
1/904 Eastern Point
8 & 9 Shantinagar, Dhaka 1217

24th May 1994

Dearest Taslima,

Further to our telephone conversation this afternoon, here is my lastest information.

It seems that, due to an oversight by somebody in our financial department, a cheque of $ 5.144, 21 (the advance payment for LAJJA), dated 15th of April and in your favour was sent directly to your address (instead of a bank order, to your bank account, as per my instructions).

This cheque was cashed and our account debited by the clearing bank in New-York on the 19th of May.

I have asked the BNP (our bank) to fax me the copy of this cheque. I cannot understand what happened unless it was stolen and your signature forged. That is what we want to find out.

The two other payments were made according to my instructions on the 15 and 16 th of May, and have gone to your bank who should have the money very shortly if not already.

Needless to say that I am pursuing my enquiries. I shall talk to our financial comptroller to-morrow to see how to solve the problem.

[illegible] stupid thing should happen at such an inconvenient time.

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে তসলিমা নাসরীনের ঠিকানায় প্রেরিত ক্রিশ্চিয়ান বিসি'র ফ্যাক্সের ফটোকপি। এ ফ্যাক্স থেকে দেখা যায় 'লজ্জা' উপন্যাসের জন্য ঐ ব্যাংক থেকে ৩ দফায় তসলিমাকে মোটা অংকের ডলার পাঠানো হয়েছে। (তথ্যসূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ৮জুন, ১৯৯৪)

www.pathagar.com

পারেনি। ফলে এই কুখ্যাত পূণ্যোদ্যোমে ফ্রি-সেক্সেই ফুল টাইম নিমগ্ন হয়ে যায়। তাই এই পুরুষ বিদ্বেষী তসলিমা পুরুষদের একাধিক স্বামী, মেয়ে বেশ্যালয়ের মতো পুরুষ বেশ্যালয় স্থাপন এবং তসলিমার ভাইয়ের ন্যায় শরীরের কাপড় খুলে প্রকাশ্যে উঠানে বসার, পুরুষের ন্যায় প্যান্টের বোতাম (শাড়ী উঠিয়ে নয়) খুলে প্রস্রাব করার দাবি জানিয়েছে। এ মহিলা আক্ষেপ ও বিক্ষুব্ধতার সাথে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির অসঙ্গতি তুলে ধরেছে। নারীদের জাগ্রত করতে গিয়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদর্শিত ধর্ম ইসলামকে নিয়ে কটাক্ষ ও উপহাস করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।

১৯৯২ সালে তথাকথিত এই নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন লিখেছেন ঃ "সভ্যতার শুরু থেকে সমাজ ও ধর্ম মানুষকে পরিচালিত করেছে, আর সমাজ ও ধর্মের পরিচালক হিসেবে যুগে যুগে পুরুষরাই কর্তৃত্ব করেছে। সমাজ ও রাষ্ট্র তো বটেই, নারীকে সবচেয়ে বেশি অমর্যাদা করেছে ধর্ম। কোনো ধর্মের আশ্রয়ে নারীর ওপর অত্যাচার যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন কিছুটা সহনীয় করে বিধি-নিষেধ আরোপ করবার জন্য নতুন ধর্মের আহবান আছে। বৌদ্ধ ধর্মের শুরুতে নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচবার তাগিদে লাখ লাখ নারী ভিক্ষুণী সংঘে আশ্রয় নিয়েছিলো। জার্মান সমাজ বিজ্ঞানী আগুস্ট বেবেল তাঁর 'উওম্যান ইন দ্য পাস্ট, প্রেজেন্ট এন্ড ফিউচার' গ্রন্থে লিখেছেন- 'খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাব হলে অন্য সব দুর্ভাগাদের মতো নারীরাও তাদের দুরাবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য এই ধর্মের প্রতি খুব আগ্রহী ও অনুরক্ত হয়ে পড়লো।' কিন্তু খ্রিস্টধর্ম নারীর জীবন থেকে দুর্দশা দূর করতে পারেনি। এই ধর্ম নারীকে পুরুষের বশবর্তী হয়ে থাকতে বাধ্য করলো। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বলেছেন- 'জেসাস ক্রাইস্ট নারীর অধিকার বলতে কিছু দেননি। দাসীবৃত্তি ছাড়া নারীর আর কোনো কাজই সমাজে ও ধর্মে নির্দেশিত হয়নি।'

সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির অত্যাচারে বহু নারী ধর্মান্তরিত হয়েছে। হিন্দু ধর্ম থেকে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছে। ইসলাম ধর্মে শিশু হত্যা নিষিদ্ধ, স্ত্রীর মোহরানা, খোরপোষ বাধ্যতামূলক হওয়ায় অনেকেই এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু কোনো ধর্মই নারীকে মানুষের সম্মান দেয়নি।

বিজ্ঞানের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং ভ্রূণের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেও আমরা 'মানুষের অস্থি থেকে মানুষের উৎপত্তি' বিষয়ক বিশ্বাস নির্মূল করতে পারি না। ধর্ম নারীকে বিনিময় পণ্য হিসেবে, দামী সামগ্রী হিসেবে, মূল্যবান দাসী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।" (তসলিমা নাসরিন, নির্বাচিত কলাম)

এভাবে তসলিমা নাসরিন অন্যান্য ধর্মের সাথে মানবতার মহান ধর্ম ইসলামকে একাকার করে নারী নির্যাতনের জন্য ইসলামকে সমভাবে দায়ী করেছেন। বিজ্ঞানকে দৃষ্টান্ত হিসাবে টেনে এনে ইসলামের বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে আঘাত হেনেছে। ইসলাম চৌদ্দশত বছর আগে মানব কল্যাণে যে সব বিধি-বিধান আরোপ করেছেন তা বিজ্ঞানসম্মত বলে আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞানীরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। অথচ এই কুখ্যাত বিকৃত রুচির মহিলা আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধানকে উপেক্ষা ও বিদ্রূপ করে বাস থেকে নেমে ছেলেদের ন্যায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাপড় উঠিয়ে প্রস্রাব করার

www.pathagar.com

অধিকার চায়। পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক আইন কানুনে নারী-পুরুষের অসঙ্গতি প্রসঙ্গে পবিত্র গ্রন্থগুলোর সংশোধন চায়। বিএনপি'র সাবেক মহিলা এমপি ফরিদা রহমানও তসলিমার সুরে সুর মিলিয়ে জাতীয় সংসেদ একই দাবি করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমার একটি গল্প মনে পড়েছে। গল্পটি হলো ঃ

তসলিমার ন্যায় একজন নাস্তিক বুদ্ধিজীবী ছিলো। এ বুদ্ধিজীবী প্রায়ই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করতেন। সৃষ্টির অনেক অসঙ্গতি নিয়ে আল্লাহ্‌র তীব্র সমালোচনা করাই তার কাজ ছিলো। যেমন বিরাট এক কুল গাছে ছোট্ট একটি ফল অথচ মাটিতে নুয়ে পড়া ছোট্ট লাউ গাছে ইয়া বড় বিরাট এক ফল।

একদিন এ বুদ্ধিজীবী প্রকৃতির ডাকে কুল গাছের নিচে বসে যান। সে সময় হঠাৎ একটি কুল বুদ্ধিজীবীর মাথায় পড়ে। কুলটি মাথায় পড়ার পর মুহূর্তেই নাস্তিক বুদ্ধিজীবীর হুশ হয়। তখন সে চিন্তা করে কুল গাছে যদি ছোট্ট কুল না হয়ে লাউ হতো তবে আজকেই আমার জীবন লীলা সাঙ্গ হতো। সুতরাং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি অত্যন্ত নিখুঁত, নির্ভুল ও যথার্থ। মানুষের সীমিত জ্ঞানে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিষয় না বুঝার কারণে অসঙ্গতি খুঁজে সমালোচনা করে। তবে সমকালীন বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিতে এইসব উদ্ভট প্রশ্নের জবাব দেয়া যায়।

জীবতাত্ত্বিক বর্ণনার ভিত্তিতে পুরুষের দৈহিক গঠন সবদিক থেকে মহিলাদের চেয়ে স্বতন্ত্র- এটা তাদের পেশী, রক্ত, হাড়, অন্তর বা মগজ সবকিছুর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। একজন পুরুষের মগজের ওজন একজন মহিলার তুলনায় ১০০ গ্রাম এবং একজন পুরুষের ফুসফুস ৩০০ গ্রাম বেশি ওজন। গড়ে একজন মহিলার তুলনায় একজন পুরুষের দেহের ওজন ৪০০০ গ্রাম অধিক। পুরুষের হাড় অধিক ভারী ও মজবুত। মহিলাদের পেশীসমূহ হালকা-পাতলা ও কমনীয় একজন পুরুষের হৃদপিন্ড একজন মহিলার তুলনায় গড়ে ৫০ গ্রাম বেশি। এ সমস্ত শারীরিক কাঠামোগত পার্থক্যের প্রভাব উভয়ের মানসিকতার ওপর আপতিত হয়। কিছুদিন আগে ড্যানিশ গবেষক গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন যে, মহিলার চেয়ে পুরুষের মস্তিষ্ক কোষ ৪শ' কোটি বেশি। ২০ থেকে ৯০ বছর বয়সী ৯৪টি লাশের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

লন্ডন থেকে এএফপি পরিবেশিত সাম্প্রতিক খবরে বলা হয়েছে, হাজার হাজার কর্মজীবী তরুণী এখন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, আর তা হচ্ছে টাকপড়া। এই তরুণীদের মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে আর এ জন্য দায়ী তাদের দেহে টেস্টোটেরনের মাত্রা বেড়ে যাওয়া। টেস্টোটেরন পুরুষ হরমোন কিন্তু প্রচলিত ধ্যান-ধারণার কর্মক্ষেত্রগুলোতে পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করতে গিয়ে নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রমাণে ইচচ্ছুক মেয়েদের চিন্তা-ভাবনায় ক্রমশ জুড়ে বসেছে পুরুষ ভাবাপন্নতা। ফলে দেহে বাড়ছে পুরুষ হরমোন টেস্টোটেরন।

সানডে টাইমস-এর এক রিপোর্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকায় পোর্টসমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালিত এক জরিপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ৮শ' মহিলার উপর জরিপটি চালানো হয়। যাতে ৩০ শতাংশ উত্তরদাতা

www.pathagar.com

জানিয়েছেন তাদের টাক সমস্যার কথা। লন্ডনের একজন মেডিকেল হেয়ার এক্সপার্ট-এর উদ্ধৃতি দিয়ে খবরে বলা হয়েছে, তিনি এর কারণ হিসেবে দায়ী করেছেন কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতাসুলভ মনোভাব, যে মনোভাব তারা পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবেলায় ব্যবহার করতে গিয়ে নিজেরাই পুরুষদের মতো চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন আর তার ফল হয়েছে এই যে, মেয়েদের দেহে পুরুষ হরমোন বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞ গ্লেন লিয়নস বলেন, সাংবাদিকতা, চিকিৎসা, আইন পেশা বা পাইলট-এরকম প্রতিটি পেশায় মেয়েরা পুরুষ প্রাধান্য হটাতে চাইছে, ফলে তাদের প্রচন্ড পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আর এতে করে তাদের মন-মানসিকতাও পুরুষদের মতো হয়ে যাচ্ছে। লিয়নস্ বলেন, টেস্টোটেরনের মাত্রা কমাতে পারলে মেয়েদের টাক সমস্যার সুরাহা হতে পারে।

জীব বিজ্ঞানের তথ্যানুসন্ধানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, নারী স্বীয় আকৃতি অবয়ব এবং বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হতে আরম্ভ করে অণু-পরমাণু এবং Protein Motecules of tissue cells পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারে পুরুষ হতে পৃথক। যখন গর্বে সন্তানের মধ্যে Sex Fomatin (নারী আকৃতি) হয় সে সময় হতেই নারী জাতির শারীরিক গঠন এমনভাবে করা হয়, যেন সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের যোগ্য হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ের Womb tormofan হতে আরম্ভ করে সাবালক হওয়া পর্যন্ত শরীরের পূর্ণ বিকাশ এই যোগ্যতার পরিপূর্ণতার জন্যই হয়ে থাকে এবং এটাই তার ভবিষ্যত জীবনের পথ নির্ধারণ করে দেয়।

বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর থেকে নারীর মাসিক ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়। শরীর তত্ত্ববিদদের পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানতে পারা যায়, এসময় নারীদের মধ্যে নিম্নোক্ত পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়।

১. শরীরে তাপ সংরক্ষণ শক্তি কমে যাওয়ার ফলে অধিক মাত্রায় শারীরিক তাপ নির্গত হয়ে তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

২. নারী ক্ষীণকায় হয়ে পড়ে। রক্তের চাপ কমে যায়। শ্বাস গ্রহণে পার্থক্য দেখা দেয়।

৩. Protein metablism কমে যায়।

৪. Phosphates এবং Chlorides কম পরিমাণে নির্গত হয় এবং Gareous metablism এর অবনতি হয়।

৫. হজম শক্তি কমে যায়। খাদ্য বস্তু প্রোটিন ও চর্বির ভাগ শরীর গঠনে অপর্যাপ্ত হয়।

৬. শ্বাস গ্রহণের শক্তি হ্রাস পায় এবং বাকশক্তির যন্ত্রাদিতে পরিবর্তন সূচিত হয়।

৭. স্নায়ুমন্ডলী অবসন্ন ও অনুভূতি শক্তি শিথিল হয়।

৮. স্মরণশক্তি কমে যায় এবং কোন বিষয়ে একাগ্রতা থাকে না।

এ সকল পরিবর্তন একজন সুস্থ নারীকে অসুস্থ ও রুগ্ন করে ফেলে। শরীর বিজ্ঞান

www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞ Dr. Amil Nudik Hungker বলেন, এ সময় নারীদের স্নায়ুমন্ডলী উত্তেজিত হয়ে পড়ে। অনুভূতি শক্তি কমে যায়। সুসংবদ্ধ চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা হ্রাস পায় এবং অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়।

লক্ষ্যণীয় যে, মানব দেহের কেন্দ্রস্থল হৃদপিন্ডের ব্যাপারেও নারী ও পুরুষের মধ্যে অনুরূপ পার্থক্য রয়েছে। গবেষণামূলক পরীক্ষায় দেখা গেছে, নারীর হৃদপিন্ড পুরুষদের হৃদপিন্ডের চাইতে ৬০ গ্রাম ছোট ও হালকা। ইউরোপের ভিয়েনা শহরের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক ও ভিয়েনা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডঃ অসওয়াল্ড সোয়ার্জ তাঁর 'যৌন মনোবিজ্ঞান' নামক ইংরেজী বাইয়ের ১৭১ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন তার মর্ম এই যে, "পুরুষের বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে ঘরের বাইরে তার কর্মক্ষেত্রে ও কারখানায়, নারীর বুদ্ধি প্রকাশিত হয় ঘরের কোণে। তাই তারা পুরুষের মতো সংগঠন কার্য করতে সক্ষম নয়। তাদের সমিতি ক্লাব বা লাইব্রেরী একটি হাস্যস্পদ ব্যাপার। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে অন্যান্য গুণ যথা- ধৈর্য্য, উপস্থিত বুদ্ধি, মায়া, মমতা ইত্যাদি গুণ বেশি মাত্রায় দিয়ে অন্যান্য গুণের অভাবের ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছেন।

খ্যাতনামা ইংরেজ পন্ডিত স্যামুয়েল স্মাইল্‌স-এর অভিমতও উদ্ধৃতি করছি। তিনি লিখেছেন ঃ যে বিধান নারী সমাজকে শিল্প-কারখানায় কাজ করার অনুমতি দান করে, তা দ্বারা দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যতোই উন্নতি করুক না কেন, এ ব্যবস্থার পরিণামে গার্হস্থ্য জীবন নিশ্চিতভাবেই টলটলায়মান হয়ে পড়েছে, এই ব্যবস্থা সাংসারিক জীবন যাপন পদ্ধতিকে আক্রান্ত করেছে, সংসার ও পরিবারের সুসজ্জিত ইমারতকে ধ্বংস করে সামাজিক বন্ধনগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে, এই ব্যবস্থা স্ত্রীকে স্বামী থেকে এবং সন্তান-সন্তুতিকে তাদের আত্মীয়-স্বজন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এমন এক অস্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হলো নারীর নৈতিক অবস্থার অধঃপতন। কারণ প্রকৃতপক্ষে নারীদের স্বভাবত কর্তব্য হলো গার্হস্থ্য জীবনের দায়িত্বগুলো পালন করা, নিজের বাড়ি-ঘরের সাজ-সজ্জা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা, সন্তানদের সুষ্ঠু পরিচর্যার ব্যবস্থা করা, সন্তানদের সুষ্ঠুভাবে লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা এবং সংসারের ভিন্নমুখী প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সংসার জীবনের সুষ্ঠু পরিচালনা ও মিতব্যায়িতা গ্রহণ করা। কিন্তু কল-কারখানাগুলো নারীদেরকে এই সমস্ত দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

এখন ঘর আর ঘর নেই, সন্তান-সন্তুতি আর প্রয়োজনীয় উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা পায় না, বরং অযত্নে পড়ে থাকে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসায় ভাটা পড়ে গিয়েছে; নারীকে আজ আর খোশ মেজাজ স্ত্রী পুরুষের প্রিয়তমা বলেই মনে করা হয় না, বরং পরিশ্রমের কাজ করার ব্যাপারে সে আজ পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে; নারীকে আজ এ সকল প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হয়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক ও নৈতিক মানের অবনতি ঘটায়, অথচ মানসিক ও নৈতিক মানের ওপরই মর্যাদার সংরক্ষণ নির্ভরশীল।

পাশ্চাত্য জগতের নারী সমাজ যে প্রাচ্যের নারীদের তুলনায় বহুগুণ বেশি কষ্টকর দুঃখ দৈন্যের মধ্যে অতি করুণ অবস্থায় কালাতিপাত করে উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে

www.pathagar.com

তাতে আর কোন রকম সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি রয়েছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং মান-সম্মানের প্রতি স্বামী দায়িত্বশীল না হলে সম্পর্কচ্ছেদ করার অধিকার নারীর হাতে থাকে। সেখানে নারী তা খরপোষ জোগাড় করতে যাবে কেন? প্রগতিবাদীরা বলেছে– শিক্ষার ক্ষেত্রে নর-নারীর সমান অধিকার দেয়ার কথা। ইসলাম তো তা অনেক আগেই দিয়েছে। জ্ঞানার্জন করা নর-নারীর কোন তফাৎ নেই। আমল অনুপাতে নারী পুরুষ সমান। তবে শিক্ষার নামে জঙ্গলে গিয়ে অবাধে নর-নারী বিচরণের মতো বেহায়ামী চতুষ্পদ জন্তুর মতো সমান অধিকার ইসলাম দেয়নি। চলাফেরার অধিকারের ক্ষেত্রেও যত্রতত্র যখন তখন যাওয়া আসার সুযোগ দেয়নি। কারণ নারীদেরকে আল্লাহপাক দৈহিকভাবে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। তাদের দেহে লাভন্য আছে যা, পুরুষকে আকৃষ্ট করে। অবাধ বিচরণের সুযোগ দিলে নারীর নারীত্ব বিপর্যস্ত হবে, ইসলাম তাদেরকে অবাধ চলাফেরা না করে সীমিতভাবে চলাফেরার অধিকার দিয়েছে। পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় পাগলপ্রায় হয়ে কথিত প্রগতিবাদীরা বলে থাকে নারীদেরকে রোজগারের সমান সুযোগ দিতে, চাকরিতে সমান পদ দিতে। পক্ষান্তরে ইসলাম এখানে নারীদের সন্তান ধারণ ও উৎপাদনজনিত কষ্টের কথা বিবেচনা করে রোজগারের তথা বাইরের কষ্টের কাজের দায়িত্ব পুরুষের উপর চালিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমারা এই আরামটুকুও নারীদেরকে দিতে চায় না। অধিকারের নাম করে নারীদেরকে সারাদিন পরের ঘরের চাকরানী বানিয়ে রাখতে চায়। স্বামীর ঘরে স্বামীর খেদমতে তারা দাসী বাঁদির গন্ধ পায়। কিন্তু মোটর সাইকেল নিয়ে অথবা একটা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে অথবা ফাইলপত্র বগলে নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাওয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরাকে সুনামের কাজ মনে করে। আক্কেল আর কাকে বলে? পশ্চিমা মগজের বিষফল এটাই। শ্লোগান দেয় ঘরের বেড়া ভাঙব বলে। তাইতো আজ অধিকার আদায়ের নাম নিয়ে নারীরা রাস্তাঘাটে, বন-জঙ্গলে প্রকাশ্যে হচ্ছে ধর্ষিতা।

সুতরাং নারী-পুরুষের দৈহিক গঠন প্রণালী যেমন ভিন্ন ঠিক তেমনি তাদের কর্ম পদ্ধতির ধারাও ভিন্ন। একজন পুরুষ যে কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে সক্ষম সেটা একজন নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। আবার একজন নারীর পক্ষে যে কাজ সুচারুরূপে সমাধা করতে সম্ভব একজন পুরুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আধুনিক বিজ্ঞানও কোরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানকে সমর্থন করছে। সুতরাং যারা সমঅধিকারের নামে জোর করে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ব্যত্যয় ঘটাতে চান তাহলে হিতে বিপরীতই হবে। যা বর্তমানে হচ্ছে।

ইসলামের মূল আদর্শটি হলো পুরুষের মতো নারীকেও মানব হিসাবে গণ্য করা। অর্থাৎ নারী-পুরুষ উভয়ই মানব এবং একই অধিকারে অধিকৃত। খৃষ্ট লোক বা অন্যান্য ধর্মবাদের ন্যায় এখানে পুরুষ আত্মা বা নারী আত্মার এরূপ শ্রেণী বিন্যাস করা হয় না। তাই ইহুদী, খ্রীস্টান, ব্রাহ্মণ্যবাদী ও এদেশের কতিপয় বাম ও রামপন্থী দালালেরা নারী স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় হিসেবে বেছে নিয়েছে মানবতার মহান ধর্ম পবিত্র ইসলামকে।

এই লেখিকা তসলিমা নাসরিন ইউরোপীয় সংসদের গ্রীন পার্টিগুলোর উদ্যোগে

www.pathagar.com

আয়োজিত 'পি-৯৭' সম্মেলনে বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার চায় না আমি দেশে ফিরে যাই। যে মোল্লারা কথায় কথায় মেয়েদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে সরকার তাদেরও শাস্তি দেয় না। অথচ আমাকে দুঃসহ নির্বাসনে দিন কাটাতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমি অবসাদে ভুগছি। লেখার কাজে ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে। ব্রাসেলস-এ বাংলাদেশসহ বিশ্বের সাতটি অতি দরিদ্র দেশের মহিলাদের দুর্দশার বিবরণ তুলে ধরতেই ১৪ জুলাই '৯৭ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ইউরোপে আশ্রয়রত তসলিমা নাসরিন সম্মেলনে বলেন, ইসলামী আইন নারীর উন্নতিতে বড় বাধা। মেয়েদের মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশসহ অতি দরিদ্র সাতটি দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইসলাম ও মৌলবাদ নারী স্বাধীনতার পরিপন্থী।

ইসলামী আইনে ব্যাভিচারী নারীকে অর্ধেকটা মাটিতে পুঁতে পাথর ছুঁড়ে মারা হয়। তসলিমা নাসরিন আরো বলেন, বাংলাদেশে মৌলবাদীরা বিভিন্ন বেসরকারী (এনজিও) সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজে বাধা সৃষ্টি করে। পি-৭ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের একজন প্রতিনিধি। তিনি মহিলা সম্পর্কিত তসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিদ্বেষী বক্তব্যকে পাশ কাটিয়ে মুখ রক্ষার স্বার্থে নারী কল্যাণের কিছু ফিরিস্তি দিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশ সরকার এখন মহিলাদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে। শ্রম ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলাদের সমঅধিকারের জন্যে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। অথচ ইসলাম ও নারী প্রসঙ্গে তসলিমার বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন সোমালিয়ার প্রতিনিধি ফৈয়জ জামা মোহাম্মদ। তিনি বলেছেন, ইসলামী দেশগুলোতে নারী নিপীড়নের জন্যে ইসলাম ধর্ম দায়ী নয়। কিছু মানুষ ইসলাম ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নারী স্বাধীনতা হরণ করেছে। (বাংলাবাজার, ১৬/৭/৯৭)

এখানে উল্লেখ্য, ইউরোপীয় সংসদ তসলিমার লেখার স্বীকৃতি হিসাবে তাকে ১৯৯৫ সালে 'শাখারভ' পুরস্কার এবং ভারতের আনন্দবাজার গোষ্ঠী সম্ভবতঃ ১৯৯২ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' প্রদান করে ইসলাম বিরোধিতার জন্য সম্মানিত করেছে। সুতরাং এই তৃতীয় শ্রেণীর লেখিকা নোংরা ও কুৎসিত সাহিত্যের নামে কাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করছেন তা বলাই বাহুল্য।

আমাদের দেশে কতিপয় বুদ্ধিজীবী আছেন। ইসলামের রীতি-নীতিকে নিয়ে সমালোচনা করলে, পবিত্র কোরআনকে নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা লিখলে সেটা হয় মুক্ত চিন্তার অধিকারী। আর ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে কেউ যদি এরূপ তথাকথিত মুক্ত চিন্তার অধিকারীদের সমালোচনা করে তাহলে এরা হন এসব বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রতিক্রিয়াশীল, ফতোয়াবাজ, সাম্প্রদায়িক, রাষ্ট্রদ্রোহী এবং স্বাধীন চিন্তায় বাধাদানকারী।

বর্তমান বিজ্ঞান যতো সামনের দিকে এগুচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং রাসুল (সঃ) এর রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে মানব সমাজ তথা বিজ্ঞানীদের কাছে। আর সে যুগেও সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, লিঙ্গ, জীবজন্তু বা কীটপতঙ্গকে দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করলে তা ধর্মান্ধ বা মৌলবাদ হয়না। অথচ যা বর্তমান বিজ্ঞান সাক্ষ্য দিচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং রাসুলের সুন্নতের পক্ষে সেই পবিত্র কোরআন এবং রাসুল (সঃ) এর কথা বললে অপবাদ দেয়া

www.pathagar.com

হয় মৌলবাদ বা ধর্মান্ধ বলে। এসব তথাকথিত প্রগতিবাদীরাই নারী মুক্তির, নারী স্বাধীনতা নিয়ে খুবই সোচ্চার। সভা-সমাবেশে নারী পক্ষ নিয়ে এদের মুখে খই ফোটে। এসব কবিদেরকে আবার এইডস প্রতিরোধ সমিতির মিছিলেও দেখা যায়। এসব কবি-বুদ্ধিজীবীরা কতিপয় বামপন্থী পত্র-পত্রিকায় ও বই পুস্তকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফতোয়াবজাদের দায়ী করে ইনিয়ে বিনিয়ে কাল্পনিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প-কবিতা লিখছে। অন্যদিকে এরাই একই পত্র-পত্রিকায় যুবক-যুবতীদের চরিত্র হননমূলক গল্প কবিতা লিখছে। যা দৃষ্টান্ত হিসেবে এই বইয়ে যৌনাচার অধ্যায়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

অনেকদিন পূর্বে পত্রিকায় একটি সংবাদ পড়েছিলাম। সংবাদটি ছিলো মহাখালী মসজিদের ইমামকে নারী ধর্ষণের দায়ে মসজিদ কমিটি চাকরি হতে বরখাস্ত করেছে। পরবর্তীতে সেই বহিষ্কৃত ইমাম হয়ে যান ঘাদানিক কমিটির প্রভাবশালী নেতা। তাকে দেখেছি বাম, রাম ও ঘাদানিকদের নিয়ে মোনাজাত করতে। সে মোনাজাতে আল্লাহ্‌র নিকট ধর্ম ব্যবসায়ীদেরকে এ জমিন হতে উৎখাত এবং অমুকের তমুকের খপ্পর হতে ইসলামকে রক্ষা করার প্রার্থনা জানিয়েছে। আরেক মাওলানা আছে তার বিদঘুটে চেহারাই তাকে ক্রিমিনাল হিসেবে চিহ্নিত করে। এই ভন্ড মাওলানা সব সরকারের আমলে দালালী করেছে। এই মাওলানা নামধারী কতিপয় ভন্ডরা পত্র-পত্রিকায় নানা ঢংয়ে, নানা রংয়ে, ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা, মৌলবাদী, ফতোয়াবাজী, পরিবার পরিকল্পনা, নারী নির্যাতন, নারী মুক্তি প্রসঙ্গে প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখছেন।

আন্তর্জাতিক চক্র এনজিও

বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ করার সাহস আন্তর্জাতিক এনজিও চক্র এবং তাদের এদেশীয় দালাল দোসরদের নেই। তাই বৃটিশ আমলের ভ্রান্ত শিক্ষানীতিতে সৃষ্ট অপরিপক্ক, আনাড়ী এবং ইসলাম ধর্ম বিষয়ে অপর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী কতিপয় মাওলানা মৌ-লোভী বা ইমামের কর্মকান্ড নিয়ে গোটা ইসলামী বিধি-বিধান এবং ইসলাম প্রিয় জনগণকে নিয়ে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে ও পাতাবাহারী পত্র-পত্রিকায় কটাক্ষ ও বিদ্রূপ করছে। নানা কাল্পনিক গল্প-কাহিনী প্রকাশ করে জনগণকে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে বিষিয়ে তুলছে এবং বিজ্ঞ ও জ্ঞানী আলেমদের সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্ত সৃষ্ট করছে। এখানে একটি পাতাবাহারী জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া কিছু তথাকথিত ফতোয়াবাজীর ঘটনা সম্পর্কে ১৩/১১/৯৮ তারিখে "ফতোয়ার শিকার কতিপয় প্রাণ" শিরোনামে জনৈকা পারভীন সুলতানা লিখেন ঃ

সমাজের সব অন্যায়-অবিচার-কুসংস্কার-গোঁড়ামির যূপকাষ্ঠের বলি হতে হয় মহিলাদের। পাশ্চাত্যে বহু আগে প্রচলিত উইচ হান্টিংয়ে যেমন ডাইনি বলে পুড়িয়ে মারা হতো অনেক নিরপরাধ মেয়েকে, তেমনি প্রাচ্যের সমাজে বিভিন্ন অনুশাসন ও ধর্মের নামে অত্যন্ত নির্মম ও ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে বহু নির্দোষ নারীকে।

www.pathagar.com

আজও তা চলছে। ফতোয়ার নামে মহিলাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে ভয়ঙ্কর সব শাস্তি। সাম্প্রতিককালে ১৯৯৩ সালে সিলেটের মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ থানার ছাতকছড়া গ্রামে নূরজাহান নামক ২২ বছরের তরুণীর ওপর এ ধরনের অন্যায় বিচার চাপানো ও পরবর্তীতে লজ্জা-অপমানে তার আত্মহত্যার ঘটনাটি সারা সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফতোয়াবাজরা গ্রেফতার হয়। তাদের শাস্তি দেয়া হয়। এরপরও ফতোয়াবাজি বন্ধ হয়নি বরং দিনের পর দিন তা বাড়ছে। পারভীন সুলতানা যে সব ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো ঃ

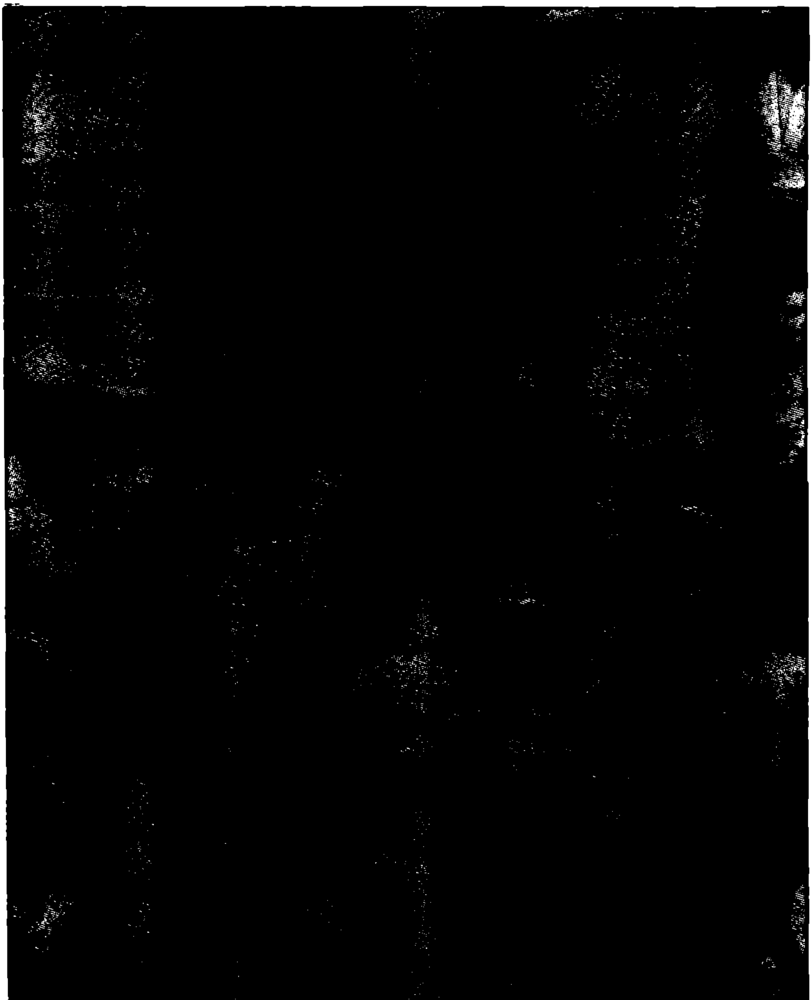

'মৌলবাদ ফতোয়াবাজদের রুখে দাঁড়াও' প্লাকার্ড হাতে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের নামে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত সমাবেশে এরা কারা? এরা কি গার্মেন্টস শ্রমিক? না-কি এরা বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত? কি এদের পরিচয়?

www.pathagar.com

নূরজাহান ঃ ১৯৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে সিলেটে নূরজাহানের দ্বিতীয় বিয়ে নাজায়েজ বলে ফতোয়া দেয় স্থানীয় মৌলভী মওলানা মান্নান। প্রথম স্বামীর তালাকনামা দেখানো হলেও গ্রাম্য সালিশী নূরজাহানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে, সে অবৈধভাবে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বাস করছে। এ কারণে স্বামীসহ তাকে কোমর সমান গর্তে দাঁড় করিয়ে ১০১টি পাথর ছুঁড়ে মারা হয় ও নূরজাহানের মা-বাবাকেও ১০০টি দোররা মারা হয়। শাস্তি শেষ হওয়ার সাথে সাথেই অপমানে ঘটনাস্থল থেকে আঁচলে মুখ ঢেকে ঘরে ফিরে এসে নূরজাহান কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করে।

ফিরোজা ঃ ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ থানার ষোড়শী ফিরোজার সাথে উদয় মন্ডল নামক এক যুবকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে– এই অভিযোগে স্থানীয় মৌলভী আব্দুর রহিমের ফতোয়া অনুযায়ী তাকে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে ঝাটা পেটা করা হয়। লজ্জায়-অপমানে ফিরোজা আত্মহত্যা করে।

দুলালী ঃ ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে সন্তান প্রসবের ৭ দিন পর নোয়াখালীর দুলালীকে ১০১ দোররা মারার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দুলালীর সাথে দু'সন্তানের জনক এক প্রভাবশালী ব্যক্তি অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুললে দুলালী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। গ্রাম্য সালিশীতে ওই ব্যক্তির শাস্তির কথা বলা হলেও পরে তা প্রত্যাহার করে শুধু দুলালীর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। পরে স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সালিশী শাস্তি দিতে পারেনি। তবে ঘটনাটি খুব আলোচিত হয়।

পারভীন ঃ ১৯৯৪ সালের মার্চে কসবার সীমান্তবর্তী মাদলা গ্রামে পারভীনকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে মানিক মিয়া। পারভীন চিৎকার করলে মানিক ধরা পড়ে। গ্রাম্য সালিশী বসে যেখানে ফতোয়া অনুযায়ী মানিককে ৪ হাজার টাকা জরিমানা, ৫০টি দোররা মারার সিদ্ধান্ত ও গলায় গামছা বেঁধে ঘোরানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু মসজিদের ইমাম আগের সালিশীর বিরুদ্ধে ঘরোয়া বৈঠক করে বলে, শরিয়ত অনুযায়ী পারভীনকে ২০ দোররা ও তওবা পড়ানো হবে। রাগে-দুঃখে পারভীন বিষ পান করে আত্মহত্যা করে।

স্বপ্নাহারা ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা থানার মেয়ে স্বপ্নাহারা ধর্ষিত হলে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। সন্তান প্রসবের পর ১০০ দোররা মারা হবে, এই ফতোয়া প্রদানের পর প্রশাসন ও নারী সংগঠনের সহযোগিতায় তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করা হয়।

বিউটি ঃ সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার সোনারখাড়া ইউনিয়নের মৌহার গ্রামের মেয়ে বিউটিকে ধর্ষণ করে প্রভাবশালী ব্যক্তি আব্দুল মান্নান। গ্রাম্য সালিশীর কাছে বিচার চাইলে তারা গড়িমসি করে। তখন মান্নানের বিরুদ্ধে বিউটির স্বামী মামলা করলে ক্ষিপ্ত হয়ে উল্টা পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক করায় মসজিদের ইমাম মৌলভী সামসুল বিউটিকে ১০১ বেত্রাঘাত, তওবা পড়ানো ও মান্নানের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেয়ার ফতোয়া জারি করে। মনের দুঃখে বিউটি নিজ ঘরে বিষপানে আত্মহত্যা করে। ঘটনাটি ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসের।

রুমা ঃ ১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসের আরেকটি ঘটনা। কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার ডালা গ্রামে রুমা পারভীন প্রেম করে বিয়ে করে শাহজাহানকে। পারিবারিক চাপে

www.pathagar.com

শাহজাহান বিয়ের দশদিন পর রুমাকে তালাক দেয় এবং তার পরিবার প্রচার চালায় যে, রুমার ছোট বোন আফরোজার সাথে শাহজাহানের পূর্বে বিয়ে হয়। গ্রাম্য সালিশী বসে এবং রায় দেয়া হয় যে, আফরোজার 'কথিত বিয়ে' বজায় থাকবে এবং সে শাহজাহানের সাথে ঘর করবে। রুমা-শাহজাহানের বিয়ে বাতিল হবে এবং রুমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। মনের দুঃখে রুমা বিষপানে আত্মহত্যা করে।

শাহিদা ঃ শাহিদার প্রথম স্বামী সাত বছরের কন্যাকে রেখে পালিয়ে গেলে জনৈক রাজ্জাকের সাথে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে- এই অভিযোগে সাভারের ইয়ারপুর ইউনিয়নের জামগড়া এলাকায় '৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে গ্রাম্য সালিশীতে শাহিদাকে একশ' দোররা মারা হয়।

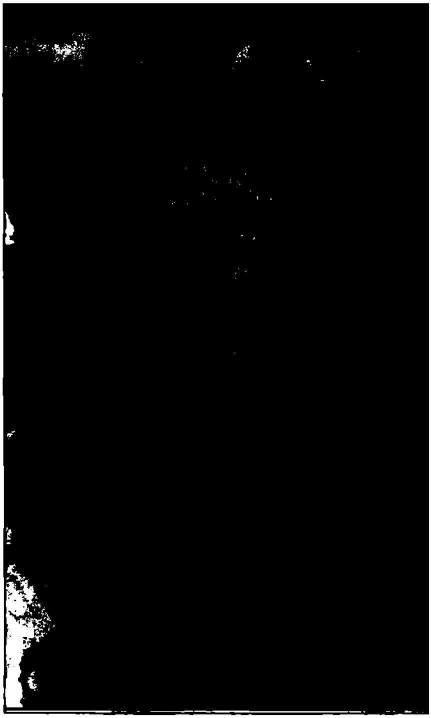

এনজিওদের পৃষ্ঠপোষকতায় তথাকথিত মৌলবাদ ও ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে একদল মহিলা

জুলেখা ঃ সাতক্ষীরায় জুলেখার পরিবারের সাথে একটি পুকুরের মালিকানা নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে বিরোধ হলে প্রতিবেশীরা জুলেখার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করে। মসজিদের ইমাম মওলানা হাবিবুর রহমান জুলেখাকে ১০১ দোররা মারার ফতোয়া দেয়। ঘটনাটি '৯৪ সালের অক্টোবর মাসে সংঘটিত হয়।

মঞ্জিরা ঃ ১৯৯৪ সালের অক্টোবরের ঘটনা। রাজশাহীর একটি গ্রামে মঞ্জিরা নামে এক তরুণীর সাথে লালন হোসেন নামক এক যুবকের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঘটনাটি প্রকাশ পেলে গ্রাম্য সালিশীতে লালনকে ২ হাজার টাকা জরিমানা ও মঞ্জিরাকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করা হলে মঞ্জিরা আমগাছে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে।

হাজেরা ঃ ১৯৯৪ সালের নবেম্বরে কুড়িগ্রামের উলিপুর থানায় ধর্ষণের কোন প্রমাণ না পাওয়ায় ধর্ষিতা হাজেরাকে ৮০ দোররা মারার শাস্তি ঘোষণা করে গ্রাম্য সালিশী চারটি বাঁশের কঞ্চি একত্রে বেঁধে তাকে দোররা মারা হয়। এর কিছুদিন আগে হাজেরার গর্ভপাত হয়। হাজেরা দোররা মারার সময় অচেতন হয়ে পড়ে।

রীনা ঃ ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে ফেনীর ফুলগাজী থানার আনন্দপুর ইউনিয়নে রীনা নামের এক তরুণী এক যুবকের সাথে ঘনিষ্ঠতার ফলে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। গ্রাম্য সালিশীতে মৌলভী ফতোয়া দেয় ১০১ দোররা ও তওবা করাতে হবে রীনাকে এবং রীনার পরিবারকে ভোজের ব্যবস্থা করতে হবে। লোকলজ্জার হাত থেকে রক্ষা পেতে

www.pathagar.com

রীনা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।

মনোয়ারা ঃ ১৯৯৫ সালের জানুয়ারীতে হবিগঞ্জের বানিয়াচং থানায় মনোয়ারাকে যৌতুকের জন্য অত্যাচার করায় মনোয়ারা স্বামীকে তালাক দেয়। এই অপরাধে গ্রাম্য সালিশী তাকে ও তার বাবাকে ১০০ দোররা মারার হুকুম জারি করে।

জোহরা ঃ মানিকগঞ্জের ঘিওর থানার জোহরার গরু এক ব্যক্তির ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেললে গ্রাম্য সালিশী বসে। বিচার জোহরার মনোপূত না হওয়ায় সে প্রতিবাদ করে, এই অপরাধে সালিশীর বিচারকরা জোহরার স্বামীকে নির্দেশ দেয় জোহরাকে জুতাপেটা করতে। ক্ষোভে-দুঃখে জোহরা বিষপান করে আত্মহত্যা করে। '৯৫ সালের মার্চের ঘটনা এটি।

রাজিয়া ঃ '৯৫ সালের এপ্রিলের আরেকটি ঘটনা। পিরোজপুরে রাজিয়ার স্বামী শ্যালিকাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। কিছুদিন পর ঘরে ফিরে আসে। গ্রাম্য সালিশী রাজিয়া ও তার স্বামী দু'জনকেই দোররা মারে। অপমানে-দুঃখে রাজিয়া আত্মহত্যা করে।

নূরজাহান ঃ সাভারের নূরজাহান ও তার স্বামী কৃষক ফজলুর মধ্যে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য কলহ বাঁধে। রাগের মাথায় তালাক দিয়ে আবার ঘর-সংসার করার অপরাধে দু'জনকে গ্রাম্য সালিশীর মাধ্যমে মাটিতে পুঁতে দোররা মারে। ঘটনাটি '৯৫ সালের নভেম্বরের।

সাবিহা ঃ মির্জাপুর থানার মোল্লা রাগের মাথায় স্ত্রী সাবিহাকে মুখে তালাক বলে সাথে সাথে ভুল বুঝে আবার সাবিহার সাথে সংসার করায় গ্রাম্য সালিশী ক্ষিপ্ত হয় এবং সাবিহাকে হিল্লা করতে বলে। ঘটনাটি ১৯৯৭ সালের।

ফাজিলা ঃ মেহেরপুরে ফাজিলার ব্যাপারে একই ঘটনা ঘটে ঐ বছরেরই মার্চ মাসে।

ওহাব ঃ একই বছর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওহাব প্রগতিশীল বই পড়ায় টাঙ্গাইলে মৌলভীর ফতোয়া অনুযায়ী তাকে গলায় জুতা পরিয়ে সারা গ্রাম ঘোরানো হয়।

চট্টগ্রাম ঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এক ওয়ার্ডে ফতোয়াবাজির জোরে ২৭ মুসলমানকে কাফের ঘোষণা করা হয় এবং স্ত্রীরা তালাক হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ব্যাপারটি তখন খুব আলোড়ন সৃষ্টি করে।

শেফালি ঃ সিরাজগঞ্জের ধর্ষিতা গৃহবধূ শেফালিকে গ্রাম্য সালিশীতে দোররা মারা হয়। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ঘটনাটি ঘটে।

সালেহা ঃ একই বছর কিশোরগঞ্জে ৩ সন্তানের জননী সালেহা বেগমকে ব্যাভিচারের অভিযোগে ১শ' ঘা দোররা ও ১শ' বার কান ধরে ওঠা-বসা করতে হয় মওলানার এক ফতোয়ার জোরে।

নাজনীন ঃ ঢাকার মধ্য বাড্ডায় এক মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও স্থানীয় কাজীর দেয়া ফতোয়ায় ২ মাসের সন্তানসহ নাজনী স্বামী মিজানের ঘর করতে পারেনি কিছুদিন। রাগের মাথায় মিজান তালাক বলায় মৌলভীরা তাকে হিল্লা করার আদেশ দেয়। পরে অবশ্য ব্যাপারটি মিটে যায় অন্য মৌলভী ও নারী সংগঠনের সহযোগিতায়।

www.pathagar.com

কোহিনূর ঃ এ বছরের সবচেয়ে সাড়া জাগানো ফতোয়াবাজের ঘটনা ঘটে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায়। সেখানকার এক মেয়ে কোহিনূরের প্রথমে বিয়ে হয় খালেক নামক এক যুবকের সাথে। যৌতুকের জন্য স্বামীসহ শ্বশুর বাড়ির লোকজন অত্যাচার চালালে সে স্বামীকে তালাক দেয়। গত মাসে বিয়ে করে রশিদকে। এই বিয়ে মেনে নিতে পারেনি গ্রামের মাতব্বররা। গ্রাম্য বিচারের আয়োজন করে দু'জনকে ১০১ দোররা ও দু'জনের মাথা ন্যাড়া করে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। শত শত লোকের সামনে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। অপমান সহ্য করতে না পেরে কোহিনূর ও রশিদ দু'জনই আত্মহত্যা করে।

ফেরদৌস ঃ সন্তানদের শিক্ষককে ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে বেপর্দা হওয়ার অপরাধে নোয়াখালীর সুধারামের ৪৫ বছর বয়স্ক জান্নাতুল ফেরদৌসকে ৩০ দোররা মারা হয়।

উপরোক্ত ঘটনাগুলোর অধিকাংশই সাজানো ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এর অনেক তথ্য প্রমাণ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এনজিওরা স্থানীয় প্রভাবশালী মাতব্বরদের সহায়তায় অর্ধশিক্ষিত মসজিদের ইমাম বা মূর্খ সুন্নতী লেবাসধারী ব্যক্তিদের আলেম সাজিয়ে ফতোয়াবাজির নাটক সৃষ্টি করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃন্য অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। একই পত্রিকায় ২/১/২০০১ তারিখে

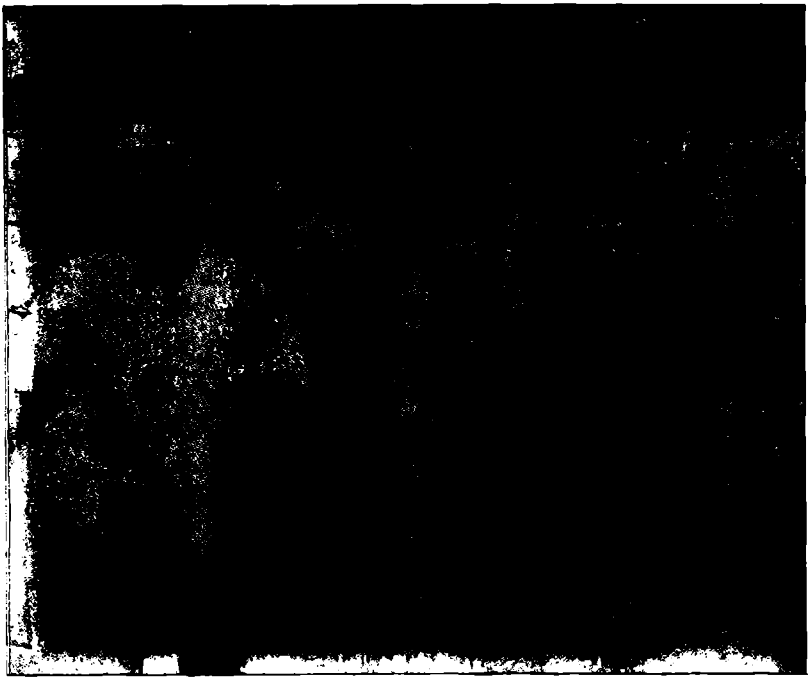

এই ছবিটি ১৯৭২ সালে তোলা। আমেরিকান নাপাম বোমায় ঝলসে যাওয়া ভিয়েতনামের বালক-বালিকারা। যা সেদিন বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছিলো ধিক্কারে ও ঘৃণায়। আজকে তারাই নারী ও শিশু অধিকারের এক নম্বর প্রবক্তা

www.pathagar.com

প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়, "গত সাড়ে ৪ বছরে দেশে 'ফতোয়াবাজির' ঘটনা ঘটেছে ১৩৬টি। ফতোয়ার শিকার হয়ে লজ্জায়-ঘৃণায় কিংবা দোররা মারার পর কিংবা ফতোয়ার বিধান মেনে গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে মারা গেছেন ১৭ জন।" উক্ত রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, ১৩৬টি ফতোয়াবাজির ঘটনার মধ্যে ১৬টি ছিলো হিল্লা বিয়ের, ৬০টি দোররা মারার, ২২টি পরিবারকে একঘরে করার, ১১টি দম্পতিকে তালাক দিতে বাধ্য করার এবং অবশিষ্টগুলো মাটিতে পুঁতে পাথর মারার ঘটনা। উল্লেখিত ঘটনা ও তথ্যগুলো কতকটা বস্তুনিষ্ঠ এ নিয়ে জনমনে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সন্দেহ যে অমূলক নয় নিম্নে উল্লেখিত ঘটনাগুলোই প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এখানে সব ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। তবে উল্লেখিত ঘটনার অধিকাংশই অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সাজানো নাটক তা প্রমাণের জন্য কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না।

গত বছর উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলেম ফুলতলীর পীর সাহেবের বিরুদ্ধে নারীঘটিত ব্যাপারে একটি জাতীয় দৈনিকে চাঞ্চল্যকর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে আরেকটি জাতীয় দৈনিক একটি বস্তুনিষ্ট রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টে এনজিও তেরেসা কর্মী হুসনা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন- আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। মরে গেলেও আর এনজিওতে নয়। মাত্র ৭শ' টাকা বেতনে নিয়মিত স্কুলে গেছি। হঠাৎ একদিন, হ্যাঁ ১৫ মার্চ '৯৮ তেরেসা অফিসে যাই। চুনু বলেছিল, ট্রেনিং হবে। গিয়ে দেখি শুধু চুনু। আর কেউ নেই। বললাম, ট্রেনিং তো, কেউ আসেনি কেনো? চুনু তখন আমাকে এনজিও তেরেসার গার্ড বশিরের কক্ষে নিয়ে গেল। তারপর বশিরের বিছানায় শুইয়ে আমাকে জোরপূর্বক ইয়ে.... (ধর্ষণ) করল। আমি তখন চিৎকার করলাম, কাঁদলাম। কেউ আসেনি। এভাবে ৪ দিন আমাকে নানা অজুহাতে খবর দিয়ে অফিসে নিয়ে ভোগ করে। আমি ভাবতাম, অফিসে তো অন্যরাও আসবেন। কিন্তু গিয়ে দেখি কেউ নেই। অবশ্য শেষ দিন গার্ড বশির ছিলেন। চুনু তাকে চা আনতে পাঠিয়ে দেয়। এসব কথা আমি ভয়ে-লজ্জায় কাউকে বলিনি। শুধু চুনুকে বলতাম, আমি স্কুল চালাতে পারব না, সবকিছু সমঝে নাও। সে বলতো, তোমাকে আইন সালিশীর কাজ পাইয়ে দেব। বেতন অনেক বেড়ে যাবে। এই বড় বড় আশা দিয়ে আমাকে... পরে যখন আমার ইয়ে.... (গর্ভপাত) হলো তখন চুনু আমার দুই সহকর্মী হেনা ও রত্নাকে দিয়ে একটি চিঠি পাঠায়। আমি পড়েই চিঠি ছিঁড়ে ফেলি। সেই চিঠিতে চুনু লেখে, আমি যেন হিঙ্গাইর কুড়ির পীর সাহেবের (লুৎফর রহমান) নাম বলি। সে সাংবাদিক পাঠাবে। সাংবাদিকের কাছেও যেন আমি পীর সাহেবের নাম বলি। হেনা ও রত্না বলে যায়, স্যারের কথা (চুনু) বলো না, বললে আমরা বিপক্ষে চলে যাব। পরে সাংবাদিক এসেছিলেন। নাম আবুল খায়ের। তাকে চুনু এক হাজার টাকা খাইয়েছে। আমিও সাংবাদিকের কাছে এবং আব্বার কাছে পীরের নাম বলি। আম্মা ৩ মাস আগে মারা গেছেন। তিনি অসুস্থ থাকতে পীর সাহেব আসতেন। এটা চুনু দেখেছিলো।

এ সম্পর্কে হুসনার বাবা বলেন ঃ হুসনার পিতা সখাওয়াত আলী ৯০ বছরের বুড়ো জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। চোখের পানি এখন তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। হুসনারা ৫ বোন, ১ ভাই। ৪ বোন বিবাহিতা। ভাইও বিয়ে করে এখন আলাদা সংসার। হুসনার বাবার এক কথা- আপনারা বিচার করে দিন। বিপদে পড়েই

www.pathagar.com

তো মেয়েকে এনজিও স্কুলে চাকরিতে দিয়েছিলাম। বিশ্বাস করেই তো দিয়েছিলাম। তাকে যখন প্রশ্ন করা হলো, আপনার মেয়ে যখন পীর সাহেবের নাম বললো আপনি কি তা বিশ্বাস করেছিলেন? এর জবাবে তিনি বলেন, না, আমি বিশ্বাস করিনি। ঐ সাংবাদিকের হাত ধরে বলেছিলাম, পীর সাহেব ভালো মানুষ। তার বদনাম করো না।

তথাকথিত প্রগতিবাদীদের দৃষ্টিতে এরই নাম নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার

ফুলতলীর পীরের ভাষ্য ঃ উপমহাদেশের বিশিষ্ট আলেম ছাহেব কিবলা ফুলতলী পীর বললেন, পবিত্র আল-কোরআনে আছে সামান্য সন্দেহবশত কেউ অপবাদ দিলে তার উপর লানত পড়বে। দ্বীনদার সৎলোকের উপর যারা অনুমানের উপর অপবাদ দিয়েছে সেসব মিথ্যাবাদীদের বিরুদ্ধে সরকার অবহেলা না করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে বলে তিনি আশা পোষণ করছেন। কেননা দুষ্টচক্রকে দমন করার দায়িত্ব সরকারের। যে সাংবাদিক মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছেন তারও শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। এনজিও কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ফুলতলীর পীর বলেন, বিধর্মীদের প্ররোচনায় এনজিওরা কাজ করছে। এরা অদূর ভবিষ্যতে দেশের মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করার ব্যবস্থা করে ফেলবে।

থানা নির্বাহী অফিসারের ভাষ্য ঃ থানা নির্বাহী অফিসার খোরশেদ আলম বললেন, এই ঘটনার মূল কারণ মেয়েটির পরিবারের অভাব-অনটন। ওর বাবা তো অসহায়। পরিবারটির প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখছি। পীর সাহেব স্বনামধন্য। চুনু ধরা না পড়লে আমাদের কপালে দুর্ভোগ ছিলো, পীর সাহেবের নাম উঠায়...। জকিগঞ্জের মাটিতে আর এমন ঘটনা যাতে একটিও না ঘটে সেক্ষেত্রে সজাগ হওয়া দরকার।

ওসি, জকিগঞ্জ এর ভাষ্য ঃ জকিগঞ্জ থানার ওসি সাইফুল ইসলাম পিপিএম বলেন, এখন পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত। হুসনা এজাহারে যা বলেছে, জবানবন্দীতে তাই বলেছে। চুনু হুসনার মনিব। চুনু বলেছে, পীরের নাম বলবা। চাকরি বহাল রাখার স্বার্থে হুসনা তাই করেছিলো। আর পীর সাহেব তো আধ্যাত্মিক জগতের লোক। তাঁর বিচরণ আলাদা। চুনুর দোষ প্রমাণ হলে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত রয়েছে। আর সে (হুসনা) তো (নির্দোষ) খামোখা একঘরে করে...। আর দোররার তথ্য মিথ্যা। কেউ তো দোররা মারতে চায়নি। তাকে দোররা মারাও হয়নি। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই নওয়াব উল্লাহ্ বলেন, চুনু যে ধর্ষণ করেছে তা তো নিজেই স্বীকার করেছে। পরে চাকরির লোভ দেখিয়ে সম্পর্ক গড়ে তুলে। এটা আর কি। দারিদ্র অসহায়ত্বের

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে শ্লোগান ছিলো- "আমার ছেলে, আমার মেয়ে কেড়ে নেবার তুমি কে"।

সুযোগ নিয়ে। পীর সাহেব হলেন এখানকার স্বনামধন্য ব্যক্তি। চুনুই হুসনাকে পীর সাহেবের নাম বলতে চাপ দেয় এবং যুক্তি দেখায়, এই নাম শুনলে কেউ ভয়ে কিছু বলবে না। গত ২৭ আগস্ট আদালতে চুনুর জামিন হয়নি।

অন্যরা যা বলেন ঃ টিএনও কক্ষে ছিলেন থানার প্রায় সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান। তাদের সকলের বক্তব্য, পীর সাহেব ভালো মানুষ। আর সাংবাদিকরা তো তাদের (পীর/আলেম) ভাল চান না- মৌলবাদ, তাই সুযোগে রং সাজিয়ে রিপোর্ট করেন। তবে শিক্ষিত সমাজে একঘরে বলে কিছু নেই।

গ্রামের মসজিদ কমিটির সদস্য হাজী আবদুল জলিল বলেন, চুনু ঐ বাড়িতে আসতো। মুরব্বীরা জানতে চান, চাপ দেন, কেনো আসে। তখন হুসনার পিতা বলেন, আমাদের কুটুম। এখন গ্রাম তাদের একঘরে করেছে। তবে গ্রামবাসীর কাছে মাফ চাইতে হবে এবং রাজি করাতে হবে। সাবেক ইমাম ক্বারী মুফচ্ছিল আলী বলেন, সবার মতো তিনিও শুনেছেন। তবে পীর সাহেব ভালো মানুষ- এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। একঘরে করার ব্যাপারে তার মন্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, তওবা করলে আল্লাহ্ মাফ করে দেন। এমন কাজ আর না করার আশ্বাস দিয়ে মাফ চাইলে গ্রামবাসীর উচিত মাফ করে দেয়া।

জকিগঞ্জের বাসিন্দা এডভোকেট কাওছার রশীদ বাহার ও ব্যবসায়ী সিহাব আহমদ অভিন্ন কথা বললেন। তাদের বক্তব্য- পীর সাহেব অত্যন্ত ভালো মানুষ। তবে হুসনার কথায় অসঙ্গতি আছে। যেহেতু মামলা চলছে তাই কমেন্ট করা ঠিক নয়।

জকিগঞ্জ ছাত্র উন্নয়ন পরিষদের সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ বলেন, বারবার এনজিওরা এমন সংবাদ সৃষ্টি করছে- আলেমরা এ জন্যই এদের ভালো চান না। আর এই সুযোগে ওরা পীর সাহেবের বিরুদ্ধে রটনা সাজিয়ে চাইছিলো একটা খেল জমাতে। ওরা ভেবেছে কেউ মুখ খুলবে না। কিন্তু সহজেই নেপথ্য বিষয় বের হয়েছে। ধর্মপ্রাণদের মন থেকে এই ঘটনা সহজে মুছে যাবে না।

এদিকে এনজিও তেরেসা অফিসে আপাতত তালা ঝুলছে। সহজে কাউকে পাওয়া যায় না। থানা প্রাঙ্গণে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আব্দুস সালাম খান আলাপকালে বলেন, এমনি তো জানতাম হুসনা ভালো। তার চারিত্রিক দিকটি সম্পর্কে আমার জানা

www.pathagar.com

নেই। বিষয়টি এডাব-এর সিলেট চ্যাপ্টারের ডাইরেক্টর তদন্ত করে গেছেন। তেরেসার মূল সমন্বয়কারী হচ্ছে এডাব। আর বর্তমান ঘটনা তো আপনারা জানেন। (তথ্য সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, '৯৮)

এমনি এক মৌলভী, মৌলভীবাজারে বছর দুয়েক পূর্বে একটি ঘটনা ঘটিয়েছিলো। এ ঘটনাটি নিয়ে বামপন্থী পত্রিকা এনজিও এবং তাদের দালালেরা দেশে অনেক তুলকালাম কান্ড বাঁধিয়েছিলো। প্রকৃত ঘটনার একটি প্রতিবেদন সাপ্তাহিক বিক্রমে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত হলো ঃ

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নাগরিক আন্দোলন ও এ্যাকশন কমিটি জাতীয় সংসদে নারীর আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচনের দাবীতে শহীদ মিনারে সমাবেশ

মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানা শহরের প্রায় চার কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের পাদদেশে ছাতকছড়া গ্রাম। অধিবাসীরা শতকরা একশ' ভাগই বহিরাগত। শিক্ষা-দীক্ষার আলো খুব একটা পৌঁছায়নি। ক্ষেত কৃষি ও কাঠ কেটে বিক্রি করাই অধিকাংশ লোকের পেশা। এ গ্রামেরই এক দরিদ্র পরিবারের মেয়ে নূরজাহান। তার পিতা আশ্রব উল্যা '৬৫ সালে ভারত থেকে হিজরত করেছেন। ছাতকছড়ার এই পাহাড়ী এলাকায় এসেছেন ১৬ বছর আগে। একইভাবে মুনীর সর্দার ও তার আত্মীয় স্বজনরাও ভারত থেকে এসেই এই এলাকায় বসতি স্থাপন করেছে। তবে তার আছে বিরাট দলবল ও প্রভাব-প্রতিপত্তি। বেশ ক'বছর আগে থেকেই নূরজাহানের পিতা আশ্রব উল্যার সাথে মুনীর সর্দারের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না। ঝগড়া, ফ্যাসাদ, হুমকি-ধমকি, রেষারেষি লেগেই ছিলো। কয়েকবার এই মুনীর সর্দার আশ্রব উল্যাকে মারধর করতে উদ্যত হয়। তার জমির ধান কেটে নেয়, শন কেটে নেয়। এছাড়াও সব সময় মুনীর তার দলবল নিয়ে আশ্রব উল্যার দুর্বলতার সুযোগ খুঁজে ফিরতো। তার জিঘাংসা চরিতার্থ করার এমনি এক মোক্ষম সুযোগ পেল আশ্রব উল্যার মেয়ে নূরজাহানের দ্বিতীয় বিয়ে হবার পর। গ্রামের মোড়ল হিসেবে তার দলবল দিয়ে দাবি করলো এ বিয়ে বিধিসম্মত হয়নি। এ বিয়েতে যারা শরীক ছিলো সবাইকে শাস্তি পেতে হবে। বিশেষ করে নূরজাহান ও তার দ্বিতীয় স্বামীকে মাটিতে পুঁতে ১০১টি পাথর নিক্ষেপ করতে হবে।

মুনীর সর্দার পঞ্চায়েত নামক তার দলবল ও কথিত মাওলানা(?) মান্নান নামক

www.pathagar.com

তারই প্রভাবের জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে উপরোল্লিখিত শাস্তি জনসমক্ষে কার্যকরি করে। এই পাশবিক অত্যাচার ও অপমানের গ্লানি মাথায় নিয়ে আত্মহত্যা করেছিলো হতভাগ্য গৃহবধূ নূরজাহান (২২) ১০ জানুয়ারি '৯৩ সালে। মুনীর সর্দারসহ ৯ জন আসামী জেল হাজতে আছে। মামলা বিচারাধীন। সকলেই এ জাতীয় অত্যাচারের দৃষ্টান্তমূলক বিচার চায়। কিন্তু ইতোমধ্যেই একটি চিহ্নিত মহল এ ঘটনাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজানোর জন্য লুফে নেয়। তারা ইসলামী আইন ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা প্রমাণ করার লক্ষ্যে নূরজাহানের ঘটনাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। আলেম সমাজ ও (তাদের ভাষায়) কথিত মৌলবাদীদের প্রতি উদোর পিন্ডি বুদোড় ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার মতো প্রচুর লেখালেখি হয়েছে এবং হচ্ছে। বিটিভি'র একশ্রেণীর কর্মকর্তা প্রকৃত ঘটনার মূল্যায়ন না করে অনেকটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ইসলামী আইন ও আলেম সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে বার বার এ ঘটনাটি রং লাগিয়ে প্রচার করে। এখানেই শেষ নয়। একটি মহল নূরজাহান চরিত্র নিয়ে সিনেমা করার উদ্যোগ নেয়। সম্প্রতি এলাকায় এসে একদল অভিনেতা-অভিনেত্রী স্যুটিং করে গেছে। এ নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, নূরজাহান নিহত হওয়ার এক বছর অতিবাহিত হলো। শত শত লোক নূরজাহানের পিতার পাহাড় ঘেরা জীর্ণ কুটীরে পদচারণা করেছেন। কিন্তু হতভাগা নূরজাহান পরিবারের ফরিয়াদের সত্যিকার দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত না করে প্রতিটি মহল শুধু নিজ মতলব হাসিলের মসল্লা সংগ্রহ করার জন্য নূরজাহান চরিত্র ও তার সহজ সরল অশিতিপর বৃদ্ধ পিতাকে ব্যবহার করেই চলেছে। এ অবস্থায় ঘটনার প্রকৃত মূল্যায়নের লক্ষ্যে আমরা ছাতকছড়া গিয়ে নূরজাহানের মজলুম পিতা আশ্রব উল্যা ও মা সায়রা বেগমের সাক্ষাতকার রেকর্ড করি। এ ছাড়াও স্থানীয় ক'জন রাজনৈতিক নেতা, আলেম ও গণমান্য ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি।

পিতা আশ্রব উল্যা, মা সায়রা বেগম, ছয় ভাই, তিন বোনের মধ্যে নূরজাহান চতুর্থ। এক ভাই ও-তিন বোন নিয়ে তার পিতা ছাতকছড়ায় দিন যাপন করছিলেন। শেরপুরের এক যুবক ঘরজামাই হয়ে নূরজাহানকে বিয়ে করে। কিছুদিন পর সে পালিয়ে যায়। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর নূরজাহানের বৃদ্ধ পিতা তাকে দ্বিতীয় বিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেন এবং এই অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে শরীয়ত সম্মত হবে কিনা এই মর্মে গ্রাম্য মৌলভী মান্নানের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি স্থানীয় আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওঃ মুহিউদ্দিন সাহেব থেকে লিখিত ফতোয়া এনে দেন যে, প্রথম স্বামী নিরুদ্দেশ হলে স্ত্রীকে চার বছর ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এক সময় নূরজাহানের নিরুদ্দেশ হওয়া স্বামী থেকে তালাকনামা এসে যায়। তা মৌলভী মান্নানকে দেখানো হলে তিনি বিয়ে বৈধ হবে বলে সিদ্ধান্ত দেন এবং এরই ভিত্তিতে নূরজাহানের দ্বিতীয় বিয়ে হয় স্বগ্রামেরই মতালিব নামক এক যুবকের সাথে।

দু'মাস যাবার আগেই গ্রামের মোড়ল মাতব্বররা বিশেষ করে মুনীর সর্দার ও তার সহযোগিরা আনীত তালাকনামাকে জাল বলে চ্যালেঞ্জ করে এবং বলতে থাকে যে, এই দ্বিতীয় বিয়ে বৈধ হয়নি। তাদের দু'মাস মেলামেশার দরুন তাদের প্রতি জেনার শাস্তি ঘোষণা দেয়ার জন্য মৌঃ মান্নানের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। মুনীর সর্দারেরা

www.pathagar.com

নূরজাহান ও তার দ্বিতীয় স্বামীকে পৃথক করে দেয় এবং সালিশীর মাধ্যমে বিচার বৈঠকে বসে।

১০ জানুয়ারি '৯৩ উক্ত বৈঠকে মুনীর সর্দার ও তার সহযোগিরা তার মহল্লার মসজিদের ইমাম (যিনি আদৌ ফতোয়ার যোগ্যতা রাখেন না) কে দিয়ে শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয় যে, নূরজাহান ও তার স্বামীকে হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে ১০১টি কঙ্কর নিক্ষেপ এবং নূরজাহানের মা-বাবাকে ৫০টি করে বেত্রাঘাত করতে হবে। এই রায়ের উপর দু'একজন আপত্তি তুললেও মুনীর সর্দারের সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর মোকাবেলা করতে সক্ষম হননি। আশ্রব উল্যা বলেন যে, উক্ত ফতোয়া কোনো ভালো আলেমের কাছে যাচাই করার জন্য দু'দিনের সময় চান। কিন্তু মুনীর সর্দার গংদের জেদের মুখে তাকে কোনো আপীলের সুযোগ না দিয়ে আধাঘন্টা সময়ের মধ্যেই জনসমক্ষে উক্ত রায় কার্যকর করা হয়। নূরজাহানকে পাথর মারার পর মুনীর সর্দার ও তার সহযোগিরা ভৎর্সনা সহকারে বলতে থাকে ছিঃ ছিঃ! তোর বেঁচে থেকে লাভ কি বিষ খেয়ে মরা উচিত। সত্যিই নূরজাহান বাড়ি গিয়ে অপমানের গ্লানি মাথায় নিয়ে কীটনাশক পানে আত্মহত্যা করলো। সন্ধ্যায় তার পিতা আশ্রব উল্যা থানায় যান। পরদিন দারোগা সাহেব ঘটনাস্থলে যান এবং লাশ দাফন করে নিতে বলেন। কিন্তু মুনীর সর্দার গংরা এই মজলুম পরিবারকে আরো মানসিক নির্যাতন করার লক্ষ্যে দাফন কাজে কোনো সহযোগিতা না করার ঘটনা আরো ছড়িয়ে পড়ে এবং মহল বিশেষের পক্ষ থেকে গুজব ও বিকৃত ব্যাখ্যা ছড়াতে থাকে। পরদিন পোস্টমর্টেম করে লাশ দাফন করা হয়।

ইতোমধ্যে একটি চিহ্নিত মহল এই ঘটনাকে ইসলামী আইন ও আলেম সমাজকে দায়ী করে মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে পত্র-পত্রিকায় বিকৃত উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রচারণা চালাতে থাকে। এমনকি বিটিভি'র একশ্রেণীর কর্মকর্তা প্রকৃত ঘটনার মূল্যায়ন না করে শুধু ইসলামী মূল্যবোধকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে উক্ত ঘটনার বিকৃত উপস্থাপনা বার বার করেছেন। যেসব প্রচারণা অতিরঞ্জিত ও উদ্দেশ্যমূলক বলে স্বয়ং নূরজাহানের পিতা আশ্রব উল্যা অভিযোগ করেছেন।

কোর্টে মামলা চলছে। মামলার ব্যাপারে আশ্রব উল্যা বলেন, মহিলা পরিষদ নেত্রী

গত কয়েক বছর ধরে রহস্যজনকভাবে ক্রমাগত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে আগুন লেগে অনেক শ্রমিকের প্রাণহানী ঘটছে। এদের বেশিরভাগই নারী শ্রমিক। নারী মুক্তিবাদীদের এ বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। অথচ এটা যদি কোন তথাকথিত মৌলবাদীদের কারণে একজনেরও প্রাণহানী ঘটতো তাহলে দেশে নারীবাদীরা তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে ছাড়তো

www.pathagar.com

কবি সুফিয়া কামাল লোক পাঠিয়ে তাকে ঢাকায় যেতে বলেন। 'আই মুভিজ এডভারটাইজিং, ৭৯ গ্রীন ভিউ সুপার মার্কেট, ১ম তলা, গ্রীন রোড, ফার্মগেট' এ ঠিকানায় তিনি কবি সুফিয়া কামালের সাথে সাক্ষাত করেন। আগা কামাল, শামছুল হক মাহমুদ, আবু হেনা বাবুল, এইচ কে মাহমুদ, আবু হেলিম প্রমুখ তাকে সুফিয়া কামালের সাথে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যান। কবি সুফিয়া কামাল তাকে ৭০ হাজার টাকা দেয়া হবে বলে কাগজে সই নেন। মামলার ব্যাপারে তাকে কিছুই করা লাগবে না। সব ঢাকা থেকে করে দেয়া হবে বলে আশ্বাস দেন এবং ১৬৩ জন উকিলের নামে ওকালতনামায় সই নেন। আশ্রব উল্যাকে তারা নগদ ২২০০ টাকা দিয়ে বিদায় দিতে চাইলে তিনি বলেন– আমি লেখাপড়া না জানা লোক। আপনারা যেসব দায়-দস্তখত নিচ্ছেন তা আমি বাধ্য হয়ে দিচ্ছি, এতে আমার যেনো কোনো ক্ষতি না হয়। এরপর মামলার প্রতি তারিখে সাক্ষীগণকে ২শ'/৪শ'/৫শ' টাকা করে দেয়া হতো। গত দুই তারিখে টাকা না পাওয়াতে তিনি যেতে পারেননি।

স্থানীয়ভাবে যারা তাকে সহযোগিতা করছেন এবং কবি সুফিয়া কামালের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে আশ্রব উল্যা ক'জন পরিচিত সিপিবি নেতার নাম উল্লেখ করেন (অবশ্য তাদের রাজনৈতিক পরিচিতি তিনি বলতে পারেননি)। তারা হলেন– মায়া ধর, মোঃ আফছার আলী। মামলা চালাচ্ছেন এডভোকেট পীযুষ কান্তি, স্বপন কুমার, নির্মলেন্দু। তাদের মাধ্যমে টাকা লেনদেন ও সামগ্রিক যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

মৌলভী মান্নান কয় নম্বর আসামী এ প্রশ্নের জবাবে আশ্রব উল্যা বলেন, তিনি ঠিক বলতে পারবেন না। কারণ এ ব্যাপারে উকিল বাবুদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, অন্ধের যেমন লাঠির প্রয়োজন তেমনি তোমার প্রয়োজন আসামীর শাস্তি হওয়া, অন্য কিছু জানার দরকার নাই। মৌঃ মান্নান সম্পর্কে আশ্রব উল্যা আরও বলেন, তার বাড়ি বাঘমারা নামক অন্য এক গ্রামে। লাকসাম থেকে এসে এখানে বাড়ি করেছে। একটি মহল্লার মসজিদে ইমামতি করে। মুনীরের দাপটে সে ভীত ও প্রভাবিত হয়ে মুনীরের দেয়া রায়কে সমর্থন দিয়েছে। আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত যে, মান্নান নূরজাহানকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো– এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, একটি পত্রিকার ভাষ্য মতে, নূরজাহানের লাশ দাফন করাও নাজায়েজ বলে ফতোয়ার কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে আশ্রব উল্যা উল্লেখ করেন। মৌঃ মান্নানের সাথে তার পরিবারের কোনো আক্রোশ বা মনোমালিন্য ছিলো না। তাকে মুনীর সর্দার ও তার সহযোগিরা ব্যবহার করেছে।

নূরজাহানকে নিয়ে সিনেমা হচ্ছে– এ ব্যাপারে আশ্রব উল্যা বলেন, শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কাজ সেটা নাটক হোক সিনেমা হোক– এতে তার আপত্তি আছে। মেয়েকে নিয়ে এগুলো করা হলে তিনি কেইস করবেন।

সবশেষে তিনি অভিযোগ করেন যে, সরেজমিনে গিয়ে জেলা প্রশাসক একটি রাস্তাকে নূরজাহান সড়ক ঘোষণা দেন কিন্তু আশ্রব উল্যা আমাদেরকে দেখালেন যে, আজো সেটা সড়ক নয়, একটি আইল মাত্র।

www.pathagar.com

একটি আন্তর্জাতিক চক্রের দালালদের সহযোগিতায় প্রতি বছর হাজার হাজার নারী ও শিশু পাচার হচ্ছে। সম্প্রতি একটি তথ্যে জানা যায়, বর্তমানে শুধু ভারত ও পাকিস্তানেই প্রায় ২ লক্ষ বাংলাদেশী নারী দুঃসহ মানবেতর জীবন যাপন করছে নিষিদ্ধ পল্লীতে। অথচ তাদেরকে উদ্ধার এবং পাচার রোধ করার কোন জোরালো কার্যকর দাবী বা কর্মসূচী নেই; যেমন দেখা যায় ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে

নূরজাহানের মা সায়রা বেগমকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি বলেন, তিনি বিচার বৈঠক থেকে বাড়ি ফেরার আগেই নূরজাহান বিষপান করে এবং তার জবান বন্ধ হয়ে যায়। সে কথা বলতে পারেনি।

ছাতকছড়া থেকে ১ কিলোমিটার দূরে রামটিলা জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ আঃ গফুরের সাথে বেশ কিছু মুরুব্বিসহ আলাপ করি মসজিদ আঙ্গিনায় বসে। তিনি মৌঃ মান্নান সম্পর্কে বলেন, তার কোনো রাজনৈতিক পরিচিতি ছিলো না। কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে দেখা যায়নি। তবে তথাকথিত আহলে সুন্নাতুল জামাত(?) রেজভী গ্রুপ তাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো। তবে এ ঘটনা তার একারই। আলেম সমাজ বা কোনো দলের সম্পর্ক এর সাথে নেই। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা দাখিল পাস।

মৌঃ মান্নানের নিজ গ্রাম বাঘমারা মসজিদের ইমাম মৌঃ লুকমান সাহেব বলেন, মান্নান কট্টর বিরোধী ছিলো ওলামায়ে দেওবন্দ ও তাবলীগ জামাতের। এ ছাড়াও আমরা অত্র এলাকার একমাত্র আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওঃ মুহিউদ্দিন সাহেব দারুচ্ছুন্নাত মাদ্রাসার মুহতামীম জনাব মাওঃ আঃ শহীদ, কমলগঞ্জ হাইস্কুলের হেড মাওলানা মৌঃ আঃ হান্নান, কমলগঞ্জ উপজেলা মসজিদের ইমাম মাওঃ আশিক আহমদ, বাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওঃ আঃ হামিদ। এ ছাড়া বিএনপি'র যুবদলের শফিক বেগ, জাতীয়তাবাদী দলের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম ভূঁইয়া, জামায়াতে ইসলামীর শফিকুর রহমান সিদ্দিকী বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক জাসদ নেতা জনাব আঃ গণি তরফদারসহ বেশ কিছু সুধীবৃন্দের সাথে মৌঃ মান্নান ও নূরজাহান সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করি। উত্তর প্রায় একই ধরনের আসে যার সারসংক্ষেপ হলো যে, মৌঃ মান্নান একজন অখ্যাত ব্যক্তি যার কোনো

www.pathagar.com

রাজনৈতিক পরিচিতি ছিলো না। বরং যারা ইসলামী রাজনীতি করেন তাদের বিরোধীই ছিলো। উপর মহল নূরজাহানের ঘটনাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাওয়াতে এলাকাবাসীর সহানুভূতি হারিয়ে ফেলে। যার দরুন সুফিয়া কামালরা ঢাকা থেকে ছুটে গেলেও এলাকাবাসী এটাকে জাহেল গোষ্ঠীর প্রতিহিংসার শিকার বলে মনে করে। এখানে না ছিলো ইসলামী আইন আর না ছিলো আলেম সমাজের কোনো ভূমিকা। স্থানীয় আলেমরা এর নিন্দাই করেছেন। এরপরও যখন সুফিয়া কামালরা এটাকে ইসলামী আইনের মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলে চালিয়ে দিতে উঠে পড়ে লাগলেন, এসব নাস্তিক্যবাদীদের ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের পাঁয়তারা বলে এলাকাবাসী মনে করে।

আমরা দেখতে পাই, এসব মানবাধিকারবাদীরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাহাড় ঘেরা গভীর অরণ্যে যেখানে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি, সেখানে ঘটে যাওয়া একটা হিংসাত্মক ঘটনা যা কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠীর জিঘাংসার জের হিসেবে ঘটে যায় তা নিয়ে তাদের দরদ উপচে পড়ে। মানবাধিকারের মায়া কান্নায় তারা ছুটে যান পাহাড়ে-জঙ্গলে। কিন্তু তাদের চোখে পড়ে না আধুনিক বর্বরতার দৃশ্য।

নূরজাহানের নির্মম হত্যার পর '৯৫ সালের ২৪ আগস্ট দিনাজপুরে ঘটে আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা। পুলিশ কর্তৃক কিশোরী ইয়াসমিন ধর্ষিতা এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হন। এই অমানবিক ঘটনা দুটো নিয়ে এনজিওসহ দেশের প্রতিটি মানুষ ছিলো ঘৃনায়, ক্ষোভে, ধিক্কারে ও প্রতিবাদে ছিলো সোচ্চার। কিন্তু পরবর্তীতে এরূপ আরো অনেক ঘটনা ঘটেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য ঘটনা থেকে আমি এখানে মাত্র কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

১৯৯৫ সালের অক্টোবরে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, কুলসুম নামে একটি দরিদ্র মুসলিম যুবতী চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামী এলাকার একটি গার্মেন্টিসে নতুন কাজ পেয়েছে। সে কিশোরগঞ্জের মেয়ে। নিতান্তই পেটের দায়ে কুলসুম নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে সুদূর চট্টগ্রামে গিয়ে ফুফাতো বোনের বাসায় আশ্রয় নিয়ে গার্মেন্টিসে কাজ ধরেছে। ঘটনার দিন সন্ধ্যে বেলায় সে ফ্যাক্টরীর কাজ সেরে ফেরার পথে বিবিরহাটে টেম্পো থেকে নেমে বাসার উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করলে একটু নিরিবিলি স্থানে তিনটি যুবক তাকে আটক করে এবং জোর করে একটি বাড়ীর তিনতলায় নিয়ে যায়। সেখানে আরও দু'জন যুবক অপেক্ষা করছিল। এই পাঁচটি নরপশু মিলে সারারাত মেয়েটির ওপর বলৎকার চালায়। মেয়েটির কাকুতি-মিনতি ও ক্রন্দনে এই পাঁচটি অমানুষের হৃদয় গলে না। কিন্তু পাশের বাড়ীর লোকেরা বিষয়টি আঁচ করতে পেরে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েটিকে উদ্ধার করে এবং ঐ বাড়ীটি ঘেরাও করে ধর্ষণকারী পাঁচ যুবককে গ্রেফতার করেছে। পাঁচজনের মধ্যে ৪ জনই ছিলো দেশের দু'টি বৃহৎ রাজনৈতিক দল সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের স্থানীয় নেতা। অপরজন সন্ত্রাসী বলে পরিচিত। কোর্টে তাদের জামিন নামঞ্জুর হয়েছে। কুলসুমকে পাঁচলাইশ পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। তবে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগ নাকি এখনো মেয়েটির মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট দেয়নি। কেন দেয়নি তা অবশ্য আন্দাজ করা

www.pathagar.com

রমনার বটমূলে বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অশ্লীল নৃত্য পরিবেশন করা হয়

যায়। (সূত্র ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ২৭/১০/৯৫)

১৭ ডিসেম্বর '৯৫ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভাষানটেক এলাকায় শহীদুল ইসলামের মেয়ে ইয়াসমিনকে অগ্নিদগ্ধ করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

৪ ডিসেম্বর '৯৫ যাত্রাবাড়ী এলাকার জনৈক বাড়িওয়ালার ছেলে দেলওয়ার শাহীনা (১৪)কে অপহরণ করে অত্যাচার ও ধর্ষণের পর তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে নির্মমভাবে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে।

একই বছর ময়মনসিংহ ও জামালপুরের একজন পুরুষ ম্যাজিস্ট্রেট আরেকজন মহিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অন্যের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নিজ স্ত্রী দাবি করেন। দাবি সম্মত না হওয়াতে প্রকাশ্যে রাজধানীর এক বাড়িতে কুপিয়ে হত্যা করে এবং আধুনিক আইনের বাহকেরা তাকে ছেড়ে দেয়।

১৭/১১/৯৫ তারিখে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে বেগম জেমসিন জাহানের 'সন্ত্রাস আর ধর্ষণের তন্ত্র' শিরোনামে একটি চিঠি ছাপা হয়। চিঠির ভাষা নিম্নরূপ ঃ (আংশিক)

১২/১১/৯৫ সন্ধ্যা ৭টার ঘটনা। স্থান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গেট। পিতা সাথে। মেয়ে বেড়াতে এসেছে কোনো এক আত্মীয় শিক্ষকের বাসায়। পিতার মুখে দাড়ি আর মেয়ে বোরকা পরিহিতা। এই হলো সন্ত্রাসীদের চোখে অপরাধ। আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগে যা ঘটতো তাই করলো ওরা। পিতাকে অস্ত্রের মুখে নিয়ে গেলো একদিকে আর মেয়েকে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে। গণতান্ত্রিক স্টাইলে পালাক্রমে ধর্ষণ করে রক্তাক্ত মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে গেলো আমাদের জাতীয়তাবাদের ধারক-বাহক মরহুম মহান নেতার সৈনিকেরা। মেয়ের অবস্থা দেখে পিতা বুক ছাপড়ে মূর্ছা গেলেন। হুঁশ ফিরে এলে পিতা আর আদরের ধন কন্যাকে কোলে তুলে নিলেন। না– কন্যা কথা বলছে না।

চিৎকার দিয়ে বুক ফাটিয়ে হাত উঠালেন আরশের দিকে। হে আল্লাহ্! বোরকা পরাই কি আমার মেয়ের অপরাধ? নবীর সুন্নত দাড়ি রাখাই কি আমার অপরাধ? মুমূর্ষু

www.pathagar.com

কন্যাকে নিয়ে পিতা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। একটি পত্রিকা মন্তব্য করেছে, হয়তো পিতা বাসায় গিয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে না পারার যন্ত্রণায় হার্টফেল করবেন। আর মেয়ে? তাদের ভাগ্য সম্পর্কে আমরা আর জানি না। (দৈনিক সংগ্রাম ১৭/১১/৯৫)

শহরের রবার্টসন্সগঞ্জ এলাকার মন্ডলপাড়ার একদল সন্ত্রাসী রুমানা আফরোজ তন্দ্রা (১৮) নামে একজন কলেজ ছাত্রীকে প্রকাশ্যে বিবস্ত্র করে নির্যাতন করায় সে মনের দুঃখে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে। গত সোমবার সন্ধ্যায় উক্ত এলাকার সামছুল ইসলামের মেয়ে এবং ঢাকার মিরপুর আইডিয়াল ইন্সটিটিউট ডিগ্রীর ছাত্রী তন্দ্রা বাড়িতে কেউ না থাকায় নিজেই সামনের মুদির দোকান থেকে একটি দিয়াশলাই আনতে গেলে উক্ত এলাকার কতিপয় সন্ত্রাসী যুবক তাকে জড়িয়ে ধরলে সে গালমন্দ করে। ফলে সন্ত্রাসীরা উত্তেজিত হয়ে তন্দ্রাকে প্রায় বিবস্ত্র করে লাঞ্ছিত করে। এই অবস্থায় সে দৌড়ে বাড়িতে পালিয়ে যায় এবং পোশাক ঠিক করে বঁটি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে সন্ত্রাসীদের খুঁজতে থাকে। এ সময় সন্ত্রাসীরা এক ফাঁকে তার কাছ থেকে বঁটি কেড়ে নিয়ে মারধর করে। পরে তন্দ্রার মা গ্রামের ২/১ জনের সহযোগিতায় তাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যায়। এদিকে সন্ত্রাসীরা পুনরায় ক্ষিপ্ত হয়ে তন্দ্রাদের বাড়িতে প্রবেশ করে পুনরায় মারধর করে। পরে প্রতিবেশীরা এ ব্যাপারে সন্ত্রাসীদের ভয়ে এটি মীমাংসায় বসলে এই ফাঁকে তন্দ্রা লজ্জায় ঘরের ভেন্টিলেটারে ওড়না জড়িয়ে আত্মহত্যা করে। পরে মীমাংসার জন্য আসা প্রতিবেশীরা ঘরের দরজা ভেঙ্গে তার লাশ উদ্ধার করে। তার ময়না তদন্ত শেষে মা মাছুদা চৌধুরী লাশসহ রংপুর প্রেসক্লাবে আসেন এবং বিচার দাবি করেন। তিনি বাদী হয়ে মানিক, রতন, রানাসহ ৭ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। (দৈনিক মিল্লাত ৩/৭/৯৬)

ফুলপুরের নশুয়া গ্রামে মিনতি রানী (২২)। গত ৯ আগস্ট '৯৬ মিনতি স্বামীর গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে পিত্রালয় থেকে দুইজন সঙ্গী নিয়ে স্বামীর বাড়ি যাচ্ছিল। পথিমধ্যে ১১টায় ফুলপুর বাসস্ট্যান্ডে ৩ জন পুলিশ তাদের আটক করে। এ সময় মিনতি রানী পুলিশকে স্বামীর অসুস্থতার কথা জানায় এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র দেখায়। কিন্তু পুলিশ মিনতির আকুতি কর্ণপাত না করে থানায় এনে তাকে আলাদা একটি কক্ষে আটক করে রাখে। উল্লেখ্য, সেই রাতে থানার ডিউটি অফিসার প্রসাদ চন্দ্র থানায় না থেকে বাসায় ঘুমাচ্ছিল। মিনতি রানী অভিযোগ করেছে এই সুযোগে পুলিশ কনস্টেবল ইঞ্জিল মিয়া, আব্দুস সাত্তার ও রফিকুল ইসলাম রাতভর তার সাথে চরম অশালীন আচরণ করে। স্বামীর অসুস্থতার কথা বলেও সে রক্ষা পায়নি। পরদিন সকালে মিনতি ছাড়া পায়। কিন্তু সে স্বামীর গ্রামে পৌঁছার পূর্বেই তার স্বামী মারা যায়।

১৯৯৬ সালের ৯ অক্টোবর চট্টগ্রামের রাউজান থানা কর্তৃক আটক অবস্থায় সীমা নাম্নী এক যুবতী পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিতা হন। পরে ঘটনা চাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে কারাগারে বিষপানে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেয়া হয়। শুধু এখানেই শেষ নয়। আলামত নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়। পরবর্তীতে আসামীদের বেকসুর খালাস দেয়া হয়। ক্ষুব্ধ, বিচলিত এবং অসহায় বিচারক উপসংহারে বলেছেন– "বিজ্ঞ আদালত যিনি সাক্ষী-সাবুদের উপর ভিত্তি করে রায় দেবেন তার জন্য কোনো পথই হয়নি।"

www.pathagar.com

৭/১২/২০০০ তারিখে দৈনিক ইনকিলাব একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে '৯৭ সালের একটি লোমহর্ষক ঘটনা উদ্ধৃত করে। ঘটনাটি এরূপ ঃ বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকের প্রথম মেয়ে লাবণী। দ্বিতীয় মেয়েটির নাম শ্রাবণী। সবশেষ সন্তানটির নাম জয়। এটিই একমাত্র পুত্র সন্তান। লাবণী বড় সন্তান। তাই তাকে নিয়ে বাবা-মায়ের অনেক বড় আশা। মেয়েকে ভালো পড়াবে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে। লাবণীরও সাধ ছিলো তার বাবার স্বপ্নকে সফল করতে। ছোটবেলা থেকেই লাবণী লেখাপড়ার প্রতি বেশ মনোযোগী ছিলো। দ্বিতীয় স্থান কি তা লাবণীর ডায়রীতে পড়েনি। সকল ক্লাসে সে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ক্লাস ফাইভ থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিল লাবণী। লাবণীর বাবা যে স্কুলে শিক্ষকতা করতেন সেই স্কুলেই তাকে ভর্তি করিয়ে দেন ক্লাস সিক্সে। প্রথম প্রথম সে তার বাবার সঙ্গে স্কুলে আসা-যাওয়া করতো। লাবণীর ক্লাস আগে ছুটি হওয়ায় তার বাবার জন্য বসে থাকতে হয় প্রধান শিক্ষকের মেয়ে বলে সব স্যাররা তাকে আদর করতেন। কিছুদিন পর আর তার বাবার জন্য অফিসে বসে থাকতে হয় না। কারণ, এতোদিনে লাবণী বান্ধবী জুটিয়ে ফেলেছে। তারা এক সঙ্গে স্কুলে আসা-যাওয়া করতো। স্কুলটিও তাদের বাড়ী থেকে বেশি দূরে নয়। সে এখন কিশোরী থেকে তরুণীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। .... লাবণী সে শুধু সুন্দরী একটি মেয়ে তা বললে কম বলা হবে। .... এখন তাদের পাড়ার এবং স্কুলের কিছু বখাটে ছেলেরা বিরক্ত করে। লাবণীকে দেখলেই তারা ছুড়ে দেয় শিস ও অশ্লীল উক্তি। এদের মধ্যে একজনকে দেখা যেত লাবণীকে খুব বেশি বিরক্ত করতে। নাম তার ডন। ডনের সঙ্গে থাকতো আরও কয়েকজন। ... এরা সমাজের কীটপতঙ্গ। .... এদের দ্বারা এমন কোন খারাপ কাজ বাকী নেই যাতে তারা জড়িত ছিলো না। প্রশাসন কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় ডন হয়ে ওঠে কুখ্যাত সন্ত্রাস্রী দলের নায়ক। সমাজে তারা ডন বাহিনী নামে পরিচিত। এদের গডফাদারও আছে। রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় এরা হয়ে ওঠে আরও শক্তিশালী। ডন প্রায়ই তার দল নিয়ে লাবণীকে পথরোধ করতো এবং ভালোবাসার কথা বলতে চাইতো। ডন বাহিনীর কোন খারাপ কাজ করতে দ্বিধা হয় না এটা ভেবে লাবণী ভয়ে কাউকে কিছু বলেনি। .... সামনে তার এসএসসি পরীক্ষা। ... প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য মাঝে মাঝে লাবণীকে একাই স্কুলে যেতে হয়। সেই সুযোগে ডন একদিন লাবণীর হাত ধরে তার বুকে টেনে নেয় লাবণী আর চুপ থাকতে পারলো না। ডনকে কামড় দিয়ে ফেলে চিৎকার করে প্রধান শিক্ষকের বাড়ীতে হাজির হয়। ... পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর দেখা গেলো লাবণীর রোল নম্বরের পাশে চারটি লেটারসহ স্টার মার্ক। ... ডন গোপনে খবর রাখছে লাবণী কোথায় কবে কোন্ কলেজে ভর্তি হতে যাবে। এখন শুনুন, আমাদের দেশের স্বপ্নের সোনার বাংলার করুণ কাহিনী। ভর্তি হওয়ার জন্য ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলো লাবণী এবং তার বাবা। যশোর জেলা ছেড়ে আসার আগেই ডন বাহিনী তুলে নেয় বাবা ও মেয়েকে। গভীর রাতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় লাবণীর বাবাকে পাওয়া গেলেও লাবণীকে পাওয়া যায়নি। ... তিন দিন পর ঝিলের পাড়ে লাবণীর লাশ পাওয়া যায়। ... লাশ ছিলো সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। ... যোনীপথ কেটে মলদ্বার পর্যন্ত নেয়া হয়েছে। দু'টি স্তনই কেটে ফেলা হয়েছে যেটা কল্পনাতেও সম্ভব নয়। সেটাই ঘটাতে পেরেছিল নির্মম পাষন্ড বর্বর ও কুখ্যাত সন্ত্রাসীরা।

www.pathagar.com

৪ অক্টোবর '৯৭ দৈনিক জনকণ্ঠ "আরেক বর্বরতার কাহিনী ফেনীতে!" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়– মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের সঙ্গে আর উম্মেহানীর দেখা হলো না। ফেনীতে সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত কলেজ ছাত্রী উম্মেহানী বাবা ও ভাইসহ এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এদিকে সোমবার রাতের এই বর্বর ঘটনার ৬ ঘন্টা পর উম্মেহানীর মা গ্রামের বাড়িতে মারা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার ফেনী সদর থানার হাজীর বাজার নামক স্থানে। মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে ঢাকার টিএন্ডটি কলেজের ছাত্রী উম্মেহানী বাবা আব্দুর রশিদ (৫০) ও ভাই কাশেম (১৫)সহ ঢাকা থেকে ওইদিন রাতে ফেনী পৌঁছায়। ফেনী মহিপাল বাসস্ট্যান্ড থেকে ট্যাক্সি করে বাড়ি যাওয়ার পথে হাজির বাজারে একদল সন্ত্রাসী তাদের ট্যাক্সির গতি রোধ করে। এক সময় দুর্বৃত্তরা উম্মেহানীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে বাবা ও ভাই বাধা দেয়। এতে সন্ত্রাসীরা এদের ৩ জনকে গুলি করে আহত করে। সন্ত্রাসীরা এতেও ক্ষান্ত হয়নি। তারা এক পর্যায়ে উম্মেহানীর স্তন কেটে দেয়। তাদের আর্তনাদে পার্শ্ববর্তী লোকজন তাদের উদ্ধার করে প্রথমে ফেনীতে এবং পরে ঢাকায় স্থানান্তর করে।

উম্মেহানী এবং তার বাবা-ভাই কেউ জানাজায় অংশ নিতে পারেনি। এই বর্বর ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

একই বছরের ডিসেম্বর মাসে নারী পাচারকারী দলের খপ্পরে পড়েছিলো যশোরের সাজেদা ও তার ভাই। ভাগ্যক্রমে চোরাচালানীদের হাত থেকে রেহাই পেলেও রেহাই পায়নি সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ভদ্রলোকের মুখোশধারী নরপশু তিনজন আইনজীবীর লালসা থেকে। সাজেদাকে আইনের সহায়তা দেবার নাম করে এই তিন নরপশু পালাক্রমে ধর্ষণ করে আত্মগোপন করেছিলো।

এমনকি ৭ বছরের একটি শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করেছে ১২ থেকে ৭ বছর বয়সের ৪ জন স্কুল ছাত্র। ৫ মে প্রকাশিত পত্রিকার সংবাদে জানা যায়, ১৯৯৭ সালের ২ মে দুপুরে পিরোজপুরের নাজিরপুর থানার ঝলঝলিয়া গ্রামে একটি ঘরে ঢুকে ১২ বছরের একজন, ১১ বছরের দু'জন এবং ৭ বছরের একজন ছাত্র ঐ ৭ বছরের শিশু কন্যাটিকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে।

'৯৮ সালের জানুয়ারিতে সংবাদপত্রের এক রিপোর্টে পড়লাম অসুস্থ পিতাকে চিকিৎসা করাতে এসে এক নবম শ্রেণীর ছাত্রী ক্লিনিকের ভেতরেই জনৈক ডাক্তার কর্তৃক ধর্ষিতা হয়। ঘটনাটা এরকম ঃ অসুস্থ পিতাকে পেট অপারেশনের জন্য রোগীর কন্যা (১৬) একটি ক্লিনিকে নিয়ে যায়। সেখানে রাত বারোটার দিকে ক্লিনিকেরই জনৈক নার্স মেয়েটিকে অপারেশনের অনুমতিপত্র স্বাক্ষরের জন্য দোতলায় ডাক্তারের কক্ষে পৌঁছে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। ডাক্তার মেয়েটিকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। মেয়েটি বহু কাকুতি-মিনতি করেও মুক্তি পায়নি। পরদিন বিষয়টি জানাজানি হলে ডাক্তার ক্লিনিক বন্ধ করে পালিয়ে যায়। মেয়েটিকে ডাক্তার চেকআপের জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে এ কাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে পাওয়া যায়নি।

৩ অক্টোবর '৯৮ সন্ত্রাসীরা নাটোর শহরের উত্তর পটুয়াপাড়াস্থ কুর্নির মাঠ এলাকার

www.pathagar.com

জনৈক বেলাল মিয়ার স্ত্রী শহরবানুর পায়ের রগ ও স্তন কেটে দিয়েছে। জলাবদ্ধ একটি সড়কে চলাচলের জন্য স্থানীয় জনগণ কিছু ইট বিছিয়ে তা কোনো মতে ব্যবহার করতে থাকে। ঐ সড়ক নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার ভরত গত ৩০ সেপ্টেম্বর বিছিয়ে রাখা ইটগুলো সরিয়ে ফেলতে গেলে শহরবানু ও স্থানীয় আরো কয়েকজন মহিলা ঐ সড়কটি ব্যবহার করার স্বার্থে সেগুলো না সরানোর জন্য অনুরোধ করে। এক পর্যায়ে ভরত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং শহরবানুকে মোটর সাইকেলের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এ ঘটনায় এলাকার মহিলারা ভরতকে আটকিয়ে রেখে মারধর করে। পরে ঠিকাদার ভরত হুমকি দিয়ে চলে যায়। হুমকির প্রেক্ষিতে শহরবানু ঐদিনই নাটোর থানায় জিডি করে। এতে ভরত ক্ষিপ্ত হয়ে গত ৩ অক্টোবর তার দলবল নিয়ে শহরবানুর উপর পুনরায় চড়াও হয়। সন্ত্রাসীরা শহরবানুকে মারধর করে দু'পায়ের রগ ও স্তন কেটে দেয়। শহরবানু নাটোর সদর হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করলেও নিরাপত্তার কারণে সেখানে ভর্তি হয়নি। (দৈনিক ইনকিলাব, ৫/১০/৯৮)

উপেন্দ্র কিশোর ও সুকুমার রায় রচিত 'মহাভারতের কথা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, পঞ্চপাণ্ডব রাজসূয় যজ্ঞের জন্য একটি প্রাসাদ তৈরী করেন। ঐ প্রাসাদের মূল্যবান মণি-মানিক্যের চাকচিক্য দেখে কুরু বংশের দুর্যোধনরা লোভাতুর হয়ে পড়েন। কিভাবে ঐ সম্পদ দখল করা যায় তার জন্য তারা নানা ফন্দি-ফিকিরও আঁটতে থাকেন। এ ব্যাপারে তারা তাদের মামা শকুনীর সাথে সলা-পরামর্শ করেন। তারা জানতেন যে, পাণ্ডবদের বড় ভাই যুধিষ্ঠিরের দুর্বলতা রয়েছে পাশা খেলার প্রতি। যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় সব সময় হারুপার্টি ছিলেন। কিন্তু ক্ষত্রীয়দের একটি ঐতিহ্য ছিলো যে, পাশা খেলার আমন্ত্রণ

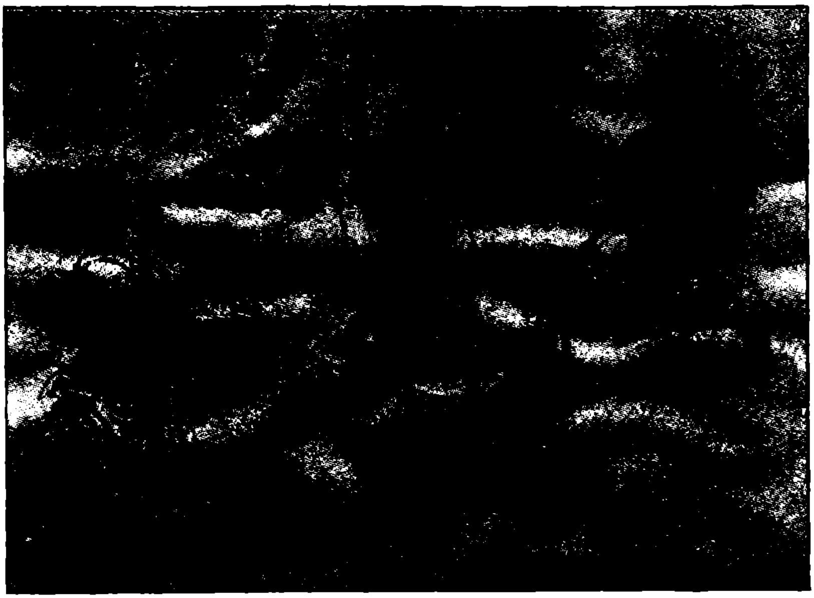

মহাভারতে বর্ণিত সেকালের দুর্যোধনরা দ্রোপদ্রীর বস্ত্র হরণ করছে

www.pathagar.com

তারা প্রত্যাখ্যান করতেন না। যাই হোক প্ল্যান মোতাবেক যুধিষ্ঠিরের সাথে কৌরবদের পক্ষে পাশা খেলা শুরু করেন শকুনী। কৌরবদের পক্ষে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন দেবতা সূর্যের সন্তান (এখান থেকে 'সূর্যসন্তান' শব্দটির উৎপত্তি) মহাবীর কর্ণ এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখ। পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির প্রথমে তাদের সহায়-সম্পদ এবং পর্যায়ক্রমে দাস-দাসী ও চার ভাইকে পণ রাখেন। এক এক করে পণ হিসাবে সব হারানোর পর পণ রাখা হয় পঞ্চ পান্ডবের অভিন্ন স্ত্রী দ্রৌপদীকে। এই দানেও যখন যুধিষ্ঠির হেরে যান তখন দ্রৌপদীকে তারা দখল করতে আসেন। প্রথমে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আসেন। এরপর সূর্যসন্তান কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের অপর পুত্র বিকর্ণকে হুকুম করেন পাণ্ডবদের সকলের কাপড় খুলে ফেলতে এবং সর্বশেষে দ্রৌপদীর বস্ত্র উন্মোচনের নির্দেশ দেয়া হয়। দুর্যোধন দ্রৌপদীর শাড়ি খুলতে শুরু করেন। তিনি শাড়ি টানতেই থাকেন এবং সেই শাড়ি দ্রৌপদীর গাত্র থেকে স্খলিত হয়ে দুর্যোধনের মুঠি ভরে ওঠে। দুর্যোধন দ্রৌপদীর শাড়ি খুলেই চলেছেন। কিন্তু শাড়ি আর শেষ হয় না। একপ্রান্ত ধরে টানছেন তো টানছেনই। কিন্তু অপর প্রান্ত আর আসে না। এভাবে দ্রৌপদীর কাপড় খুলতে খুলতে দুর্যোধন ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে বস্ত্রহরণে ক্ষান্ত হন।

দুর্যোধনের ন্যায় বাংলাদেশের নারীদের এই বস্ত্র হরণের প্রক্রিয়া চালু হয়ে গেছে।

'৯৮ সালের ২১ আগস্ট সাতক্ষীরায় একটি তালকে নিয়ে সন্ত্রাসীরা তুলকালাম কান্ড ঘটায়। নওগাঁ জেলার ধামরাইহাট থানার প্রত্যন্ত গ্রাম চকসবদলে মাহমুদা নাম্নী এক গৃহবধূকে উলঙ্গ করে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছিলো সন্ত্রাসীরা। প্রথমে গাছের তাল কুড়ানো নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এক পর্যায়ে প্রতিবেশী আশরাফ আলী ও তার সঙ্গীরা গৃহবধূ মাহমুদার উপর চড়াও হয়। তাকে ঘর থেকে টেনে-হিঁচড়ে চুল ধরে ঘরের বাইরে এনে মেতে ওঠে পৈশাচিক উল্লাসে। মারতে মারতে পরনের শাড়ি খুলে ফেলে। ব্লাউজের বোতাম ছিঁড়ে ফেলে। পেটিকোটের ফিতার গিট বেঁধে গেলে তা খুলতে না পেরে উপরের দিকে তুলে নগ্ন করে। এরপর সন্ত্রাসীরা শ্লীলতাহানি করে। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা নিয়ে প্রতিবেদক জানায়, মাহমুদা ব্যথা ও লজ্জায় কুঁকড়ে গেছে। তার চোখে ভয়ার্ত ভাব। ঠিক মতো কথা বলতে পারছে না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে কাঁদছিলো। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন। বাম স্তন থেতলে গেছে। যৌনাঙ্গের সামান্য উপরে লাথির আঘাত।

২৭ সেপ্টেম্বর '৯৮ নোয়াখালীর চাটখিল থানাধীন ১নং শাহাপুর ইউনিয়নের করটখীল গ্রামের সন্ত্রাসীরা কালা মিয়ার যুবতী কন্যা লিপি (১৪)কে বিবস্ত্র ও শ্লীলতাহানি করেছে। বাগানের নারিকেল পাড়তে লিপির মা বাধা দিলে বিকেলে ভাত রান্না করার সময় সন্ত্রাসীরা লিপির ওপর চড়াও হয়। একই মাসের ২৮ তারিখে ময়মনসিংহের ভালুকা থানার পাড়াগাঁও গ্রামে গার্লস স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী পারভীন আক্তার (১১) মাদ্রাসা থেকে বাড়ী ফেরার পথে দুর্বৃত্তদের কবলে পড়ে। নরপশুরা কিশোরীর হাত থেকে পবিত্র কোরআন শরীফ কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকে বিবস্ত্র করে কুমতলবে। গ্রামবাসীরা টের পেয়ে বিবস্ত্র অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে।

www.pathagar.com

আধুনিককালের দুর্যোধনরা

১৬ নভেম্বর সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী দল রাত দুটোয় পল্লবীর সুজাতনগর নতুন বস্তির ঘরে ঘরে ঢুকে মহিলাদের টানা-হেঁচড়া করে ঘর থেকে বের করে দেয়। যারা ঘর ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছেন তাঁদের শাড়ি-ব্লাউজ খুলে নেয়। বিবস্ত্র মহিলারা সন্ত্রাসীদের সন্তান-ভাই ডেকে করজোড়ে মিনতি করে শাড়ির বদলে পেয়েছে প্রহার। এ সময় সন্ত্রাসীরা কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষণ করেছে।

২০ জুলাই '৯৮ রাজশাহীর বাঘা থানা সদরে দুই যুবতীকে বিবস্ত্র করার ঘটনাটি প্রায় প্রতিটি দৈনিকে প্রকাশ পেয়েছে। একজন ব্যবসায়ীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বাসভবনে স্থানীয় সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। সরকারী দলের সন্ত্রাসীদের নির্যাতন থেকে বিরোধী দলীয় সমর্থক উক্ত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করতে আসে তার স্ত্রী ও বোন। ফলে ননদ-ভাবী উভয়ে দুষ্কৃতকারীদের নির্যাতনের শিকার হয়। প্রকাশ্যে যুবতীদ্বয়কে বিবস্ত্র করা হয় মধ্যযুগীয় কায়দায়। একই সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের ঘটনাটিও রাজশাহী জেলারই গোদাগাড়ী থানার। পাকড়ি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নির্দেশে একজন মহিলা ইউপি সদস্যের শাড়ি খুলে নেয় এবং ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলে পেটোয়া বাহিনী। ভিজিএফ কার্ডধারীদের গম বিতরণে চেয়ারম্যানের দুর্নীতির প্রতিবদের জবাব দেয় চেয়ারম্যানের লালিত সন্ত্রাস বাহিনী। পরের ঘটনাটিও একই জেলার। পুটিয়া থানায় মাইপাড়া গ্রামে ১৯ সেপ্টেম্বর প্রভাবশালী আওয়ামী সমর্থক জনৈক ব্যক্তি নির্জনে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে লোকজন নিয়ে এক মহিলাকে মারধর করে এবং শাড়ি খুলে নেয়।

পরবর্তী ঘটনাটি আরও বেশি উদ্বেগজনক। বিবস্ত্রকরণের পর চুল কাটা এবং ছবি তোলা। ৮/৪/৯৯ তারিখে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকাকে পাবনা থেকে জেলা সংবাদদাতা

www.pathagar.com

জানিয়েছেন, পাবনার ফরিদপুর থানা এলাকায় একদল সন্ত্রাসী দুই মহিলাকে শ্লীলতাহানী করার পর চুল কেটে, হাত-পা বেঁধে উলঙ্গ করে ছবি তুলে ব্ল্যাক মেইলিং করার অপচেষ্টা চালায়। এ ঘটনায় জড়িতদের পুলিশ এখনও বিচারের সম্মুখীন করতে পারেনি। উপরন্তু মামলার আসামীদের হুমকিতে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করছে সর্বস্ব হারানো উক্ত দুই মহিলা।

১১ মে সম্মিলিত বিরোধী দলের আহবানে হরতাল চলাকালে বিএনপি কর্মী মনি বেগমকে পুলিশ লাঞ্ছিত এবং বিবস্ত্র করেছে। এর সচিত্র প্রতিবেদন প্রতিটি দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে ১২ মে। এতে জনমনে প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং সরকার ও প্রশাসন নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এর প্রতিবাদে ক্ষোভ ও নিন্দা হয়েছে।

সম্প্রতি ২৫ জুন '৯৯ রাতে এক ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে পঞ্চগড়ে। তালমা আদর্শ গুচ্ছগ্রামের মহিলা সদস্যরা নিজেদের টাকায় রোপন করা ২টি ইউক্যালিপটাস গাছ বিক্রি করে পুকুরের মাছের পোনা কেনার জন্য। স্থানীয় টাউট-বাটপাররা গাছ দু'টি সরকারী বলে উৎকোচ গ্রহণ করতে চায়। সদস্যরা উৎকোচ দিতে অস্বীকার করলে থানার এসআই ও কনস্টেবলরা ৩ জন মহিলাকে বিবস্ত্র এবং ৬ জনকে লাঞ্ছিত, শিশুদেরও নির্যাতন করেছে। পুলিশের বর্বরতায় মহিলারা প্রতিটি মুহূর্ত নিরাপত্তাহীনতায় দিন যাপন করছে।

৪ জুলাইয়ের পত্রিকায় প্রকাশিত মহিলাদের বিবস্ত্র করার সর্বশেষ লোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার থানার গোপালনগর গ্রামে। পুলিশের উপস্থিতিতে এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী 'হান্নান বাহিনী' কর্তৃক যুবতী ও গৃহবধূদের সম্ভ্রমহানির প্রেক্ষিতে ৫২টি পরিবার গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রতিবেশীরা কুখ্যাত হান্নানকে গণধোলাই দেয়। মহিলাদের ওপর নির্যাতন, ধর্ষণ, বিবস্ত্রকরণ, অমানুষিক হামলা ১৯৭১ সালের বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। হান্নানের ভাই বাদী হয়ে নির্যাতিত গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে। পুলিশ তদন্তের নামে এলাকাবাসীর সাথে প্রহসন করছে। হান্নান দেবীদ্বার থানার দারোগা বিহার কান্তি শীলকে নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দারোগার উপস্থিতিতে মহিলাদের উপর আরেক দফা নির্যাতন চালায়। (সূত্র ঃ সাপ্তাহিক বিক্রম, বর্ষ ১২, সংখ্যা ১৫, ১৩–১৯ জুলাই '৯৯)

হোসাইন মুহাম্মদ ইফতেখারুল আলম একটি জাতীয় দৈনিকে চিঠিপত্র কলামে "দয়া করে বলবেন কি?" শিরোনামে লিখেন–

এক তরুণীর একটা দিনের কথা ভাবুন। মেয়েটি পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে তার মনে কতো গর্ব এবং আশা। সূর্যালোকিত সুন্দর সোনালী দিন। কলাভবনের সামনে অপরাজেয় বাংলা। মেয়েটি সেখানে দাঁড়িয়ে পথের ধারে। সে ইংরেজী বিভাগের ছাত্রী। তৃতীয় বর্ষে এবার। রিকশায় যাচ্ছে দু'জন যুবক। মেয়েটির উদ্দেশ্যে তারা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো নাম কী? মেয়েটি একা। নাম না বলে তাড়াতাড়ি সরে যেতে চাইলো সেখান থেকে। যুবকদ্বয়ের একজন রিকশা থেকে নেমে মেয়েটির কাছাকাছি চলে এলো। তার প্রশ্নের উত্তর সে পায়নি। সোজা চড় বসিয়ে দিলো মেয়েটির গালে।

www.pathagar.com

বিগত ২২ জানুয়ারী এ ঘটনা ঘটে গেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ঘটনার দুর্বৃত্তটি দেশের ছাত্র ক্যাডার। সম্প্রতি আরেকটি ঘটনা ঘটেছে শাহবাগ এলাকায় সংবাদপত্রে তা আসেনি। তিন তরুণী সন্ধ্যার পর আজিজ সুপার মার্কেট থেকে বেরিয়েছে এমন সময় এক যুবক তাদের অনুসরণ করতে থাকে। সে বাজে মন্তব্য ছোঁড়ে, এক সময় এক মেয়ের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এ সময় আরো কিছু লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে চিৎকার-চেঁচামেচি বাড়িয়ে দেয়। এক দুর্বৃত্তের সমর্থনে এগিয়ে আসে পাশেই আড্ডারত আরো কয়েকজন। সে জানিয়েও দেয়, সে একটি দলের ছাত্র ক্যাডার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ইচ্ছা করলে এ রকম তরুণীকে বিবস্ত্র করাও তার পক্ষে কোনো কঠিন কাজ নয়।

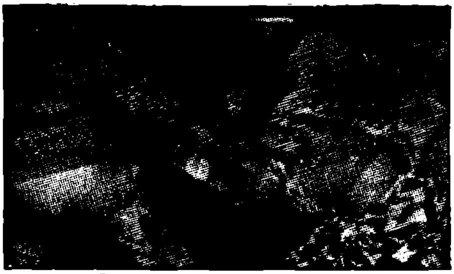
১৯৯৫ সালে রাজপথে পুলিশী নির্যাতন

এছাড়াও আমরা পত্রিকার পাতায় দেখেছি ১৯৯৬ সালে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষে কাজ করার অপরাধে এক মহিলাকে বিবস্ত্র এবং ১৯৯৭ সালে বোনকে নকল করার সুযোগ না দেয়ার অপরাধে ভাই কর্তৃক জনৈকা শিক্ষিকাকে কাপড় খুলে নিয়ে শুধুমাত্র পেটিকোট রেখে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। এরপরও এনজিও ও বুদ্ধিজীবীদের কোনো বক্তব্য-বিবৃতি লক্ষ্য করা যায়নি। এখানে তারা মুখে কুলুপ এঁটে বসে ছিলো। তাদের শুধু একটাই জিকির মৌলবাদ ও ফতোয়াবাজ। এরাই নাকি নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, নারী অপহরণ, এসিড নিক্ষেপসহ সব কিছুর জন্য দায়ী।

প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হলে অথবা বিয়ের প্রস্তাবে রাজী না হলে সন্ত্রাসী কর্তৃক এসিড নিক্ষেপ ও নারী অপহরণ এখন একটি নিয়মিত ঘটনা। এছাড়া অবৈধ প্রেমের বলি আত্মহত্যার ঘটনা ক্রমাগতভাবে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েই চলছে। এ অবস্থা যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে আগামী ৫ বছরে বোধ হয় আমেরিকা, বৃটেন ও ভারতকেও ছাড়িয়ে যাবে।

নারী স্বাধীনতা, নারী অধিকারের ঠেলায় এখন বাংলাদেশে নারী ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন হয়েছে একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। পিতা-মাতার সামনে কন্যাকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, ভাইয়ের সামনে বোনকে ধর্ষণ করা হচ্ছে। পাঁচ বছরের শিশু থেকে ষাট বছরের বৃদ্ধাও রেহাই পাচ্ছে না ধর্ষণকারীদের কবল থেকে। এমনকি ভাইয়ের সামনে বোনকে উত্যক্ত করলে ভাই বাধা দিলে তাকে লঞ্চ থেকে নদীতে নিক্ষেপ করার ঘটনাও ঘটেছে বাংলাদেশে। সেই হতভাগ্য ভাইয়ের লাশও খুঁজে পায়নি তার আত্মীয়স্বজনেরা। মুন্সীগঞ্জ থেকে ঢাকায় অবস্থানরত ভাইয়ের কাছে পিতার মৃত্যু সংবাদ বয়ে আনতে গিয়ে বুড়ীগঙ্গা মৈত্রী সেতুর কাছে ধর্ষিতা হতে হয়েছে হতভাগা এক তরুণীকে।

গত ২২/৮/৯৮ দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় "এনজিও ঃ এবার ধর্ষণ ও নির্যাতনকারীর ভূমিকায়" শিরোনামে দুটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে আতিক হেলাল

www.pathagar.com

লিখেছেনঃ

রাজধানী ঢাকার বাইরে একটি থানা শহরে এনজিওর কর্মকর্তারা নয়জন তরুণীকে ধর্ষণ করেছে বলে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। দেশব্যাপী ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেও এই ঘৃণ্য ঘটনাটির খবর মানুষের নজর এড়াতে পারেনি। খবরে প্রকাশ, পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ থানাধীন লক্ষ্মীহাটে ৯ জন তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে ১৫ আগস্ট একাধিক জাতীয় দৈনিকে খবর প্রকাশিত হয়েছে। 'দেবীগঞ্জ মহিলা কল্যাণ সেবা প্রকল্প' নামে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠান ঐ নয়জন তরুণীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার নামে প্রলুব্ধ করে নিয়ে আসে। প্রশিক্ষণের পরে ভাল চাকরি দেয়া হবে বলেও তাদেরকে আশ্বাস দেয়া হয়। তথাকথিত প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর ঐ নয়জনকে এনজিওর একটি কক্ষে রাতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে রাখা রুমে তরুণীরা আক্রান্ত হয় গভীর রাতে। বিশ-পঁচিশজনের একটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর দল গভীর রাতে ঐ রুমে ঢুকে ঐ নয়জন তরুণীর ওপর চড়াও হয়। পালাক্রমে তারা স্থানীয় ইউপি সদস্যের স্ত্রীসহ নয়জনকেই ধর্ষণ করে। ঐ ইউপি সদস্যের স্ত্রী পরে ঘটনা প্রকাশ করলে ইউপি চেয়ারম্যানের উদ্যোগে থানায় এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করতে যান। কিন্তু থানা কর্তৃপক্ষ প্রথমে মামলা গ্রহণ করেনি। শেষে ধর্ষিতাদের নিয়ে এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে এগার দিন পর মামলা গ্রহণ করা হয়। জেলার ডিসি-এসপি এই ধর্ষণের ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। ১২ আগস্ট ইউপি সদস্য সুশীলচন্দ্র বাদী হয়ে যে মামলা দায়ের করেছেন, সেটির স্মারক নম্বর ৫/১২-৮-৯৮।

এমনকি গত সরকারের একজন মন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন যে, কিছু এনজিও নারীদের বিভিন্ন কৌশল ও প্রতারণার মাধ্যমে মেয়েদের নগ্ন ছবি তুলে বিদেশে পাচার করছে। নারীদের স্বাধীনতা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার নামে বাংলাদেশের কোমলমতি মেয়েদের ইজ্জত হরণকারী এনজিও সাইনবোর্ডধারী কথিত কর্মকর্তা ও তাদের এদেশীয় দোসররা এদেশকে বানিয়েছে ধর্ষণের নরকরাজ্য। তথাকথিত মানবতাবাদী এনজিও এবং আমাদের পরজীবিদের চোখে নূরজাহান ও ইয়াসমিনের ঘটনা চোখে পড়লেও হাজারো নূরজাহান ও ইয়াসমিনদের ইজ্জত হারানোর আর্ত চিৎকার তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। এ সব অমানবিক নিষ্ঠুর ঘটনাগুলো নিয়ে প্রতিবাদ করা দূরে থাক কোনো বিবৃতিও লক্ষ্য করা যায় না। হতভাগা ইয়াসমিনের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী কোরআনখানি ও দোয়ার আয়োজন না করে ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী গীতিনাট্য প্রদীপ মিছিল ও মোটর সাইকেলে ভ্রমণ করে দিনাজপুরে ইয়াসমিনের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করলেও হাজার হাজার বাংলার ধর্ষিতা নারীদের নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কাজেই এনজিওদের মানবতাবোধ ও নারীপ্রেম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও রাজনৈতিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় জনাব মাশহুর হাসান "নারীর মূল সমস্যাটা ইসলাম, না স্বনির্ভরতার অভাব" শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধটি লক্ষ্যণীয়। তিনি এ নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

নারীবাদী আন্দোলনের নামে এনজিওরা পশ্চিমা বিচ্ছেদবাদী কায়দায় এই মহাদেশে,

www.pathagar.com

বিশেষত এই দেশে তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের কাঁধে সিন্দাবাদের ভূতের মতো কেমন গাঁট হয়ে বসেছে, টেলিভিশনের কল্যাণে তা একেবারে ফকফকা পরিষ্কার! 'হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট' বা 'রুরাল ডেভেলপমেন্ট' এনজিও অ্যাক্টিভিটিসের গোড়ার কথা বা মূল দর্শন হলেও নারী উন্নয়নের নামে ইসলাম নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে মেয়েদের ধর্ম, সমাজ, পুরুষ ও বন্ধনবিমুখ করে ঘরের বার করাই যে অধিকাংশ এনজিওর মূল মন্ত্র এটা প্রায় সবার কাছেই এখন স্পষ্ট। এই কথিত নারীবাদী বক্তব্যমূলক নাটক, স্পট, প্রামাণ্য প্রতিবেদন ও বিজ্ঞাপন চিত্র বিটিভিতে সম্প্রচারের বদৌলতে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে নারী উন্নয়নের আড়ালে ধর্ম ও সমাজ ভাঙার মেসেজ। কিছু কিছু 'স্পটে' সরাসরি আক্রমণ করা হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলামকে। আর এভাবেই প্রতিপক্ষ করা হচ্ছে সিংহভাগ মানুষের চেতনা ও উপলব্ধি জগত সংস্কৃতিকে।

২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিন ২ মার্চ সকাল সাড়ে ৯টার সময় পরীক্ষার্থীরা হলে প্রবেশ করতে থাকে। এ সময় কলারোয়া সরকারী কলেজ উপকেন্দ্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় যাদের সিট পড়ে তারা সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময় কতিপয় ছাত্র ক্যাডার ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি, ওড়না ধরে টানা-হেঁচড়া, কানের দুল, চেন ছিনতাই শুরু করে। ছাত্রী-অভিভাবকরা সন্ত্রাসীদের বাধা দিতে গেলে সন্ত্রাসীরা চেয়ার-বেঞ্চের ভাঙ্গা পায়া দিয়ে মারপিট শুরু করে। ফলে জীবন বাঁচাতে সিঁড়ির ভেতরে দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে পরীক্ষার্থিনী সামছুন্নাহার লিপি (১৮), শিক্ষিকা ফজিলা (২৯), অভিভাবক মামুন (২৪), হাবিব (১৯) নিহত হয় ও প্রায় ৫০ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে অভিভাবক কাশেম বর্তমানে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছে। আরও কয়েকজন মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। নারী নির্যাতকদের পদতলে পিষ্ট হয়ে নিহত হয়েছে সম্ভাবনাময়ী, সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী এই পরীক্ষার্থিনী অষ্টাদশী সামছুন্নাহার লিপি। প্রায় বছর হতে চললেও এ ব্যাপারে কলারোয়া থানার ওসি তথা পুলিশ দল কিংবা রাষ্ট্রীয়ভাবে এই তরুণীসহ নিহত চারজনের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এনজিও নামের নারীবাদীরা নির্বাক।

www.pathagar.com

বিটিভিতে জাতীয় সংবাদ বুলেটিনের আগে বা পরে প্রায়ই এমনি একটি 'স্পট' নিশ্চয়ই সচেতন দর্শকের চোখে পড়েছে। 'স্পট'টিতে তিনটি নির্যাতিত মেয়ের আর্ত উচ্চারণ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনটি মেয়েই গ্রামীণ সমাজে নিগ্রহ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে উচ্চকিত এবং সেই সুযোগে তাদের দ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ তথা ধর্মের বিরুদ্ধে। এদের মধ্যে তৃতীয় ও সর্বশেষ মেয়েটির স্পর্ধিত উচ্চারণ ভঙ্গী রীতিমতো দেখবার মতো। প্রথমে অত্যন্ত বিমর্ষ ও বিষন্ন।

'আমাকে কি চেনা যায়'?

তারপরে বিবৃত হয় তার নির্যাতনের কাহিনী। কীভাবে গাঁয়ের কিছু লোক তাকে নষ্ট করে। এই অন্যায়ের বিচার চাইতে গিয়ে বেপর্দা হয়ে শহরে যাওয়ায় উল্টো তার বিচার হয়। বর্ণনার এক পর্যায়ে কারা কীভাবে তার বিচার করলো তা বলতে গিয়ে ফুঁসে ওঠে মেয়েটি–

'তারা মানে– বুঝলেন? তা-রা–'

অত্যন্ত ক্ষোভ ও বিদ্রুপের সাথে দাঁতে দাঁত ঘষে 'তারা' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে গ্রামের আলেম সমাজের (যাদেরকে ফতোয়াবাজ বলে ধিক্কার দেয়া হয়) প্রতি বিষোদগার করা হয়েছে।

তারপর মেয়েটি বলে চলে– 'বিচারের আশায় সদরে গেছিলাম। বেপর্দা হইছিলাম। সেটা আমার পাপ। তারা সালিশ বসাইলো। ১০০টা দুররা মারলো। আমার পাপের শাস্তি....'।

এটুকু বলে ক্রোধে ফেটে পড়ে মেয়েটি। তার স্বরে চ্যাচিয়ে ওঠে–

'পাপ'?

কীসের পাপ? পা-প-প-প...?

ভাইব্রেশনের মধ্য দিয়ে তার ক্ষুব্ধ উচ্চারণটি ক্রমশ যেনো ইথারে ছড়িয়ে পড়লো।

বিজ্ঞ পাঠক একবার ভাবুন, নিরক্ষর গ্রামীণ সমাজে কালে-ভদ্রে হয়তো এ জাতীয় দু'চারটে ঘটনা ঘটে। হয়তো গ্রাম্য সালিশের নামে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও কুপমন্ডুক কিছু লোক ধর্মের নামে হয়তো খানিকটা বাড়াবাড়ি করে থাকতে পারেন, তাই বলে কি আধুনিক বিশ্বে সবচাইতে যুক্তিনিষ্ঠ বলে প্রমাণিত চিরশান্তির ধর্ম পবিত্র ইসলাম পচে গেলো? কিংবা পচে গেলেন সেই সব সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব যাঁরা 'মুফতি', যারা ইসলাম নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থায় সৃষ্ট সংকট সমাধানে সিদ্ধান্ত বা ফতোয়া দিয়ে থাকেন এবং দেয়ার অথরিটি যাঁদের রয়েছে এবং যাঁদেরকে এই এনজিও স্যাকুলার সমাজ ও সম্প্রতি তাদের মদদপুষ্ট সরকার 'ফতোয়াবাজ' বলে গালি দিয়ে যাচ্ছে অহরহ? সুকৌশলে পবিত্র ধর্ম ইসলাম ও এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারীদের পচানোর এই পাঁয়তারা কেনো?

মেয়েটি 'পাপ? কীসের পা-প...?' বলে ইসলাম ধর্মে নির্দেশিত নৈতিকতা-অনৈতিকতা বিচারের একটি অন্যতম মৌলিক মানদন্ডের প্রতি তার স্বরে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে। পর্দা প্রথার মতো একটি সম্ভ্রম রক্ষাকারী বিধানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা হয়েছে। অথচ পর্দা নারীর ব্যক্তিত্বকেই কেবল মহিমান্বিত করে না, নারীর নিরাপত্তার

www.pathagar.com

রক্ষাকবজ হিসেবেও কাজ করে আসছে। সম্ভ্রমহীনতা নারীকে তথাকথিত মুক্তির নামে যথেচ্ছাচার ও ব্যাভিচারী জীবনের দিকেই ঠেলে দেয় না, প্রকারান্তরে অনাচার-অনৈতিকতা-সন্ত্রাস ও ঘাতক ব্যাধি 'এইডস'-এর মতো ভয়াবহ অভিশাপের দিকে সমাজকে ঠেলে দেয়।

এনজিও ও সিভিল সোসাইটির নামে কথিত স্যাকুলার সমাজ এবং তাদের মদদপুষ্ট সরকার নারী উন্নয়নের পথে ইসলামকেই প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়; অথচ মানবতা ও সাম্যের ধর্ম ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে, যে মর্যাদা দিয়েছে, নারীর প্রতি পরিবার ও সমাজের যে কর্তব্য নির্দেশ করেছে যে সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকায় অথবা জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও সুকৌশলে সে সব দিক এড়িয়ে যাচ্ছে।

নারী নির্যাতন সমাজে বিচ্ছিন্ন কোনো সমস্যা নয়। অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, অনৈতিকতা- এরকম অন্য দশটির মতোই পরিপূরক একটি সমস্যা। এই সমস্যা রোধে যেমন দরকার গণসচেতনতা, শিক্ষা ও নৈতিকতা বোধের বিকাশ, তেমনি দরকার ইসলামের মতো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থামূলক একটি আধুনিক ও বিশ্লেষণধর্মী ধর্মের ঐসব যুক্তিনিষ্ঠ অনুপুঙ্খ নির্দেশের যথাযথ অনুশীলন; সেই সাথে দরকার ইসলামী আদর্শ ও চেতনাভিত্তিক সংস্কৃতি ও নৈতিকতা শিক্ষার প্রসার।

একটি বিষয় কি আমরা কখনো লক্ষ্য করে দেখেছি? নারী উন্নয়নের নামে এসব এনজিওগুলো পুরুষকে বাদ দিয়ে নারীকে আলাদাভাবে বাইরে এনে রাজমিস্ত্রী হওয়ার অধিকার, বোঝা বা মাল টানার অধিকার, মাটি কাটার অধিকার, বাসে বা টেম্পুতে এক সাথে বসার অধিকারের নামে স্বাবলম্বী করতে চাইছে কেনো? শুধু কি নারীর অতিরিক্ত কর্মঘন্টা ও শ্রম ঘোষণা? শুধুই নারীকে পুরুষের প্রতিপক্ষ কিংবা পুরুষকে ক্রমে নির্জীব করে তোলা? আরো কি কোনো গভীর উদ্দেশ্য নেই? নারীকে ঘরের বাইরে এনে পশ্চিমা উদারতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী স্টাইলে ধর্ম-সমাজ ও বন্ধন ভেঙে তাদের ব্যাভিচারী জীবনে ঠেলে দিয়ে পরনির্ভরশীল জাতি হিসেবে আমাদের ললাট লিখনে চিরস্থায়ী করার কোনো দুরভিসন্ধি কি নেই? একবার কি আমরা ভেবে দেখেছি, এই নারী তার কর্মোদ্দীপনা দিয়ে তার নিজের ঘরকেও সাজানো বাগান করতে পারে? ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে স্বামীকে সহযোদ্ধা মনে করে সাজাতে পারে শ্রম ও ঘামে গড়ে তোলা যৌথ খামার? আমরা কি দেখেছি একবার ভেবে, ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসনবিহীন এসব অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত-অধপতিত নারী সমাজ কর্মজীবনে বেসুমার মেলামেশার মধ্য দিয়ে কখনো কখনো যে সন্তান ধারণ করছে, এই ব্যবস্থায় এসব অবৈধ সন্তান জন্মহার ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে আগামী জেনারেশনের ভিত্তি কি দাঁড়াচ্ছে? সামাজিক ভারসাম্য স্থিতিশীলতা কিভাবে খন্ডিত হচ্ছে? এবং আমরা জাতি হিসেবে কোন্ ভয়ঙ্কর পথের দিকে অগ্রসর হচ্ছি?

পরিবেশে নারী নেত্রী, নারী উন্নয়ন কর্মী, এনজিও, স্যাকুলার সোসাইটি ও তাদের মদদপুষ্ট সরকারের কাছে বাস্তবতার আলোকে একটি প্রশ্ন না করে পারছি না- নারী উন্নয়নের পথে ইসলামকে এতো বাধা হিসেবে দেখছেন, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিগত সরকারের আমলেও আপনারা এতো সোচ্চার ছিলেন, এক ইয়াসমিন হত্যাকে ইস্যু করে

www.pathagar.com

আপনারা সরকারের পতন ঘটাতে রাস্তায় নেমেছিলেন, দিনের পর দিন মিছিল-মিটিং করেছেন, বক্তৃতাবাজি করেছেন, এমনকি বর্তমানেও যে নিন্দনীয় ঘটনার বিচারসহ বিষোদগার অব্যাহত রয়েছে, অথচ থানা হাজতে সীমা ধর্ষণ ও কারাগারে বর্বরোচিত আচরণে তার মৃত্যুর প্রতিবাদে এমনকি এর পরিহাসমূলক রায়ের বিরুদ্ধে আপনারা একটি উচ্চারণ পর্যন্ত করলেন না? এ সরকার গদিনশীন হওয়ার সাড়ে তিন বছরে ধর্ষিত হয়েছে ৮১০৩৭ জন- কই তখন তো কিছু বললে না? এই কি আপনাদের নারী আন্দোলন ও নারীর প্রতি সহানুভূতির নমুনা? এই কি নারী উন্নয়নের নিদর্শন?

ইসলাম ও নারী অধিকার সংরক্ষণের নামে উচ্চকণ্ঠ বর্তমান সরকার ও তার পদলেহী নারী নেত্রী, উন্নয়ন কর্মী, এনজিও এবং কথিত স্যাকুলার সমাজ জবাব দেবেন কি?

শুধুমাত্র ২৩ জুন থেকে ৩১ মে '৯৭ পর্যন্ত ১১ মাসে সারা দেশে কমপক্ষে ২৫২ জন নারী ধর্ষিতা হয়েছে। ধর্ষিতাদের মধ্যে ৩৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। তরুণীদের মুখে এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ৬৬টি। এসব অপরাধী কারা? এদের রাজনৈতিক পরিচয় কি? এদের মধ্যে কতজন মৌলবাদী বা তাদের ভাষায় ফতোয়াবাজ রয়েছে? জানি এসব উত্তর তথাকথিত মানবতাবাদী এনজিও এবং বুদ্ধিজীবীদের জানা থাকলেও এরা হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে এ ব্যাপারে একেবারে নীরব।

৬ ডিসেম্বর '৯৪ কুষ্টিয়া সদর থানার প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ওসমান গণির (৩৫) স্ত্রী রোজিনা পরকীয়া প্রেমে মত্ত হয়ে প্রেমিকের নির্দেশে স্বামীকে এসিড দগ্ধ করলো, এগুলো কি বর্বরতা নয়? এগুলো কি তথাকথিত প্রগতিশীলতার নামে চরম অসভ্যতার বহিঃপ্রকাশ নয়? এভাবে আর কতোদিন মতলববাজরা এ জাতিকে বিভ্রান্ত করবে?

উল্লেখিত দৃষ্টান্ত আরো দেয়া যায়। কিন্তু এসব অমানবিক বর্বর ঘটনাগুলো নিয়ে তথাকথিত নারীবাদী এনজিওদের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কোনো বিবৃতি, মিটিং, মিছিল, প্রতিবাদ হয়নি। এরা একেবারে নিশ্চুপ। এদের মানবতা তখন উথলে উঠেনি। বিবেক দংশন করেনি। নারী নির্যাতনের এসব লোমহর্ষক সংবাদগুলো যেন চোখেই পড়ে না। প্রখ্যাত সাংবাদিক মরহুম মানিক মিয়ার ভাষায় বলতে হয়- "বিলাই যেন তাদের চোখে মুতিয়া দিয়াছে।"

এসব ঘটনাগুলোতে যদি কোনো অর্ধশিক্ষিত মোল্লা-মৌলভী জড়িত থাকতেন তাহলে সারা দেশব্যাপী প্রতিবাদ, বক্তৃতা, বিবৃতির ঝড় উঠতো। ফতোয়াবাজকে উপলক্ষ্য করে মহান ধর্ম ইসলামের বিধি-বিধানকে বর্বর ও অমানবিক হিসেবে চিহ্নিত করতো।

আমাদের এই ছোট্ট দেশটিতে পাহাড় সমান সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা নিয়ে প্রগতিবাদী ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই- এরা সভা-সমিতিতে শুধু ফতোয়াবাজদের খুঁজে। ফতোয়াবাজরা নাকি সারা বাংলাদেশে মেয়েদেরকে শুধু দো-র-রা মারছে। তাই এদের কর্মকান্ড দেখলে স্বাভাবিকভাবেই বলতে ইচ্ছে করে। দূর-হ এনজিও এবং তাদের এ দেশীয় দালালেরা। দূর-হ মানবতার শত্রুরা। দূর-হ অপশক্তির ছায়ারা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে বর্তমানে ধর্ষণ ঘটনা বৃদ্ধির অনেকগুলো কারণের মধ্যে নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখযোগ্য। যেমন ঃ

১. ঢাকা শহরসহ দেশের বড় বড় শহরের প্রায় প্রত্যেক খবরের কাগজের দোকানে এবং রাস্তায় ফুটপাতে যুবতী মেয়েদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছবি ও কু-রুচিপূর্ণ যৌন উত্তেজনামূলক লেখা সম্বলিত অসংখ্য সাপ্তাহিক যৌন পত্রিকা, পর্ণো বই প্রকাশ্যে ও অবাধে বিক্রি হচ্ছে। ঐ সমস্ত বুক স্টলে ৩০/৪০ টাকায় যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন ভঙ্গীতে শুধুমাত্র যৌন ক্রীড়ারত অসংখ্য রঙ্গিন ছবির বই বিক্রি হচ্ছে। ঐ সমস্ত পর্ণো পত্রিকা ও পর্ণো বইয়ের ক্রেতা হলো স্কুলের নাবালক ও কিশোর ছাত্ররা, যুবক ও শ্রমিকরা। এই সমস্ত বইয়ের যৌন উত্তেজনামূলক বিকৃত লেখা পড়ে এবং উলঙ্গ ছবি দেখে বর্তমানে কিশোর ও যুব সমাজ যৌন উন্মাদ হয়ে ধর্ষণ ঘটাচ্ছে।

২. বাসস্ট্যান্ডগুলোর বড় বড় দোকানে বিপুল পরিমাণে শুধুমাত্র নগ্ন ছবির বই, পর্ণো ছবির বিদেশী বই প্রকাশ্যে ও অবাধে বিক্রি হচ্ছে।

৩. ঢাকা থেকে সমস্ত যৌন সাপ্তাহিকগুলো প্রকাশিত হচ্ছে তাতে কক্সবাজারে বা অন্যান্য শহরের প্রমোদ বালাদের নাম, যে হোটেলে থাকে তার নাম ঠিকানা, তাদের শারীরিক সৌন্দর্য্যের বিবরণ দেয়া থাকে। যদি উল্লেখিত ধর্ষণের কারণগুলো রহিত করা যায় তবে দেশের ধর্ষণের ব্যাপকতা অনেক কমে যাবে। দেশে সুস্থ অবস্থা ফিরে আসবে। মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে। এ জন্য সরকারকে সদিচ্ছা নিয়ে এহেন ধর্ষণজনিত জাতীয় বিপর্যয় হতে দেশকে রক্ষার জন্য অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। এবং নিম্নোল্লেখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

ক. অবিলম্বে দেশব্যাপী পর্ণো ছবি ও পর্ণো পত্রিকা বিক্রি বন্ধ করতে হবে।

পুনর্বাসনের দাবীতে নারায়ণগঞ্জের পতিতারা

www.pathagar.com

দেশে যারা পর্ণো পত্রিকা প্রকাশ করছে এবং যারা বিক্রি করছে তাদের ধরে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ. অবিলম্বে ব্লু-ফিল্মের ক্যাসেট বিক্রি বন্ধ করতে হবে।

গ. সিনেমা হলগুলোতে অবিবাহিত এডাল্ট ইংরেজী ছবি দেখা বন্ধ করতে হবে।

ঘ. ম্যাসেজ পার্লারের ছদ্মাবরণে মিনি পতিতালয়গুলো বন্ধ করতে হবে।

ঙ. অভিভাবক বা পিতা-মাতা ছাড়া ৩/৪ জন বা ৫/৬ জন কিশোর বা যুবকের একত্রে আবাসিক হোটেলে যাতায়াত বা রাত্রি যাপন, ট্রেনের রিজার্ভ কামরায় মহিলা বা যুবতী নিয়ে ভ্রমণ বা সমুদ্র সৈকতের হোটেলে রাত্রি যাপন বন্ধ করতে হবে।

চ. দেশের রাস্তা-ঘাটে, পার্কে ভ্রাম্যমান পতিতাদের বা প্রমোদবালাদের অবাধ বিচরণ বন্ধ করতে হবে।

বাংলাদেশে সুষ্ঠু নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করতে উপরের প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন অতীব প্রয়োজন। সরকার তার পুলিশ বাহিনী ও জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় তা বাস্তবায়ন করলে দেশে ২/৪ বছরের মধ্যে ৯০% ধর্ষণসহ যৌন অনাচার কমে যাবে বলে বিশ্বাস।

নারীর মজুরী বৈষম্য

সেন্টার ফর ডেভেলপমন্টে সার্ভিসেস নামে একটি এনজিও মজুরী বৈষম্য নিয়ে একটি নাটিকা প্রায়ই টিভিতে প্রচারিত হয়। অথচ আমাদের দেশে এনজিওরা নারীদেরকে সবচেয়ে কম মজুরী প্রদান করে। কোনো পরিবারে পুরুষ বেকার থাকলেও এরা পুরুষদেরকে চাকরি দেয় না, মহিলাদেরকে চাকরিতে নিয়োগ করে। যেহেতু মহিলারা কোনো প্রতিবাদ করে না। এরা প্রতিনিয়ত শ্রম আইন লংঘন করছে। দেশে কর্মরত এনজিওগুলোর বেশির ভাগই আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রচারের আড়ালে জমজমাটভাবে মহাজনী কায়দায় সুন্দর ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব এনজিওর হাতে আন্তর্জাতিক শ্রম আইন ও দেশের প্রচলিত শ্রম আইন লংঘিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। এসব এনজিও'র দ্বারা বিত্তহীন মানুষের অর্থ আত্মসাতের মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনাও ঘটেছে। এদের সুদের হার ১২%-২০% পর্যন্ত। প্রধানত এরা গ্রাম পর্যায়ে বিত্তহীন নারীদের টাকা দিয়ে থাকে।

লাখ লাখ গার্মেন্টিস শ্রমিককে নামমাত্র মজুরীতে ১৬-১৮ ঘন্টা পরিশ্রম করানো হচ্ছে, বদ্ধ ঘরে গুদামের মধ্যে বসে পশুর মতো গরমে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে, খাবারের সুযোগ দূরে থাক ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পানি ও বাথরুমের সুযোগটুকুও দেয়া হচ্ছে না, বের হবার সময় অভিযুক্ত অপরাধীর মতো শরীর হাতড়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে, চিকিৎসা ও ন্যূনতম জীবন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছাড়াই কাজ করানো হচ্ছে।

এ সকল এনজিওগুলোর মাঠ পর্যায়ে কাজ করার জন্য বিপুল সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন হয়। ফলে প্রায়ই বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে উচ্চ মূল্যে ফরম বিক্রি করে কর্মচারী সংগ্রহ

www.pathagar.com

করা হয়। এ সকল কর্মচারীর বেতন শব্দটি ব্যবহার না করে ভাতা-প্রশিক্ষণ ভাতা ইত্যাদি নাম দিয়ে মাসে মাত্র ৪০০ টাকা হতে ৭০০ টাকা দিয়ে থাকে। একজন শ্রমিকের জন্য ৮ ঘন্টা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হলেও এনজিওগুলো ১২ ঘন্টার উর্ধ্বে কাজ করিয়ে নেয় কিন্তু কোনো প্রকার ওভারটাইম বিল প্রদান করে না। এসব শ্রমিক-কর্মচারীর জন্য কোনো চিকিৎসা সুবিধা থাকে না। পোশাক থাকে না, উৎসব বোনাস থাকে না, চাকরি শেষে কোনো আর্থিক সুবিধার নিশ্চয়তা থাকে না। এভাবে শ্রম আইন লংঘন করা হলেও দেশের প্রচলিত আইনে এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না বা কোনো শ্রমিক নেতাও সোচ্চার হন না। আর নির্যাতিত বঞ্চিত শ্রমিক-কর্মচারীরাও চাকরি হারানোর ভয়ে কোনো প্রতিবাদ করেন না।

ঋণের নামে নারী শোষণ

এক সময় নীলকরেরা দাদন দিয়ে চাষীদেরকে নীল চাষ করতে বাধ্য করতো। এখন নব্য শোষক এই এনজিওরা চড়া সুদে ঋণ দিয়ে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বৃটিশ আমলে মহাজনেরা ঋণ আদায়ের জন্য কৃষকদের লোটা-বাটি নিয়ে আসতো। ভিটেয় ঘু-ঘু চড়াতো। জমি-জিরাত নীলামে চড়াতো। ঠিক একই স্টাইলে এনজিওদের কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে এর পরিনাম ফল বৃটিশ আমলকেও হার মানায়। যা আমরা প্রায়ই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রত্যক্ষ করি। অসংখ্য দৃষ্টান্ত থেকে এখানে কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি।

রামচন্দ্রপুর, ঝিনাইদহ থানার হলিধানী ইউনিয়নের অধীন একটি গ্রাম। গ্রামীণ ব্যাংকের হলিধানী শাখার আওতায় এই রামচন্দ্রপুরে ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। বছর দুয়েক আগে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সমিতিভুক্ত ৩৫ জন মহিলার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো আপনাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা কি ভালো হয়েছে? ৩৪ জনই জবাব দিয়েছেন– 'না, বরং অবস্থা আরো খারাপ। শুধু একজন মহিলা বলেছিলেন ভালো। কিন্তু তার গ্রুপ চেয়ারম্যান জানালেন, অভাবের কথা বলতে লজ্জা লাগায় সে মিথ্যা বলেছে। কেননা গত কিস্তির টাকা নিরূপায় হয়ে হাঁড়ি বিক্রি করে পরিশোধ করেছে। ঋণ গ্রহীতা মহিলাদের পরিবারের প্রায় অধিকাংশের দিনমজুরীই আয়ের একমাত্র উৎস। স্বল্প সংখ্যক ক্ষুদে ব্যবসায়ে জড়িত। এদের অনেকের কোনো জমি নেই বা কয়েক শতক জমি আছে। পরিবারের গড় জনসংখ্যা ৪.৫০ জন। পাঁচজন সদস্য নিয়ে এটি গ্রুপ, ৮টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠন করা হয়। প্রত্যেক সদস্যকে গ্রুপভুক্ত করার সময় ৭.০০ টাকা এবং প্রতি সপ্তাহে প্রথম বছর এক টাকা করে সঞ্চয় গ্রুপ ফান্ডে জমা দিতে হয়। দ্বিতীয় বছর হতে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা নেয়া হয় ৩.০০ টাকা করে। ঋণ প্রদানের সময় জামানত নেয়া হয় না ঠিকই কিন্তু প্রত্যেক সদস্যদের জন্য প্রত্যেকে এবং সমষ্টিগতভাবে ঋণের জন্য দায়ী থাকে। যদি কোনো সদস্য কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হয় তবে ঋণ গ্রহীতারা সম্পদাদি বিক্রি করে অথবা নিজেরা দিয়ে দায়মুক্ত হতে চায়। জানা যায়, অধিকাংশ ঋণ গ্রহীতারাই ঋণ ১০ হতে ১৫ সপ্তাহ যেতে না যেতেই সমুদয় টাকা খরচ করে ফেলে।

www.pathagar.com

তখন দিনমজুরী করে বা হাঁড়ি পাতিল, হাঁস-মুরগী বিক্রি করে কিস্তি চালায়। কিস্তির দিন ঋণ গ্রহীতারদের নিকট মহাদুর্যোগের দিন হিসেবে হাজির হয়। এই দিনে তারা আর পরিবারের কেউ থাকে না। হয়ে পড়ে ব্যাংকের সম্পত্তি। খোদেজা ঋণ নিয়ে একটি গাভী কিনেছিলো। কিস্তি দিতে না পারায় বাধ্য হয়ে গাভী বিক্রি করে কিস্তি পরিশোধ করেছিলো। ৬ ডিসেম্বর '৯৪ মুরগী বিক্রি করে কিস্তি পরিশোধ করে। কিস্তি দিতে না পারায় রমেছা বেগমের নতুন কাঁথা (যা তখনও সেলাই হয়নি) গ্রুপ চেয়ারম্যান বিক্রি করে কিস্তি আদায় করেছে। রূপসী ঋনের টাকা দিয়ে টিন কিনে ঘর বানিয়েছিলো। সেই চালের টিন বিক্রি করে কিস্তি চালিয়ে এসেছে। ১৩ ডিসেম্বর '৯৪ সে কিস্তির টাকা সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। ব্যাংকের লোক ও গ্রুপ সদস্য তার ঘরে তল্লাশি করে বিক্রি করার মতো এক ভাড় ধান পায়। সেই ধান বিক্রি করে কিস্তির অর্থ আদায় করেছে। সুফিয়া খাতুন নলকূপ বসিয়েছিলো ঋণ নিয়ে। কিস্তি দিতে ব্যর্থ হওয়ায় নলকূপের হেড বন্ধক রেখে কিস্তির অর্থ আদায় করা হয়। এটা ১৯৯৪-এর নভেম্বর মাসের ঘটনা। উল্লেখ্য, বিশুদ্ধ পানির জন্য সে নলকূপ বসিয়েছিলো সমিতির সদস্য লাল ভানু। কিস্তির দিন তার জামাই এসেছিলো। কিন্তু কিস্তির টাকার জন্য জামাইকে অভুক্ত রেখে চাল বিক্রি করে কিস্তি মিটিয়েছে। বছর কয়েক পূর্বে খুলনার বিউটি বেগম 'আশা' নামক একটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছিলো। কিন্তু যথাসময়ে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তার নাকের নথ খুলে নিয়েছিলো। স্বামী অপমানে আত্মহত্যা করেছিলো।

সাপ্তাহিক খবরের কাগজ ২১ সেপ্টেম্বর '৯৩-তে লিখেছেন ঃ এক বিধবাকে ঋণ দেয়া হয় ৩ হাজার টাকা। প্রথম কয়েক কিস্তি মোটামুটি ভালোভাবেই শোধ করে। তারপর শুরু হয় অনিয়ম। চাপের মুখে পড়ে দুটো ছাগল ছিলো বিক্রি করে কিছু কিস্তি শোধ করে, কিছু নিজের জন্য খরচ করে। তারপর আবার চাপ। ভয়ে বাড়ির একটা আমগাছ বিক্রি করে। এতেও শোধ দিতে পারে না কিস্তি।

কর্মীটির চাপ বাড়তে থাকে। বিধবা ভয়ে পালিয়ে থাকেন ক'দিন। একদিন ধরা পড়ে যান। কর্মীটি রাগে মহিলার চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে গলার উপর পা তুলে দিয়ে বলতে থাকে– বল্ কবে দিবি টাকা। টাকা না দিলে মেরেই ফেলবো। মাত্র ৪শ' টাকার জন্য এই বর্বর অত্যাচার। মহিলা ঘরের টিন বিক্রি করে ব্র্যাকের 'দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি'র হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কর্মীটি হিসেব করে দেখালেন যে, এই মহিলার কাছ থেকে তিন হাজার টাকা ঋণের পরিবর্তে দেড় বছরের মধ্যে সুদাসলে সাড়ে ৪৫শ' টাকা আদায় করা হয়েছে। (সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, ২১ সেপ্টেম্বর '৯৩)

১৭ই আগস্ট '৯৮ তারিখে একটি জাতীয় দৈনিকে "এ নিয়ে কোন মন্তব্য প্রয়োজন আছে কি" শিরোনামে লিখেছে ঃ "গ্রামীণ ব্যাংক কর্মকর্তাদের চাপের মুখেই রাবেয়া (২৮) গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। ব্যাংকের সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করার কোনো সামর্থ্য ছিলো না তার। চেষ্টা-তদবির করেও সে জোটাতে পারেনি কিস্তির টাকা। অথচ কিস্তি ছাড়া কেন্দ্রে গেলে রাবেয়াকে আটক রাখা হবে। খুলে নেয়া হবে পরনের কাপড়-চোপড়। কর্মকতাদের এমন হুমকি-ধমকির মুখে সম্ভ্রম রক্ষার্থে রাবেয়া আত্মহননের পথ বেছে নেয়। নির্মম এ ঘটনা ঘটেছে ঢাকার দোহার থানাধীন খাড়াকান্দা গ্রামে।"

www.pathagar.com

ঘটনাটি এখানেই শেষ নয়। রাবেয়ার এই মর্মান্তিক মৃত্যুর পর ঋণের টাকা পরিশোধ ছাড়া এনজিও কর্মকর্তারা তার লাশটি পর্যন্ত দাফন করতে দিচ্ছিল না। বাধা দিয়ে বলেছিলো, "আগে ঋণের টাকা পরিশোধ, পরে লাশ দাফন করবে।" শেষে এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে রাবেয়ার লাশ দাফন করা হলেও সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তার অসহায় পরিবারকে "এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হলে অসুবিধা আছে" বলে নানা প্রকার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে বলেও পত্রিকার খবরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যায়, ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে অক্ষম হওয়ায় আর আর সি নামের একটি এনজিও যশোরের অভয়নগর থানার মশরহাটি গ্রামের হেনা বেগমের তিন বছর বয়সী শিশু সন্তানকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে তিন দিন আটকে রাখে এবং তার প্রাণনাশের হুমকি দেয়। বাড়ী বাড়ী ঝি-এর কাজ করেন হেনা বেগম। বছরখানে আগে তিনি ওই এনজিও'র কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন ৪০০০ টাকা। কিস্তি পরিশোধে অক্ষম হওয়ায় আর আর সি প্রথম দফায় তার থালা-ঘটিবাটি ও একটি ছাগলসহ সবকিছু নিয়ে গিয়ে তাকে সতর্ক করে দেয়। তারপর গত ১২ সেপ্টেম্বর '৯৯ তুলে নিয়ে যায় তার তিন বছর বয়সী শিশু সন্তানকে। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে থানায় খবর দিলে অভয়নগর থানা পুলিশ পাভেলকে উদ্ধার করে। পাভেল আধো আধো ভাষায় জানায় যে, ওরা কেটে নদীতে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলো।

এনজিওগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের নামে গত ২৮ বছর যাবত দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারী মুক্তির নামে কিভাবে শোষণ করছে তা আমাদের চারপাশের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা প্রত্যক্ষ করলেই তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। দেশ স্বাধীন হবার পর এ দেশে ভূমিহীনদের সংখ্যা ছিলো ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ। বর্তমানে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৮৭ শতাংশই আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত দারিদ্র্য সীমার নিচে মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

তেলের ঘানি টানছে এক কিশোরী ও গৃহবধূ। বাংলাদেশের গ্রামে এমন দৃশ্য এই আধুনিককালেও চোখে পড়ে। যে কাজ গরু বা ঘোড়া দিয়ে করানোর কথা সে কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে নারী। এর পেছনে পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা যেমন দায়ী তেমনি দায়ী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী। দেখা গেছে কোনো কোনো অঞ্চলে ঘানি টেনে তেল উৎপাদন করে সংসারের আয়-রোজগার বাড়াতে কোনো কোনো অঞ্চলে পুরুষের একাধিক বিবাহ পর্যন্ত করছে। ছবিটি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে তোলা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে দশ হাজারের বেশি এনজিও কাজ করছে। এর মধ্যে প্রায় এক হাজারের বেশি এনজিও বিদেশী সাহায্য পেয়ে থাকে। এরা দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারী মুক্তির নামে প্রতি বছর বহু হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে। কিন্তু সকল এনজিও'র সামগ্রিক অবদানের ফলে বাংলাদেশের ৮০ হাজার গ্রামের মধ্যে ১০টি গ্রামের দারিদ্র্য বা নিরক্ষরতা দূরীকরণ হয়েছে এমন বলা যাবে না। এনজিওরা শূন্য কলসির মতো শুধু বাজেই বেশি। তবে শূন্য কলসির মতো তারা নির্দোষ নয়।

এনজিওদের কর্মতৎপরতা মানবিক নয়; রাজনৈতিক

একশ্রেণীর এনজিও'র লক্ষ্য হলো বাংলাদেশী মুসলিমদের মন-মানস থেকে ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও শ্বাশত মূল্যবোধকে ক্রমশঃ মুছে ফেলা। এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম, জীবনবোধ ও আচরণের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টির কাজে তারা সূক্ষ্ম চক্রান্তে লিপ্ত। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এরা বেছে নিয়েছে এদেশের দারিদ্র্য নারী সমাজকে এবং এদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আলেম সমাজকে।

প্রাচ্যে পুরুষ অর্থ উপার্জন করে, নারী তা ব্যয় করে। পাশ্চাত্যে নারী এবং পুরুষের আয়, ব্যয়, ব্যাংক হিসাব সম্পূর্ণ আলাদা। এরূপ পরিবেশে "কিসের বর, কিসের ঘর, যদি না থাকে স্বাধীনতা" প্রকারের শ্লোগান মুসলিম সংস্কৃতিতে হুমকিস্বরূপ।

একজন অর্থনীতিবিদ বলেছেন, আমরা যখন জাতীয় আয় হিসাব করি, তখন মেয়েদের সাংসারিক শ্রমের কোনো হিসাব ধরি না। ধরি না তারা পুত্র-কন্যাকে মানুষ করবার পেছনে দেয় তার শ্রমের মূল্য। অথচ একটা জাতীয় জীবনে এই শ্রমের মূল্য কোনোক্রমে কম নয়। এর জন্য কোনো আর্থিক মূল্য আমাদের দিতে হয় না বলে জাতীয় আয়ের হিসাবে তা পড়ে না। এই শ্রম যদি না থাকতো, তবে এখনও প্রায় সব জাতির জীবন ও অর্থনীতি অচল হয়ে পড়তো।

মুসলমান সমাজে, এমনকি ইউরোপ-আমেরিকার অতি আধুনিক সমাজেও যে প্রশ্নটি এখনও মীমাংসিত হয়নি, তাহলো মায়েরা কতোটা বাইরের কাজ করবে। মায়ের উপর শিশুর যে বিশেষ জন্মগত দাবী, তা নারী স্বাধীনতার নামে কতোটা অস্বীকার করা চলে? নিছক জীবতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও বলতে হয়, সমাজ জীবনে পুরুষ ও নারীর ভূমিকা কখনই অবিকল এক হতে পারে না। সংসারে নারীর একটা পৃথক ভূমিকা আছে, আর তা থাকাও উচিত। না হলে এ বিশ্বের বুকে মানবধারা বিলুপ্ত হতে পারে। পরিবার প্রথা হলো মানব সমাজের ভিত্তি।

আজকে নারী অধিকারের নামে আমাদের ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক ভিত্তি ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। আমাদের দেশে কিছু এনজিও চাকরির নামে প্রলোভন দিয়ে বিভিন্ন ঘৃণ্য কাজে জড়িয়ে ফেলছে। একদিকে নারীদেরকে বিভিন্ন কৌশলে শোষণ করছে, অন্যদিকে নারী অধিকারের ছদ্মাবরণে দেহবাদের প্রসার চালাচ্ছে। এসব সংগঠন কতোটুকু সফল হয়েছে তা না বলে অন্তত একথা বলা যায় যে, এগুলোর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ইতোমধ্যে আমাদের সমাজে লক্ষ্যণীয়। এসব সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বোঝানো হচ্ছে অবাধ যৌনতা স্বাভাবিক বিষয়। এতে খারাপের কিছু নেই। নারীদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে

www.pathagar.com

অবাধ যৌনতার বিষয়টি গ্রহণ করতে হবে। এর বিরুদ্ধতা একজন আধুনিক সমঅধিকার বিশ্বাসী মানুষের জন্য গোড়ামী। এইসব মগজ ধোলাই করে অবাধ যৌনতার স্বাদ আস্বাদনকারী কর্মী বাহিনী ছড়িয়ে পড়ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এরা নানাবিধ সুবিধার আড়ালে অপকর্মের জাল বিস্তার করছে। অবশ্য এ কাজে তারা নিজেদের মধ্যে এ পরিবেশ সৃষ্টি করে নিচ্ছে বা নিয়েছে।

গত কয়েক বছর যাবৎ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও অনেক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে 'বিশ্ব নারী দিবস' পালিত হয়ে আসছে। এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্র। তথাকথিত নারী মুক্তির নামে আমাদের মা-বোনদের রাজপথে এনে অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ শ্লোগান দিতে বাধ্য করছে। এদের নোংরা শ্লোগান শুনে অনেকেই হতবাক হয়েছে। পেশাদার পতিতারাও বোধ হয় এহেন কর্মে লজ্জা পেয়েছে। পেশাদার পতিতারাও রাজপথে প্রকাশ্যে নিজেদেরকে পতিতা পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে কিন্তু এদের তাও ছিলো না।

নারী অধিকারের নামে তারা যে সব সর্বনাশা শ্লোগান দিয়েছে তা তুলে ধরছি। যেমন ঃ

কিসের ঘর, কিসের বর
ঘর যদি হয় মার ধর।
শাক-শুঁটকি খাব না,
স্বামীর কথা মানব না।
আমার দেহ, আমার মন,
কথায় কেনো অন্য জন।
রাতের বেড়া ভাঙ্গবো,
স্বাধীনভাবে চলবো।
নারী, নারী, নারী,
সবই করতে পারি।
আমার শরীর আমার না,
এমন কথা মানবো না।
একটা কথা সোজাসুজি,
নিজের শরীর নিজে বুঝি।
রাজপথে নারীর সাড়া,
জাগরণের নূতন ধারা।
নির্যাতনের শেষ চাই,
বাঁচার মতো বাঁচতে চাই।
নিজের হাতে কাজ করি,
নিজের ভাগ্য নিজে গড়ি।
রাষ্ট্র এবং পরিবারে
সমান হবো অধিকারে।

www.pathagar.com

এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সূত্র থেকে জানা যায়, নারী দিবস পালনের নামে কুখ্যাত তসলিমার কবিতা আবৃত্তি, ফতোয়া দাতার দাড়ি ছিঁড়ে ফেলার হুমকি, প্রকাশ্যে যুবতীদের উদ্দাম অশালীন নৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে নারী প্রগতির শ্লোগানধারীরা 'বিশ্ব নারী দিবস' পালন করেছে। সমাবেশে ও মিছিলে শার্ট-প্যান্ট-গেঞ্জি পরিহিতা কিছু অত্যাধুনিকাও ছিলো।

পুরুষের ব্যান্ডের তালে তালে নারীবাদী মহিলারা মিছিলে নাচতে নাচতে শ্লোগান দেয়- "নারী নারী নারী, আমরা সবই করতে পারি"। রমনা পার্কের বটমূলে আয়োজিত সভায় সমবেত সংগঠকদের প্রথম কথা ছিলো- 'ঘরের বেড়া ভাঙবো' স্বাধীনভাবে চলবো।' এক পর্যায়ে ব্যান্ডের সাথে কয়েকজন যুবতী অশ্লীল ব্রেক ড্যান্স শুরু করে দেয়। এদের মধ্যে 'নারী পক্ষ' নামের একটি এনজিও'র নাসরিন নাম্নী এক নেত্রী ছিলো অগ্রণী ভূমিকায়। এই কনসার্নে সিপিবিসহ বহু এনজিও'র মৈত্রী ও কর্মীরা অংশগ্রহণ করে। বেলা ১২টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়। বটমূলে 'স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া' নামে একটি নাটক প্রদর্শিত হয়। এতে মেয়েরা পুরুষ সেজে অভিনয় করে। একজন দাড়ি টুপি লম্বা কোর্তা লাগিয়ে মওলানা সাজে। তিনি ফতোয়া দেয়ায় এক মহিলা তার দাড়ি ছিঁড়ে ফেলার হুমকি দেয়। মহিলারা এই আলেমকে ফতোয়া দানের 'শাস্তি দিতে উদ্যত হলে তিনি সঙ্গীসহ পলায়ন করেন। এটাই নাটকের সারমর্ম।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯১০ সালে জার্মানির সমাজতন্ত্রী নেত্রী জেট্‌কিন ৮ মার্চকে 'বিশ্ব নারী দিবস' হিসেবে প্রথমবারের মতো ঘোষণা করেন। এর দীর্ঘ ৮১ বছর পর হঠাৎ ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে দিনটি ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপনের রহস্যজনক তোড়জোড় শুরু হয়। কিন্তু নারী দিবসের সাথে কুৎসিত নোংরা শ্লোগান, অশ্লীল ব্রেক ড্যান্সের সম্পর্ক কি? এ প্রশ্ন শুধু আমার একার নয়, সচেতন দেশবাসীরও।

নারীবাদী মহিলাদের এসব শ্লোগান শুনে এবং নারী-পুরুষের উদ্দাম নৃত্যের দৃশ্য দেখে পথচারীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে। সবার চোখে মুখে প্রশ্ন- এরা কারা, এরা কোথা হতে এলো, এরা কি চাচ্ছে।

এ সম্পর্কে আবদুল মবিন তাঁর 'নষ্ট দর্শন' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ মেয়েগুলো বস্তিবাসী দরিদ্র মেয়ে। মহিলা সংস্থায় কয়েক মাসের স্বাবলম্বনের প্রশিক্ষণ নেয়। প্রতিদানে মাসে ৩০ কেজি গম পায়। বস্তি জীবনে তাদের শরীরই তাদের শত্রু। কৈশোর হতেই তারা দেখে এসেছে সন্ধ্যা হতেই একদিকে যেমন আঁধার ঘিরে আসে; অপরদিকে মস্তানদের হাতের কড়কড়ে টাকা চক চক করে উঠে। তাদের টাকা প্রয়োজন অনেক। টেলিভিশন, হিন্দী সিনেমা, তাদের সারা দেহ মনে অনেক সাধ-আহলাদের প্ররোচনা দিচ্ছে। কিন্তু তাদের টাকা নেই। তারা জানে শরীরটা বিছিয়ে দিলেই অনেক টাকা আসে। কিন্তু হায় তার শরীর যে তার নয়। শরীরের সিদ্ধান্ত সে নিজে নিতে পারে না। শিয়রে বাবা ঘুমায়, পাশে শুয়ে মা গায়ে হাত দিয়ে রাখে। তাই নিজের শরীরটিকে রেখে ঢেকে বেঁধে চলতে হয়। কিন্তু ৪ঠা মার্চ আর ৮ই মার্চের মিছিল সমাবেশের মধ্যে সে সকল বন্ধন উদাম করে দেয়ার একটা প্রচেষ্টা স্পষ্ট হয়ে এসেছে। সমাবেশ শেষে মেয়েগুলো বুঝতে পেরেছে অতি শীঘ্রই তারা নিজের শরীরের সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করতে পারবে এবং

www.pathagar.com

শরীর পুঁজি করে উপার্জনের একটা উপায় হয়ে যাবে। সেদিন ঐ আনন্দেই মেয়েগুলো আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। ঐ ধরনের উদাম উদ্দামতা লক্ষ্য করা যায় ম্যানিলা, ব্যাংকক, হংকং ইত্যাদি শহরে।

ম্যানিলা এবং ব্যাংকক শহরে যে কোনো ভ্রমণকারীর পকেটে ডলার আছে জানতে পারলে মেয়েরা দলে দলে তার পিছু নেয়। এমন কি মা-মেয়ে মিলে শিকার ধরার প্রতিযোগিতা করে। ব্যাংকক ও ম্যানিলা শহরের মেয়েরা বেশির ভাগই নিজ শরীর এবং নিজ সিদ্ধান্তের স্বাধীনতা উপভোগ করে থাকে। বিশ্বের বহু দেশের পর্যটকদের জন্য ব্যাংকক ম্যানিলার মেয়েদের শরীরের স্বাধীনতার ব্যাপারটা একটা বাড়তি আকর্ষণ বটে।

প্রতি বছর মে মাসে ম্যানিলায় মে ফেয়ার নামে মাসব্যাপী একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে রাস্তার মোড়ে মোড়ে যেখানটায় একটু প্রশস্ত আইল্যান্ড আছে সে সব জায়গায় ছোট ছোট মঞ্চ তৈরি করে দলে দলে মিনি স্কার্ট পরা মেয়েরা নাচের তালে

চিরসত্য সৃষ্টিগত অবস্থানিক সৌন্দর্যময় অবস্থান ভেঙ্গে মনগড়া নারী প্রগতির শ্লোগানে বিভ্রান্তকর পরিবেশ সৃষ্টির শিকার হয়ে স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা আজ বিপর্যস্থ ও অসহায় নারী-পুরুষের চিরন্তন সুসামঞ্জস্য মানবিক মর্যাদা– ছবিতে এমনি একটি ঘটনার বাস্তব রূপ ঃ নারী স্বাধীনতার তথাকথিত শ্লোগানে উন্মত্ত স্ত্রী হারিসা বেগম নারকীয় অবস্থানে। নৈতিকতাবিহীন আচরণে স্বামী মতলব অসহায়-বিপর্যস্ত। অমানবিকতার এরূপ চিত্র আড়ালে-আবডালে কতো যে ঘটছে তার হিসাব কে রাখে? সৌন্দর্যময় মানবিকতার সুসামঞ্জস্য সামাজিকতার অবস্থানের চিরন্তন প্রবাহে তথাকথিত নারী স্বাধীনতার শ্লোগানে বিধ্বস্থ হয়ে আজ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ব্যাহত। স্ত্রী হারিসা বেগমের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছিলো স্বামী মতলভ। মতলব ঢাকার আদালত প্রাঙ্গণে হাজির হলে হারিসা রণমূর্তি ধারণ করে স্বামীর উপর হামলা চালায়। স্বামীর শার্টের কলার ধরে চিৎকার করে বলতে থাকে ঃ 'মামলা তুলে না নিলে কেয়ামত হয়ে যাবে'। অবশেষে স্বামী হার মেনে মামলা তুলে নেয়। ঘটনাটি আদালতপাড়ায় হাস্যরসের সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

তালে শরীরের বাঁক ভাঁজ প্রদর্শন করে থাকে। শহরের সেঞ্চুরীর পার্কের যেখানটায় হোটেল শেরাটন, হোটেল এ্যাডমিরাল ইত্যাদি অবস্থিত সে সব এলাকায় সন্ধ্যার পর কোনো ভদ্রলোক নিরাপদে চলাচল করতে পারে না। নিরাপদ মানে টাকা-পয়সা ছিনতাই হওয়া নয় বটে, কিন্তু এক রকম হাত ধরে টানাটানি করার মতো সর্বসমক্ষে মেয়েরা এবং তাদের দালালেরা টানাটানি করে মানুষটিকেই ছিনতাই করতে চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকানদের সান্নিধ্যে এসে ম্যানিলার মেয়েরা শরীরের স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্তের স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে। এখন জাপানীরা দলে দলে ম্যানিলায় কাম সফরে আসে। আশির দশকে ফিলিপিনো মহিলা সংস্থা জাপানীদের কাম সফরের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে ম্যানিলার রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করেছিল। এসব সংবাদ আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছিল।

ঐ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকার ম্যানিলার সকল ম্যাসেজ পারলার বার ইত্যাদি বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু শরীরের স্বাধীনতার নেশাগ্রস্ত মেয়েদের এবং তাদের পুঁজি করে সেখানে যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাদের প্রতিরোধের মুখে সরকারী সিদ্ধান্ত মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

২৯শে মার্চ ১৯৮৮ তারিখের বাংলাদেশ অবজার্ভার পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, "পর্যটন শহর ম্যানিলার হংকী টংকী সেলুন, ডিসকো ইত্যাদিসহ নাইট ক্লাবগুলো বন্ধ করে দেয়ার জন্য সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ঐসব প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার মেয়ে ন্যাংটা হয়ে ম্যানিলার রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করার হুমকি দিয়েছে।

একজন নর্তকী সাংবাদিকদের কাছে বলেছে, "আমরা কোনো প্ল্যাকার্ড বা ব্যানার বহন করবো না। আমরা আমাদের উলঙ্গ শরীরেই আমাদের দাবী লিখে নেব। বার মালিক সমিতির প্রধান ফ্রালিক্স এসপীরিটো জানান, তিনি আশা করেন ফিলিপাইনের রাজধানীতে অন্ততঃ ৬০ হাজার মেয়ে ঐ উলঙ্গ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে। পুলিশ প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলফ্রেডো লিম জানান, ব্যাভিচার এবং অপরাধী চক্রের আড্ডাখানা হওয়ার কারণেই সরকার ঐ নৈতিকতাবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলো তালাবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"

ব্যাংকক শহরের ১৪৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে পাত্তায়া নামে একটি পর্যটন শহর আছে। ঐ শহরে কদাচ কোনো স্বামী-সন্তান কেন্দ্রিক মেয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে। সেখানকার মেয়েরা স্বামীর ঘর, পিতার খবরদারী পছন্দ করে না, তারা নিজ শরীরের ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিজেরাই গ্রহণ করে। দূর-দুরান্ত অঞ্চল হতে আগত ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মেয়েরা সেখানে গিজ গিজ করে। সুলেখক, কলামিস্ট আবদুল বারী সাহেবের একটি প্রবন্ধের সামান্য উদ্ধৃতি হতে ব্যাপারটি পরিষ্কার বুঝা যাবে। তিনি এক সময় নৌ কর্মকর্তা ছিলেন।

তিনি লিখেছেন ঃ "দু'সপ্তাহ পর আমরা কোশিচাং বন্দরে পৌঁছলাম। কোশিচাং থাইল্যান্ডের এনজয়মেন্টের জন্য সুপরিচিত স্থান পাত্তায়া সংলগ্ন একটি বন্দর। সেখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেহপশারিণী মেয়েতে জাহাজ ভরে গেল। জাহাজে উঠেই তারা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাপনী উৎসবে রাধা-কৃষ্ণের বর্ণাঢ্য র‍্যালী। আর শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ এন্তেমাল হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

এর কেবিনে ওর কেবিনে হানা দিতে লাগলো। আমি ইঞ্জিন রুম থেকে এসে যেমনি কেবিনে ঢুকেছি অমনি আমার পেছনে পেছনে চার পাঁচজন মেয়ে ঢুকে পড়লো। একেকজনের ফিগার একেক রকম। তার মধ্যে দু'জনের ফিগার চোখে লাগার মতো।

বললো ঃ চীফ! কি রকম মেয়ে চাই তোমার? আমাদের সার্ভিস গ্যারান্টিড, একজন মেয়ে বললো।

বললাম ঃ আমি এখন খুব ব্যস্ত। তোমরা যাও প্লিজ, বলে আমি ওদের চলে যেতে অনুরোধ করলাম।

একজন হেসে প্রশ্ন করলো ঃ কেনো, আমাদের পছন্দ হয় না?

বললাম ঃ পছন্দ হবে না কেনো, তোমরা সত্যিই সুন্দরী। কিন্তু আমার কাউকে প্রয়োজন নেই, তোমরা চলে যাও।

এভাবে ধমকের সুরে কথা বলাটা ওদের বোধ হয় পছন্দ হয়নি। তাই একজন হাতের বুড়া আঙ্গুল খাড়া করে আমাকে দেখিয়ে ব্যঙ্গ করে বললো ঃ কেনো, তোমার কি এটা নেই?" (যায় যায় দিন, ১৮ জানুয়ারী, ১৯৯৪)

৪ঠা মার্চ তারিখের বিশ্ব নারী দিবসের সমাবেশে আর একটি শ্লোগান এক শ্রেণীর মহিলার মুখে খুব জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়েছে। তা হচ্ছে আমরা নারী-পুরুষের ভিন্নতা মানি না। ভাবটা এমন যেন নারী দেহের নমনীয়তা, কমনীয়তা দুর্বলতা ইত্যাদি শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য পুরুষরাই দায়ী। ভাবটা এমন যেন পূজারীরা যেমন পূজা উপভোগ করার জন্য মন মতো করে সরস্বতী, দুর্গা, লক্ষ্মী ইত্যাদির মনোহর মূর্তি তৈরি করে, পুরুষরাও যেন তেমনি নিজেদের ভোগের জন্য নারীকে শারীরিক নানা বাঁক, ভাঁজ, মেদ, নিতম্ব ইত্যাদি দ্বারা সৌন্দর্য ভারাক্রান্ত করে তৈরি করেছে।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, ঢাকার রাস্তায় যে মিছিল এবং রমনার বটমূলে শরীরের স্বাধীনতাকামী মেয়েরা শারীরিক যে কসরত প্রদর্শন করেছে এবং আন্দোলনের যে নীলনক্সা রচনা করেছে তার সাথে ম্যানিলার শরীরের স্বাধীনতা ভোগকারী মেয়েদের ঐ উলঙ্গ মিছিলের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে ম্যানিলার সভ্য

www.pathagar.com

সমাজ্ শরীরের স্বাধীনতাভোগকারী মেয়েদের অপকর্ম দ্বারা সামাজিক পরিবেশে যে কলুষ সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঐ স্বাধীনতার অবসান কামনা করছে, আর আমাদের দেশের অনাস্বাদিত মদিরার নেশাগ্রস্ত মেয়েরা সে কাজটি মাত্র শুরু করতে চাচ্ছে। তারা এখনও বুঝতে পারছে না আন্দোলন দ্বারা তাদের কোন্ স্বাধীনতার মদিরা পরিবেশন করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নারীর নিরাপত্তা, অধিকার ও মর্যাদার স্বার্থেই ইসলাম 'দেহ আমার সিদ্ধান্ত আমার' এরূপ সর্বনাশা স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী। ইসলাম ধর্ম নারীকে তার দেহের পূর্ণ পবিত্র অধিকার দেয়। এ জন্যেই বিয়ের সময় নারীর পছন্দ-অপছন্দের অভিমত অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু তথাকথিত নারীবাদীরা 'দেহ আমার সিদ্ধান্ত আমার' যে সর্বনাশা শ্লোগানে বিশ্বাসী তা নারী স্বার্থের পরিপন্থী। যতোদিন নারীর রূপ-যৌবন আছে ততোদিন ঘুরে ঘুরে ভ্রমরের মতো মধু খাওয়া পুরুষদের কাছে কদর আছে। যখন তাদের রূপ-যৌবন ফুরিয়ে যাবে তখন ন্যাপকিনের মতো আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। যা দেখছি পাশ্চাত্য দুনিয়ায়।

প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয়দের মাথাব্যথা একটাই মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সম্পদ পারিবারিক জীবন। সারা বিশ্বে দরিদ্র মানুষের জন্য গড়া হয় এনজিও। লাখ লাখ লোক বেকার আর তাদের লোক নিয়োগে অগ্রাধিকার তাও আবার অবিবাহিতা। একা থাকতে হয় দূর এলাকায়। গ্রামময় ঘুরে বেড়ানো। ওরাই সহজলভ্য করেছে পিল, কনডম আর কন্ট্রাসেপটিভ জন্ম নিয়ন্ত্রণ না করলে সাহায্য নেই। ওদের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতি যা সব সময়ই খোদা বিমুখ। ধর্মের বৈরীতা তার প্রধান কাজ। তাদের শ্লোগান– কিসের বর কিসের ঘর, দেহ আমার সিদ্ধান্ত আমার।

নারী নির্যাতনের উৎস

পাশ্চাত্যের সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তারা বাংলাদেশীদের চেয়েও বেশি ধর্মপ্রাণ ছিলো। কিন্তু যখন মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী শাসকরা নিজেদের পাপ জনগণের কাছে লঘু করার জন্যে পাদ্রিদের দ্বারা প্রচার করতে লাগলেন 'যীশু ক্রুশ বিদ্ধ অবস্থায় সকল মানবের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন', তখনই পাশ্চাত্যে সংশয়ী চেতনার জন্ম নেয়। আর মানুষের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে ধর্মীয় নৈতিকতা দূর হতে থাকে। ফলে শ্বাশত সতীত্ববোধ ও দেহের পবিত্রতা পাশ্চাত্য সমাজে বিলুপ্ত হতে থাকে। সামাজিক এই পরিবর্তনকে একশ্রেণীর দুষ্টচক্র ব্যবসায়ী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। ফলে নীল ছবি, সেক্স শো, নীল পুস্তক, যৌন উত্তেজক চুইংগাম ট্যাবলেট, জেলি-ফোম ট্যাবলেট, সেক্স ডল এবং জটিল যন্ত্রপাতি দিয়ে কোটি কোটি টাকা ব্যবসা করতে থাকে। কিন্তু এইডস ও একঘেয়েমী পাশ্চাত্য সমাজেও ধীরে ধীরে মানুষকে যৌন বিমুখ করে তুলেছে।

দুষ্টচক্রে যেসব নিষিদ্ধ পণ্যের গোপন শিল্প গড়ে তুলেছে তার বাজার সেখানে ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া দেরীতে হলেও তাদের মধ্যে অনেকের বোধোদয় ঘটেছে যে, পশ্চিমা বিশ্বে অপরাধী প্রবণতা, হত্যা, নির্যাতনসহ সামাজিক

www.pathagar.com

অস্থিরতার প্রধান কারণ হচ্ছে সমঅধিকারের নামে সামাজিক বন্ধনের অস্তিত্ব বিনাশ। এই সামাজিক বন্ধন লোপ পাওয়ার পেছনে রয়েছে অবাধ যৌন স্বাধীনতা। অবাধ যৌন স্বাধীনতার কারণে তারা আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। এই ভয়াবহ ধ্বংস ঠেকানোর জন্য তারা আবার পরিবার প্রথার দিকে ফিরে যাচ্ছে। এর পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে। কিছুদিন আগে পোপ জন পল আমেরিকায় এক সম্মেলনে মানবিক প্রশান্তির লক্ষ্যে পরিবারের দিকে ফিরে আসার আহবান জানান। পশ্চিমা বিশ্ব যেসব কারণে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়গুলোকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর সুকৌশলে চালিয়ে দিচ্ছে। আর এর সাথে তাদের পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীক স্বার্থও রয়েছে। এরা বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট সামাজিক অস্থিরতা এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে কাজে লাগাচ্ছে। তাদের এখন নতুন নতুন বাজার খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে। আর তা খুঁজতে তারা রক্ষণশীল মুসলিম-অমুসলিম দেশগুলোকে বেছে নিয়েছে। সুকৌশলে তাদের পাপের ফসল চাপিয়ে দিচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে। এ কাজের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে নারীবাদের শ্লোগান। এদেরকে একটি শক্তি হিসেবে প্রমাণ করার জন্য পারিবারিকভাবে কাজ করা হচ্ছে। এ ছাড়া নারী নির্যাতন, নারী অমর্যাদার প্রধান সহায়ক অশ্লীলতা ও অবাধ যৌনতা।

রাধাকে জড়িয়ে ধরে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন আর গোপিণীরা তা নিয়ে হাস্যরসে উল্লসিত হচ্ছেন। গত ১৪ অক্টোবর ১৯৯৯ তারিখে ঢাকায় প্রকাশ্য রাজপথে এ দৃশ্যের অভিনয় করে উদীচীর একটি র‍্যালি বের হয়। কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন 'উদীচী' ঢাকা মহানগর শাখার দু'দিনব্যাপী ৪র্থ সম্মেলন উপলক্ষে গুলিস্তানের মহানগর নাট্যমঞ্চে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর উদীচী শিল্পীদের র‍্যালিটি ঢাকঢোল পিটিয়ে হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতির নানা উপাখ্যানের সজীব চিত্র ফুটিয়ে তুলে রাজপথ প্রদক্ষিণ করে

এই পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক ভাড়াটে পোষ্যরা সে লক্ষ্যেই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কাজ করছে। এরা এতোটা বেপরোয়া যে, এরা বাংলাদেশের মতো গরীব দেশে ফ্যাশন প্রতিযোগিতা, মডেলিং প্রতিযোগিতা, মীনা বাজার, সুইমিংপুল, নায়িকাদের ওপেন কনসার্ট, মিস বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা, অভিনেত্রীদের ফুটবল মহড়া, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, গ্রুপ থিয়েটার, বিজ্ঞাপন চিত্র, সাহিত্য, রেডিও-টিভি, আকাশ সংস্কৃতি প্রভৃতি বিলাসী কর্মযজ্ঞ শুরু করে দিয়েছে। নারীবাদীরা এগুলো প্রগতির নিয়ামত হিসেবে করে। এরা এখন নৈতিক শিক্ষার বিরোধিতা করে যৌন শিক্ষা চালু করার পরামর্শ দিচ্ছে।

প্রগতির ছদ্মাবরণে আন্তর্জাতিক নারীবাদীরা তাদের ষোলকলা পূর্ণ করার জন্যে, তাদের মতো লেজকাটা শিয়ালে পরিণত করার প্রয়াসে, নারীর সমঅধিকারের নামে

www.pathagar.com

এদেশকে জাহান্নামে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে তাদের দোসর এদেশীয় কতিপয় দালাল বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের। '৭১-কে উপলক্ষ্য করে রাজাকার-ফতোয়াবাজদের নামে পরোক্ষভাবে আঘাত হানা হচ্ছে শান্তির ধর্ম, প্রগতির ধর্ম, মানবতার মুক্তির ধর্ম ইসলামের রীতি-নীতি ও পদ্ধতির বিরুদ্ধে। বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের নেতা-নেত্রী ও বুদ্ধিজীবীদের মুখে পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনতায় পঞ্চমুখ। তাই সেই নারীবাদী এজেন্টদের আমাদের সামাজিক কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলার জন্যে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

বেশ কয়েক বছর যাবত হিন্দুদের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমাদের নেতা-নেত্রীরা প্রায়ই বলে থাকেন- শ্রীকৃষ্ণ ছিলো একজন মহাপুরুষ। তিনি ছিলেন পথ প্রদর্শক। আমরা যদি তার আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করি তাহলে এই অশান্তির পৃথিবী শান্তিময় হয়ে উঠবে ইত্যাদি। নেতা-নেত্রীরা যদি এইসব কথাগুলো হিন্দু ভাইদের উদ্দেশ্যে বলা হতো তাহলে আমাদের বলার কিছুই ছিলো না। কিন্তু 'আমরা' শব্দ যখন ব্যবহার করা হয় তাহলে সহজেই অনুমেয় মুসলমান সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করেও তা বলা হয়েছে। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ কি? কেমন মহাপুরুষ ছিলেন তিনি?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ 'নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"সখী সম্ভোগরত কৃষ্ণকে দেখে ঈর্ষান্বিত রাধার প্রেমাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিলো এবং তারপর বহু বেদনা ও প্রতীক্ষার পর উভয়ের মিলন ঘটেছিলো।" (ডঃ অজিত কুমার ঘোষ ঃ নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ ঃ দেব পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৯১ ইং, পৃঃ ১৬৭)

এ ছাড়া হিন্দু ধর্মগুরুদেরও যৌনাচার নিয়ে অনেক কাহিনী রয়েছে। এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে সংক্ষেপে কয়েকটি কাহিনী উদ্ধৃত করেছি মাত্র।

রাধা ছিলেন আয়ান ঘোষের স্ত্রী সম্পর্কে কৃষ্ণের মামী। শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভ রাজকন্যা রুক্মিণীকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন। রাজকন্যা রুক্ষিণী তাঁর স্ত্রী, রাধা পরস্ত্রী। পরস্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও রাধা-কৃষ্ণের প্রেম আদর্শ প্রেমরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। বৃন্দাবনের প্রেম বাংলাদেশকে আচ্ছন্ন করে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপিকা ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান এবং বাঙলা একাডেমির মহাপরিচালক) তার 'বঙ্গ সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন ঃ

"চর্যাপদের পর শ্রীকৃষ্ণ কীর্তিনেও বাঙলার সাধারণ সমাজ জীবন সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। এগারো বছরের বালিকার দেহভোগের জন্য গ্রাম্য কিশোরের নীতিহীনতা দেব মাহাত্ম্যরূপে চিহ্নিত হয়েছে। সমাজের নিম্নস্তরের অধিবাসীরা অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিলো, তারা উপার্জন করতো যেমন রাধা ও বড়াই গোপিনীদের নিয়ে দই দুধ বিক্রি করতে যেতো। পান-ফুল দিয়ে রাধাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কৃষ্ণ" পূর্বেই বলেছি রাধা ছিলেন কৃষ্ণের মামী। মামা আয়ান ঘোষের স্ত্রী। কৃষ্ণ বিয়ে করেছিলেন রাজকুমারী রুক্মিনীকে। স্বামী-স্ত্রীর ছবি বা মূর্তি পূজিত হয় না; রাধা কৃষ্ণ পূজিত হন।

www.pathagar.com

বেশ কয়েক বছর ধরে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে লালন করা হচ্ছে। যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে না। ১৯৯৫ সালে ২৫তম বিজয় দিবস উপলক্ষে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের অনুসারীরা বিজয় দিবসের সাথে সম্পর্কহীন রাধা-কৃষ্ণের মিছিল বের করেছিলো, যা ছিলো রহস্যজনক

আরেকটি তথ্যে জানা যায়, শিব পুরাণ, মার্কন্ডেয় পুরান ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, একদা দুর্গার সাথে সঙ্গমকালে শিব এতো বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাতে দুর্গার প্রাণনাশের উপক্রম হয়। দুর্গা তখন মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে থাকেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে নিজ হস্তস্থিত সুদর্শন চক্রধারা আঘাত করলে উভয়ের সংযুক্ত যৌনাঙ্গ কেটে আসে। ঐ সংযুক্ত যৌনাঙ্গের মিলিত সংস্করণের নাম বানলিঙ্গ বা শিবলিঙ্গ যা হিন্দু সমাজের একটি প্রধান পূজ্য বস্তু এবং ঐ শিবলিঙ্গের পূজার জন্য বহু বড় বড় শিব মন্দির গড়ে উঠেছে। মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে কাসর ঘন্টা বাজিয়ে হিন্দু সমাজ মহাসমারোহে ঐ শিবলিঙ্গ পূজা করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণশ্বরে শিবের যৌন সঙ্গমের অবস্থান প্রদর্শনের জন্য পর পর বারোটি মন্দির রয়েছে। ঐ মন্দিরগুলোতে সঙ্গমকালীন সময়ের বারো রকমের প্রমত্তাবস্থা প্রদর্শন করা হয়েছে। এতে প্রতিদিন হাজার হাজার মহিলা দর্শনার্থীর সমাগম হয়। সেখানে পুরুষ খুবই কম যায়।

রাধা কৃষ্ণের লীলা সম্পর্কে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত আছে ব্রহ্মা বলছেন, "হে বৎস। আমার আজ্ঞানুসারে আমার নিয়োজিত কার্য করিতে উদযুক্ত হও। জগদ্বিধাতা ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাধা কৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে দেবী রাধিকা সহাস্যবদনে সকটাক্ষ নেত্রে কৃষ্ণের রদনমন্ডল বারংবার দর্শন করতঃ লজ্জায় মুখ আচ্ছাদন করিলেন। অত্যন্ত কামবাণে পীড়িত হওয়াতে রাধিকার সর্বাঙ্গ পুলকিত হইল। তখন তিনি ভক্তিপূর্বক কৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ তাহার শয়নাগারে গমন করিয়া কস্তুরী কুঙ্কুম মিশ্রিত চন্দন ও অগুরুর পঙ্ক কৃষ্ণের বক্ষে বিলেপন করিলেন এবং স্বয়ং কপালে তিলক ধারণ করিলেন।

তৎপর কৃষ্ণ রাধিকার কর ধারণ করিয়া স্বীয় বক্ষে স্থাপন করতঃ চতুর্বিধ চুম্বনপূর্বক

www.pathagar.com

তাহার বস্ত্র শিথিল করিলেন। হে সুমে। রতিযুদ্ধে ক্ষুদ্র ঘন্টিকা সমস্ত বিচ্ছিন্ন হইল, চুম্বনে ওষ্ঠরাগ, আলিঙ্গনে চিত্রিত পত্রাবলী, শৃঙ্কারে কবরী ও সিন্দুর তিলক এবং বিপরীত বিহারে অলঙ্কাঙ্গুর প্রভৃতি দূরীভূত হইল। রাধিকার সরসঙ্গম বশে সর্বাঙ্গ পুলকিত হইল। তিনি মুর্ছিতা প্রায় হইলেন। তার দিবারাত্রি জ্ঞান থাকিল না। কামশাস্ত্র পারদর্শী কৃষ্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা রাধিকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গন করতঃ অষ্টবিধ শৃঙ্কার করিলেন, পুনর্বার সেই বক্রলোচনা রাধিকাকে আকর্ষণ করিয়া হস্ত ও নখ দ্বারা সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। (মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, পৃঃ ১১৪)

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হওয়ায় এবং সারা রাতভর যৌন নিপীড়নের কারণে প্রভাতকালে দেখা গেল রাধিকার পরিহিত বস্ত্র এতো বেশি রক্তরঞ্জিত হয়ে পড়েছে যে, লোকলজ্জায় রাধিকা ঘরের বাইরে আসতে পারছেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন দোল পূজার ঘোষণা দিয়ে হোলি খেলার আদেশ দেন। সবাই সবাইকে রঙ দ্বারা রঞ্জিত করতে শুরু করে। তাতে রাধিকার বস্ত্রের রক্তের দাগ রঙের আড়ালে ঢেকে যায়। আজও হিন্দু সমাজ কাসর ঘন্টা বাজিয়ে দোল পূজা করে থাকে এবং রঙ দ্বারা সেই হোলি খেলায় উন্মত্ত হয়ে উঠে।

শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু রাধিকার সাথেই যৌনলীলা করেছেন তা নয়। একদিন শঙ্খচুড়ের স্ত্রী তুলসী দেবীকে দেখে তিনি কামোত্তেজিত হয়ে পড়েন। দেবী তখন যৌন ক্রিয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না বা কৃষ্ণ তাকে শৃঙ্গারের ভাষা বা ভাব নিবেদন করেননি। সুতরাং নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায়ই কৃষ্ণ তুলসী দেবীর উপর যৌন আক্রমণ করে বসেন। ধর্ষিতা হয়ে তুলসী দেবী কৃষ্ণকে অভিশাপ দিলে তিনি গোলাকার পাথরে পরিণত হয়ে যান। শালিগ্রাম নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটেছিল বলে ঐ পাথরের নাম হয়ে যায় শালগ্রাম শিলা।

কৃষ্ণ পাথরে পরিণত হয়েছে দেখে তুলসী দেবী দেবতাদের ভয়ে ভীতা হয়ে নিজেকে তুলসী গাছে রূপান্তরিত করে ঐ পাথরের পাশে দাঁড়িয়ে পড়েন। পরে দেবতাগণ সব ঘটনা জানতে পেরে আদেশ করেন যে, প্রত্যহ পূজার সময় এই শিলার বুকে এবং পিঠে তুলসী পাতা সংযুক্ত করতে হবে। অন্যথায় ভগবানের পূজা সিদ্ধ হবে না। (স্কন্ধ পুরাণ নাগর খন্ড, দেবী ভগবত নবম স্কন্ধ)।

এই কৃষ্ণ সম্পর্কে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সহযোগী এস. ও. মাথাই তাঁর "রমিনিস্যান্স অব দি নেহেরু এইজ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, "ভগবান কৃষ্ণের জীবনে ১৬০৮টি নারী এসেছিলেন।" এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের আরেকটি অভ্যাস ছিলো নারীদের নগ্ন দেহ অবলোকন করা। তিনি নাকি নগ্ন নারী দেহ দেখতে খুবই পছন্দ করতেন। তাই সখীরা যখন তীরে কাপড় রেখে উলঙ্গ হয়ে স্নান করতেন মহাপুরুষ(!) শ্রীকৃষ্ণ তখন কাপড়গুলো গাছের চূড়ায় নিয়ে বসে থাকতেন এবং নারীদের উলঙ্গ দেহ প্রত্যক্ষ করতেন। এগার বছরের বালিকার দেহ ভোগের জন্য গ্রাম্য কিশোরের নীতিহীনতা দেব মাহাত্মরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

ডঃ বি. আর. অম্বেদকার 'রাম চরিত ও কৃষ্ণলীলা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

www.pathagar.com

বিশ্ব হ্যান্ডবল দিবস উপলক্ষে ঢাকায় রাধা-কৃষ্ণের স্কেচ সম্বলিত ফেস্টুন সহকারে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করা হয়

কল্যাকে পরাস্ত করার পরপরই শুরু হয় কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ পর্ব– যার রহস্য ভেদ করতে পৌরাণিক কৃষ্ণের পূজারীদেরকে গলদঘর্ম হতে হয়। ব্যাপারটিতে এতই লজ্জাকর যে এর অতি আবছা বর্ণনাও অশ্লীল বলে বিবেচিত হবে বলে আমার আশঙ্কা। সেজন্য যতদূর সম্ভব শালীনতা রক্ষা করেই আমি ঘটনাটির বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করবো– যাতে কৃষ্ণ সম্পর্কিত আমার বর্ণনাটি অসম্পূর্ণ থেকে না যায়। এ যুগেও যেমন এদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এ প্রথাটি চালু আছে বলে বলা যায় যাকে সে রকম ঐ সময় কতিপয় গোপী নারী নিজেদের বস্ত্র যমুনা তীরে রেখে জলকেলি ও স্নানের উদ্দেশ্যে নদীতে নামলেন। কৃষ্ণ তাদের বস্ত্র হরণ করে নদীতটের একটি বৃক্ষে আরোহণ করেন। বস্ত্র ফেরৎ দেবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হলে তিনি তা করতে এই শর্তে সম্মত হলেন যে, গোপীনীদের প্রত্যেকে একে একে বৃক্ষের নিকটে এসে তাঁর কাছে কাপড়ের জন্য অনুরোধ করবে। এটা কেবল বিবস্ত্র অবস্থায় পানি থেকে উঠে এসে এবং উলঙ্গ অবস্থায় কৃষ্ণের সম্মুখে নিজেদের উপস্থিত করেই তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিলো। যখন তারা তা করলো, তখন কৃষ্ণ পরিতুষ্ট হয়ে তাদের বস্ত্র ফিরিয়ে দিলেন। ভগবতে এ গল্পটির উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণের পরবর্তী বীরত্বপূর্ণ কাজটি হচ্ছে গো-বর্ধন পাহাড়টিকে উত্তোলন। গোপগণ বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে তাদের বার্ষিক বলিযজ্ঞের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছিল। তা দেখে কৃষ্ণ তাদেরকে বললেন যে, তারা হলো চারণ সম্প্রদায়, কৃষক সম্প্রদায় নয়। গাভীকূল, পাহাড়রাজি এবং অরণ্যরাজিই হচ্ছে তাদের প্রকৃত দেবতা; সুতরাং তাদের কেবল এদেরই পূজা-পার্বন করা উচিত, বৃষ্টি দেবতা ইন্দ্রের নয়। গোপগণ কৃষ্ণের এ পরামর্শ মেনে নিয়ে ইন্দ্রের পূজার ইচ্ছা পরিত্যাগ করলো এবং গাভীকূলের প্রতিপালনকারী গোবর্ধন পাহাড়ের পূজার উদ্যোগ গ্রহণ করলো। মহাসমারোহে তারা ভোজ ও নৃত্যের মাধ্যমে এ পূজা সমাপন করলো। নিজের প্রতি এ অবজ্ঞা ও অসম্মান দেখে ইন্দ্র খুবই

www.pathagar.com

ক্রুদ্ধ হলেন। শাস্তিস্বরূপ তিনি গোপদের লোকালয়ে লাগাতার সাত দিন বারিবর্ষণ করলেন। এ সময় কৃষ্ণ অকুতোভয়ে পাহাড়টিকে উপড়ে শূন্যে তুলে নিলেন এবং গোপদের এলাকার উপরে ছাতার মতো ধরে রাখলেন। এভাবে তিনি গোপদের এবং তাদের পশুকূলকে ইন্দ্রের রোষাগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের মধ্যকার বৈরিতার যে উল্লেখ ঋগবেদে রয়েছে এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণুর মধ্যকার শত্রুতার যে বর্ণনা সতপথব্রাহ্মণ-এ রয়েছে তার উল্লেখ আমি আমার প্রথম বক্তৃতায় করেছি।

কৃষ্ণের যৌবনপূর্ণ জীবন বৃন্দাবনের যুবতী রমণীদের সাথে অবৈধ মেলামেশার ঘটনায় পরিপূর্ণ। এগুলো তাঁর রাসলীলা নামে অভিহিত হয়ে থাকে। রাস হচ্ছে একটি চক্রাকার নৃত্য, যাতে নৃত্যরত পুরুষ ও নারীদের হাত একে অন্যের হাতের সাথে আবদ্ধ থাকে। কথিত আছে যে, এটা এখনও এ দেশের কোনো কোনো বন্য উপজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, বৃন্দাবনের গোপীদের সাথে কৃষ্ণ প্রায়ই এ নৃত্য করতেন। তারাও তাঁর প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিলো। এসব নৃত্যের একটি বর্ণনা বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও ভগবতে রয়েছে। এসব শাস্ত্রকারদের সবাই কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের এ আসক্তিকে ধর্মানুরাগ বা ভগবত-প্রেম হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর প্রতি তাদের এ প্রেম নিবেদনে তাঁরা আপত্তিকর কিছুই দেখতে পাননি। কিন্তু তাঁদেরই মতে এসব কাজ অন্যদের বেলায় অত্যন্ত গর্হিত। রাসলীলার সাধারণ প্রকৃতি, দৃশ্য, লগ্ন, ঋতু, সুমধুর সঙ্গীতলহরীর লয়তালের সাথে নারীদেরকে আকর্ষণ করা, নৃত্য, নানা ভঙ্গিতে কৃষ্ণের প্রতি রমণীকূলের প্রেম নিবেদন এবং নানা ভঙ্গিতে তাদের আবেগের অভিব্যক্তি প্রভৃতি ব্যাপারে শাস্ত্রকারদের কোনো দ্বিমত নেই। তবে এসবের বর্ণনায় বিষ্ণুপুরাণ যেখানে আড়াল আবডালের আশ্রয় নিয়ে ব্যাপারগুলোকে শালীনতার গন্ডীর ভিতরে ধরে রাখার প্রয়াস পেয়েছেন, সেখানে 'হরিবংশ' নির্দ্বিধায় তা' প্রকাশ করে দিয়েছেন। ভগবত-এসবের বর্ণনায় অশ্লীলতা ও অশালীনতার কোনো কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি।

কৃষ্ণের জীবনের তাবৎ অশ্লীলতাপূর্ণ কাজের মধ্যে জঘন্যতম হচ্ছে রাধা নামক গোপীর সাথে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের সুন্দর বর্ণনা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এ চিত্রায়িত হয়েছে। কৃষ্ণ নিজের বৈধ স্ত্রী রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করে পরস্ত্রী রাধাকে প্ররোচিত করে তার সাথে পাপপূর্ণ জীবন যাপন করেন। এ জন্য তিনি কোনোদিন অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনাও করেননি।

চারদিকের অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, আন্তর্জাতিক নারীবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নেতা-নেত্রীদের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশের তরুণ-তরুণীরা শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ এস্তেমাল করা শুরু করে দিয়েছে। তবে পার্থক্য শুধু শ্রীকৃষ্ণ স্নানরত সখীদের কাপড় তুলে নিয়ে গাছের চূড়ায় বসে চুরি করে নারীর দেহ প্রত্যক্ষ করেছে। আর এখনকার নব্য কৃষ্ণরা পাশ্চত্যে সভ্যতার অনুসরণে ঢাকা-ঢোল পিটিয়ে সুন্দরী প্রতিযোগিতা ও ফ্যাসন শো-এর নামে প্রকাশ্যে নগ্ন-অর্ধ নগ্ন নারী দেহ প্রত্যক্ষ করছে।

www.pathagar.com

সুন্দরী প্রতিযোগিতা

আজ থেকে ৩৫ বছর আগে ১৯৫১ সালে লন্ডনে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা। এরপর ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে পর্যায়ক্রমে এই সুন্দরী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালের ২৩ নভেম্বর দক্ষিণ ভারতের একটি প্রদেশ কর্ণাটকের রাজধানী বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা'।

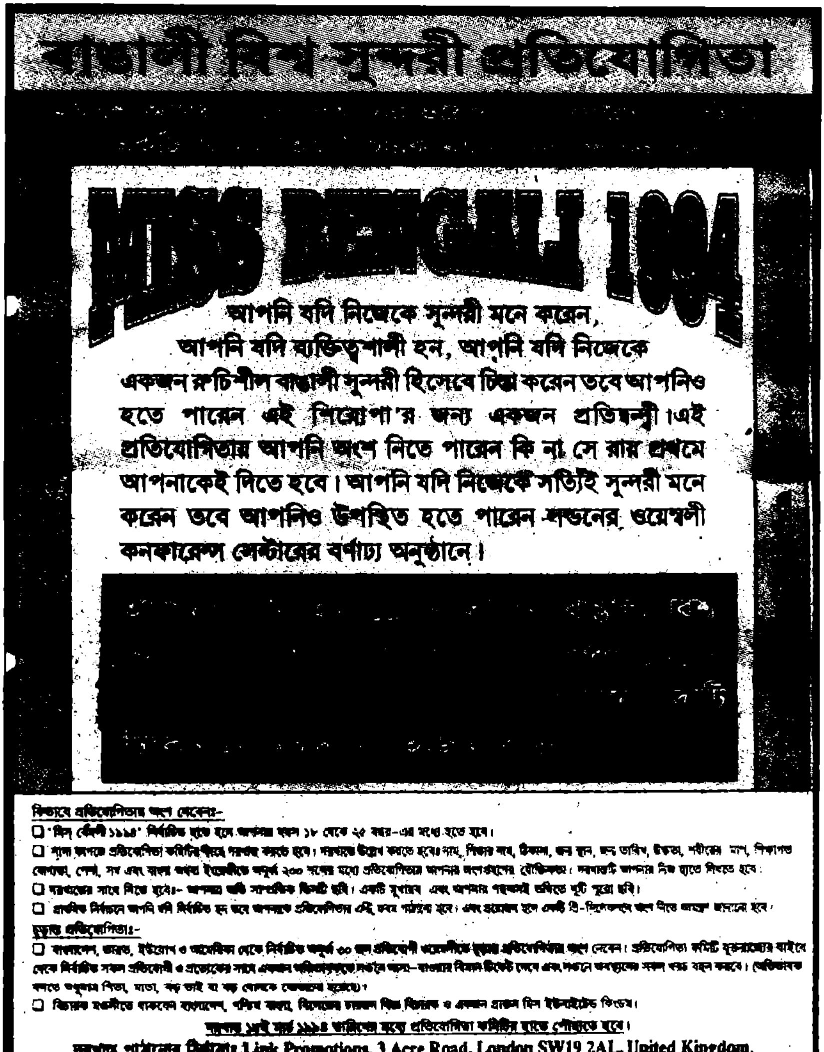

আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে বাঙ্গালী রমণীদেরকে উৎসাহিত করছে

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদীরা সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে প্রতিবছর নারীদেহ প্রদর্শনীর আয়োজন করছে

ভারতীয় ফিল্মী জগতের কিংবদন্তীর কিংস্টার অমিতাভ বচ্চন ছিলো এর প্রধান উদ্যোক্তা। তার নিজ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এ প্রতিযোগিতায় লগ্নি করেছে প্রায় ৩০ কোটি রুপী। বিশ্বের প্রায় ১১৫টি দেশ এ অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করেছে। এর ফলে বিশ্বের প্রায় দু'শ টিভি দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছে।

বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিশেষত্য হলো- তিন সপ্তাহ ধরে এক ঝাঁক দেহবতী নারীর অঙ্গশোভা প্রদর্শন। যেসব সুন্দরী ষোড়শী তন্বীরা এই প্রতিযোগিতায় তালিকাভুক্ত হয় তাদেরকে কয়েকটি পর্বে বাছাই করে। চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করে প্রথম পর্বে

মিস বাংলাদেশ সুন্দরী প্রতিযোগিতায় '৯৫ বিজয়িনী

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নিম্নতম যোগ্যতা যাচাই-বাছাই করা হয়। কয়েকবার বাছাই পর্ব হয়। সর্বশেষ চূড়ান্ত তালিকার কলেবর সংক্ষিপ্ত হয়।

মিস বাংলাদেশ ১৯৯৪ ও মিস ওয়ার্ল্ড ১৯৯৪

পরবর্তীতে ফাইনাল প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত সুন্দরী তন্বীদের শারীরিক মাপ-জোক শুরু হয়। যেসব তরুণীর শরীরের বাঁক সবচেয়ে প্রখর তারাই সবচেয়ে সুন্দরী বলে বিবেচিত হয়। এরপর যুবতী সুন্দরী প্রতিযোগীদের স্পর্শকাতর অংশের যেমন কটিদেশ, নিতম্ব ও বক্ষ প্রদেশ ফিতা দিয়ে পুরুষেরা মেপে থাকে। প্লাস্টিক সার্জারী বা অন্য কোনো কৃত্রিম উপায়ে স্তন ও নিতম্ব ফোলানো হয়েছে কিনা তা বেশ কয়েক হাতে পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই প্রত্যঙ্গগুলো প্রতিযোগিনীর সহজাত নিজস্ব সম্পদ হতে হবে। কোনো কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয়া যাবে না। পরীক্ষকবৃন্দ যাতে ভালোমতো পরীক্ষা করে দেখতে পারে সে জন্য প্রতিযোগিনীর বুকে ও নিতম্বে থাকে মাত্র এক চিলতে কাপড়; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে বোর্ডের সামনে আসতে হয়। অবশ্য উলঙ্গ হওয়াটা ব্যতিক্রম, তবে বিকিনি পরতে হয়। সুন্দরীদের সর্বাঙ্গ প্রদর্শনে প্রচুর অর্থের সমাগম হয়। এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন উপস্থিত বিচারক, জুরি, পর্যবেক্ষক এবং কর্তৃপক্ষ সমন্বয়ে কয়েকশত দর্শক। এসব ষোড়ষী তন্বীরা একে একে ধীরলয়ে ধীর

মিস ইন্টারন্যাশনাল সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী মিস ভেনেজুয়েলা ভিভিয়ান রিনকনকে (মাঝে) অভিনন্দন জানাচ্ছে প্রথম রানারআপ মিস কোরিয়া সোহন তায়ে-ইয়ং (বামে) এবং দ্বিতীয় রানারআপ মিস রাশিয়া স্তেতলানা গোরেভা –এএফপি

www.pathagar.com

পদক্ষেপে মঞ্চে আসেন। এদের চোখে-মুখে থাকে কামার্তের ভাব ও দুষ্টমি হাসি। তাদের দেহের বিভিন্ন অংশ, খাঁজ-ভাজ নানা ভঙ্গিতে ঘুরয়ে ফিরিয়ে উপস্থিত দর্শকদের প্রদর্শন করেন। সুতরাং বিশ্ব সুন্দরী নামক এই অনুষ্ঠান প্রক্রিয়াটি নিঃসন্দেহে কুৎসিত। এই সুঁড়সুড়ি মার্কা অশ্লীল ও রুচি বিকৃতির অনুষ্ঠানটি নিয়ে 'কামসূত্রের' দেশ ভারতে তুমুল বিতর্ক ও প্রতিবাদের ঝড় সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে ভারতে তখন হৈ চৈ কান্ড, হৈ রৈ ব্যাপার ঘটেছিল। পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, উদ্যোক্তারা অনুষ্ঠান করার জন্য যেমন ধনুভঙ্গ করেছেন তেমনি সেই অনুষ্ঠান প্রতিরোধ ও বানচাল করার জন্যও পাল্টা প্রস্তুতিও শুরু করেছিলো। ভারতের একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী এবং মহিলা সংগঠন ভারতের মাটিতে বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানকে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জ বেহায়াপনা বলে অভিযুক্ত করেছেন। এ সুন্দরী প্রতিযোগিতা প্রতিহত করতে চূড়ান্ত দিনে ১০ লাখ প্রতিবাদপত্র পাঠানো হয়েছিলো। এ ছাড়া কর্ণাটক প্রাদেশিক পরিষদের বেশ কয়েক জন সদস্য হুমকি দিয়েছিলো যে, তারা অনুষ্ঠান পন্ড করার জন্য সুইসাইড স্কোয়াড বা আত্মঘাতী দল পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। অন্যদিকে প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্য দিল্লী থেকে কমান্ডো বাহিনী নেয়া হয়েছিলো। ঘনকালো কৃষ্ণবর্ণের এ বাহিনী হলো ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দুর্ধর্ষ অংশ। যাদেরকে বলা হয় 'ব্ল্যাক ক্যাট'। এ ছাড়া সরকার ১৫ হাজার পুলিশ মোতায়েনের ব্যবস্থা করেছিলো। সুতরাং আশঙ্কা করা হচ্ছিল যে, বাঙ্গালোরে সৌন্দর্য্যের সাথে মোকাবেলা হচ্ছে বারুদ বন্দুকের।

ভারতের কংগ্রেস (আই) দলও সেদেশে বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা আয়োজনের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে একাত্ম হয়ে বলেছিল এ ধরনের প্রতিযোগিতা ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিপন্থী। কংগ্রেসের দক্ষিণাঞ্চলীয় কর্ণাটক রাজ্য শাখার তরফ থেকেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেব গৌড়ের পিপলস পার্টির নেতৃত্বাধীন প্রাদেশিক সরকারের প্রতি বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা থেকে দূরে থাকার আহবান জানানো হয়েছিল।

কর্ণাটকের কংগ্রেস নেতা এইচ কে পাতিল বলেছিলেন, আমরা চাই না, সরকার বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতার ব্যাপারে কোনো রকম আগ্রহ দেখাক।

২২৪ সদস্য বিশিষ্ট বাঙ্গালোর প্রাদেশিক সংসদের সাতজন সদস্য হলেন মহিলা। তাদের অন্যতম নেতা প্রমিলা নেসারগী বলেছিলেন যে, যে কোনো মূল্যে এ অনুষ্ঠান আমরা ভন্ডুল করে দেব। সেই অগ্নিকন্যা নেসারগী হুমকি দিয়েছিলো, 'আমরা শুধুমাত্র মহিলাদের দিয়ে একটি আত্মঘাতী দল গড়ে তুলছি। ওরা অনুষ্ঠানস্থলের অভ্যন্তরে যাবে এবং অনুষ্ঠান বানচাল করে দেবে।"

এ ছাড়া এই প্রতিযোগিতার বিরোধিতা করছেন কর্ণাটক মুসলিম মহিলা কল্যাণ সংস্থা নামক একটি মহিলা সংগঠন। তাদের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'এই নোংরা, বেহায়া অনুষ্ঠান ভারতীয় রমণীর সুচি স্নিগ্ধতা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি মূল্যবোধকে ধ্বংস করবে।"

ঠিক একইভাবে ভারতীয় জনগণ বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালোর বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে আরেকবার প্রতিরোধ গড়েছিলেন কয়েক মাস আগে কলকাতায়। বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা উপলক্ষে উদ্বোধনী দিনে মিস ইউনিভার্স আকাশ থেকে মর্তে

www.pathagar.com

নামার কথা ছিলো। এই সুস্মিতা সেন দু'বছর আগে বিশ্ব সুন্দরীর শিরোপা পেয়েছিলেন। আমরা জানি ভারত অশ্লীলতার স্বর্গরাজ্য। তা সত্ত্বেও সেখানে কতিপয় রুচিবান জনগণ কুৎসিত, নোংরা, অশ্লীল ও রুচি-বিকৃতির সুন্দরী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের চরম বিরোধিতা এবং চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন। এই প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য তাদেরকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দক্ষিণ আফ্রিকার সানসিটিতে মিস ওয়ার্ল্ড '৯৪ প্রতিযোগিতায় মিস বাংলাদেশ আনিকা তাহের ও প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা

আমাদের এই বাংলাদেশে আবহমানকাল ধরে নারীর রূপ বর্ণনা হয়েছে কবিতায়, গানে ও লোক কাহিনীতে। যেমন–

যৌবনের ভারেরে ওরে কন্যা
টলমল করে।
সাত সায়রের পানিরে যেমন
উগলিয়ে পড়ে।
কন্যার রূপেতে রে ওরে
বাগান হইছে আলো।
এইনা রূপ দেখিয়া ওরে সাধুর
মন খারাপ হইল।

গ্রাম বাংলার মানুষ মনোরঞ্জনের জন্যে গানের মাধ্যমেই নারীর রূপের বর্ণনা করে বা

বিশ্ব সুন্দরী লিনর এবারগিল (মাঝে) বাঁয়ে মিস মালয়েশিয়া এবং ডানে মিস ফ্রান্স

www.pathagar.com

কেশ পরিচর্যায় ব্যস্ত বাঁয়ের ছবিটি এদেশের মডেল কন্যা চিত্রার। বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় তিনি অংশ নিয়েছেন

শুনে রোমাঞ্চিত হতো, আনন্দ পেতো। এ ছাড়া গ্রাম বাংলায় এককালে গরু দৌড়ের প্রচলন ছিলো। গরু দৌড়ের সাথে গরু প্রদর্শনীও হতো। গ্রাম বাংলার অনেক সৌখিন ব্যক্তি গরু দৌড়ের জন্য গরু পালন করতেন। এসব গরু দিয়ে হালচাষ করা হতো না। বছরের নির্দিষ্ট এক সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে গরু দৌড়ের জন্য একত্রিত করতো। গরু দৌড়ের চেয়ে গরু প্রদর্শনের দিকেই ঝোঁক ছিলো এলাকার জনগণের। তারা কোন্ গরুটি মোটা-তাজা, শক্তিশালী তা নিরূপণ করতো। কেউ কেউ খোঁচা মেরে গরুর তেজ ও শক্তি পরখ করতো। এই গরু প্রদর্শনী ছাড়া আর কোনো প্রদর্শনীর অস্তিত্ব গ্রাম

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক গেমস-এ বিভিন্ন খেলার নামে চলছে এভাবে নারী প্রদর্শনী

www.pathagar.com

বাংলায় ছিলো না। ঢাকার পাকা মাটিতে পা রেখে দেখলাম পাশ্চাত্যের অনুকরণে কুকুর প্রদর্শনী থেকে শুরু করে সব প্রদর্শনী হয়। এক সময় আমাদের দেশে গানে-কবিতায় এদেশের নারীর রূপের বর্ণনা সীমাবদ্ধ ছিলো, পরবর্তীতে যাত্রা নাটকে মেয়েরা অংশগ্রহণ করতো বটে; কিন্তু সুন্দরী প্রতিযোগিতায় মেয়েরা অংশগ্রহণ করেনি। অথচ গত কয়েক বছর ধরে পাশ্চাত্যের অনুকরণে তথাকথিত প্রগতিবাদীরা নারীর রূপ সৌন্দর্য প্রদর্শনের আয়োজন করছে। ঠিক তদ্রুপ আমাদের দেশে বিভিন্নভাবে কয়েক বছর ধরে সুন্দরী প্রতিযোগিতা আয়োজনের মহড়া চলছে। নারীকে রূপের প্রতিযোগিতায় নিয়ে এসেছে একটি পাক্ষিক ম্যাগাজিন 'আনন্দ বিচিত্রা'। এ ম্যাগাজিনের মহাজ্ঞানী ব্যক্তিত্বরা নারীর রূপ সৌন্দর্যকে নতুন আঙ্গিকে ধারণ করতে চায়। এসব প্রগতিবাদীরা রক্ষণশীলতাকে দূর করে নারীকে স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে 'ফটো সুন্দরী' প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বাংলার শত শত নারীকে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আহবান জানাচ্ছে। যে রূপের মূল্যমান তারা নির্ধারণ করেছেন ৫ হাজার ও ২ হাজার টাকা। বাংলাদেশ একটি দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র। আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম বিগত সরকারের আমলে অনিকার মতো একজন মুসলিম নারীর বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে দেখে। আত্মসম্ভ্রম রক্ষায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান সকলেই তৎপর। কিন্তু আজকে মুসলিম নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে পরিণত করার জন্যে সব আয়োজন চলছে। এরশাদ আমলে বাংলাদেশে নারীর ব্যক্তিত্বের অবমাননা করে বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান আয়োজনের চেষ্টা করা হয়েছিলো। কিন্তু জনতার আপত্তির কারণে তিনি এটা নিষিদ্ধ করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক-এ ইভেন্টের অবসরে জনৈক রমণী

১৯৯৫ সালে বিএনপি সরকারের আমলে শুরু হয় আসল মহড়া। চুপি চুপি, গোপনে এ ঢাকায় ছোটখাটো একটি সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করেই ফেলে। ১৯৯৫ সালের ১২ আগস্ট রাজধানীর ঈসা খাঁ হোটেলে 'মিস বাংলাদেশ' প্রতিযোগিতা হয়ে যায়। ১৩ আগস্ট পত্র-পত্রিকায় 'বাংলাদেশী সুন্দরীদের' ছবিসহ খবর প্রকাশিত হয়। প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন লন্ডনভিত্তিক একটি

আন্তর্জাতিক অলিম্পিক-এর একটি দৃশ্য

www.pathagar.com

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।

এই প্রতিযোগিতার বিচারক নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক, সাংবাদিক শফিক রেহমান ও ঔপন্যাসিক রাহাত খান। এঁদের সাহিত্যকর্মে বাংলার নিজস্ব আবহমান কৃষ্টি কালচারের খই ফোটে। কিন্তু 'মিস বাংলাদেশ' সুন্দরী প্রতিযোগিতার সাথে এদেশের মানুষের স্বপ্ন, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং বাঙ্গালীর সংস্কৃতির আদৌ কোনো যোগসূত্র আছে কি?

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে জানা যায়, এসব সুন্দরীদের শরীরে সেদিন জড়ানো ছিলো সংক্ষিপ্ত স্কার্ট। সম্ভবত এরশাদের শাসনামলে টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে সৈয়দ শামসুল হকসহ তাঁর মেয়েকে দেখেছিলাম। তাঁর মেয়ের পোশাক দেখে আমি নিজেই লজ্জিত হয়েছিলাম। এঁরা মুখে বাঙালী সাংস্কৃতির কথা বলে অথচ তাঁদের জীবনাচারে এর প্রতিফলন নেই। এই স্ববিরোধী বুদ্ধিজীবীরা 'মিস বাংলাদেশ' সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে আন্তর্জাতিক হোটেলের বলরুমে বসে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য স্টাইলে তরুণী বালিকাদের হাঁটার ঢং, কোমরের মাপ, আর নিটোল বক্ষের ওঠানামা পরিমাপ করেছেন।

রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে বসে এ ধরনের অর্ধনগ্নতা প্রদর্শন হয়েছে অথচ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কিছুই জানেনি। ১৩/৮/৯৫ তারিখে পত্র-পত্রিকায় সচিত্র সংবাদ প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। তবুও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের টনক নড়েনি। জনগণের প্রতিবাদের মুখে ৮ দিন পর অর্থাৎ ২০/৮/৯৫ তারিখে এই প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি দেন।

আমাদের ধর্মীয় পরিপন্থী এই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছিলো জাতির অজান্তে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে। আমাদের তৎকালীন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাও ছিলো রহস্যময়। নাকের ডগায় আন্তর্জাতিক হোটেলে 'মিস বাংলাদেশ' প্রতিযোগিতা হলো মন্ত্রণালয় কিছুই বলেননি। পত্র-পত্রিকায় সংবাদ বের হলো, তখনও মন্ত্রণালয় কিছুই বলেননি। জনগণ যখন এর তীব্র প্রতিবাদ জানাতে শুরু করে তখনও তৎকালীন জাতীয়তাবাদী(!) সরকারের মন্ত্রণালয় কিছুই বললেননি। জনগণ যখন প্রতিবাদ করে ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন মন্ত্রণালয় লোক দেখানো ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বেশ কয়েক বছর যাবত নারীকে রূপের প্রতিযোগিতায় নিয়ে এসেছে একটি পাক্ষিক ম্যাগাজিন 'আনন্দ বিচিত্রা'। এ ম্যাগাজিনের মহাজ্ঞানী ব্যক্তিত্বরা নারীর রূপ সৌন্দর্যকে নতুন আঙ্গিকে ধারণ করতে চায়। এসব প্রগতিবাদীরা রক্ষণশীলতাকে দূর করে নারীকে স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে মর্যাদা দিতে 'ফটো সুন্দরী' প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বাংলার শত শত নারীকে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আহবান জানাচ্ছেন। যে রূপের মূল্যমান তারা নির্ধারণ করেছেন ৫ হাজার ও ২ হাজার টাকা। ভাবতেও অবাক লাগে শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এই বাংলাদেশে এ অপকর্ম করার সাহস এরা পায় কোথেকে? রূপের ব্যবসা, দেহ ব্যবসার চেয়ে জঘণ্য এবং ঘৃণিত।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'যায় যায় দিন' পত্রিকাটি ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বাঙালী ললনাদের অংশগ্রহণের জন্য বিজ্ঞাপনের

www.pathagar.com

মাধ্যমে লোভনীয় ও আকর্ষণীয় প্রস্তাব দিয়েছিলো। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি একটি নারী স্বাধীনতার পক্ষে এবং ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী চটকদার রসালো যৌন উদ্দীপক কাল্পনিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে যুবক-যুবতীদের চরিত্র হননের সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

ভালেন্টাইন ও 'ভালোবাসা দিবস'

গত কয়েক বছর যাবত ১৪ ফেব্রুয়ারী 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে' বা বিশ্ব ভালোবাসা দিবস পালিত হচ্ছে। উদ্দাম, উচ্ছ্বাস, একে অপরকে সর্বাধিক পছন্দের উপহার প্রদান, জোড়ায় জোড়ায় অবাধে ঘুরে বেড়ানো, তরুণ-তরুণীদের পুষ্প বিনিময় (তার সাথে হৃদয়ও) প্রভৃতির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে ভালোবাসা দিবস।

ডিশ কালচারের বদৌলতে ১৯৯৩ সাল থেকে এদেশে পালিত হচ্ছে দিবসটি। এর আগে ইউরোপ-আমেরিকার মাঝেই তা ছিলো সীমাবদ্ধ। এই দিবস পশ্চিমা জগতের নৈতিক পদস্খলনেরই আরেক নজীর।

১৪ ফেব্রুয়ারীর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে অনেক তরুণ-তরুণী। প্রিয় মানুষটিকে কিভাবে আরো প্রিয় করা যায়, তা নিয়ে ভাবনার অন্ত থাকে না। 'তাকে এটা মানাবে তো! এটা পেলে খুশী হবো তো!' কতো রকমের চিন্তা। কিন্তু অনেকেরই জানা নেই দিনটির ইতিহাস। নানা ধরনের কথা প্রচলিত আছে এর উৎপত্তির ব্যাপারে। এর মধ্য থেকে কোন্‌টি সঠিক ইতিহাস, তা বের করা মুশকিল।

৮২৭ সালের কথা। রোমের পোপ হয়ে এলেন সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামের এক সুদর্শন যুবক। ভালোবাসার মাধুরী দিয়ে সুকোমল ব্যবহারে বিমুগ্ধ করে ফেললেন ভক্ত-

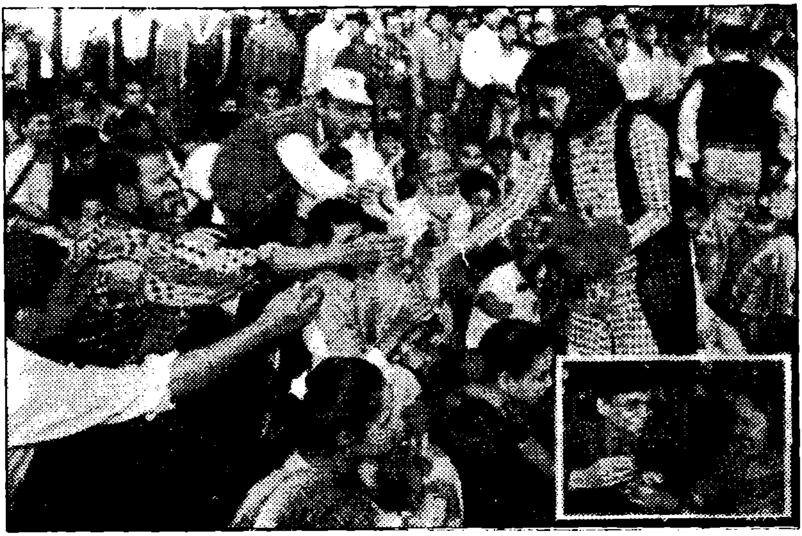

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'র সড়ক দ্বীপে 'ভালোবাসা দিবস-এর মিলন মেলার দৃশ্য

www.pathagar.com

জনতাকে। তার জয়-জয়কার ধ্বনি পড়ে গেলো শহরে। মুখে মুখে একটি নাম 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন'। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! মাত্র ৪০ দিনের মাথায় বিদায় নিতে হলো এ পুরুষটিকে। আর সেই বেদনাবিধুর দিনটি ছিলো ১৪ ফেব্রুয়ারী। সেই থেকে খৃষ্টীয় ধর্মীয় আমেজে পালিত হয়ে আসছে এ দিবসটি।

কারো মতে, রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াসের নির্দেশ জারি করে যে, কেউ বিয়ে করতে পারবে না। কারণ বিয়ে মানুষকে 'ঘরমুখী করে রাখে'। তাই সে দেশে নিষিদ্ধ হয়ে গেলো বিয়ে।

ফুলের সৌরভকে মাড়িয়ে বইয়ে দেয়া হলো বারুদের গন্ধ। তীব্র প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ালো প্রতিবাদী যুবক সেন্ট ভ্যালেন্টাইন। ক্ষুব্ধ হলো সম্রাট। বন্দী করা হলো তাকে। নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে। নির্যাতনের স্টিম রোল চালানো হলো তার উপর। অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে অবশেষে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়া হলো তাকে। সেই কালো দিনটি ছিলো ১৪ ফেব্রুয়ারী।

আবার কেউ কেউ মনে করেন, প্রাচীন রোমের উৎসব থেকে 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র উৎপত্তি। সেই উৎসবে একটি বিশেষ ধরনের পাত্রে কুমারী মেয়েরা ভালোবাসার পংক্তি লিখে জমা রাখতো। যে যুবক যার পংক্তিসম্বলিত কাগজ তুলতো, সেই তার যোগ্য স্বামী ও সাথী হিসেবে বিবেচিত হতো।

অন্য মত অনুসারে মধ্যযুগে নর্মান জাতি যে ফরাসী ভাষা ব্যবহার করতো, তার একটি শব্দ ছিলো- GALANTINE যার অর্থ 'সাহসী প্রেমিক'। উচ্চারণ ও অর্থের দিক থেকে মিল থাকায়, এই শব্দটি থেকে EVALAENTINE-এর উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন।

আবার কেউ কেউ মনে করেন, মধ্যযুগের ইউরোপীয়ানরা বিশ্বাস করতো ১৪ ফেব্রুয়ারী পাখিরা তাদের সাথী খুঁজে নেয়। এই ধারণা থেকেই দিনটিকে প্রেমিক-প্রেমিকারা উপহার ও ভালোবাসা বিনিময়ের জন্য বেছে নেয়। এই 'পক্ষী মতবাদ'টি বিশ্বখ্যাত কবি ও নাট্যকার শেক্সপিয়ার তার A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM নাটকে ব্যবহার করেন।

এমনি নানা ধরনের উপাখ্যান প্রচলিত আছে 'ভ্যালেন্টাইন ডে'র ব্যাপারে।

মূলত দিনটি প্রথমে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা থেকে পালিত হতো। কিন্তু আজকাল আধুনিকতার নামে এবং আকাশ কালচারের বদৌলতে নানা রকমের নৈতিকতা বিবর্জিত কাজের মধ্য দিয়ে তা পালিত হচ্ছে। ভালোবাসা অনেক ক্ষেত্রে বিকৃতি ও বাড়াবাড়ির দরুন নিছক জৈবিক তাড়নায় পর্যবসিত হচ্ছে। আবেগসর্বস্ব তারুণ্যের উদ্দামতাই যেন দিবসটির প্রতিপাদ্য।

গত দু'বছর যাবত এদেশে সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণভাবে উৎসবটি পালন করা হচ্ছে। পার্ক রেস্তোরাঁ, ভার্সিটির করিডোর, টিএসসি, বিমান বন্দর সংলগ্ন ওয়াটার ফ্রন্ট, চারুকলার বকুলতলা প্রভৃতি স্থানে ছিলো প্রেমপাগল তরুণ-তরুণীদের ভিড়। ফুলের দোকানগুলোতে ফুল বিক্রি হয়েছে রেকর্ড পরিমাণ। দুপুরের দিকে লাল গোলাপ ছিলো

www.pathagar.com

দুষ্প্রাপ্য। বাংলা একাডেমির বইমেলাতেও লেগেছিলো এর ঢেউ। প্রেমিকরা ফুল নিয়ে লাইন দিয়েছিলো ক্যাম্পাসে মেয়েদের হলের সামনে।

টিএসসিতে ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিলো বিচিত্র অনুষ্ঠানমালা। এর মধ্যে ছিলো স্মৃতিচারণ, আবৃত্তি, সঙ্গীত, রম্য বিতর্ক। উদ্বোধন করেছিলেন কম বয়েসী মন্ত্রীদের একজন সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

নগরীর পাঁচতারা হোটেলগুলো বিচিত্র সাজে হয়েছিলো সজ্জিত। যুগলবন্দী উদ্দাম নৃত্য, ফ্রি মাদক পানীয় পরিবেশন, লাল গোলাপ শুভেচ্ছা আর উপাদেয় ভোজের আয়োজন ছিলো। রাতভর জোড়ায় জোড়ায় নাচে সরব ছিলো হোটেলের বলরুম। বিদেশী মিউজিকের তালে তালে নেচে-গেয়ে মাতিয়ে রাখা হয়েছিলো নিশুথি রাতে উচ্চবিত্তের মহল।

স্বাভাবিকভাবেই দেশের সচেতন সুধী মহল থেকে প্রশ্ন উঠেছে- এর নামই কি তারুণ্য? এটাই কি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ? ডিশ কালচারের মাধ্যমে কেনো পাশ্চাত্য জগত এগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বময়? এসব অপসংস্কৃতি প্রচারের টার্গেট কারা? টার্গেট বিশেষ করে যুব সমাজ। তারা ধ্বংস করতে চায় তরুণদের নৈতিক প্রতিরোধের শক্তিকে। অবক্ষয়ের বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে ভাসিয়ে দিতে চায় নব বংশধরকে।

ভালোবাসা চিরন্তন। ভালোবাসা ছিলো, আছে, থাকবে চিরকাল। ভালোবাসা ছিলো বলেই এই পৃথিবী, প্রকৃতি, মানুষসহ সৃষ্টিজগত রয়েছে। যদি না থাকতো ভালোবাসা, তবে এই পৃথিবী হতো না এতো সুন্দর।

কিন্তু চিরন্তন এই প্রেম ভালোবাসাকে কেনো করা হচ্ছে বিতর্কিত?

গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে মুসলমান হিসেবে আমাদের আত্মপরিচয় জানতে হবে। আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে কালজয়ী আদর্শ ইসলামের দিকে।

ফ্যাশন শো

'৯৫-এর মিস বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা আয়োজনের বিরুদ্ধে জনগণ তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত কয়েক বছর যাবত সুন্দরী প্রতিযোগিতা আয়োজনে উদ্যোক্তারা সাহস পাচ্ছিল না। কিন্তু এরা বসে নেই। বর্তমানে ফ্যাশন শো এবং কনসার্টের নামে এ পথে ধীরলয়ে এগুচ্ছে। বর্তমানে মাঝে মাঝেই রাজধানীর অভিজাত হোটেলগুলোতে 'ফ্যাশন শো'-এর আয়োজন করা হচ্ছে। এসব ফ্যাশন শোতে শুধু ষোড়শী তরুণীদেরই ব্যবহার করা হচ্ছে না। স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরও এ

ফ্যাশন শো-তে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও তালিম দেয়া হচ্ছে

www.pathagar.com

বিষয়ে তামিল দেয়া হচ্ছে। সুন্দরী প্রতিযোগিতা এবং ফ্যাশন শো মূলতঃ কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু একটি হলো সুন্দরী বাছাইয়ের নামে অন্যটি ফ্যাশন শো এর নামে। উভয় ক্ষেত্রেই থাকে দেহবতী ষোড়শী নারীদের অঙ্গশোভা প্রদর্শন। সংক্ষিপ্ত বিকিনি বা স্কার্ট পরিহিত অর্ধনগ্ন সুন্দরী তন্বীরা সুন্দরী প্রতিযোগিতার মতো চোখে-মুখে কামার্তের ভাব ও দুষ্টমীর হাসি নিয়ে আধা আলোতে যন্ত্র ও নৃত্যের তালে তালে পাশ্চাত্য বা হিন্দি গানের সুরে সুরে তাদের দেহের বিভিন্ন অংশ, খাঁজ-ভাজ নানা ভঙ্গিতে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রদর্শন করে থাকে।

আবহমান কাল ধরে আমাদের দেশে একটি নিয়ম চলে আসছে পাত্র-পাত্রী দেখে বিয়ে ঠিক করা। ইসলাম ধর্মও তা অনুমোদন করে। কিন্তু ইদানিং গ্রাম-বাংলায় যেভাবে পাত্রী দেখা হচ্ছে তা অশোভনীয়। আমরাও এর বিরোধিতা করি এবং নিন্দা জানাই। অবিলম্বে এরূপ অশোভনীয় ভাবে পাত্রী দেখা সামাজিকভাবে প্রতিহত করা জরুরী। কিন্তু আমাদের দেশের কতিপয় সুন্দরী প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষক মিডিয়াগুলোতে এই পাত্রী দেখার প্রথাকে তীব্র সমালোচনা করে থাকে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো– তারা সুন্দরী প্রতিযোগিতা ও ফ্যাশন শো-এর নামে যেভাবে অর্ধনগ্ন করে নারী দেহ প্রদর্শন এবং প্রত্যক্ষ করে থাকেন তা কি পাত্রী দেখার চেয়েও অশোভনীয় ও নিকৃষ্ট নয়?

ফ্যাশন শো'র নাম যুবতীদের নগ্ন দেহ প্রদর্শনীর এক চমৎকার আয়োজন। ২০০১ থার্টিফার্স্ট নাইটে গ্রামার মিডিয়া (কোরিওগ্রাফার) নামে একটি সংগঠন মহাখালীর হোটেল অবকাশে এই নারী দেহবল্লরী প্রদর্শনের আয়োজন করে। এখানে পানাহার, উদ্দাম নৃত্য-গীতসহ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্টাইলে বেহায়াপনা চলে এক সঙ্গে।

www.pathagar.com

এক সময় হিন্দু রাজ-রাজারা ও অভিজাত শ্রেণী পাত্রী নির্বাচন করতো ব্রাহ্মণদের মাধ্যমে। এই ব্রাহ্মণেরা তাদের এবং নিজ পাত্রী নির্বাচনের জন্য সুন্দরী মহিলাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে এবং শরীরের বিভিন্ন গোপনীয় অঙ্গে হাত স্পর্শ করে পাত্রী নির্বাচন করতো। এরই ধারাবাহিকতা ভিন্ন আঙ্গিকে আমরা লক্ষ্য করছি সুন্দরী প্রতিযোগিতা এবং ফ্যাশন শো অনুষ্ঠানে।

মানব জাতি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেরা জীবন। ঠিক নারীও তাই। পণ্যের ন্যায় অশ্লীলভাবে মায়ের জাত নারীকে এভাবে প্রদর্শন করা তাদের প্রতি অবমাননা নয় কি?

বাউলবাদ

পাশ্চাত্যের অনেক অমুসলিম বুদ্ধিজীবী ইসলামকে জানতে গবেষণা করে যাচ্ছে। আর আমাদের দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল বলে দাবীদার বুদ্ধিজীবীরা গবেষণামূলক ধর্মকে বাদ দিয়ে লালনকে নিয়ে গবেষণা করছে। আল্লাহ-রাসূল, ইসলাম, মুসলমান- এই শব্দগুলো নিয়ে এদের এলার্জি থাকলেও লালনবাদ নিয়ে তারা খুবই উচ্চকিত। প্রেস ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় লালন ও বাউলবাদ প্রচারে খুবই উৎসাহিত। এর রহস্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

লালনের গানে যে দেহতত্ত্বের দর্শন রয়েছে তা অত্যন্ত চাতুরিপূর্ণ। সরল প্রাণ মানুষকে গোমরাহীর দিকে ঠেলে দেয়ার একটি অভিনব প্রতারণা। প্রকৃতপক্ষে দেহতত্ত্ব চিকিৎসা বিদ্যার বিষয়; আধ্যাত্মিকতার নয়। লালনের গানে যে দেহতত্ত্ব-এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় দেহই সব। যা ফ্রয়েডের দর্শন এবং যা ইসলামী দর্শনের সাথে সাংঘর্ষিক। আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাবো না। আর এখানে তা সম্ভবও নয়। এর জন্য আলাদা গ্রন্থ রচনা করতে হবে। আমি শুধু দৃষ্টান্ত হিসেবে এই নোংরা ও কুৎসিত মতবাদের প্রবক্তা লালনের গান থেকে কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি। লালন বলেন ঃ

"উপাসনা নাই গো আর
দেহের সাধন সর্বসার
তীর্থ ব্রত যার জন্য
এই দেহের তার সব মিলে।"
অথবা
"এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন
তাইতো মানুষরূপ গঠনে নিরঞ্জন।"

কথাগুলোর মর্মার্থ হলো- বিকৃতি ও বিভ্রান্তির অন্ধকারে দেহলিপ্সু নারী পুরুষকে ডেকে নেবার একটা ভূমিকা মাত্র। এই ধরনের পংক্তি আরো অনেক আছে, যার কাজ হলো লালনের উদ্ভাসিত অথবা ঈপ্সিত নিভৃত সাধনার গোপন অন্দর মহলে প্রবেশের আহবান। কিন্তু সকল 'উপাসনা', 'তীর্থ ব্রত',

বাউলবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে না। তবুও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রতিবছর বাউল গানের আয়োজন হচ্ছে বিপুল সমারোহে

www.pathagar.com

'মাধুর্য ভজন' যে লক্ষ্যে নিবেদিত সেই 'মহামূল্যবান' সাধারণ স্বরূপ কী? খুবই অশ্লীল ও অকথ্য কিন্তু লালন বড় 'সুন্দর' করে বলেন ঃ

"জন্মপথে ফুলের ধ্বজা
ফুল ছাড়া নাই গুরুপূজা
সিরাজ সাঁই কয় এ ভেদ বোঝা
লালন ভেড়োর কর্ম নয়।"

বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়, নারীর জন্মপথ অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়কে পুষ্পার্ঘ্যরূপে গুরুর কাছে নিবেদন করাই সাধনার প্রথম পাঠ (নাউজুবিল্লাহ) এবং গানের স্তাবকটিতে উল্লেখ করা আছে, তা সাধারণ ফুল নয়, 'বাঁকা নদীর তীরে বারো ফুল ফোটে'। বুঝা যায়, 'জন্মপথে' নারীর যে মাসিক রজঃস্রাব, সেই 'মহাযোগের' মাহেন্দ্রক্ষণে ভক্তির নৈবেদ্য সাজিয়ে গুরুর কাছে নিঃশেষে সমর্পিত হবার নামই সাধিকার জন্য 'পরম সাফল্যের' সন্ধান লাভ; শুধু সাধিকা নয়, গুরুর জন্যও বটে।

লালনের একটি বিখ্যাত গানের কিছু অংশ ঃ

"তিরপিনীর তীর ধরে
মীনরূপে সাঁই বিহার করে
তুমি উপর উপর বেড়াও ঘুরে
সে গভীরে ডুবলে না
মাস অন্তে মহাযোগ হয়
নীরস হতে রস ভেসে যায়
করিয়ে সে যোগের নির্ণয়
মীনরূপে খেল দেখলে না।"

তিরিপিনীর অর্থ ত্রিবেণী। লালন এখানে দেহ সাধনার নামে লাম্পট্যের এক আবহ নির্মাণ করেছেন। এক সময় ভারতবর্ষে অনেক চতুর মোহান্ত দেবতার নামে দেবদাসীদের শরীর ভোগ করতো। দক্ষিণ ভারতে কোন কোন স্থানে এই যৌনাচার এখনো অব্যাহত আছে। লালন এই চতুর মোহান্ত দেবতার নামে দেবদাসীদের ভোগ করতো। লালন এই চতুর মোহান্তদেরই চতুর এক বাঙ্গালী সংস্করণ।

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী, গীতিকার, গ্রন্থকার এবং কুষ্টিয়া সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক আবু জাফর বলেন, দেহতত্ত্ব যে কী জিনিস, আল্লাহ মালুম! দেহতত্ত্ব চিকিৎসা বিদ্যা বিষয় হতে পারে কিন্তু এর সাথে আধ্যাত্মিকতার কি সম্পর্ক? বস্তুত, এটা একটা অতি নিম্নমানের চাতুরিতাপূর্ণ পরিভাষা, সরলপ্রাণ মানুষকে গোমরাহির দিকে টেনে নেবার একটা প্রতারণা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যতো নোংরা প্রতারণাই হোক, এই গানের সংখ্যাও বিপুল, প্রভাবও ভয়াবহ। লালনের গানে যে দেহতত্ত্ব, তার সরল অর্থ হলো দেহই সব। প্রায় হুবহু ফ্রয়েডের মতো কথা। ফ্রয়েড তবু তো অনেক ভাল যে, তিনি যৌনতাকে মানব জীবনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে

www.pathagar.com

উপস্থাপন করেছেন। খুবই ভুল কিন্তু ফ্রয়েডের মধ্যে অন্তত কোন রকম চালাকি ছিলো না। অথচ লালন এ ক্ষেত্রে এক চতুর-কামুকতা ও বিকৃত কামপ্রক্রিয়ার ধারক ও প্রচারক। লালন তত্ত্বের প্রধান কথাই হলো, সাধনা-সিদ্ধি-মোক্ষ সবকিছুই এই দেহেরই মধ্যে। এই তত্ত্ব কারও কারও কাছে খুবই প্রিয়; কারণ স্পষ্ট, আধ্যাত্মিকতার আবরণে প্রাণভরে দেহ-সম্ভোগের এমন নির্ঝঞ্ঝাট সুযোগ অন্য আর কোথায় পাওয়া যাবে। লাম্পট্যের মধ্যে এমন মারেফাতী তরিকার সবক ও সৌরভ কতই না মূল্যবান। সবাই জানে, মানুষের দেহে আত্মার আনাগোনা বলে কিছু নেই। আত্মা একবারই আসে, একবারই বিদায় গ্রহণ করে। কতিপয় পন্ডিতের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন, রূহ বা আত্মা হলো আল্লাহর হুকুম। আসলে 'অচিন পাখি', 'অচিন মানুষ' ইত্যাদি শব্দবন্ধ লালন ব্যবহার করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে। লালনের বিবেচনা মতে, 'অচিন পাখি ধরার স্থান হলো 'মূলাধারচক্র বা ত্রিবেণীর ঘাট'; অর্থাৎ একেবারে নারীর নিভৃত যৌনাঙ্গ। বস্তুতই, লালনগীতির সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে এই ধরনের কদর্য অশ্লীলতা। (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ৭ জানুয়ারী ১৯৯৯)

কলকাতার দেশ পত্রিকা ৪ মাঘ, ১৩৯৮, ৫৯ বর্ষ, ১২ সংখ্যায় বাউলদের উপর এক প্রচ্ছদ নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। সেখানে কিছু মহিলা বাউলের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাৎকারে বাউলদের কুৎসিত জীবনাচারের পরিচয় মেলে।

বর্ধমান জেলার কিশোরীগঞ্জ গ্রামের মহিলা বাউল ননীবালা তার সাক্ষাৎকারে বলেন, "তিনি যে বাউলের সঙ্গে আছেন তার নাম রাধে শ্যাম। তার সঙ্গে তিনি বহু বছর ধরে আছেন। ননী বালা দাসীর সাক্ষাৎকার হুবহু উদ্ধৃত হলো–

প্রশ্ন ঃ আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়?

উত্তর ঃ এই ধরো ১০ হতে পারে, ১২ও হতে পারে। আমাদের কি অতো বয়সের হিসেব থাকে?

প্রশ্ন ঃ আপনাদের বিয়েতে কি আমাদের মতো সাত-পাক আচার-অনুষ্ঠান হয়?

উত্তর ঃ দেখ, তোমাদের যেমন স্বামী-স্ত্রী আমাদের বলে ক্ষ্যাপা-ক্ষ্যেপী। আমাদের মধ্যে বিয়ে কথাটাও চলে না, বলে সঙ্গিনী করেছে, ক্ষ্যেপী নিয়েছে। ধরো, কোনো বাউলের কাউকে পছন্দ হলো, গুরুর সামনে তার সঙ্গে কণ্ঠী বদল করে পাঁচজন সাধু গুরুর সেবা দিলেই হয়ে গেলো।

প্রশ্ন ঃ প্রায়ই দেখি বাউল এক ক্ষ্যেপিকে ছেড়ে আর একজনের সঙ্গে থাকে। তবে কি কণ্ঠী বদলের কোনো মূল্য নেই?

উত্তর ঃ (একটু চুপ করে থেকে) আমার কথাই বলি, "আমার মা যার সঙ্গে আমার কণ্ঠী বদল করিয়েছিল সে হঠাৎ একদিন আমাকে ছেড়ে চলে গেলো। আমার গুরুদেব আবার আর একজনের সাথে কণ্ঠী বদল করালেন। দু'টা ছেলেও হলো। হঠাৎ একদিন সেও উধাও হয়ে গেলো। ছেলেপুলে নিয়ে কি অবস্থা তখন আমার। তখন এই ক্ষ্যাপা রাধেশ্যাম ঠাঁই দিলো।

www.pathagar.com

প্রশ্ন ঃ এ রকম জীবনে সুখই বা কি?

উত্তর ঃ কেনো মেয়েরা বাউল জীবনে ঢোকে জানো? যাদের কোনো গতি হয় না। ধরে, অল্প বয়সে কোনো মেয়ে বিধবা হলো, কিংবা স্বামী ছেড়ে চলে গেলো। মেয়েটা তখন কি করবে? আত্মীয়-স্বজনের মুখঝাপটা, নানা বদনাম থেকে উদ্ধার করেন কোনো বাউল গুরু।

প্রশ্ন ঃ আর ছেড়ে গেলে?

উত্তর কি আর করবে। আবার কোনো বাউলের নেক নজরে পড়লে তো ভালো। না হলে ভিক্ষে করে বেড়াও করতাল বাজিয়ে।

প্রশ্ন ঃ আমার মনে হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা ধর্মের ভেক ধরে চরম ভোগ-ব্যভিচারের পথ। ঠিক না?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, মজা মারার দল তো আছেই।

দেহতত্ত্বের নামে এই মজা মারা দলের কদর্য অশ্লীলতার বাণী ও দর্শন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ঘন ঘন প্রচার করে থাকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অর্থে রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে। এমনকি বেসরকারী চ্যানেল 'একুশে টিভি' লালন মতবাদ প্রতি সপ্তাহে প্রচার করে থাকে। কয়েক দিন পূর্বে এমনই একটি পর্ব দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিলো। প্রশ্নকারীর উত্তরে লালন অনুসারী বলেন- "কোন নারী যদি কোন পুরুষের পাপকে অর্থাৎ অপকর্মকে গোপন করে সে ঐ পুরুষের আপন হয়ে যায়। সেই মহিলাকে ব্যবহার করতেও কোন বাঁধা নেই। (নাউজুবিল্লাহ)।

যাত্রা গান

বর্তমানে মানুষের বিনোদনের ক্ষেত্র বিভিন্নমুখী প্রসারিত হয়েছে। এ ছাড়া ইলেকট্রিক মিডিয়ার কারণে যাত্রাগানের আয়োজনের ক্ষেত্রে কিছুটা ভাটা পড়েছে। তবুও শীতকাল আসলে প্রতিবছরই একটি সুসংগঠিত চক্র বিভিন্ন ক্লাব ও সংস্থার কল্যাণার্থে গ্রামে-গঞ্জে ও শহরে আনন্দমেলার নামে যাত্রা প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

যাত্রা উদ্যোক্তাদের প্রচারণায় আকৃষ্ট হয়ে এবং লেখার উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অথবা কিছুটা কৌতুহলবশতঃ কয়েকটি যাত্রাগান উপভোগ করার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল।

যাত্রাপালার শুরুতেই বাদ্যযন্ত্রের ঝংকারে, লাল-নীল আলোর ঝলকানিতে, উগ্র যৌবনা নগ্নবক্ষা পরিহিতা জর্জেটে পাছা মোড়ানো ও নগ্ন উরু বিশিষ্ট বে-শরম প্রিন্সেসরা যৌন আবেদনমূলক বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে নৃত্য শুরু করে। তখন দর্শকদের মাঝে অশ্লীল বাক্যের জোয়ার বয়। প্রিন্সেসরা পরিধেয় বস্ত্র, ব্রা খুলে দর্শকদের মাঝে ছুড়ে মারে। এক পর্যায়ে প্রিন্সেসদের কোমড়ে ও বুকে একখন্ড বস্ত্র ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। প্রিন্সেসদের ছুড়ে দেয়া বস্ত্র নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। অনেক দর্শক এসব বস্তু কুড়িয়ে চুমো খায়। কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল যুবক দর্শক তখন প্রিন্সেস এর হাত

www.pathagar.com

ধরে নিতম্বে স্পর্শ করে চুমো খায়। আবার অনেক প্রিন্সেস হাত ধরে দর্শকদের সারি হতে অনেক যুবককে মঞ্চে উঠায়। এরপর শুরু হয় যুবককে নিয়ে যৌন কর্মের ন্যায় বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী। স্টেজের সামনের সারি থেকে কতিপয় যুবক 'আরো চাই, আরো চাই' বলে চিৎকার শুরু করে। দর্শকদের সারি হতে তখন মঞ্চের দিকে ইট, জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরা, কনডম ছুড়ে মারে। এই নারকীয় কান্ড দেখে হয়তো শয়তানও লজ্জায় পালিয়ে যায়। উচ্ছৃঙ্খল যৌন উন্মাদনা দর্শকদের মাঝে সারারাত এই কুৎসিত নৃত্য মুক্ত আবাহনে শীস বাজিয়ে তুড়ি দিয়ে ক্লান্তিতে কাহিল হয়ে দর্শকেরা বাড়ী ফিরে আর সারাদিন ঘুমিয়ে কাটায়।

এসব যাত্রাগানে শুধু অশ্লীল নৃত্যই হয় না। যাত্রাভিনয়ের ছদ্মবরণে থাকে প্রকাশ্যে জুয়া, ম্যাজিক শো, হাউজি, মদ, গাঁজা, নীল ছবি এবং

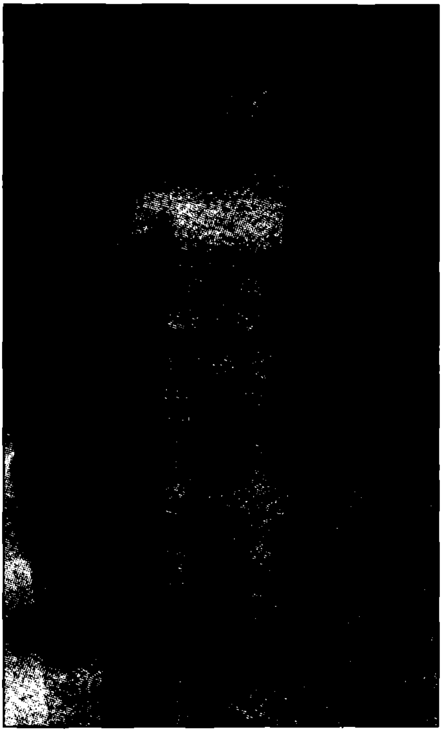

ছবিটি কোনো পর্ণো পত্রিকার অশ্লীল আলোকচিত্র নয়। এটি যাত্রা মঞ্চে উদ্দাম তরুণীর অশ্লীল নৃত্যের একটি ভঙ্গিমা

গভীর রাতে যাত্রা মঞ্চে অশ্লীল নৃত্যের দৃশ্য

www.pathagar.com

বিচিত্রানুষ্ঠানের নামে পতিতা কর্তৃক উত্তেজক নৃত্যের আসর। এসব যাত্রাগানের দর্শক প্রধানতঃ উচ্ছৃঙ্খল কিশোর, যুবক ও স্কুল-কলেজের ছাত্র। ফলে এসব কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে কোমলমতি তরুণ ছাত্র-যুবকেরা অতিরিক্ত অর্থের জন্য কৌশলে গোবেচারা দরিদ্র অভিভাবকদের পকেট কেটে অথবা ধান-চাল চুরি করে সর্বস্বান্ত করছে। অপরদিকে আশেপাশের এলাকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মেয়েদের উত্যক্ত করা, নেশা গ্রহণ, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদিসহ অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপ দারুণভাবে বেড়ে গেছে। এসব মতিভ্রষ্ট উঠতি যুবকদের আগমনে পতিতা পল্লীর ব্যবসা রমরমা হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যৌন রোগীর সংখ্যা।

যাত্রাদলে যেসব মেয়ে থাকে, দুই একটা ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের উদ্দেশ্যই থাকে রূপ-যৌবন ও দেহবল্লবী দেখিয়ে অর্থোপার্জন করা। শোনা যায়, যাত্রাদলের কোনো কোনা অভিনেত্রী এবং নর্তকী মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে আনন্দমেলা বা প্রদর্শনীর প্রভাবশালী আয়োজকদের শয্যা শায়িনীও হয়। ব্যবসার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সবটা অভিনেত্রী বা নর্তকীর ভাগ্যে জোটে না। এর সিংহভাগ পায় যাত্রা দলের মালিকেরা।

সরকারীভাবে হাউজি, যে কোনো ধরনের জুয়া, অশ্লীলতা, প্রদর্শনী নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর নাকের ডগায় প্রভাবশালী মহল কর্তক এসব বেআইনী কার্যকলাপ প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে যাত্রা, হাউজি, অশ্লীল নৃত্য ও অশ্লীল চলচ্চিত্র অথবা যাত্রার মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরকে ধ্বংস করার জন্য একটি বিশেষ মহল সুসংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে। এই বিশেষ মহলটি কোথাও সংস্কৃতির নামে, কোথাও বা শিল্প ও ললিতকলার নামে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মগজ ধোলাই করছে। এর সাথে ইসলাম বিদ্বেষী কতিপয় রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তৎপরতা চালাচ্ছে। কারণ এরা জানে কোনো সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হানার চাইতে পরোক্ষভাবে সংস্কৃতি ও শিল্পকলার নামে কাজ করা সহজ। আর সংস্কৃতি ও শিল্পকলার চর্চার নামে এরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের চরিত্রকেই মূল টার্গেট করেছে। এদের এসব তৎপরতা শুধু যাত্রানুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নেই। আমাদের চলচ্চিত্রে, মঞ্চ নাটকে এবং জাতীয় প্রচার মাধ্যম টেলিভিশন-রেডিওতেও অব্যাহত রয়েছে। কতিপয় রাজনৈতিক দল এ দেশকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার যতো প্রকার প্রক্রিয়া আছে তা গণতন্ত্র উদ্ধারের নামে তাদের আন্দোলনে গ্রহণ করেছে। ঠিক তেমনি তথাকথিত সংস্কৃতির নামে জাতির চরিত্র হননে যতো প্রকার প্রক্রিয়া আছে সংস্কৃতিসেবীরা তা গ্রহণ করছে। তার মধ্যে যাত্রাপালাও একটি।

সুতরাং স্কুল-কলেজ অথবা বিভিন্ন সংগঠন আনন্দমেলার নামে যাত্রাগানের রুচিহীন আয়োজন ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। অশ্লীল নৃত্য-গীত, দেহ বল্লবীর প্রদর্শনী এবং যাত্রার মূল কাহিনীর সাথে সামঞ্জস্যহীন আদি রসাত্মক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সমাজে বা রাষ্ট্রে অশ্লীলতার জোয়ার বয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার নামে এসব নারকীয় কান্ডের আগুনে গোটা সমাজ তথা নারী জাতি পুড়ে মরবে তা নিশ্চিত। ইতোমধ্যেই এর অশুভ আলামত প্রতিদিন দেখছি জাতীয় দৈনিকের পাতায় পাতায়।

www.pathagar.com

গ্রুপ থিয়েটার

লাল বিপ্লবীরা এককালে মগজ ধোলাইয়ের মাধ্যমে যুবকদেরকে বিনষ্ট করেছে। বর্তমানে গ্রুপ থিয়েটারগুলো লাল বিপ্লবীদের স্টাইলে যুবকদেরকে বিভ্রান্ত এবং মগজ ধোলাই করার কাজটি ভালভাবেই সমাধা করছে। এই গ্রুপ থিয়েটারের এর সাথে জড়িত ছিলেন এমন একজন সদস্য আমাকে বলেছেন ঃ

কিছু নাট্য গ্রুপ আছে যারা প্রতিবছর অভিনয়ের প্রশিক্ষণের নামে যুবক-যুবতীদেরকে ভর্তি করে। এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে এইচএসসি। প্রত্যেক শিক্ষার্থী থেকে প্রশিক্ষণের নামে ১৫০০/- থেকে ৩০০০/- টাকা পর্যন্ত ফি নেয়া হয়। এ সব যুবক-যুবতীদের নিকট মুসলিম সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো হয় এবং ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির প্রশংসা করা হয় এবং সে অনুযায়ী তালিম দেয়া হয়। জাতিসত্ত্বা বিরোধী প্রপাগান্ডা করা হয়। অভিনয়ে ফ্রী হবার বাহানায় ছেলে-মেয়েদেরকে একটি রুমে ঢুকিয়ে লাইট অফ করে বিদেশী মিউজিকের তালে নৃত্য করানো হয়। ছেলে-মেয়েদের অবাধে মেলামেশার সুযোগ করে দিয়ে অন্যান্য যুবকদেরও নাট্য গ্রুপে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করা হয়। এভাবে অনেক মেধাবী ছেলেমেয়ে নায়ক-নায়িকা হবার আশায় নাট্য গ্রুপ থিয়েটার কর্মকর্তার পিছনে ৩/৪ বছর সময় ব্যয় করে নিজেদের মূল্যবান জীবনটাকে নষ্ট করে। পরবর্তী এর কুপ্রভাব নিজেদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনেও প্রতিফলিত হয়।

গ্রুপ থিয়েটারগুলো তথাকথিত ফতোয়াবাজ এবং মৌলবাদকে উপলক্ষ করে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন অপকর্মের নামে নাটকের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে

তথাকথিত কমার্শিয়াল বাংলা মঞ্চ নাটকের একটি দৃশ্য

www.pathagar.com

ডিস এন্টিনা

বাংলাদেশের প্রতিটি শহরে এখন ডিস এন্টিনার বদৌলতে বিদেশী ছবি দেখার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রতিটি শহরে ভিডিও দোকানগুলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ডিস এন্টিনার ব্যবহার শুরু করেছে। সংযোগ ফি এক হাজার টাকা এবং প্রতিমাসে দু'শ' টাকার বিনিময়ে এখন যে কোনো টিভি মালিকই এই সুযোগ নিতে পারেন। এসব ডিস এন্টিনা থেকে ৪/৫টি করে চ্যানেল দেখা যায়। জিটিভি, এমটিভি, স্টারপ্লাস, প্রাইম স্টার, চ্যানেল-ভি ছাড়াও আরো কয়েকটি চ্যানেল দর্শক-শ্রোতারা দেখতে পাচ্ছেন। অনেকে ইতিমধ্যে ব্যক্তিগতভাবে বাসা বাড়িতে ডিস লাগিয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা কমপক্ষে একশতটি চ্যানেল দেখতে পাচ্ছেন। ইতিপূর্বে ডিস এন্টিনার কোন সরকারী রাজস্ব ছিল না। গত কয়েক বছর থেকে এই প্রথা চালু হয়েছে। সরকার এতে লাভবান হচ্ছেন বটে কিন্তু এর বহুল ব্যবহার আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব ফেলছে। অনেকগুলো বিদেশী চ্যানেলে এমন সব অসামাজিক ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে যা সমাজ ও পারিবারিক জীবনের জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়। আমাদের পারিবারিক পরিমন্ডলে এসব ছবি দেখা দুষ্কর বলে অনেক অভিভাবক জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততিদের নিয়ন্ত্রণ করা অনেকের পক্ষে ভবিষ্যতে কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়েও অনেকেই চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন।

স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে আজ জিটিভি, এটিএন, স্টার প্লাস ইত্যাদি। আজ হলিউডি আর বলিউডি অনুষ্ঠানমালার গানে আনজানে, টপটেন, বাসনা সংতেরে নাম সে, ফরমায়েশ, চিত্রতরঙ্গিনী, তেরে সুর মেরে গীত, বেওয়ার ইত্যাদি প্রোগ্রামগুলোর উপর যুবক-যুবতীরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। শুধু ইন্ডিয়া নয়, বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে, আনাচে-কানাচে, আবাল-বৃদ্ধবণিতার মুখে আজ 'তু চিজ বড়ি হ্যায় মাস্তে মাস্তে', 'চোলি কা পিছে কেয়া হ্যায়', তুতুতু তুতু তারা,', 'ওলে ওলে ওলে', 'সেক্সি সেক্সি সেক্সি', 'পরদেশী পরদশৌ' প্রভৃতি গানের জয়জয়কার। সেক্স সিম্বল বলিউডি নায়ক-নায়িকাদের ইঙ্গিতপূর্ণ অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি আমাদের যুব সমাজকে নেশায় বুঁদ করে রেখেছে। ভারতীয় হিন্দী ছবির নীল দংশন আজ আমাদের তরুণ-তরুণীদের নীলকণ্ঠ করেছে। প্রতিটি হিন্দী ছবির কানফাটা ঢিসুম ঢিসুম, উগ্র যৌনতা, আর বীভৎস রক্তপাত আমাদের যুবক যুবতীদেরকে এমন রাহুগ্রস্ত করেছে যে, রাহাজানি, রক্তপাত আর মানুষ খুন আজ আমাদের একটি শ্রেণীর কাছে খোলামকুচি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাই একের পর এক কঠিন থেকে কঠিনতর আইন করার পরও বেপরোয়াভাবে নারী নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, নৈরাজ্য বেড়েই চলছে।

ডিস এন্টিনার কুপ্রভাবে আমাদের দেশের নীতি নির্ধারকেরা আতঙ্কিত না হলেও ভারতের সচেতন বুদ্ধিজীবীরা আতঙ্কিত। সেখানে আজ নারীরা পাইকারী হারে ধর্ষিতা হচ্ছে। এমনকি পিতা কর্তৃক আপন কন্যাও ধর্ষিতা হয়েছে। গত ১৬ জুন '৯৫ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'নিজের মেয়েকে ধর্ষণ' শিরোনামে একটি সংবাদ ছাপা হয়। এ ছাড়া সেখানকার নারী ধর্ষণের একটি বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় ৯ ডিসেম্বর '৯৪ তারিখের 'সানন্দা'য় প্রকাশিত শঙ্ক দেবীর কবিতায়। 'নিহত কিশোরীর প্রার্থনা' শিরোনামে কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

www.pathagar.com

ধর্ষিতা নিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি
কুটুসের ঝোপে সাঁই বাবলার বনে
সবটাই খোলা, ঢাকা নেই, কাছাকাছি
এগোয়নি কেউ, কুয়াশায় সমীরণে
পড়ে আছি মৃত মাঠের রাঙানো ঘাসে...।
দু'বুকের মাঝে খুবলানো নুনছাল
ঠ্যাং তুলে করে পেচ্ছাব সেই লাশে
কামুক কুকুর, রোদসী অন্তরাল
তোলো; মাছি বসে চোখে-নাকে-মুখে চুলে
নাভি ও যোনিতে কালশিটে পড়া স্তনে
ধূর্ত শেয়াল খেলো কি গোলাপ ভুলে
দাঁতের পেরেক বসেছে বুকের বনে
পাললিক গালে উরুতে ও জঙ্ঘায়
হে জীবন নড়ে ওঠো, দাও কাকুকুতু
কান্নায় আর নিঃশ্বাসে ঝরে যায়
কতো জল কতো রক্ত লাল ও থুথু
চেটে খায় কালো পিঁপড়েরা মধুখানি।

ডিস এন্টিনার দূরদর্শন (ডিডি) চ্যানেলসমূহ সমাজে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়াও এ চ্যানেলটির বিরুদ্ধে কোনো কোনো দেশে অপতৎপরতার অভিযোগ রয়েছে।

ডিস এন্টিনার প্রধান প্রধান চ্যানেলসমূহ ভারতীয়। কিন্তু দূরদর্শনের চ্যানেল বিশেষ করে ভিডিও ক্লাব চ্যানেলটি গভীর রাতে প্রাপ্ত বয়স্কদের উপযোগী ইংরেজী চলচ্চিত্র পরিবেশন করে যা পরিবারভিত্তিক সমাজে দেখা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু পারিবারিকভাবে দেখা না গেলেও উঠতি ও যুব বয়সীরা এসব অপসংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে নানা কারণে। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, ফেনসিডিলের নেশা, অপসংস্কৃতি সেই সঙ্গে যুবসমাজকে ক্রমান্বয়ে জাতিবিধ্বংসী অপতৎপরতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। অন্যদিকে ডিস এন্টিনা ব্যবসার স্বার্থ সংরক্ষণের নামে মহল্লায় মহল্লায় গড়ে উঠছে মাস্তানদের আড্ডা, যাদের অর্থ ডিস ব্যবসায়ী তথা গ্রাহকগণ সরবরাহ করেন।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা না থাকার কারণে এক সময় পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে ভিডিও ব্যবসা। পরবর্তীতে কিছু নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করা হলেও তাতে খুব লাভ হয়নি। কারণ, ক্যাসেট ব্যবসার সাথে জড়িত গোষ্ঠী অর্থ ও ক্ষমতার বলে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে চলেছে। বর্তমানেও তাই হচ্ছে। এ ডিস এন্টিনা ব্যবসার সাথে প্রকাশ্যতঃ উঠতি বেকার যুবকরা জড়িত থাকলেও নেপথ্যে রয়েছেন সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। মূলত তারা নিয়মিত বখরা পান অথবা তাদের নিয়ন্ত্রণে ব্যবসা চলে।

www.pathagar.com

ডিস এন্টিনার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে জাতীয় সংস্কৃতি বিরোধী অপপ্রচারের অভিযোগ থাকার কারণে ভুটান সে দেশে ডিস এন্টিনা দেখা নিষিদ্ধ করেছে। ইরানও একই অভিযোগে ডিস এন্টিনার ব্যবসা অবৈধ করেছে। পাকিস্তানের দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ করাচীতে দূরদর্শন দেখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ, দূরদর্শনের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে সন্ত্রাসীদের কাছে নির্দেশ পাঠানো হতো বলে অভিযোগ রয়েছে।

ডিস এন্টিনার কুপ্রভাব থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্যে অনেক দেশেই 'ডিকোডার' পদ্ধতি ব্যবহার হচ্ছে। শোনা গিয়েছিলো বাংলাদেশও একবার চিন্তা-ভাবনা করেছিলো। কিন্তু আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বরং বাংলাদেশ টিভি কর্তৃপক্ষ ডিস এন্টিনার অপসংস্কৃতির সাথে পাল্লা দিয়ে বিটিভিকে অনুরূপ ছকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। যা জাতীয় সংস্কৃতির জন্য আরো মারাত্মক হবে।

ডিস এন্টিনার সাহায্যে টিভিতে আমরা যেসব বিদেশী ছবি দেখি তার মধ্যে অশ্লীল, সহিংস ও রুচিহীন ছবি যেমন আছে ঠিক তেমনি অনেক শিক্ষণীয় ছবিও প্রদর্শিত হয়। আমাদের দেশের ছেলেরা উচ্চ শিক্ষার জন্য আমেরিকা বা লন্ডনে যায়। আমেরিকানদের যেমন খারাপ অভ্যাস রয়েছে ঠিক তেমনি এদের অনেক ভালো দিকও রয়েছে। অথচ আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলেরা এদের ভালো অভ্যাসগুলো অনুসরণ করে না।। খারাপ অভ্যাসগুলো শিখে এসে আমাদের সমাজে এস্তেমাল করতে দেখা যায়। তাই কি করে আশা করা যায় আমাদের ছেলেরা ডিস এন্টিনায় প্রভাবিত ছবির খারাপ দিকগুলো বর্জন করবে এবং ভালো দিকগুলো গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ যেখানে শতকরা ৯০% ভাগ লোক মুসলমান এবং অধিকাংশ লোক ধর্মভীরু। তারা কখনো অনৈসলামিক কর্মকান্ড বা অনৈতিকতাকে মেনে নিতে পারে না। সর্বদাই তারা ধার্মিক থেকেই অজান্তের খুচরো ভুলগুলো সংশোধনের মাধ্যমে জীবনকে পরিচালিত করতে চায়। মুষ্টিমেয় লোক পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে বিশ্বাসী। তাদের হাতেই অনৈতিকতার জন্ম হয়ে থাকে। এরই অংশ হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশের ডিস এন্টিনাসমূহ। আমরা বিশ্বাস করি এই আধুনিক প্রযুক্তিটি বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত আল্লাহর একটি নিয়ামত। কিন্তু তাতে বর্হিবিশ্বের এমন কতিপয় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় যার ভিত্তিতে দেশ ও জাতির চরিত্র বিনষ্টের পথে চলেছে। তবে ডিস থেকে প্রচারিত বিভিন্ন ডকুমেন্টারি ফিল্মগুলো সত্যিই শিক্ষার একটি অংশ বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু আমাদের তরুণ সমাজ তো এগুলো ভুলেও দেখে না। ভার্সিটির হলে গিয়ে আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই বাংলাদেশের মতো একটি বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্রের উচিত সরকারীভাবে পদক্ষেপ নিয়ে উক্ত ডিস এন্টিনার ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করার।

ডিস এন্টিনার সাথে পাল্টা দিয়ে বর্তমানে জাতীয় প্রচার মাধ্যম বিটিভি বিদেশী অশ্লীল ও মারদাঙ্গা ইংরেজী ও হিন্দি ছবি ডাবিং করে প্রচার করছে যা আমাদের সমাজ ও ধর্মের পরিপন্থী। এইসব অশ্লীল ছবি নিয়ে দর্শক-শ্রোতাদের বহু অভিযোগ পত্র-পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অবস্থা ও অবস্থান হচ্ছে 'মারো আর ধরো আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো, বকো আর ঝকো কানে দিয়েছি তুলো'। এদের কান্ড-কীর্তি দেখে মনে হচ্ছে এদেশে অশ্লীলতা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে তাদের চেষ্টার কোনো বিরাম

www.pathagar.com

নেই। কাঠের গুড়ি ঠেলা মজুরদের ন্যায় তারা একটানা যেন বলেই চলেছে– 'জোরছে মারো হেইও। আরো জোরে মারো হেইও'।

পরিশেষে ডিস এন্টিনা সম্পর্কে লেখক, সাংবাদিক জনাব আয়ার দানিশ-এর একটি চমৎকার বক্তব্য দিয়ে এ বিষয়ে ইতি টানছি।

আগ্রাসন শব্দটার অর্থ পররাজ্য আক্রমণ বা গ্রাস করা। কিন্তু সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হলো আর এক ধরনের সূক্ষ্ম পন্থা, যার দ্বারা অন্য দেশের মানুষের দেহ, মন, আত্মার উৎকর্ষ সাধন প্রক্রিয়াকে আক্রমণ করে দেশটিকে গ্রাস করে ফেলা যায়। স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলগুলো সে রকম আগ্রাসন চালিয়ে আমাদের দেশের যুগ যুগ ধরে নির্মিত সভ্যতার স্বপ্নের শহরকে ধূলিস্যাৎ করে দিচ্ছে। একটা ছুরি নিজে কাউকে খুন করতে পারে না। সে ব্যবহৃত হয় ঘাতকের ইচ্ছানুযায়ী। তেমনি টেলিভিশন নামক ছুরিটি, গ্লোবাল ভিলেজের নামে ঘাতকের হাতে তুলে দেয়ায় সেটি দেশের কোটি কোটি মানুষের মনুষ্যত্বকে হত্যা করে চলেছে। মানুষ জন্মায় বর্বর হয়ে, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চাই তাকে সুসভ্য করে। কিন্তু আজকের স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো আমাদের নব প্রজন্ম তরুণ-তরুণীদের যে সংস্কৃতি উপহার দিচ্ছে তা হলো 'কিল অ্যাট দ্য ফার্স্ট ইন্সট্যান্স' (দেখা মাত্রই খতম কর) এবং মেয়েদের 'রেডি টু স্ট্রীপ অ্যাট দ্য ফার্স্ট জেস্চার' (প্রথম দর্শনেই উলঙ্গ হও)।

অশ্লীল চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম যা গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে বিরাট গুরুত্ব বহন করে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিনোদনের পাশাপাশি প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব কৃষ্টি সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করা যতটা সহজ গণযোগাযোগের আর.কোনো মাধ্যমেই তা সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রের প্রভাব মানব জীবনে খুবই স্পষ্ট। চলচ্চিত্র একদিকে মানব চরিত্রের উন্নতি সাধন করতে পারে অপরদিকে পারে অবনতি ঘটাতে। চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম যা সর্বসাধারণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে চলতে পারে। এর ব্যাপ্তি ব্যাপক। নাটক একটি উৎকৃষ্ট গণমাধ্যম হলেও কিছুটা সীমাবদ্ধ। ঠিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একি কথা বলা যায়। চলচ্চিত্র হচ্ছে নাটক, সাহিত্য সর্বোপরি মানব সংস্কৃতির একটা সমন্বয় প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি প্রেক্ষাগৃহের বিজ্ঞাপনে কিছুসংখ্যক উদ্ভট ষন্ডামার্কা ছবি লক্ষ্য করা যায়। এসব ছবির অধিকাংশ দর্শক হচ্ছে কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরা। এই ছবিগুলোর প্রভাবস্বরূপ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে।

কিছুসংখ্যক অর্থলোভী বিবেকহীন পরিবেশক বিদেশী অশ্লীল চলচ্চিত্র এবং এরা নৃত্যকলার নামে দেহের টসটসে যৌবন তরঙ্গ মঞ্চে ময়দানে প্রদর্শন করে বেড়ায়। অভিনয়ের নামে চুম্বন, আলিঙ্গন, মন্থনের কৌশল প্রদর্শন দ্বারা দর্শকদের অন্তরে কামনার তরঙ্গ সৃষ্টি করে। দেশের প্রতিটি শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলোতে এসব অশ্লীল ছবি প্রদর্শিত হয়। বিশেষ করে মফস্বল শহরের বিডিআর অডিটোরিয়ামগুলো এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। যেখানে ইংরেজী তথা বিদেশী ছবি চলছে সেখানেই দর্শকদের ভিড়

www.pathagar.com

উপচে পড়ছে। আমাদের দেশের বাংলা ছবিতে যত না ভিড় হয় তার চেয়ে অনেক বেশি ভিড় হয় এসব সেক্সমার্কা বিদেশী ছবিগুলোতে। কারণ এসব ছবিতে আছে অশ্লীল নাচ গান, দৈহিক মিলন তথা নগ্ন দৃশ্যের ছড়াছড়ি। বিকৃতভাবে যৌনতাকে উপস্থাপন করা হয় নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। আবার কোনো প্রেক্ষাগৃহে ইংরেজী ছবিতে ব্লু ফিল্ম স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে ফাঁকি দিয়ে এসব ছবি দেখে। অনেকেই এসব ছবির ভাষা বুঝে না। তারা নগ্ন দেহ ও যৌন মিলনের দৃশ্য দেশে আনন্দ উপভোগ করে।

এরপর ভিডিও ক্লাবের বদৌলতে প্রতিটি পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রাম-গঞ্জে সেন্সরবিহীন ইংরেজী-হিন্দি ছবি এবং ব্লু ফিল্মের কুপ্রভাবে বর্তমান তরুণ সমাজ ধ্বংসের পথে। এসব ছবি দেখার ফলে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্ষণ, অপহরণ, পরকীয়া প্রেম, অবৈধ গর্ভপাতের আধিক্য দেখা যাচ্ছে। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বহু লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু সরকার এ পর্যন্ত কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

এ সমস্ত অশ্লীল ছবি বর্তমান সমাজকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েক বছর আগে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ থেকে কিছুটা আঁচ করা যায়। মেট্রো সিনেমায় 'পিতা-পুত্রের ব্লু ফিল্ম দর্শন অতঃপর' শিরোনামে জনাব ইকবাল আহমদ লিখেন– পিতা ও পুত্র উভয়ের অজান্তে ব্লু ফিল্ম দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে বিব্রত পিতা নিজের অপরাধ চেপে পুত্রকে শাঁসাতে গিয়ে পুত্রের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে নারায়ণগঞ্জ নিউ মেট্রো সিনেমা হলে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে জানা গেছে, ফতুল্লা এলাকার কাঠ ব্যবসায়ী জনৈক কালাচাঁন বেপারী (৪৫) ও তার পুত্র স্কুল ছাত্র রাজু (২০) অল্প সময়ের ব্যবধানে ৩টার শোতে টিকিট কেটে সিনেমা হলে প্রবেশ করে পিতা-পুত্র ব্লু ফিল্ম দেখে সিনেমা হল হতে বের হয়ে যাওয়ার সময় উভয়ে মুখোমুখি হলে বিব্রত পিতা পুত্রকে খোঁজ করতে এসেছে বলে পুত্রের জামা ধরে শাঁসাতে থাকে। এ সময় সিনেমা ফেরত দর্শকদের অনেকেই পিতার কান্ডে প্রতিবাদ করলে পুত্রের নিকট আসল ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়লে, পুত্র পিতাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে চলে যায়।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ভিসিআর-এ দর্শনীর বিনিময়ে ব্লু ফিল্ম দেখার প্রবণতা নেই কিন্তু দেশের অনেক সিনেমা হলে নিয়মিত ইংরেজি ছবি প্রদর্শনের নামে প্রকাশ্যে ব্লু ফিল্ম প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহপূর্ণ প্রদর্শিত ব্লু ফিল্মের ৯০ ভাগ দর্শকই কিশোর যুবক শ্রেণী।

কিছু কিছু ছবি নির্মাতা বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং বিভিন্ন চেতনার কথা বলতে অজ্ঞান। কিন্তু তাদের নির্মিত ছবিগুলোতে বাঙালী জাতীয়তাবাদের কোনো চিহ্নই থাকে না। থাকে অপসংস্কৃতি ভরপুর কুৎসিত বিষয়বস্তু আর থাকে জাতিকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করার কাল্পনিক কাহিনী ও উস্কানিমূলক বক্তব্য। এরা চলচ্চিত্রের ব্যবসার নামে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধ ধ্বংসকারী আগুনের লেলিহান শিখা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কুরুচিপূর্ণ ইংরেজী ছায়াছবি ও ব্লু ফিল্মের কারণেই নির্মমভাবে জীবন দিতে হয়েছে মা-বাবার একমাত্র সন্তান ঈসাসহ অনেক যুবক-যুবতীর।

ভারতে ধর্মীয় ও সামাজিক বিধানে যৌনাচারের অবাধ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও প্লেগ, ম্যালেরিয়া এবং মারাত্মক ব্যাধি এইডস-এর কারণে তাদের বোধোদয় ঘটেছে। ভারতে

www.pathagar.com

ক্রমবর্ধমান এইডসের সংক্রমনের প্রেক্ষিতে ছবিতে মারদাঙ্গা রোধে ভারতীয় সেন্সর বোর্ড কয়েক বছর আগে নয়া নির্দেশ জারি হয়েছে। ছবিতে নিষিদ্ধ দৃশ্যের তালিকা হলো ঃ

- মেয়েদের শরীর নিয়ে এমন কোনো সংলাপ বলা যাবে না যার দু'টি অর্থ হয়।
- যৌন অঙ্গভঙ্গীর প্রতীক দৃশ্য নিষিদ্ধ।
- কোনো পুরুষ বা নারী একে অন্যের শরীরের উপর শুয়ে বা পরস্পরের বিপরীত দিকে ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে কোমর নাচাতে পারবে না।
- নাচ ও গানের সময় স্বচ্ছ ও স্বল্প পোশাক পড়িয়ে মেয়েদের শরীরের উপর

ঢাকাসহ দেশের প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহে এ ধরনের অশ্লীল ছবির দৃশ্যের ব্যানার শোভা পাচ্ছে

www.pathagar.com

চড়ে বসবে না। কোনো নারীর বুক থেকে উরু পর্যন্ত কোনো পুরুষ গা ঘষতে পারবে না। পক্ষান্তরে নারীরা তাদের বুক দিয়ে কোনো পুরুষের গায়ে ঠেলা দিতে পারবে না। পুরুষ ও নারী কেউ কারোর উরুর ওপর বসবে না; উরুতে বসে দুই পা দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরবে না। মেয়েদের স্কার্ট বা ঘাগরার নীচে উঁকি দেয়া চলবে না। স্কার্ট বা ঘাগরা তুলে শরীরের বিশেষ অংশ দেখানো বা তাকানো নিষেধ।

★ মেয়েদের নাভি ও কোমরে চিমটি কাটা চলবে না।

★ বুক, নাভি, নিতম্ব বা উরুর ওপরের অংশে বার বার চুম্বন করা যাবে না।

★ ইভ টিজিং বা মেয়েদের জ্বালাতনের কোনো দৃশ্য দেখানো যাবে না। এতে নারীর শরীরের প্রাইভেসী নষ্ট হয় যেমন মেয়েদের ব্লাউজের ভিতর খুচরা পয়সা ঢুকিয়ে দেয়া।

★ প্রকাশ্যে কোনো নারীকে বিবস্ত্র করা নিষিদ্ধ।

ধর্মে অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হলেও কর্মে ভীষণ কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে– বাস্তবের নিরিখে তা করতে বাধ্য করা হয়েছে। আদিকালে আদিরসের ব্যাপারে আদিম ব্যবসা চালু হলেও পরবর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেল জীবজন্তুর জন্য যা স্বাভাবিক, জীবশ্রেষ্ঠ মানবের জন্য তা অস্বাভাবিক। মানবের স্বভাব ধর্ম ইসলামে তাই বলা হয়েছে 'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ'। আল-কোরআনের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে 'অশ্লীলতার নিকটবর্তী হইও না" শালীনতা রক্ষা করা মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। "নর-নারী নির্বিশেষে সবাইকে গুপ্ত অঙ্গের সংরক্ষণ করতে হয়।" ছতর ঢাকতে হয়। কলিকাতা যাদুঘরে প্রবেশ পথে একটি প্রমাণ সাইজের যুবতীর উলঙ্গ প্রস্তর মূর্তি রয়েছে। নিখুঁত মূর্তি, নারী অঙ্গের প্রতিটি ভাঁজ এমনকি গুপ্ত লোমের স্থানটি পর্যন্ত এমন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে সত্যি অবাক হতে হয়। অজন্তার শিল্পকর্মের নিদর্শন। ভারতীয় সেন্সর বোর্ডের নয়া নির্দেশ অনুযায়ী অজন্তার এই অনুপম ভাস্বর্যটিও ছায়াছবিতে প্রদর্শন নিষিদ্ধ। বাস্তবের আঘাতে ভারত তার ঐতিহ্য বিরোধী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। (তথ্য সূত্র ঃ ওবায়দুল হক সরকার, বিক্রম, ২৮ নভেম্বর – ৪ ডিসেম্বর '৯৪ সংখ্যা)

ইসলামে মূর্তি নির্মাণের প্রশ্নই উঠে না; যুবতীর উলঙ্গ মূর্তি নির্মাণ কল্পনাই করা যায় না। যুবতীদের পর্দা-পুশিদায় রাখার বিধান দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের শতকরা ৯০ জন মুসলমান। এই মুসলমানের দেশে নির্মিত ছায়াছবিতে শালীনতা বজায় রাখা হবে এটা সবাই আশা করে।

সুতরাং সমাজ থেকে ধর্ষণ, অপহরণ, পরকীয়া প্রেমসহ নারী নির্যাতন বন্ধ বর্তমান বংশধরদের অবক্ষয় থেকে রক্ষা করতে হলে সরকারকে অবিলম্বে এসব অশ্লীল যৌনলীলা সম্বলিত ছবি প্রদর্শন বন্ধ করার পদক্ষেপ নিতে হবে। পেশা ও পয়সাওয়ালা চিত্রনির্মাতাদের খপ্পর হতে জাতিকে বাঁচাতে হবে। নতুবা টেলিভিশনে এইডস রোগের বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন প্রচার করে এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। এর থেকে রক্ষা পাবার একটিই মাত্র প্রতিরোধক টিকা আছে, তা হলো সুস্থ ও জীবনধর্মী ছবি নির্মাণ,

www.pathagar.com

অশ্লীল ও মারদাঙ্গা ছবি আমদানী নিষিদ্ধ করা এবং 'মহানবী (সঃ) প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রচলন করা।"

স্বাধীনতার নামে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার নীতিতে ইসলাম বিশ্বাসী নয় বলে ইসলামের পারিবারিক বিধানে স্বামী-স্ত্রীর স্বাধীন অধিকার স্বীকার করেও পারিবারিক জীবনের পবিত্র বন্ধনের গুরুত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, যা আমাদের দেশের কু-বুদ্ধিজীবীরা স্বীকার না করলেও পশ্চিমা বিশ্বের অনেক তাত্ত্বিক, মুক্তি ও শান্তিকামী মহিলাদেরও

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে বর্তমান হাল

www.pathagar.com

অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করছে।

ইসলামের নৈতিকতার সীমারেখার গুরুত্ব এরা না বোঝার ভান করলেও পাশ্চাত্য দুনিয়া আজ ইসলামের মহিমা বরণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। গত রমজান উপলক্ষে ২২ নভেম্বর ২০০০ প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন মুসলিম জাহানের উদ্দেশ্যে একটি বাণী দিয়েছিলেন। ইউসিস পরিবেশিত বাণীটির কয়েকটি বক্তব্যের মধ্যে আমাদের অতি-আধুনিকতাবাদীদের জন্য পথের দিশা থাকতে পারে। তিনি বলেন, "আমেরিকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা ৬০ লাখ। আমেরিকান সমাজে তাদের সংখ্যা শক্তি ও প্রতিপত্তি বেড়ে চলার সাথে সাথে অন্য ধর্মাবলম্বীরা ইসলামের উৎপত্তি ও মর্মার্থ সম্পর্কে আরো বেশি করে জানছে। ... আমি আমেরিকায় ইসলামকে স্বাগত জানাই। আত্মশৃঙ্খলা, সহমর্মিতা ও পরিবারের প্রতি অঙ্গীকার সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করছে। ... রমজানের রোজা উপলক্ষে আমি সব ধর্মের অনুসারীদের প্রতি কোরআনের অমূল্য শিক্ষা উপলব্ধি করার আবেদন জানাচ্ছি।" ইউসিস, দৈনিক ইনকিলাব, ২৭/১১/২০০০

মার্কিন প্রেসিডেন্টের এ বাণীর বক্তব্যগুলোতে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারীদের জন্য শিক্ষণীয় উপাদান রয়েছে।

বেশ কয়েক বছর আগে একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে কথাচ্ছলে একটি কাহিনী বলেছিলেন। তা হলো- 'বিল কসবি শো' নামে একটি ইংরেজী ছবি যে দিন টিভিতে প্রদর্শিত হয় সেদিন রাজপথের লোকসংখ্যা দারুণভাবে কমে যায়। এই জীবনঘনিষ্ট সৃজনশীল ছবিটিতে হালকা হাস্যরসের মাধ্যমে অতীতকালের একান্নবর্তী পরিবারের মধুর সম্পর্কের বাস্তবচিত্র যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা দেখে বর্তমান বংশধরেরা বিস্মিত হন। যান্ত্রিক সভ্যতার উৎকর্ষতা আর অতি আধুনিক হওয়ার নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতায় মানুষকে কতটা অস্থির, অসহিষ্ণু, স্বার্থপর ও হিংস্র করে তুলেছে পাশ্চাত্য সমাজ আজ এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করছে। তাই এ 'বিল কসবি শো' ছবিটির বাস্তব পারিবারিক কাহিনী যেন তাদের কাছে রূপকথার কল্পকাহিনী। বর্তমান বংশধর এটা ভাবাই স্বাভাবিক কারণ তাদের পারিবারিক পরিমন্ডল থেকে স্নেহ, মায়া-মমতা ও মানবিক প্রাচীন মূল্যবোধ বিদায় নিয়েছে। উন্নতির নামে মানবিক দৈন্যতায় তিলে তিলে যন্ত্রণাগ্রস্থ আমেরিকানরা বিল কসবি শো'র মতো জীবনের স্বাভাবিক ধর্মমুখী ছবিগুলোর প্রতি এতো আগ্রহী হয়ে পড়েছে।

সহিংস ও অশ্লীল ইংরেজী ছবির সুতিকাগার যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে বর্তমানে জনগণের বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে দেরীতে হলেও তাদের বোধদয় ঘটেছে। এর বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিচ্ছে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো।

চলচ্চিত্রে সেক্স, ভায়োলেন্স এবং ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ৭৬ বছর বয়স্ক পোপ জন পল হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন- 'সিনেমা সত্যের বিকৃতির মাধ্যমে স্বাধীনতার অপব্যবহার করে থাকে। তিনি আরো বলেন, চলচ্চিত্র সহিংসতা ও যৌনতা ব্যবহারের মাধ্যমে নেতিবাচক দর্পণ হিসেবে মানবিক মর্যাদাকে আঘাত হানে।'

www.pathagar.com

তাই আজ অশ্লীল চলচ্চিত্রের ক্ষতিকর কুপ্রভাব পাশ্চাত্য সমাজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। মরণব্যাধী এইডস-এর ব্যাপকতায় তাদের আজ টনক নড়েছে। অথচ আমাদের দেশে এসব অশ্লীল ও মারদাঙ্গা ছবি প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নির্মিত এবং বিভিন্ন মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে।

কাজেই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন জাতিকে সুশিক্ষার পাঠ দেয়া যায়; ঠিক তেমনি অপব্যবহারের মাধ্যমে কুশিক্ষার পাঠও দেয়া যায়। চলচ্চিত্র যেমন একজন আদর্শ শিক্ষক হতে পারে; ঠিক তেমনি জাতির নৈতিকতাকে গলা টিপে হত্যা করার জল্লাদও হতে পারে। বর্তমান চলচ্চিত্র জাতিকে কুশিক্ষার পাঠই দিচ্ছে। তাই চলচ্চিত্র আজ আদর্শ শিক্ষক না হয়ে তা হয়েছে জাতিকে সর্বক্ষেত্রে চুবিয়ে মারার জল্লাদ। এককালে সিনেমাভক্ত অনেক তরুণ ছবি দেখে ছবির স্টাইলে প্রিয়সীর কাছে ফুল অথবা প্রেমপত্র গুঁজে দিতো। বর্তমানে মারদাঙ্গা ছবির কাহিনীর সাথে সাথে প্রেম নিবেদনের ধরণও পাল্টিয়েছে। এখন কোনো তরুণের কোনো তরুণীকে পছন্দ হলে অনেক ক্ষেত্রেই ফুল অথবা প্রেমপত্র দিয়ে প্রেম নিবেদন করে না। রাস্তা-ঘাটে ফিল্মী স্টাইলে উত্যক্ত করে, অশ্লীল বাক্য ছুড়ে দেয়। অশোভনীয় ইশারা-ইঙ্গিত এবং দৃষ্টিকটূ অঙ্গভঙ্গি করে। আবার কোনো মেয়েকে পছন্দ হলেও অভিভাবকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। সম্মত না হলে হুমকি দেয়। ফিল্মী স্টাইলে অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ অথবা ধর্ষণের মতো জঘণ্য অপকর্ম ঘটায়। কারণ বর্তমানে নির্মিত ছবিগুলোতে নিটোল প্রেমের পরিবর্তে রয়েছে দৈহিক প্রেমের আবেদন ও হাতছানি। কাজেই এ ছবিগুলো সমাজের তরুণ শ্রেণীর কাছে সাময়িকভাবে আফিমের নেশার ন্যায় গ্রহণীয় হলেও এর কুফল সর্বগ্রাসী। সমাজে এ সকল অনৈতিকতা কার্যকলাপের একাধিক কারণ কাজ করে। এর মধ্যে অধিকাংশভাবে দায়ী অবিবেচক রাজনৈতিক দল বা নেতা এবং মারদাঙ্গা অশ্লীল চলচ্চিত্র। বিজ্ঞানের অগ্রগতির মাধ্যমে রেডিও, টিভি, স্যাটেলাইটসহ প্রেক্ষাগৃহে যে সকল নাটক, সিনেমা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করছে তার অধিকাংশই গঠনমূলক এবং আমাদের সমাজে উপযোগী বা গ্রহণযোগ্য নয়। চরিত্র গঠনে আদর্শহীনতার পরিচায়ক। ইদানিংকালে নির্মিত প্রায় সব সিনেমার কাহিনীতে উদ্ভট, অবাস্তব ও এক কল্পনা জগতের স্বার্থক রূপায়ন। তথাকথিত প্রেমনির্ভর, গানের দৃশ্যে অশ্লীল নাচ, বস্ত্রহীনতা, বেহায়া মানব, নর-নারীর অশ্রাব্য সংলাপ এগুলোই এখন সিনেমার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে কম বয়সের তরুণ-তরুণীকে নায়ক-নায়িকা করে যতটা অশ্লীলতা ও যৌনতাপূর্ণ ছবি তৈরি করা যায় এরই যেন প্রতিযোগিতা চলছে। এসব ছবিতে কাহিনী গতানুগতিক। কোনো নতুনত্বের ছোঁয়া নেই। ধনী লোকের মেয়ে দরিদ্র কারো পুত্রের প্রেমে পড়ে অথবা এর বিপরীতে হয়। অভিভাবকেরা হয়তো এই অসম প্রেম মেনে নিচ্ছেন না তার প্রেক্ষিতে শুরু হয়ে যায় নায়ক-নায়িকার বীরত্বপূর্ণ! বক্তব্য, ঔদ্ধতপূর্ণ আচরণ, আদব-কায়দার বালাই নেই। এর প্রয়োজনে প্রেমের জন্য হত্যা, মারামারি, অপহরণ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ এর চিত্র ছবিতে জুড়ে দেয়া হয়। এছাড়া এ সকল ছবির অধিকাংশই যৌন সুঁড়সুঁড়ি দিয়ে তৈরি, অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ নাচ ও অশ্রাব্য গানের কথায় পরিপূর্ণ। এমন একটা অবস্থা যেন তেন করে দর্শকদের ধোকা দিতে পারলেই হলো। সিনেমা নির্মাণকারীদের যেন সমাজ ও

www.pathagar.com

জাতির প্রতি কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।

বর্তমানে সিনেমা বা ছায়াছবিতে মেয়েরা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে। এখানে প্রযোজকেরা তাদের খুশীমতো দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে নারীদের ব্যবহার করে। প্রয়োজনবোধে পোশাকের ন্যূনতম সীমাও লংঘন করতে বাধ্য করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যে ছবি যতো অশ্লীল, যতো অশালীন নগ্ন হয় সে ছবিই বেশিরভাগ দর্শকের কাছে ততো প্রিয় হয়। এসব ক্ষেত্রেও নারীরা শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের সামগ্রী, এর বাইরে এদের মূল্য অতি নগন্য। রূপ আর যৌবনই এদের একমাত্র পুঁজি। এই পুঁজি শেষ হয়ে গেলে তারা মূল্যহীন। তাছাড়া স্বামী বদল, স্ত্রী বদল, সিনেমা পাড়ায় তো ডাল ভাতের মতো। এর ফলে দাম্পত্য জীবনে নারীরাই হয় চরমভাবে নির্যাতিতা। সিনেমার অনেক স্বনামধন্য পরিচালক একথা প্রকাশ করাকে অসম্মানজনক বলে মনে করেন।

মানুষের অনুকরণ স্পৃহা থাকার কারণে ব্যক্তি ও সমাজ কতগুলো বিষয়ক মডেল হিসেবে নিয়ে থাকে এবং তাদের কিছু আচরণ নিজেরা অনুকরণ করে। টেলিভিশনের নাটক, সিনেমার কাহিনী আগ্রাসী ও সন্ত্রাসী মডেল হওয়ার কারণেই আজকে এতো রাহাজানি, হত্যা, ছিনতাই, ধর্ষণ, সন্ত্রাসী ঘটনা প্রতিদিন ঘটে যাচ্ছে। আমরা প্রায়ই শুনতে পাই সিনেমা স্টাইলে ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার সংবাদ। এসব অপরাধ দেশের তরুণ সমাজ থেকে আজকে শিশু-কিশোর পর্যন্ত প্রভাবিত হচ্ছে এবং জড়িয়ে পড়ছে।

আশির দশকের শেষ দিকে এ দেশে আসে ভিসিআর। ভিসিআর-এ বিদেশী অশ্লীল ছবি দেখার জন্য দর্শক ঝুঁকে পড়ে। আমাদের দেশের ছবি নির্মাতারাও দর্শক ধরে রাখার জন্য বিদেশী ছবির অনুকরণে সেক্স, ভায়োলেন্স সমৃদ্ধ মারদাঙ্গা ছবি নির্মাণ করতে থাকে। বর্তমানে প্রায় প্রেক্ষাগৃহে এসব অশ্লীল ছবি প্রদর্শিত হয়। এসব ছবির মান এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যা সপরিবারে দেখা তো দূরে থাক একা দেখতেও অনেকের রুচিতে বাধে। হালে ইংরেজী ও বোম্বের ছবির মিশ্রণে এদেশের ছবি নির্মাতারা যে সমস্ত টনিক উৎপাদন করছেন তা হজমের উপযোগী নয়। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে মন্দার অজুহাতে তারা এই দুষ্কর্মটি করছেন। বর্তমানে চলচ্চিত্রগুলোতে সামাজিক কোনো অবদান কিংবা শিক্ষণীয় বিষয় বলেও বিশেষ কিছু নেই। সবই অত্যন্ত অশ্লীল ও নিম্নমানের। অনেক রুচিশীল দর্শকদের পরিবার পরিজন নিয়ে হলে গিয়ে সিনেমা দেখা দূরে থাক হলের সামনে যে ব্যানার টানানো হয় তা দেখে পরিবার পরিজনসহ যাতায়াত করতে বিব্রতবোধ করেন।

এ প্রসঙ্গে বহু দিন আগে ঔপন্যাসিক 'বনফুল'-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে আজকের লেখার ইতি টানছি। চলচ্চিত্র বা সিনেমা সম্পর্কে বনফুল বলেছেন- "পূর্বে খাইবার পাস দিয়ে বহিঃশত্রুরা এসে এ দেশ জয় করেছিলো। এখন তারা আসছে যন্ত্রের ভেতর দিয়ে। মানুষ পশুকে জয় করতে পারে, মানুষকে পারে না। এইসব যন্ত্র তাই অধিকাংশ মানুষকে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দিতে চায়। পূর্বে পাশ্চাত্য বনিকেরা চীনাদের অকর্মন্য করবার জন্য জোর করে তাদের আফিমের নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল, আমাদের দেশের চাষীকে দরিদ্র করে ধানের ক্ষেতে নীলের চাষ করতে বাধ্য করেছিল। কারণ

www.pathagar.com

নেশাগ্রস্থ বা দরিদ্র জাতিকে শোষণ করা সহজ। শোষণ এবং শাসন করবার জন্য এখন তারা নতুন পন্থা অবলম্বন করেছে যন্ত্রের পন্থা। আর্ট পরিবেশনের ছলে সিনেমা মারফত তারা যা পরিবেশন করছে তা সেই আর্ট নয়, যা আমাদের সত্য সুন্দরের সন্ধান দেয়। তা সেই আর্ট, যা আমাদের কামনাকে মোহনী বেশে সাজিয়ে আমাদের সর্বনাশ করে।"

অশ্লীল সাহিত্য

ভারত, বৃটেন ও আমেরিকার ধারায় আমাদের দেশেও ফ্রী মিক্সিং-এর নামে অবাধ যৌনাচার সংস্কৃতি চালু হয়ে গেছে। এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে বিদেশী কতিপয় এনজিও ও এদেশের কতিপয় বুদ্ধিজীবী নামের দালালেরা। এরা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে ধর্মীয় অনুশাসনে সযত্নে লালিত মানবীয় মূল্যবোধকে ধ্বংস করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশের কতিপয় কুশিক্ষিত, লেখক ও বুদ্ধিজীবী বলে খ্যাত বিদেশী সংস্কৃতির দালাল এদের চিন্তা-চেতনায়, বিভিন্ন কর্মে, চলচ্চিত্রে, নাটকে, সাহিত্যের গল্প-কবিতায় এবং বিভিন্ন কৌশলে অবাধ যৌনাচারের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিচ্ছে। এর ভয়াবহ আলামত ইতোমধ্যেই আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে।

সাহিত্য সমাজেরই বাস্তব চিত্র অংকিত হয়ে থাকে। সাহিত্য বাস্তব সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যে সমাজের চালচিত্র, রীতি-নীতি, বিধি-বিধানের বাস্তব চিত্রই ফুটে উঠে। ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে যা বলা যায় না; সাহিত্যেও তা শোভা পায় না। যদি করা হয় তাকে সামাজিকভাবে অশ্লীল বলে আখ্যায়িত করে। সাহিত্যের এসব অশ্লীলতা একটি সুস্থ সমাজকে অসুস্থ করে। পাপ পঙ্কিলতার দিকে একটি জাতিকে ঠেলে দেয়। সাহিত্য মানুষকে আদর্শের বাণী শেখায়; অশ্লীলতা শিক্ষা দেয় না। সাহিত্য সমাজ গঠনের শিক্ষা দেয়; অসুস্থ সমাজ গঠনের শিক্ষা দেয় না। সাহিত্য সামাজিক সুশৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়; উচ্ছৃঙ্খলতা শিক্ষা দেয় না। নারী সাহিত্যে থাকবে জায়া, ভগ্নী ও জননী হিসেবে। এটাই শ্লীল সাহিত্যের দাবী। কিন্তু আমাদের দেশে কতিপয় তথাকথিত প্রগতিবাদী লেখক তাদের নারী সাহিত্যে অশ্লীলতার উপাদান জুড়ে দিচ্ছে।

এসব 'আধুনিক' কবিতার নামে সৃষ্ট বিকৃত পর্ণোগ্রাফি আমাদের তরুণ প্রতিভাদের কিভাবে বিপথগামী করছে, তা একজন তরুণ কবির নিম্নোক্ত ক'টা লাইন অনুধাবন করা যেতে পারে।

নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হলে অভিজ্ঞতা চাই
আধুনিক জীবন যাপনে এরকম
অভিজ্ঞতার অনেক প্রয়োজন
শোনো, তুমি সময় পেলেই
নিকটবর্তী কোন একদিন একটি নীল ছবি দেখে নেবে–
সুযোগ পেলেই সমকামী হয়ে
নিজেকে জ্বালিয়ে নেবে.... /

কবি যুবতী কাজের মেয়ের শারিরীক গঠন বর্ণনা করেছেন এভাবে-

'সে যে ডাগর পেঁপে গাছ

www.pathagar.com

হয়ে আছে এক জোড় পাকা,
গোল-গাল, বেশ বড়ো-সড়ো
কাঞ্চন বয়নী গাড় লালিমায়।'

মেয়েদের নগ্ন শরীর নিয়ে এই খ্যাতনামা কামুক কবি তাঁর কবিতায় লিখেছেন-

'নিভৃত শরীর দেখলাম নগ্নতায়
উদ্ভাসিক এবং তোমার উষ্ণ, স্মিত যৌনীরূপ
সতেজ ঘাসের স্পর্শ মাটির আঘ্রাণ পেতে চায়
স্তন চূড়া, নাভিমূল, শিহরিত আরণ্যক সুরে।'

বারবনিতার নগ্ন দেহ নিয়ে কবি লিখেছেন-

'হালায় আজকে নেশা করছি বহুত। রাইতের
লগে দোস্তি আমার পুরানা কান্দুপট্টির খানকি
মাগীর চক্ষুর কাজলের টান এই মাতোয়ারা
রাইতের তামাম গতরে।'

নারী প্রসঙ্গ আসলেই অযাচিতভাবে এসব কবিদের যৌন ক্ষুধা জেগে উঠে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে। যেমন-

'অন্তরঙ্গতায় তুমি রেখেছিলে মুখ? মনে পড়ে
গোধূলিতে কৌমার্য হরণ সেই কৈশোরের ঘরে?

★ ★ ★

বুকে নাভিমূলে, থুতনিতে
অথবা গ্রীবায় লেগে থাকে থরো থরো চুম্বনের ম্যাজেন্টা স্বাক্ষর।

★ ★ ★

হয়তো স্নানের ঘরে নিজেকে দেখেছো অনাবৃতা,
জানালার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি ভেজা নর্তকীর মতো
গাছটিকে তীব্র দেখছিলাম তখন।
সাবান ঘষছো তুমি বগলের সবুজাভ ভূমি
সরার মতন স্তন, নাভীমূল, উরু
এবং ত্রিকোণ মাংসপিণ্ড, কি মঞ্জুল

★ ★ ★

কোনো কোনো মধ্যরাতে জেগে দেখি, আমার যুগল
উরুর একান্ত মোহনায় মুখ গুঁজে রয়েছে সে, ছলচ্ছল
নড়ে উঠলেই আমি, চেপে ধরে স্তন জিভ তার
যেন মাছ, মারে খাই কী-যে ঘেন্না লাগতো আমার
প্রথম প্রথম। আজ উপভোগ করি, বলা যায়, যথারতি।

★ ★ ★

হয়তো বা ব্রা খুলে দাঁড়াবে স্নানাগারে
গা জুড়ে কোমল নেবে জলের আদর

www.pathagar.com

★ ★ ★

কারো অভিযান প্রিয় হাত তোমার স্তনের দিকে
অগ্রসর হ'লে তুমি কেমন বিহ্বল হয়ে যাও,
এবং তোমার ওষ্ঠে কেউ চুমো খেলে
তোমার চোখের পাতা অতি দ্রুত নেমে আসে কিনা।

শুধু তা-ই নয়। এসব কবিরা পিতার লাশের সাথে শোকাতুর মায়ের যৌন ক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন তাদের কবিতায়। পিতার মৃত্যুতে পাষণ্ড কবি মানবতার শত্রু অশ্লীল যৌন ক্ষুধা প্রকাশ করেছেন কিন্তু শোক তাকে স্পর্শ করেনি। বন্ধুর লাশের পাশে বসেই বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি যৌন কাতর পাষণ্ড কবি বিকৃত যৌন লালসা সংবরণ করতে পারেনি। যেমন-

'ইতিমধ্যে তোমার রোরুদ্যমান স্ত্রীর
ব্লাউজ উপড়ে পড়া কম্পমান স্তন আড়চোখে
নিলাম বিষম দেখে, অবাধ্য রক্তে ডাকে বারবার
লাল-চক্ষু তৃষিত কোকিল।'

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্রমাগত উদ্‌ঘাটন করছে কুরআনের দাবীর সত্যতা। প্রকৃতিও পুরুষকে স্থান দিয়েছে নারীর ওপরে। বিশেষ এক সময়ে নারী পুরুষের নিচে থাকতে চায়; কিছুতেই উপরে উঠতে চায় না। কিন্তু আমাদের দেশের কতিপয় লেখক প্রকৃতি বিরুদ্ধ কিছু করতে চায় তাদের অশ্লীল সাহিত্যকর্মে।

অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদ রাতারাতি খ্যাতি অর্জনের প্রয়াসে তাঁর সাহিত্যকর্মে লিঙ্গ সমতার নামে নারীকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করছেন। ইসলাম বিদ্বেষী বক্তব্যের মাধ্যমে নানা আঙ্গিকে, নানা ঢংয়ে, নানা দৃষ্টান্ত উপমা দিয়ে এবং কাল্পনিক ঘটনার নানা শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করে তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন অশ্লীলতার উপকরণ হিসাবে। এমনি একটি গ্রন্থ হলো 'নারী'। খ্যাতি ও বইয়ের কাটতির জন্য ভুল তথ্যের মাধ্যমে তিনি গ্রন্থটির ১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"মেয়েদের খৎনার বিভীষিকা জাগানো প্রথা আজো প্রচলিত আরব দেশগুলোতে, বিশেষ করে মিসর, সুদান, ইয়েমেন ও নানা উপসাগরীয় রাজ্যে এবং সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, ঘানা, গিনি ও নাইজেরিয়ায়। এসব দেশে কুমারীত্ব আর যোনিচ্ছদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যোনির এক টুকরো পাতলা পর্দার ওপর দাঁড়ানো সেখানে বংশের মানসম্মান। যাতে বংশের মানসম্মান বা বালিকার সতীত্ব ও সতীচ্ছদ অক্ষত থাকে, তার জন্য খৎনা করানো হয় বালিকাদের। নারী সেখানে ফিৎনা, যার কাজ বিপর্যয় ঘটানো, ওই বিপর্যয় থেকে সমাজকে বাঁচানোর জন্য সেখানে কুরিয়ে ফেলে দেয়া হয় যোনির পাপ পরায়ণ প্রত্যঙ্গগুলো। ওই বর্বর পিতৃতন্ত্র জানে যদি কেটে ফেলা হয় বালিকার ভগাঙ্কুর, বৃহদোষ্ঠ, ক্ষুদ্রোষ্ঠ, তাহলে থাকবে না তার কামক্ষুধা। রক্ষা পাবে সতীত্ব আর সমাজ। বালিকাদের খৎনা করানো হয় সাত-আট বছর বয়সে, ঋতুস্রাব দেখা দেয়ার আগে। সেখানে রয়েছে মেয়েদের খৎনা করানোর জন্য হাজামী। দু'জন নারী মেয়েটিকে শক্ত করে চেপে ধরে, যেমন ধরা হয় কোরবানির পশু, দু'উরু জোরে টেনে ধরে তারা ফাঁক করে বালিকার যোনি অঞ্চল, আর হাজামী ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে

www.pathagar.com

বালিকার ভগাঙ্কুর ও অন্যান্য প্রত্যঙ্গ। খৎনার সময় তারা আবৃতি করতে থাকে 'আল্লাহ মহান, মুহাম্মদ তার নবী, আল্লাহ আমাদের দূরে রাখুক সমস্ত পাপ থেকে'। যে ছুরিটি দিয়ে খৎনা করা হয়, সেটি সব সময় ধারালোও হয় না। ছুরিটি হতে পারে ধারালো পাথর, ব্লেড বা কাঁচের টুকরো। খৎনায় প্রথমে কেটে ফেলা হয় বালিকার সম্পূর্ণ ভগাঙ্কুর, তারপর কাটা হয় ক্ষুদ্রোষ্ঠ, তারপর বৃহদোষ্ঠের ভেতর ভাগের মাংস। খৎনার পর সেলাই করে দেয়া হয় যোনিরন্ধ্র, একটু ফাঁক রাখা হয় ঋতুস্রাবের জন্য। খোলা রাখা হয় মূত্ররন্ধ্র। খৎনার সময় বালিকার মা ও আত্মীয়রা ক্ষতের ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে খৎনা ঠিক মতো হয়েছে কিনা। খৎনার পর চল্লিশ দিনের জন্য শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয় বালিকার দু'উরু, যাতে যোনি ভালোভাবে জোড়া লাগে। হাজামীরা অশিক্ষিতা নারী, তারা খৎনা করতে গিয়ে বিপন্ন করে তোলে বালিকার জীবন। খৎনা সফল করার জন্য তারা গভীরভাবে কাটে বালিকার ভগাঙ্কুর, যা দেহে কামের একটি কণাও অবশিষ্ট না থাকে।"

অথচ যৌনবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন ভগাঙ্কুর হলো নারীদেহের যৌনমুখের কেন্দ্রবিন্দু। এটি চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে বলে সঙ্গমের সময় নারী চরম সুখ পায় না। কামশীতল নারীকে কোন পুরুষ পছন্দ করে না। নারী নিজে চরমসুখ পেলে পুরুষকেও চরম সুখ দিতে পারে। তাই বর্তমান পাশ্চাত্যে যেন মোটা অংকের টাকা ব্যয় করে অপারেশন করিয়ে তরুণীরা ভগাঙ্কুরের উপরের চামড়াটা সরিয়ে দিয়ে ভগাঙ্কুর উন্মুক্ত করে রাখে। যেন স্বামীকে তারা সন্তুষ্ট করতে পারে। আরব দেশসমূহে একাধিক স্ত্রী থাকে। কামশীতল স্ত্রী হলে বিয়ের রাতেই স্বামী তালাক দেবে এই আশঙ্কায় সেখানে নারীদের মধ্যে খৎনার প্রচলন হয়।

ভারতের প্রথম আজীবন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলার নেহরু (প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পিতা এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মাতামহ) তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "Glimpses of World History" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"প্রাচীন যুগের মিসর, চীন কিংবা ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীসে তবু খানিকটা মেলে, রোমে কিন্তু আবার বিজ্ঞানের চর্চা ছিল না। কিন্তু আরবগণের এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎস্যটুকু ছিল, সুতরাং তাদের আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলা যেতে পারে।" জওহরলাল নেহরু ঃ বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ (অনুবাদক-শ্রীসুবোধ চন্দ্র মজুমদার) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা-৯, পৃঃ ১২৯)

'আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা' মধ্যযুগে আরবের মুসলমানরা। আরবের যৌন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে, নারীদেহে কামসুখের কেন্দ্র বিন্দু হলো তার ভগাঙ্কুর। কিন্তু চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে বলে সে চরম সুখ পায় না। বিজ্ঞানীরা নারীকে চরম সুখ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেন খৎনার দ্বারা। ভগাঙ্কুরের ওপরের চামড়াটুকুর সামান্য একটু অংশ কেটে ফাঁক করে দিলেই ভগাঙ্কুর জেগে উঠে, তখন সে নিজে চরম সুখ পায়, তার স্বামীকেও চরম তৃপ্তি দিতে সমর্থ হয়। বিবাহিত দম্পতি যাতে বিবাহের চরম সুখ পায় সে জন্য আরব দেশসমূহে খৎনার প্রচলন হয়।

অধ্যাপক ডঃ হুমায়ুন আজাদ ঠিক উল্টোটা লিখেছেন। আরব দেশসমূহে নারী দেহে

www.pathagar.com

যাতে 'কামের একটি কণাও অবশিষ্ট না থাকে' সে জন্য তার ভগাঙ্কুর, বৃহদ্রোষ্ঠ, ক্ষুদ্রোষ্ঠ সব কেটে বাদ দেয়া হয়। এই নৃশংস পৈশাচিক কাজ অর্থাৎ খৎনা করার সময় আবৃত্তি করা হয় 'আল্লাহ মহান, মুহাম্মদ তার নবী, আল্লাহ আমাদের দূরে রাখুক সমস্ত পাপ থেকে'– যেন আল্লা-রাসূল (সাঃ)কে খুশী করার জন্য এই জঘন্যতম কাজ করা হয়। মুসলমান সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টির জন্য লেখকের এই সুকৌশল অপপ্রচার। পাকিস্তান মুসলিম দেশ, এই মুসলিম দেশের যে চিত্র তিনি এই গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় দিয়েছেন তা তুলে ধরা হলো ঃ

"বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসেও মুক্তি ও যুদ্ধের থেকে অনেক সময় বড়ো হয়ে উঠছে ধর্ষণ। সৈয়দ শামসুল হকের নিষিদ্ধ লোবান (১৯৮১, ১৫১) থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। পাকিস্তানী মেজরটি বিলকিসকে শারীরিক ধর্ষণের আগে ধর্ষণ করে মানসিকভাবে, যা শারীরিক ধর্ষণের চেয়ে অনেক বেশি হিংস্র। মানসিক ধর্ষণের রূপটি এমন ঃ

'আমাকে একটা কথা বলো, হিন্দুরা কি প্রতিদিন গোসল করে?'
নীরবতা।
'হিন্দু মেয়েদের গায়ে নাকি কটু গন্ধ?'
নীরবতা।
'তাদের জায়গাটা পরিষ্কার?'
নীরবতা।
'আমি শুনেছি, মাদী কুকুরের মতো। সত্যি?'
নীরবতা।
'শুনেছি হয়ে যাবার পর সহজে বের করে নেয়া যায় না?'
নীরবতা।
'আমাকে কতক্ষণ ওভাবে ধরে রাখতে পারবে?'

নিছক পর্ণগ্রাফী-পাঠককে কামোত্তেজিত করার জন্য এই বর্ণনা। এইসব বর্ণনার কারণে বইমেলায় বইটির প্রতি তরুণ-তরুণীদের সর্বোচ্চ আকর্ষণ। লেখকের যৌনবিকৃতি আরও মারাত্মক।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মুরারজী দেশাই তার প্রস্রাব পান করতেন। এক বিশেষ সম্প্রদায় 'বিন্দুপান' করে থাকে। নারীর প্রথম ঋতুস্রাব বিন্দু বিন্দু করে পান করে সমবেত ভক্তরা। বাংলাদেশে ঋতুপান চালু করার জন্য লেখক গ্রন্থটিতে ১৭১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"ঋতুক্ষরণকে পুরুষেরা ঘেন্না করে, কামুকও এ সময় নারীকে ছু'তে চায় না, নারীরাও নিজেদের মনে করে অশুচি। এতে অশুচিত্বের কিছু নেই, সঙ্গম না করারও কিছু নেই, বরং এ সময়টা সম্পূর্ণ নিরাপদ, অধিকাংশ নারী এ সময়েই বোধ করে বেশি কামাবেগ। ঋতুক্ষরণের রক্ত দূষিত নয়, ঘৃনার বস্তু নয়। গ্রিয়ার (১৯৭০, ৫১) বলেছেন, 'যদি তুমি নিজেকে মুক্ত মনে করো, তবে তুমি তোমার ঋতুরক্ত একটু চেখে দেখার কথা ভেবে দেখতে পারো– যদি তোমার এতে ঘেন্না লাগে, তবে আরো অনেক পথ

www.pathagar.com

বাকি আছে, মেয়ে।'

আল্লাহ শেষ বিচারের দিন বান্দাদের কৃতকর্মের জবাব নিবেন। কুকর্মের মিথ্যা সাক্ষী দেবে বলে আল্লাহ বান্দার মুখ বন্ধ করে দেবেন এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে কুকর্মের ফিরিস্তি নেবেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো আমাদের দেশে কিছু লোক দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর পর তাদের মুখ তাদের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষী দেয়া দূরে থাক জীবিতকালেই তাদের মুখ কুকর্মের ফিরিস্তি দিচ্ছে। তাও প্রকাশ্যে এবং বাড়ীতে সাংবাদিক ডেকে এনে। যেমন একটি ম্যাগাজিনের ঈদ সংখ্যা '৯৮ এ দেশের একজন নামকরা কবি তাঁর কুকর্মের বয়ান করেছেন। ঐ সাক্ষাৎকারে প্রশ্নের জবাবে এই কবি যা বলেছেন তা হলো ঃ তাঁর জীবনে বহু নারী এসেছে। নাম প্রকাশ করে তাদের বিপদে ফেলতে চাই না। তারাও তো কোনো না কোনো পরিবারের সদস্য। পরকীয়া প্রেম সম্পর্কে বলেন ঃ

"... মনেরও তো একটা ক্ষুধা থাকে। যে আমার সঙ্গে অষ্টপ্রহর আছে। সে যদি সেই ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে না পারে.... তবে অন্য নারী এসে ভাসিয়ে নিতেই পারে। 'শারীরিকভাবে এই বয়সে তিনি পুরোপুরি সক্ষম নন এরপরও নারীরা কেন আসে"?

এর জবাবে কবি বলেন- "তারা সেটা জেনেই আসে। বয়সের তো একটা সীমাবদ্ধতা আছেই। মনের দিক থেকে আমি যতোই উদ্দাম থাকি না কেন শরীরের দিক থেকে তো নই। কাজেই সাধ থাকলেও.... মানুষের এমন একটা বয়স আসে, যখন তার উচ্ছলতা কমে যায়.....। "এক সঙ্গে দু'জন নারীর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক হয়েছে?" এর জবাবে কবি বলেছেন, "এক সঙ্গে দু'জন নারীর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক হতে পারে না। তবে একবার কিছুদিনের জন্য এক অভিনেত্রীর সঙ্গে আমার গাঢ় সম্পর্ক হয়েছিলো। তিনি জানতেনও আমার জীবনে অনেক নারী এসেছে।"

এই কবির মতো আরেকজন কবি-নেতা বাসায় সাংবাদিক ডেকে এনে নিজের কুকর্মের কথা ফলাও করে প্রচার করেছিলেন। তিনি আরেকজনের স্ত্রীর সাথে পরকীয়া প্রেমে মত্ত ছিলেন চৌদ্দ বছর তা সগর্বে ঘোষণা করেছেন।

এসব কবিরা একদিকে নারী স্বাধীনতার কথা বলেছে অন্যদিকে অশ্লীল সাহিত্যের মাধ্যমে যুব সমাজকে নৈতিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং দেশে ধর্ষক উৎপাদন করছেন। আবার এদেরকেই এইডস বিরোধী মিছিলে দেখা যায়। নারীর কল্যাণে সভায়-সমাবেশে কখনো কোকিল কণ্ঠে, কখনো হাত-পা ছুঁড়ে বজ্রকণ্ঠে বক্তৃতা করতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এদের দ্বারা কখনোই নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এসব বুদ্ধিজীবীদের ব্যক্তিগত জীবনই তা বলে।

কিশোর-চরিত্র হনন

সম্প্রতি বায়তুল মোকাররমে 'আরব্য রজনী' নামে ৭২৮ পৃষ্ঠার (ম্যাগাজিন সাইজ) সাদা কাগজে মাত্র ১০০/- টাকায় ভারতীয় বইটি বিক্রি হতে দেখেছিলাম। বইটির প্রতিটি গল্পের ইলাস্ট্রেশনে নগ্ন নর-নারী প্রেমলীলায় অথবা কামকেলীতে রত নগ্ন রেখাচিত্র রয়েছে। মুসলমানী গল্পের আড়ালে বাবুরা আমাদের সন্তানদের চরিত্র হননের

www.pathagar.com

কাজটি সুকৌশলে করে যাচ্ছে। এরূপ জঘন্য আগ্রাসন দেখবার অথবা রুখবারও যেন আমাদের দেশে কেউ নেই। সম্প্রতি নিউ মার্কেট, বাংলাবাজার, বায়তুল মোকাররমসহ দেশের বইয়ের বাজারে প্রতিটি দোকানে ভারত থেকে অবৈধ উপায়ে যে সমস্ত সাময়িকী আসছে তার মধ্যে আলোকপাত, মনোরম, সানন্দ, আনন্দলোক, স্টার এন্ড স্টাইল, স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড, সিমেনা জগত, সিনেব্লিৎস, মোভিও, স্টার ডাস্ট, ইন্ডিয়া টুডে, গোয়েন্দা তদন্ত, সন্ধানী দীপ, রহস্য তদন্ত, প্রতিক্ষণ, পরিবর্তন, প্রসাদ, আনন্দমেলা, অনুসন্ধান সংকেত, অপরাধ ক্রাইম, দৃষ্টিপাত, সত্যসন্ধানী, মনোরঞ্জন, সত্যিকাহিনী, ঘরোয়া, সিনে এ্যাডভান্স এবং ভারতীয় অন্যান্য পত্রিকাসমূহ। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন শারদীয় সংখ্যা। আমরা জানি 'প্লে বয়' পত্রিকা পাকিস্তান আমল থেকে এ দেশে চোরাই পথে আসছে। এসব পত্রিকা চুপি চুপি গোপনে বিক্রি হতো। এসব পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ছিলো খুবই সীমিত। সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর গ্রাহক এসব পত্রিকা পড়তো। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় এসব অশ্লীল পত্রিকা অবাধে গ্রামে-গঞ্জে, শহরে, হাটে বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। অল্প শিক্ষিত থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষিত বিকৃত রুচির লোকেরা এসব পত্রিকা কিনছে, পড়ছে। প্লে বয় পত্রিকা যেমন মানুষের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটায় ঠিক তেমনি ভারতীয় অশ্লীল পত্রিকাও নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটায়। তবে এ জন্যে তুলনামূলকভাবে ভারতীয় অশ্লীল পত্রিকাই বেশি দায়ী। কারণ এসব পত্রিকার কাহিনী সব শ্রেণীর পাঠকই পড়তে ও বুঝতে সক্ষম। পত্রিকাটি জেলা শহরের ফুটপাতে, পত্রিকার স্টল ও অভিজাত লাইব্রেরীতে অমার্জনীয় অশ্লীল, অর্ধ উলঙ্গ ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছবির বিপুল ব্যবহৃত বইয়ের ব্যবসা জমজমাট রূপ নিয়েছে। 'পিন আপ' করা ম্যাগাজিন যেমন পিও পিল হট ওয়েভসহ বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও বই যাতে মেয়ে-পুরুষের অশ্লীল ছবিসহ যৌন সুড়সুড়ি মার্কা রসালো যৌনবেদনাময়ী কেচ্ছা-

দেশের প্রায় প্রতিটি পত্রিকার দোকানে থরে থরে সাজানো থাকে এ ধরনের অশ্লীল পত্রিকা

www.pathagar.com

কাহিনী থাকে। এসব কমোদ্দীপনাময় বই-পত্রিকা পড়ে যুব সমাজ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। গুলিস্তান মোড় দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় রাস্তার পার্শ্বের হকাররা বলতে থাকে, স্যার 'ইন্ডিয়ান ন্যাকেট বই' লাগবে কিনা। গ্রাম-গঞ্জে এসব বই প্রকাশ্যে বিক্রি হলেও গুলিস্তান এলাকার হকাররা এসব বই হাতের কাছে রাখেন না। দরদাম ঠিক হলে বিশেষ স্থানে লুকিয়ে রাখা বই এনে খরিদদারের হাতে তুলে দেয়। ব্যাপকভাবে এই সকল নোংরা ও চরিত্র হননকারী বইপত্র সর্বত্র কিশোর-কিশোরী ও যুবক যুবতীদের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে বলে ভবিষ্যত নাগরিকদের সম্পর্কে সচেতন অভিভাবকগণ স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন। মাছি যেমন নর্দমা, ময়লা আবর্জনা থেকে রোগ জীবাণু বয়ে এনে খাবারে বিষ ছড়ায় ঠিক সমাজে তেমনি এসব অশ্লীল পত্র-পত্রিকাও সুস্থ সামাজিক পরিবেশকে বিনষ্ট করার জন্য সমাজে বিষ ছড়াচ্ছে। যুব সমাজের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটাতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করছে। বাংলাদেশের এক শ্রেণীর অসাধু বিবেকহীন পত্রিকা। ব্যবসায়ী ভারতীয় অশ্লীল পত্রিকার কাহিনী নকল করে অবাধে প্রকাশ্যে বিক্রি করছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনী লেখার অপরাধে তৎকালীন জাতীয়তাবাদ সরকার সাপ্তাহিক 'বিচিন্তা' পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু কতকগুলো ভুঁইফোড় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা নগ্ন, অর্ধনগ্ন ছবি প্রকাশ করে অশ্লীল প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখছেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অবশ্য অতীতে দেখেছি সরকার মাঝে মাঝে এসব পত্রিকার বিরুদ্ধে লোক দেখানো ব্যবস্থা নেয়। যেমন জানুয়ারী মাসের কোনো আপত্তিকর সংখ্যা এপ্রিল মাসে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ যখন পত্রিকাটি সের দরে বিক্রি হয়ে কাগজের মন্ড তৈরির জন্য কাগজ কারখানায় যায়। এখানে উল্লেখ্য স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে অপপ্রচারমূলক 'লজ্জা' গত '৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বই মেলায় দেদার বিক্রি হওয়ার পর সরকার বইটি ঐ বছরের জুলাই মাসে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

যে সব প্রকাশক-লেখক পাঠকদের যত বেশি ফাঁকি দিতে অথবা প্রতারণা করতে পারছে তাদের বই আমাদের দেশে হট কেকের মতো বিক্রি হচ্ছে। আবার বইয়ের কোনো কোনো লেখক বলে থাকেন– পাঠককে অর্থের বিনিময়ে আনন্দ দেবার উদ্দেশ্য। দেশ ও জাতি কোথায় গেলো সেটা তাদের দেখার বিষয় নয়। দেশ ও জাতি স্বর্গে গেলে না নরকে গেলা সেটা তাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। নগদা-নগদি অর্থ প্রাপ্তিই তাদের কাছে মুখ্য। দেশ ও জাতির প্রশ্ন তাদের কাছে গৌণ!?

সমরেশ বাবুদের অনুকরণে/ অনুসরণে আমাদের দেশ কিছু নব্য গজিয়ে উঠা লেখক সৃষ্টি হয়েছে। শুনেছি এদের কোন বই মাসে ২/৩ সংস্করণও বের হয়। এসব বই ইসলামী চিরসত্য, চির সুন্দর ধ্যান-ধারণার প্রতি কটাক্ষ করা হয়। অত্যন্ত চাতুর্যতার সাথে অশ্লীলতা, সন্ত্রাসের কলা-কৌশল শিখানো এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে প্রায় প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত করা হয়।

সেক্স ডল

১৯৯৬ সালের ১১ অক্টোবর একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়,

www.pathagar.com

ভারতীয় সেক্স ডল অত্যন্ত সন্তর্পণে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। লিভিং ডল নামক এই সেক্শুয়্যাল পুতুলটির আরেকটি নাম হলো 'সেক্স ডল'। প্রতিদিন শত শত পিস 'সেক্স ডল' নামক প্লাস্টিক পুতুল সীমান্ত দিয়ে পাচার হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাচ্ছে। পত্রিকার খবরে প্রকাশ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়ার বিভিন্ন চোরাকারবারীদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, 'ডেক্স ডল' নামক এই পুতুলগুলো দেখতে অপরূপ। একটি পূর্ণাঙ্গ নারীরূপেই এই পুতুলগুলোকে অত্যন্ত সুন্দর মোহনীয় করে তৈরী করা হয়েছে। বেলুনের মতো ফুঁ দিয়ে ফোলানো এই সেক্স ডল পুতুলগুলো সুন্দর মোহনীয় ও আকর্ষণীয় হয়ে একটি নগ্ন নারীরূপে উপস্থাপিত হয়। প্রয়োজন শেষে হাওয়া ছেড়ে দিলে পুতুলগুলো আবার ভাঁজ হয়ে ছোট হয়ে যায়। কৃত্রিমভাবে যুবকদের যৌন চাহিদা নিবারণের জন্য এই সেক্স ডলের সৃষ্টি আমাদের প্রতিবেশী দেশটির বন্ধুত্বের কি অপূর্ব নমুনা! বাংলাদেশের যুবসমাজ যখন ভারতীয় উলঙ্গ সংস্কৃতির প্রভাবে চরিত্র হারাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে চরিত্রের বারোটা বাজানোর শেষ নিদর্শন হিসেবে ভারত এই সেক্স ডলগুলো বাংলাদেশে পাচার করছে। আর এর বিনিময়ে এদেশ থেকে লুটে নিচ্ছে বিপুল সংখ্যক বৈদেশিক মুদ্রা, শিশু, নারী আর স্বর্ণ। পত্রিকান্তরে জানা যায়, সেক্স ডলগুলোর প্রতিটির মূল্য বাংলাদেশে ২৫শ' থেকে ৩ হাজার টাকা। এখন সহজেই অনুমেয় যুব সমাজ তাদের যৌন চাহিদা নিবারণের জন্য সেক্স ডল সংগ্রহের নিমিত্তে এতো বিপুল টাকা যোগাড় করার জন্য নিশ্চয়ই অবৈধ পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হবে। স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের যুব সমাজকে ধ্বংস করার এমন কোন প্রক্রিয়া নেই যে তারা এস্তেমাল করছে না। যার কুৎসিত প্রতিফলন দেখছি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

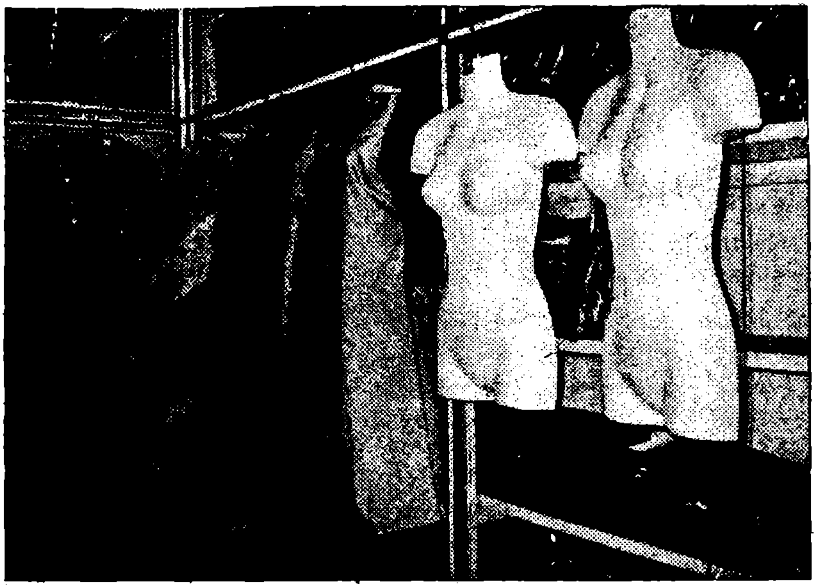

নারী শরীরের আদলে তৈরী বডি হাঙ্গার। তার ওপর সজ্জিত মেয়েদের পোশাক

www.pathagar.com

বই মেলায় নারী

প্রতিবছর ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে মাসব্যাপী বই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ ছাড়া গত কয়েক বছর যাবত জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র কর্তৃকও আন্তর্জাতিক বই মেলা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এসব মেলায় বখাটে মাস্তান আর রংবাজদের কোনো গ্যাঞ্জাম নেই। উগ্র আধুনিকা যুবতী-তরুণীদের সমাহার নেই। লিপিস্টিক, প্রসাধন পাশ্চত্যের দামী সুগন্ধীর ফোয়ারা-হাসির ঝিলিক নেই। চুড়ির রিনিঝিনি আওয়াজ আর ডাকাডাকি হাকাহাকি নেই। এরকম সুন্দর ও নির্মল পরিবেশের মধ্য দিয়েই প্রতিবছর বই মেলা সমাপ্ত হয়। অথচ ব্যতিক্রম শুধু বাংলা একাডেমি। প্রতি বছরই বাংলা একাডেমি বই মেলায় গুন্ডাদের উৎপাত লক্ষ্যণীয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উদ্ধৃতি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করছি। বেশ কয়েক বছর আগে বাংলা একাডেমির একুশের বই মেলায় ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ চলে যায়। এ ঘটনার উপর বহুল প্রচারিত একটি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন নিম্নরূপঃ (আংশিক)

বিভিন্ন বয়সী মহিলারা বাঁচাও বাঁচাও আর্ত চীৎকারে পুরুষ আত্মীয়-স্বজন ছাড়া অন্য কাউকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়নি। পরে আলো জ্বলে উঠলে যুবকদের অনেকের হাতে দেখা যায় শাড়ি, ব্লাউজ, এমনকি অন্তর্বাস পর্যন্ত। অনেক যুবকের মুখ ছিল রঞ্জিত। রং এর দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। বাংলা একাডেমির বটমূলে দুই হাত ও চুল দিয়ে মুখ ঢাকা অনেক মহিলার কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায়। তাদের সামনেই নতমুখী আত্মীয়-স্বজন ছিল রক্তাক্ত ও ছিন্নভিন্ন। (দৈনিক ইনকিলাব, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯)

.... ৩টার পর থেকে মেলায় শুরু হয় একশ্রেণীর বখাটে যুবক ও তরুণদের নারকীয় তান্ডব। প্রতিটি গ্রুপে ৩০/৪০ জন করে এই বখাটেরা মহিলা, কিশোরী ও তরুণীদের উপর হামলা চালাতে শুরু করে এবং দলে দলে অশ্লীল ভাষায় গান গেয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। এতে মেলায় আগত সকল বয়সের মহিলার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সেই সাথে অভিভাবকগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সাড়ে ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত এই দেড় ঘন্টা বখাটে যুবকেরা ভাইয়ের সামনে বোনের, বাবার সামনে মেয়ের, স্বামীর সামনে স্ত্রীর গায়ে হাত দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তাদের তান্ডবলীলার শিকার হয়ে অনেক মা-বোনকে কাঁদতে কাঁদতে বই মেলা ত্যাগ করতে দেখা গেছে। অনেক তরুণীকে ছেঁড়া কাপড়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায্য প্রার্থনা করতে দেখা যায়। অনেক মহিলাকে ছোট বোন ও মেয়েদের নিয়ে বিভিন্ন স্টলের ভেতরে আশ্রয় নিতে দেখা গেলেও বাইরে যুবকদের হৈ হুল্লোড়ে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়। (দৈনিক মিল্লাত, ১২ ফেব্রুয়ারি '৯৪)

বিকাল ৩টা থেকে মেলা জমে ওঠার কথা থাকলেও একশ্রেণীর বখাটে যুবক দলবেধে তার পূর্বেই মেলায় অবস্থান নেয়। তাদের লক্ষ্য বই মেলা নয়, মেলায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে আসা মেয়েদের উত্যক্ত করা এবং অশালীন উক্তির মাধ্যমে বিব্রত করা। তাদের অশালীন উক্তির প্রতিবাদ করতেও অনেক মেয়েকে দেখা গেছে। গতকাল তেমনি একটি ঘটনা চোখে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স শেষ বর্ষের একজন ছাত্র

www.pathagar.com

তার স্ত্রীকে নিয়ে মেলায় গিয়েছিলেন। তখন সন্ধ্যা ৭টা। তার স্ত্রীও বাংলা অনার্সের ফাইনাল পরীক্ষার্থীনী তার সাথে দু'বন্ধুকে নিয়ে একাডেমির বাইরের ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতে গিয়েই এই বখাটে দলের কবলে পড়েন। উদ্‌ভ্রান্ত যুবকেরা তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে অশালীন উক্তি ও বিদ্রুপ করতে থাকে। এক পর্যায়ে একজন যুবক অকথ্য ভাষা ব্যবহার করলে সেই অনার্সে পড়ুয়া তরুণী গৃহবধূর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। ধরে বসেন বখাটে যুবকের শার্টের কলার। প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যে উৎসুক জনতা তাদের ঘিরে ধরেন। তখন অবিরাম গণধোলাই থেকে বাঁচার জন্য বয়ার পর সেই তরুণী বধূ কেঁদে ফেলেন এবং এই প্রতিবেদককে বলেন, এই যদি হয় মেলার অবস্থা তাহলে মা-বোনেরা বই কিনবে কি করে। আর মান-সম্মানই বা রক্ষা পাবে কি করে? (দৈনিক মিল্লাত, ৬ ফেব্রুয়ারি '৯৪)

বাংলা একাডেমিতে প্রতিবছর বই মেলার নামে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকিদার পরিপন্থী অনুষ্ঠানের আয়োজন কার স্বার্থে? আমাদের গৌরব গাঁথা লোকাচারকে নামে মাত্র মুখ রক্ষার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেও অধিকাংশ অনুষ্ঠান হয় একটি বিশেষ দেশের অনুকরণে ও অনুসরণে এবং বিজাতীয় স্টাইলে।

প্রতিবছর বই মেলায় 'বসন্ত বন্দনা' হচ্ছে। ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবী চটি পরে স্বাগত জানাচ্ছে বসন্ত উৎসবকে। অনেকে ধুতি পরে কপালে তিলক এঁকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। চারুকলার ছেলে-মেয়েরা বই মেলায় গিয়ে সবার কপালে জোর করে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। ছেলে-মেয়ে কয়েকজন রংচং মেখে মিছিল করে।

এসব বিজাতীয় সংস্কৃতির কারণে অনেকেই ক্ষুব্ধ। বসন্ত বরণের নামে একশ্রেণীর তরুণ-তরুণীর ঢলাঢলিতে মেলায় আসা সাধারণ দর্শকেরা লজ্জায় মুখ ঢাকে।

www.pathagar.com

নববর্ষের নামে নারী অবমাননা

নববর্ষের প্রধান আকর্ষণ যেহেতু মেলা সেহেতু এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিকদের মতে মেলা শব্দের অর্থ মিলিত হওয়া বা একত্রিত হওয়া। এক সময় গ্রামীণ মানুষের জীবন ছিল বদ্ধ, বিশেষ করে বাড়ীর বউ-ঝিদের। খেটে খাওয়া জীবনে বাইরে বেরুনো বা আমোদ-প্রমোদের সুযোগ ছিল সীমিত। সুতরাং নববর্ষ বা নানান উপলক্ষে তারা বাইরে আসতো। সাজ-গোজ করে এক স্থানে মিলিত হয়ে নির্মল আনন্দ-ফূর্তি, কুটীর শিল্পের প্রদর্শনী এবং মিঠাই, মন্ডা, জিলাপী, কদমা, বাতাসা, পাঁপড়, খই-মুড়কীর বিকিকিনি করতো।

কালক্রমে মেলা নামের এই জীবন বিভঙ্গ কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে বাঁধা পড়ে। ক্ষীয়মান হয়ে যায় মেলার আদি উদ্দেশ্য, মেলার ধরণ যায় বদলে। মুসলমান শাসনের পতনের পর বৃটিশ বেনিয়াদের আনুকূল্যে এ দেশে এক 'বাবু' শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যাদের জীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্যটি হলো ইন্দ্রিয় সম্ভোগ। চোখে কালি পড়া, বাউরী চুল, ফিনফিনে কালোপেড়ে ধুতিপরা এই বাবুদের বক্তব্য ছিল– "সুখজনক কাজ করলে যদি পাপ হবে তবে ঈশ্বর সুখসাধন ইন্দ্রিয়কে আপন কর্মে নিযুক্ত করেছেন কেনো? দেখ হস্ত, ইন্দ্রিয় দ্বারা আহার করছে, চক্ষু ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখছে। তাতে লোকে পরম সুখী হচ্ছে। তবে গণিকা সম্ভোগে পাপ হবে এ কেমন কথা?" এ ধরনের জীবনাদর্শে বিশ্বাসী জমিদার বাবুরা এক সময় মেলা নামক সামাজিক উৎসবটির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তারা মেলাকে রোজগার বাড়াবার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। মেলার চরিত্র যায় বদলে। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' বইতে বাবুদের মেলার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "খড়দহের ও ঘোষপাড়ার মেলায় কিংবা মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতি সময়ে কলিকাতা হতে বীরাঙ্গণাদিগকে লইয়া দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত।"

থার্টি ফার্স্ট নাইটে নারকীয় তান্ডবের শিকার বাঁধন

www.pathagar.com

লাঞ্ছিত হওয়ার পর বাঁধনকে এভাবে টহল পুলিশের ট্রাকে তুলে দেয়া হয়

দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর 'পল্লীচিত্র' বইতে মরুটীয়ার স্থান যাত্রার মেলা প্রসঙ্গে লিখেছেন– "বার বিলাসিনীদের দোকান" এ অঞ্চলের মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মেলায় ইহাদের সমাগম যত অধিক হয় জমিদারের লাভও তত অধিক হইয়া থাকে। এক একটি

পহেলা বৈশাখ বরণ উৎসব উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে বহিরাগত তরুণ-তরুণী এভাবে মেয়েদের বুকে-মুখে আলপনা এঁকে দেয় এবং ছেলেদেরও মুখ-কপালে চন্দনের তিলক কেটে দেয়

www.pathagar.com

রূপজীবিনী তিনচারি হাত লম্বা 'টোঙ্গে রূপের দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। অর্থোপার্জনের আশায় এখানে নানা পল্লী হতে তিন শতাধিক রূপজীবিনীর সমাগম ঘটেছে। শিকারের সন্ধানে অনেক চারি গাছা মলের ঝনঝননিতে গ্রাম চাষীদের, পাইপ পেয়াদা ও নগদীগণের তৃষিত চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত করে মেলার মধ্যে বিচরণ করছে।

লোক গীতিকার কুবির গোঁসাই তাঁর গানে বাবু-বিবিদের এই মেলার বর্ণনা দিয়ে গেয়েছেন ঃ

"নারী চারিদিকে
বেড়াচ্ছে পাকে পাকে
দেখে যারে তাইরে ডাকে
প্রাণ বন্ধু বলে।"

বাবু-গৌরবের আমলে মেলা হয়ে উঠেছিল একান্তভাবেই মদনোৎসব। মেলা মানেই ছিল নাগর-নাগরীদের খেলা। মেয়েরা ছড়া কেটে বলতো–

"সবাই দেবে গায়ে হাত
তবেই হবে মেলার জাত।"

সেকালে মেলার নামে যা হতো বিদ্যাপতি ঠাকুরের কাব্যে বর্ণিত আছে। তিনি লিখেছিলেন ঃ

"ব্রাহ্মণের পৈতে গিয়ে পড়ছে
চন্ডালের গায়ে,
আর বেশ্যার পয়োধর মর্দিত হচ্ছে
সন্ন্যাসীর বুকে।"

সুন্দরী সুসজ্জিতা তরুণীকূলের সাথে নরককূলের মাত্রাতিরিক্ত ভীড় দেখে সেকালের ঘোষ পাড়ার কর্তাভাজা মেলা সম্পর্কে 'সোম প্রকাশ' (১২৭০ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় চৈত্র সংখ্যায় লেখা হয়েছিল ঃ

> "এ বৎসরে 'দোলে' প্রায় ৬৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। যাত্রীদিগের মধ্যে চৌদ্দয়ানা স্ত্রীলোক। কুলকামিনী অপেক্ষা বেশ্যাই অধিক। যে সমাজের স্ত্রী লোকেরা লজ্জা ও কুল ভয়ে গৃহের বাহির হইতে সাহসী হয় না, সেই সমাজের, সেই স্ত্রী লোকের এক কর্তার অনুরোধে বহু সংখ্য অপরিচিত পুরুষের সহিত একত্রে বসিয়া আমোদ করিতে লজ্জিত হইতেছে না, এক একটি পুরুষের নিকট গড়ে ৪/৫টি করিয়া যুবতী বসিয়া আছে।"

আজকের মেলাগুলোর চেহারাও ব্যতিক্রম কিছু নয়। বাবু-বিবির মেলার সেই হারান চিত্র আবার ফিরে এসেছে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে গ্রামীণ জীবন দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। কবে নববর্ষ আসে, কবে বসন্তের ফুল ফোটে কোনো খবরই রাখে না গ্রামের মানুষ। গাজীপীর, সত্যপীর, হালখাতা বা রথের মেলায় মুখরিত হয় না গ্রামীণ জনপদ। যত মেলা এখন শহরে। রমনা বটমূলে বৈশাখী মেলা, বাংলা একাডেমিতে একুশের মেলা, পাঁচতারা হোটেলগুলোতে ইংরেজী নববর্ষের মেলা, বাউল মেলা, আর্ট কলেজের পথে বসন্তের মেলা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

আদি মেলার চরিত্র ও চালচিত্র বদলে দিয়ে অভিনব পদ্ধতিতে পালিত হচ্ছে এসব মেলার উৎসব। নববর্ষে রাত বারটার পর গাড়ী নিয়ে রাস্তায় উচ্চশব্দে হর্ণ বাজাতে বাজাতে গাড়ী মিছিল দিয়ে শুরু হচ্ছে নববর্ষের সূচনা। বাঘ, ঘোড়া, হাতি, শিয়াল, বানরের মুখোশ পরে ঢাকা, উলুধ্বনি, শাঁখ কাসার ঘন্টার সহযোগে বেরোচ্ছে মিছিল। শতক ও পয়লা বৈশাখ বরণের আয়োজন অনুষ্ঠানে ঘটেছে, পেঁচা, লক্ষ্মীর মুখোশ, জন্তু-জানোয়ারের মুখোশপরা লোকজনের র‍্যালী, সেই র‍্যালীতে পূজার বাদ্যের মতো টাকডুমাডুম

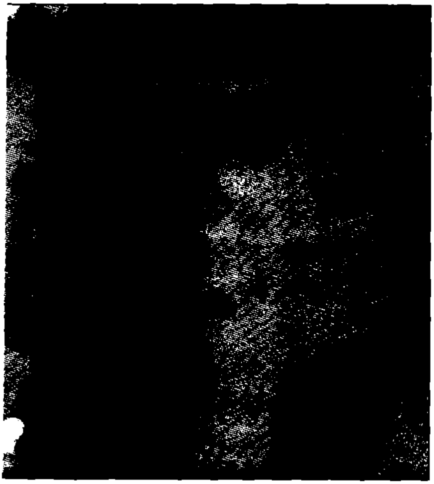

হোক না অচেনা অজানা পুরুষ, দিক না কপালে টিপ-সিঁদুর পরিয়ে আপত্তি নেই

www.pathagar.com

ঢোলের শব্দ, কাসর ঘন্টা ইত্যাদির সঙ্গে ছেলে-বুড়ো, তরুণ-তরুণীর উদ্দাম নৃত্য! রমনা পার্কে ঘটা করে পান্তা ভাত আর পিঠাপুলী মাটির শানকিতে করে চড়া দামে বিক্রি করা হয়েছে। তরুণ-তরুণীরা তো বটেই মাঝ বয়সী মহিলাও ধামুস ধুমুস করে বৈশাখী রৌদ্রেও বেদম নেচেছেন। এর ওপর কিছু মুখচেনা বুদ্ধিজীবী গলা ফাটিয়ে চীৎকার করেছেন। "নতুন শতাব্দী হবে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মানবতার জয়গানের শতাব্দী।"

মেলার নামে উৎসবের নামে বেলেল্লাপনার চমকপ্রদ ছবি প্রতিবছর ছাপা হয় জাতীয় প্রতিটি দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতায়। ছবিতে দেখা যায় জনৈক সুবেশ্যা, টোপর পরা তরুণী স্মিতহাস্যে মেলায় আগত তরুণ খদ্দেরের মুখে পান্তা খাইয়ে দিচ্ছে। তরুণটি পরম প্রশান্তিতে পরনারী-সুখ স্পর্শমোদিত সেই পান্তা গোগ্রাসে গিলছে। পাশে দন্ডায়মান আর এক নারী স্পর্শলোভী তরুণ খদ্দের হাস্যমুখে পান্তা খাওয়ার অপেক্ষায় আছে। ছবির ক্যাপশনে লেখা হয়- "রমনা পার্কে, পয়লা বৈশাখ সকালে এসব ধনীর দুলাল-দুলালী একদিনের বাঙালী সেজেছিল। আর প্রসাধন চর্চিতা, বর্ণাঢ্য সজ্জিতা আধুনিকারা খদ্দের ভেদে ২০ টাকা থেকে ১০০ টাকা প্রতি শানকি পান্তা ভাত খাইয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ ভারি করে।"

আধুনিকাদের অর্থোপার্জনের এই অভিনব পান্তার সাথে দীনেন্দ্র রায়ের 'পল্লীচিত্রে' বর্ণিত স্নান যাত্রার মেলার পার্থক্য কোথায়? সেখানে তিনি লিখেছেন- "বারবিলাসিনীদের 'দোকান' এ অঞ্চলের মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তফাৎ হয়তো এইটুকু, তারা পেটের দায়ে রূপের পসরা সাজিয়ে মেলায় দোকান বসাত। পঞ্চদশ সালের শিক্ষিতা আধুনিকারা একই কাজ করছে ফ্যাশনের দায়ে। এরপরও কর্তাভজা বুদ্ধিজীবীরা গলা ফাটিয়ে বলেছেন, "নতুন শতাব্দী হবে মানবতার জয়গানের শতাব্দী"। তাদের মানবতার জয়গানে জাতি শংকিত। তাদের মানবতা মানে যুবক-যুবতীর কণ্ঠলগ্ন নৃত্য, আদিম জংলী কায়দায় 'জঙ্গল নিশি' উদ্‌যাপন, টোটেম সমাজের মতো মুখোশ, নাচ, উলঙ্গ নৃত্য প্রভৃতি। তাদের মানবতা বিবাহ বন্ধন মানে না। কন্যার

www.pathagar.com

কুমারীত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না পিতামাতা, পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে বিয়ে ছাড়াই সহবাস এবং গর্ভধারণের পক্ষে সোচ্চার। দেহের বেসাতীকেই এরা নারী স্বাধীনতা জ্ঞান করে। বাহু কণ্ঠলগ্না নারীকেই এরা আধুনিক আখ্যা দেয়। এই তথাকথিত সেক্যুলারিস্ট মানবতাবাদীদের আদর্শই হলো জীবনের সৎ শিক্ষা, আদর্শ, মূল্যবোধ, বাস্তব সচেতনতা এবং চিরন্তন সত্যগুলোকে গুলিয়ে দিয়ে এক ভোগবাদী, উচ্ছৃঙ্খল সমাজ নির্মাণ, যেখানে তারা বিজাতীয়দের মতো উচ্চারণ করবে "যদি বেশ্যা গমনে পথ থাকিত তবে কি জনমে জয়-উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি স্বর্গের বেশ্যা সৃষ্টি করিতেন"? (সূত্র ঃ আয়ার দানিশ, দৈনিক ইনকিলাব, ২৩ বৈশাখ ১৪০১)

এক সময় আরবে 'নওরোজ' উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে পালন করা হতো। যা ছিল ইসলাম ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের পরিপন্থী। তাই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে দু'ঈদে নির্মল আনন্দ করার অনুমতি দেন। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য আজ মুসলমানদের মধ্যে নববর্ষ উদ্‌যাপনের নামে বেহায়াপনার অনুশীলন এবং পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে। অথচ ইসলাম এসেছিল পৌত্তলিকতা নাশ করে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে। এক সময় প্রতীক পূজারীরা ধর্মের নামে বর্বরতা লালন করতো। হিন্দুদের নরবলী ও সতীদাহের মতো নির্মম বর্বরতা এই সেদিনও চালু ছিল। এখন থেকে ষাট বছর আগেও ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীতে নরবলীর ঘটনা

নববর্ষের উন্মাদনায় সুন্দরের আড়ালে অসুন্দরের ও অশুভ শক্তি দানবীয় মুখোশে বুদ্ধিজীবী নামের এক বৃত্তিজীবী

www.pathagar.com

ঘটতে দেখা গেছে। বালি দ্বীপের জংলীরা বাপ বুড়ো হলে মেরে আগুনে জলসে পিন্ড বানিয়ে খেতো। জাহেলিয়াতের যুগের আরবরা শিশু কন্যা জ্যান্ত কবর দিতো। দক্ষিণ সাগরের কার্থেজ দ্বীপবাসীরা ধ্যান যজ্ঞের মানুষের রক্ত দিয়ে সরোবর বানিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করতো। দেবতার তুষ্টের জন্য রোমানদের অসংখ্য বর্বরতার একটি ছিলো সদ্যপ্রসূত শিশু সন্তান ভক্ষণ করা ও পোয়াতিকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা। এরকম হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে অবতারবাদ ও প্রতীক পূজার নিষ্ঠুরতম আনুষ্ঠানিকা। এ প্রতীক পূজার নিষ্ঠুরতা থেকে মানব জাতিকে মুক্তির লক্ষ্যেই এ ধরায় এসেছিল মানবতার মহান ধর্ম ইসলাম। ইসলাম এসেছিল পৌত্তলিকতা নাশ করে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করতে। ইসলাম সত্যের বাহক, সুন্দরের পূজারী। অথচ আজকে তথাকথিত প্রগতিবাদীরা নববর্ষ উদ্‌যাপনের নামে জাতিকে পৌত্তলিকতার যুগে, প্রতীক পূজার যুগে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। এদের নিকট কোরআন পাঠ করে অনুষ্ঠান শুরু করলে তা হয় সাম্প্রদায়িক। আর মঙ্গল প্রদীপ, মঙ্গলঘট স্থাপন করলে তা হয় প্রগতিশীল। একদল মুখচেনা বুদ্ধিজীবী শেকড়ের সন্ধানে কালিমূর্তির মধ্যে তাদের উৎসের অনুসন্ধান করেছেন। দেশের সচেতন সমাজ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলে কুচক্রীমহল বোল পাল্টিয়ে বক্তব্য দেয় যে, কালিমূর্তি যেহেতু কাইয়ুম চৌধুরী অঙ্কিত সেরা চিত্র সেহেতু তার মনোগ্রাম দোষণীয় নয়।

কলসির কানায়ই যদি মঙ্গল লুকিয়ে থাকতো তাহলে এ পৃথিবীতে ঐশি কেতাবসমূহ কেনো অবতীর্ণ হয়েছিলো? পাথরের খোদাইতেই যদি শ্রদ্ধা বাণী উৎকলন করা গেলো তাহলে জগতের যাবতীয় প্রতীকতাবাদ মুছে দিয়ে নিরাকার বিশ্বাসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো কি করে? প্রকৃতপক্ষে এরা অসুন্দরের অশুভ শক্তির পূজারী। তাইতো এরা নববর্ষ উপলক্ষ্যে সুন্দরকে আড়াল করে অসুন্দরের মুখোশ পরে। ভয়ঙ্কর জীব-বস্তুর মুখোশ পড়ে অশুভ শক্তির ছদ্মাবরণে নিজেদেরকে প্রমাণ করে।

বাঙ্গালী হিন্দু তাদের সনাতন ধর্মভিত্তিক পুরুষানুক্রমিক সংস্কৃতিরবশে সন্ধ্যায় উলুধ্বনি করে শাঁখ ও কাঁসার ঘন্টা বাজিয়ে সন্ধ্যারতি করে, বিয়ে বা কোনো শুভ অনুষ্ঠানে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং মঙ্গলঘট স্থাপন করে মাঙ্গলিক আচরণ করে থাকে। তারা নিকানো উঠানে আলপনা আঁকে এবং সন্ধ্যায় তুলসীপাতায় প্রণাম জানায়। হিন্দু নারীরা ত্রয়োতির চিহ্ন হিসেবে সিঁথিতে সিঁদুর পরে এবং হাতে শাঁখা পরে। কিন্তু মুসলমান সমাজে কোনোদিন উল্লেখিত ধর্মচারণ পালিত হতো না বা এখনও হচ্ছে না।

বাংলায় পাল বংশের শাসনামলে উলুধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ কামনা করা হতো। বহিরাগত সেন বংশের রাজত্বকালে মঙ্গল প্রদীপের প্রচলন করা হয়। পরবর্তীতে মুসলিম শাসন আমলে সভা-সমিতি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে এই মঙ্গল প্রদীপ হিন্দু পূজার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে তা রহিত করা হয়।

গত কয়েক বছর যাবত আমাদের এদেশের কতিপয় পরান্নভোজী বুদ্ধিজীবী প্রায়ই বাঙ্গালীত্বের নামে 'মঙ্গল প্রদীপ' জ্বালিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্বোধন ও শুভ কাজের সূচনা করছে। মঙ্গল প্রদীপকে মুসলমান বাঙ্গালীদের কালচার হিসেবে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে তথাকথিত বাঙ্গালী সংস্কৃতির খোলসে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের তল্পিবাহক কিছু

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক সংগঠন ও তাদের অনুসারীরা।

নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আনন্দ মিছিলের নামে তারা যে বেলেল্লাপনা প্রদর্শন করেছে তা ধর্মপ্রাণ জনগণকে বিব্রত করেছে, শংকিত করেছে। বিভিন্ন দৈত্য-দানব, রাক্ষস-খোক্কস ও জীব-জন্তুর মুখোশ পরে তারা পূজার স্টাইলে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে রাস্তা প্রদক্ষিণ করেছে। পশুর মাথা নিজেদের মাথায় লাগিয়ে ষাট বছরের বৃদ্ধও উভয় দিকে ষোড়শী রমণী পরিবৃত অবস্থায় ত্রিশ বছরের যুবকের ন্যায় নেচে নেচে রাস্তা প্রদক্ষিণ করেছে।

অনেকের মতে এদের উপর ব্রাহ্মণ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী অপসংস্কৃতির ভূত সওয়ার হয়েছে। জাতিসত্তাকে রক্ষা করার জন্য, আমাদের স্বকীয় মূল্যবোধ ও আত্মপরিচয়ের ধারা ফিরিয়ে আনার স্বার্থে প্রয়োজন জাতীয়তাবাদী ওঝার মাধ্যমে ঝাঁটাপেটা করে নীতি ও কক্ষ বিচ্যুত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের ঘাড় থেকে এই ভূত নামানোর ব্যবস্থা করা।

১৪০২ সালে নববর্ষের উন্মাসিকতায় আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে এক বা একাধিক তরুণ দ্রোপদীর বস্ত্র হরণের ন্যায় একজন তরুণীর বস্ত্র হরণে লিপ্ত হয়েছিল। ১৪০৩ সালে 'পহেলা বৈশাখের পাচালী' শিরোনামে একটি জাতীয় পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করছি।

বাজনার তালে তালে মঞ্চে নাচছে একদল যুবক। সামনে নারী পুরুষ-শিশু মিলিয়ে দর্শক অনেক। হঠাৎ ড্রামবিট যেন পাগল হয়ে উঠলো। দ্রুতলয়ে বাদ্যের সাথে সাথে আরো ক'জন যুবক উঠে নাচতে শুরু করেছে। ব্রেকড্যান্স। বাজনার আওয়াজ ক্রমশঃ জোরালো হচ্ছে। এদিকে নৃত্যের উদ্দামতা বেড়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ বেহুশের মতো ফ্রী স্টাইলে নাচছে। হঠাৎ উঠে এলো বাসন্তী শাড়ী পরা এক যুবতী। সে এক মুহূর্তও দেরী না করে যুবকদের সাথে যোগ দিল। দশ যুবক ও এক যুবতীর উন্মাতাল নৃত্য। মেয়েটি যুবকদের একজনের দু'হাত ধরে নাচে বিভোর। ওদিকে দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা

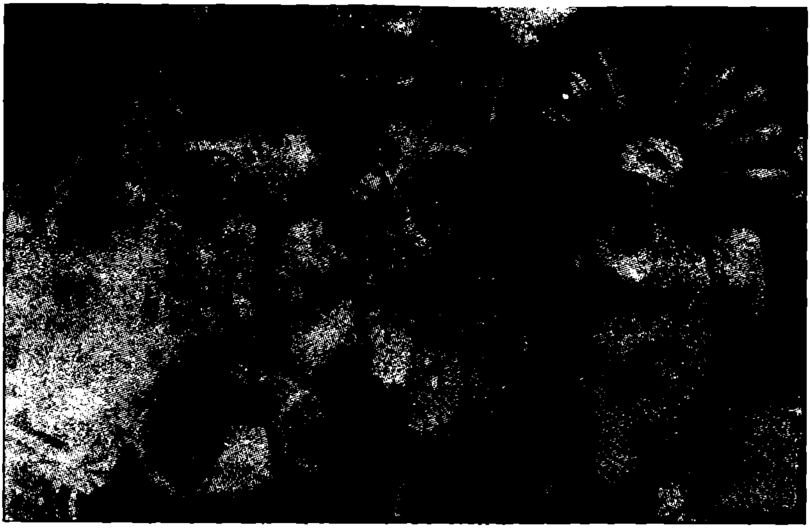

পহেলা বৈশাখ চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরা বিজাতীয় সাজে বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করেছে

www.pathagar.com

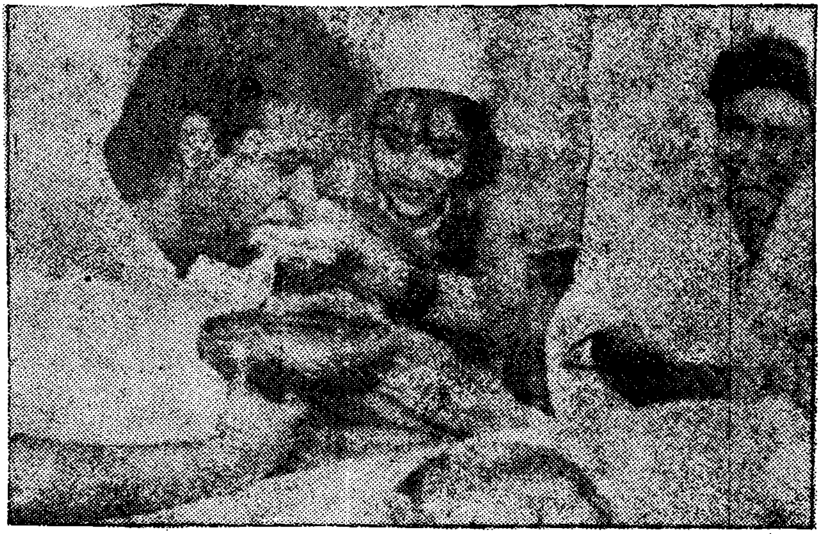

তরুণটি পরম প্রশান্তিতে পরনারী সুখ স্পর্শমোদিত সেই পান্তা সোল্লাসে গিলছে

বাড়ছে। বাজনার গতি এখন আরো বেশী। যুবক-যুবতী যুগল যেন কাল-বৈশাখীর চেয়েও উতাল-পাথাল। তারা ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। .... কিন্তু না ক্লাইমেক্সে পৌঁছা গেল না। 'বেরসিক' ড্রামবাদক বাজনা থামিয়ে দিয়েছে।

পয়লা বৈশাখ সকাল ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের এটা একটা দৃশ্য মাত্র। বিকেল ৫টায় এখানকার লিচু তলায় বানরের বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়।

সকালে চারুকলার ছাত্র-ছাত্রীরা নানা ধরনের কিম্ভূতকিমাকার মুখোশ পরে শোভাযাত্রা বের করে। তবে গত দু'বছরের তুলনায় এবার জন্তু-জানোয়ারের বেশ ধারণের মাতামাতি ছিল কম। বাংলা বর্ষের প্রথম দিনের ভিড়ে এবারও বেশ কয়েকজন যুবককে দামী ধবধবে ধুতি পরে আয়োশ করে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। চারুকলা ইনস্টিটিউট অঙ্গনেই এদের আনাগোনা ছিল বেশি।

রমনা পার্কসহ বিভিন্ন স্থানে দেদার পোস্টার মেলে বসেছিল হকাররা। তবে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য কিংবা আমাদের ইতিহাসের স্মরণীয় নায়কদের প্রতিকৃতি নয়। এগুলো ছিল বোম্বের জুহি চাওলা, সঞ্জয় দত্ত, অঞ্জু ও সুনীল শেঠীর মতো ফিল্মী নায়ক-নায়িকাদের বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি।

বৈশাখী মেলায় আরেকটি পোস্টার বিক্রি করতে দেখা গেছে। 'বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ' এই পোস্টার বের করেছে। দাম দশ টাকা করে। এতে ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি রয়েছে ৭ জন মহিলার। এঁদের মধ্যে বেগম রোকেয়ার সাথে আছেন ঘাদানি নেত্রী জাহানারা ইমাম ও সুফিয়া কামাল, কমিউনিস্ট নেত্রী মনোরমা বসু (মাসিমা) ও ইলা মিত্র এবং সূর্যসেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন অভিযানের সহকর্মী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত। মনোরমা ও কল্পনা সম্প্রতি কলকাতায় মারা গেছেন। ইলা

www.pathagar.com

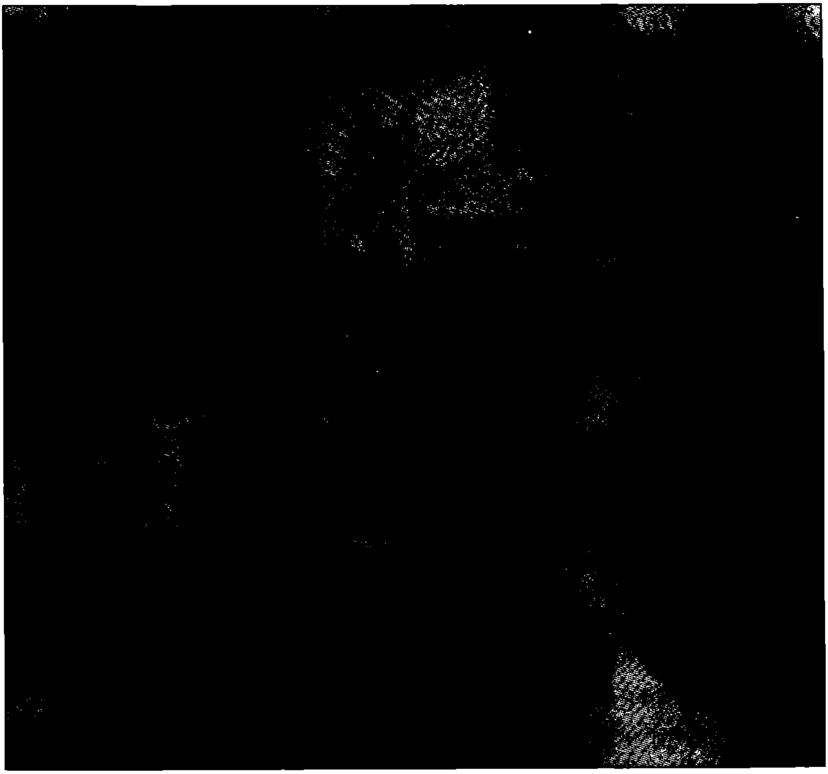

রমনার বটমূলে অশুভ নোংরা হাতের টানে বিপন্ন নারী। বিপন্ন রুচি

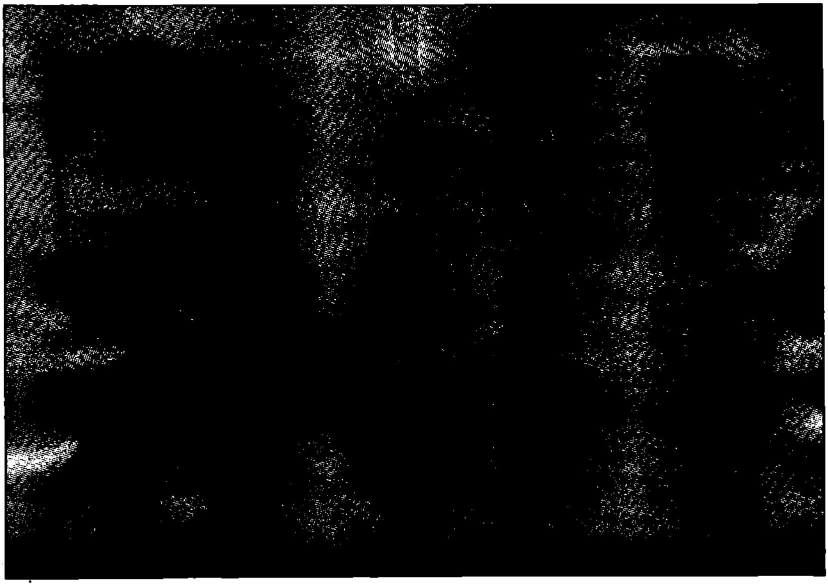

www.pathagar.com

মিত্রও এদের মতো ভারতের নাগরিক। সকাল সাড়ে ১০টায় খেলাঘর আসরের ভ্যান মিছিল শাহবাগ মোড় হয়ে টিএসসির দিকে যায়। ৮টি ভ্যানে নানা সাজে শিশুরা অভিনয় করছিল। কেউ বর কনে, কেউবা চাষী, জেলে, গৃহবধূ প্রভৃতি সেজেছিল। একটি ভ্যানে বসা ছিল মুসলিম, হিন্দু ও খৃস্টানের সাজে তিনটি শিশু। মুসলমানের মুখে ছিল লম্বা দাড়ি। গ্রামের বিয়ের অনুষ্ঠানেও টুপি দাড়ি শোভিত কয়েকজন ছিল।

এই আকর্ষণীয় শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য দেখে অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে। একটা ভ্যানে একজন মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরণে পাজামা-পাঞ্জাবী, মাথায় টুপি, মুখে সুন্দর দাড়ি। বুকে লেখা– 'রাজাকারমুক্ত বাংলাদেশ চাই'। তার পাশেই মেথরাণীর স্টাইলে উঁচু করে শাড়ী পরিহিতা একটি মেয়ে ঝাঁটা হাতে দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ সে রাজাকারকে সমুচিত শাস্তি দিচ্ছে। কিন্তু সাধারণ দর্শকদের জিজ্ঞাসা, এসব পোশাকে কি রাজাকারের নাম করে এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, তথা মুসলিম সমাজের ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে অবাঞ্ছিত কটাক্ষ করা হচ্ছে না? নাকি আলেম সমাজকে পাইকারীভাবে হেয় করাই সাবেক সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গ সংগঠনতুল্য খেলাঘরের মতলব?

এর আগে সানরাইজ প্রি-ক্যাডেট এন্ড হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ট্রাকযোগে নগরীর বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করে। গানগুলোর একটি ছিল কৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক। এর মধ্যে বার বার গাওয়া হয় এই পংক্তি 'পরজনমে তুমি হইও রাধা'।

নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশ বলে দাবীদার আমরা এ কোথায় চলেছি? আমাদের মনে রাখতে হবে অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, উভয়েই সমান পাপী। উভয়কে একই কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

বৈশাখের প্রথম প্রভাতে রমনা পার্কে এবং সংলগ্ন সড়কে পান্তা ভাতের বেশ ক'টি দোকান বসেছিল। কোনোটার নাম 'ছলিট (সলিড?) পান্তা' কোনোটার 'ক্যাফে পান্তা'। আইটেম ছিল শুঁটকিসহ বিভিন্ন ভর্তা এবং পেঁয়াজ-কাঁচা লংকা। কেউ কেউ আলু ভর্তা, এমনকি ইলিশ ভাজারও আয়োজন করেছিল। বাঁধাধরা দাম ছিল না। এক বাসন পান্তা খাইয়ে ৮০/৯০ টাকাও আদায় করা হয়েছে। খদ্দের ধরার জন্য কোনো কোনো স্টলে আধুনিকা তরুণীরা ছিল ব্যস্ত। কিন্তু মেলায় আগত লোকজন পান্তার বদলে ফান্টাসহ কোল্ড ড্রিংক, কেক, আইসক্রীম, চা প্রভৃতির দিকে আগ্রহী ছিল অনেক বেশি। যুবকের সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো। এর পাশাপাশি অত্যন্ত উগ্র পোশাকে বহু কিশোরী ও তরুণী ঘুরে বেড়িয়েছে। টাইট জিন্স প্যান্ট এবং খাটো গেঞ্জি কিংবা ইন করা শার্ট পরিহিতা এসব মেয়ের অনেকে এসেছিল মা-বাবার সাথে।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, রমনা পার্ক, শাহবাগ মোড়, শিশুপার্ক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, টিএসসি প্রভৃতি স্থানে এক ডজনের বেশি মঞ্চ থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীতের পাশে যে গানটির প্রাধান্য ছিল, তাহলো 'সাধের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী'। চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে লুঙ্গি মিছিল ও কল্কে মিছিল বের হয়। এক পর্যায়ে কয়েকজন তরুণ সড়কের মাঝখানে কচি আম-কাঁঠাল দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজার ভঙ্গীতে কৌতুক করছিল।

www.pathagar.com

আরেকটি জাতীয় দৈনিকের ২৭ এপ্রিল '৯৪ তারিখের ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

"রমনা বটমূলের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে যে কলঙ্কময় অধ্যায়ের সূচনা, তা বিবেকবান প্রতিটি মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। সেখানে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তা পাশ্চাত্য সমাজে হয়তো দোষণীয় নয়, কিন্তু আমাদের বাঙালি সমাজে তথা বাঙালি সংস্কৃতিতে কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। যেভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে কাকরাইল মসজিদের কাছে নববর্ষের অনুষ্ঠানে আগত রিকশা আরোহিনী যুবতীকে পরিচিত এক যুবক

পহেলা বৈশাখের সকালে কতিপয় যুবক-যুবতী ধুতি পরে, কপালে সিঁদুর তিলক কেটে, গলায় রুদ্রাক্ষরের মালা জড়িয়ে রাধা-কৃষ্ণ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সাজে ঢোল-করতাল-মন্দিরা বাজিয়ে আর উদ্বাহু নেচে-গেয়ে দলে দলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঘুরে বেড়ায়

www.pathagar.com

অতর্কিতে তার দুই গালে চুমু দিয়েছিল, তা আমাদের সমাজের সাথে কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। শুধু আরও লাঞ্ছনার ভয়েই সেদিন সেই যুবতী কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনি। দেশের যুব সমাজের এই অবক্ষয়ের মূল কারণ কি তা আমাদের তলিয়ে দেখা উচিত। এর জন্যে দায়ী কারা? নিশ্চয়ই যারা যুব সমাজকে নিজেদের ব্যক্তি বা রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে থাকেন, তুলে দেন তাদের হাতে অস্ত্র, অর্থ ও অন্যান্য উপাদান, তারাই কি মূলতঃ এর জন্যে দায়ী নন?

আমাদের দেশে বর্তমানে দু'টি আগ্রাসনই প্রবল। একটি বাঙালী সংস্কৃতির নামে ভারতীয় আর্যামি। এর মধ্যে রয়েছে ভোগবাদ পুতুল পূজা ও যৌন বিকার। আর অন্যটি হচ্ছে আধুনিক সংস্কৃতির নামে পাশ্চাত্য ইউরোপীয় সংস্কৃতি। এর মধ্যে রয়েছে ভোগবাদ ও উৎকট যৌন বিকৃতি। যার প্রতিফলন বাংলা ও ইংরেজী নববর্ষসহ অন্যান্য বিশেষ দিনগুলোর অনুষ্ঠানে আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

বছর দুয়েক যাবত শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইংরেজী নববর্ষ বরণের উন্মাসিকতা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সাল মাস ও বার ব্যবহার হয়ে থাকে ব্যবসা বাণিজ্য ও নানা কাজকর্মে। আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনেও এ গণনা বা হিসাব অনেক দেশেই তা প্রচলিত। আমরা বাংলাদেশীরাও তা ব্যবহার করছি। কিন্তু বাংলাদেশের সংস্কৃতির সাথে এর কোনো যোগসূত্র নেই।

১লা বৈশাখ আসলে বটতলায় গিয়ে তরুণীর হাতে ইলিশ পান্তা খেয়ে এবং নারী পুরুষের ঢলাঢলি করে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির অনুসরণে নববর্ষ উদ্‌যাপন করে তথাকথিত প্রগতিবাদীরা একদিনের জন্য বাঙালী সেজে যান। বৈশাখ চলে গেলে বাংলা মাসের দিন তারিখের সঠিক হিসাবও রাখে না এরা। বারো মাস চাইনিজ হোটেলে আধো আলোতে জোড়ায় জোড়ায় স্যুপ খায়। আবার এসব ভেজাইল্যা বাঙ্গালীরা ইংরেজী নববর্ষে রাত ১২-১ মিনিটে রাজপথে পটকা আর বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বঙ্গ ললনার কটিদেশে হাত রেখে নৃত্যের তালে তালে মদ্য মাতাল হয়ে ইংরেজী নববর্ষকে গ্রহণ করে। '৯৬ সালের ইংরেজী নববর্ষ উদ্‌যাপনে মাতাল বাঙ্গালী তারুণ্যের সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সংক্ষেপে তা হলো-

খ্রীষ্টীয় নববর্ষ '৯৬ উদ্‌যাপিত হলো। এ দিবসটি পালনের মাহাত্ম্য দেখাতে গিয়ে আজকের প্রজন্মের তরুণ-যুবা ঘর ছেড়ে বাইরে এলো। রকমারী মদের ক্যান হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে, পাড়া-মহল্লায়, হোটেলে, বারে সারারাত চললো মাদক নৃত্য। নববর্ষের শুভেচ্ছাস্বরূপ পাওয়া গেল সুরা-সাকীর রঙ্গ-তামাশা, হোটেল, বারে, মুক্ত সড়কে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার হাজারো দৃশ্য সেদিন ধরা দিলো কারো কারো অনুসন্ধানী চোখে। মাতলামির দায়ে ঢাকার রাস্তা থেকে পুলিশ তুলে আনলো সেদিন অন্তত শ'খানেক নেশায় বুঁদ হওয়া পাবলিক।

যে মুহূর্তে দেশে চলছে রাজনৈতিক সংকট, আর্থ-সামাজিক অস্থিরতা ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়, দৃশ্যটি সে সময় যদিও বিঘ্নিত হবার মতো কিছু নয়, কিন্তু দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ছাত্র, যুবক এবং আজকের তারুণ্য এতটা তাদের চিরায়ত ঐতিহ্যের পথ পরিক্রমায় কালিমা লেপন করে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে গা ভাসিয়ে দেবে তা

www.pathagar.com

জাতি কোনোভাবেই আশা করতে পারে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নববর্ষ পালন করতে গিয়ে মাদক নৃত্যের পাগলপারা দৃশ্য সেদিন দেশবাসীকে উপহার দিলো তা নিঃসন্দেহে বহু ঐতিহ্যের গর্বিত গালে চপেটাঘাত করার শামিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে ফ্লোরে ফ্লোরে মদ খেয়ে গণমাতলামী সেদিন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী নীরবে প্রত্যক্ষ করেছে। দৃশ্যটি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই

(১) নববর্ষের প্রথম প্রহরে উচ্ছ্বসিত তরুণরা নগরীর রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি নিয়ে ঘুরে মদ্যপান করে। (২) গুলশান এক নম্বরে মাইক্রোবাস থেকে বিদেশী পিস্তলসহ পুলিশ গ্রেফতার করছে এক যুবককে। (৩) যুবকদের রাস্তায় রাস্তায় আতশবাজি। (৪) নগরীর রাজপথে উদ্যাম নৃত্যরত যুবকদল। (৫) গুলশান এলাকায় বিভিন্ন মোড়ে পুলিশ গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালায়। (৬) উল্লসিত তরুণরা নববর্ষের রাতে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। (৭) মহানগরী পুলিশ নববের্ষর দ্বিতীয় প্রহরে নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করা বিদেশী মদের বোতল ও ককটেল একত্রিত করছে।

www.pathagar.com

নয়, ক্যাম্পাসের বাইরে, পাড়া, মহল্লায় এমন কি উন্মুক্ত রাস্তায় সেদিন মদে মাতাল তারুণ্যের ঘটেছিল আকস্মিক বিপর্যয়।

একটি জাতীয় দৈনিকের ভাষ্যকার বলেন, সে এক লোমহর্ষক দৃশ্য। হোটেল সোনারগাঁর অনতিদূরে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্রই পটকা আর বোমার বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের সেকি বিকট আওয়াজ! মনে হলো চতুর্দিকে প্রলয় কান্ড শুরু হয়েছে। সারা আকাশ জুড়ে আগুনের লেলিহান। শূন্য উড়ে চলছে ছুটন্ত আগুনের ফুলকি। বাইনোকুলারে চোখ রেখে দেখা গেল, অদূরে প্রচন্ড বিস্ফোরণ। পাকানো ধোঁয়ার বিশাল কুন্ডলী নীলাভ আকাশকে নিকষ অন্ধকারে ঢেকে দিচ্ছে। সে এক বলিহারী দৃশ্য! এতে রাত জাগা নগরবাসী আতংকে কুঁকড়ে গেলেও 'চেলারা' উল্লাসে পাগলের হাসি হেসেছে। নাচে-নাচে চিৎকার দিয়ে ঘোষণা করছে 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'।

দেশের একশ্রেণীর তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী বিকৃত রুচির বুড়ো খুকো-খুকীরা বর্ষবরণটা এভাবেই করেছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী উচ্ছৃঙ্খল এ শ্রেণীটি পূর্ব থেকে ওঁৎ পেতে বসে ছিল, কখন থার্টি ফার্স্ট নাইট শুরু হবে। অনেক বিলাসী পুঁজিপতি ভোগ আর পেয়ালায় উন্মাতাল কাটিয়েছে রাত। এ জন্য চিত্রজগতের উঠতি নায়িকা, মেদবহুল এক্সট্রা, তথাকথিত মডেল তারকাসহ একশ্রেণীর সোসাইটি গার্লদের আগেভাগেই বুক করে রাখা হয়েছিল। হালের এক নম্বর খেতাবধারী এক ব্যস্ত নায়িকার নাম উল্লেখ করে রিপোর্ট করা হয়, এ নায়িকা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে কোটিপতির বাহুলগ্না হয়ে রাতটি খুব এনজয় করেছে। এভাবে বিত্তবান বিকৃত রুচির কিছু নারী-পুরুষকে এনজয় দিতে 'থারটি ফার্স্ট নাইটে' রাজধানীর বড় বড় হোটেল, চাইনিজ রেস্তোরাঁ আর বিলাসবহুল ভবনগুলো ছিল সরগরম। এক কথায় এসব প্লেসে তারা বিট আর ড্রামের তালে তালে সারারাত নেচেছে, খেয়েছে, পান করেছে– করেছে ভোগ। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে বা ঈদ, পূজা-পার্বণে মিষ্টির দোকানে যেমন আগেই বুক লিস্ট করতে হয়, তেমনি 'নাইনটি সিক্স'কে বরণ করতে যেয়ে মানুষ, বিদেশী মদ আর বিয়ারের ক্যান আগেভাগেই রিজার্ভ রাখতে হয়েছে। আর্জেন্ট কোনো অর্ডার ফলো করা সম্ভব ছিল না। তারপরও অতিরিক্ত যোগান রেখেও সামাল দেয়া যায়নি। মনে হয় বুড়িগঙ্গার সবটা লাল পানি বানালেও টান পড়তো।

পাঁচতারা আর বিলাসবহুল এলাকার হোটেল বারগুলোতে নাকি যুগল ছাড়া প্রবেশাধিকার ছিল না। কারণ নেশায় বুদ মাতাল যখন দেখবে পাশেই লাল ঠোঁট ফাঁক করে বেসামাল নগ্ন তরুণী কলকলিয়ে যুগল নাচ নাচছে, সাদা দন্ত বের করে কাঁচভাঙ্গা হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছে– তখন সিঙ্গেল মাতাল ডিস্টার্বস্ তো বটেই। তাই পরিবেশ নির্ঝঞ্ঝাট রাখতে যুগলের সিস্টেম। আর সেই তিনি– বউ হোন, শ্যালিকা হোন, বান্ধবী হোন আর বাজারী বেশ্যাই হোন– যুগল হলেই হলো। সেখানে যুগলের কোনো বৈধ-অবৈধতা নেই বরং ফ্রি সেক্সই তাদের লিগালাইজেশনের সনদ!

পাশ্চাত্য স্টাইলে একশ্রেণীর দম্পতির মাঝে আবার সেক্স চেঞ্জিং-এর ব্যামো আছে। নিজেরটা অন্যকে দিয়ে, অন্যেরটা নিজে না নিলে নাকি বেডসীন উপভোগ্য হয় না; জাতে উঠা বেমানান, স্মার্ট আর প্রগতিশীল হওয়া যায় না। সে যাই হোক, বর্ষবরণের

www.pathagar.com

বসন্ত বরণের নামে (পহেলা ফাল্গুন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনস্টিটিউটে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর কতিপয় তরুণ-তরুণী পরস্পর পরস্পরের মাথায় ও মুখে সিঁদুর ও চন্দনের তিলক পরিয়ে, উল্কি কেটে, গায়ে রং মেখে সঙ সেজে দৃষ্টিকটুভাবে নাচানাচি করে বেড়ায়

নামে এমন সব বিচিত্র ঘটনা সে রাতে ঘটেছে যা সভ্য ভাষায় প্রকাশ করাও অসভ্যতা।

কায়-কারবার শুধু চার দেয়ালের ভেতরেই হয়নি; রাজপথ, ট্রাম-বাস, বাসার ছাদ, বড় রাস্তার মোড়, পার্কের নিয়নবাতির ফাঁক-ফোঁকর আর পবিত্র শিক্ষাঙ্গন- সর্বত্রই হয়েছে। মোটকথা তথাকথিত শিক্ষিত ও বিত্তবানদের যেখানে বাস সে সব এলাকায়ই উচ্ছৃঙ্খল তরুণ-তরুণীরা বাঁদর নাচ নেচেছে। সাথে সাথে পটকাবাজি বোমাবাজি করেছে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বরাবরের মতো এবারও বর্ষবরণ হয়েছে। বরণ কালচারের নামে সেগুলোতে যা হয়েছে তার সব কলমের খোঁচায় প্রকাশ করা যাবে না। সন্ধ্যার পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীরা হুড়োহুড়ি শুরু করে। তবে যেই বেজেছে রাত ১২টা ১ মিনিট, শুরু হয় বিকট শব্দ, চেঁচামেচি, চিৎকার-শৎকার, আর হৈ-হুল্লোড়। এসবই নাকি তারুণ্যের দুর্বিনীত উল্লাস। হোন্ডা, টেক্সি, রিকশাভ্যানে চড়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে প্রথমেই এক পশলা ক্যাম্পাসকে রাউন্ডআপ করা হয়। অতঃপর টিএসসিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুরু হয় গান। ইতোমধ্যেই দর্শকদের(!) শরীর নাচানো, বুক কাঁপানো, কোমর দোলানো শুরু হয়ে গেছে। ওদিকে বাজি, পটকা আর ককটেল তো ফুটেছেই, সাথে সাথে বোমা-গুলিও ফুটছে। রাতের সুনীল অন্তরীক্ষ জোছনাকে ম্লান করে জানান দিয়েছে বুলেটের শব্দ। সুযোগের সদ্ব্যবহার অনেকভাবেই হয়েছে। ফাঁক-ফোকরে পুরাতন 'মালগুলা' জালাই করে নেয়া হয়েছে।

আবাসিক-অনাবাসিক কিছু মেয়েও এ উদ্যমতায় পিছিয়ে ছিল না। বলতে গেলে তারা ছিল আরও ফার্স্ট। মেয়ে হলগুলোর আশপাশ, জাতীয় কবির মাজার, টিএসসি এলাকাই যৌবনের উদ্যমতা প্রকাশের ছিল উপযুক্ত স্থান। কেউই যেন ঘরে ফিরতে রাজি নয়। সবাই একে অন্যের মাঝে লীন হতে চায়। হারিয়ে যেতে চায় সুখের বন্যায়(!) কোনো দূর অরণ্যে। রাত ১০টার পর কিছু মেয়েকে হোস্টেল সুপাররা বলে-কয়ে 'গরের মেয়ে ঘরে' নিয়ে যায়। অনাবাসিক হওয়ার বাহানায় অনেকে আবার 'রাধা-কৃষ্ণের' পালা দিতে জোছনার চাদোয়ার নিচে প্রকৃতির শ্যামল কাঁচা ঘাসের মখমলকেই

www.pathagar.com

'চন্দন পালংক' বানিয়ে রাত কাটায়। শীত আর শীত নেই। উষ্ণতায় সবাই বেসামাল। 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'। প্রাচ্যের অক্সফোর্ট খ্যাত এই ছিল বর্ষবরণের ঢা. বি. স্টাইল!!

এ অবস্থা রাজধানীর প্রায় সর্বত্রই ছিল। গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, বনানী, ধানমন্ডি, মগবাজার, সিদ্ধেশ্বরীসহ অন্যান্য স্থানে প্রকাশ্যে তরুণ-তরুণীরা কোথাও দল বেঁধে কোথাওবা জোড়ায় জোড়ায় বিয়ারের ক্যান হাতে হেলে দুলে নেচেছে, গেয়েছে। পরিচিত-অপরিচিত যাকে পেয়েছে তাকেই জড়িয়ে ধরেছে, চুমু খেয়েছে- পটকা আর বোমার বিকট বিস্ফোরণে উল্লাস প্রকাশ করেছে।

সবচেয়ে জংলী আচরণ করা হয়েছে গত ২০০০ সালের থার্টি ফার্স্ট নাইটে টিএসসির সামনে অতি আধুনিকা শাওন আক্তার বাঁধন নামে এক তরুণীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফজলুল হক রাসেলের নেতৃত্বে একদল নরপশু লাঞ্ছিত করে। এদের মধ্যে ৮ জন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং কয়েকজন বহিরাগত। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, সেই রাতে বাঁধনের চাল-চলন মার্জিত ছিলো না। সে তার বন্ধুদের সঙ্গে খুব উগ্র ও অশালীনভাবে চলাফেরা করছিলো। রাত দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে তারা টিএসসিতে আসে। টিএসসিতে এসে জোরে জোরে বলছিলো নাচের পার্টি থেকে এসেছি- আজ টিএসসির সবাইকে নাচাবো। হাত উঠিয়ে সে বিভিন্নজনকে হাই-হ্যালো বলে থার্টি ফার্স্ট নাইটের শুভেচ্ছা বিনিময় করছিলো। হঠাৎ হ্যালো বলে বাঁধনের সঙ্গে হ্যান্ডশেখ করতে এগিয়ে যায় কয়েকজন যুবক। কিন্তু বাঁধন তাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেখ না করে পাশ কাটিয়ে যায়। অশ্লীল ভঙ্গিতে সে তার বন্ধুদের সঙ্গে টিএসসি এলাকা প্রদক্ষিণ করতে থাকে। তার এই অশালীন বিচরণ পুরো টিএসসি এলাকা উত্তেজিত করে তোলে। এই সুযোগে বখাটে তরুণরা পিছু নেয়। বাঁধনের সন্দেহজনক চলাফেরা রাসেল ও তার মদ্যপ বন্ধুদের আরো মাতাল করে তোলে। এক পর্যায়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁধনের উপর। প্রথমে শাড়ি ধরে টানাটানি এবং পরে ব্লাউজ, পেটিকোট খুলে পুরোপুরি বিবস্ত্র করে ফেলে বাঁধনকে। ওই সময় ঘটনার অদূরে পুলিশ নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে থেকে ঘটনা উপভোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করে। বাঁধন হেল্প হেল্প বলে চিৎকার করলেও পুলিশ তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেনি। এ সময় বাঁধনের বন্ধু জিল্লুর রহমান চিৎকার করে বলতে থাকে প্লিজ আমার বউকে বাঁচান। কিন্তু বাঁধনকে উদ্ধার করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। রাসেল ও তার বন্ধুরা ল্যাং মেরে বাঁধনকে মাটিতে ফেলে দেয়। তারা হিংস্র উন্মত্ততায় মেতে ওঠে। এই আদিম খেলা ১০/১৫ মিনিট ধরে চলতে থাকে। তারপর টহল পুলিশ উদ্ধার করে বাঁধনকে তুলে নেয় পিকআপ ভ্যানে।

আনন্দ বলতে তথাকথিত সভ্য সমাজের বেহায়াপনা নয়, মুসলমানদের আনন্দ সত্যি আনন্দ। ভদ্রতা, শালীনতার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয় মুসলিম উম্মাহর নববর্ষ উৎসব। তাদের আনন্দ করে না মানবতার সীমা লংঘন। বর্তমান সভ্য দুনিয়ার নববর্ষ উৎসব হচ্ছে পহেলা জানুয়ারি। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের নাগরিকগণ এই উৎসব পালন করে থাকেন। তাদের আনন্দ তো আনন্দ নয়, বরং মাতালের মাতলামী যেন 'কে কত বড় পাঁড় মাতাল হতে পারে' তার প্রতিযোগিতার হাট বসে। তাদের আনন্দে থাকে না কোনো সুশৃঙ্খল। বাধা-বন্ধনহীন উৎসবীরা ইনসানিয়াত নয়, বরং ইনসানেরই বারোটা

www.pathagar.com

পহেলা ফাল্গুন বসন্তের নবীন আনন্দে মহিলারা লাল পেড়ে হলুদ রঙের শাড়ী পরে হলুদ গাঁদা ফুলের মালা গলায় দিয়ে বরণ করছে ঋতুরাজকে

বাজিয়ে ছাড়ে। এ ওর শরীরে রং ছিটিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। ফলে ভদ্র সমাজের ভদ্র লোকের ভদ্র চেহারা হয়ে উঠে অভদ্রের মতো। দল বেঁধে হৈ-হুল্লোড় করে ভিড় জমায় মদিরা গৃহে। হাতে হাতে তুলে নেয় ব্রান্ডি, জিন, হুইস্কি ও বিয়ারের বোতল। চিয়ার্স বলে শুরু করে দেয় সুরা পান বোতলের পর বোতল নিঃশেষ হতে থাকে। মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যাওয়ায় অনেকে সেখানেই পটল তোলে। সে সমাজের লোকেরা উৎসব করতে গিয়ে পশুর মতো স্বীয় জীবনকে বলী দেয় তাদের সভ্য বিশ্লেষণে কিভাবে বিশেষিত করা হয় তা বোধগম্যের বাইরে। যারা সভ্যতার কলংক তারাই আজ বিশ্বের সভ্য বলে পরিচিত। সভ্যতার প্রকৃত সংজ্ঞাই বুঝি আজ পাল্টে গেছে। বাঙালী সমাজের নববর্ষের উৎসব অন্যদের চেয়ে ভিন্ন রকম। ভিন্ন স্বাদের। এদের নববর্ষের আনন্দোৎসব অনেকটা পূজোর শামিল। ফলশ্রুতিতে বিপাকে পড়ে গেছে এ অঞ্চলের মুসলিম জনতা। মুসলমানদের মধ্যে যারা প্রথমতঃ মুসলিম পরে বাঙালী, এ উৎসবে তারা অংশ নেন না। পক্ষান্তরে যারা প্রথমত বাঙালী, ইসলাম যাদের কাছে গৌণ সাধারণতঃ তারাই এ উৎসবে অংশ নিয়ে থাকে। তাদের জন্য মারাত্মক ভয়ের কারণ রয়েছে। হাদীসের ভাষ্য মতে, সাদৃশ্য হেতু হাসরও বিধর্মীদের সাথে হবে। সুতরাং ঠাকুর, ঘোষদের সাদৃশ্য হেতু এ জাতীয় মুসলমান নামধারীদের হাসরও হবে তাদের সাথে। প্রশ্ন হতে পারে, বাঙালীদের উৎসব আমরা বাঙালীরা পালন করবো এতে অবৈধতার কি আছে? তবে তাদেরকে আমি বলবো সৌদিতে যেসব হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান আছে তারা কি কখনও মুসলমানদের নববর্ষের উৎসব পালন করেন? কিন্তু আমরা বিজাতীয় অনুসরণে তা করছি।

www.pathagar.com

ভিন্ন সম্প্রদায় দেবতার জন্য না হয় নগ্ন বসনা নারীর প্রেমার্ঘ্যে প্রয়োজন আছে, দেব-দেবীমূলে নর-নারীর বেসামাল নৃত্য, মাতাল যুবক-যুবতীর বিকৃত লীলা কর্মে না হয় ঈশ্বর পুলকিত হন, পরিতৃপ্তি বোধ করেন। কিন্তু আমরা যারা এক আল্লায় বিশ্বাসী তাদের ছেলে-মেয়েরা ওই কর্মগুলো কোন্ দেব-দেবীর অর্চনায় নিবেদন করেন? 'নিজের কান কেটে পরের বাপের শ্রাদ্ধ' করার গ্রামীণ প্রবাদ দীর্ঘদিনের পুরনো। এখন দেখছি আধুনিকতা আর প্রগতিশীলতার ব্যাপারে সর্বত্র সে কর্মগুলোই হচ্ছে!

আত্মবিক্রিত মানুষের পরিণতি সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা পাক কোরআনের সূরা কালামের (২ঃ৪৪) আয়াতে স্পষ্টতই বলেছেন– "যারা এ কোরআনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদের এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা জানতেও পারবে না। আমি তাদের সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।"

কনসার্ট

আজ থেকে চৌদ্দ শ' বছর আগে নবী করীমের (সঃ) ইসলামের দাওয়াতের প্রভাব ও প্রসারতা যখন কোরাইশদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রোধ করা গেল না তখন তারা ইরান থেকে রুস্তম ও ইসফেন্দিয়ারের বাহিনী সংগ্রহ করে এনে গল্প গানের চর্চা শুরু করে দেয়। গায়িকা দাস-দাসীদের নিয়ে গীতবাদ্যের ব্যবস্থা করে যাতে লোকে এইসব জিনিসে মশগুল থেকে নবী করীমের (সাঃ) কথায় কর্ণপাত না করে। এ প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহপাক এসব বিভ্রান্ত মানুষদের উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন– "লোকদের মধ্যে এমনও কেহ আছে, যে মন ভুলানো কথা খরিদ করে আনে, যেন লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান ব্যতিরেকেই আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে এবং পথটিকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে পারে। এই ধরনের লোকদের জন্য কঠিন ও অপমানকর আযাব নির্দিষ্ট হয়েছে।" (সূরা লোকমান, আয়াত-৬)

এই একই তৎপরতা আমরা লক্ষ্য করছি সমকালীন প্রেক্ষাপটে। প্রতিবছর একশ্রেণীর সাংস্কৃতিক সংগঠন ঝাঁকে ঝাঁকে মমতা কুলকার্নী মার্কা শিল্পী এনে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় নির্লজ্জ নৃত্যের আয়োজন করছে। অনেকের মতে তাদের বেহায়াপনায় দর্শকের চুলকানী সৃষ্টি হয় তাই তাকে লোকেরা মমতা চুলকানী বলে আখ্যা দেয়। নির্লজ্জ এই শয়তানের নগ্নতা প্রদর্শিত হয় অনেক ভিআইপি/ সিআইপি'র সামনে। উচ্চ দরের লোকদের জন্য এনে এই উচ্ছৃংখল যুবতীকে দিয়ে মঞ্চে চার যুবকের সাথে যে ঢলাঢলি, গড়াগড়ি, টানাটানি এবং একে একে সব পোশাক খুলে ফেলে সকলকে উত্তেজনায় উন্মাদ করে দিয়েছিল তা যে কোন রুচিশীল মানুষকে বিস্মিত করে।

সম্প্রতি দেশে পাশ্চাত্যের স্টাইলে চলছে কনসার্ট আয়োজনের হিড়িক। অভিজাত হোটেল বা এলাকায় একশ্রেণীর নারীবাদীরা এই কনসার্টের উদ্যোক্তা। এসব কনসার্টে থাকে বিদেশী যন্ত্রের কানফাটা উচ্চ আওয়াজে বিকৃত সুরে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজী গানের উৎপাত। যন্ত্রের ঝংকারে, গানের সুরে সুরে রং-বেরংয়ের আলোর ঝলকানিতে লম্ফ-ঝম্ফ ও মৃগী রোগীর মতো খিচুনী দিয়ে উচ্ছল তরুণ-তরুণীদের থাকে উদ্দাম নৃত্য। শোনা যায়, তৃতীয় শ্রেণীর এসব ভাড়াটে শিল্পীরা বেশির ভাগ নাচই মেলাতে না

www.pathagar.com

পেরে এ-ওকে দেখাদেখি করে নাচে। এসব কনসার্টের অনুষ্ঠানে নর্তন-কুর্দন দেখে এটাকে অনেকে একটি উচ্চমানের শরীর চর্চার মহড়া বলেই মন্তব্য করেন।

এসব মন্তব্যের সঙ্গত কারণও রয়েছে। জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত কনসার্টে অংশগ্রহণকারী তরুণ-তরুণীদের উদ্দাম নৃত্যের ছবিই বলে দেয় সঙ্গীতের নামে সেখানে কি চলে। একবার তো আলীসা নামক ভারতের তৃতীয় শ্রেণীর এক নায়িকা এই বুনো অনুষ্ঠানে হিন্দি ও ইংরেজী মিলিয়ে প্রায় দেড় ডজন নাচ-গানের মাঝে কৃষ্ণের বাঁশি নিয়ে আহবান জানালেন, 'কাম টু মি, কাম উইথ মানি'। পুরো অনুষ্ঠানটির থীম ছিলো লাভ এন্ড লাভ। আই লাভ ইউ। ইউ লাভ মী। কাম্‌স ভালোবাসার বন্যা বইয়ে দাও সবখানে।

সম্প্রতি শো বিজের ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ মিউজিক্যাল ব্যান্ড এসোসিয়েশন (বামবা) রাজধানীর শাহীন কলেজের খোলা মাঠে আয়োজন করে নগর বাউলদের এক কনসার্ট। মুক্ত পরিবেশে প্রায় ২৫ হাজার তরুণ-তরুণী দর্শক দিনভর উপভোগ করে দেশে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় এই গানের মেলা ব্যান্ড সঙ্গীতের আসর- ওপেন এয়ার কনসার্ট। বামবা'র সদস্যভুক্ত দেশের খ্যাতনামা ১৫টি ব্যান্ড সঙ্গীত গ্রুপ কনসার্টে তাদের বাছাই করা নতুন-পুরনো গান পরিবেশন করে।

সকাল এগারোটা থেকে রাত সাড়ে নয়টা দীর্ঘ দশ ঘন্টার বেশি সময় ব্যান্ড সঙ্গীতের হৃদয়কাড়া শব্দ আর সুরের মূর্ছনায় হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর প্রাণোচ্ছল আনন্দে ফেটে যায় দশটি গান। এই কনসার্ট সম্পর্কে একটি জাতীয় দৈনিকের রিপোর্ট হলো ঃ

সঙ্গীতপ্রেমী হাজারও তরুণ-তরুণী গানের তালে তালে নেচে-গেয়ে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করে। মাঝে মাঝে হাজার হাজার কণ্ঠ এক সাথে গেয়ে উঠে গানের কলি। সন্ধ্যা নামতেই জমকালো আলোকে গানের তালে তালে তরুণ-তরুণীদের উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়িয়ে যায়, খানিকটা আনন্দময় অশ্লীলতায় মেতে ওঠে। কিছু তরুণীর সাজ-পোশাক ছিলো

আর্মি স্টেডিয়ামে বনিএম-এর শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

www.pathagar.com

হোটেল শেরাটনে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ব্যান্ডের তালে তালে নাচছেন সস্ত্রীক ওকাব-এর সদস্যবৃন্দ

পাশ্চাত্যের মতো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতি স্বল্প পোশাক। তারা তরুণদের জড়িয়ে মেতে ওঠে উদ্দাম নৃত্যে। এসব তরুণীদের ঘিরে তরুণ যুবকরা বেলেল্লাপনায় মেতে উঠে। রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত তরুণীদের অশোভন কর্মকান্ড ছাড়া কনসার্টটি ছিলো সঙ্গীতপ্রেমীদের আনন্দক্ষণ। রাতের শিল্পী গানের ফাঁকে বলেন, এখন এখানে কেবল

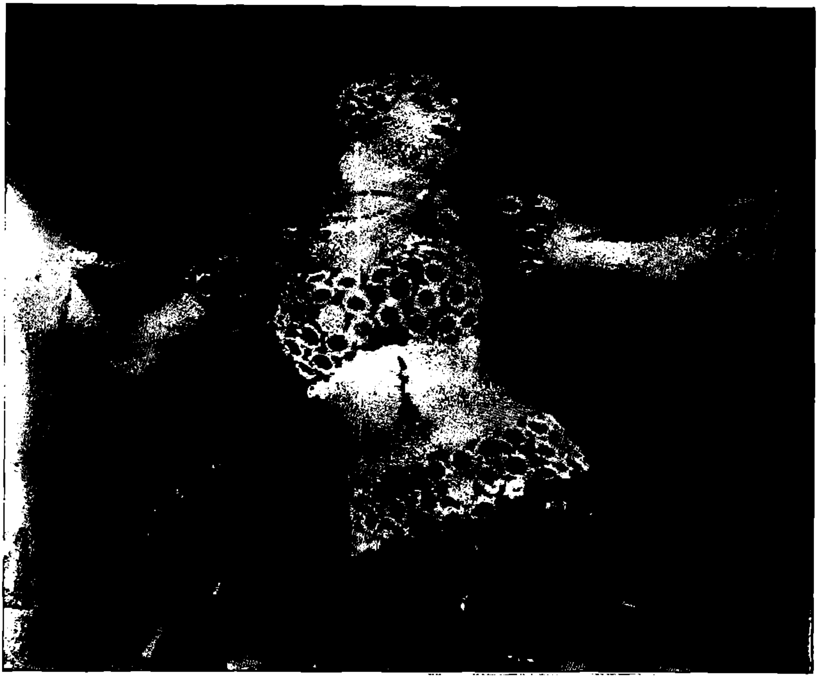

ঢাকা শেরাটনের উইনার গার্ডেনে নৃত্য পরিবেশনরত মমতা কুলকার্নি। যা সভ্য জাতি ধিক্কার জানিয়েছে

www.pathagar.com

মায়া আর মায়া, গভীর মায়া। অতি মায়ায় জড়ানো তরুণীদের কয়েকজন কনসার্টের শেষে মায়াবী তরুণদের খপ্পরে পড়ে। বের হবার পথে গেটে লাঞ্ছিত হয় বেশ কয়েকজন তরুণী। সারাদিন আর সন্ধ্যার পর যে অভিজাত, উচ্চবিত্ত তরুণীরা অশ্লীল আনন্দ প্রকাশ করে, শেষে তারাই অশ্লীলতার শিকার হয় ফেরার পথে প্রচন্ড ভীরের চাপে। কেউ উড়না ছিড়ে নেয়, কেউবা পোশাক হারায়। আর দুপুরে অপ্রীতিকর ঘটনায় আহত হয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইমন, মোয়াজ্জেমসহ কয়েকজন।

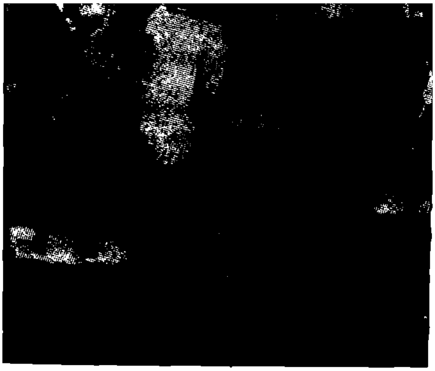
আর্মি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী কনসার্টে তরুণী দর্শকদের উন্মাতাল নৃত্যের দৃশ্য

বেলা ১১টায় শুরু হয় এই দীর্ঘ ও বিশাল কনসার্ট। সকাল ৮টা থেকে গেট খোলা হয়। ৩শ' টাকার টিকেট কেটে ঢুকতে হয় সেখানে। প্রায় ২০ হাজার টিকিট বিক্রি হয় বলে শোন যায়। সকালে রেনেসাঁ ব্যান্ডের নকিব খান 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল' বিজয়ের এ গান দিয়ে কনসার্ট শুরু করেন। এরপর পরিবেশন করেন

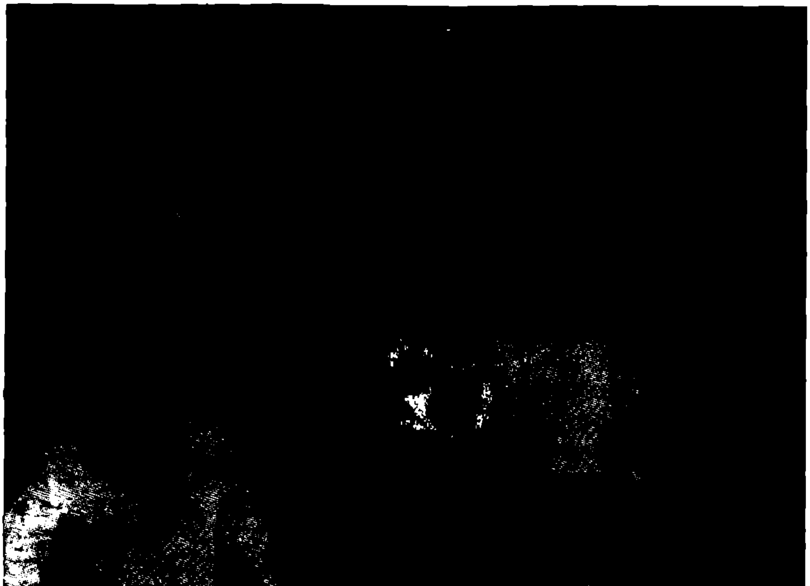
শাহীন কলেজ মাঠে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সাম্বা কনসার্টে বহু তরুণ-তরুণী ব্যান্ড সঙ্গীতের তালে তালে নেচে-গেয়ে উন্মত্ত উল্লাসে মেতে উঠে

www.pathagar.com

কনসার্টে তরুণীরা

'বাংলাদেশ বাংলাদেশ'। পর্যায়ক্রমে ১৫টি ব্যান্ডসঙ্গীত পরিবেশন করে। রাত সাড়ে ৯টায় বামবা সভাপতি হামিন আহমেদের মাইলসের গান দিয়ে কনসার্ট শেষ হয়। অন্য ব্যান্ডগুলো হলো ঃ ফেইথ, ইনসাইট, প্রমিথিউস, সাডেন, চাইম, এলআরবি, ওয়ারফেজ, অবসকিউর, ঢাকা ও মাকসুদ, আরক, উইনিং, হ্যাপিটাচ ও ফিলিংস। সোলসের শিল্পীরা বিদেশে থাকায় অংশ নিতে পারেনি। দীর্ঘ কনসার্টে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে ফিলিংসের জেমসের গান– 'তারায় তারায় রটিয়ে দেবো' এবং 'দুঃখিনী দুঃখ করো না'। (দৈনিক ইনকিলাব, ২৬/১২/৯৭)

এই মিস বাংলাদেশ সুন্দরী প্রতিযোগিতা এবং কনসার্টের সাথে এদেশের মানুষের স্বপ্ন, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং বাঙালীর সংস্কৃতির আদৌ কোনো যোগসূত্র নেই। পাশ্চাত্যে এসব অশ্লীল, বিকৃত ও রুচিহীন অনুষ্ঠান করে তারা কি পাচ্ছে, সে দেশের নারীরা কি পাচ্ছে তা ইতিমধ্যেই তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। সুতরাং সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হলে পাশ্চাত্য বা শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ অনুসরণের সর্বনাশা প্রবণতা রুখতে হবে।

বিজ্ঞাপন চিত্র

বর্তমানে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী তাদের পণ্য বিপণনের উদ্দেশ্যে নারী দেহকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অশালীন এবং অশ্লীল ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন, যা আমাদের নারী সমাজের জন্য মর্যাদার জন্য অত্যন্ত হানিকর। পথে-ঘাটে বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের বিজ্ঞাপনে কখনও অর্ধনগ্ন কখনও প্রায় নগ্ন ছবি ছাপিয়ে বিজ্ঞাপনগুলো আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। বিজ্ঞাপন মডেলিং-এর নামে দেহের রূপ-যৌবনকে পুরুষের চোখের সামনে

www.pathagar.com

পরতে পরতে মেলে ধরে রূপের পসরা প্রদর্শন করে। শাড়ী, গাড়ী, জামা, জুতো, ছাতা, ব্রেসিয়ার, বিস্কুট, সামান্য জেট, ব্লেড, পাউডারসহ বিভিন্ন ভোগ সামগ্রীতে নারীদেরকে ব্যবহার করে বিভিন্ন কামার্ত ভঙ্গীতে অথবা অর্ধনগ্ন অবস্থায় প্রেস, ইলেকট্রিক মিডিয়াসহ প্রতিনিয়ত প্রদর্শন করা হয়। তাদের অপূর্ব ভঙ্গিমায় বিচিত্র হাসি, নগ্নবক্ষ এগুলোকেই বেশি প্রাণবন্ত করা হয়। সুন্দরী তন্বী এবং মনোরম ভঙ্গীতে তোলা নারী মূর্তির প্রতি কে না আকৃষ্ট হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকারা এমন জ্ঞান লাভ করে যা বিজ্ঞাপনদাতাদের অজানা থাকার কথা নয়। মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য নারী দেহের গোপন অঙ্গগুলোকে আকর্ষণীয় করে বিজ্ঞাপনে প্রকাশ নারী জাতিকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছাড়া আর কি হতে পারে?

নারীর দেহ আবৃত থাকবে, এটাই স্বাভাবিক ও শাশ্বত কথা। কিন্তু মুসলিম প্রধান দেশ বাংলাদেশে বিজ্ঞাপনের মডেলে পরিণত করেছে নারীর উদোম দেহকে। কসমেটিক্স তথা প্রসাধনী সামগ্রীর বাজারজাতকরণে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হচ্ছে নারীর দেহ। এছাড়া যে কোন বিজ্ঞাপনেও নারীর নারীর কণ্ঠ ও নারীর দেহকেই বেছে নেয়া হয়। যা কিনা মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিপন্থী। যে নারীর দেহকে আবৃত করে রাখা, পর্দায় রাখা ফরজ, সে নারীর দেহকে যদি উদোম করে অর্ধউলঙ্গ করে রাখা হয়, তাহলে সে সমাজে বা দেশে নারী নির্যাতন, ধর্ষণের কালচার বাড়বে বৈকি? পতঙ্গ যেমন আলোর ফাঁদে জড়িয়ে যায়। তেমনি নারীর দেহের গোপনীয়তা যদি প্রকাশ হয়ে যায়, তাহলে তার সমূহ পরিণতি থেকে নারী ধর্ষণ ঠেকাবে কোন শক্তি?

পতিতা নারীর অবস্থা

নারী নির্যাতনের পয়লা নম্বরের শিকার এ দেশের পতিতারা। মানবতার দৃষ্টিতে এটি একটি জঘণ্যতম পেশা। কেউ স্বেচ্ছায় এ পথে আসে না। নিরুপায় হয়ে মহিলারা জীবিকার সন্ধানে দিশেহারা অবস্থায় কুচক্রী মহলের চক্রান্তে পরিস্থিতির শিকার হয়েই এ পেশায় জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়ে থাকে। এ পতিতাবৃত্তি পেশার অন্তরালে একটি কুচক্রী সমাজ রয়েছে। এরাই নারী সমাজের পয়লা নম্বরের দুশমন। ১৯৮৮ সালের হিসাব অনুযায়ী ঢাকা শহরের পতিতার সংখ্যা ২০ হাজার, সারা দেশে কয়েক লাখ হবে। সরকার এদের লাইসেন্স দিচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এফিডেভিট করে যে কেউ এ পেশায় আসতে পারে। পতিতাবৃত্তি পেশা মানব সমাজের জন্য ক্যান্সারস্বরূপ। কিন্তু নিরাশ্রয় মহিলাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা না করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে যারা ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে মাতৃজাতিকে এ ঘৃণিত পেশায় নিয়োজিত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে মানবতার, জঘণ্যতম দুশমন নরপশু ইবলিস শক্তির এজেন্ট বৈ আর কিছু নয়।

নিম্নবিত্ত কর্মজীবী নারী সমাজ

অর্থের অভাবে অনেক মহিলা ঝি-চাকরানীর কাজ করে। এদের শতকরা ৯৯ জনেরই জান ও মান-ইজ্জতের কোন নিরাপত্তা নেই। অসহায় হওয়ার কারণে তারা অধিকাংশ সময়েই গৃহকর্তা বা বাড়ীর অন্যান্য পুরুষের লালসার শিকার হয়। ছোট

www.pathagar.com

নাবালিকা মেয়েরাও এর থেকে বাদ পড়ে না। অনেক মহিলা ইট ভাঙ্গা, মাটি কাটার কাজ করে। যেহেতু এরা দরিদ্র এবং এদের রক্ষা করার কেউ নেই, এখানেও অনেক সময় নারীরা অসহায়ভাবে নরপশুদের লালসার শিকার হয়। তাছাড়া বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাষ্ট্রিতে মহিলা শ্রমজীবীরা তাদের ন্যায্য মজুরি তো পাচ্ছেই না, অধিকন্তু তাদের ইজ্জত আবরুর কোন নিরাপত্তা নেই। সহকর্মী, কর্মকর্তা, মালিক সবই এদের অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করে। জাতীয় পত্রিকাগুলোতে প্রায়ই এসব খবর ছাপা হয়, মনিবদের জেল-জরিমানাও হয়, কিন্তু নির্যাতন কমে না।

হোটেল ব্যবসায়ীর কবলে নারী

আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের অনুকরণে এমন অনেক অভিজাত হোটেল গড়ে উঠেছে যেখানে খরিদ্দারদের মনোরঞ্জনের জন্যে মেয়ে সরবরাহ করা হয়। কিছু মেয়ে আছে যাদেরকে বাইরে থেকে বেশ ভদ্র শিক্ষিতা এবং ভাল বলেই মনে হয়, কিন্তু তারা এই সমস্ত হোটেল রেস্তোরাঁকে নিজের জীবিকার পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে। সেখানে তাদের উপর অর্থের বিনিময়ে পশুসুলভ আচরণ করা হয়। অনেক ভদ্রবেশী এবং সমাজে খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি, যারা দিনে নারী মর্যাদা, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি মুখরোচক বুলি আওড়ায়, তাদেরকেও দেখা যায় রাতের অন্ধকারে এই সমস্ত জায়গাতে আশ্রয় নিতে এবং এসব সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে।

অভ্যর্থনাকারিণী হিসেবে নারী

বিভিন্ন স্টল, হোটেল, দোকান ও বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে অভ্যর্থনাকারিণী হিসেবে নিয়মিত মেয়েদেরকে আমরা দেখতে পাই। এসব ক্ষেত্রে তারা ক্রেতাদের মনোরঞ্জন করে থাকে। কিন্তু এটা কি নারীত্বের অবমাননা নয়? নিজেদেরকে সাজিয়ে গুছিয়ে মনোরম করে দশজন পুরুষের সামনে তুলে ধরা, বিনিময়ে কিছু অর্থলাভ এটাই কি নারীর স্বাবলম্বিতার স্বরূপ? নারী কি ভোগ্যপণ্য? তাছাড়া একজন নারী কয়জন পুরুষের মনোরঞ্জন করতে পারে? সামান্য দুটো অর্থের বিনিময়ে স্বাবলম্বিতার ভাওতা শ্লোগানে নারী তার যৌবন সাজিয়ে গুছিয়ে অন্যের মনোরঞ্জনে ব্যয় করবে এটা কি নারী নির্যাতনের নতুন পথ নয়?

কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সহকারিণী হিসেবে নির্যাতিতা নারী সমাজ

এদের জীবন যে কতো দুর্বিষহ তা ব্যথিতজন ব্যতীত অন্য কাউকে বুঝানো দুঃসাধ্য। সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা আনার জন্যে নিজেদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করার জন্যে তারা স্বেচ্ছায় এই পেশা গ্রহণ করে। কিন্তু সময়ের গতি পার হতে না হতেই এ পেশা তাদের জীবনের কাল হয়ে দেখা দেয়। কারণ এ পেশায় নিয়োজিত মেয়েরা তাদের দ্বৈত প্রভুর মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হয়ে জীবনে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। স্বামীর কাছেও তারা অবিশ্বাসের কারণ হয় সঙ্গত কারণেই। ফলে শান্তির নীড় পরিণত হয় অশান্তির জ্বলন্ত অঙ্গারে। আর সে অঙ্গারে প্রথম নির্যাতন নারীর কপালেই জোটে।

www.pathagar.com

উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত নারী সমাজের দুরবস্থা

নিম্নবিত্তদের সমস্যা প্রধানত অর্থনৈতিক। তদুপরি তারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকলেও তাদের মানসিক পীড়ন এবং দুর্গতি ও দুরবস্থা যে ওদের চেয়ে কোন অংশে কম নয় তা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। সাজানো ড্রইং রুম আর বাইরের চাকচিক্যের আড়ালে তাদের দীর্ঘ শ্বাস ঢাকা পড়ে না। এইসব উচ্চবিত্ত মহিলা যাদের দেখলে মনে হয় বাহ্যত কোন সমস্যা নেই তারাও অনেক সময় চরিত্রহীন, মদ্যপ, পরকীয়া প্রেমের শিকার স্বামীর হাতে নির্যাতিত হয়। মেয়ে-পুরুষের অবাধ খোলাখুলি মেলামেশা, রেডিও-টেলিভিশনের অশ্লীল অনুষ্ঠান, পত্র-পত্রিকার অশ্লীল সাহিত্য, পর্ণগ্রাফি ইত্যাদির ফলে সৃষ্ট দুষিত পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে অনেক রথী মহারথীই স্ত্রীর প্রতি অবহেলা উপেক্ষা প্রদর্শন করে। এগুলোর ফলে পারস্পরিক আস্থা নষ্ট হয় এবং এ পথ ধরেই এমন মানসিক নির্যাতন নেমে আসে যার পরিণতিতে অনেকে গায়ে আগুন ধরিয়ে বা ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়। এমনকি চাকরাণীর সঙ্গে প্রেম ঠেকাতে গিয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে এমন ঘটনাও এদেশে মোটেই বিরল নয়।

বিউটি পারলার

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাজধানীসহ বড় বড় শহরগুলোতে পাশ্চাত্য স্টাইলে ব্যাঙের ছাতার মতো ম্যাসেজ পারলার বা বিউটি পারলার গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক জীবনে ক্ষুর বড় বিষম বস্তু। অনাদিকাল থেকে ক্ষুরের কাজ অবশ্য ক্ষৌরকর্মই ছিল এবং আছে। ইদানিং মস্তানদের হাতে ক্ষুর উঠে নাগরিক জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। শুধু এখানেই শেষ নয়। ক্ষুর আরও হাত বদলেছে। ক্ষুর উঠেছে এখন নারী সুন্দরীদের (মহিলা নাপিত) হাতে। একজন সুন্দরী মহিলা নাপিতের হাতে নিজের মুখমন্ডল সমর্পণ করে দিয়ে কি আনন্দ তা যিনি পেয়েছেন তিনিই জানেন। আনন্দ বিধুর ক্ষৌরকর্মের একটি মুহূর্ত

www.pathagar.com

পত্র-পত্রিকার সূত্রে জানা যায় এসব বিউটি পারলারে প্রায় ১০ হাজার বিউটিশিয়ান-কাম ম্যাসেজম্যান, কাম পতিতা-বেশ্যা দিয়ে দিনরাত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রগুলোর আলো আঁধারিতে যা হয় তাকে ভদ্র ভাষায় যৌনতা কামুকতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এই বিউটিশিয়ানরা এখানে আসা খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের জন্য অসামাজিক যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে থাকে। এসব পারলারে সাধারণত পুরুষ খদ্দেররাই যান। যাদের মধ্যে রয়েছে ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী এমনকি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। এসব পারলারের খদ্দেরদের কাছ থেকে সময়ের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক নেয়। যেমন ঘন্টায় কোথাও ১শ' টাকা, আবার কোথাও ২ থেকে ৩শ' টাকা পারিশ্রমিক নেয়। এরা তাদের এই অবৈধ কাজগুলো চালিয়ে থাকে একটা মোটা অংকের ঘুষের বিনিময়ে। যার একমাত্র অংশীদার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার লোকজন। এই ম্যাসেজ পারলারের অবৈধ যৌনাচারের কারণে এইডস ভাইরাস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এ সম্পর্কে একটি সংবাদ গত ১৫/৬/৯৫ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সংবাদটি এখানে উদ্ধৃত হলো।

মহাখালী, গুলশানসহ রাজধানীর অভিজাত এলাকায় গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক মানের হোটেলগুলোয় এইডস ভাইরাস আক্রান্ত দেহপসারিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মরণব্যাধি আক্রান্ত এক ব্যক্তি স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের কাছে লেখা চিঠিতে এই তথ্য জানিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক যুবকটি জানিয়েছেন, দু'বছর আগে নাজমা নামের এক মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। প্রায় এক বছরের মেলামেশায় তাদের মাঝে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মেলামেশার সময় নাজমার গোপনাঙ্গ দিয়ে রক্তপাত হয়েছে। পরে সে জানতে পায় তার বান্ধবী ঢাকার বিভিন্ন অভিজাত হোটেলে কখনও নাজমা, কখনও পারভীন আবার কখনও রিতা নামে বহু বিদেশী নাগরিকের সঙ্গে রাত্রি যাপন করেছে।

যুবকটি জানায়, এই ঘটনার পরপরই সে চাকরি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে চলে যায়। সেখানে আট-নয় মাস চাকরি করার পর তার শরীর ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। সে দেশেই বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তার রক্তে এইডস ভাইরাসের জীবাণূ পাওয়া গেছে। এরপরই তাকে সে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয় বলে সে জানায়। সে চিঠিতে উল্লেখ করে, বিদেশে থাকার সময় কোনো খারাপ সংস্পর্শে সে আসেনি। বিদেশে যাওয়ার আগেও শুধুমাত্র নাজমা নামের সেই মেয়ের সঙ্গেই মেলামেশা করেছে। সেই নাজমা বর্তমানে পারভীন নাম নিয়ে কাকরাইলস্থ একটি অভিজাত হোটেলে ভূগর্ভস্থ অংশে প্রতিষ্ঠিত ম্যাসেজ পারলারে যৌন কর্মী হিসেবে কাজ করছে বলে সে জানায়। সৌন্দর্য চর্চা মানুষের শ্বাশত নেশা। আর এ নেশাকেই নোংরা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে বাঙালী ললনারা। এ কিসের আলামত জানি না। এ দেশের ভবিষ্যৎ বংশধর যুব সমাজকে ধ্বংসের লক্ষ্যে অন্যান্য প্রক্রিয়ার পাশাপাশি এই একটি নতুন আইটেম সংযুক্ত হয়েছে।

আমেরিকা-ইউরোপের মতো এখানকার পার্লারগুলোতেও চলে খন্ডকালীন চাকরি। বিভিন্ন পত্রিকা সূত্র জানা যায় যে, এই পার্টটাইম চাকরির অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.pathagar.com

সুন্দরী তরুণী, হাই অফিসিয়াল মহিলা, নার্স কিংবা ভদ্রবেশী তন্বী-তরুণী-মহিলা-গৃহিনী। এরা সাধারণত তাদের ফ্যাশন চাহিদা পূরণ ও হাতখরচ মিটানোর জন্যই পার্লারগুলোতে এসে থাকে। আর প্রতিদিন এরা প্রায় গড়ে ৫ থেকে ৬ জন খদ্দের পেয়ে থাকে। ফলে গড়ে এরা প্রতিদিন ৫/৬শ' কিংবা তারও বেশি টাকা আয় করে থাকে। বিউটিশিয়ানদের দৈনিক আয়ের হিসাবটা অতিরিক্ত মনে হলেও বাস্তবে এই তথ্যের সত্যতায় এতোটুকুও খাদ নেই।

বাংলাদেশের পার্লারগুলো ম্যাসেজের নাম ভাঙ্গিয়ে যে কি অসম্ভব রকম বাণিজ্য করে যাচ্ছে তার চাক্ষুষ প্রমাণ মিলে রাজধানীর মৌচাক, মিরপুর, বনানী, গুলশান ও জুরাইন-এর পার্লারগুলোর দিকে তাকালে। এসব স্থানে এমন অনেক পার্লার আছে যেখানে ম্যাসেজ(?) করাতে হলে অন্ততপক্ষে এক সপ্তাহ কি ১০ দিন পূর্বে গিয়ে সেখানে কিছু এডভান্স দিয়ে নাম লিখিয়ে আসতে হয়। অতঃপর দীর্ঘ অপেক্ষার পর নির্দিষ্ট দিনে ম্যাসেজ-কাম-কামাচার-পাপাচারে লিপ্ত হতে হয়।

একটি পার্লার-এর বিউটিশিয়ান-কাম ম্যাসেজম্যান, এরা তাদের এই অবৈধ কাজগুলো চালিয়ে থাকে একটা মোটা অংকের ঘুষের বিনিময়ে। যার একমাত্র অংশীদার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার লোকজন। তাই মোটা অংকের কচকচে কাঁচা টাকার গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে এরা সমস্ত অন্যায়কে বৈধতা দান করে থাকে। ফলে বিউটি পার্লার আর বিউটিশিয়ানদের যাবতীয় অসামাজিক ক্রিয়া-কর্মে বাঁধা দেয়ার কেউ থাকে না। কিন্তু অচিরেই কঠোর নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ করতে না পারলে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর বিষক্রিয়া পরিলক্ষিত হতে বাধ্য।

সেবার নামে যৌন স্বাধীনতা ফেরী

এনজিওগুলো সেবার নামে এ দেশে যৌন স্বাধীনতা ফেরী করছে। দেশে এনজিওদের কার্যক্রম নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত নানা ধরনের অভিযোগ উঠেছে। পত্র-পত্রিকাগুলোতে এসব বিষয় নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। এদের কোনো টনক নড়েনি। বরং নতুন পদ্ধতি আর নতুন আঙ্গিকে সেবার নাম করে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি সাপ্তাহিক ও একটি দৈনিক পত্রিকার রিপোর্ট এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ বেশ কিছু দিন যাবত পশ্চিমা সাহায্যপুষ্ট কিছু এনজিও রাজনীতিতে যেমন নাক গলাচ্ছে তেমনি দেশের আবহমান সংস্কৃতি ও ধর্মের বিরুদ্ধে নানা রকম ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে। বর্তমানে এরা আমাদের যুথবদ্ধ সমাজ কাঠামোতে ধস নামানোর কাজে লিপ্ত। এ কাজে সফলতার জন্য সূক্ষ্ম কৌশলে কাজ করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে তারা মেয়েদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সমঅধিকারের কথা বলে তথাকথিত নারীবাদের শ্লোগান দিচ্ছে। বড় বড় এনজিওগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় ছোট ছোট কিছু সংগঠন গড়ে তুলছে যারা ফ্রি সেক্স বা অবাধ যৌন স্বাধীনতা ফেরী করছে। এ কাজের অংশ হিসেবে বেশ কিছু তরুণ-তরুণীকে বেছে নেয়া হচ্ছে। এরা অবাধে যৌন কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। এখানে উদাহরণ হিসেবে একরকম একটা ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের সঙ্গে জড়িত একটি

www.pathagar.com

এনজিও সংস্থার একজন কর্মকর্তা খোদ রাজধানীর উত্তর বাড্ডায় তথাকথিত নারীবাদী অপর একটি সংগঠনের প্রোগ্রাম অফিসারের মধ্যে প্রকাশ্যে অবাধ মেলামেশার কারণে এই কর্মকর্তা লাঞ্ছিত হয়েছে এবং স্থানীয় কিছু লোক এর প্রতিবাদ করেছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এই সংগঠন একটি বড় এনজিও'র অঙ্গ সংগঠন যাদের লক্ষ্য হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক এনজিও গঠন। এরা নারী কল্যাণের নামে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। কিছু সংগঠন রয়েছে পি, পি-২১, নারী প্রগতি সংঘ প্রভৃতি। এইসব সংগঠনের কর্মীদের সাথে আলাপকালে জানা গেছে, অবৈধ যৌন সম্পর্ককে এরা মোটেই খারাপ চোখে দেখে না বরং নারী মুক্তির অংশ, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার এটি অংশ হিসেবে মনে করে। 'দেহ আমার সিদ্ধান্ত আমার' এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এরা কাজ করে যাচ্ছে।

বরিশালের জাগুয়া ইউনিয়নের টিয়াখালী গ্রাম মহিলা কল্যাণ সমিতির সভানেত্রীর সাথে তার বয়ফ্রেন্ডের আপত্তিকর ছবির ব্যবসা জমে উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে, বিদেশী সংস্থার সাহায্যে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানে মহিলা কল্যাণের চেয়ে দেহ ব্যবসা বেশি চলছে। সম্প্রতি এ সংস্থার সভানেত্রী মাহমুদা বেগমের সাথে এক যুবকের নগ্নচিত্র স্থানীয়দের হাতে পড়ে। এ নিয়ে তুলকালাম কান্ড ঘটে যায়। ছবির দৌড় দারোগা-পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছে। কোতোয়ালী থানার সিআর মামলা নং-১৪৫/৯৫ এর জনৈক আসামীর জামিন মঞ্জুরে এদের ছবি দাখিল করা হয়েছে বলে জানা গেছে। (দৈনিক ইনকিলাব ১৭৭/৯৫)

গত সরকারের আমলে একজন মন্ত্রী বলেছিলেন– এনজিও প্রতিনিধিরা রংপুরে মহিলাদের বিবস্ত্র করে তাদের ছবি বিদেশে পাঠিয়ে বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা এনে নিজেরা ভোগ করে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, এসব সংগঠন সরাসরি বিদেশী সাহায্য পরিচালিত নয় বরং কিছু গডফাদার এনজিও'র সাইনবোর্ডবিহীন অঙ্গ সংগঠন। যাদের কাজ হচ্ছে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে যৌন স্বাধীনতার পথকে প্রশস্ত করা। এসব সংগঠনই চাকরির নামে প্রলোভন দিয়ে বিভিন্ন ঘৃণ্য কাজে জড়িয়ে ফেলছে। নারী অধিকারের ছদ্মাবরণে দেহবাদের প্রসার চালাচ্ছে। এসব সংগঠন কতটুকু সফল হয়েছে তা না বলে অন্ততঃ এ কথা বলা যায় যে, এগুলোর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ইতোমধ্যে আমাদের সমাজে লক্ষ্যণীয়। এসব সংগঠনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বোঝানো হচ্ছে অবাধ যৌন স্বাভাবিক বিষয় এতে খারাপের কিছু নেই, নারীদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবাধ যৌনতার বিষয়টি গ্রহণ করতে হবে, এর বিরুদ্ধতা একজন আধুনিক সমঅধিকার বিশ্বাসী মানুষের জন্য গোড়ামী। এইসব মগজ ধোলাই করে অবাধ যৌনতার স্বাদ আস্বাদনকারী কর্মী বাহিনী ছড়িয়ে পড়ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এরা নানাবিধ সুবিধার আড়ালে অপকর্মের জাল বিস্তার করছে, অবশ্য এ কাজে তারা নিজেদের মধ্যে এ পরিবেশ সৃষ্টি করে নিচ্ছে বা নিয়েছে।

পশ্চিমা বিশ্বে অপরাধী প্রবণতা, হত্যা নির্যাতনসহ সামাজিক অস্থিরতার প্রধান কারণ হচ্ছে সামাজিক বন্ধনের অস্তিত্ব বিনাশ। এই সামাজিক বন্ধন লোপ পাওয়ার পেছনে

www.pathagar.com

রয়েছে অবাধ যৌন স্বাধীনতা। অবাধ যৌন স্বাধীনতার কারণে তারা আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। এই ভয়াবহ ধস ঠেকানোর জন্য তারা আবার পরিবার প্রথার দিকে ফিরে যাচ্ছে। এর পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে। এই তো কিছুদিন আগে পোপ জন পল আমেরিকায় এক সম্মেলনে মানবিক প্রশান্তির লক্ষ্যে পরিবারের দিকে ফিরে আসার আহবান জানান। পশ্চিমা বিশ্ব যেসব কারণে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়গুলোকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর সুকৌশলে চাপিয়ে দিচ্ছে। আর এর সাথে রয়েছে তাদের পুঁজিবাদী ব্যবসায়িক স্বার্থ। এরা বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট সামাজিক অস্থিরতা এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে কাজে লাগাচ্ছে। সুকৌশলে তাদের পাপের ফসল চাপিয়ে দিচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে। এ কাজের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে নারীবাদের শ্লোগান। এদেরকে একটি শক্তি হিসেবে প্রমাণ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে কাজ করা হচ্ছে।

যৌতুক প্রথা

এককালে মুসলিম নারীরা ছিলো খুবই পর্দানশীল। গায়ের মোহারেম পুরুষের সাথে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা বা গোপনে প্রেম নিবেদনের কোনো সুযোগ ছিলো না। ফলে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে একটি যুবক বিয়ের জন্য উন্মুখ হয়ে যেতো। অভিভাবকেরা ছেলের জন্য সুপাত্রীর সন্ধানে ঘটক নিয়োগ করতেন। ঘটক উপযুক্ত সুপাত্রীর সন্ধান জানালে পাত্রপক্ষ পাত্রীর সম্পূর্ণ পারিবারিক বায়োডাটা সংগ্রহ করতেন। পাত্রীর বায়োডাটায় পাত্র পক্ষ সন্তুষ্ট হলে পাত্রী দেখার জন্য সংবাদ পাঠাতেন। নির্ধারিত দিনে পাত্রসহ মুরুব্বী ধরনের আত্মীয়-স্বজন পাত্রীর বাড়িতে গিয়ে পাত্রীকে দেখতেন। পাত্রী পছন্দ হলে উভয় পক্ষ বিয়ের দেনা-পাওনা নিয়ে আলোচনায় বসতেন। পাত্রী পক্ষের লোকেরা পাত্র পক্ষকে বলতেন, "আমাদের কন্যাকে আপনারা কি কি গহনা দিয়ে সাজিয়ে নিবেন, বরযাত্রী কতজন হবে ইত্যাদি। পাত্রপক্ষ তাদের সামর্থ অনুযায়ী প্রস্তাব রাখতেন। উভয় পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে দেয়া-নেয়ার পরিমাণ নির্ধারিত হতো। এরপর উভয় পক্ষের সম্মতিতে একটি শুভদিন ধার্য করে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হতো। সে সময়ে গ্রাম বাংলায় একটি বহুল প্রচলিত প্রবচন ছিলো। যেমন ঃ

"কন্যা দিমু সাজাইয়া
টাকা নিমু বাজাইয়া।"

উল্লেখিত শ্লোকেই উপলব্ধি করা যায় আমাদের দেশে নারীর মর্যাদা ও সম্মান ছিলো কত বেশি। তৎকালে যুবকেরা অভিভাবকদের সম্মতিতে যাকেই বিয়ে করতো তাকে নিয়েই গড়তো সোনার সংসার- বেহেস্তের এক অনিন্দ্যসুন্দর বাগান। উভয়ে উভয়কে ভালোবাসতো নিবিড় থেকে নিবিড়তরভাবে। দু'জনে মিলে হতো এক দেহ, এক মন।

গত তিন যুগ ধরে আমাদের দেশে বিবাহ কার্যে চলছে ঠিক বিপরীত রীতি-নীতি। এখন পাত্রীপক্ষ পাত্রের সন্ধান করে। পাত্রপক্ষ বলে, আমাদের ছেলেকে আপনারা কি কি দিবেন। বর্তমানে এই সর্বনাশা যৌতুক প্রধান আধিক্যে পূর্বের শ্লোক পরিবর্তন করে এভাবে বললে বোধ হয় ভুল হবে না। যেমন ঃ

www.pathagar.com

"বর দিমু সাজাইয়া
টাকা নিমু বাজাইয়া।"

পূর্বে মুসলিম সমাজে যৌতুক প্রথা না থাকার কারণে মেয়েদের বিয়ে দেয়া ছিলো সহজসাধ্য এবং পর্দা প্রথার কঠোরতার কারণে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন ছিলো অকল্পনীয়। বর্তমানে যৌতুক প্রথার কারণে মেয়েদের বিয়ে দেয়া হয়েছে ব্যয়বহুল। এছাড়া পর্দা প্রথার কঠোরতা না থাকার কারণে অবৈধ যৌন সম্পর্কের জঘন্য ঘটনা ক্রমান্বয়েই বাড়ছে এবং যত্রতত্র ঘটছে। পরিবার পরিকল্পনার সামগ্রী সহজলভ্য হওয়ার কারণে অবৈধ যৌন সম্ভোগ যুবক-যুবতীদের জন্য আরো নিরাপদ হয়েছে। কাজেই যুবকদের অবাধে যৌন সম্ভোগের সুযোগ থাকায় বিয়ে করতে পূর্বের ন্যায় ততোটা উৎসাহী নয়।

আমাদের দেশে এই অভিশপ্ত যৌতুক প্রথার প্রচলন হয়েছে হিন্দুদের পণ প্রথা থেকে। হিন্দু ধর্মে 'পণ প্রথা' আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। হিন্দুদের ধর্মীয় মতে নারীরা অত্যন্ত হীন ও নীচ। একই সময়ে একাধিক পুরুষের সাথে নারীর বিয়ে হতো। কারণ নারীদেরকে হিন্দুরা মনে করতো ভোগপণ্য, সেবাদাসী। ধর্ষণ ও ব্যাভিচারকে তারা অতিথিপরায়ণের সেবা মনে করতো। যাদের পূজ্য দেবীদের অধিকাংশ ছিলো অবিবাহিতা কুমারী মাতা। নীচু বংশের মেয়েরাতো ব্রাহ্মণদের রক্ষিতা ছিলো। কারণ অর্থের অভাবে গরীব পিতার পক্ষে কন্যা পাত্রস্থ করা সম্ভব হতো না। শাস্ত্রমতে কন্যা কুমারী থাকলে পিতাকে অনন্ত নরকবাস করতে হবে। কন্যাকে দেবদাসী করলে নরকে যাওয়ার ভয় থাকে না। তাই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা তাদের কন্যাদের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে দেবদাসী করে দিতেন। দেবী 'মা কালি উলঙ্গ' তাই দেবদাসীরাও উলঙ্গ থাকতো। মন্দির গাত্রে বিভিন্ন আসনে যৌন ক্রীড়া খোদিত থাকতো। ব্রাহ্মণেরা সে সব আসন অনুসরণ করে দেবদাসীদের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হতো। শোনা যায়, এই দেবদাসীদের নিয়ে তৎকালে লোকের মুখে মুখে এই গানটি প্রচলিত ছিলো–

সগন গগন অংগন তলে
সৌদামিনী লৌ আমি পূজারই নীর–২
দেব-দাসীনি লৌ আমি পূজারই নীর–২
দেবতার মন্দিরে অংগন তলে
দেব-দাসীনি লৌ আমি পূজারই নীর
মেঘ মল্লারে দীপকেরি সুরে
সজল কাজল মেঝেরই কোলে
চঞ্চল যৌবন বাদল দোলে। ঐ

অধিকাংশ দেবদাসী তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেহদানে বাধ্য হতো। মন্দিরের দেবদাসীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিলো না। অসুস্থ দেহেও দেহদানে বাধ্য হতো। সুন্দরীদের অবস্থা আরো শোচনীয় হতো। সারাদিন হয়তো শতাধিক ব্যক্তিকে দেহদান করতে হতো। মন্দিরের কুমারী সেবাদাসীদের উপর সেবায়েৎরা বলাৎকার করার সময় যাতে ঐ মেয়েটির আর্তনাদ বাইরে শোনা না যায়, তজ্জন্য মন্দিরে জোরে

www.pathagar.com

জোরে কাসর ঘন্টা বাজানো হতো। এখনও ভারতের যে সকল অঞ্চলে এ সেবাদাসী বা দেবদাসী প্রথা প্রচলিত আছে সে সব মন্দিরে কাসর ঘন্টা পূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

ব্রাহ্মণদের পূত দেহের পরশে তারা পবিত্র হতো। এরূপ কুলটা নারীকে যারা বিয়ে করতো তারা স্ত্রীর লুণ্ঠিত অমূল্য ইজ্জতের পরিবর্তে নিতো পণ। [এই দেবদাসীদের নিয়ে এই যৌন নিষ্ঠুরতার এবং অশ্লীলতার ইতিহাস পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ তাঁর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "কুলীন ব্রাহ্মণ হিসাবেও রাখতেন না তাঁরা ক'টি মেয়েকে বিবাহ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য একটি ছোট খাতায় বিয়ের ও বিয়ের পরে পাওয়া যৌতুকের তালিকা লিখে নিজেদের কাছে রেখে দিতেন। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শ্বশুরালয়ে গেলে তাঁদের কি কি জিনিস দিতেন তারও একটি তালিকা রাখতেন। ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষ আরো লিখেছেন ঃ "একটি ব্রাহ্মণের যদি ত্রিশটি স্ত্রী থাকে তবে প্রতি মাসে কয়েকদিনের জন্য শ্বশুরালয়ে গিয়ে থাকলেই ভালো খেয়ে ও উপহার পেয়ে এবং জীবিকা অর্জনের কোনো চেষ্টা না করে তার সারা বছর কেটে যেতে পারে।" এভাবেই ব্রাহ্মণ শ্রেণীটি নিষ্কর্মা শ্রেণীতে পরিণত হয় এবং কুলীন কন্যাদের বহু বিবাহের ফলে ব্যাভিচার, গর্ভপাত, শিশু হত্যা, বেশ্যাবৃত্তি, সেবাদাসী প্রভৃতি অনৈতিক ক্রিয়া সমাজে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর শ্রীকান্ত উপন্যাসে এমনি এক কুলীন ব্রাহ্মণের চিত্র এঁকেছেন, অশীতিপর বৃদ্ধ সেই ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার সর্বস্ব বেচা পয়সায় যৌতুকের বিনিময়ে তাঁর দুই যুবতী কন্যাকে একই পিঁড়িতে বিবাহ করেছিলেন। পরভুক ব্রাহ্মণ শ্রেণী শুধু অন্যবর্ণের প্রতি নয় নিজ বর্ণের নারীদের প্রতিও কি রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করে উল্লেখিত ঘটনাগুলো তারই প্রমাণ।

আরেকটি তথ্যে জানা যায়, বেচারা ব্রাহ্মণকে এক হাতে যখন যম টানছে, তখনও অন্য হাতে কন্যার বাবা টানছে তার মেয়েটিকে বিয়ে করে কুলে তোলার জন্য। ব্রাহ্মণেরাও এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতো। তারা বাড়তি আয় ও নিত্য নতুন তরুণী ভার্যার লোভে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ভ্রমরের মতো ঘুরে ঘুরে গুনগুন করে নিজ পরিচয় ব্যক্ত করতেন। অমনি কন্যার পিতারা লাইন লাগাতেন– বিয়েও হয়ে যেতো। এ ছাড়া এই ব্রাহ্মণেরা সুন্দরী মেয়েদেরকে উলঙ্গ করে দেখে পাত্রী নির্বাচন করতো।

বাসরশয্যার ফুলের গন্ধ শুকাতে না শুকাতেই ব্রাহ্মণটি আবার নতুন ফুলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তেন। এমনি করে ব্রাহ্মণেরা বছরের পর বছর একদিকে স্ত্রী গ্রহণ করতে এবং অপরদিকে স্ত্রী ফেলে যেতে লাগলেন। এসব স্ত্রীরা জীবনে হয়তো দ্বিতীয়বারের মতো আর কোনোদিনই স্বামীটির দেখা পেতো না।

মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা বন্য পশু-পাখি শিকার করে এবং বাঁশ-বেতের হস্তশিল্পকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতো। এদের মেয়েরা নৃত্য পটিয়সী ছিলো। তাদের যুবতী মেয়েরা হাতে তৈরী শিল্পপণ্য নিয়ে গ্রামে এসে নেচে-গেয়ে সেসব বিক্রি করতো। গ্রামের রমণ, ভ্রমণ, আহার-বিহারে অভ্যস্থ নিষ্কর্মা, ব্রাহ্মণসহ উচ্চবর্ণ হিন্দুরা ডুম্বিনী শবরীদের নাচে-গানে রূপে-রসে মুগ্ধ হয়ে জাতপাত

www.pathagar.com

ভুলে যেতো। সময় বুঝে তারা ডুম্বিনী শবরীদের কুড়েঘরের চারপাশে ঘুর ঘুর করতো এবং সুযোগ বুঝে তাদের দেহ সম্ভোগ করতো। ব্রাহ্মণকে দেহদানে ডুম্বিনী শবরীদের আপত্তির কিছু ছিলো না। কারণ অচ্ছুত হয়েও ব্রাহ্মণের স্পর্শ লাভকে তারা নিজেদেরকে ধন্য মনে করতো। ব্রাহ্মণদের অপকর্ম প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস তার দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা গ্রন্থে বলেছেন, "সাধারণ বিষ শুধু পানকারীকেই বিনাশ করে কিন্তু ব্রাহ্মণ্য বিষয় (অর্থাৎ কামতাড়িতের বিষ) পুত্র পৌত্রকেও বিনাশ করে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটগল্প 'দেনা পাওনা'তে লিখেছেন ঃ

এখন নিরুপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায়বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায়বাহাদুরের পৈতৃক বিষয়-আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদী ঘর বটে।

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন; এমন পাত্র কোনোমতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিছুতেই টাকার জোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় করিয়া, অনেক চেষ্টাতেও হাজার ছয়-সাত বাকি রহিল। এ দিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়বাহাদুরের হাতে-পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয় টাকাটা শোধ করিয়া দিব।" রায়বাহাদুর বলিলেন, "টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।"

এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদের যে মূল কারণ সে চেলি পরিয়া; গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাবী শ্বশুরকুলের প্রতি যে তাহার খুব-একটা ভক্তি কিংবা অনুরাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা যায় না।

ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, "কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না; বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব।"

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল, "দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার?" দুই-একজন প্রবীণ লোক ছিল, তাহারা বলিল, "শাস্ত্রশিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই।"

বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদুর হতোদ্যম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষন্ন নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

www.pathagar.com

শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় নিরুপমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। নিরু জিজ্ঞাসা করিল, "তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না, বাবা।" রামসুন্দর বলিলেন, "কেন আসতে দেবে না মা। আমি তোমাকে নিয়ে আসব।"

রামসুন্দর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিন্তু বেহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নাই। চারকগুলো পর্যন্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনোদিন বা দেখিতে পান না।

কুটুম্বগৃহে এমন করিয়া আর অপমান তো সহ্য যায় না। রামসুন্দর স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক টাকটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে তাহারই ভার সামলানো দুঃসাধ্য। খরচপত্রের অত্যন্ত টানাটানি পড়িয়াছে এবং পাওনাদারদের দৃষ্টিপথ এড়াইবার জন্য সর্বদাই নানারূপ হীন কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

শেষ পর্যন্ত বাড়ী বসতবাটী বিক্রি করে যৌতুকের টাকা সংগ্রহ করেছিলেন রামসুন্দর। কিন্তু কন্যা নিরুপমা কৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে দেয়নি। শ্বশুর বাড়ীর মানসিক যন্ত্রণা ও অপমানে নিরু কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দেনা পাওনা' ছোট গল্পে পণ প্রথার যে করুণ চিত্র এঁকেছেন তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। অথচ তাঁর বাস্তব জীবনে যৌতুক দিয়ে তিন কন্যাকে পাত্রস্থ করেছেন। বড় কন্যা মাধুরী লতা (বেলা)কে বিশ হাজার টাকা পণ এবং ব্যারিস্টারী পড়াতে ইংল্যান্ডে পাঠানোর শর্তে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে নয় বছরের ছোট শরত বাবুর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। মেঝো কন্যা রেনুকা (রানী)কে সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্যের সাথে বিয়ে দেন আমেরিকায় হোমিওপ্যাথিক শেখার শর্তে। ছোট কন্যা মীরাকে বিয়ে দেন বরিশালের এক অসচ্ছল পরিবারের সন্তান নগেন্দ্রনাথের সাথে আমেরিকায় কৃষি বিদ্যা শেখার শর্তে। এদের দু'জনকে নগদ অর্থও প্রদান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো উঁচু তলার ব্যক্তিরাই পণ প্রথাকে জিইয়ে রেখে মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে।

বইয়ের কাটতি, খ্যাতি, যশ, অর্থ প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলা যায়, লিখা যায়। কিন্তু বাস্তবে ব্যক্তিগত জীবনে এর প্রতিফলন অনেক লেখকদের মাঝেই দৃশ্যমান নয়। হয়তো এদের উদ্দেশ্যেই পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক অতি সুন্দরভাবে এরশাদ করেছেন– "কেবল পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাই কবিদের অনুসরণ করে, কবিরা নানা উপত্যকায় বিচরণ করে উদ্‌ভ্রান্তের মতো, তাদের কথার সঙ্গে কর্মের কোনো মিল নেই।" (সূরা শুয়ারা)

যা হোক হিন্দু অসহায় নারীদের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তিলাভের কোনো গঠনমূলক পদক্ষেপ রবীন্দ্রনাথের পূর্বসুরী ও উত্তরসূরীরা গ্রহণ করেনি বা গ্রহণ করতে পারেনি। ইতিহাস সাক্ষী একমাত্র মুসলমানদের আগমনের ফলেই অসহায় নারীরা তাদের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তিলাভ করেছিলো মুসলমান সুলতানদের আগমনে। আল-কোরআনের নির্দেশ ঃ

www.pathagar.com

"এবং তোমরা স্বীয় তরুণী দাসীদিগকে অবৈধ ব্যক্তির জন্য বাধ্য করিও না, যদি তারা পার্থিব জীবনে মর্যাদার সাথে সতীত্ব সংরক্ষণ করতে চাহে।"

তৎকালে মুসলমান শাসকদের আগমনের ফলে ভারতের হিন্দু নারীরা অভিশপ্ত জীবন থেকে কিছুটা সময় রেহাই-রক্ষা পেলেও পণ প্রথার যাঁতাকল থেকে রক্ষা পায়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া বেনিয়ার জাত এদেশে নিয়ে আসে নেংটা ও নোংরা সভ্যতা। ক্রমান্বয়ে ইংরেজদের উলঙ্গ বর্বরতা আর হিন্দুদের পণ প্রথা মুসলিম জাতিকেও পেয়ে বসে। যা বর্তমানে মুসলিম সমাজে যৌতুক প্রথা বলে অভিহিত হচ্ছে।

যৌতুক প্রথা আল্লাহ্‌র গযব। আল্লাহ্‌পাক যখন গযব নাযিল করেন তখন শুধু স্বামী-স্ত্রী, নারী-পুরুষই তাতে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, পৌঢ়-পৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এক কথায় আপামর জনগণ সে আযাবের শিকার হন। এই অভিশপ্ত যৌতুক প্রথার কারণে কতো দুগ্ধপোষ্য শিশু ইয়াতিম হচ্ছে, কত কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী হচ্ছে পশু, বেছে নিচ্ছে পশুতর জীবন! কত পৌঢ়-পৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা হচ্ছে অসহায়, জান কবজ করা শোক-দুঃখ, অভাব, দরিদ্রতার শিকার। ভাঙ্গছে সোনার সংসার, ধ্বংস হচ্ছে সমাজ, নষ্ট হচ্ছে সম্ভ্রমবোধ, সম্বন্ধ-সম্প্রীতি। চারিদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে অশান্তির লেলিহান সর্বগ্রাসী অগ্নিশিখা।

আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন– "হে ঈমানদার (নারী-পুরুষ), তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর (অর্থাৎ পূর্ণরূপে ইসলাম কবুল কর) এবং শয়তানের অনুসরণ করো না (শয়তান ইচ্ছাকৃতভাবে যেমন একবার মাত্র অপরাধ করেছিল– তোমরা তাও করো না), সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (বাকারা ঃ ২০৮)

সেই আল্লাহ্‌তায়ালাই বলেন, "এবং যে ইসলাম ছাড়া অন্য আইন অন্বেষণ করে (মেনে চলে) তার থেকে তা কবুল করা হবে না এবং (তার প্রত্যেকটি কাজের) পরিণামে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবেই।" (আল ইমরান ঃ ৮৫)

গোখরো সাপের এক ফোঁটা বিষ যেমন একটি মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় ঠিক তেমনি শয়তানের যে কোনো আইন-বিধান, নিয়ম-নীতি মানুষের মনুষ্যত্বকে, মানবতাকে শেষ করে দিয়ে পশুত্বে পরিণত করতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেন, "যারা তাদের দু'টি অন্তর (মুখ ও লজ্জা অঙ্গ) হেফাজত করবে আমি তাদের বেহেশতের জামিনদার হয়ে যাবো।" (বোখারী)

সুতরাং নারীদের অবাধে দেহ প্রদর্শন অশ্লীলতা ও লজ্জাহীন কাজের ইন্ধন জোগায়। যেখানে এই অশ্লীলতা ও লজ্জাহীন কাজ বিদ্যমান সেখানে যৌন সম্ভোগ সহজ হয়ে যায়। ফলে পুরুষের কাছে নারীর চাহিদা কমে যায়। যতদিন রূপ-যৌবন থাকে ততোদিন পুরুষদের কাছে এইসব নারীদের মূল্য থাকে। পারিবারিক সুখ দূরের কথা ব্যক্তিগত সুখও তাদের কপালে জোটে না। আত্মমর্যাদাহীন এইসব নারীরা বাধ্য হয়ে যত্রতত্র দেহদান করে নিজেদের সাথে গোটা নারী জাতির কপালে আগুন লাগায়।

নারী-পুরুষের বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দৈহিক, মানসিক, দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের উন্নতি, শান্তি ও কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌পাক মানব জাতিকে কিছু

www.pathagar.com

নীতিমালা দিয়েছেন। নারীরা যদি ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন ও অনুরাগে এইসব নীতিমালা মেনে চলেন তাহলে পুরুষের কাছে নারীদের মর্যাদা ও মূল্য ততো বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ্ প্রদত্ত উন্নত আদর্শ ও নীতিমালাকে উপেক্ষা করে অন্ধভাবে বিধর্মীয় বর্বর রীতি-নীতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করলে বিরাজমান সমস্যা কখনো দূর হবে না। মুক্তিও আসবে না। মানব রচিত আইন দিয়ে যৌতুকের অভিশাপ থেকে এই দেশের নারী সমাজকে কখনো রক্ষা করা যাবে না।

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, যৌনাচার এবং এর পরিণাম

ফ্রী মিক্সিং ইংরেজী শব্দটি আজকাল প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। ফী মিক্সিং-এর আভিধানিক অর্থ নারী-পুরুষের এক সাথে অবাধে মেলামেশা করা। নারী ও পুরুষ উভয়ই মানুষ এবং মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী। বিপরীত লিঙ্গের কারণে মানব সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত। একটি নর; অপরটি নারী। এই নর-নারীর মানবীয় বৈশিষ্ট্যের সকল উপাদান সমানভাবে বিদ্যমান কিন্তু দৈহিক গঠন প্রণালী ভিন্ন। আল্লাহ্ পৃথিবীতে বংশ বিস্তারের জন্যে মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে জৈবিক ক্ষুধা দিয়েছেন। এই জৈবিক ক্ষুধার কারণেই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এক প্রচন্ড আকর্ষণ ও সৃষ্টি সুখ অনুভব করে। এই জৈবিক ক্ষুধা নিবারণের জন্য জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মানুষ সভ্য ও সামাজিক জীব; কিন্তু পশু-পাখিরা তা নয়। এ কারণেই বিপরীত লিঙ্গের জোড়াবদ্ধ পশু-পাখির চলাফেরা, ভালোবাসা, বসবাস ও জৈবিক ক্ষুধা নিবারণের কোনো বিধি-নিষেধ নেই। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক অবকাঠামোর সুশৃঙ্খলতা রক্ষার স্বার্থে বিপরীত লিঙ্গের জোড়াবদ্ধ মানুষের চলাফেরা, ভালোবাসা, বসবাস ও জৈবিক ক্ষুধা নিবারণে রীতি-নীতি ও বিধি-নিষেধ রয়েছে। তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাক বলেছেন, "আর আল্লাহ্ চান তোমাদের দিকে সদয়ভাবে ফিরতে। পক্ষান্তরে যারা কাম রিপুর বশবর্তী, তারা চায় তোমরা সরলপথ হতে বহু দূরে সরে যাও।" (সূরা নেসা-২৭)

নারী নির্যাতন, নারী অমর্যাদার প্রধান সহায়ক অশ্লীলতা ও অবাধ যৌনাচার। এই সভ্য মানুষের যৌন পরাধীনতা আর অশ্লীলতা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন– "বলো, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে... ।" (সূরা আরাফ-৩৩)। জিনার (অবৈধ যৌন সঙ্গমের) কাছে যেও না, এ অশ্লীল আর মন্দ পথ। (সূরা বনি ইসরাঈল-৩২)। প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক– অশ্লীল আচরণের কাছে যেও না। (সূরা আনয়াম-১৫১)।

বিধর্মী সিগমন্ড ফ্রয়েড বলেছেন– যৌন পরাধীনতা না থাকলে সভ্য সমাজে স্বীকৃত বিবাহ প্রথা অর্থহীন হয়ে যেতো। তখন দেখা দিতো উদ্দাম যৌনাচার যা আগামী প্রজন্মকে এক জারজ সভ্যতার অনুগামী করে দিতো।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমান, সুতরাং ধর্মীয় রীতি-নীতি কঠোরভাবে মেনে চলার কারণে এদেশে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তথাকথিত সভ্যতার দাবীদার রাষ্ট্রসমূহের জন্য এখনো শিক্ষণীয় ও দৃষ্টান্তমূলক সুন্দর ঐতিহ্য রয়েছে। সে ঐতিহ্য ভেঙ্গে ফেলার জন্য আজ চতুর্মুখী আয়োজন চলছে। ইতিমধ্যেই ইলেকট্রোনিক্স, প্রিন্টিং মিডিয়া ও এনজিওদের অপকৌশলের কারণে আমাদের সমাজ নৈতিক বাঁধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসছে। যার খন্ড চিত্র পরিবারে, সমাজে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মস্থলে, নাটকপাড়ায়, সিনেমা পল্লীতে, প্রচার মাধ্যমের করিডোরে, রাজপথে এমনকি হাসপাতালেও প্রত্যক্ষ করছি। তথাকথিত প্রগতি ও সভ্যতার দাবীদার বলে কথিত পাশ্চাত্যের ন্যায় নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর ন্যায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রগতি ও সভ্যতার কথা বলে তথাকথিত প্রগতিশীলরা সমগ্র মানবজাতিকে আদিম যুগে, অসভ্যতার যুগে, বর্বরতার যুগে ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং নারী জাতিকে অন্ধকারের গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে। পাশ্চাত্যে আজ নৈতিক মূল্যবোধ ধূলায় লুণ্ঠিত। সুস্থ, সুন্দর সামাজিক পরিবেশ সে দেশে আর নেই। আমাদের দেশেও তার আলামত দেখা যাচ্ছে।

নর-নারী অবাধ মেলামেশায় সামাজিক বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এ কারণেই ইসলামী সংস্কৃতিতে নর-নারীর অবাধ মেলামেশায় কঠোর সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের মতো কঠোর সীমাবদ্ধতা নেই। অন্যান্য ধর্মে পরোক্ষভাবে যৌন স্বাধীনতা রয়েছে। কতিপয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যৌনাচার ধর্মীয় সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইসলাম ধর্মে তা প্রত্যক্ষভাবে যৌন পরাধীনতা আছে। সুতরাং ইসলাম ধর্মের এ পরাধীনতা তথাকথিত প্রগতিবাদীদের নিকট একেবারেই অসহ্য। এরা চায় ভারত ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের ন্যায় আমাদের দেশেও নর-নারীর অবাধ মেলামেশা ও যৌন স্বাধীনতা। তাই এ সম্বন্ধে আলোচনার গভীরে যাবার পূর্বে যারা অবাধ মেলামেশা ও যৌন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক যৌনাচারের পরিণাম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

সনাতন হিন্দু ধর্মে দেব-দেবতাদের মধ্যে যৌনাচারের ভরপুর। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দুর্গা তার আপন ছেলের (কার্তিক) চেহারায় মুগ্ধ হয়ে বনে গিয়ে বলেছিলো, আমার সঙ্গে মিলন ঘটাও এবং ঘটিয়েছিলোও তাই। যম তার যমজ ভগিনী যমীর কাছে সঙ্গম প্রার্থনা করেছে। দম্ভ নিজ ভগিনী মায়াকে, লোভ নিজ নিবৃতিকে, ক্রোধ নিজ ভগিনী হিংসাকে ও কলি নিজ ভগিনী দিরুক্তিকে বিবাহ করেছে। আবার ঊষা সূর্যের জনয়িত্রী। কিন্তু সূর্য প্রণয়ীর ন্যায় তার অনুগমন করেছে ও তাকে স্ত্রীরূপে বরণ করেছে। মৎস্যপুরাণ অনুযায়ী শতরূপা ব্রহ্মার কন্যা। কিন্তু ব্রহ্মা কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে অজাচারে লিপ্ত হন। এই কন্যার গর্ভে ব্রহ্মা হতে স্বায়ম্ভুব মনুর জন্ম হয়। আবার স্বায়ম্ভুব মনু হতে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপদ নামে দু'পুত্র এক কাকুতি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে। আবার এদের পুত্র কন্যা হতে মনুষ্য জাতির উদ্ভব হয়। অর্থাৎ জন্ম থেকেই মনুষ্য জাতির রক্তের মধ্যে অজাচারের বীজ উপ্ত হয়েছিলো।

www.pathagar.com

ছবি কথা বলে। চিত্র পরিচালক মহেশ ভাট ও তার কন্যা পূজা ভাট

যৌন জীবনে দেবতাদের কোনোরূপ সংযম ছিলো না। আদিত্যযজ্ঞে মিত্র ও বরুন উর্বশীকে দেখে যজ্ঞ কুম্ভের মধ্যে শুক্রপাত করে। অগ্নি একবার সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের দেখে কামোমত্ত হয়েছিলো। ঋক্ষরজাকে দেখে ইন্দ্র ও সূর্য দু'জনেই এমন উত্তেজিত হয়েছিলো যে, ইন্দ্র তার চিকুরে ও সূর্য তার গ্রীবায় রেতঃপাত করে ফেলে।

সূর্য অজাচারী দেবতা। চন্দ্র ব্যভিচারী দেবতা। চন্দ্র দক্ষের সাতাশটি মেয়েকে বিবাহ করেছিল। কিন্তু তাতেও তার কাম-লালসা পরিতৃপ্ত হয়নি। কামাসক্ত হয়ে সে দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তারাকে অপহরণ করে। এই নিয়ে দেবলোকে এক ঘোর অশান্তির সৃষ্টি হয়। দৈত্য, দানব ও দেবশত্রুরা চন্দ্রের পক্ষ নেয়। আর বৃহস্পতির পক্ষে দাঁড়ান ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা। মহাদেব ও শুক্রাচার্যও বৃহস্পতির পক্ষ নেন। প্রলংকরী যুদ্ধের আশঙ্কা করে স্বয়ং ব্রহ্মাও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। মহাদেব ও শুক্রাচার্যকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে বলেন এবং চন্দ্রের কাছ থেকে তারাকে নিয়ে বৃহস্পতির হাতে প্রদান করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে চন্দ্রের দ্বারা তারার গর্ভসঞ্চার হয়ে গিয়েছিলো। বৃহস্পতির আদেশে তারা গর্ভত্যাগ করে ও এক পুত্রের জন্ম হয়। ব্রহ্মা তারাকে জিজ্ঞেস করেন, এ সন্তান কার? তারা উত্তর দেয়, চন্দ্রের। তখন চন্দ্র ঐ পুত্রকে গ্রহণ করে ও তার নাম রাখে বুধ। বৃহস্পতির শাপে চন্দ্র যক্ষা রোগগ্রস্থ হয়।

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থানই সর্বাগ্রে। ইন্দ্র অত্যন্ত সূরা (সোমরস) পায়ী। ইন্দ্র নিজ পিতার কাছ থেকেও কেড়ে নিয়ে সুরাপান করতো। ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রানী বা শচী। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মন অনুযায়ী ইন্দ্র যৌন আবেদনে আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য সুন্দরীদের প্রত্যাখ্যান করে ইন্দ্রানীকে বিবাহ করেছিলো। অন্য মতে, ইন্দ্র ইন্দ্রানীর সতীত্ব নষ্ট করে এবং শাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইন্দ্রানীর পিতা পুলোমাকে হত্যা করে ইন্দ্রানীকে বিয়ে করে।

ইন্দ্র যে মাত্র ইন্দ্রানীর সতীত্ব নষ্ট করেছিলো, তা নয়। মহাভারত অনুযায়ী ইন্দ্র গৌতম মুনির অনুপস্থিতিতে গৌতমের রূপ ধারণ করে তাঁর স্ত্রী অহল্যার সতীত্ব নাশ

www.pathagar.com

করেছিলো। গৌতমের শাপে ইন্দ্রের দেহে সহস্র যোনী চিহ্ন প্রকাশ পায়। ইন্দ্রের কাতর অনুনয়ে গৌতম ওই চিহ্নগুলোকে লোচন চিহ্নে পরিণত করেন। আবার রামায়নের কাহিনী অনুসারে গৌতমের শাপে ইন্দ্রের অন্ড খসে পড়ে। পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় মেষ অন্ড সংযোগে ইন্দ্রের পুরুষত্ব ফিরিয়ে আনে। এই ইন্দ্র মর্তালোকে এসেও মানবীদের সাথে মিলিত হতেন। এই মিলনের ফলে বাল্বী ও অর্জুনের জন্ম হয়েছিলো। ধর্ম ও মর্তে এসে মানবীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। ধর্মের ঔরসে ও কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। অনুরূপভাবে অগ্নির ঔরসে মাহিষ্মতী নগরীর ইক্ষাকুবংশীর রাজকন্যা সুদর্শনার গর্ভ হয়।

পৌরানিক যুগে বিষ্ণুই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। কিন্তু বিষ্ণুও মুক্ত নন। এটা তুলসীর সতীত্বনাশের কাহিনী থেকে প্রকাশ পায়। এ সম্বন্ধে দুটো কাহিনী আছে। পদ্মপুরাণ অনুযায়ী জলন্ধর নামে এক অসুরের স্ত্রী ছিলেন বৃন্দা। তার বর ছিলো যে তার সতীত্বনাশ না হলে, তার স্বামীর মৃত্যু হবেনা। জলন্ধর একবার ইন্দ্রকে পরাস্ত করে অমরাবতী অধিকার করলে, ইন্দ্র শিবের শরণাপন্ন হন। শিব জলন্ধরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে, বৃন্দা স্বীমার প্রাণ রক্ষার জন্য বিষ্ণু পূজায় রত হন। কিন্তু বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করে বৃন্দার সামনে এসে উপস্থিত হন। স্বামীকে অক্ষত দেহে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতে দেখে বৃন্দা বিষ্ণু পূজা অসমাপ্ত রেখে স্বামীর কাছে আসে। জলন্ধররূপী বিষ্ণু তখন বৃন্দার সতীত্বনাশ করে। তখনই যুদ্ধে জলন্ধরের মৃত্যু ঘটে। পরে বৃন্দা যখন সব ব্যাপারটা বুঝতে পারলো, তখন সে বিষ্ণুকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলো। সতীর শাপ অমোঘ জেনে বিষ্ণু ভয়ে বৃন্দাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো যে, তুমি সহমৃতা হও। তোমার ভষ্মে তুলসী বৃক্ষ উৎপন্ন হবে এবং তুলসী পাতা ব্যতীত বিষ্ণু নারায়ণের পূজা হবে না।

বৃহ্ম বৈবর্তপুরাণ অনুযায়ী তুলসী ছিলেন শঙ্খচূড়ের স্ত্রী। শঙ্খচূড়ের বর ছিলো যে তার সতীত্বনাশ না ঘটলে, তার মৃত্যু হবে না। শঙ্খচূড়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা ব্রহ্মার সঙ্গে শিবের কাছে যান, শিব তাদের নিয়ে নারায়ণের সমীপস্থ হন। নারায়ণ দেবতাদের দুর্দশার কথা শুনে বলেন যে, শিব শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলে, তিনি গিয়ে তুলসীর সতীত্বনাশ করবেন। তখন শিব শঙ্কচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধে রত হন। এ দিকে নারায়ণ শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করে তুলসীর কাছে গিয়ে তার সতীত্বনাশ করেন। তখন শিবের হাতে শঙ্খচূড়া নিহত হয়। তুলসী যখন এটা জানতে পারে, তখন সে নারায়ণকে অভিশাপ দেয়– "তুমি পাষাণে পরিণত হও"। নারায়ণ তুলসীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, তোমার কেশ থেকে তুলসী বৃক্ষ উৎপন্ন হবে। লক্ষ্মীর ন্যায় তুমি আমার প্রিয়া হয়ে থাকবে। সেই থেকে নারায়ণ শিলারূপে পরিণত হয়ে সর্বদা তুলসীযুক্ত হয়ে থাকেন।

এতোক্ষণ দেবলোকের পুরুষদের যৌন-চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। এখন দেবলোকের দেব-স্ত্রীদের কথা কিছু বলি। স্বাহা দক্ষের কন্যা। ইনি অগ্নিকে কামনা করতেন। একবার সপ্তার্ষিদের যজ্ঞে অগ্নি সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের দেখে কামার্ত হয়ে ওঠেন। স্বাহা এটা লক্ষ্য করেন। স্বাহা তখন এক একবার এক এক ঋষিপত্নীর রূপ ধরে ছয় বার অগ্নির সঙ্গে মিলিত হন এবং ছয় বারই অগ্নির বীর্য কাঞ্চণকুন্ডে নিক্ষেপ করেন। এই ঘটনার পর সপ্তর্ষিরা তাদের স্ত্রীদের সন্দেহ করে পরিত্যাগ করে। সপ্তর্ষিদের অন্যতম

www.pathagar.com

বশিষ্টের স্ত্রী অরুন্ধতীর তপঃপ্রভাবে স্বাহা আর তার নিজের রূপ ধারণ করতে পারেননি। বিশ্বামিত্র প্রকৃত ব্যাপার জানতেন বলে, তিনি ঋষি-স্ত্রীদের নির্দোষী বলেন। কিন্তু ঋষিরা তা বিশ্বাস করেন না। পরে স্বাহা অগ্নির স্ত্রী হন। কিন্তু স্বর্গে গিয়েও স্বাহার স্বভাব পরিবর্তিত হলো না। তিনি নিজ স্বামীকে ছেড়ে কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাবার জন্য তপস্যা করতে লাগলেন। বিষ্ণুর বরে স্বাহা দ্বাপরে নগ্নজিৎ রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন ও কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পান।

দেবতাদের মধ্যে শিবই হচ্ছেন সবচেয়ে সংযমী দেবতা। তিনি সংহার কর্তা। আবার সংহারের 'পর নতুন জীবনের সৃষ্ট করেন। সে জন্য তার নাম শঙ্কর। সৃষ্টির রক্ষক হিসেবে তার প্রতীক লিঙ্গ বা প্রজননের চিহ্ন। এই প্রতীকের সঙ্গে যোনি বা স্ত্রী শক্তি সংযুক্ত হয়ে তিনি সর্বত্র পূজিত হন।

আবার অলোকবাবু ডক্টর অতুল সুরের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "বেদে অযাচারের একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। প্রথমেই উষার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঋক বেদের ২০টা সূক্তে উষা স্তুত হয়েছে। সে প্রজাপতির কন্যা, কাঞ্চনবর্ণা ও সূর্যদেবের ভগিনী। উষা বক্ষদেশ উন্মুক্ত রাখতো। ব্রহ্মার ন্যায় প্রজাপতিও ছিলেন একজন কামুক দেবতা।

রাণী সুদেষ্ণার মূর্তি

মহাভারতের মতে, বাঙ্গালীরা 'দীর্ঘতমা মুনির' জারজ সন্তান। মহাভারতে বলা হয়েছে দীর্ঘতম মুণি, ঋষি, উতসা ও মমতার পুত্র। মমতা যখন গর্ভিনী ছিলেন তখন তার দেবর, দেব পুরোহিত বৃহস্পতি ভাবীর সাথে সঙ্গম করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভাবী বলেন, আমি ইতোমধ্যেই তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হতে গর্বিনী হয়েছি। বৃহস্পতি তথাপি ভাবীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সঙ্গম অভিলাষ চরিতার্থ করে। গর্ভস্থ শিশু তখন নিজের পা দ্বারা শুক্র প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেয়। বৃহস্পতি এতে ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ভস্থ শিশুকে জন্মান্ধ হওয়ার অভিশাপ দেন। বৃহস্পতির অভিশাপে দীর্ঘতমা মুণি জন্মান্ধ হন। অন্ধ হলে কি হবে, কামধেনুর কাছে গো-ধর্ম শিক্ষা করে দীর্ঘতমা মুণি অত্যন্ত কামুক ও লম্পট হয়ে পড়ে। যত্র-তত্র, যার-তার সাথে সঙ্গমরত হওয়ায় প্রতিবেশী স্ত্রী, পুত্র সকলেই তার প্রত ক্ষুব্ধ হন। একদিন বিরক্ত হয়ে স্ত্রী প্রদ্বেষী ও পুত্ররা তাকে কলার ভেলায় বসিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয়। ভাসতে ভাসতে দীর্ঘতমা গঙ্গার নিম্নাঞ্চলে চলে আসেন। সেখানে গঙ্গাস্নান করছিলেন সেই অঞ্চলের রাজা 'বলি'। বলি রাজা দীর্ঘতমাকে উদ্ধার করে ঘরে নিয়ে আসেন। এদিকে, বলিরাজা ছিলেন নপুংসক এবং সন্তান জন্মদানে অক্ষম। দীর্ঘতমা মুণিকে স্বাস্থ্যবান দেখে বলিরাজা স্বীয় সুন্দরী স্ত্রী সুদেষ্ণা এবং দীর্ঘতমা মুণির অবৈধ মিলনে জন্ম হয় পাঁচ পুত্রের। এই পাঁচ পুত্রের নাম রাখা হয় অংগ, বংগ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুহ্ম তাদের নামেই নাম পেল বংশধরেরা এবং তাদের বাসভূমিগুলো। অর্থাৎ তাদের ধর্মমতে বাংগালী হলো আর্য ঋষি দীর্ঘতমার জারজ সন্তান বংগের বংশধর। বংগদেশ হলো সেই বংগগোষ্ঠীর বাসস্থান।

www.pathagar.com

কৃষ্ণ যজুর্বেদের মৈত্রায়নী সংহিতা (৪/২/২২) অনুযায়ী প্রজাপতি নিজ কন্যা ঊষাতে উপগত হয়েছিলো। .... (ধর্মের নামে, পৃষ্ঠা ২৩) বলির জন্ম হয় সমলিঙ্গ মিলনে। শিব ও বিষ্ণু দুই দেবতাই পুরুষ। তাদের সমলিঙ্গ মিলনে ষষ্ঠের জন্ম হয়।" (দ্রষ্টব্য ঃ ধর্মের নামে, ২৪ ও ২৫ পৃঃ)

বিশ্ব বরেণ্য ইতিহাসবেত্তা আল বেরুনীর উক্তি 'আসল ব্যাপার হচ্ছে যে, হিন্দুরা পরদার গমন বা যৌন ব্যাভিচারের তেমন কঠিন শাস্তি দেয় না'। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য তৎকালীন হিন্দুদের মতে স্বয়ং ভগবান ও দেব-দেবীরা যখন ব্যাভিচারে লিপ্ত তখন ব্যাভিচারের আবার শাস্তি কি।

শ্রদ্ধেয় মওলানা আকরাম খাঁ আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ বামাচারী তান্ত্রিকদের পূজা পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন- "বামাচারীদের শাস্ত্র রুদ্রমংগলতন্ত্রে বলা হইয়াছে ঃ রজস্বলার সহিত সংগম পুষ্করে স্নানতুল্য, চন্ডালী সংগম কাশীযাত্রার তুল্য, চর্মচারিনীর সহিত সংগম প্রয়াগে স্নানের তুল্য, রজকী সংগম মথুরা যাত্রার তুল্য এবং ব্যাধ কন্যার সহিত সংগম অযোধ্যা তীর্থ পর্যটনের তুল্য।"

"যখন বামাচারীরা ভৈরবী চক্রে (নির্বিচারে অবাধে যৌন সম্ভোগের জন্য মিলিত নর-নারীদের একটি চক্র) মিলিত হয়, তখন ব্রাহ্মণ-চন্ডালের কোনো ভেদ থাকে না। একদল নর-নারী অন্যলোকের অগম্য একটি নির্জন স্থানে মিলিত হইয়া ভৈরবীচক্র নামে একটি চক্র রচনা করিয়া উপবেশন করে অথবা দন্ডায়মান হয়। এই কামুকদের সকল পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে বাছিয়া লইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া তাহার পূজা করে। অনুরূপ সকল নারী একজন পুরুষকে বাছিয়া বাহির করে এবং তাহাকে উলঙ্গ করিয়া পূজা করে। পূজা পর্ব শেষ হওয়ার পর শুরু হয় উদ্দাম মদ্যপানের পালা। মদ্যপানের ফলে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইলে পরিধানের সকল বস্ত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া তাহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া পড়ে এবং যাহাকে যাহার ইচ্ছা তাহার সহিত এবং যতজনের সঙ্গে সম্ভব ততজনের সঙ্গে অবাধ যৌন সঙ্গমে মাতিয়া উঠে- যৌন সঙ্গী যদি মাতা, ভগ্নি অথবা কন্যাও হয় তাহাতেও তাহাদের কিছু যায় আসে না। বামাচারীদের তন্ত্রশাস্ত্রে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, একমাত্র মাতা ব্যতীত যৌন সঙ্গম হইতে অবশ্যই অন্য কোনো নারীকে বাদ দিবে না এবং কন্যা হউক অথবা ভগ্নি হউক আর সকল নারীর সঙ্গেই যৌন কার্য করিবে। (জ্ঞান সংকলনীতন্ত্র ঃ মাতৃং যোনিং পরিত্যাজ্য বিহারেৎ সর্বযোনীষু)-এসব বৈষ্ণবতান্ত্রিক বামাচারীদের আরো এতো জঘন্য অশ্লীল ক্রিয়াকলাপ আছে যে তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।" (মুসলেম বংগের সামাজিক ইতিহাস ঃ মওলানা আকরাম খাঁ)।

ইংরেজদের শাসনকালে হিন্দুদের অনেক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং মন্দিরে রক্ষিত দেবদাসীদের ভরণ-পোষণের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছেন ইংরেজ সরকার। মন্দিরের কর্মচারীবৃন্দ ও দেবদাসীসহ সবার বেতন প্রদান করতেন। ইংরেজরা ব্রাহ্মণ ভোজন এবং উৎসবাদি ও বলিদানের জন্য বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতেন।

এ কুপ্রথা আজও ভারতের মন্দিরগুলোতে প্রচলিত হয়ে আসছে। গত ১৩/৬/৯৪ তারিখে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় "ভারতের দু'টি রাজ্যের মন্দিরগুলিতে ৩৭ হাজার

www.pathagar.com

দেবদাসী" শিরোনামে একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে। সংবাদে বলা হয়েছে ঃ

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় দু'টি রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশ ও কর্ণাটকের হিন্দু মন্দিরগুলোতে ৩৭ হাজারেরও বেশি মহিলা দেবদাসী (ভগবানের দাসী) হিসেবে কাজ করছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির এক রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে।

হিন্দু ধর্মে সিঁদুর হচ্ছে বিবাহ বন্ধনের চিহ্ন। বিধবা বা অবিবাহিত নারীর সিঁদুর দেয়ার বিধান নেই। ফলে তাদেরকে ভোগ করা সকলের জন্যই বৈধ। অবাধ যৌনাচারের চিত্র এ প্রথা থেকে ফুটে উঠে।

নৈতিকতার দিক থেকে বিবেচনা করলে হিন্দু বিবাহ বাস্তবিকই ছিল অতি নিকৃষ্ট। কেউ কেউ ঋষিকে কন্যাদান করতো যা 'আর্য বিবাহ' নামে পরিচিত। এছাড়া চুরি অথবা বলাৎকার করে শর্তাধীন সাময়িক বিবাহ প্রথাও প্রচলিত ছিল। অন্যান্য বিবাহ বিধানের মধ্যে 'রাক্ষস বিবাহ', 'অসুর বিবাহ', 'পৈশাচ বিবাহ', 'ব্রহ্মা বিবাহ', 'সান্দব বিবাহ' ছিল হিন্দু ধর্মে সর্বসম্মত।

উন্নতমানের সন্তান লাভের জন্যে হিন্দু স্বামীরা তাদের স্ত্রীদেরকে উচ্চ বংশের বা ঠাকুর দেবতার কাছে পাঠাতো গর্ভবতী হবার জন্যে। ভারতের কেরকের মন্দির গাত্রে বিভিন্ন আসনের যৌন লীলা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গণ-সঙ্গমের এমন বীভৎস দৃশ্য বিশ্বের অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা নিজের কন্যাকে মন্দিরে দিয়ে আসতেন পূজারীদের যৌন তৃপ্তি সাধনের উদ্দেশ্যে। পূজারীরা মন্দিরের মধ্যে দেবদাসীদের সাথে যৌন সঙ্গমে মিলিত হতেন এবং মন্দিরের গাত্রে যৌন সঙ্গমের দৃশ্য 'আসনে'র বাস্তবায়ন করতেন।

"পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথের মন্দির। এই মন্দিরে জগন্নাথদেব অধিষ্ঠিত। এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে খাওয়ানো হয়। এই মন্দিরের বাইরের দেয়ালে ৬৪ রকমের যৌন মিলন ভঙ্গীর ভাস্কর্য আছে। আছে জয় বিজয় তোরণে জগন্নাথদেবের নানা ধরনের যৌনভঙ্গীর চিত্র।"

"মন্দিরের সেবায় রয়েছে ১২০ জন দেবদাসী। এদের কাজ জগন্নাথের মূর্তির সামনে নৃত্য করা। সেই নৃত্য শুরু হয় রাত্রে। প্রতিদিন রাত ১০টার পর মন্দিরের রুদ্ধকক্ষে জগন্নাথের নিষ্প্রাণ মূর্তির সামনে চলে ভজনের নৃত্য। প্রতি রাতেই নাচে এক একটি নতুন মেয়ে। মাঝে মাঝে বাজনা বাজায় পুরোহিত। শুধু পুরোহিত ছাড়া অন্য কারোর থাকার অধিকার নেই এই ঘরে। এক রাতে একজনই শুধু নাচে। এক সময়ে এই নৃত্য চরমে উঠলে দেহের সমস্ত আচ্ছাদন খুলে ফেলে সেই মেয়েটি। নাচতে থাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে। তারপর? তারপরের ঘটনা রীতিমতো রোমহর্ষক, সেই বিবস্ত্রা মেয়েটি নিজেকে সঁপে দেয় জগন্নাথের মূর্তির কাছে। উত্তাল নৃত্যের সঙ্গে উৎকট উত্তেজনায় চিৎকার করতে থাকে– হে প্রভু, তুমি আমার সব। তুমি ইহকাল, তুমিই পরকাল। আমি তোমার স্ত্রী। আমার এ দেহমন সবই তোমার। আমি আর পারছি না। তুমি আমাকে গ্রহণ কর। তারপর যা ঘটনার তাই ঘটে। কে এই বিবসনা যুবতীকে গ্রহণ করে? জগন্নাথের প্রাণহীন মূর্তি না জীবন্ত পুরোহিত? এইসব মেয়েদের শেষ জীবন বড় করুণ।

www.pathagar.com

যৌবন ফুরিয়ে গেলে এদের আর কোন কদর থাকে না। ওইসব চরিত্রহীন পুরোহিতদের কাছে তাই এরা বারাঙ্গানাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয় শেষ বয়সে। আর এইসব দুশ্চরিত্র দুষ্ট অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্যই মনে হয় মন্দিরের গায়ে অতসব যৌন মিলনের ভাস্বর্য রয়েছে।"

আলোকবাবু লিখেছেন, "মন্দির আমাদের কাছে পবিত্র স্থান। কিন্তু নানারকম অপবিত্র কাজই সংগঠিত এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে। কালীঘাটের কালী মন্দিরের পাশেই পতিতালয়।... তারাপীঠের মন্দিরের চারপাশের হোটেলগুলোতে খোঁজ নিলে দেখা যাবে ভক্তের চেয়ে ভন্ডের সংখ্যাই বেশি। যৌন সঙ্গমের জন্যে প্রচুর নর-নারীর ভিড় সেখানে। [ধর্মের নামে, পৃষ্ঠা ৪৮]

তারকেশ্বরের মন্দিরে "দেখা যাক এত ভিড় হয় কেন সেখানে। এই মন্দিরের চারপাশেও ঘর ভাড়া দেওয়া হয় সম্ভোগের জন্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পান্ডারাই সবকিছুর ব্যবস্থা করে দেয়।" [ঐ, পৃঃ ৪৮]

"একটি কেরালার চেঙ্গানন্দের কালীমন্দির। ধূর্ত পুরোহিত এমন নোংরা কাজ করেছিল যা কল্পনাও করা যায় না।... হঠাৎ একদিন সেই পুরোহিত ঘোষণা করে কালীমন্দিরের মা কালীর প্রতিমাসে মাসিক রক্তস্রাব হচ্ছে। আর সেই রক্তে ভেজা ন্যাকড়া সব রোগ সারিয়ে দেয়। সে কি ভীড় মন্দিরে; অন্ধ বিশ্বাসী ভক্তদের মধ্যে সেই ন্যাকড়া বিতরণ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ঐ শয়তান পুরোহিত। আসলে সে তার স্ত্রী ও মেয়ের মাসিক ঋতুস্রাবে ব্যবহৃত ন্যাকড়া খন্ড খন্ড করে অন্ধ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করত।" [ঐ, পৃঃ ৫০]

"বিপুল ঐশ্বর্যের ভান্ডার তিরুপতি মন্দিরের বর্তমান রোজগার সোমনাথ মন্দিরের অতীতের উপার্জনকেও ছাড়িয়ে গেছে। ...শোনা যায় মন্দিরের মাসিক আয় তিন কোটি টাকার উপর। অর্থাৎ রোজ ১০ লাখ টাকার বেশী। বিশেষভাবে বিবাহিতা নারীদের সতীত্ব নষ্ট করার ব্যাপারে এদের জুড়ি মেলা ভার। কিভাবে এইসব লম্পট চরিত্রহীন পুরোহিতরা ধর্মবিশ্বাসী সরল নারীদের সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হয় সেই কাহিনী আলোকবাবু লিখেছেন ডক্টর অতুল সুরের উদ্ধৃতি দিয়ে, "অনেক সময় ধর্মের রূপ দিয়ে কামাচারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা বিবাহিত নারীদের প্রলুব্ধ করত, তাদের সতীত্ব বিসর্জন দিতে। দেবতার আশ্চর্যশক্তি আছে স্ত্রীলোকের বন্ধ্যাত্ব দূর করবার। এরূপ মন্দিরের মধ্যে কর্ণটিক দেশের তিরুপতি মন্দির বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এখানকার দেবতা ভেন-কাটেশ্বরের কাছে অসংখ্য স্ত্রীলোক আসে সন্তান কামনায়। পুরোহিতগণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তারা মন্দিরে রাত্রিযাপন করে। পুরোহিতগণ তাদের বলে যে তাদের ভক্তির দ্বারা প্রীত হয়ে ভেনকাটেশ্বর রাতে তাদের কাছে আসবে এবং তাদের গর্ভবতী করে দিয়ে যাবে। তারপর যা ঘটত তা না বলাই ভাল। পাঠক তা সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন। পরদিন প্রভাতে এই সকল জঘন্য চরিত্রের ভক্ত তপস্বীরা কিছুই জানে না এরূপ ভান করে ঐ সকল স্ত্রীলোকের কাছে এসে দেবতার করুণা লাভ করেছে বলে তাদের পুণ্যবতী আখ্যা দিয়ে তাদের কাছ হতে দান গ্রহণ করত। দেবতার সঙ্গে তাদের যৌনমিলন ঘটছে এই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে এই সকল হতভাগিনী নারীরা নিজ নিজ গৃহে

www.pathagar.com

ফিরে যেত।" [ঐ, পৃষ্ঠা ৫২]। "মোদ্দা কথা, ব্যাপারটা আসলে ধর্মের নামে লোক ঠকানোর ব্যবসা। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ২২০০ বছর আগে লেখা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। মিথ্যা প্রচার চালিয়ে সরল বিশ্বাসী মানুষদের স্রেফ প্রতারণা করা হতো। যেমন 'কোনো প্রসিদ্ধ পুণ্যস্থানে ভূমিভেদ পূর্বক দেবতা নির্গত হইয়াছেন, এই ছলে সেখানে রাত্রিতে বা নির্জনে একটি দেবতার বেদী স্থাপন করিয়া এবং এই উপলক্ষে উৎসাবাদি ও মেলা বসাইয়া সেই স্থানে শ্রদ্ধালু লোকের প্রদত্ত ধন দেবতাধ্যক্ষ গোপনে রাজসমীপে অর্জন করিবেন।' [কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, ৫ম অধিকরণ, ২য় অধ্যায়, ৯০তম প্রকরণ]। ঐ গ্রন্থেরই ৯০তম প্রকরণে একথাও আছে, "দেবতাধ্যক্ষ (অর্থাৎ প্রধান পুরোহিত স্থানীয় ব্যক্তি) ইহাও প্রচার করিতে পারেন যে উপবনে একটি বৃক্ষ অকালে পুষ্প ও ফলযুক্ত হইয়াছে" [ঐ, পৃঃ ৫৯ঃ। 'ধর্ম ও কুসংস্কার' পুস্তকে সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা হতে লেখক লিখেছেন, "বন্ধ্যা রমণী দেবতার কাছে মানত করতেন তাঁর সন্তানাদি হলে তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রথমটিকে দান করবেন। এভাবে প্রথম সন্তানকে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে বিসর্জন দেয়া হতো।"

পাঞ্জাবে কোনো কোনো জায়গায় কন্যাকে হত্যা করা হতো এবং বলা হতো 'তুমি যাও তোমার ভাইদের পাঠিয়ে দিও'। দাক্ষিণাত্যের নায়ার জাতির লোকেরা হাম, বসন্ত ইত্যাদি নিবারনের জন্য প্রথম সন্তানটিকে দেবীর কাছে বলি দিত। [ঐ, পৃষ্ঠা ৬৩]

"উপনিষদে আছে কয়েকজন মুনি কোনো এক ঋষির অপরূপ সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে কামোন্মত্ত হয়ে তাকে টানতে টানতে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়। ঐ দুশ্চরিত্র মুনিদের হাত থেকে নিজের স্ত্রীকে রক্ষার কোনো চেষ্টাই করে না সেই ঋষি। অসহায় মায়ের এই অপমানে পিতাকে নীরব দর্শকের ভূমিকায় দেখে পিতৃভক্ত পুত্র একেবারে বিস্মিত। ক্ষিপ্ত পুত্র পিতার কাছে এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জানতে চায়। জবাবে পিতার উক্তি- "নারী হচ্ছে ভোগের সামগ্রী। তাই কেউ ভোগ করতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া উচিত না। তাছাড়া এক্ষেত্রে নারীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছারও কোনো মূল্য নেই।" এ প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর কথাও উল্লেখযোগ্য। দ্রৌপদী চরিত্রে যত মহত্ত্বই আরোপ করা হোক না তার পঞ্চস্বামী ভোগ কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ঠিক এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিবস্ত্রা গোপিনী দর্শনও সমর্থনযোগ্য নয়। শ্রীকৃষ্ণের এই বিকৃত রুচি সমাজের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি- তা শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে যত দর্শনই প্রদর্শন করা হোক।" [পৃষ্ঠা ৬৫ হতে ৬৬]

লেখক আলোক বাবু তাঁর পুস্তকের ১০৭ পৃষ্ঠায় ডঃ অতুল সুরের বই হতে উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন- "তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ 'ম'-কার সহকারে চক্রপূজার ব্যবস্থা আছে। পঞ্চ 'ম'-কার হচ্ছে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। তন্ত্রপূজার এগুলো হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। তন্ত্রে শক্তি সাধনা ও কুলপূজার উপর বিশেষ করে জোর দেয়া হয়েছে। কোনো স্ত্রীলোককে শক্তির প্রতীক ধরে নিয়ে তার সঙ্গে যৌন মিলনে রত থাকাই তান্ত্রিক সাধনার মূল তত্ত্ব। গুপ্ত সংহিতায় বলা হয়েছে যে, সে ব্যক্তি পামর যে ব্যক্তি শক্তি সাধনার সময় কোনো স্ত্রী লোকের সঙ্গে মৈথুন ক্রিয়ায় নিজেকে না নিযুক্ত রাখে। নিরুক্ততন্ত্র এবং অনেক তন্ত্রে বলা হয়েছে যে শক্তি সাধক কুলপূজা হতে কোনোরূপ পুণ্যফল পায় না, যদি না সে কোনো বিবাহিতা নারীর সাথে যৌন মিলনে প্রবৃত্ত হয়। এ কথাও বলা

www.pathagar.com

হয়েছে যে, কুলপূজার জন্য কোনো নারী যদি সাময়িকভাবে স্বামীকে পরিহার করে তবে তার কোনো পাপ হয় না। সমাজের দৃষ্টিতে যাকে অযাচার বলা হয় অনেক সময় এটা সেরূপও ধারণ করতো। কেননা কুলচূড়ামণিতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, অন্য রমণী যদি না আসে তাহলে নিজের কন্যা বা কণিষ্ঠা বা জেষ্ঠা ভগিনী, মাতুলানী, মাতা বা বিমাতাকে কুলপূজা করবে। ["অন্যা যদি ন গচ্ছেতু নিজ কন্যা নিজানুজা। অগ্রজা মাতুলানী বা মাতা তসপত্নীকা। পূর্বাভাবে পরা পূজ্য মদংশা ঘোষিতো মতাঃ। একা চেৎ কুল শাস্ত্রজ্ঞ পূর্জার্হা তত্র ভৈরব।"]

এবার দেখা যাক সেই তন্ত্রসাধনা বা কুলপূজা কিভাবে হতো– রাত্রিকালে সাধক 'আমি শিব' (ধ্যাত্বা শিবোহমতি) এইরূপ ভাবতে ভাবতে নগ্ন অবস্থায় নগ্না রমণী রমণ করতো (ততো নগ্নাং স্ত্রিয়ং নগ্নং রমণ ক্লেদযুতোহপি বা) রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নিজ সাধন কার্যে লিপ্ত থাকবে। কুলার্ণবতন্ত্র এই সাধন প্রক্রিয়া কি তা আমি আর বাংলায় অনুবাদ করব না। মূল সংস্কৃত শ্লোকই এখানে উদ্ধৃত করছি–

"আলিঙ্গনং চুম্বনঞ্চ স্তনয়ো মর্দনস্তথা।
দর্শনং স্পর্শনং যোনি বিকাশো লিঙ্গ ঘর্ষণম্।
প্রবেশ স্থাপনং শক্তের্নব পুষ্পা নিপুজনে।" [ঐ পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮]

সংস্কৃত ভাষা মোটেই যিনি জানেন না শুধুমাত্র বাংলা জানেন, তিনিও সহজেই এই সংস্কৃতি শ্লোকের আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তনমর্দন, স্পর্শ, যোনি বিকাশ, লিঙ্গ ঘর্ষণ, প্রবেশ ও স্থাপন শব্দগুলো হতেই নোংরামির পরিমাপ করতে পারবেন সহজেই।

বারাঙ্গনা, বেশ্যা, পতিতা, দেহোপজীবী প্রভৃতি নামে হতভাগ্য দেহ ব্যবসায়ীরা সমাজে আজ কলঙ্কিতা। আবার পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষ সম্প্রদায় ঐ কলঙ্ক থেকে নিজেদের আড়ালে রাখতে সর্বতোভাবে সক্ষম হয়েছে। অথচ চরিত্রহীন পুরুষদের বীভৎস্য ক্ষুধা মেটাতেই তাদের অবতারণা। তাই নিষিদ্ধপল্লী বা পতিতালয়ের নারীদের যেখানে পতিতা বলা হয় সেখানে পুরুষদের পতিতা বলা হয় না। এটা ঠিক আমাদের প্রসঙ্গ নয়। আমাদের প্রসঙ্গ হচ্ছে– ধর্মকেন্দ্রিক, ধর্মের মোড়কে মোড়া মন্দিরে ও নানা ধর্মস্থানে পুণ্য সঞ্চয়ের নামে যা সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে সে সম্বন্ধে তথ্যভিত্তিক আলোচনা। নবপরিকল্পিত স্বর্গ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলে এ প্রাচীন সভ্যতা চালু করা সার্বিক উন্নতির অনুকুল হবে না প্রতিকুল তা ভাববার বিষয়।

শ্রীমতি আরতি গঙ্গোপাধ্যায় নামী-দামী লেখকদের লেখা ৩৭টি বই থেকে সাহায্য নিয়ে ১৯৮২ সালের মার্চ মাসে 'প্রসঙ্গ দেবদাসী' নামে একটি পুস্তকে যেসব আলোচনা করেছেন তা আমাদের কারো মতে অত্যন্ত উপাদেয়, সমাজকল্যাণের অমূল্য সম্পদ। আবার কারো মতে হয়তো বা তা ধর্মবিরোধিতা ও অশ্লীলতা। তিনি তাঁর পুস্তকের ৬০ পৃষ্ঠায় মন্দিরের দেবদাসী সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে দেবদাসীদের বেশ্যা বলেই প্রমাণ করেছেন। লিখেছেন, "দেবদাসী– মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতায় এক বিশেষ ধরণের বারবণিতা।" তিনি আরও লিখেছেন, "মনোরঞ্জনই ছিলো এই দেবদাসীদের অবশ্য কর্তব্য। এই মনোরঞ্জন রাজার রাজপুরুষদের এবং পুরোহিতদের।"

www.pathagar.com

"এ প্রথা নতুন নয়, যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ভারতবর্ষে এই দেবদাসী প্রথা সবচেয়ে ব্যাপক। ভারতীয় নারী সমাজ বহু যুগ ধরে এই প্রথার প্রভাবে অত্যাচারিত। ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭২ ও ৩৭৩ ধারায় অপ্রাপ্ত বয়স্কা কুমারীদের মন্দিরে উৎসর্গ করার জন্য ১৯৪৭ সালে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দেবদাসী প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে আইনের সাহায্যে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে দেবদাসী প্রথা আজও বিলুপ্ত হয়নি।" [৩ পৃষ্ঠা]। এদেরই কেউ কেউ মন্দিরে নিয়েজিত হতো দাসীরূপে। এছাড়া কাঞ্চনমূল্যে কিনে বা বলপ্রয়োগে এদের সংগ্রহ করা হতো। অথবা রাজভয়ে গৃহস্থরা মেয়েদের দাসীরূপে নিবেদন করত মন্দিরে।" [ঐ, পৃষ্ঠা ৮ দ্রঃ]

"বেশ্যাবৃত্তিকে স্বাধীন বৃত্তিরূপে প্রতিষ্ঠার করার পিছনে দেবদাসীবৃত্তিই সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা। মন্দিরবাসীরা যে কার্যতঃ পুরোহিতদের মনোরঞ্জন করতেন সে সম্বন্ধে ইতিহাসে বহুবিধ তথ্য প্রমাণ আছে।" [ঐ পৃষ্ঠা ৯]। "দেবতার নামে যত অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তার চূড়ান্ত হয়েছে দেবদাসী প্রথার মাধ্যমে– নারীর অবমাননা।" [ঐ, পৃষ্ঠা ১৪]

দেবদাসীদের বেশ্যা না বলে তাদের অন্য নানা নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল; যেমনঃ দত্তা ঃ কোন পুণ্যলোভী গৃহস্থ স্বেচ্ছায় মন্দিরে কন্যা দান করলে সে হতো 'দত্তা' দেবদাসী।

হৃতা ঃ যে সব মেয়েকে হরণ করে নিয়ে এসে মন্দিরে উপহার দেয়া হতো।

বিক্রিতা ঃ মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কন্যাকে বিক্রি করলে সে বিক্রিতা দেবদাসী রূপে গণ্য হতো।

ভৃত্যা ঃ যে দেবদাসী মন্দিরের কাজে ভৃত্যরূপে আত্মোৎসর্গ করার জন্য স্বেচ্ছায় মন্দিরবাসিনী হতো সে ভৃত্যা।

ভক্তা ঃ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারিণী সন্ন্যাসিনীকে ভক্তা দেবদাসী বলা হতো।

অলংকারা ঃ নৃত্যগীত ও কলাবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর যে নারীকে অলঙ্কৃত করে দেবমন্দিরে অর্পণ করা হতো সে অলঙ্কারা। রাজকন্যারাও এভাবে মন্দিরে অর্পিতা হতেন।

গোপিকা বা রুদ্রগণিকা ঃ এরা নির্দিষ্ট সময়ে নৃত্যগীত করার জন্য মন্দিরের বেতনভোগিনী দেবদাসী সম্প্রদায়রূপে পরিচিতা।" [আরতি দেবী ঃ ঐ, ২২-২৩ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

দামোদর ভট্টাচার্যের লেখা 'কুট্টনীমতম'-এ নানা বর্ণনা আছে। তিনি বলেছেন যে, "দেবদাসীরা মন্দিরের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যা পেতেন, তাই তাঁদের আয় ছিল এবং এই জীবিকা ছিল বংশানুক্রমিক বা ক্রমোপগত।"

ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'সময়াকৃত' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বলেছেন যে, "দেবদাসী দেবালয়ে তার কর্মের জন্য শস্য প্রাপ্ত হয় মজুরী হিসাবে। মন্দিরগুলোতে একাধিক দেবদাসী ছিল। তারা ক্রমান্বয়ে নৃত্যগীত করতো। মুক্তেশ্বর মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লিখিত আছে যে পহ্লব রাজ্ঞী ধর্মমহাদেবী চুয়াল্লিশজন দেবদাসীর নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা মন্দিরের কর্মাধ্যক্ষের কাছ থেকে বেতন পেতেন।" [ক্ষেমেন্দ্রের 'সময়াকৃত', ২৫ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

www.pathagar.com

"স্বয়ং চৈতন্যদেব পুরীর মন্দিরের তৎকালীন দেবদাসীকে অনুগ্রহ করে ধর্মদীক্ষা দিয়েছিলেন চৈতন্যচরিতামৃতে তার উল্লেখ আছে। অদ্যাবধি দেবদাসী পদ জগন্নাথ মন্দিরে যথেষ্ট সম্মানিত পদ। রথযাত্রা উপলক্ষে দেবদাসীর উপস্থিতি অবশ্য কর্তব্য।.... উড়িষ্যা থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারতের সকল জায়গাতেই এই একই প্রথা অনুসৃত। .... দেবদাসী বৃত্তির অন্য দিকটি অর্থাৎ বারাঙ্গনাবৃত্তি এখন সোজাসুজি মন্দিরের বাইরেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।" [ঐ, পৃষ্ঠা ৩১, ৩২]

"তবে একথা ঠিক, অদ্যাবধি উপজাতি সমাজে নারীর মূল্য ও সামাজিক অধিকার অনেক বেশি। কিন্তু পাল, সেন বা তার পরবর্তী যুগে আর্য জীবনযাত্রার যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাতে নারীর মূল্য বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়নি।" [ঐ, পৃষ্ঠা ৩৫]

"মহাভারতের 'যযাতি উপাখ্যানে' আমরা ঋষি গালবের বৃত্তান্ত পাই। রাজা যযাতি ঋষি গালবকে তাঁর প্রার্থিত অর্থ উপার্জনের উপায়স্বরূপ কন্যা মাধবীকে তাঁর হাতে দান করেছিলেন। মাধবী পর্যায়ক্রমে তিনজন রাজা, একজন ঋষির শয্যাভাগিনী হয়ে চারটি পুত্র প্রসব করে গালিবের প্রার্থিত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কোন ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়েও এ ঘটনার নৃশংস বর্বরতাকে চাপা দেওয়া যায় না।" [ঐ, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭]

"দেবদাসী প্রথার নামে গণিকাবৃত্তি প্রচলন এখন তাই বেশ স্বাভাবিক। মাদ্রাজ শহরের গণিকাপল্লীকে 'দেবপল্লী' বলে অভিহিত করা হয়।" [ঐ, পৃষ্ঠা ৪১-৪২]

"পুরোহিতদের প্রভাবে এবং কার্যকরী সাহায্যে অনেক কুসংস্কার ও কুপ্রথার মতো দেবদাসী প্রথাও অদ্যাবধি প্রচলিত।" [ঐ, পৃষ্ঠা ৪৩]

"বর্তমান দেবদাসী প্রথা ব্যাপকভাবে বেড়ে চলেছে বিশেষ একটা ভূখন্ডে। কর্ণাটক, কেরল, মহারাষ্ট্র, গোয়া, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে এই প্রথার ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ার প্রধান কারণ হল, পশ্চিম উপকূলের শহরগুলিতে বারবণিতার চাহিদা।... মহারাষ্ট্রের বিচিত্র জাতিবিন্যাসের বর্ণনায় বলা হয়েছে কতকগুলি তপশিলী নিম্নজাতির মধ্যে 'মাঙ্গ জাতি', 'মাহার জাতি' ও 'চামার জাতির' অন্যতম বৈশিষ্ট্য এরা নাচ গানে পারদর্শী। বর্তমানে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের এই সাংলী জেলাতেই 'মাঙ্গ' জাতির উপাস্য দেবী 'ইয়ালাম্মা'কে কেন্দ্র করে দেবদাসী প্রথা চালু আছে।" [পৃষ্ঠা ৫৬]

"কর্ণাটকে দেবদাসী কথাটা চালু নয়। ব্যবহারিক সংজ্ঞা হল 'বাসবি', 'কসবি', 'সুলী' ইত্যাদি। 'বাসবী' অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিনী, 'কসবি'– দেহ ব্যবসায়ী আর 'সুলী' মানে ব্যবসায়ী বেশ্যা। পতিতা পল্লীগুলির বিভিন্ন নাম। গোয়াতে এদের নাম 'ভবানী', পশ্চিম উপকূলে 'কুড়িয়ার', অন্ধ্রে 'ভগমবন্ধাল', তামিলনাড়ুতে 'তেবরিয়াব'এবং মহারাষ্ট্রে 'মুরলী ও 'আরাধিনী'। [পৃষ্ঠা ৫৭]

দশম শতাব্দীতে জৈন মন্দিরগুলিতেও দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করার এটা ছিল সহজ উপায়। ১৩৯০ সাল পর্যন্তও তিরুপতি ও নঞ্জনগুডের মন্দিরে দেবদাসী নিয়োগ করা হয়েছে।... কিন্তু আর্য প্রভাবিত দেবদাসী প্রথার সর্বনাশা দিকটাই এখানেও প্রকট– ধর্মীয় আবরণের আড়ালে দেবদাসীদের উপভোগের সামগ্রীতে পরিণত করা।" [পৃষ্ঠা ৫৯]

www.pathagar.com

“পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ সকলেই স্থানীয় মেয়েদের ‘উপপত্নী’ হিসাবে বাড়ীতে রাখতো। এদের সন্তান সন্ততিরা বর্তমানে ভারতীয় জাতিবিন্যাসে একটা বড় অংশ।” [পৃষ্ঠা ৬০]

“ধনদেবতা কুবেরের নবমন্দিরের এই নতুন দেবদাসীরা মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত।” [পৃষ্ঠা ৬৩]

“প্রথমত পরিবারের অনেকগুলি মেয়ে থাকলে অন্ততঃ একটিকে দেবতার কাছে দিতে হবে এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ।.... কোন দম্পতি সন্তানহীন হলে মানত করে প্রথম কন্যা সন্তানটিকে দেবতার কাছে উৎসর্গ করা ছিল প্রাচীন নীতি।. সাত-আট বছর বয়সের মধ্যেই তাকে উৎসর্গ করতে হতো।” [পৃষ্ঠা ৬৬]

“বর্তমানে যে সমস্ত মন্দিরে দেবদাসী উৎসর্গ করা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে ইয়েলেম্মা যুগপৎ কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের লোকদেবী। কামাপুরের কমলেশ্বরী, খান্ডবার ভাগ্যমুরলী, মহেগাশীর সান্তাদুর্গা ও অন্যান্য লোকদেবীদের মন্দিরেও দেবদাসী প্রথা চালু রয়েছে। এছাড়া হনুমান মন্দির ও জগদগ্নি মন্দিরেও দেবদাসী প্রথা চালু আছে, যদিও এঁরা লোকদেবী নন। হনুমান তাঁর ব্রতচারী কুমার জীবনের জন্য পূজিত ও প্রশংসিত। তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য নারীভোগের ব্যবস্থার ব্যাপারটি কৌতুহল উদ্রেক করে।... সৌন্দর্তী মন্দিরে [হেয়েলেম্মা গুড্ডা] দেবদাসী উৎসর্গ হতো বলে জানা গেছে।.... উগার গোলে ইয়েলাম্মা পাহাড়ের কোলে অবস্থিত মন্দিরে দেবদাসী উৎসর্গ হয়।..... ধর্মের আবরণ ছাড়াই বর্তমানে এখানে বেশ্যাবৃত্তি চলছে অবাধে।” [পৃষ্ঠা ৬৮] “মুগলকোড, মাঙ্গসুলী, কোকটনুর, তেরদাল কুরচি এবং আঠানী শহরের নিকটবর্তী শংকরহাট্টি, থারুর ইত্যাদি গ্রামে অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে দেবদাসী উৎসর্গ করা হয়।.... বিজাপুর শহর ও বিজাপুর জেলার সমস্ত তালুকেই দেবদাসী প্রথা প্রবলভাবে প্রচলিত। ‘দেবদাসী বলয়’ নামে যে অঞ্চলটি কর্নাটক ও মহারাষ্ট্রের সংযোগস্থল তার প্রধান অংশ এই জেলাতেই বর্তমান। এই শহরগুলিতে পতিতাপল্লী অত্যন্ত সমৃদ্ধ। শহর ছাড়া নিকটবর্তী গ্রামগুলিতেও দেবদাসী ও অন্য পতিতাদের সমারোহ ব্যাপক।” [পৃষ্ঠা ৬৯-৭০]

“দেবদাসী উৎসর্গ করা হয় ইয়েলেম্মার মন্দিরেই সবচেয়ে বেশী। তুলসীগোরির হনুমান মন্দিরে, টিকেটায় মন্দিরেও দেবদাসীদের উৎসর্গ করা হয়। এছাড়া জগদগ্নি মন্দির ও পরশুরাম মিন্দরে দেবদাসী উৎসর্গ করা হয়।”

“এই সময়কার দৃশ্যটা এই, দূর-দুরান্ত থেকে দলে দলে যাত্রীরা আসছে। মাইলখানেক লম্বা গাড়ীর সারি। সারি সারি নগ্নদেহ নিমপাতার মালাপরা ছোট ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে উৎসর্গীত হবার জন্য, শুকনো উপবাসক্ষিণ্ন মুখ, স্নান করানো বলির ছাগশিশুর মতো। একবার দেবদাসী হয়ে গেলে তাদের আর বিবাহ নিষিদ্ধ।” [ঐ গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৭২]

“যদিও সাধারণ জনসমাজ এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, তবুও মুষ্টিমেয় মন্দির কর্তৃপক্ষ হিন্দু ধর্ম রক্ষণের নামে তাঁদের নিজেদের স্বার্থ [vested interest] রক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। মন্দিরের অধিকার এবং পবিত্রতা রক্ষার

www.pathagar.com

নামে তাঁরা আসলে মন্দিরের সম্পদকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে মন্দিরের পবিত্রতা নষ্টই করেছেন।" [ঐ, পৃষ্ঠা ৭৩]

"অল্পবয়স্কা বা অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকার বিবাহ সরকারী আইনে নিষিদ্ধ হয়। এই সংশোধন প্রস্তাবটি আইনে রূপান্তরিত হওয়ার পর ১৮ বছরের মেয়েদের উৎসর্গ করা শুরু হলো।" [ঐ, পৃষ্ঠা ৭৮]

"ভারতে সর্বত্র পতিতালয় নিষিদ্ধ হয় ১৮৫৫ সালের পার্লামেন্ট আইনে, কিন্তু এই ব্যাপক পতিতাবৃত্তির উপর তা প্রয়োগ করবার কোন উপায় ছিল না। শ্রীমতি মুথুলক্ষী রেডিড এই আইনের ফাঁকটা ধরে ফেললেন। তিনি দেখলেন যে, ভারতীয় মন্দিরগুলি সম্বন্ধে এই আইন প্রযুক্ত হতে পারছে না। ফলে এই প্রথা ধীরে ধীরে কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। মাদ্রাজ শহরেই পতিতালয়গুলি প্রকাশ্যে 'দেবীপল্লী' বলে অভিহিত হতে শুরু করেছে।" [ঐ, পৃষ্ঠা ৭৮]

রিপোর্টের বরাত দিয়ে নয়াদিল্লী থেকে সিনহুয়া জানায়, এসব দেবদাসীর সিংহভাগই হচ্ছে নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং স্থানীয় প্রথা ও ঐতিহ্য অনুযায়ী খুব অল্প বয়সে বয়ঃসন্ধিক্ষণেই এদের এই পেশায় নিয়োগ করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, মন্দিরগুলোতে অল্প বয়সের এই মেয়েরা যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ায় দেবদাসীর এই প্রথা প্রকৃত পক্ষে শিশু পতিতাবৃত্তিকেই বাড়িয়ে তুলছে।

ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক দুর্গতিসহ বেশকিছু কারণে অধিকাংশ পরিবার দেবদাসী হিসেবে কাজ করতে তাদের মেয়েদের উৎসর্গ করে থাকে। তবে এই উৎসর্গ সত্ত্বেও এসব পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। উল্লেখ্য, অন্ধ্র প্রদেশ ও কর্ণাটক উভয় রাজ্যেই দেবদাসী প্রথা বিরোধী আইন বলবৎ রয়েছে।

পরাধীন বৃটিশ আমলে এই ভারতে নাচে গানে পটু বেশ্যাদের একটা সম্মানীয় নাম ছিল– বাঈজী। ঐ সুন্দরী বেশ্যা-বাঈজীর মধ্যে যার ছিল খুব খ্যাতনামা তাদের নাম নিকি, সুপন, বকনাপিয়ারী, হিঙ্গুল প্রভৃতি। ঐ বাবু ও জমিদারেরা এদের ভাড়া করে আনতেন। নাচ, গান, বাজনা আর খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে বাজী পোড়ানো এবং আরও কুৎসিত আমোদ প্রমোদের উৎসব চলতো ঢালাওভাবে। বাড়ির এই উৎসবে ইংরেজ মনিবদের নেমতন্ন করা হতো। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডক্টর বিনয় ঘোষের একটি মন্তব্য বেশ উপভোগ্য– "সন্ধ্যার পর নগরমধ্যে পাপের মহোৎসব উপস্থিত; কোনো স্থানে বহু ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া গণিকার গৃহে প্রবেশ করিতেছে। কুত্রাপি কোনো বাবুর কদাচারের সাক্ষী স্বরূপ অশ্বযান তাঁহার রক্ষিতা বেশ্যাদ্বারে স্থাপিত হইয়াছে; কোনো কোনো বেশ্যার আলয় হইতে মাদকোন্মত্তসমূহ লম্পটের উল্লাস কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে। কুত্রাপি গণিকার অধিকারের জন্য বিমোহিত পুরুষেরা বিবাদ কলহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছে।"

ডক্টর কুমুদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বুলবুল পাখির লড়াই, খেউর গান, বাঈনাচ ও বেশ্যাগমন– এই ছিল নগর কলকাতার নাগরিক জীবনের একমাত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়। 'আত্মীয়সভা' 'ধর্মসভা'র গোষ্ঠীভুক্ত রাজা রামমোহনের বাড়িতে, প্রিন্স দ্বারকানাথের বাগান বাড়িতে, রাজা রাধাকান্তদেবের গৃহে, মহারাজা সুখময় রায়ের বাড়িতে, রাজা

www.pathagar.com

গোপীমোহন দেবের বাড়িতে, বেনিয়ান বারানসী ঘোষের বাড়িতে নাচ গান মদ বাঈজী ও আতসবাজী পোড়ানোর বল্গাহীন কুৎসিত আমোদ প্রমোদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা চলতো।" (দ্রষ্টব্য ভট্টাচার্য, ঐ, পৃঃ ৬১)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর অতুল সুর তাঁর '৩০০ বছরের কলকাতা, পটভূমি ও ইতিকথা' বইতে 'বাবু'দের জন্য 'কলিকাতা কমলালয়' থেকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন– "এরা বনিয়াদী বড় মানুষ নয়, ঠিকাদারী, জুয়াচুরি, পোদ্দারী, পরকীয়া রমণী সংঘটন ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করে বড়লোক হয়েছেন।" এরপরেই ডঃ অতুল সুর লিখেছেন, "ভবানীচর এদের 'বনিয়াদী বড় মানুষ নয়' বললেও, এরাই কলকাতা শহরের বনিয়াদী পরিবারসমূহের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে দাঁড়ায়।"

এই 'বাবু'রা যেমন করে 'বাবু' হবার পাঠ নিতেন সেকথা ডক্টর সুর তাঁর বইতে লিখেছেন।

"যেহেতু 'নববাবু বিলাস' হচ্ছে সমসাময়িককালের বাবু কালচারের একখানা বিশ্বস্ত দর্পণ, সেজন্য ওতে বাবুর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করা হচ্ছে। বাবুর মোসাহেবরা বাবুকে উপদেশ দিচ্ছে– 'শুন, বাবু টাকা থাকিলেই হয় না। ইহার সকল ধারা আছে। আমি অনেক বাবুগিরি করিয়াছি এবং বাবুগিরি জারিজুরি করিয়াছি এবং অনেক বাবুর সহিত ফিরিয়াছি, রাজা গুরুদাস, রাজা ইন্দুনাথ, রাজা লোকনাথ, তনুবাবু, রামহরি বাবু, বেণীমাধব বাবু প্রভৃতি ইহাদিগের মজলিস শিখাইয়াছি এবং যেরূপে বাবুগিরি করিতে হয় তাহাও জানাইয়াছি। এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত তথাপি ইচ্ছা হয় তুমি যেরূপে উত্তম বাবু হও এমত শিক্ষা দিই।'

প্রথম উপদেশ। যে সকল ভট্টাচার্যরা আসিয়া সর্বদা টাকা দাও, টাকা দাও এই কথা বই আর অন্য কথা বলে না, তাহাদের কথায় কান দিবে না। আমার পিতার শ্রাদ্ধের সময় উহারা যখন কহিল, বাবু শ্রাদ্ধের কি করিব। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে শ্রাদ্ধের ফল কি? উহারা বলিল, পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়। আমি বলিলাম, কোনোকালেও শুনি নাই যে মরা গরুতে ঘাস জল খাইয়া থাকে। ভট্টাচার্য শেষে কহিল বাবুজী আর কিছু কর না কর, পিন্ডদানটা করা আবশ্যক। তাহাতে আমি কহিলাম আজ আমি উত্তম বুদ্ধিমতী পরধার্মিকা বকনা পিয়ারীর ('বেশ্যাপ্রধানা') নিকট যাইব তাহারা যেরূপ পরামর্শ দিবে সেরূপ করিব। বকনা পিয়ারী আমাকে কহিল, 'তুমি এক কর্ম কর– এক ব্রাহ্মণকে ফুরাইয়া দাও, শ্রাদ্ধ দশপিন্ড ব্রাহ্মণ ভোজনাদি যত কর্ম সেই করিবেক। আমিও তাবত কর্ম ফুরাইয়া দিলাম। অতএব, নির্বোধ ভট্টাচার্যেরা আগমন করিলে কদাচ আসিতে আজ্ঞা হয় বসিতে আজ্ঞা হয় এরূপ বাক্য বলিবে না, যদ্যপি কিঞ্চিৎ দিতে হয়, তবে কহিবা সময়ানুসারে আসিবে। এইরূপ মাসেক দুই মাস প্রতারণা করিয়া কিঞ্চিত দিবা।"

দ্বিতীয় উপদেশ। গাওনা বাজনা কিছু শিক্ষা কর যাহাতে জিউ খুশী থাকিবে এবং যত বারাঙ্গানা আছে তাহাদিগের বাটীতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়া ঐ বারাঙ্গনাদিগের সর্বদা ধনাদি দ্বারা তুষ্ট রাখিবে, কিন্তু যবনী বারাঙ্গনা সম্ভোগ করিবে; কারণ, তাহারা পেঁয়াজ, রসুন আহার করে সেইহেতু তাহাদিগের সহিত সম্ভোগে যত মজা পাইবে এরূপ অন্য কোন রাঁড়েই পাইবে না। যদি বল যবনী বেশ্যা গমন করিলে পাপ হইবে তাহা

www.pathagar.com

কদাচ মনে করিবে না। যাহাদের পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা থাকে তাহারাই উত্তম স্ত্রী সম্ভোগ করে। যদি বেশ্যা গমনে পাপ থাকিত, তবে কি উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বেশ্যার সৃষ্টি হইত? তারপর পয়ার ছন্দে বললেন–

'কর গিয়া বেশ্যাবাজি,
যদি বল কর্ম পাজি,
মন শুচি হলে পাপ নয়।
যাহার যাহাতে রুচি,
সেই দ্রব্য তারে শুচি,
তার তাতে হয় সুখোদয়।
অন্য অন্য সুখের সৃষ্টি,
করি বিধি পরে মিষ্টি,
করিলেন সুখের সৃজন।
বেশ্যাকুচ বিমর্দন,
যত নেতে আলিঙ্গন,
আর তার শ্রীমুখ চুম্বন।
বেশ্যার আলয়ে বসি,
এইরূপ দিবানিশি,
তুমি বাবু কর আচরণ।
ইহাতে অন্যথা কভু,
মনে না ভাবিবে বাবু,
হইবেক দুঃখ বিমোচন।"

তৃতীয় উপদেশ। প্রতি রবিবারে বাগানে যাইবা মৎস্য ধরিবার সকের যাত্রা শুনিবা, নামজাদা বেশ্যা ও বাঈইয়ারদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাগানে আনাইবা বহুমূল্য বস্ত্র, হার, হীরাকাঙ্গুরীয় ইত্যাদি দিয়া তুষ্ট করিবা। দেখিবে কি মজা হয়।"

এই আলোচনায় জানা গেল মুনি-ঋষীদের অতীত ইতিহাস। এবং তাদের অনুসারীদের চলমান অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা রাখছি।

১৪/১০/৯৫ তারিখে "ভারতে হিন্দু গুরুর অপকর্মে লিপ্ত শিরোনামে" এএফপি'র বরাত দিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ সংবাদ ভারতের হিন্দু গুরুদের যৌনাচারের একটি চিত্র পাওয়া যায়। সংবাদটি উদ্ধৃতি হলো–

ভারতে হিন্দু গুরুরা ক্রমবর্ধমান হারে ক্রোধের শিকারে পরিণত হয়েছে। কারণ তারা এখন লিপ্ত হয়েছে যৌনাচার ও নানা অপরাধী কার্যকলাপে। অথচ ভারতে এসব ধর্মগুরুকে দেবতার দূত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গত বছর ধর্ষণ ও হত্যাসহ বিভিন্ন অভিযোগে প্রায় এক ডজন হিন্দু গুরুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুশ্রুমণ্ডিত কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনকারী এসব গুরু এমনকি রাজনীতিতে নাক গলাচ্ছে।

এদিকে কট্টরপন্থী হিন্দুরা ভারতকে রামরাজ্যে বা পুরোহিত শাসিত রাষ্ট্রে পরিণত

www.pathagar.com

করার হুমকি দিচ্ছে। সর্বশেষ যিনি জনসমক্ষে হাজির হয়েছেন, তিনি হলেন চন্দ্রস্বামী। ভুঁড়িওয়ালা স্ব-ঘোষিত দেবদূত হিসেবে আবির্ভূত এই লোকটি ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাঁধে ভর করেছে। তার অসংখ্য ভক্ত রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও।

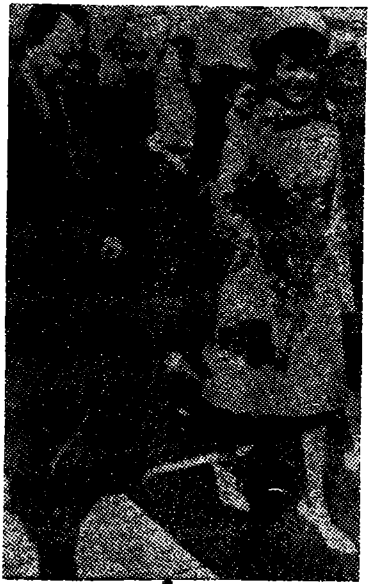
জ্যাকুলিন কেনেডির সাথে পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান

যা হোক, ভারতীয় কর্মকর্তা ও বিরোধী দলগুলো তার বিরুদ্ধে জালিয়াতি ও প্রভাব খাটানোর অভিযোগ তুলেছেন। গত মাসে একজন মন্ত্রী জনৈক হংকং ব্যবসায়ী প্রতারণার জন্য চন্দ্রস্বামীকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলে রাজনৈতিক ঝড় ওঠে। দুই মাস আগে নয়াদিল্লী পুলিশ এক ব্যবসায়ীকে হত্যার চক্রান্তের দায়ে প্রবীণ হিন্দু গুরুকে গ্রেফতার করে। ব্যবসায়ীর পত্নীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক রাখার জন্য ধর্মগুরু এ কাজে লিপ্ত হয়।

সম্প্রতি গুজরাটে দুই শতাধিক মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে আরেকজন গুরুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই গুরু সরকারী অর্থ দিয়ে এতিম বালিকাদের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল খুলেছিলো। এই গুরুর নাম স্বামী কেশবানন্দ। পুলিশ গুরুর সংস্থা থেকে পর্ণোগ্রাফি, অশ্লীল বইপত্র, শেয়ার সার্টিফিকেট উদ্ধার করেছে। স্বামী কেশবানন্দ ১৪ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণ করে। পরে গর্ভপাতের সময় এই কিশোরী মারা যায়।

১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসে ধর্ষণ, হত্যা ও সম্পদ চুরিসহ নানাবিধ অভিযোগে আরেকজন ধর্ম গুরু স্বামী প্রেমানন্দকে গ্রেফতার করা হয়। উত্তর ভারতে একই সময়ে শতাধিক মহিলাকে ধর্ষণ ও ১০ ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে ৪৮ বছর বয়স্ক এক ধর্মগুরুকে পুলিশ হেফাজতে আটক করা হয়। রামপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তি এই অভিযোগ করে যে, এই ধর্ম গুরু তার বোন, ভাইজি, পুত্রবধূসহ বেশ কিছু সংখ্যক মহিলাকে ধর্ষণ করেছে। একটি মহিলা গ্রুপ তথাকথিত এই ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানিয়েছে। মহিলা সমিতির নেত্রী ব্রিন্দা কারাত বলেন, এসব শঠ ধর্ম গুরুর কবলে পড়ে বিপুল সংখ্যক মহিলা ও কিশোরী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। তিনি বলেন, এসব স্ব-ঘোষিত দেবদূতের অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি তাদের ধর্মীয় প্রতারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আহবান জানান।

এই যৌনাচার ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জীবনেও লক্ষ্য করা যায়। An **Autobiography** of Ghandi and this story of my experiment with truth 1925 গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে দৈনিক বিকালের কাগজ ও একটি সাপ্তাহিক লিখেছে ঃ গান্ধী মনে

www.pathagar.com

করতেন আহার করা বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে বের করার প্রক্রিয়া এবং বীর্যের স্তব করার মধ্যেই জীবনীশক্তি নিহিত রয়েছে। ছাত্র জীবন থেকেই যৌন তাড়নায় তাড়িত হওয়ার ফলে গান্ধীর পড়াশোনা বিঘ্নিত হয়েছে। গান্ধী ১৩ বছর বয়সে বিয়ে করেন। গান্ধীর জন্য বিয়ে ছিলো যৌন কর্মকান্ডের অসংখ্য ইচ্ছা পূরণের শুরু। গান্ধীর স্ত্রীর নাম ছিলো কস্তুরী বাঈ। এই কস্তুরি বাঈ মারা যান ১৯৪৪ সালে। সে সময় অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের অভিযোগে কস্তুরি বাঈ এবং গান্ধী কারাগারে ছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত কস্তুরি বাঈ তার স্বামীকে ঘিরে থাকা নারীদের সম্পর্কে একটি অবিশ্বাস পোষণ করে গেছেন।

গান্ধী নারী পছন্দ করতেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সতেরো বছর বয়স্ক সোনজা স্কেলসিন থেকে শুরু করে অনেক ক'জন সেক্রেটারী নার্স বিভিন্ন সময় ছিলো তার নিত্যকার সঙ্গী। এরা ভক্তি এবং দাসসুলভ আনুগত্য নিয়ে তার সেবা করেছে। এরা ডিকটেশন নেয়ার পাশাপাশি তার শরীর ম্যাসেজ ও স্নান করিয়েছে। প্রয়োজনে তার সাথে ঘুমিয়েছে। গান্ধীর আকর্ষণ এতে প্রবল ছিলো যে, দূর-দুরান্ত থেকে মহিলারা তার কাছে আসতেন এবং এটা অবশ্যই বলা যায় বিপরীত সেক্সের সঙ্গে গান্ধীর সব সম্পর্কই নিষ্কাম ছিলো না। তার ভাষায় যৌনতার প্রশ্নে পবিত্র থাকা 'তরবারির ধারে হাঁটার মতো কঠিন'। রাত্রিকালীন সেক্সুয়াল নির্গমন তাকে জৈব কারণেই পীড়া দিয়েছে। ষাটোর্ধ্ব বয়সে তার এই জৈব ক্রিয়াকে প্রকাশ্যে তিনি 'প্রায়শ্চিত্ত' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

জীবিত অবস্থায়ই তার সম্পর্কে একটি স্ক্যান্ডাল ছড়িয়ে পড়ে। তার উষ্ণতাকে জিইয়ে রাখা এবং সংকল্পকে পরীক্ষা করবার জন্য অল্প বয়স্কা নগ্ন নারী তার শয্যাসঙ্গিনী হতেন, এ ধরনের একটা স্ক্যান্ডাল প্রচারিত হয়েছিলো তার জীবিতাবস্থায়।

রাতের বেলায় 'কেঁপে কেঁপে' উঠতেন গান্ধী। তার ঘনিষ্ঠ সার্কেলের মধ্যে যে কয়জন স্বল্প বয়স্কা নারী ছিলো, তাদের তিনি অনুরোধ করেন তারা যেন তাদের শরীর দিয়ে তাকে 'গরম' রাখে। এরা সবাই ছিলো হয় কুমারী অথবা সদ্য বিবাহিতা। কারো কারো জন্য এটা স্বনির্হিত বিপরীতধর্মী অভিজ্ঞতা। গান্ধীর এক দৌহিত্রের স্ত্রী আভা গান্ধী ১৬ বছর বয়স থেকেই তার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন। তাকেও দেহ থেকে পরিধেয় উন্মোচনের জন্য বলা হয়েছে। তার স্বামী এ ঘটনায় এতো আপসেট হয়েছিলো যে, নিজেই গান্ধীকে 'গরম' করার দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলো। গান্ধী অবশ্য তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মানু গান্ধী ছিলেন দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। ১৯ বছর বয়স থেকেই তিনি গান্ধীর শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন। বাইরে যাওয়ার সময় মানু এবং আভার উপর ভর দিয়েই বের হতেন তিনি। এরা দু'জন ছিলেন তার 'হাতের লাঠি'। অনশনের সময় মানু গান্ধী তার ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনা করতো এবং এমনকি প্রয়োজনে মলদ্বার দিয়ে ওষুধও প্রয়োগ করেছে। গান্ধীর এক অনুসারী তার নারীদের সম্পর্কে উক্তি করেছেন, 'যতই তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেছে, নিজেদের যৌন তাড়নাকে চাপা দিতে চেষ্টা করেছে ততো বেশি যৌন সচেতন এবং যৌন পীড়নে পীড়িত হয়েছে।' গান্ধীর এই অনুসারী ছিলেন একজন নারী, ব্রহ্মচারী এবং কবিরাজ। অদৃষ্টের পরিহাস হলো এই ব্রহ্মচারী নারীকে গান্ধী তিরস্কার করেছিলেন তার এক রোগীর সঙ্গে 'নগ্ন' হয়ে শোবার জন্য। আসলে, যেমন রাজনীতিতে তেমনি যৌন জীবনে মহাত্মা নিজেই নিজের

www.pathagar.com

নিয়ম ঠিক করতেন। (তথ্য সূত্র ঃ **Autobiography** of Ghandi, মৌচাকের ঢিল, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সংখ্যা এবং দৈনিক বিকালের কাগজ '৯৬)

গান্ধীর পিতা গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেবা-শুশ্রুষার ব্যাপারে তিনি ছোট ভাইকে ডেকে এনেছিলেন, কারণ একা গান্ধীর পক্ষে তা কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছিল না। এক রাতে, ঘড়িতে তখন সাড়ে দশটা কি এগারোটা বাজে, গান্ধী পিতার পা মালিশ করছিলেন, তখন তাঁর কাকা তাঁকে বিশ্রাম নিতে বললেন। খুশি হয়ে গান্ধী প্রায় ছুটে গেলেন বেডরুমে, ঘুমন্ত স্ত্রীকে জাগিয়ে তুললেন যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে। কয়েক মিনিট পর ভৃত্য করাঘাত করল দরজায়, মিলনরত দম্পতিকে জানালো ঃ পিতার মৃত্যু ঘটেছে।

'এই সেই লজ্জার কথা....' গান্ধী লিখেছেন, 'পিতাকে সেবার সময়ও যৌনতাড়িত হয়ে থাকা। আজ পর্যন্ত আমি এই পরাজয়ের চিহ্ন মুছতে পারিনি। আমি একথা কিছুতেই ভুলতে পারি না যে, পিতা-মাতার প্রতি আমার সীমাহীন ভক্তি এবং তাঁদের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করার পণ থাকলেও, আমার মন সেই সংকটপূর্ণ মুহূর্তেও লালসা মুক্ত ছিলো না। এটা ছিলো পিতৃসেবায় আমার এক অমার্জনীয় ত্রুটি। এ জন্যেই এক নারীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা সত্ত্বেও, নিজেকে আমি বিচার করেছি যৌন-অন্ধ ব্যক্তি হিসেবে। নিজেকে ওই লালসা থেকে মুক্ত করতে আমার অনেক সময় লেগেছে। অনেক কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে।.... এখানে আমি আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করতে চাই, এরপর আমার স্ত্রী যে সন্তান প্রসব করেছিলো সে দু'দিনের বেশি বাঁচেনি। এর অন্য পরিণতি আর কি হতে পারতো?' মনে হয় গান্ধী বলতে চাইছেন, যৌন কামনা-বাসনার

তরুণী বেষ্টিত যৌন কাতর গান্ধী

www.pathagar.com

দুর্ভোগ পুরুষানুক্রমে সইতে হয়।

ওই কামজ বাসনার কারণে গান্ধী নাকি জীবন জুড়ে নিজেকে অভিশপ্ত ভেবেছেন। একে দমন করে রাখার জন্যে একান্তে তিনি কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, সারা জীবন ধরে তিনি মোক্ষ খুঁজেছেন ব্রহ্মচর্য ও যৌন-বিশুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যমে।

এখানে ওই সময়কার আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। গান্ধী তখন স্কুলের ছাত্র, সহপাঠী বন্ধু শেখ মেহতাবের প্ররোচনায় তিনি প্রথম বারের মতো গিয়েছিলেন পতিতালয়ে। সে অভিজ্ঞতার বর্ণনা গান্ধী দিয়েছেন এভাবে। (মূল গুজরাটী অনুসরণে) ঃ "আমি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম, কিন্তু ঈশ্বর যাকে রক্ষা করবেন সে নষ্ট হতে চাইলেও শুদ্ধ থেকে যায়। সেই ঘরের মধ্যে আমি প্রায় অন্ধ হয়ে গেলাম। কথা বলতে পারছিলাম না। একেবারে হতবুদ্ধি অবস্থা, মেয়েলোকটার সঙ্গে খাটিয়ায় বসেছিলাম, কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বলতে পারছিলাম না। মেয়েলোকটা রেগে আগুন হয়ে গেলো, তারপর জঘন্য ভাষায় গালাগালি করে আমাকে দরজা দিয়ে বার করে দিলো।"

গান্ধী তাঁর আত্মজীবনীতে আরো একটি যৌন অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। তখন তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডে। স্ত্রী ও এক পুত্রকে ছেড়ে ১৮ বছর বয়সে গান্ধী আইন পড়তে গিয়েছিলেন সে দেশে। যাওয়ার আগে মায়ের কছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ওই দেশে তিন বছর অবস্থানকালে তিনি মদ, নারী ও মাংস স্পর্শ করবেন না। কিন্তু তিন বছরের মাথায় ঘটলো একটি ঘটনা।

নিরামিষাশীদের এক সম্মেলনে যোগ দিতে গান্ধী গিয়েছিলেন পোর্ট স্মাউথ। এক মহিলার বাসায় তিনি ছিলেন এক বন্ধুর কক্ষে। মহিলাটি 'বেশ্যা ছিলো না, তবে স্খলিত চরিত্রের ছিলো'। রাতে তিনজনে মিলে তাস খেলেছিলেন, পাশাপাশি চলছিল বেদম যৌনাত্মক হাসি-ঠাট্টা তাতে সোৎসাহে যোগ দিচ্ছিলেন গান্ধীও। এক সময় তিনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন 'কথাকে কাজে পরিণত করতে', তখন বন্ধুটি মনে করিয়ে দিলেন মায়ের কাছে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা। গান্ধী লিখেছেন, 'আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম'।

পরকীয়া প্রেম, অবৈধ যৌনাচারের রসালো কাহিনী ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সম্পর্কেও শোনা যায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু কামশাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করায় সহজেই সুন্দরী এডুউইনাকে (লেডী মাউন্টব্যাটন) বশীভূত করে ফেলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটন তার আত্মজীবনীতে নেহেরুর সাথে তাঁর স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। লেডী মাউন্ট ব্যাটনের সাথে নেহেরুর এই অবৈধ সম্পর্কের কারণে নেহেরুর প্রেমিকা পদ্মজা নাইডু আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন। নেহেরুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এম ও মাথাই তার 'রেমিনিসেন্সেস অব দ্যা নেহরু এজ' গ্রন্থে নারী পটিয়সী নেহরু সম্পর্কে লিখেছেন–

"১৯৪৭-এর শীতকালে লক্ষ্ণৌতে নেহরু স্বল্পকালীন অবস্থানের কথা ছিলো। যুক্তপ্রদেশের গভর্নর সরোজিনী নাইডু তার ঘনিষ্ঠ মহলে ঘোষণা করেছিলেন যে, এবার নেহরু পদ্মজাকে প্রস্তাব দেবে এবং পদ্মজাও গভীর আগ্রহ নিয়েছিলেন। কিন্তু হায়! নেহরু লেডী মাউন্ট ব্যাটনকে নিয়ে লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হলেন। পদ্মজা নিজকে একটা কক্ষে বন্দী করে ফেললেন এবং ঘোরের মধ্যে কাটাতে লাগলেন। তিনি লেডী মাউন্ট

www.pathagar.com

ব্যাটেনের সাথে দেখা করলেন না।

লেডী মাউন্ট ব্যাটনের আগমনের দু'দিন আগে পদ্মজা পশ্চিম কোর্টে তার ভগ্নী লায়লামনি নাইডু, যিনি তার প্রাদেশিক মন্ত্রণালয়ে ছিলেন, তার ঘরের পাশের স্যুটে চলে আসেন। লেডী মাউন্ট ব্যাটন আসার পর পদ্মজা ইন্দিরাকে ডেকে পাঠান এবং তার কাছে তাকে লেখা নেহরুর সব পত্র দিয়ে বলেন যে, তিনি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন।...."

লেডী কিলার বলে কথিত নেহেরু পরকীয়া প্রেমিকা এড্বইনা। পাশে এড্বইনার স্বামী মাউন্ট ব্যাটেন

১৯৪৭-এর পর নেহরুর জীবনে যত নারী এসেছিলো তাদের মধ্যে লেডী মাউন্ট ব্যাটন সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী ও প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য মহিলা, সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর স্বভাবের...

রাষ্ট্রপতি ভবনের সুইমিংপুলে প্রায় উলঙ্গ লেডী মাউন্ট ব্যাটন ও নেহরুর জলকেলী গ্রন্থকার স্বচক্ষে দেখেছেন। শোনা যায়, ভারতে আগমনের পর লেডী মাউন্ট ব্যাটনের নজর নাকি প্রথমে কায়েদে আজম জিন্নাহর প্রতি পড়েছিলো। জিন্নাহ সাহেব জেনায় (ব্যাভিচারে) অভ্যস্থ ছিলেন না, কামাতুরা লেডী তখন নেহরুর প্রতি নজর দেন। রাজ্য শাসিছে রাজা, রাজারে শাসিছে রাণী– লেডী মাউন্ট ব্যাটনের কথায় নাকি লর্ড মাউন্ট ব্যাটন ভারত ভাগের সময় নেহরুর পক্ষ অবলম্বন করে 'কীটদষ্ট পাকিস্তান' গ্রহণে জিন্নাহকে বাধ্য করেছিলেন। লেডী মাউন্ট ব্যাটনই নাকি সবকিছুর মূলে।

অনেকে গর্ব করে বলেন যে, পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন 'লেডী কিলার'। লেডী কিলার হওয়াটা যেনো একটি বিরাট চারিত্রিক গুণ। এ জে ফিলিপের তথ্যবহুল নিবন্ধের শিরোনাম– "They are all

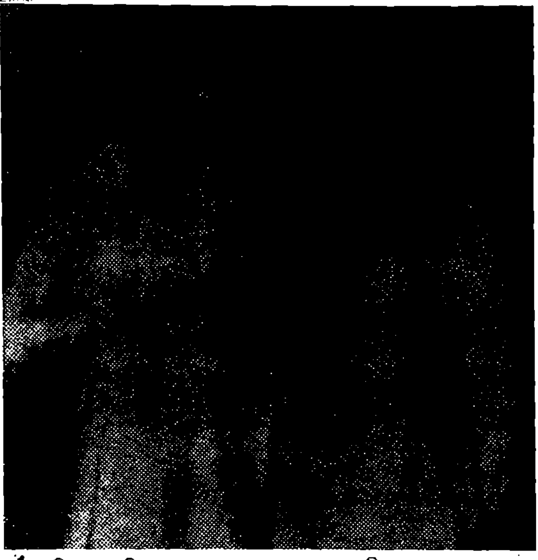
জ্যাকুলিন কেনেডির সাথে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু

www.pathagar.com

Nehru's Women", অর্থাৎ তারা সকলেই নেহরুর রমণী। এসব 'নেহরুর রমণী'দের মধ্যে ছিলেন পদ্মজা নাইডু, মৃদুলা সরাভাই, কমল দেবী চট্টোপাধ্যায়, সিনেমার নায়িকা দেবীকা রানী, পূর্নিমা ব্যানার্জী, ফ্রান্সিস গুন্থাসহ আগুনঝরা রূপের রানী লর্ড মাউন্ট ব্যাটনের পত্নী এডউইনা মাউন্ট ব্যাটেন। শংকর ঘোষের 'জওহরলাল নেহরু ঃ এ বায়োগ্রাফী' গ্রন্থে এ সম্পর্কে আরো রসালো কাহিনী পাওয়া যায়। তার দাবী, লেডী মাউন্ট ব্যাটেনের সাথে তার গভীর সম্পর্ক দলিলপত্র দ্বারা প্রমাণিত। নেহরু ব্রহ্মচর্যে বিশ্বাস করতেন না। অথবা সেক্সকে তিনি পাপ বলেও মনে করতেন না। নেহেরুর যুক্তি ছিলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদি হাজার হাজার নারী ভোগ করতে পারেন তাহলে তিনি কেনো কয়েকশত নারী ভোগ করতে পারবেন না। অকাট্য যুক্তি!

ইংল্যান্ডের মন্ত্রী যৌন কেলেংকারীর জন্য চরম মূল্য দিলেন, কিন্তু ভারতের গান্ধী ও নেহরু নিন্দিত না হয়ে বরং নন্দিত হলেন। একজন হলেন জাতির পিতা, অন্যজন ছিলেন আমরণ প্রধানমন্ত্রী। এই গান্ধী-নেহরু আমাদের ধর্মনিরপেক্ষবাদী শিবিরের নমস্য। সুতরাং নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তির নামে গান্ধী-নেহেরুর এই উদার নৈতিকতা আমাদের যুবক-যুবতীদের মাঝে যে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে তাতে আর অবাক হওয়ার কি আছে?

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে পিলে চমকানো বক্তব্য দিয়েছেন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বলে খ্যাত ডঃ আহমদ শরীফ। তিনি বলেছেন ঃ "তিনি (রবীন্দ্রনাথ) যেখানে গেছেন মেয়েদের প্রেমে পড়েছেন, টিস করেছেন। জগদীস ভট্টাচার্য ইনিয়ে বিনিয়ে বহু নারী সম্পর্কে বলবার চেষ্টা করেছেন, এমন যেন গুরুদেবের নিন্দে না হয়।" (দৈনিক বাংলাবাজার, ১/৫/৯৭)। উল্লেখ্য, জেনা ও ব্যাভিচার ইসলামে নিষিদ্ধ। অবাধ যৌনাচারের ফলে যৌনব্যাধি হয়ে থাকে। ১৯২৮ সালে 'অবতার' পত্রিকায় লেখা হয়েছিলো যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সিফিলিস হয়েছে। (সূত্র ঃ সংগ্রাম ১৫/৩/৯৭)।

প্রেমিক দেবর হিসেবে যিনি বাঙালী সমাজে পথ প্রদর্শক হয়ে আছেন তিনি কবি রবীন্দ্রনাথ, অগ্রজ জ্যোতিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রণয় নিয়ে একটি বিরাট উপাখ্যান রচিত হতে পারতো।

দু'জনের প্রণয় ছিলো অত্যন্ত গাঢ়। কিন্তু পারিবারিক চাপে রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৩ সালে মৃণালিনীকে বিয়ে করলে তিন মাসের মধ্যে কাদম্বরী আত্মহত্যা করে। তখন সে অন্তঃস্বত্ত্বা ছিলো। কাদম্বরীর শূন্যতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলো– (১) আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, (২) আহা তোমার সঙ্গে (৩) আমি তোমার প্রেমে হবো সাবার।

রবীন্দ্রনাথের সাথে বৌদি কাদম্বীরী প্রেম যে অত্যন্ত জমজমাট ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় অমিতাভ চৌধুরী 'পরলোকে রবীন্দ্রচর্চা' গ্রন্থ থেকে। রবীন্দ্রনাথ প্ল্যানচেটে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্ল্যানচেট করে আনলেন কাদম্বরীকে। কাদম্বরী বললো, "কে তুমি? আমাকে চিনতে পারছে না ঠাকুর পো? আমি তোমার সেই বৌঠান, যার কাছে গচ্ছিত ছিলো আমার ২২ বছরের যৌবন।"

www.pathagar.com

যারা রবীন্দ্র চর্চাকে এবাদত মনে করেন তাদের জন্য রবীন্দ্রনাথের বৌদির সাথে প্রেমলীলা অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে কিনা জানি না।

প্রাচীন ভারতে ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হতো। তাই গান্ধী নেহরু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশে পাশ্চাত্যের ন্যায় গত নভেম্বর ('৯৭) মাসে কলকাতার মহিলা ও পুরুষ যৌনকর্মীদের নিয়ে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শোনা যায়, এই যৌন কর্মীদের একটি কমিটিও রয়েছে।

জীবন সায়াহ্নে দুই প্রেমিক-প্রেমিকা (১৯৫৫ সালের ছবি)

সুতরাং যে ধর্মের আচারে বিশ্বাসে, যৌনাচার, কাম রিপুর ছড়াছড়ি, যে দেশের ধর্মীয় গুরু ও নেতারা যৌন কেলেংকারীতে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সে দেশের সাধারণ নর-নারীর মধ্যে অবাধ মেলামেশা ও যৌনাচার কোনো অপরাধই নয়; তাদের নিকট এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা। তাইতো আজ থেকে বহু বছর পূর্বে 'মহাত্মা কেরী' নামক এক ইংরেজ এই হিন্দুদের সম্পর্কে বলেছেন-

হিন্দুরা সুস্পষ্ট পাপের পঙ্কে ডুবে ছিলো। একথা সত্য যে, আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের মতো তারা হিংস্র নয়, কিন্তু নীচ, চতুরতা ও শঠতায় তারা অভাবটা পুষিয়ে নিয়েছে। তাদের ধর্ম ব্যবস্থায় নৈতিকতার বালাই নেই মোটেই। অতএব, কিছুমাত্র আশ্চর্য নয় যে তারা গভীর পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত আছে।

বাসস পরিবেশিত এক তথ্যে জানা যায়ঃ সম্প্রতি কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৮/১০/৯৫ তারিখে একটি জরিপ প্রকাশিত হয়। এই জরিপ রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পতিতা রয়েছে ভারতে। তাদের সংখ্যা ৬২ লাখ ১০ হাজার। নয়াদিল্লীতে জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগ পরিচালিত এক জরিপে বলা হয়, পতিতার সংখ্যা প্রতিবছর ৫০ হাজার করে বাড়ছে। ব্যাপক পতিতা বৃত্তির জন্য প্রধান কারণ হিসেবে দারিদ্র্যের বাধা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, পতিতারা শতকরা ৮০ ভাগই গ্রাম থেকে এসেছে। অধিকাংশ পতিতাদের বয়স ১২ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তারা বাস করে দুর্দশাপূর্ণ অবস্থায়। তাদের আয়ের একটি অংশ চলে যায় মাসীদের হাতে।

ভারতের নর-নারীর অবাধ মেলামেশা, উন্মুক্ত ও বিকৃত যৌনাচারের ফলে মরণ ব্যাধি এইডস ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় এইডস রোগীর সংখ্যা ৬০ লাখ এর মধ্যে শুধু ভারতেই ৩৫ লাখ এইডস রোগী রয়েছে।

www.pathagar.com

যুক্তরাজ্যের যৌনাচার

বৃটেনে উশৃঙ্খল ও অবাধ যৌন মিলনে প্রতি বছর সে দেশের প্রায় ৮ হাজার স্কুল ছাত্রী গর্ভবতী হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে ১৬ বছরের কম বয়সী স্কুল ছাত্রীদের মধ্যে এই হার সবচেয়ে বেশি। সম্প্রতি দ্য হেলথ এডুকেশন অথরিটির এক সমীক্ষা রিপোর্টে এ তথ্য জানা গেছে।

সাপ্তাহিক যায় যায় দিন পত্রিকার সূত্রে জানা যায়, ক্লাসরুমে যৌন শিক্ষার বিপত্তি শুধু যে টিচারদের ভাগ্যেই জোটে তা নয়। টিচাররাও মাঝে মাঝে এই দুর্ভোগের শিকার হন। এসব অভিজ্ঞতার করুণ বিবরণ জানা যায় শিক্ষকদের ইউনিয়নের বার্ষিক রিপোর্টে।

১৯৮৭-তে ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল টিচার্স ইউনিয়নের রিপোর্টে এ বিষয়ে রিসার্চের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়। এতে জানা যায় যে, শতকরা পঁয়তাল্লিশ জন পুরুষ শিক্ষক তাদের শিক্ষকতা জীবনের কোনো এক সময়ে ছাত্রীদের হয়রানির শিকার হয়েছেন। রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, যৌন হয়রানির বিষয়ে ছাত্রীরা যে সব সময় রেখে ঢেকে কুকর্মটি করে তা নয়; বরং দেখা যায় তারা এ বিষয়ে যথেষ্ট উগ্রভাবে এগিয়ে আসে।

একটি ঘটনার উল্লেখ এই রিপোর্টে করা হয়। ছাত্রী হোম টাস্ক না করে আসার জন্য শিক্ষক তাকে ডিটেনশন দিয়েছিলেন। অর্থাৎ দিনের ক্লাসগুলো শেষ হয়ে যাবার পর ক্লাসে থেকে হোম ওয়ার্কটি করে যেতে হবে। তাকে পাহারা দিচ্ছিলেন শাস্তিদাতা শিক্ষকটি। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তার ছাত্রী বইয়ের পাতা খোলার বদলে ধীরে ধীরে ব্লাউজের হুক খুলতে শুরু করেছে। শিক্ষক তৎক্ষণাৎ ডিটেনশন শেষ করে বাড়ি ফিরে যান।

রিপোর্টে আরেকটি ঘটনার কথা জানানো হয়েছে। ভূগোল বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়ার জন্য ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো প্রত্যন্ত অঞ্চলের কয়েকটি দর্শনীয় স্থানে সেখানে বনের পাশে বড় মাঠে সবাই তাঁবু গেড়ে রাত্রি যাপন করেছিলেন। হঠাৎ একদিন রাতে বিছানায় জনৈক শিক্ষক অনুভব করলেন কোনো বন্য প্রাণী তাকে জাপটে ধরার চেষ্টা করছে। সভয়ে তিনি চিৎকার করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যান। তার আর্তনাদ শুনে অন্য টিচাররা টর্চ হাতে ওই তাঁবুতে এসে একটি পনের বছর বয়সের ছাত্রীকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দেখতে পান। (তথ্য সূত্র ঃ যায় যায় দিন, ২৩ জুলাই ১৯৯৬)

আধুনিক ফ্যাশনের ধারক ও বাহক বলে কথিত ব্রিটেনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই অবাধ যৌন-মিলনের ভয়ঙ্কর পরিণতিতে সেখানকার প্রশাসন, অভিভাবক ও শিক্ষক মহল দারুণভাবে উদ্বিগ্ন। সমীক্ষায় প্রকাশ, সে দেশের প্রতিটি স্কুলের ২টি করে ছাত্রী অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে।

স্কুল পড়ুয়া নয় এমন যুবক-যুবতীদের মধ্যেও অবৈধ যৌন মিলনের যথেচ্ছ গর্ভবতী হয়ে পড়ার ঘটনা ঘটছে। আর সে ঘটনাতে ব্রিটেন এখন সবচেয়ে এগিয়ে। সমীক্ষায় প্রকাশ, ১৫-১৯ বছরের যুবক-যুবতীদের প্রতি ১০০০ জনে ৬৯ জন গর্ভবতী হচ্ছে। যা নেদারল্যান্ডের ৬ গুণ। এমনকি জার্মানীতে প্রতি ১০০০ জন কুমারী যুবতীর মধ্যে ৪০ জনের গর্ভধারণের রেকর্ডটিও ব্রিটেন বর্তমানে ভেঙ্গে দিয়েছে।

বৃটেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী টম ম্যাকভিলে এ ব্যাপারে বলেন, টিন এজারদের মধ্যে অবাধ যৌন মিলনে অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ রোধ করতে দেশের স্কুলগুলোতে বিনামূল্যে কনডম সরবরাহ করার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। সরকারি মতে, অবাধ যৌন মিলনে টিন এজারদের সংখ্যা

www.pathagar.com

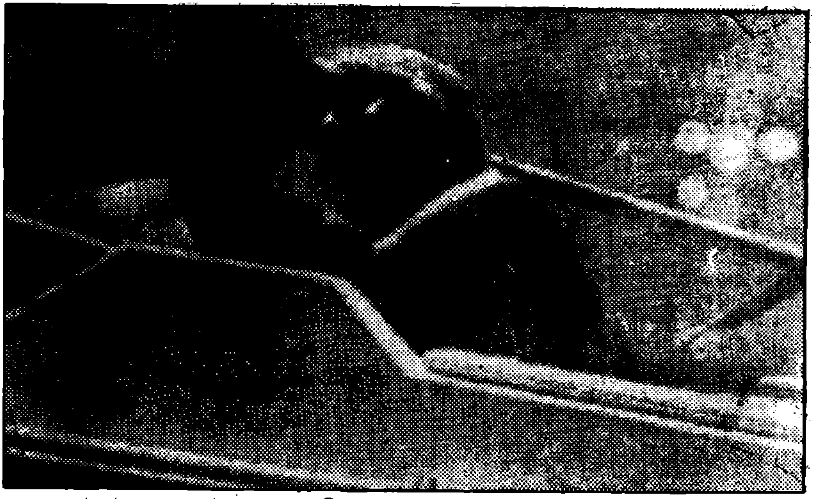

ফ্রান্সের সেন্ট ট্রোপেজ-এ নৌ-ভ্রমণরত সুখী ডায়ানা ও দোদি। এই তথাকথিত নারী স্বাধীনতার কাফফারা দিতে হয়েছিলো সুন্দরী ডায়নাকে নিজের জীবনের বিনিময়ে

১১৭৫০০। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ব্রিটেনের স্কুল-ছাত্রীদের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকালে যৌন মিলনের অত্যধিক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। কারণ তাদের প্রথম যৌন মিলন সংঘটিত হয় যথেচ্ছাভাবে, কোনো রকম সাবধানতা অবলম্বন করে না। এরপর তারা পারিবারিক ডাক্তারদের শরণাপন্ন হতে চায় না। পাছে যদি তাদের মা-বাবারা জেনে ফেলে। যখন এরা বুঝতে পারে যে তারা সন্তান ধারণ করতে বসেছে তখন বাড়ি থেকে এক সপ্তাহের অবসর নেয়ার জন্য ছুটি নিয়ে বেড়াতে যাবার ছল করে। বাড়ি থেকে ছাড়াও পেয়ে যায়। আর এই এক সপ্তাহে তারা অবসর বিনোদন না করে চলে যায় একটু দূরের কোন এক ক্লিনিকে। যেখানে গর্ভপাত করানোর সংবাদ হয়তো বাড়িতে পৌছবে না।

কিন্তু সত্য কোন দিন চাপা থাকে না। ব্রিটেনে এখন যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অবাধে যৌন মিলনে গর্ভবতী হওয়ার আশঙ্কায় অভিভাবকরা তাদের পড়ুয়া মেয়েদের প্রতি নজর রাখতে শুরু করেছেন। সেই সঙ্গে তারা এখন আতঙ্ক বোধ করছেন।

এ ব্যাপারে ব্রিটেনের ফ্যামিলি প্লানিং এসোসিয়েশন-এর জনৈক অফিসার বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাদের ঋতুকালের কোন হিসাব না রাখার ফলে এবং বেপরোয়া যৌন মিলনে কোন সতর্কতা অবলম্বন না করার ফলে এই পরিণতি ঘটছে।

উল্লেখ্য, ব্রিটেনের স্কুলগুলোতে যৌন শিক্ষার প্রচলন আছে। তবে ২৬ শতাংশ স্কুলেই তা সীমাবদ্ধ। যে সব স্কুলে যৌন শিক্ষার প্রচলন নেই, সে সব স্কুলে শিক্ষকরা নাকি যৌন শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে বিব্রত বোধ করছেন।

পলিসি স্টাডিস ইনস্টিটিউশনের অপর এক সমীক্ষায় জানা যায়, গর্ভবতী হওয়া টিন এজারদের ৯৬ ভাগ হচ্ছে ছাত্রী। তবে এই টিন এজার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষকরা যৌন শিক্ষা দানে যে বেশ লজ্জাবোধ করেন তা লন্ডনের একজন স্কুল শিক্ষকের জবানীতে জানা যায়। লন্ডনের জনৈক স্কুল শিক্ষক তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, ক্লাসে যখন যৌন শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা হয় তখন অনেক সময় যৌনতা

www.pathagar.com

নিয়ে কিছু অশ্লীল শব্দ আসতে বাধ্য, আর তার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা চাপা হাসি হাসতে থাকে। এর ফলে কোন শিক্ষকই বিষয়টা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে পারে না।

ব্রিটেনের ক্লিনিকগুলোতে গর্ভপাত করার জন্য যুবক-যুবতীদের ভিড় বেশি হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নাকি গর্ভনিরোধক বড়ি সেবন করার আগ্রহ বেড়েছে। তবে সরকারি স্বাস্থ্য দফতর থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অবাধ যৌন মিলনে গর্ভধারণ রোধ করতে কনডম বিনামূল্যে সরবরাহ করার যে প্রস্তাব নেয়ার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে তা বাস্তবায়ন করার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ব্রিটেনের স্কুল শিক্ষকরা। তারা মনে করেন, এই কনডম ব্যবহার বিনামূল্যে সরবরাহ করার ফল হবে যথেষ্ট খারাপ। কারণ এটা অবাধ যৌন মিলনের সহায়ক। ছাত্র-ছাত্রীরা কনডম ব্যবহারের ফলে নিরাপদে অবাধ যৌন মিলনের সুযোগ পাবে। বরং ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবাধ যৌন মিলনের ভয়ঙ্কর পরিণতি নিয়ে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপকভাবে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করা প্রয়োজন।

সরকারী মহল থেকে বিনামূল্যে স্কুলগুলোতে কনডম সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া সেখানকার বিভিন্ন কনডম প্রস্তুতকারকদের মধ্যে খুশীর জোয়ার এসেছে। কনডম প্রস্তুতকারকরা নাকি ইতোমধ্যে ব্যাপক হারে কনডম উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। তবে ব্রিটেনের একটি বুদ্ধিজীবী মহল সন্দেহ প্রকাশ করছেন, স্কুলগুলোতে বিনামূল্যে কনডম সরবরাহ করার চিন্তা-ভাবনা নাকি কনডম প্রস্তুতকারকদের। তাদের ব্যবসার দিকে লক্ষ্য রেখে দেয়া প্রস্তাব ব্রিটেন সরকার বাস্তবায়িত করলে যে স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভূত ক্ষতিসাধন হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (সাপ্তাহিক কলম, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৪)

বৃটেনের অধিকাংশ মহিলাই স্বামীদের নিয়ে সুখী নয়। যৌন মিলনের অতৃপ্তিতে তাদের অনেকেই স্বামী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একজন করে প্রেমিক খুঁজে নেয়, যে তাদের কানায় কানায় পূর্ণ করে দিতে পারে। তাই সে দেশের নারীরা স্বামীর চেয়ে একটা ফ্রিজকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বিশিষ্ট কলামিস্ট এ্যানলেসলীর এক তথ্যানুসন্ধানী জরিপ মতে, কর্মজীবী মহিলাদের অধিকাংশই তার বসদের মনোরঞ্জনের জন্য তার সাথে যৌন মিলনে বাধ্য হতে হয়। শতকরা ৯১.০৩ ভাগ কর্মজীবী মহিলাই এই যৌন মিলনের শিকার হন। চাকরিতে পদোন্নতি বা বিশেষ সুবিধা লাভের জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবেই তারা বড় সাহেবদের দেহ দান করে। তারা এটাকে অন্যায় বলে মনে করে না।

একজন ইংরেজ লেখক জর্জ র‍্যালী স্কটের 'বেশ্যাবৃত্তির ইতিহাস' (A History of Prostitution) নামক গ্রন্থে স্বীয় মাতৃভূমির চিত্র নিম্নরূপ ভাষায় পরিস্ফুট করেছেন।

যে সকল নারী দেহ ভাড়া দেয়াকেই তাদের জীবিকার্জনের একমাত্র পন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাদের বাদ দিলেও আর এক শ্রেণীর নারী আছে– এবং এদের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে– এরা জীবনের আবশ্যক দ্রব্যাদি লাভ করার জন্য অন্যান্য পন্থাও অবলম্বন করে থাকে এবং যাতে অতিরিক্ত দু'পয়সা অর্জন করতে পারে, তার জন্য আনুসঙ্গিকরূপে ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। ব্যবসায়ী বেশ্যা ও এদের মধ্যে কোনই

www.pathagar.com

টলস্টয়

প্রথম জীবনে টলস্টয় ছিলেন নিত্য-নতুন নারী সম্ভোগ, সুরা পান ও জুয়া খেলায় অভ্যস্থ। একে একে তিনটি বিয়ে করেন টলস্টয়। প্রথম দু'স্ত্রী তার উচ্ছৃংখল জীবনের জন্য ত্যাগ করে চলে যায়। তৃতীয় স্ত্রী সোফিয়া টলস্টয় উচ্ছৃংখল জেনেও তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু এই তৃতীয় স্ত্রী সোফিয়ার অত্যাচারে টলস্টকে পালিয়ে থাকতে হয়। পরবর্তীতে জীবনে ইসলামী দর্শন অধ্যয়নের ফলে তাঁর অন্ধকার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। জীবনের বাঁক পরিবর্তিত হয়। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর পর রেল স্টেশনে পরে থাকা তার লাশের পকেটে পাওয়া যায় Sayings of Mohammed (SM)

টলস্টয় পত্নী সোফিয়া

পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এই যে, এদেরকে বেশ্যা নামে অভিহিত করা হয় না। আমরা অবশ্য তাদেরকে Amateur Prostitutes অর্থাৎ 'পেশাহীন বেশ্যা' বলে অভিহিত করতে পারি।

এই সকল কামাতুর অথবা পেশাহীন বেশ্যার সংখ্যা আজকাল যে পরিমাণে দেখা যায়, তা অন্য সময়ে কখনও পরিদৃষ্ট হয়নি। সমাজের উঁচু-নীচু সকল স্তরেই এই শ্রেণীর নারী দেখা যায়। যদি এই সমস্ত সম্ভ্রান্ত মহিলাকে কখনও আকার ইঙ্গিতে বেশ্যা বলা হয় তা হলে তারা অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের অসুন্তুষ্টি ও ক্রোধ প্রকাশে প্রকৃত ঘটনার কোনো পরিবর্তন হয় না। প্রকৃত ঘটনা এই যে, তাদের ও পিকাডিলীর কুখ্যাতা ও নির্লজ্জ বেশ্যাদের মধ্যে কণামাত্র পার্থক্য নেই।

... অসৎ চালচলন এবং এতদ্বিষয়ে নির্ভীকতা, এমন কি বাজারী চালচলন পর্যন্ত এখানকার যুবতী মেয়েদের এক ফ্যাশন হয়ে পড়েছে। সিগারেট পান, তীব্র মদ্যপান, ওষ্ঠদ্বয় লাল রঙে রঞ্জিতকরণ, যৌন বিজ্ঞান ও গর্ভনিরোধ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভিব্যক্তি, অশ্লীল সাহিত্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই এদের এক ফ্যাশন হয়ে পড়েছে। .... বিবাহের পূর্বে নিঃসংকোচে অপরের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করেছে, এইরূপ বালিকা ও নারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। যে সকল সত্যিকার লাজনম কুমারী বালিকাকে গীর্জায় উৎসর্গীকরণ বেদীর সম্মুখে শপথ গ্রহণ করতে দেখা যেত, তারা আজকাল একেবারেই বিরল হয়ে পড়েছে।

যে সকল কারণে পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়েছে, তার বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলছেন ঃ

সাজসজ্জার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বালিকাদের মধ্যে এক দুর্দমনীয় লালসার সঞ্চার করেছিল এবং এরই বশবর্তী হয়ে তারা নব নব ফ্যাশনের মূল্যবান বেশভূষা ও সৌন্দর্য বর্ধনের নানাবিধ সামগ্রীর প্রতি মোহাবিষ্ট হইয়া পড়েছিল। এটি সেই নীতিবিরুদ্ধে বেশ্যাবৃত্তিরই অন্যতম প্রধান কারণ। মূল্যবান নয়নাভিরাম বেশভূষায় সজ্জিত শত সহস্র তরুণী ও যুবতী নারীকে নিত্যই পথে ঘাটে দেখতে পাওয়া যায়। তাদেরকে দেখে প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই এ কথা বলবে যে, সদুপায়ে অর্জিত অর্থ তাদের

www.pathagar.com

এহেন বেশভূষার ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। অতএব একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, একমাত্র পুরুষই তাদের বেশভূষা ক্রয় করে দেয়।

এরূপ উক্তি আজ হতে পঞ্চাশ বছর পূর্বে যেমন নির্ভুল ছিলো, আজও তেমনি নির্ভুল; তবে পার্থক্য শুধু এই যে, পূর্বে যে সকল পুরুষ তাদের বস্ত্রাদি ক্রয় করে দিতো, তারা ছিলো হয়তো তাদের স্বামী কিংবা পিতা অথবা ভ্রাতা। কিন্তু এখন তাদের পরিবর্তে অন্য লোক তা ক্রয় করে দেয়।

এরূপ অবস্থার জন্য নারী স্বাধীনতাও বহুলাংশে দায়ী। বিগত কয়েক বছর হতে মেয়েদের প্রতি পিতামাতার তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ এতো কমে গেছে যে, তার ফলে মেয়েরা আজকাল যতখানি স্বাধীন ও বেপরোয়া হয়ে পড়েছে, ত্রিশ চল্লিশ বছর পূর্বে বালকেরাও এতখানি হতে পারেনি।

সমাজের মধ্যে যৌন স্বেচ্ছাচারিতার ব্যাপক প্রসারতার একটি প্রধান কারণ এই যে, মেয়েরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, অফিসাদি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে চাকুরী গ্রহণ করছে। এ সকল স্থানে রাতদিন পুরুষের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগ হচ্ছে। এটি নারী-পুরুষের নৈতিক মানকে অতি নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছে। পুরুষ অগ্রগামী হয়ে কিছু করতে চাইলে তা রোধ করার ক্ষমতা নারীর থাকে না। ফলে উভয়ের মধ্যে যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং তা নৈতিকতার সকল বন্ধন অতিক্রম করে। এখন যুবতী নারীর মনে বিবাহ এবং পবিত্র জীবন যাপনের ধারণা স্থানই পায় না। যে মদানন্দময় সময়ের সন্ধান এক সময়ে শুধু লম্পট শ্রেণীর লোকই করত, আজকাল প্রত্যেক তরুণী তারই কামনা করে। কুমারীত্ব ও সতীত্বকে আজকাল প্রাচীন প্রথা মনে করা হয় এবং আধুনিক যুগের মেয়েরা একে এক বিপদ মনে করে থাকে। এদের মতে জীবনের আনন্দই এই যে, যৌবনকালে যৌনসম্ভোগের রঙ্গিন সুরা প্রাণ ভরে পান করতে হবে। এরই জন্য এরা নৃত্যশালা, নৈশক্লাব, হোটেল, বেশ্যালয় প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়ায়। এরই আশায় সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে মোটরযোগে আনন্দ অভিসারে বাইর হবার জন্য প্রস্তুত হয়। মোটকথা, এরা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে নিজেদেরকে এমন এক পরিবেশের মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং করে আসছে, যা মানব মনে স্বভাবতই কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে দেয়। অতঃপর এর যে অবশ্যম্ভাবী প্রাকৃতিক পরিণাম ফল হয়, তার জন্য এরা মোটেই শংকিত হয় না, বরং তাকে অভিনন্দন জানায়।

যুক্তরাষ্ট্রে যৌনাচার

বিখ্যাত জর্জ বেনলিন্ডসে (Ben Lindesy) একদা ডেনভারস্থ তরুণদের অপরাধের জন্য স্থাপিত বিচারালয়ের সভাপতি (Chairman of the Juvenile Court of Donver) ছিলেন। এই কারণে আমেরিকার তরুণ সম্প্রদায়ের নৈতিক অবস্থা তাঁর ভালোভাবে জানবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি তার Revolt of Modern Youth নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আমেরিকার বালক-বালিকাগণ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সাবালক হতে আরম্ভ করেছে। অতি অল্প বয়সেই এদের মধ্যে যৌনপ্রবণতার উন্মেষ হয়। তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ তিন শত বারজন বালিকার অবস্থা পরীক্ষা করে জানতে পারেন যে, তাদের মধ্যে দুই শত পঞ্চাশ

www.pathagar.com

জন এগার হতে তের বছর বয়সেই সাবালিকা হয়েছে এবং তাদের এমন যৌন তৃষ্ণা ও দৈহিক চাহিদার লক্ষণ দেখা যায়, যা আঠার বছর বয়স্কা বালিকার মধ্যে হওয়া সম্ভব নহে। (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮২-৮৬)

ডাঃ এডিথ হুকার (Edith Hooker) তার Laws of Sex নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

বিশিষ্ট ভদ্র ও ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এটি এক অতি সাধারণ ব্যাপার যে, সাত-আট বছরের বালিকা সমবয়স্ক বালকদের সহিত প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন করে এবং অধিকাংশ সময়ে যৌনক্রিয়াও করে থাকে।

তিনি আরো বলেন ঃ কোনো বংশের উজ্জ্বল রত্ন সাত বৎসরের একটি বালিকা তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে সম্মিলিত হয়। আর একটি ঘটনা এই যে, দুইটি বালিকা ও তিনটি বালকের একটি দলকে পারস্পরিক যৌনকার্যে লিপ্ত দেখা যায়। তারা অন্য সমবয়স্ক বালক-বালিকাদিগকেও উক্ত কার্যের জন্য প্ররোচনা দেয়। এই দলের মধ্যে দশ বছর বয়স্কা বালিকাটিই সকলের বড় ছিলো। কিন্তু তথাপিও সে বিভিন্ন প্রেমিকের প্রেম নিবেদন লাভ করার গৌরব অর্জন করে। (ঐ, পৃঃ ৩২৮)

বালটিমোরের জনৈক ডাক্তারের রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, সেই শহরে বার বছরের কম বয়সের বালিকার সাথে যৌনকার্য করার অভিযোগে এক বছরে সহস্রাধিক মামলা দায়ের করা হয়। (ঐ, পৃঃ ১৭৭)

কামরিপু জাগ্রত করবার যাতীয় উপায় উপাদানে পরিপূর্ণ উত্তেজনাব্যঞ্জক পরিবেশের এটিই প্রাথমিক পরিণাম ফল। আমেরিকার জনৈক গ্রন্থকার বলেন ঃ

আমাদের অধিবাসীদের বৃহত্তর অংশ যে অবস্থায় কালাতিপাত করে, তাহা এতো অস্বাভাবিক যে, দশ পনর বছর বয়সেই বালক-বালিকাদের মধ্যে একে অপরের সাথে

যৌন হয়রানির প্রতিবাদে আমেরিকার মেয়েরা এখন সোচ্চার

www.pathagar.com

প্রণয়াবদ্ধ হবার মনোভাব জাগ্রত হয়। এরূপ অকাল যৌনস্পৃহার পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক ও হয়াবহ হওয়াই স্বাভাবিক। অন্ততপক্ষে এর পরিণাম ফল এই হয় যে, অল্প বয়স্কা তরুণীগণ বন্ধুদের সাথে গৃহ হতে পলায়ন করে অথবা অল্প বয়সেই বিবাহিতা হয়। কিন্তু প্রেমের খেলায় যদি তারা অকৃতকার্য হয় তবে আত্মহত্যা করে বসে।

এভাবে যে সমস্ত বালক-বালিকার মধ্যে অসময়ে যৌন প্রবণতা জাগ্রত হয়, তাদের প্রথম পরীক্ষা ক্ষেত্র হয় বিদ্যালয়সমূহ। বিদ্যালয়গুলো দুই প্রকার হয়। এক প্রকার বিদ্যালয়ে শুধু একই শ্রেণীর শিক্ষার্থী ভর্তি হয় এবং আর এক শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বালক-বালিকা উভয়েরই সহশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলোতে সমলৈঙ্গিক মৈথুন (Homo Sexuality) ও হস্তমৈথুনের (Masturbation) সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করছে। কারণ শৈশবকালেই যে ধরনের আবেদন-অনুভূতিকে জাগ্রত করা হয় এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশ যার পূর্ণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তাকে চরিতার্থ করার জন্য কোনো না কোনো পন্থা অবলম্বন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ডাক্তার হুকার বলেন যে, এ ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে, কলেজে, নার্সদের ট্রেনিং স্কুলে, ধর্মীয় শিক্ষাগারসমূহে সর্বদাই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয় যে, একই লিঙ্গের দুইজন পরস্পর যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছে এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি তার কোনো আগ্রহই নেই। (পৃঃ ৩৩১)

এতদসম্পর্কে তিনি আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করে বলেন যে, বালিকা বালিকার সাথে এবং বালক বালকের সাথে যৌনক্রিয়ায় সম্মিলিত হয়ে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে। এই সমলৈঙ্গিক মৈথুন সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় কিরূপ দ্রুত প্রসার লাভ করছে, তা অন্যান্য গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। Dr. Lowry তার Herselt গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, একবার এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক চল্লিশটি পরিবারের কাছে গোপন পত্র দ্বারা জানিয়ে দেন যে, তাদের সন্তানদিগকে আর স্কুলে রাখা সম্ভব নহে। কারণ তাদের মধ্যে চরিত্রহীনতার এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। (পৃঃ ১৭৯)

এখন আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা করবো যেখানে বালক-বালিকার সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখানে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির উপাদান যেমন বর্তমান আছে, তা চরিতার্থ করার উপায়ও তেমনিই বিদ্যমান রয়েছে। শৈশবে যে যৌনস্পৃহা ও প্রবণতার সঞ্চার হয়, এ ধরনের বিদ্যালয়ে আসার পর তা চরিতার্থ করার সুযোগ ঘটে। বালক-বালিকারা অতি জঘন্য ও অশ্লীল সাহিত্য অধ্যয়ন করতে অভ্যস্থ হয়। প্রেমপূর্ণ গল্প-উপন্যাস নামমাত্র আর্টের পুস্তিকাসমূহ, যৌন সমস্যা সম্বলিত অশ্লীল গ্রন্থাদি এবং গর্ভনিরোধ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য প্রবন্ধাদি স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের যৌন প্রভাবে সর্বপেক্ষা এক আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে পড়ে। খ্যাতনামা মার্কিন গ্রন্থকার হিনড্রিচ ভন লোয়েন বলেন, আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে সকল সাহিত্যের সর্বপেক্ষা অধিক চাহিদা, তা সকল প্রকার অপবিত্রতা, অশুচিতা, অশ্লীলতা ও প্রগলভতার সংক্ষিপ্ত সার মাত্র। জনসাধারণের মধ্যে এ প্রকার সাহিত্য আর কোনোকালেও এতো স্বাধীনভাবে প্রচারিত হয়নি।

এ সকল সাহিত্য হতে যে সব জ্ঞান লাভ হয়, যুবক-যুবতিগণ সে সম্পর্কে

www.pathagar.com

স্বাধীনভাবে আলোচনা করতঃ প্রত্যক্ষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী মিলিয়া পেটিং পার্টিস-এর বাহির হয় এবং তথায় স্বাধীনভাবে মদ্য ও সিগারেট পান এবং নৃত্য-গীতের ভিতর দিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করে। লিন্ডসে সাহেবের অনুমান এই যে, হাই স্কুলের শতকরা ৪৫ জন ছাত্রী স্কুল ত্যাগ করার পূর্বেই চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে পড়ে।

শিক্ষার পরবর্তী সোপানগুলিতে এর অনুপাত অনেক বেশি। লিন্ডসে সাহেব বলেন, হাই স্কুলের বালকগণ বালিকাদের তুলনায় যৌন তৃষ্ণার দিক দিয়ে অনেক পশ্চাতে। সাধারণত বালিকারাই কোনো না কোনো প্রকারে অগ্রগামিনী হয় এবং বালকগণ তাদের ইঙ্গিতে নৃত্য করতে থাকে।

স্কুল-কলেজে তবুও এক প্রকারের নিয়ম শৃঙ্খলা আছে, যার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের মেলামেশায় কিয়দংশে বাধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ সকল নব্য যুবক-যুবতীর দল যখন যৌনক্ষুধার প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব নিয়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করতো জীবনক্ষেত্রে পদার্পণ করে, তখন তাদের আলোড়ন-উপদ্রব যাবতীয় বাধা-বন্ধনকেই অতিক্রম করে। এখানে তাদের যৌন প্রবণতা উত্তেজিত করার এ পরিপূর্ণ বারুদখানা বিদ্যমান থাকে এবং উত্তেজনা প্রশমিত করার উপায়-উপাদানও অনায়াসে লাভ করা যায়।

যে সমস্ত কারণে আমেরিকায় চরিত্রহীনতার অসাধারণ প্রচার প্রসার চলছে, তৎসম্পর্কে একটি মার্কিন পত্রিকা নিম্নোক্ত মন্তব্য করে ঃ

তিনটি শয়তানী শক্তি আছে এবং তাদের ত্রিত্ববাদ আজ আমাদের এই ভূ-ভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করতঃ এক নরক সৃষ্টি করেছে। এই তিনটি শক্তি হচ্ছে ঃ

১. অশ্লীল সাহিত্য, যা প্রথম মহাযুদ্ধের পর হতে আশ্চর্যজনক দ্রুততার সাথে নির্লজ্জতার ব্যাপক প্রচার করে আসছে।

২. চলচ্চিত্র; যা শুধু সকাম প্রেম-প্রবণতাকে প্ররোচিত করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং তার বাস্তব শিক্ষা দান করে।

৩. নারীদের অধপতিত চারিত্রিক মান; তাদের বেশ-ভূষা, অধিকাংশ সময়ে নগ্নতা, সিগারেট পানের ক্রমবর্ধমান অভ্যাস এবং পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা প্রভৃতি কারণে অপরিচিতের সাথেও তাদের যোগসূত্র প্রগাঢ় হয়।

এই তিনটি বস্তু আমাদের এখানে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে। এর ফলে খৃষ্টীয় সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার অবনতি এবং শেষ পর্যন্ত বিলোপ সাধন অবশ্যম্ভাবী হবে। যদি এখনও আমরা এর গতিরোধ করতে না পারি, তা হলে যে প্রবৃত্তি পূজা ও যৌন উন্মত্ততা রোম এবং অন্যান্য জাতিকে তাদের মদ্য, নারী ও নৃত্যগীতসহ ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে, আমাদের ইতিহাসও অনুরূপভাবে লিখিত হবে।

যে সকল যুবক-যুবতীর মধ্যে কণামাত্র উষ্ণ শোণিত বিদ্যমান আছে, সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তারকারী এই তিনটি শয়তানী শক্তি তাদের আবেগ-অনুভূতির মধ্যে চিরন্তন আলোড়ন সৃষ্টি করে। বস্তুত অশ্লীলতার আধিক্যই এরূপ আলোড়নের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ফল।

www.pathagar.com

আমেরিকায় যে সকল নারী বেশ্যাবৃত্তিকেই তাদের স্থায়ী জীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা প্রায় চার হতে পাঁচ লাখের মধ্যে। কিন্তু আমেরিকার বেশ্যাদিগকে এতদ্দেশীয় বেশ্যাদের অনুরূপ মনে করা চলবে না। এরা বংশানুক্রমিক বেশ্যা নহে। আমেরিকার বেশ্যা এমন এক নারী, যে গতকল্য পর্যন্ত কোনো স্বাধীন পেশা অবলম্বন করেছিল, অসৎ সংসর্গে থেকে চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে এবং বেশ্যালয়ের শরণাপন্ন হয়েছ। সে এখানে কিছুকাল কাটাবে। অতঃপর বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করত কোনো অফিস বা কারখানায় চাকরি গ্রহণ করবে। তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে যে, আমেরিকার বেশ্যাদের শতকরা পঞ্চাশজন গৃহপরিচারিকাদের (ডোমেস্টিক সারভেন্ট) মধ্যে হতে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে। অবশিষ্ট পঞ্চাশজন হাসপাতাল, অফিস ও দোকানের চাকরি পরিত্যাগ করতঃ বেশ্যালয়ে গমন করে। সাধারণত পনর-বিশ বছর বয়সে এ ব্যবসা আরম্ভ করা হয় এবং পঁচিশ-ত্রিশ বছর হয়স হলে পুনরায় বেশ্যালয় পরিত্যাগ করে কোনো স্বাধীন ব্যবসা শুরু করে।

আমেরিকার চার-পাঁচ লাখ বেশ্যার অস্তিত্বের মূলে কি তাৎপর্য রয়েছে, তা এই আলোচনা হতে অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়।

পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বেশ্যাবৃত্তি একটা সুসংগঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার নিউইয়র্কে, রিউ ডি জেনিরো, বুয়েন্স আয়ার্স উক্ত ব্যবসায়ের কেন্দ্র বিশেষ। নিউইয়র্কের দু'টি বৃহৎ ব্যবসায় কেন্দ্রের প্রতিটির স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা আছে, যার সভাপতি এবং সম্পাদক যথারীতি নির্বাচিত হয়। প্রতিটির একজন করে আইন উপদেষ্টা তাদের পক্ষে ওকালতি করে। যুবতী নারীদেরকে ফুসলিয়ে অপহরণ করার জন্য হাজার হাজার দালাল নিযুক্ত আছে। তারা প্রতিটি স্থানে শিকারান্বেষণে ঘুরে বেড়ায়। এ সকল শিকারী কিরূপ দক্ষতাসম্পন্ন তা এই বর্ণনা হতে অনুমান করা যায় যে, শিকাগো আগমনকারী বাস্তুত্যাগী সংঘের সভাপতি একবার পনর মাসের আগমনকারীদের সংখ্যা গণনা করেন। তাতে জানা যায় যে, এ সময়ের মধ্যে শিকাগো গমনেচ্ছু ৭,২০০ জন বালিকার এ মর্মে পত্র পাওয়া যায় যে, তারা শিকাগো পৌঁছুচ্ছে। কিন্তু মাত্র ১,৭০০ জন গন্তব্য স্থানে পৌঁছে। অবশিষ্ট বালিকাদের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি!

বেশ্যালয় ব্যতীতও তথায় বহু Assignation Houses ও Call Houses আছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, যদি সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও নারী পরস্পর সম্মিলিত হতে ইচ্ছা করে, তা হলে উক্ত স্থানে তাদের জন্য যথারীতি সুব্যবস্থা করা হয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, একটি শহরেই ঐরূপ ৭৮টি গৃহ আছে। অপর দুইটি শহরে যথাক্রমে ৪৩টি ও ৩৩টি অনুরূপ গৃহ আছে।

এই সমস্ত গৃহে যে শুধু অবিবাহিত নরনারীই গমন করে তা নয়; অনেক বিবাহিত নর-নারীও তথায় গমন করে। জনৈক বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক মন্তব্য করেন 'নিউইয়র্কের অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ চারিত্রিক ও দৈহিক দিক দিয়া দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব প্রতিপালন করে না। নিউইয়র্কে ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।'

www.pathagar.com

আমেরিকায় নৈতিক সংস্কারকদের একটি সভা Committee of Fourteen নামে অভিহিত। এই সভার পক্ষ হইতে অসচ্চরিত্রের আড্ডাগুলির সন্ধান, দেশের নৈতিক অবস্থার তথ্যানুসন্ধান এবং নৈতিক সংস্কার সাধনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থাবলম্বন ব্যাপকভাবে করা হয়। এর রিপোর্টগুলিতে বলা হয়েছ যে, আমেরিকায় যত নৃত্যশালা, নৈশ ক্লাব, সৌন্দর্যশালা (Beauty Saloons), হস্ত কমনীয়করণের দোকান (Manleure Shops) মালিশ কক্ষ (Massage Rooms) ও কেশবিন্যাসের দোকান (Hair Dressing Saloons) আছে তাহা প্রায়ই বেশ্যালয়ে পরিনত হয়েছে। এমন কি তা হতে নিকৃষ্টতর বললেও অত্যুক্তি হবে না। কারণ সেখানে যে সকল কুকার্য করা হয় তা অবক্তব্য।

যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই হচ্ছে রতিজ দুষ্টব্যাধি। অনুমতি হচ্ছে যে, আমেরিকার শতকরা ৯০ জন অধিবাসী এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। Encyclopadia Britanica হতে জানা গেছে যে, তথাকার সরকারী ঔষধালয়গুলোতে প্রতি বছর গড়ে দুই লাখ সিফিলিস ও এক লাখ ষাট হাজার প্রমেহ রোগীর চিকিৎসা করা হয়। ৬৫টি ঔষধালয় শুধু উক্ত ব্যাধিগুলির চিকিৎসার জন্যই নির্দিষ্ট রয়েছে। কিন্তু সরকারী ঔষধালয় অপেক্ষা বেসরকারী ডাক্তারের নিকটে রোগীর ভীড় বেশি হয়ে থাকে। এখানে শতকরা ৬১ জন সিফিলিস (গমি ঘা) ও ৮৯ জন প্রমেহ রোগীর চিকিৎসা হয়। (খন্ড ২৩, পৃঃ ৪৫)

প্রতি বছর ত্রিশ-চল্লিশ হাজার শিশু জন্মগত সিফিলিস রোগে মৃত্যুবরণ করে। কঠিন জ্বররোগ ব্যতীত অন্যান্য যত প্রকার ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটে, তার মধ্যে সিফিলিস ব্যাধিজনিত মৃত্যুর হার অত্যধিক।

সেই প্রমেহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে, যুবকদের শতকরা ৬০ জন এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। এদের মধ্যে বিবাহিত অবিবাহিত উভয় শ্রেণীই রয়েছে।

স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত যে, যে সকল বিবাহিতা স্ত্রীলোকের দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়, তাদের শতকরা ৭৫ জনের মধ্যে সিফিলিসের জীবাণু পাওয়া যায়।

এরূপ অবস্থায় পারিবারিক শৃঙ্খলা ও দাম্পত্য সম্পর্ক কেমন করে অক্ষুণ্ন থাকতে পারে? যে সমস্ত স্বাধীনজীবী নারী কামরিপু চরিতার্থ করার প্রয়োজন ব্যতিরেকে তাদের জীবনে পুরুষের আবশ্যকতা অনুভব করে না এবং বিবাহ না করেই পুরুষ যাদের সাথে মিলিত হতে পারে, তারা বিবাহকে একটা অনাবশ্যক বস্তু মনে করে। আধুনিক দর্শন ও জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী তাদের অন্তকরণ হতে এ ধারণা মুছিয়া ফেলেছে যে, বিবাহ ব্যতিরেকে কোনো পর পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে কোনো দোষ বা পাপ হতে পারে। এই পরিবেশ সমাজকেও এমন চেতনাহীন করিয়া ফেলেছে যে, এ ধরনের নারীকে সে ঘৃণা বা নিন্দনীয় মনে করে না। জর্জ লিন্ডসে আমেরিকার সাধারণ নারী জাতির মনোভাব নিম্নরূপ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

বিবাহ আমি কেনো করিব? আমার সঙ্গিনীদের মধ্যে যারা গত দুই বছরে বিবাহ করেছে, তাদের দশজনের মধ্যে পাঁচজনের বিয়েই তালাকে পরিণত হয়েছে। আমি মনে করি, বর্তমান যুগের প্রত্যেক মেয়ে প্রেমের ব্যাপারে স্বাধীন কার্যক্রম অবলম্বন করার

www.pathagar.com

স্বাভাবিক অধিকার রাখে। গর্ভনিরোধের যথেষ্ট জ্ঞান আমাদের আছে। এর দ্বারা আমাদের এ আশংকাও দূর হয়েছে যে, কোনো অবৈধ সন্তান জন্মলাভ করে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি জটিল করে তুলবে। আমাদের বিশ্বাস, আধুনিক পন্থানুযায়ী গতানুগতিক আচার পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনই বিবেকের কাজ হবে।

এরূপ মনোভাবাসম্পন্ন নির্লজ্জ নারীকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করতে পারে একমাত্র প্রবল প্রেমানুরাগ। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এই প্রেমানুরাগ আন্তরিক হয় না, একটা সাময়িক উত্তেজনার বশে হয়ে থাকে। উত্তেজনার নেশা কেটে যাবার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর প্রেম অবশিষ্ট থাকে না। প্রকৃতি ও আচার ব্যবহারের কিঞ্চিত বিসদৃশ্য উভয়ের মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার করে। অবশেষে তালাক অথবা বিচ্ছেদের আবেদনসহ তারা বিচারালয়ের শরণাপন্ন হয়।

লিন্ডসে বলেন ঃ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ডেনভারের প্রতিটি বিবাহই বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয়েছিল এবং প্রতি দু'টি বিয়ের জন্য একটি করে তালাকের মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এটি শুধু ডেনভারেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, আমেরিকার প্রায় প্রতিটি নগরেই অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। তিনি আরও বলেন ঃ তালাক এবং বিচ্ছেদ দিন দিন বেড়েই চলছে। এ অবস্থা যদি চলতে থাকে এবং এর সম্ভাবনাও প্রচুর রয়েছে– তা হলে দেশের প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলেই বিবাহের জন্য যতটা লাইসেন্স দেয়া হবে, তালাকের জন্যও ঠিক ততোটা লাইসেন্স দেয়া হবে, তালাকের জন্যও ঠিক ততোটা মামলা আদালতে দায়ের করা হবে।

একদা ডেট্রয়েটের (Detroit) 'ফ্রী প্রেস' নামক একটি সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এর কিয়াদংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

বিবাহের স্বল্পতা, তালাকের আধিক্য এবং বিবাহ ব্যতিরেকে স্থায়ী অথবা সাময়িক যৌন সম্পর্কের ব্যাপকতায় এই প্রমাণ করে যে, আমরা পশুত্বের দিকে দ্রুত ছুটে চলেছি। সন্তান উৎপাদনের প্রাকৃতিক কামনা বিলুপ্ত হচ্ছে; নবজাত সন্তানের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাচ্ছে; সভ্যতা ও একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থায়ীত্বের জন্য পারিবারিক ও গার্হস্থ্য সুশৃঙ্খলা যে অপরিহার্য, এ অনুভূতি মানুষের মন হতে মুছে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে সভ্যতা ও শাসন ক্ষমতার ভিতর দিয়ে এক নির্মম অবহেলা দানা বেঁধে উঠছে।

তালাক ও বিচ্ছেদের ব্যাপকতা নিরসনের উপায় হিসাবে Companionnate Marriage অর্থাৎ পরীক্ষামূলক বিবাহের প্রচলন করা হয়। কিন্তু এই সমাধান প্রকৃত ব্যাধি হতে নিকৃষ্টতর প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষামূলক বিবাহের অর্থ এই যে, পুরুষ ও নারী 'প্রাচীন ধরনের বিবাহে' আবদ্ধ হয়ার পরিবর্তে কিয়ৎকাল একত্রে বসবাস করবে। এরূপ একত্রে বসবাসকালে যদি তাদের মধ্যে মনের মিলন হয়ে যায়, তা হলে উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে নতুবা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণ করতে থাকবে। পরীক্ষামূলক সময়ে তাদেরকে সন্তান উৎপাদন হতে বিরত থাকতে হবে। কারণ সন্তান উৎপাদিত হলে তখন তাদের মধ্যে যথারীতি বিবাহ বন্ধন বাধ্যতামূলক হয়ে পড়বে। এটিই রাশিয়াতে Free Love অর্থাৎ 'স্বাধীন প্রেম' নামে অভিহিত।

প্রবৃত্তি পূজা, দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে বিতৃষ্ণা– পারিবারিক জীবন যাপনে বীতরাগ ও

www.pathagar.com

দাম্পত্য সম্পর্কের স্থিতিহীনতা নারীর প্রাকৃতিক মাতৃসুলভ আবেগ অনুরাগ প্রায়ই বিনষ্ট করে দিয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটিই নারী জাতির মহানতম আধ্যাত্মিক অনুরাগ এবং এরই অস্তিত্বের উপর শুধু তাহযীব-তমদ্দুনই নহে, মানবতার অস্তিত্বও নির্ভরশীল। এ অনুরাগের অভাবেই গর্ভনিরোধ, গর্ভনিপাত ও প্রসূত হত্যার শয়তানী অনুরাগ জন্মলাভ করেছে। আইনগত বাধা থাকা সত্ত্বেও আমেরিকায় প্রতিটি যুবতী নারী গর্ভনিরোধ সম্পর্কিত জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারিণী। গর্ভনিরোধের ঔষধাবলী ও যন্ত্রপাতি স্বাধীনভাবে বাজারে বিক্রয় হয়। সাধারণ নারী তো দূরের কথা, স্কুল-কলেজের ছাত্রীগণও এ সকল উপাদান সঙ্গে রাখে, যাহাতে প্রণয়ী বন্ধু হঠাৎ ভুলবশত সঙ্গে না আনার কারণে মধুময় 'সান্ধ্য অভিসার' ফেলে না যায়।

উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪৯৫ জন বালিকা আমার কাছে স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছে যে, বালকদের সাথে তাদের যৌনক্রিয়ার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা হয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র ২৫ জনের গর্ভসঞ্চার হয়। অন্যদের মধ্যে কয়েকজন ভাগ্যক্রমে রক্ষা পায়। কিন্তু অধিকাংশই গর্ভনিরোধের যথেষ্ট জ্ঞান রাখত। এ জ্ঞান তাদের কাছে এমন সাধারণ বস্তু হয়ে পড়েছিল যে, লোকে তা ধারণাই করতে পারে না।

কুমারী মেয়েরা ঐসব ঔষধ ও যন্ত্রপাতি এজন্য ব্যবহার করে যে, তাদের স্বাধীনতার পথে যেন কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়। বিবাহিতা নারীদের তা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য এই যে, সন্তান হলে তার প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বই শুধু গ্রহণ করতে হয় না, বরং এর কারণে স্বামীর তালাক দেওয়ার পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। এ সকল বিপদ এড়াবার জন্যই বিবাহিতা নারী গর্ভনিরোধের ঔষধাবলী ব্যবহার করে। সকল নারীই এজন্য সন্তানের মা হইতে ঘৃণাবোধ করে যে, জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করতে হলে এ সন্তানরূপ বিপদ হতে মুক্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু সন্তান প্রসবের ফলে তাদের সৌন্দর্যেও ভাটা পড়ে যায়।

কারণ যাই হোক না কেনো, যাদের এরূপ নারী-পুরুষের সম্পর্ক গড়ে উঠে, তাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনের স্বাভাবিক পরিণাম ফলের পথ গর্ভপ্রতিষেধক দ্বারা রুদ্ধ করা হয়। অবশিষ্ট শতকরা ৫ জনের যদি দুর্ভাগ্যক্রমে গর্ভসঞ্চার হয়ে পড়ে তাদের জন্য ভ্রূণ হত্যা ও প্রসূত হত্যার পথ উন্মুক্ত থাকে যায়। জর্জ লিন্ডসে বলেন যে, আমেরিকায় প্রতি বছর পনের লাখ গর্ভনিপাত করা হয় এবং হাজার হাজার নবজাত সন্তানকে হত্যা করা হয়। (পৃঃ ২২০)

খৃস্টান পাদ্রী বা ধর্ম যাজকরাও যৌন কেলেংকারীতে পিছিয়ে নেই। একটি জাতীয় দৈনিকের তথ্যে জানা যায়, ১৯৮৪ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের চারশতের বেশি ধর্মযাজক শিশুদের উপর বলৎকার অথবা যৌন নির্যাতন চালিয়েছেন। লক্ষণীয় ব্যাপারটি এই যে, অভিযুক্ত পাদ্রীরা বলতে গেলে কেউই স্বাভাবিক যৌনাপরাধে অপরাধী নয়। তারা সকলেই বিকৃত এবং নোংরা যৌন আচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত। যাজক পাদ্রীদের বিবাহ রীতি নেই। প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিধারা থেকে বিচ্যুত এই নাসারা ধর্মগুরুরা তাই বেছে নেয় বিকার এবং নীচুমনা হীন প্রবৃত্তির পথ। কৌতুকের ব্যাপার এই যে, ধর্মীয় কঠোরতা অবসানের দাবী যারা উত্থাপন করেছেন ঘটনাচক্রে তারা সকলেই অভিযুক্ত যৌনাপরাধী।

www.pathagar.com

এই ধর্মীয় যৌন অপরাধীদের দেশ যুক্তরাষ্ট্রে ১৮ বছর বয়স নাগাদ অধিকাংশ মার্কিন টিনএজারই যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হচ্ছে। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক বলেছে যে, তারা যৌন সম্পর্কের জন্য চাপ অনুভব করেছে। কয়েক বছর আগে ওয়াশিংটনে এক জরিপে একথা বলা হয়েছে। ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী ৬৫০ জন টিনএজারের উপর পরিচালিত এ জরিপে দেখা যায়, শতকরা ৪৭ ভাগই বলেছে যে, তারা প্রস্তুত হওয়ার আগেই যৌন অভিজ্ঞতামূলক কিছু করেছে অথবা করার জন্য চাপ অনুভব করেছে। যৌন অভিজ্ঞতামূলক কিছু বলতে কি বোঝায়, সে ব্যাপারে জরিপের রিপোর্টে কিছু বলা হয়নি। কায়সার ফাউন্ডেশন এ জরিপ পরিচালনা করে।

জরিপে বলা হয়, টিনএজারদের মধ্যে কম ও বেশি বয়সী উভয়েই এমন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে, যেখানে তারা যৌন চাপ অনুভব করে বলেই মনে হয়। তবে টিনএজারদের মধ্যে যাদের বয়স বেশি তারাই যৌন চাপের কাছে বেশি নতিস্বীকার করে। জরিপের রিপোর্টে বলা হয়, টিনএজারদের 'খুব বেশি দূরে' যাওয়ার ব্যাপারটি ক্রমশ সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠছে।

কায়সার ফাউন্ডেশন স্বাস্থ্য ও পরিবার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। ফাউন্ডেশন জানায়, চুম্বনের মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক শুরু হয় এবং টিনএজারদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা পূর্ণ যৌন মিলনে পরিণত হয়।

জরিপে বলা হয়, টিনএজ বালক ১৬ বছর বয়সে পৌঁছার পর যৌন মিলন তার জন্য সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় (শতকরা ৫৫ ভাগই যৌন মিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করে)। অন্যদিকে টিনএজ মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা ঘটে ১৭ বছরে পৌঁছে (শতকরা ৫১ ভাগ)। ১৬ বছর বয়স্কা বালিকাদের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ যৌনকর্মের কথা জানিয়েছে।

১৩ থেকে ১৪ বছরের শতকরা ১৩ ভাগ ছেলে ও শতকরা ৩ ভাগ মেয়ে বলেছে, তারা যৌন মিলনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। জরিপে বলা হয়, ইতোমধ্যে যারা যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সেসব বালক ও বালিকার প্রথম যৌন মিলনের ঘটনা ঘটেছে গড়ে ১৫ বছর বয়সে।

যৌনক্রিয়ার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন টিনএজদের অনেকেই বলেছে, ছেলে বা মেয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ ও গভীর ভালোবাসার কারণেই যৌন মিলন ঘটে থাকে। শতকরা ৩১ ভাগই এ জবাব দিয়েছে। ১৯ ভাগ বলেছে, তারা এটা করেছে এ কারণে যে, তারা বাগদত্ত অথবা বিবাহিত হওয়ার কারণে এবং শতকরা ১৯ ভাগ বলেছে, তাদের পছন্দের ছেলে বা মেয়েদের সাথে যৌনকর্মের চেষ্টা করার সময় যৌন মিলন হয়েছে। শুধু শতকরা ১৫ ভাগ বলেছে যে, তাদের যৌন মিলন ঘটেছে সঙ্গী, বয়ফ্রেন্ড অথবা মেয়ে বন্ধুর চাপের কারণে।

অধিকাংশ টিনএজারই বলেছে, তারা রোগ ও গর্ভধারণের ব্যাপারে চিন্তিত। শতকরা ৫৮ ভাগ বলেছে, তারা গর্ভবতী হওয়ার ব্যাপারে চিন্তিত এবং শতকরা ৬১ ভাগ বলেছে, মেয়েরা এইডস রোগের কারণে এইচআইভি ভাইরাসের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। অন্যদিকে এ ব্যাপারে চিন্তিত ছেলেদের সংখ্যা শতকরা ৫১ ভাগ। তবে এ উদ্বেগ বা চিন্তা যৌন মিলনে তাদের ভীত করতে পারেনি। অধিকাংশই শতকরা ৫৮ ভাগ বলেছে, প্রতিবার যৌন মিলনের সময় তারা কোন জন্ম প্রতিরোধক ব্যবহার করেনি এবং শতকরা ৪০ ভাগ

www.pathagar.com

বলেছে, তারা তাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সাথে রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে কোন আলোচনা করেনি।

এই মানবতা ও শান্তির স্বর্গরাজ্য বলে কথিত আমেরিকায় এক, দুই বা তিন বছর বয়সের শিশুর সামনে অজস্র খেলনা আর পর্যাপ্ত খাবার রেখে একটি তিন চার হাত লম্বা বেল্ট বা চেইন দিয়ে ঘরে বেঁধে রেখে মা শিশুর সামনে দিয়ে আর এক পুরুষের হাত ধরে ক্লাবে নাচতে চলে যায়। বাবা-মা এক সঙ্গে থাকলে দু'জনেই ক্লাবে বা বারে চলে যায়। বেল্ট বা চেইন দিয়ে আটকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য হলো শিশু যেন এর বাইরে গিয়ে ঘরের কোনো কিছু নষ্ট করতে না পারে। কিছুক্ষণ খেলাধুলা করে অনেকক্ষণ কেঁদে পেন্টিতে পেসাব-পায়খানা জমিয়ে শিশু এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। যে শিশুর প্রতি বাবা-মা এমন নিষ্ঠুর, সে শিশু বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে তাদের শেষ বয়সে নিজের কাছে রেখে সেবা না করলে তাকে দোষ দেয়া যায় না।

তথাকথিত সভ্যতার দাবীদার আমেরিকার ৭০% দম্পতির ক্ষেত্রেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন জোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমালে বা টুথব্রাস ঠিকমত ধুয়ে না রাখলে পাশ্চাত্য সমাজে হয় অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতা। এরূপ তুচ্ছ কারণে পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী আদালতের রায়েই তালাকপ্রাপ্ত হয়। সেখানে ব্যাপক হারে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে ৭০% শিশুই পিতা-মাতার স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়। নিরাপরাধ শিশুকে পার্কে ফেলে রেখে বাবা-মা উধাও হয়ে যায়। এমনকি ভূমিষ্ট বাচ্চাকে টয়লেটে ফেলে নাচতে চলে গেছে মার্কিন তরুণী এমন সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে জাতীয় দৈনিকে।

রিপোর্ট থেকে জানা যায়, মিস এবি বসম্যান নাম্নী এক মার্কিন তরুণী (পিতার নাম ব্রায়ান পিটার্স) নিউজার্সির এক স্কুলের নাচঘরের পাশের টয়লেটে একটি শিশুর জন্ম দেয়। সদ্য ভূমিষ্ট রক্তাক্ত শিশুটিকে টয়লেটে রেখেই মা নাচতে চলে যায়। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে এক মহিলা। (দৈনিক সংগ্রাম, ১০/৬/৯৭)

তাই দেখা যায়, পাশ্চাত্যে দাদা-দাদী, নানা-নানী তো দূরের কথা, মা-বাবাও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদেরকে নার্সিং হোম কিংবা কোনো প্রবীণ নিবাসে নির্বাসনে পাঠানো হয়ে থাকে। প্রাচীন যুগে তো কোনো কোনো সমাজে নাকি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকে নবীন উত্তরাধিকারীরা উদয়স্ত করে ফেলতো, পুড়িয়ে মারতো। আধুনিক যুগে কোনো সমাজে প্রবীণ-প্রবীণাদের উদয়স্ত করা হয় না বটে; তবে উদ্বাস্তু বানানো হয়। কর্মদক্ষতা হারাবার পর প্রবীণ-প্রবীণাদের নার্সিং হোম অথবা নির্জন নিবাসে প্রেরণকে উদ্বাস্তু বানানো ব্যতীত আর কি বলে আখ্যায়িত করা যায়?

এসবই হলো তথাকথিত নারী স্বাধীনতা এবং অবৈধ যৌনাচারের ফল। সেখানে বর্তমানে ১৮ জন কন্যা পিতার যৌন লালসার শিকার হন। শতকরা ৪ জন মাতা-পুত্রের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকেল ৪টা হতে রাত ৭টা এবং শুক্র ও শনিবার রাত ১টা পর্যন্ত ছাত্ররা মেয়েদেরকে উপভোগ করার জন্য হোস্টেলে নিয়ে যেতে পারে। সহশিক্ষার বদৌলতে বৃটেনে ৮০% স্কুল ছাত্রী গর্ভনিরোধ ওষুধ সাথে রাখে। নরওয়েতে ৫৪% এবং জার্মানীতে ৫৫% চাত্রী গর্ভনিরোধ সাথে রাখে। সে দেশের ৯৯% ছাত্রী বিয়ের পূর্বে যৌন স্বাদ ভোগ করে থাকে। শোনা যায়, কোটি ডলার পুরস্কার ঘোষণা করলেও নাকি গোটা মুল্লুকে ১৩ থেকে ১৬ বছরের

www.pathagar.com

একজন কুমারীও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমেরিকার লস এঞ্জেলসে একটি হোটেল খুলেছে। এ হোটেলের নাইট ক্লাবে দু'ধরনের সার্ভিস রয়েছে। এসব হোটেলে উদ্ভিন্ন যৌবনা রমণীরাই সার্ভ করছে। তবে খদ্দেরেরা চাহিদা অনুযায়ী কারো কাছে আসছে পুরো পোশাক পরা রমণী আবার কারো কাছে আসছে শুধু প্যান্টি পরা বুক খোলা রমণী। চার্জ ডাবল। ডাবল হলেও অধিকাংশ খদ্দের পছন্দ করেন টপলেস ওয়েট্রেসদের। বাধ্য হয়ে মালিক সাহেবকে বুক খোলা ওয়েট্রেসের সংখ্যা বাড়াতে হয়েছে। নারী স্বাধীনতাকামী এসব রমণীদের শরীর উপচে পড়ছে যেন। ধন্য তারা পুরুষদের লালসায় ব্যবহৃত হয়ে। কি দারুণ সভ্যতা! প্রকাশ্যে পতিতার মতো ব্যবহার করে উপার্জন করছে লাখ লাখ ডলার।

কয়েক বছর আগে একটি জাতীয় দৈনিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ এবং ইউল-এর একটি রিপোর্ট 'নৈতিক অধঃপতনের ভয়ঙ্কর চিত্র' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ সংবাদে বলা হয়–

'সুইং গিং', 'গ্রুপিং', 'প্লে-বয় ক্লাব' ইত্যাদির অস্তিত্ব প্রমাণ করে পাশ্চাত্যের সুসভ্য 'অনেক জন-সমাজকে পথভ্রষ্ট' করতে শয়তান কি পরিমাণ সক্ষম হয়েছে। গ্রুপ সেক্স বা অবাধ যৌনাচারের এইসব পার্টির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা হলো চার দম্পতি। শুক্রবার রাতে কোনো স্থানে তারা মিলিত হয়, শনি ও রবি ছুটির দু'দিন সেখানে সবাই কাটিয়ে সোমবার সকালে যে যার বাড়িতে ফিরে যায়। নিয়ম হলো এই ৬০ ঘন্টা নারী পুরুষ সবাইকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে থাকতে হবে, বৈধ স্বামী-স্ত্রী একত্রিত হতে পারবে না, অদল-বদল করে সবাই যৌন সুখ সর্বসমক্ষে উপভোগ করবে। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক যৌন ক্রীড়ায় অতি অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। বিকৃত কামকেলীতে যে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে তাকে পার্টি পুরস্কার দেবে।

সম্প্রতি নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত কন্ট্রসেপটিভ টেকনোলজি নামক একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থে যুক্তরাষ্ট্রে নারী-পুরুষের যৌন জীবন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার জরিপের বরাত দিয়ে বইটিতে উল্লেখ করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৩ শতাংশ বিবাহিতা মহিলা পায়ুপথে সঙ্গম করে। ২১ শতাংশ মহিলা এই কাজ মাঝে-মধ্যে করেন। শতকরা সত্তর ভাগ বিবাহিতা মহিলা বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক রক্ষা করেন এবং সমপরিমাণ মহিলা কুকুরের সাথে.........। ২৬ শতাংশ স্বামী ও ২১ শতাংশ স্ত্রী দাম্পত্য জীবনের বাইরে অন্তত একজন যৌনসঙ্গী রাখেন। ৮ শতাংশ স্বামী ও ৪ শতাংশ স্ত্রীর বিবাহ-বহির্ভূত সঙ্গীর সংখ্যা ছয়জনের বেশি। যুক্তরাষ্ট্রে সমকামিতাকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে পুরুষে পুরুষে এবং মেয়ের সাথে মেয়ের বিয়ে আইনসিদ্ধ এবং বহুল প্রচলিত। এমনকি পিতার সাথে কন্যার, মাতার সাথে পুত্রের, ভ্রাতার সাথে ভগ্নি যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিদের প্রেম কিংবা নারীঘটিত কেলেংকারি নতুন শিরোনাম নয়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরের রাষ্ট্রপতিদের প্রায় সকলেই বিভিন্ন সময় নারীঘটিত কেলেংকারির জন্য সমালোচিত হয়েছেন। বহুল আলোচিত সে ঘটনাগুলোর দিকে এবার নজর দেয়া যাক।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট। যুক্তরাষ্ট্রের সেরা রাষ্ট্রপতিদের অন্যতম। তাকে ঘিরে অনেকেই শিরোনাম হয়েছেন। তার গৃহপরিচারিকার সঙ্গেও তার যৌন সম্পর্কের কথা শোনা যায়। লুসি মার্কার নামে এক মার্কিন তরুণীর সান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি ছিলেন দারুণ উদগ্রীব।

জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি যাকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচে সুদর্শন রাষ্ট্রপতি বলা হতো। ৬ ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চতার কেনেডি এ্যাথলেটের মতো শরীর তৈরি করেছিলেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের তরুণী থেকে যুবতী সবার কাঙ্ক্ষিত পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। আর এ সুদর্শন রাষ্ট্রপতিও নাকি ছিলেন প্রচন্ড কামুক। লোকে বলে, কেনেডি যৌন ক্ষুধাকে মনে করতেন স্বাভাবিক ক্ষুধা এবং তা নিবৃত্ত করার জন্য যে কোন কাজ তিনি করতেন। একবার প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিছানায় অন্য এক মহিলার ব্রেসিয়ার পড়ে থাকতে দেখে মিসে কেনেডি তার স্বামীকে বললেন, ডার্লিং, ব্রেসিয়ার দু'টি আমার মাপের বলেতো মনে হচ্ছে না। নিজের স্বামীর বিছানায় অন্য মহিলার ব্রেসিয়ার দেখেও স্ত্রী উত্তেজিত অথবা গোস্বা করেননি। হলিউডের প্রায় সকল সুন্দরী নায়িকাদের সঙ্গে কেনেডির যৌন সম্পর্ক ছিলো। তবে সবচে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল অনিন্দ্য সুন্দরী উর্বশী নায়িকা মেরিলিন মনরোর সঙ্গে প্রেম এবং সহবাস প্রসঙ্গ। শোনা যায়, প্রচন্ড কামুকী মেরিলিন মনরোর যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করার সাধ্য কমসংখ্যক পুরুষেরই ছিলো। কেনেডির সঙ্গে মেরিলিনের পরিচয় ঘটে তার ৪৫তম জন্মদিনে। আর তারপর থেকেই কেনেডি আর মেরিলিনের 'প্রেম প্রেম খেলা' চলতে থাকে। মেরিলিন আর কেনেডির প্রথম দৈহিক মিলন ঘটে চলন্ত এক প্রাইভেট কারে, এরপর বেভারলি হিলস ও বিভিন্ন বিচ হাউসে তাদের প্রেমের উন্মত্ততা চলে। এভাবে কিছুদিন চলার পর মেরিলিন কেনেডিকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকে কিন্তু কেনেডি এক মহিলায় সন্তুষ্ট হবার পাত্র নন। ফলে মেরিলিনকে ফিরিয়ে দেন। তারপর এক বৈরী সকালে বিশ্ববাসী জানলো অপ্সরা মেরিলিন মনরো আর নেই। অতিরিক্ত ঘুমের বড়ি সেবন করে আত্মহননের মতো অমসৃণ পথ বেছে নিয়েছেন। এক নাগাড়ে কিছুদিন নারী সঙ্গ না পেলে কেনেডি পাগল হয়ে যেতেন। আঠার বছর অতিক্রম করার আগেই কেনেডি রাস্তা থেকে তরুণী ধরে এনে যৌন ক্ষুধা মিটাতেন। এক সাংবাদিক এক তরুণীর সাথে কেনেডির নগ্ন ছবি তুলে কেনেডিকে বিপাকে ফেলে দিয়েছিলেন। সুইমিং পুলে জলকেলির জন্য ডাক পড়তো সুন্দরী মডেল তারকাদের। ডেনমার্কের মেয়ে সাংবাদিক ইনগা আরভাদের সঙ্গে কেনেডি নিজেকে জড়ান। মেরিপিলচেট, জুরিথ ক্যামবেল, লেখিকা মার্গরেট সুইস কোয়াটা বিভিন্ন সময় এফ কেনেডির শয্যাসঙ্গী হয়েছেন। তারপর তিনি এক সময় ডালাসে আততায়ীর হাতে নিহত হন।

পরবর্তী রাষ্ট্রপতি লিনডেন জনসনেরও নারী প্রীতি ছিলো উল্লেখ করার মতো। রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকনও সিক্রেট সার্ভিসের এক মহিলাকে শয্যাসঙ্গী হবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রিগ্যান নারীঘটিত কেলেংকারি থেকে দূরে ছিলেন। রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশও স্ত্রী বারবারা বুশের কড়া নজর এড়িয়ে অন্য নারীতে দৃষ্টি দেবার সুযোগ পাননি।

www.pathagar.com

কিছুদিন আগে বিস্ফোরণ ঘটে বর্তমান রাষ্ট্রপতি উইলয়াম জেফারসন বিল ক্লিনটনের নারীঘটিত কেলেংকারি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জন্ম নেয়া বিল ক্লিনটন অত্যন্ত সুদর্শন। অভিযোগকারিনী সরকারী চাকরিজীবী পলা জোনস বলেন, আরাকানসাস রাজ্যের গভর্নর থাকাকালীন সময় সেখানে স্থানীয় হোটেল রক-এর একটি কামরায় ক্লিনটন পলা জোনসকে ডেকে নিয়ে তার প্যান্টের জিপার খুলে গোপনাঙ্গ বের করে তাতে পলা জোনসকে 'চুম্বন' করতে বলেন। এরপর ঘটনার দীর্ঘদিন পর পলা জোনস যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এনে মামলা করেছেন। ক্লিনটন আদালতের বাইরে মীমাংসার আবেদন জানালে পলা তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়া সাত লাখ ডলার ফিরিয়ে দেন। জেদী পলা জোনস চাচ্ছেন ক্লিনটন তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। (সূত্র ঃ দ্য মিয়ামি হেরাল্ড, ইউএসএ)

ক্যাথিলিন উইলি নামক এক তরুণী প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের কাছে একটি চাকরির জন্য গিয়েছিলেন। তখন তার স্বামী বেকার হয়ে পড়েছিলো। অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে তিনি হোয়াইট হাউসে একটি চাকরির আশায় যেয়ে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের হাতে নিগৃহীত হন। ৫১ বছর বয়স্ক উইলি সিবিএস নিউজ চ্যানেলে 'সিক্সটি মিনিট' সাক্ষাতকারে অভিযোগ করেন যে, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ১৯৯৩ সালের নভেম্বরে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসের বাইরে তার ঠোঁটে চুমো খান। তাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নেন। স্তনে হাত দেন। হাত টেনে পুরুষাঙ্গে স্পর্শ করান। গভীর আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরে ক্লিনটন বলে উঠেন, উইলি, যেদিন থেকে তোমাকে প্রথম দেখছি সেদিন থেকেই তোমাকে কাছে পেতে চাইছি। বিসিএস টেলিভিশনের প্রতিনিধি এড ব্রেডলের কাছে দেয়া সাক্ষাতকারে উইলি আরো বলেন, আমি প্রেসিডেন্টের বেপরোয়া আচরণের কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, ধীর গতির ছায়াছবির মতো একটির পর একটি ঘটনা ঘটে যেতে লাগলো। তিনি বলেন, আমি ভেবেছিলাম তার গালে একটি চড় মারি, কিন্তু পরে আমি ভাবলাম, না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের গালে আমি চড় মারতে পারি না। পরে আমি দ্রুত নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হোয়াইট হাউস থেকে বের হয়ে যান।

বিশ্বে সবচেয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে ক্লিনটন-মনিকার অবৈধ প্রেম। মনিকা লিউনস্কি স্বীকারোক্তিতে বলেছেন, ১৯৯৫ সালের ১৫ নভেম্বর বুধবার, বাজেট ঘাটতির কারণে সরকারী কর্মকান্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনার দ্বিতীয় দিন, তার সঙ্গে প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্টের যৌন সম্পর্ক হয়। এদিন রাত ৮টায় প্রেসিডেন্টের বিশ্রাম কক্ষের ভিতর দিয়ে মনিকা জর্জ স্টেফানোপলোসের দপ্তরে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিশ্রাম কক্ষে প্রেসিডেন্ট একা ছিলেন। ক্লিনটন মনিকাকে ভিতরে আসার ইঙ্গিত করেন। মনিকা বলেন, তাকে দেখে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ। প্রেসিডেন্ট হেসে উঠে জানতে চান, মনিকা তার ব্যক্তিগত কক্ষ দেখতে আগ্রহী কিনা। স্টেফানোপলোরে অফিসের একটি সংযুক্ত দরজা দিয়ে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত ডাইনিং রুম পেরিয়ে তারা ওভাল অফিসের পিছনের স্টাডিরুমে প্রবেশ করেন। লিউনস্কি তার স্বীকারোক্তিতে বলেন, আমরা গল্প-গুজব করি... আমরা স্বীকার করি যে, আমরা একে অপরের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছি। এরপর তিনি প্রশ্ন করেন, আমাকে চুমু খেতে পারেন কিনা।

www.pathagar.com

যাদের সঙ্গে যৌন কেলেংকারির জন্য প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ইমপিচমেন্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন (বাম থেকে) জেনিফার ফ্লাওয়ার্স, মনিকা লিউনস্কি ও পলা জোনস

মনিকা সম্মতি জানান। স্টাডিরুম সংলগ্ন হলওয়েতে তারা দু'জন দু'জনকে চুম্বন করেন। নিজের ডেস্কে ফিরে যাওয়ার আগে মনিকা প্রেসিডেন্টের জন্য তার নাম ও টেলিফোন নম্বর লিখে রেখে যান। রাত ১০টার সময় মনিকা প্রেসিডেন্টকে টেলিফোন করে জানান, তিনি চিফ অফ স্টাফের অফিসে একা আছেন। প্রেসিডেন্ট কয়েক মিনিট পরে স্টেফানোপলোসের রুমেই তাকে দ্বিতীয়বার অভিসারের আমন্ত্রণ জানান। তারা একই অফিসে আবার একত্রিত হন এবং আবার ক্লিনটনের ব্যক্তিগত স্ট্যাডি রুমে যান। এবার স্টাডিরুমের লাইট নেভানো ছিলো। মনিকার সাক্ষ্য অনুযায়ী, তিনি ও প্রেসিডেন্ট একে অপরকে চুম্বন করেন। মনিকা তার নিজের জ্যাকেট খুলে ফেলেন। মনিকা নিজে তার বক্ষবন্ধনীর হুক খুলেছেন না-কি প্রেসিডেন্ট তা খুলে দিয়েছেন– তা মনিকা ঠিকমতো স্মরণ করতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট তার হাত ও মুখ দিয়ে মনিকার উন্মুক্ত স্তন স্পর্শ করেছেন। এ সময় একটি ফোন আসে। ফোন ধরতে দু'জনকে হলওয়ে থেকে অফিসের পিছনে ফিরে যেতে হয়...। প্রেসিডেন্ট মনিকার প্যান্টের ভেতরে হাত নামিয়ে দেন এবং হাত ব্যবহার করে মনিকার গোপন প্রদেশে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। প্রেসিডেন্ট

জনসম্মুখে আলিঙ্গনরত প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও মনিকা লিউনস্কি

www.pathagar.com

যখন ফোনে কথা বলছিলেন (লিউনস্কির আন্দাজ অনুযায়ী ফোনটা কোনো কংগ্রেস সদস্য অথবা সিনেটরের হয়ে থাকবে) মনিকা তখন মুখ মেহন অব্যাহত রাখেন। ফোনে কথা বলা শেষ করে প্রেসিডেন্ট তাকে থাকতে বলেন। ১৯৯৫ সালের ১৭ নভেম্বর, শুক্রবার দু'দিন পর মনিকা পুনরায় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নিভৃতে দেখা করেন। এবার ওভাল অফিসের স্টাডিরুমের বাইরে ব্যক্তিগত বাথরুমে মনিকা প্রেসিডেন্টের ওপর মুখ মেহন চর্চা করেন। নিজের প্যান্টের জিপার নিজে খুলে যৌনাঙ্গ উন্মুক্ত করে প্রেসিডেন্টই প্রথম এ মুখমেহনের সূত্রপাত ঘটান। প্রেসিডেন্টের এ আচরণ দেখে মনিকা বুঝতে পারেন, প্রেসিডেন্ট চান মনিকা তার ওপর মুখমেহন চর্চা করুন। এই যৌনাচারের সময়, প্রেসিডেন্ট তাঁর হাত দিয়ে মনিকার নগ্ন বক্ষ মর্দন করেন এবং বক্ষ চুম্বন করেন।

১৯৯৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর, রোববার নিউ ইয়ার্স ইভে প্রেসিডেন্ট মনিকাকে তার ওভাল অফিসে আমন্ত্রণ জানান। মনিকা সেখানে পৌছলে প্রেসিডেন্ট মনিকার সোয়েটার তোলেন। হাত দিয়ে বক্ষ মর্দন করেন এবং বক্ষ চুম্বন করেন। ওভাল অফিসের স্টাডিরুমের বাইরে মনিকা প্রেসিডেন্টের ওপর মুখমেহন চর্চা করেন।

১৯৯৬ সালের ৭ জানুয়ারী, রোববার, এদিন সন্ধ্যায় ওভাল অফিসের স্টাডিরুমের বাইরে বাথরুমে মনিকা প্রেসিডেন্টের ওপর মুখমেহন চর্চা করেন। মনিকাকে বাসায় বেড়াতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রেসিডেন্টই এই সাক্ষাতের সুযোগ তৈরি করেন। এ সময় প্রেসিডেন্ট ও মনিকা বাথরুমে যান। সেখানে প্রেসিডেন্ট তার হাত ও মুখের মাধ্যমে মনিকার বক্ষ মর্দন করেন। এ সংসর্গের সময় প্রেসিডেন্ট মনিকার ওপর মুখমেহন করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু বিশেষ শারীরিক অসুবিধার কারণে মনিকা তাকে নিরস্ত করেন।

১৯৯৬ সালের ২১ জানুয়ারী, রোববার, এদিন বিকালে প্রেসিডেন্ট মনিকাকে ওভাল অফিসে ডেকে নিয়ে আসেন। এ সময় তাদের মধ্যে যৌন সংসর্গ ঘটে। প্রেসিডেন্ট মনিকার বস্ত্র উন্মোচন করেন এবং তার উন্মুক্ত বক্ষ মর্দন করেন। প্রেসিডেন্ট নিজের প্যান্টের পিজার খুলে যৌনাঙ্গ উন্মোচন করেন। হলওয়েতে মনিকা প্রেসিডেন্টের ওপর মুখমেহন চর্চা করেন।

১৯৯৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী, রোববার, এদিন ওভাল অফিস স্টাডিরুম সংলগ্ন হলওয়েতে প্রেসিডেন্ট ও মনিকার মধ্যে যৌন সংসর্গ ঘটে। এবারও প্রেসিডেন্টই মনিকাকে ডেকে আনেন। এ সময় প্রেসিডেন্ট মনিকার পোশাক ও বক্ষবন্ধনী আংশিকভাবে উন্মোচন করেন এবং হাত ও মুখ দিয়ে মনিকার উন্মুক্ত বক্ষ মর্দন করেন। এ সময় মনিকা প্রেসিডেন্টের ওপর মুখমেহন চর্চা করেন। ১৯৯৬ সালের ৩১ মার্চ, রোববার, এবারো ওভাল অফিসে মনিকাকে ডেকে নিয়ে এসে প্রেসিডেন্টই সাক্ষাতের সুযোগ তৈরি করেন। এবারো মনিকা প্রেসিডেন্টের ওপর মুখমেহন করেন। এ সময় প্রেসিডেন্ট তার হাত ও মুখ দিয়ে লিউন্স্কির উন্মুক্ত বক্ষ মর্দন করেন এবং মনিকার অন্তর্বাস খুলে ফেলে সরাসরি তার গোপন প্রদেশ মর্দন করে। এ ছাড়াও প্রেসিডেন্ট মনিকার যৌনাঙ্গে তার চুরুট প্রবিষ্ট করান।

১৯৯৬ সালের ৭ এপ্রিল, রোববার মনিকা লিউন্স্কি স্বীকার করেছেন, এদিন ওভার

www.pathagar.com

অফিসের স্টাডিরুমের বাইরে হলওয়েতে এবং স্টাডিরুমে প্রেসিডেন্ট ও তার মধ্যে যৌন সংসর্গ ঘটে। এ সময় প্রথমে পোশাকের ওপর দিয়ে এবং পরে সরাসরি প্রেসিডেন্ট মনিকার বক্ষ স্পর্শ করেন। প্রেসিডেন্ট তার জিপার খোলার পর মনিকা তার ওপর মুখমেহন চর্চা করেন। পরবর্তী নয় মাসের মধ্যে এটাই ছিলো তাদের সর্বশেষ দৈহিক সম্পর্ক। ১৯৯৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, মনিকা লিউনস্কি স্বীকার করেছেন, এদিন বিকালে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার পরবর্তী যৌন সংসর্গ ঘটে। রেডিও ভাষণ প্রস্তুত করার নামে প্রেসিডেন্ট তার সেক্রেটারী বেট্টি কারিকে দিয়ে মনিকাকে হোয়াইট হাউসে ডেকে পাঠান। রেডিওতে ভাষণ দেয়ার পর মনিকা ও প্রেসিডেন্ট বাথরুমে পরস্পরকে চুম্বন করেন। প্রেসিডেন্ট মনিকার পোশাক খোলেন এবং প্রথমে বক্ষবন্ধনী পরিহিত অবস্থায় এবং পরবর্তীকালে উন্মুক্ত অবস্থায় তার বক্ষ মর্দন করেন। পোশাকের ভিতর দিয়ে তিনি মনিকার গোপন প্রদেশ স্পর্শ করেন। লিউনস্কি প্রেসিডেন্টের ওপর মুখ মেহন চর্চা করেন। এই দিন লিউন্স্কি একটি নীল রঙের পোশাক পরেছিলেন। এই সেই নীল পোশাক, যেটিতে ক্লিনটনের বীর্যের দাগ পাওয়া গেছে।

১৯৯৭ সালের ২৯ মার্চ, শনিবার, এদিন বিকালে ওভাল অফিস স্টাডিতে ক্লিনটনের সঙ্গে মনিকার দৈহিক সম্পর্ক হয়। এ সময় প্রেসিডেন্ট মনিকার ব্লাউস খোলেন এবং বক্ষবন্ধনীর ওপর দিয়ে তার বক্ষ মর্দন করেন। তিনি মনিকার প্যান্টের ভিতর হাত ঢোকান এবং তার গোপন প্রদেশে কামোত্তেজনা সৃষ্টি করেন। এ সময় খুব অল্প সময়ের জন্য তাদের মধ্যে সরাসরি যৌনাঙ্গগত সংস্পর্শ হয়।

১৯৯৭ সালের ১৬ আগস্ট শনিবার সকালে ওবাল অফিসের স্টাডিরুমে মনিকার সঙ্গে

হাজারো আমেরেশীয় শিশুর মাত্র কয়েকজন মার্কিন পিতারা এদের ছেঁড়া জুতার মতো ছুড়ে ফেলে চলে গেছে। এছাড়া এক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো। সে সময়ে মার্কিন সৈনিকদের উপস্থিতির কারণে ভিয়েতনামে ব্যাপকভাবে সিফিলিস ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং জনসাধারণ ব্যঙ্গ করে সিফিলিসের নাম দিয়েছিলো ভিয়েতনাম রোজ

www.pathagar.com

ক্লিটনের সাক্ষাৎ ঘটে। তারা পরস্পরকে চুম্বন করেন। মনিকা পোশাকের ওপর দিয়ে ক্লিনটনের গোপনাঙ্গ স্পর্শ করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট তাকে মুখ মেহন করতে বলেন। এ সময় কোনো যৌন সংসর্গ ঘটেনি। ১৯৯৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর রোববার, পলা জোন্স মামলার সাক্ষ্য দেয়ার তিন সপ্তাহ পর প্রেসিডেন্ট এবং মনিকা ওভাল অফিসে আবার দেখা করেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার বাইরে তারা অন্তরঙ্গ চুম্বনে ব্যস্ত থাকেন। এ সময়ও কোনো যৌন সংসর্গ ঘটেনি।

লিউন্স্কি স্বীকার করেন, তারা প্রায় ১৫ বার 'ফোন সেক্সে'রত ছিলেন। প্রতিবারই প্রেসিডেন্ট নিজে ফোন করে এ ফোন সেক্স-এর সূত্রপাত ঘটান।

দৈনিক মিল্লাত সম্পাদক চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক লিখেছেন, পাশ্চাত্যে 'আমার জীবন আমি যেভাবে খুশী ভোগ করব' এই বল্লাহীন জীবনবোধই যাবতীয় সীমা লংঘনের মূল উৎস। এই যৌন অনাচার শরীর আর সইছে না। নারীর যৌনাঙ্গ, জরায়ু, ডিম্বানু কোনো কিছুই এই অনাচারের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। পুরুষের যৌনাঙ্গ, টেস্টিস, শুক্রাণু সবই আক্রান্ত হচ্ছে। বিচিত্র ও বিকৃত যৌনকর্ম নানাবিধ যৌনব্যাধি ডেকে আনছে। যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে প্রজনন যন্ত্র তার স্বাস্থ্য হারাচ্ছে। শুধু তাই নয়, যৌন জীবন দিয়ে পাশ্চত্যের সমাজে যে ভয়াবহ লাম্পট্য, ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে বল্লাহীন যৌন জীবন যাপনের উৎকট-উন্মাতাল, তারই পুরস্কার হিসেবে কেবল প্রজনন স্বাস্থ্যই বিপর্যস্ত নয়; আবির্ভাব ঘটেছে মরণ ব্যাধি এইডস-এর। (তথ্য : দৈনিক মিল্লাত, চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুকের 'অপ্রিয় হলেও বলা দরকার', ৫/৯/৯৪)

এই অবাধ যৌন স্বাধীনতার কারণে সে দেশের অধিকাংশ মহিলাই স্বামীদের নিয়ে সুখী নয়। যৌন মিলনের অতৃপ্তিতে তাদের অনেকেই স্বামী থাকা সত্ত্বেও একজন করে প্রেমিক খুঁজে নেয়, যে তাদের কানায় কানায় পূর্ণ করে দিতে পারে। কুকুর-কুকুরী যেমন সম্ভোগ করে ঠিক তেমনি পাশ্চাত্য যৌন স্বাধীনতার নামে যথা তথায় যার তার সাথে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হয়। এই অবৈধ যৌনাচারের ফলে সেখানে কোটি কোটি কুমারী মহিলা অবৈধ গর্ভধারণ করে জীব-জন্তুর মতো অবৈধ সন্তান প্রসব করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত কুমারী মাতার সন্তান জন্মদানের একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হলো।

যুক্তরাষ্ট্রে কুমারী মাতার সন্তান জন্মদান-এর শতকরা হার

সাল	সকল জাতি	শ্বেতাঙ্গ	কৃষ্ণাঙ্গ
১৯৭০	১০.৭%	৫.৬%	৩৭.৫%
১৯৭৫	১৪.৩%	৭.৩%	৪৬.৮%
১৯৮০	১৭.২%	১০.২%	৫৫,৫%
১৯৮৫	২২.০%	১৪.৫%	৬০.১%
১৯৯০	২৮.০%	২০.১%	৬৫.২%
১৯৯১	২৯.৫%	২১.৮%	৬৭.৯%

www.pathagar.com

টিনএজার এবং পাখি ও মৌমাছি ঃ কায়সার ফ্যামিলি ফাউন্ডেশনের ডাঃ ফেলিসিয়া স্টুপুট বলেন, টিনএজারদের পাখি ও মৌমাছিদের চাইতে অনেক বেশি কিছু জানা প্রয়োজন। বিশেষ করে জন্ম নিরোধকের ব্যবহার এবং এসটিডির (যৌন ক্রিয়ার মাধ্যমে সংক্রমিত রোগসমূহ) ঝুঁকি সম্পর্কে তাদের তথ্য প্রয়োজন। ফাউন্ডেশনের মতে, বিপদটা বাস্তব।

৩০ লাখ টিনএজার অর্থাৎ সমগ্র টিনএজারদের এক-চতুর্থাংশই প্রতিবছর যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে সংক্রমিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এইচআইভি আক্রান্ত আমেরিকানদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশেরই বয়স ২২ বছরের নীচে এবং প্রতিবছর ১০ লাখ টিনএজার গর্ভবতী হয়।

শতকরা ৪০ ভাগের বেশি বলেছে যে, তারা যৌন মিলন বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। শতকরা ৭৪ ভাগ বলেছে, তাদের বন্ধুরা সতীত্ব ব্যাপারটিকে ভালো বলে বিবেচনা করে।

এই জরিপ পরিচালনায় সাহায্যকারী টিন ম্যাগাজিন ওয়াইএম-এর সম্পাদক লেসলি জেন সেইসুর বলেন, সম্প্রতি টিনএজার ও গর্ভধারণের ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়ার পাশাপাশি আমরা এটা জানতে পেরে উৎসাহ বোধ করছি যে, একজন টিনএজার মেয়ের জীবনে সতীত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠছে।

১৯৯১ সালে ৮৫১টি হাসপাতালে পরিচালিত জরিপের ফলাফল থেকে বলা হচ্ছে

সেক্স উইথ এ মাইনর ইজ এ মেজর ক্রাইম- অর্থাৎ অল্প বয়সী মেয়েদের জন্য সেক্স একটি বড় ধরনের অপরাধ। অলিম্পিক বক্সিং গোল্ড মেডেলিস্ট পল গঞ্জালেজ ক্যালিফোর্নিয়ায় এক প্রচার মিশনে মেয়েদের 'টিনএজ প্রেগন্যান্সি' প্রতিকার সম্পর্কে পরামর্শ দিচ্ছেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় টিনএজারদের প্রেগন্যান্সি একটা মারাত্মক সমস্যা। প্রতিবছর প্রায় ৭০ হাজার শিশু জন্ম দেয় তারা

www.pathagar.com

যে, দেশে প্রতিবছর মোটামুটি এ ধরনের শিশুর সংখ্যা প্রায় ২২ হাজার। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি দেখে এ ধরনের শিশুর সংখ্যা আরো অনেক বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও জনসেবা দপ্তরের পরীক্ষায় এসব শিশুর চার-তৃতীয়াংশের দেহেই ড্রাগ পজিটিভের লক্ষণ দেখা গেছে এবং এদের প্রায় অর্ধেকের জন্ম হয়েছে যথাসময়ের আগে অপুষ্ট অবস্থায়। কৃষ্ণাঙ্গ ও স্পেনীশ অরিজিন থেকে আসা এ ধরনের অধিকাংশ শিশুর প্রতি দত্তক নিতে আগ্রহী পিতা-মাতারাও সহজে আকৃষ্ট হয় না এ জন্যেই। হেরোইন ও অন্যান্য মাদকে আসক্ত মায়েদের ক্ষতিকর প্রভাব অনেক শিশুর শরীরে থাকে বলে তারা শংকিত হন। আশঙ্কাটি একেবারে অমূলক নয়। কারণ এ ধরনের কোন কোন শিশুর শরীরে এইডস ভাইরাসের সন্ধানও পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গক্রমে 'ডি. সি. জেনারেল কম্যুনিটি সম্পর্কের' পরিচালক শিল্ডা আইভি বলেন, "এ ধরনের পরিত্যক্ত শিশু হাসপাতালগুলোতে আসতেই থাকবে যদি না আগে থেকেই আমরা তাদের আসার কারণগুলো দূর করি। আমরা এখন এ সমস্যা প্রতিরোধের ব্যাপারে আলোচনা করছি। ব্যাপারটিতে আগাম হস্তক্ষেপের বিষয়েও আমরা জোর দিচ্ছি।" জয়েস জনসন বলেন, "কিন্তু সমস্যা হলো এদের স্থায়ী আবাসনের জন্যে ট্রানজিশনাল সুযোগ-সুবিধে পর্যাপ্ত নয়। দেশে ছোট ছোট এতিমখানারও ঘাটতি রয়েছে।" (সূত্র ঃ ইউ এস টুডে, '৯৩)

চীনে যৌনাচার

মাও সেতুও তার বিখ্যাত ছোট লাল গ্রন্থে কঠোর সংযম, চিরস্থায়ী বিপ্লব এবং ত্যাগের বাণী প্রচার করেছেন। অথচ মাওয়ের ব্যক্তিগত যৌন জীবনের বাড়াবাড়ি ও নৈতিক অধঃপতন ছিলো চূড়ান্ত। ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ লী-এর উদ্‌ঘাটিত তথ্যসমূহ চমকপ্রদ। তিনি লিখেছেন ঃ "প্রকাশ্যে মাও মহিলাদের পক্ষাবলম্বন করে বিবৃতি, বক্তৃতার তুবড়ি ছোটাতেন আর গোপনে তিনি শ'য়ে শ'য়ে উপপত্নী সংগ্রহ করতেন। যাদেরকে ভোগ করার পরে ত্যাগ করা হতো অবলীলায়। লী বলেন, মাও-এর নারী সংক্রান্ত ক্ষুধাবোধ ছিলো তার খাদ্যাভাস্যের মতোই চিরন্তন। যদি কোনো নারী তার প্রতি কোনো ভক্তি-ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতো তখন তিনি ধরে নিতেন যে, ঐ নারী তাঁর বিছানার সঙ্গী হতে চাইছে। মহান নেতার এ ধরনের উদগ্র যৌনাকাঙ্ক্ষার বিপক্ষে তাঁর ভক্তদের মধ্যে গুটি কয়েকজন অবশ্য আপত্তি জানানোর দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির রেকর্ডপত্রে দেখা যায়, ১৯৬১ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত মাও-এর স্বীকৃতভাবে ২৯ জন সেক্রেটারী এ্যাটেনডেন্ট এবং নার্স ছিলো। এদের মধ্যে ২১ জনের উপরই অশালীন আচরণ ও বলাৎকার করা হয়েছে।

নাম্বার ওয়ান রক্ষিতা ঝদ ইউফেং-এর সঙ্গে মাও

মাও তাঁর আগের জীবনেই যখন একজন তরুণ বিপ্লবী তখনই একজন যৌন বিলাসী কামুক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এ সময়ে অধীনস্থ

www.pathagar.com

সৈনিকরা এই গানটি গাইতো–

'কমান্ডার ঝু খুবই কঠোর পরিশ্রমী
তিনি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে চালের বোঝা নিয়ে
চলতে পারেন অনায়াসে
আর কমান্ডার মাও-ও কঠোর পরিশ্রমী
তবে প্রেম করার ক্ষেত্রে।'

ডাঃ লী-এর মতে একবার তরতাজা তরুণী এবং অল্প শিক্ষিত যারা দুনিয়াদারী সম্পর্কে খুব একটা জানে না এসব স্বাস্থ্যবতী তরুণী মাওয়ের খুব পছন্দ। যেমন, সাংস্কৃতিক দলের সদস্য (পেশাদার নৃত্য শিল্পী), ওয়েট্রেস, গ্রেট হলের পরিচালিকা, মহিলা সেক্রেটারী এবং কোড রিডার্স প্রভৃতি।

বলরুমের পাশেই মাও-এর একটি বিশেষ লাউঞ্জ ছিলো যেখানে থাকাকালীন সময়ে তরুণীদের নিয়ে তিনি প্রায়ই এক-দুই ঘন্টার জন্য ওখানে চলে যেতেন। এদের মধ্যে যাদেরকে বেশি পছন্দ হতো তাদেরকে মহান চেয়ারম্যানের খাস কামরায় নিয়ে যাওয়া হতো।

মাও কখনো কখনো তার রক্ষিতাদের তার বিশেষ ট্রেনে দাওয়াত করতেন। তাদের অবশ্য স্টুয়ার্ডেস হিসেবে দেখানো হতো। এদের মধ্যে যাদেরকে পছন্দ হতো তাদেরকে ডাইনিং কার হয়ে বেডরুমে নিয়ে যাওয়া হতো। বিকাল বেলায় কখনো কখনো তিনি এক দঙ্গল নগ্ন যুবতী নিয়ে নেমে পড়তেন ঝংনানহাই প্রাসাদে নির্মিত তার ব্যক্তিগত উষ্ণজলের সুইমিং পুলে জলকেলীতে। ডাঃ লী বলেন, মাও প্রায়ই মিং রাজ বংশের একজন সম্রাটের সমালোচনা করতেন যে, এ সম্রাটের পাঁচ হাজার উপপত্নী ছিলো। আমি মনে করি না যে মাও-এর জীবনে সমপরিমাণ উপপত্নি ছিলো। কিন্তু যা ছিলো

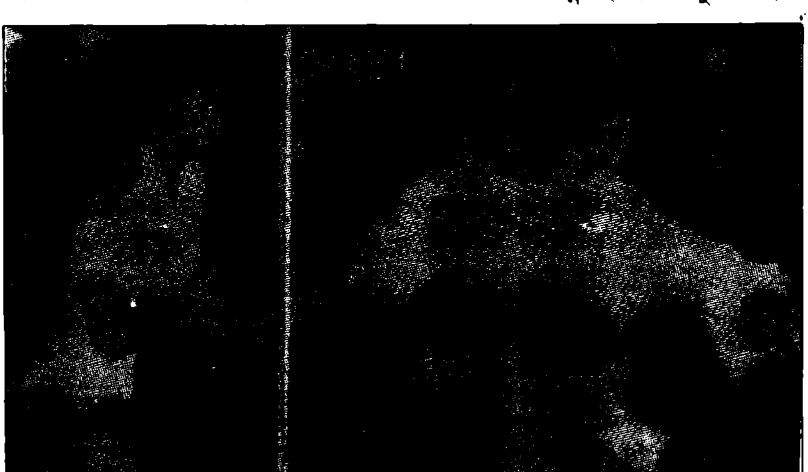

মহান গুরু চেয়ারম্যান মাও ভক্ত তরুণী শিষ্যাদের মাঝে। এরা মাওকে খুশী করার জন্যে তার ইচ্ছায় যে কোনো কিছু করার জন্যে প্রস্তুত ছিলো

www.pathagar.com

তার সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। মাও এবং তার বিছানায় অংশীদাররা সবার কাছেই যৌনতাটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। মেয়েরা তার ক্ষমতার প্রতি এবং তীব্র কামুকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ষাটোর্ধ এই বৃদ্ধের কাছে আসতো।

যৌন বিষয়ে তিনি কিছুটা অক্ষমতা আন্দাজ করলেন যে, তার ক্ষমতা এবং স্বাস্থ্য ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। তখন তিনি লাইব্রেরীতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা পর্ণো সাহিত্য পড়ে ও অশ্লীল ছবি দেখে কাটাতেন।

মাও ৪০ বছরে ৪টি বিয়ে করেছিলে। প্রথম বিয়ে করেছিলেন বয়স্কা মহিলাকে। এ বিয়ে ছিলো সামাজিকভাবে। কিন্তু অচিরেই তিনি তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলে ১৯২০ সালে ইয়াং কাইলুইক বিয়ে করেন। এই পত্নী ছিলো মাওয়ের একজন প্রাক্তন শিক্ষকের মেয়ে। গৃহযুদ্ধের সময় জাতীয়তাবাদী সরকার এই স্ত্রীকে বন্দী ও হত্যা করে। মাও তিন সন্তানের জননী কাইলুইকে ভালোবেসেছিলেন সত্য কিন্তু তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারেনি। তাই দ্বিতীয় স্ত্রী বন্দী থাকা অবস্থায়ই তৃতীয় স্ত্রী হিঝিৎসেনকে ঘরে তোলেন। হিঝিৎসেন খুবই মনোহরিণী সুন্দরী একজন কমিউনিস্ট গেরিলা ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক লংমার্চে অংশগ্রহণ করেছিলেন। লংমার্চে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য তরুণীদের সাথে মাওয়ের সম্পর্ক ঝিৎসেন মেনে নিতে পারেননি। ক্ষোভে ও দুঃখে ১৯৩৭ সালে হি চায়না ছেড়ে চলে যান অথবা মাও কর্তৃক দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন।

ইয়েনানে মাও-এর বাহিনীতে যারা যোগ দিয়েছিলো তাদের মধ্যে একজন ছিলো সাংহাইয়ের জিয়াং কিং। জিয়াং-এর মা ছিলো একজন রক্ষিতা স্তরের মহিলা এবং সম্ভবত পতিতা। জিয়ংও একজন পতিতা ছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এই পতিতাকেই পরবর্তীতে ৪র্থ স্ত্রী হিসাবে মাও গ্রহণ করেন।

অন্যান্য দেশে যৌনাচার

বৌদ্ধ ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোতে নর-নারীর অবাধ মেলামেশা, অবৈধ যৌনাচার, সমকামিতার ফলে সামাজিক অবকাঠামো ও মূল্যবোধ ধ্বংস হবার পথে। থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, লাওস ও হংকং-এ গড়ে উঠেছে সমাজ বিধ্বংসী পতিতাবৃত্তি ও নাইট ক্লাব সংস্কৃতি। নিউজ উইক-এর প্রতিবেদক Rom Moseu (জুন ২৯, ১৯৯২) বলেছেন, থাইল্যান্ডে জুতার দোকানের চেয়েও সহজলভ্য হলো নাইট ক্লাব, পর্নো পত্রিকা ও পতিতালয়।

ভারতীয় লেখক কৃষণ চন্দর এর 'হংকং এ এক রাত' গ্রন্থে লেখক দেখিয়েছেন মেয়েদের সম্ভ্রম-সঙ্কোচবোধ কতো গভীর হতে পারে। বইটিতে লেখক বি ডি ইসরানী নামক এক ব্যবসায়ীর কাহিনী লিখেছিলেন।

পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে মাত্র দশ ডলার হাতে নিয়ে ইসরানী নামক এক গরীব মিস্ত্রী সুদূর হংকং-এ এসে কেমন করে বিশাল সম্পদ ও প্রতিপত্তির মালিক হয়েছিল তারই বর্ণনা দিচ্ছিলেন বইটিতে। ইসরানী লেখককে তার সম্পদের উৎস দেখানোর জন্য যেসব জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল সেগুলোর সবগুলোই বাহ্যত ছিলো দোকান। দোকানের পেছন দরজা দিয়ে ঢুকলে দেখা যায় টয়লেট। টয়লেটের সামনে কিছু অর্ধবয়সী মানুষ

www.pathagar.com

তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে কতগুলো সাংকেতিক শব্দের প্রচলন আছে। যারা তা জানে না তারা শুধু প্রস্রাব করে ফিরে যায়। আর যারা ঐ সাংকেতিক শব্দ জানে এবং উচ্চারণ করে তাদেরকে ভেতরের দরজা পার হয়ে একটি ঘরে যেতে দেয়া হয়, যেটা একটা জুয়াখানা। তারপর দশটা চাকচিক্যময় কামরা, যার প্রতিটিতে রয়েছে মোহময়ী চীনা মদিরাক্ষী। তাদের হাতে রংবেরং এর পান পাত্র। বড় বড় শেঠরা এসে এসব কামরায় রাত কাটিয়ে যায়। তদ্দারা ইসরানীর ব্যাংক ব্যালেন্স ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং ইসরানী বুঝতে পারে সহজ ব্যবসার জন্য সম্ভ্রমের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই।

আফ্রিকার একজন এইডস রোগী

কামরার পর কামরা দেখাতে দেখাতে অবশেষে ইসরানী একটি প্রায়ান্ধকার কামরায় আসে। সেখানে হাত পা বাঁধা অবস্থায় একটি মেয়ে সোফার উপর বসে গোঙ্গাচ্ছিল। ইসরানীর ইঙ্গিতে তার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। মেয়েটির বয়স পনের-ষোলর বেশি হবে না। ইসরানী অনেকক্ষণ ধরে তাকে চীনা ভাষায় শাসাল। কিন্তু মেয়েটি বরাবর মাথা দোলাচ্ছিল এবং শেষে চিৎকার শুরু করে দিলো। মেয়েটি উঠে যেতে চেষ্টা করছিল। এমন সময় ইসরানী তাকে এক প্রচন্ড ঘুষি দিয়ে ধরাশায়ী করে ফেললো। মেয়েটির নাক মুখ থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। একটা চরম ভয় বিভীষিকা তার মুখাবয়ব আচ্ছন্ন করে ফেললো। দারুণ যন্ত্রণায় সে গোঙ্গাচ্ছিল আর অতি করুণ চোখে তার দিকে তাকাচ্ছিল।

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ইসরানী বললো গতকাল তাইওয়ান থেকে ছয়টি মেয়ের একটা ব্যাচ আনিয়েছি। একেবারে আনকোরা, কিছুই জানে না হারামজাদীরা। বাইরে এসে ইসরানী একজন কর্মচারীকে ডেকে বললো, ওই মেয়েটার কামরায় জনা দশেক লোক লাগিয়ে দাও। মেয়েটির কাছে আত্মহত্যার জন্য সম্ভ্রমের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। অথচ ইসরানীর কাছে সহজ ব্যবসায়ের জন্য সম্ভ্রমের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই।

ঐ মেয়েটি যদি আত্মহত্যা করার সুযোগ পেত তবে সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সেও অবশ্যই আত্মহত্যা করতো। কারণ দৈহিকভাবে পৃথিবীর সকল নারীই যেমন একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী তেমনি তার লজ্জা সম্ভ্রম সঙ্কোচ ও একই প্রকৃতির। কিন্তু মেয়েটির

www.pathagar.com

আত্মহত্যার সুযোগ নেই। সুতরাং দশটি পুরুষ দ্বারা তার সম্ভ্রম হরণ করে তার সকল সঙ্কোচ নিরসন করে দেওয়া হবে এবং এক সময় মেয়েটি হয়ে যাবে একটি স্বার্থক বারবণিতা। তখন মেয়েটির আত্মসত্ত্বা বলে আর কিছু থাকবে না। (তথ্য সূত্র ঃ নষ্ট দর্শন, আবদুল মবিন, পৃঃ ১১৯, ১২০)

থাইল্যান্ড জুড়ে প্রায় আট হাজার পতিতা দেহ ব্যবসায় লিপ্ত। তবে অন্য একটি সূত্র বলছে, এই সংখ্যা দুই লক্ষ অথবা তারও বেশি। প্রতিবেদক আরো একটি পিলে চমকানো তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "থাই নাগরিকদের মধ্যে এইডস সম্পর্কে সচেতন বৃদ্ধি পেলেও যৌন জীবন সম্পর্কে তাদের যে ধারণা গড়ে উঠছে তার পরিবর্তন হবে না, সেটাই কথা। থাইল্যান্ডে কোন অতিথি গেলে তাকে বিভিন্ন পার্ক, সিনেমা হলে যেমন নিয়ে যায় তার আত্মীয়রা ঠিক একইভাবে তাদের ভ্রমণের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়া হয় পতিতালয়কে।" ব্যাংককস্থ মাহিডল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ডাক্তার চানউয়ান টং তানাসউগারান বলেন, "থাই পুরুষদের ধারণা যে জীবনকে আনন্দঘন করে তুলতে নিষিদ্ধ এলাকায় যাওয়াটা জরুরী। অন্য একটি সূত্র জানায়, প্রতিদিন চার লক্ষাধিক পুরুষ পতিতালয়ে গমন করে এবং পঁচাত্তর শতাংশ এর জন্য অর্থ ব্যয় করে। থাই পুরুষরা নারীদের এখনও যৌনদাসী ছাড়া আর বেশি কিছু ভাবতে পারেনি বলেও বিশেষজ্ঞদের অভিমত। (তথ্য সূত্র : সাপ্তাহিক বিক্রম, ২৫ এপ্রিল–১ মে সংখ্যা '৯৪)

এসব যৌনাচারের ফলে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোতেও মরণ ব্যাধি এইডস মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে।

গত ৭/৬/৯৫ তারিখে মিডিয়া সিন্ডিকেট পরিবেশিত "এইডস-এর মোকাবিলায় ধর্মীয় শিক্ষাকে আত্মস্থ করার ওপর গুরুত্বারোপ" শিরোনামে একটি সংবাদ জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত হয়। এ সংবাদে বর্তমান বিশ্বে এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীদের একটি পরিসংখ্যানে পাওয়া যায়। এ চিত্র অত্যন্ত ভয়াবহ।

পৃথিবীতে ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ এইডস রোগে আক্রান্ত। এদের অর্ধেক মহিলা। পৃথিবীতে ১০ লাখ শিশু এ রোগে আক্রান্ত। এইডস আক্রান্তদের মধ্যে ৬৭ শতাংশ সমকামী। প্রতিদিন ৬ হাজার মানুষ নতুন করে এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর ৩০ লাখ মানুষ নতুন করে এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এইডস ও নৈতিক মূল্যবোধ' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা একথা বলেন। বক্তারা উল্লেখ করেন, আক্রান্তদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ১ মিলিয়ন, ল্যাটিন আমেরিকায় ২ মিলিয়ন, পশ্চিম ইউরোপে ৫ লাখ, পূর্ব ইউরোপে ৫০ হাজার, উত্তর ইউরোপে ১ লাখ, আফ্রিকায় ১০ মিলিয়ন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ২.৫ মিলিয়ন, উত্তর-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে ৫০ হাজার, অস্ট্রেলিয়ায় আড়াই লাখ মানুষ এইডস রোগে আক্রান্ত। এইডসে মহিলাদের আক্রান্তের হার বাড়ছে। কোন কোন দেশে ৫০ থেকে ৭০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

'৯৮ সালে প্রকাশিত আরেকটি তথ্যে জানা যায়, মরণব্যাধি এইডস ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ভিয়েতনামে। এক সপ্তাহে সেখানে প্রায় ৩শ' এইডস রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ভিয়েতনামের ন্যাশনাল এইডস কমিটির ডাঃ কুয়ার বলেন, ভিয়েতনামে এ

www.pathagar.com

পর্যন্ত ১০ হাজার ২২৬ জনের মধ্যে এইডস সৃষ্টিকারী এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ভিয়েতনামে '৯০ সালে প্রথম এইডস সনাক্ত হয়। ভিয়েতনামের ৬১টি প্রদেশের মধ্যে ৫৯টি প্রদেশেই এইডস ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে হোচি মিন সিটি সবচেয়ে উপদ্রুত এলাাক। এ শহরে প্রায় ২ হাজার ৬৩৯ জন এইডস আক্রান্ত রোগী রয়েছে।

সর্বশেষ তথ্যে জানা যায়, গত ২১ নভেম্বর ২০০০ WHO এবং UN AIDS সংস্থা

ঘাতক ব্যাধি এইডস বিশ্বব্যাপী তার মরণ থাবা বিস্তার করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত এই ঘাতক ব্যাধির কোনো প্রতিষেধক বের করতে পারেননি। সারা বিশ্বে আজ অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও অবাধ যৌনাচার যে পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে তাতে মরণব্যাধি এইডস কিংবা তার চাইতেও আরো ভয়াবহ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটা [illegible] স্বাভাবিক তা আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা একবাক্যে স্বীকার করছেন। প্রতিষেধক আবিষ্কারে ব্যর্থ চিকিৎসকরা এখন মানুষকে যৌনাচারের ক্ষেত্রে আরো সংযমী হতে ও নৈতিক জীবনযাপন করতে, বিশেষ করে সমকামিতা ও পতিতাবৃত্তি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। আফ্রিকার কয়েকটি দেশে ইতোমধ্যেই এই রোগ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। ইউরোপ এবং এশিয়ার কয়েকটি দেশেও এইডস রোগ আশঙ্কাজনকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এগুলোর মধ্যে রুমানিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভারতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশেও এই ঘাতক ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং ইতোমধ্যেই এখানে এইডসে আক্রান্ত বেশ কয়েকজন রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এইডসে আক্রান্ত মায়েদের গর্ভজাত সন্তানরাও এ রোগে আক্রান্ত হয়। রয়টার্সের ফাইল ছবিতে রুমানিয়ায় এই ঘাতক ব্যাধিতে আক্রান্ত কিছু সংখ্যক শিশুকে দেখা যাচ্ছে। (বামে উপরে) রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টের অদূরে ভিদরার একটি হোস্টেলে এইডস আক্রান্ত শিশুদের খাবার খেতে দেখা যাচ্ছে। (বামে নিচে) ভিদরার আরো একটি এইডস আক্রান্ত শয্যাশায়ী শিশুর জানালার ফাঁক দিয়ে এই সুন্দর পৃথিবীর শ্যামলিমাকে প্রাণভরে দেখার দৃশ্য। হয়তো অচিরেই এই শিশুটিকে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হবে। (ডানে) এইডস আক্রান্ত ১৩ বছরের রুমানীয় শিশু।

www.pathagar.com

জেনেভাতে তাদের এক বৈঠকে বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করে, যা ২৫ নভেম্বর ২০০০ রয়টার্স মিডিয়াকে এ তথ্য প্রদান করেছে। এ রিপোর্টে দেখা যায়, ২০০০ সালে এইডসে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩ লাখ মানুষ। আর সব মিলিয়ে এ মুহূর্তে বিশ্বে ৩ কোটি ৬১ লাখ মানুষ। ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০০ সালের ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত এ রোগে প্রাণ হারিয়েছে ২ কোটি ১৮ লাখ মানুষ।

অঞ্চল	মোট আক্রান্তের সংখ্যা	১৯৯৯ থেকে ২০০০-এ বৃদ্ধি
এশিয়া ও প্যাসেফিক	৬৪০০০০০	৯০০০০০
কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র	৯২০০০০	৪৫০০০
পশ্চিম ইউরোপ	৫৪০০০০	৩০০০০০
অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড	১৫০০০	–
উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য	৪০০০০০	৮০০০০
ল্যাটিন আমেরিকা	১৪০০০০০	–
ক্যারিবিয়ান	৪০০০০	–

গত ১/১২/২০০০ বিটিভিতে প্রচারিত তথ্যে জানা যায়, বিশ্বে প্রতিদিন ১৬০০০ নর-নারী এইডস রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। গত বছর মারা গেছে ৮০,০০০ জন। বেসরকারী হিসাবে বাংলাদেশে এইচআইভিতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২১,০০০ জন। সরকারী হিসাব মতে, এইডসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৯৪ জন। বেসরকারি হিসাবে আরো অনেক বেশি। ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, থাইল্যান্ডে ৬০ লাখ এইডস রোগী রয়েছে। তন্মধ্যে ভারতেই ৩৫ লাখ। রাশিয়ায় বর্তমানে মহামারী আকার ধারণ করেছে।

১৯৮৫ সাল থেকে ২০০০ সালের ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছে ২ কোটি ১৮ লাখ মানুষ। বর্তমানে সারাবিশ্বে এইডস রোগীর সংখ্যা ৩ কোটি ৬১ লাখ। আর ২০০০ সালে এইডসে নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ৫৩ লাখ। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউএন এইডস সংস্থা তাদের বার্ষিক রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ করে। সারাবিশ্বের মধ্যে আফ্রিকায় এইডসের বিস্তার লাভ করে ভয়াবহ রূপে। শুধুমাত্র আফ্রিকার উপসাহারা অঞ্চলে এইডস রোগীর সংখ্যা ১০ লাখের উপরে। এখানে প্রতি ৩ জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে ১ জন এইডসে আক্রান্ত। আর পুরো বিশ্বে প্রতি মিনিটে আক্রান্ত হচ্ছে ১১ জন নারী-পুরুষ ও শিশু। প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছে ১৫ হাজার এবং বছরে এ সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৫০ লাখ ৪ হাজার। এইডসের কবল থেকে বাংলাদেশও মুক্ত নয়। এখন পর্যন্ত এই মরণ ব্যাধি ভয়াবহ আকার বিস্তার লাভ না করলেও বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচনা করছেন। কারণ ইতোমধ্যে গত ডিসেম্বরে বিশ্ব এইডস দিবসে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী স্বীকার করেছেন বাংলাদেশে বর্তমানে ২১ হাজারের বেশি লোক এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত। ন্যাশনাল এইডস কমিটির হিসাব মতে, বাংলাদেশে এইডস রোগীর সংখ্যা গত বছরের নভেম্বর পর্যন্ত ছিলো ১৫৭ জন, ডিসেম্বরে একজন শনাক্ত হওয়ার পর এ সংখ্যা বেড়ে হয় ১৫৮ জন। এই সংখ্যাটিকেই সরকারিভাবে

www.pathagar.com

এইডস রোগীর সংখ্যা ধরা হয়। তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শেখ ফজলুল করিম সেলিম গত ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবসে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বলেন, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১৫৭ জনের দেহে এইডস শনাক্ত করা হয়েছে। গত বছর চীনা বংশোদ্ভূত আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ডঃ জেমস চিন বাংলাদেশে এইডস রোগীর সংখ্যা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, বাংলাদেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এখানে বর্তমানে ২০ হাজারের মতো এইডস রোগী রয়েছে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য এটি এক ভয়াবহ চিত্র। তবে এ মাসের শুরুর দিকে ডঃ চিন পিজি হাসপাতালের ভাইরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান ও ন্যাশনাল এইডস কমিটির সাবেক মেম্বার সেক্রেটারি প্রফেসর মোঃ নজরুল ইসলামের কাছে চিঠির মাধ্যমে জানান, তিনি বাংলাদেশে এইডস রোগীর যে সংখ্যা বলেছিলেন, তা ঠিক নয়। রোগী এতো হবে না। আরো কম। আপাতত তার এই ভুল স্বীকারে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া গেলেও প্রফেসর নজরুল ইসলাম বলেন, পুরোপুরি স্বস্তি পাওয়া কিংবা নিশ্চিন্ত হওয়ার কিছু নেই। কারণ আক্ষরিক অর্থেই বাংলাদেশ এইডসের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। কারণ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, বার্মাসহ থাইল্যান্ডে এইডসের বিস্তার ভয়াবহ আকারে বিস্তার লাভ করে চলেছে। ইতোমধ্যে ভারতে প্রায় ৫০ লাখ লোক এইডসে আক্রান্ত হয়েছে। পাকিস্তানে আক্রান্ত হয়েছে প্রায় ৮০ হাজার। আর বাংলাদেশের লোক অহরহই ভারতে যাতায়াত করছে। ফলে সেখান থেকে অনেকে এই রোগ নিয়ে দেশে ফিরছে। কাজেই বাংলাদেশ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে।

আরেকটি তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশে আগামী কয়েক বছরে এইচআইভিতে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াবে ৮ থেকে ১০ কোটিতে। একই সময়ে বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াবে ৭ লাখে। শিশুরাও এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ব্যাধির শিকার। ইতোমধ্যে এইডস-এ আক্রান্ত হয়েছে ৩০ লাখ শিশু।

১৯৯১ সালে আমেরিকার একজন বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীর মন্তব্য হচ্ছে, কেন যে অনেকে আমাদের অনুসরণ করে? কূটনীতি আর অর্থনীতি ছাড়া আমাদের কোনো নীতিই নেই! নেই পারিবারিক বা সামাজিক শান্তি, নেই কোন নীতি, নৈতিকতা, আমরা বাইরের দুনিয়ার অনেককে বর্বর বলি, সন্ত্রাসী বলি, আসলে আমরাই বর্বর, আমরাই সন্ত্রাসী, হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ আর নারী নির্যাতনই আমাদের সমাজের প্রকৃত অবস্থা। আমাদের সমাজকে যারা অনুসরণ করবে তারাই বিপদগামী হবে।

বাংলাদেশে যৌনাচার ও বিবিধ প্রসঙ্গ

বর্তমানে বাংলাদেশে ফ্রী মিক্সিং-এর প্রবণতা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের প্রতিটি স্থানে হরহামেশাই নর-নারীর দৃষ্টিকটূ দৃশ্য চোখে পড়ে। এমনকি হাসপাতালও বাদ নেই। সম্প্রতি পিজি হাসপাতালে আমার অসুস্থ মেয়েকে দেখে ফিরবার পথে তিনতলার বারান্দায় দু'জন কিশোর এবং একজন কিশোরীকে আপত্তিজনক অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। একটি কিশোর অপর কিশোরীটিকে চুমু দিচ্ছে, শরীরের বিভিন্ন অংশে হাত বুলাচ্ছে। এ দৃশ্য অনেকেই দেখেছে। কিন্তু কিশোর-

www.pathagar.com

কিশোরীদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ ছিলো না। রাজপথেও আজকাল ট্যাক্সিতে, বেবীতেও দেখা যায়। দেখা যায় ছেলে মেয়েকে জড়িয়ে ধরছে অথবা চুমু খাচ্ছে। যুবক বয়সের একটি শরীর অপর একটি যুবতী বয়সের শরীরে সান্নিধ্য পেয়ে সুখ-সুধায় দলিত-মথিত হয়ে পথ চলছে। আবার কখনো চলন্ত যানবাহনে দেখা যায় যে, ছেলের কোল জুড়ে মেয়েটির অবস্থান। মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে কখনো চুমু খাচ্ছে। কখনো দু'হাতে জড়িয়ে ধরছে গলা, বুক এবং বুকের দু'টি আকর্ষণীয় বস্তু। পথচারীরা অবাক বিস্ময়ে দেখছে। যতই মানুষ ওদের দেখছে ওরা ততই মেতে উঠছে শরীর মাতানো খেলায়। এই অবাধ ফ্রী মিক্সিং-এর অভিশাপে অনেক বাঙালী মুসলমান পরিবারে ধস নেমেছে। ভাবী-দেবরের সাথে, গৃহ শিক্ষকের সাথে ছাত্রী অথবা গৃহকর্তার অনুপস্থিতিতে গৃহ শিক্ষকের সাথে গৃহকর্ত্রী, সহকর্মীর সাথে সহকর্মিনী, বন্ধুর স্ত্রীর সাথে বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর, সহপাঠী ছাত্রীর সাথে ছাত্রীর, কাজের মেয়ের সাথে গৃহকর্তার এরকম অবৈধ প্রণয়, অবৈধ কার্যকলাপের সংবাদ প্রায়ই পত্রিকার পাতায় দেখা যায়। অবৈধ প্রণয়ের ফলে আমাদের দেশে অনেক খুন-জখমের মতো ভয়াবহ ইতিহাস সংঘটিত হয়েছে। ফ্রী মিক্সিং তথা ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার ফলে রাষ্ট্র তথা পারিবারিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ছে। মেয়েরা যখন তাদের শিক্ষাগত জীবনে বা বিবাহ পূর্ব জীবনে তার ছেলে বন্ধুদের সাথে অবাধে মেলামেশা করতে অভ্যস্থ হয়ে যায় তখন বিবাহ পরবর্তী জীবন তার কাছে একঘেয়েমী, বৈচিত্রহীন মনে হয়। তার মন পড়ে থাকে বিবাহ পূর্ব জীবনে বন্ধুদের সাথে হাসি, গল্প ও ঘুরে বেড়ানোর চটকদার স্মৃতিতে। ফলে এ ধরনের মেয়েরা এক পুরুষে মন বসাতে পারে না। যার প্রেক্ষিতে স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। ছেলেমেয়েদের দিকে যত্নবান হওয়ার ব্যাপারে এবং তাদের নৈতিক শিক্ষা দিতে তারা ব্যর্থ হয়। ফলে একটি পরিবার হতে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকেরা যে সুগভীর মায়া-মমতা ও স্নেহ-ভালোবাসা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হন মানসিকভাবে হতাশায় ভোগে এবং পরবর্তীতে এরই ফলে নানা নৈতিকতা বিবর্জিত কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং সঠিকভাবে চিন্তা-চেতনার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে।

১৯৯৭ সালে নিউইয়র্ক ভিত্তিক বৈশ্বিক প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা সংস্থা Population Council-এর বাংলাদেশ শাখা এবং Research Evolution Association Development (READ)-এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত সমীক্ষায় এ সম্পর্কিত এক ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। উক্ত সমীক্ষা অনুযায়ী দেশের অবিবাহিত তরুণদের মাঝে বেশ উচ্চহারে বিবাহপূর্ব যৌনতা বিরাজ করছে। বিবাহিত পুরুষদের মধ্যেও বিবাহপূর্ব ও বিবাহবহির্ভূত উভয় রকমের যৌন অভিজ্ঞতার হার বেশ উঁচু। অন্যদিকে বিবাহিত বা অবিবাহিত খুব কম মহিলাই বিয়ের আগে শারীরিক অভিজ্ঞতা কথা স্বীকার করেছেন।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, ধনী ও দরিদ্র উভয় শ্রেণীর পুরুষের ক্ষেত্রেই বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্কটি হয়ে তাকে মূলত বাণিজ্যিক যৌনতা কর্মী অর্থাৎ পতিতাদের সঙ্গে। এতে যৌনাবরণের ক্ষেত্রে একটি পরিষ্কার ভৌগোলিক পার্থক্য দেখা গেছে। বিয়ের আগে যৌনতার হার বেশি দেখা গেছে শহরে এবং বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক বেশি গ্রামাঞ্চলে।

www.pathagar.com

ভাওয়াল জমিদার মেজকুমার রামেন্দ্র নারায়ণ রায়

অবাধ যৌনাচার ও পতিতালয়ে যাবার কারণে ভাওয়ালের রাজা কুৎসিত দূরারোগ্য ব্যাধি সিফিলিস-এ আক্রান্ত হয়েছিলো। আর অন্যদিকে স্বামীর অবহেলায় স্ত্রী শ্রীমতি বিভাবতী দেবী পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পরেছিলো পারিবারিক চিকিৎসক আশু ডাক্তারের সাথে। কলিকাতা হয়ে দার্জিলিংয়ে যখন চিকিৎসার জন্য ভাওয়ালের রাজা মেজকুমার রামেন্দ্র নারায়ণ যান তখন স্ত্রী বিভাবতী দেবী তার ভাই সত্যেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় আশু ডাক্তারের সহযোগিতায় বিষ প্রয়োগে মেজ কুমারকে হত্যা করে। আত্মীয়-স্বজন ও প্রজারা জানে মেজ কুমারের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। দাহ করার মাঝ পথে অলৌকিকভাবে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। আত্মীয়-স্বজনেরা দাহ কার্য সমাপ্ত না করেই ঘরে ফিরে আসে। এদিকে শ্মশানের সংশ্লিষ্ট সন্ন্যাসী মেজকুমারের প্রাণ আছে মনে করে চিতা থেকে কুড়িয়ে তার আস্তানায় নিয়ে যায় এবং সেবা-শুশুষা করে তাকে সুস্থ করে তুলে।

কোন কোন মানুষের জীবনালেখ্য রূপকথাকেও হার মানায়। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলাও ঠিক তেমনি। সবাই জেনেছে কুমার মারা গেছেন, তাঁকে যথারীতি দাহ করা হয়েছে। কিন্তু বারো বছর পর এক জটাধারী সন্নাসী সবাইকে হতবিহ্বল করে দিয়ে দাবি করে বসলো– 'আমি মরিনি। আমিই তোমাদের সেই মেজকুমার'। এ নিয়ে প্রচন্ড হৈ চৈ। মামলা-মোকদ্দমা। বিজ্ঞ আদালত চূড়ান্ত রায়ে তাঁকে মেনে নিলো মেজকুমার হিসাবে কিন্তু মানেনি তার স্ত্রী। পরকীয়া প্রেম ও উচ্ছৃংখলতার দৃষ্টান্ত ভাওয়াল রাজার কাহিনী। যুগে যুগে এমনতর হাজারো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে আমাদের লোক চক্ষুর অন্তরালে।

সন্ন্যাসবেশে রামেন্দ্র নারায়ণ রায়

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে ব্যাপক কথোপকথনের মাধ্যমে জানা গেছে, অবিবাহিত তরুণ পুরুষদের ২৭ শতাংশ শারীরিক সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছে। বিবাহিত পুরুষদের মধ্যে বিয়ের আগে যৌনতার কথা স্বীকার করেছেন ৫১ শতাংশ। শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলে বিবাহিত তরুণী মেয়েদের মোটামুটি ক্ষুদ্র কিন্তু উল্লেখযোগ্য একটি অংশের তাদের ভবিষ্যৎ স্বামীর সঙ্গে বিয়ের আগে সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিলো। অন্য পুরুষদের সাথে সম্পর্ক যোগাযোগের হার ২ থেকে ৬ শতাংশ। এ যোগাযোগকে প্রায় সবাই (৯৪ শতাংশ) বর্ণনা করেছে কেবল মানসিক ঘনিষ্ঠতা অথবা সামাজিক ও প্রেমের সম্পর্ক হিসেবে। কোনো ধরনের শারীরিক ঘনিষ্ঠতার কথা স্বীকার করেছে মাত্র তিন শতাংশ। পাঁচ বছর বা তার বেশি সময় ধরে বিবাহিত এমন পুরুষদের মধ্যে প্রতি ৬ জনে একজনের (১৮ শতাংশ) ১ স্ত্রী ছাড়া অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে সমীক্ষায় পাওয়া যায়।

সমীক্ষা আরো জানিয়েছে, মেয়েরা তাদের স্বামীদের তুলনায় অনেক কম বয়সে বিয়ে করে এবং কুড়ির কাছাকাছি পৌঁছেও যদি তারা বিয়ে না করে তবে একজন পুরুষের সঙ্গে তাদের শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

উনিশ উর্ধ্ব বয়সের মেয়েদের মধ্যে ২৪ শতাংশ বিয়ের আগে যৌন অভিজ্ঞতার

www.pathagar.com

কথা স্বীকার করেছে। এই হার শহর অঞ্চলে ৪৭ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে ৫ শতাংশ। তবে একই গ্রুপের অবিবাহিত পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার অনেক উঁচু (৬১ শতাংশ) আবার শহরে ও গ্রামে এই হার যথাক্রমে ৮৮ ও ৪৪ শতাংশ। বিবাহিত মেয়েদের মধ্যে বিয়ের আগে যৌনতার কথা স্বীকার করেছেন ২৯ শতাংশ মহিলা। শহরে যার হার ৪০ শতাংশ। স্বামীদের ক্ষেত্রে বিবাহপূর্ব যৌনতার হার ৬৯ শতাংশ। শহরে ও গ্রামে এর হার যথাক্রমে ৯৩ ও ৫৮ শতাংশ। (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ৯/১১/৯৭)

উপরোক্ত সমীক্ষা নিঃসন্দেহে বিবেকবান সমাজচিন্তকদের স্তম্ভিত না করে পারে না। মূলত সাংস্কৃতিক বেলেল্লাপনা, পর্ণো ইংলিশ ছবির অবাধ প্রদর্শনী, অশ্লীল ভিডিও ক্যাসেট, ডিস এন্টিনার সুবাদে নগ্ন নারী দেহের উদগ্র উদোম প্রদর্শনী, সেক্সের ছড়াছড়ি আমাদের নতুন প্রজন্মকে কুরে কুরে খাচ্ছে। চরিত্রহীন অপসংস্কৃতির আগ্রাসন আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা এবং সামাজিক ও পারিবারিক পবিত্রতাকে হাঙ্গরের মতো গিলে গিলে খাচ্ছে।

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে চুম্বনের উপর একবার জরিপ চালানো হয়েছে। বিবাহ-পূর্ব জীবনের প্রেমের অপরিহার্যতা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত যাচাই করা হয়েছে। বিবাহ-পূর্ব জীবনে যৌন মিলন আর লিভিং টুগেদার ভালো না মন্দ, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা প্রগতির অন্তরায় কিনা, প্রেমপত্রের আদান-প্রদান দু'টি মনের উপর কি প্রভাব বিস্তার করে, এসব বিষয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটা করে জরিপ এবং মতামত নেয়া হয়েছে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছতলায় আর পার্কে উদ্যানে জোড়ায় জোড়ায় বাকবাকুম অনুরাগ অনুশীলন হয়েছে।

সম্প্রতি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে আমাদের দেশের ফ্রী মিক্সিং-এর কুফল সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। সে প্রতিবেদন হতে কিছু বাস্তব খন্ড চিত্র এখানে তুলে ধরছি–

বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক। ছাত্ররা বলে লোচ্চা। বিজ্ঞানের এই দু'জন শিক্ষককে নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচন্ড ক্ষোভ। সুন্দরী কোনো ছাত্রীকে বলবে, তুমি আমার কাছে রেগুলার আসবে তবে রেজাল্ট ভালো হবে। কোনো ছাত্রী ভালো রেজাল্ট করতে চাইলে তাকে বিশেষ কিছু(?) দিতে হয়। তবে অধিকাংশ ছাত্রই ঐ দু'জনের কাছে Thesis করতে চায় না। Department-এর বড় পিলারে কে যেন পেন্সিল দিয়ে লিখে রেখেছে– 'মেয়েদের ফার্স্ট পাওয়ার রহস্য' শিরোনামে কিছু তথ্য। একজন শিক্ষকের অফিস রুমের দরজায় পেন্সিল দিয়ে লেখা অশ্লীল বক্তব্য। এই দু'জন ডক্টরেট কিন্তু এখনো সগৌরবে তাদের অভিসার চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা শিক্ষকদের একটি শক্তিশালী প্যানেলের সাথে জড়িত। তাই তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে পারে না, ছাত্র-ছাত্রীরাতো নয়ই।

মেডিকেলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ফ্রী মিক্সিং এর ফলে ন্যাক্কারজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কিছু তরুণ ডাক্তার নার্সদের সাথেও অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই ফ্রী মিক্সিং সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে প্রতিবেদকের সাথে কয়েকজন মেডিক্যাল ছাত্রের আলাপ হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশের মত যে, তাদের সহপাঠীদের মধ্যে কেউ কেউ

www.pathagar.com

ব্যভিচারী মা আয়শা আখতারের পরকীয়া প্রেমের বলি দুই নিষ্পাপ শিশু সন্তান রাজু ও নয়ন

অবাধ যৌনলীলায় মত্ত।

এইতো গেলো মেডিক্যালের কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থা কেমন? তারাতো মেডিক্যালের মতো সুবিধা পান না তাই অবাধ প্রেমের পুরস্কার হিসেবে এমআর করতে হয়। ঢাকার সমস্ত নার্সিং হোমে যারা গর্ভপাত ঘটায় তাদের অধিকাংশই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। ক'দিন আগে ঢাকার শান্তিনগরে এক নার্সিং হোমে গর্ভপাত ঘটাতে গিয়েছিলো বিশ্ববিদ্যালয় পড় য়া প্রেমিক যুগল। প্রেমিকা যখন অতিরিক্ত রক্তপাতের কারণে মরণাপন্ন অবস্থা, তখন প্রেমিক কেটে পড়ে। অবশেষে মেয়েটি মারা যায়। আপনি যদি এ জাতীয় 'এম আর' করানোর প্রত্যাশী আরো লাইলী-

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কতিপয় শিক্ষকের যৌন হয়রানির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

www.pathagar.com

মজনু দেখতে চান তবে নার্সিং হোমগুলোতে খোঁজ নিন, আপনারও চক্ষু-কর্নের বিবাদভঞ্জন হবে।

কোনো কোনো পিতা-মাতা তার মেয়ে নাটক করলে তার সুখ্যাতি বাড়বে পাত্রদের বাজারে। যার ভাগ্য ভালো দু'একটা ভালো পাত্র (বিত্তশালী) জুটেও যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিছু বাস্তব নাটক ঘটে যায়। বিটিভিতে প্রচারিত ধারাবাহিক 'গ্রন্থিকগণ কহে' অপেক্ষাও নাটকীয় ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। নাটকের কুশলীরা খুব ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগ আদিম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে পিছপা হন না। যত বিশ্বস্ত স্বামী বা স্ত্রী হন না কেনো নাটক পাড়ায় ফ্রী মিক্সিং-এর সুযোগে নূতন বন্ধু জুটে যায়। এর সবচেয়ে আলোচিত ঘটনার নায়ক হুমায়ুন ফরিদী। মিনুর সাথে একযুগের সফল দাম্পত্য জীবন সাঙ্গ হলো যখন ফরিদী সহশিল্পী সুবর্ণাকে বিয়ে করে।

চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকারাও অবাধে মেলামেশার কারণে অনেক রগড় কাহিনীর জন্ম দেন। এসব কাহিনী অবশ্য কিছু চটুল পত্রিকার প্রধান উপজীব্য। চলচ্চিত্র পরিচালকরা উঠতি নায়িকাদের নিয়ে মেতে উঠেন। জহির রায়হান প্রথমে সুমিতা দেবীকে বিয়ে করেন। এ ছাড়া সুচন্দা ও কবরীকেও বিয়ে করেন যখন তারা সে সময়ে সবচেয়ে সফল ও সুন্দরী নায়িকা ছিলেন। এই নাটক ও সিনেমা পাড়ায় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ফ্রী মিক্সিং-এর প্রভাবে অবৈধ প্রণয় হচ্ছে। তাদের দাম্পত্য জীবন হচ্ছে দুর্বিষহ। ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে অহরহ। এই দাম্পত্য জীবনের অশান্তির কারণে আত্মহত্যা ও খুনের মতো বহু ঘটনা ঘটেছে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সুকুমারবৃত্তিগুলোর বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক শিশু-কিশোর সংগঠন। তবে অধিকাংশ সংগঠনেই যারা ভর্তি হয় কৈশোর পার হবার পরও তারা সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকে। এসব সংগঠনে সবাই স্বাধীনভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পায়। এক সাথে ছবি আঁকে, গান গায়, আবৃত্তি করে, বেড়াতে যায়। বাংলাদেশের নামকরা একটি শিশু-কিশোর সংগঠনের গেন্ডারিয়া শাখার পরিচালক তার এই সাংগঠনিক জীবনের একটা মজার ঘটনা বললেন। তার মুখ থেকেই শুনুন– "একবার আমরা পিকনিকের আয়োজন করলাম ন্যাশনাল পার্কে। বড়দের মধ্যে ছিলাম আমরা দু'জন আর সবাই কিশোর-কিশোরী বা বালক-বালিকা। আমরা সেখানে গিয়ে রান্নার জোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। রান্না যখন শেষ হলো দুপুর প্রায় গড়িয়ে এলো। বাচ্চারা তখন আমাদের সাথে ছিলো না। অগত্যা খুঁজতে বেরুলাম। প্রায় সবাইকেই শালবনের বিভিন্ন স্থানে জোড়ায় জোড়ায় ঘনিষ্ঠ পরিবেশে আবিষ্কার করলাম। পিচ্চি পিচ্চি বাচ্চাদের লাইলী-মজনু খেলা দেখে সেদিন স্তম্ভিত না হয়ে পারিনি।"

এভাবে অবাধে মেলামেশার ফলে কাম-রিপুর তাড়নায় অপরিণত বয়সেই যৌনাচারের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ কুঅভ্যাস পরিণত বয়সেও থেকে যায়। (তথ্য সূত্রঃ সাপ্তাহিক বিক্রম, ৪–১০ এপ্রিল '৯৪ সংখ্যা)

www.pathagar.com

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় জনাব মোবায়েদুর রহমান উপসম্পাদকীয় কলামে ঢাকা ভার্সিটির একজন অধ্যাপকের ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। উপন্যাসের অংশ বিশেষ এবং জনাব মোবায়েদুর রহমানের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হলো।

উপন্যাসের একটি চরিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপিকা। যার রয়েছে বিদেশের পিএইচডি ডিগ্রী, তিনি তি তার ৩৬ বছরের ভরা যৌবন অপরিচিত এক ব্যক্তিকে ফালি ফালি করে বিলিয়ে দিতে পারেন? বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে ভার্সিটির একজন পিএইচডি ডিগ্রীধারী মহিলা টিচার অত্যন্ত সম্মান এবং শ্রদ্ধার পাত্রী। সেই অধ্যাপিকা বিবাহিতা। তার স্বামী অর্থনৈতিকভাবে দারুণ সচ্ছল, কারণ তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এই ডক্টরেট অধ্যাপিকার পিতা-মাতাও অবস্থাপন্ন, ভাই-বোনরাও ভার্সিটিতে লেখাপড়া করছে। তাদের দাম্পত্য জীবনেও কোনো অপূর্ণতা নেই। বর্ণিত ঘটনাটির পূর্ব পর্যন্ত ঐ মহিলা প্রফেসরের সাথে তার স্বামীর দৈহিক বা মানসিক বা আর্থিক কোনো ক্ষেত্রেই কোনো ম্যালাডজাস্টমেন্ট দেখা যায়নি। সেই প্রফেসর তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়ে বাংলাদেশের একটি পাহাড়ী এলাকায় গেলেন শিক্ষা সফরে। তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দেয়া হলো একটি রেস্ট হাউজ। আর তাকে দেয়া হলো আরেকটি রেস্ট হাউজ। অধ্যাপিকার নাম ডঃ শিরিন। সেখানে ডঃ শিরিনের সাথে পরিচয় হলো এক ইঞ্জিনিয়ারের। সৌজন্য বিনিময়ের সাথে সাথেই তাদের হৃদয়ের অর্গল খুলে গেলো। তারা অনর্গল কথা বলতে লাগলেন। কথা বলতে বলতে তারা হাত ধরাধরি করে চন্দ্রালোকিত পাহাড়ে উঠলেন। সেখান থেকে নেমে সরাসরি ডঃ শিরিনের রুমে প্রবেশ। ডঃ শিরিন নিজেই দরজা বন্ধ করে দেন। তারপর তিনি ইঞ্জিনিয়ারকে তার বিছানায় আহবান করেন। তারপর দু'জনের শুরু হলো আদিম খেলা। এই আদিম খেলার যে রগরগে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন সেটা ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ও বিতর্কিত উপন্যাস 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভারের' দারুণ সরেস বর্ণনাকেও হার মানায়। একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ ডঃ শিরিন বলছেন, তিনি (অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব) আমার সারা শরীরে হালচাষ করছেন। হালচাষের এই কাজে তিনি খুব খাটছেন। সমানে পরিশ্রম করছেন তিনি। প্রিয় পাঠক, সারা শরীর চষে বেড়াবার এই রসঘন বর্ণনা তিনি দিয়েছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে। এভাবে তাদের শরীর সম্ভোগের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন একাধিকবার। কারণ ঘটনাটি ঘটেছে একাধিকবার। কিন্তু তারপর?

হেমন্ত মুখার্জীর একটি জনপ্রিয় গানের কলি, 'তার আর পর নেই, নেই কোনো ঠিকানা।' সত্যিই তাই। ডঃ শিরিন কর্মস্থলে ফিরে আসেন, কিন্তু পতিগৃহে আর ফিরে যাননি। তাহলে কি তিনি সেই ইঞ্জিনিয়ারের কাছে গেলেন? না, সেখানেও যাননি। সেই ইঞ্জিনিয়ারটি তার কাছে এসেছেন। তাকেও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাহলে এই বিদূষী অধ্যাপিকার কি হলো? তিনি কি ঘাটে ঘাটে পানি খাচ্ছেন? কোন্ ঘাটে ভিড়বেন তিনি? সারা উপন্যাসে এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। তাহলে ডঃ শিরিনের মতো এতো বড় বিদূষী, সচ্ছল এবং সুন্দরী এক অধ্যাপিকা কেনো অমন কাজটি করতে গেলেন? লেডি চ্যাটার্লির নায়িকা কোনি বাগানের মালির প্রতি আসক্ত হয়েছিল। তারও একটি কারণ ছিলো। কারণ তার স্বামী যদিও ইংল্যান্ডের এলিট শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলো তৎসত্ত্বেও সে ছিলো শারীরিকভাবে পঙ্গু, সেখানে একজন পূর্ণ যুবতী কোনি তার দৈহিক চাহিদার জন্য

www.pathagar.com

তাদেরই এক কর্মচারীর কুটিরে হাজির হতো। এর পেছনেও অন্তত একটি কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কার্যকারণ ছাড়াই ডঃ শিরিনকে তিনি যে স্তরে নামিয়ে এনেছেন এর ফলে তিনি বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষিকাকে ভ্রষ্টা এবং চরিত্রহীনা বানিয়ে ছেড়েছেন। ইংল্যান্ডের মতো একটি উদার সমাজেও লেডি চ্যাটার্লি ৪০ বছর নিষিদ্ধ ছিলো। বাংলাদেশে সেখানে এই চেয়ারম্যান প্রফেসরকে যখন আকর্ণ বিস্তৃত হাস্যসহকারে ফ্যানদের নোট বইয়ে অটোগ্রাফ দিতে দেখা যায় তখন সারা জাতির মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে আসে।

এইসব শিক্ষকেরাই দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ-এ মানুষ গড়ার কারিগর। সভা-সেমিনারে নারী নির্যাতন রোধে নীতি বাক্যের খই ফোটে আর লেখালেখিতে অশ্লীলতার জোয়ার বয়। এইসব মানুষ গড়ার কারিগরদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেক রগরগে রসালো প্রেম কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং শোনা যাচ্ছে বিভিন লোক মুখে। কয়েক বছর আগে এক অধ্যাপক তো একজন ছাত্রীকে নিয়ে কলকাতায় পাড়ি জমিয়েছিলো এবং হোটেলে লিভ টুগেদার করে পাঠক-পাঠিকাদের জন্য রসালো সংবাদের উপাদান যুগিয়েছিলো। এইসব অধ্যাপকদের দ্বারা সৃষ্ট কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী পবিত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে বানিয়েছে অবৈধ প্রেমকুঞ্জ অথবা ধর্ষণের স্বর্গরাজ্য যা অনেকাংশে তাদের কুশিক্ষার বা কুলেখার কুপ্রভাবের প্রতিফলন

সৌদি আরবসহ কয়েকটি মুসলিম দেশে একটি কুসংস্কার রয়েছে। তা হলো, সে সব দেশের অনেক সমাজে যোনিচ্ছদ ছেঁড়া ও রক্তক্ষরণকে মনে করা হয় নারীর সতীত্বের প্রমাণ। বাসর রাতের ভোরে তারা বিছানা খুঁজে দেখে রক্তের দাগ আছে কি-না। সেখানে নাকি সমাজে যোনিচ্ছদ ও বাসর রাতের রক্তক্ষরণ আজো চরম গুরুত্বের বিষয়। অনেক ক্ষেত্রে সেখানে কনের পিতা চরম উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে বাসর ঘরের দরজায়, তার হাতে দেয়া হয় কন্যার যোনি রক্তভেজা একটি সাদা রুমাল। আর সেটিকে পতাকার মতো উড়িয়ে ঘোষণা করে কন্যার সতীত্ব। রক্ষা করে বংশের মান। সেখানে নাকি (তথাকথিত নারীবাদী লেখকদের ভাষায়) এখন যোনিচ্ছদ জোড়া লাগানোর জন্য চিকিৎসা ধনীদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়।

এগুলো সবই কুসংস্কার। এর জন্য ইসলাম দায়ী নয়। যেমন আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি মুসলিম রাষ্ট্র। এখানে অনেক কুসংস্কার রয়েছে যা ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মুসলিম যোনিচ্ছদ নিয়ে আমাদের দেশের কতিপয় লেখক-সাহিত্যিক ও অধ্যাপক যতোটা উদ্বিগ্ন আমাদের দেশে বর্তমানে যেভাবে যে হারে যেভাবে ছয় বছরের শিশু থেকে ষাট বছরের বৃদ্ধারা ধর্ষিতা হচ্ছে এ নিয়ে ততোটা উদ্বিগ্ন নয়।

এসব লেখক-লেখিকারা খ্যাতি-যশ ও অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশী অমুসলিম তাত্ত্বিকদের দর্শন, উদাহরণ/ দৃষ্টান্ত তুলে নারী মুক্তির নামে মোটা মোটা বই লিখে বাজারজাত করছে। অথচ এই তাত্ত্বিকদের ব্যক্তিগত জীবন অনুকরণযোগ্য তো নয়ই বরং দুর্গন্ধযুক্ত। সুতরাং অশ্লীল উপাদানে ঠাসা এসব গ্রন্থ উঠতি যুবক-যুবতীদের জন্য সুখপাঠ্য হতে পারে বটে, কিন্তু নারী মুক্তির ও ধর্ষণ প্রতিরোধে কোনো দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে না।

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজ একশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রীর জ্বালায় অতিষ্ঠ। সম্প্রতি এসব ছাত্রীরা 'সূর্যাস্ত আইন' বাতিলের দাবীতে আন্দোলন

www.pathagar.com

ঢাকা ভার্সিটিতে কতিপয় শিক্ষকের যৌন হয়রানির প্রতিবাদে ছাত্রীদের মানব বন্ধন

করেছে। এই আন্দোলন বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। একই সূত্রে গাঁথা। শিক্ষার বদলে এরা নিজেদের হীন উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য 'সূর্যাস্ত আইন' বাতিল করে মেয়েদেরকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়ার অপচেষ্টা করছে। বাংলাদেশকে নিয়ে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের এটিও একটি অংশ।

গত ২ মে ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিলিমিনারীতে ভর্তিচ্ছু একজন তরুণীকে ভর্তির প্রলোভন দেখিয়ে জহুরুল হক হলের একজন ছাত্র তিনতলার দক্ষিণ-

যৌন নিপীড়নের তদন্তের দাবীতে ছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিল

www.pathagar.com

পূর্ব দিকে একটি সিঙ্গেল রুমে নিয়ে যায়। তখন বেলা দুটো। তারপর তরুণটি একদল ছাত্রের পৈশাচিক উল্লাসের শিকার হয়। রাত আটটায় মুক্তি পায়। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে '৯৪ সালের মে মাসের ৩ ও ৪ তারিখে এ সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ ছেলেদের হলে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে ৮ মে '৯৪ তারিখে এক নির্দেশ জারি করে।

এ বছর ৮ই ফেব্রুয়ারী গুটি কয়েক ছাত্রী উচ্ছৃঙ্খল ও বেপরোয়া কর্মকান্ডের মাধ্যমে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সূর্যাস্ত আইন ও সমঅধিকারের দাবীতে ভিসির নিকট স্মারকলিপি প্রদান করতে গিয়ে ছাত্রীরা উচ্ছৃঙ্খল কর্মকান্ডে মেতে উঠে। ভিসির অফিস গেটে তালা ঝুলিয়ে ভিসিকে এবং ভিসির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসা জাতিসংঘের একজন বিদেশী কর্মকর্তাকে আটকিয়ে রাখে।

ছাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে জন্মলগ্ন হতে ছাত্রী হলে সূর্যাস্ত আইন চালু আছে। সূর্যাস্তের আইনানুযায়ী ছাত্রীদের সূর্যাস্তের সাথে সাথে হলে ফিরে আসতে হয় এবং হলে রক্ষিত হাজিরা বইতে স্বাক্ষর করতে হয়। কোনো কাজে বাইরে গেলে দেরিতে ফিরলে হলে পূর্বাহ্নে সংশ্লিষ্ট হলের প্রক্টরের নিকট অনুমতি নেয়ার প্রক্টোরিয়াল আইন আছে। ছাত্রীরা ১৯২২ ও ১৯৭৩ সালের প্রোক্টরিয়াল রুলসের অন্তর্গত সকল কালা আইন ও হল গেটে রোজ হাজিরা দেয়ার নিয়ম এবং লাইব্রেরীতে লেখাপড়ার জন্য রাত ৯টা পর্যন্ত হল খোলা রাখার দাবী জানিয়েছেন।

দিনে-দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একজন ভর্তিচ্ছু ছাত্রী অত্যন্ত পৈশাচিকভাবে পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছে। সেখানে রাত ৯টায় একজন ছাত্রীর নিরাপত্তা আশা করা যায় কি করে। এ আন্দোলনের পক্ষে পত্র-পত্রিকায় অনেক দুষ্ট চক্রের সমর্থন দেখা যায়। কতিপয় লুচ্চা শিক্ষক ও তথাকথিত নারীবাদীরা এ আন্দোলনে সক্রিয় ইন্ধন ও উস্কানী দিচ্ছে। অধিকাংশ ছাত্রী এই সূর্যাস্ত আইন বাতিলের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কতিপয় ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ সূর্যাস্ত আইন বাতিল করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যাদের যাতায়াত আছে, তারাই উপলব্ধি করতে পারবেন 'সূর্যাস্ত আইন' বাতিল করার কোনো যৌক্তিকতা ছিলো কিনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র-ছাত্রীর সুকুমার বৃত্তিচর্চার নামে অশালীন ও নির্লজ্জ আচরণ দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর বারান্দা, কেন্দ্রীয় মসজিদের পার্শ্বস্থ জায়গা, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, এসব উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র-ছাত্রীর অশ্লীল ও ন্যাক্কারজনক কর্মকান্ডের উন্মুক্ত ক্ষেত্র। কিছু সংখ্যক ছাত্রীর অশালীনতা ও বেহায়াপনা এতোই উগ্র যে, যে কোনো ভদ্র, মার্জিত, রুচিসম্পন্ন মানুষের চোখে মারাত্মক দৃষ্টিকটূ ও অশ্লীল ঠেকে। এসব পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিপূজারী ছাত্রীদের কাছে হল কর্তৃপক্ষের সূর্যাস্ত আইন তো তাদের স্বাধীন বল্গাহীন জীবন উপভোগের জন্য বড় অন্তরায় বলেই প্রতীয়মান হবে। এ তাদের অধিকার খর্বেরই নামান্তর। আন্দোলন করে যদি এ আইনকে বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে আবছা আঁধারে উচ্ছল অভিসারের সুবর্ণ সুযোগ সূচিত হয়েছে বৈকি। কিন্তু তার সামগ্রিক পরিণতি হবে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। কিছুসংখ্যক ছাত্রীর

www.pathagar.com

অযৌক্তিক আবদারের কাছে মাথানত করে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের মান-সম্ভ্রম ও মর্যাদা যে ম্লান ও কালিমালিপ্ত হয়েছে বা হচ্ছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। ছাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আদলে ছাত্র-ছাত্রীদের সমঅধিকার চর্চার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগ করে দেয়া মোটেই শুভ কাজ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিকামী সচেতন ছাত্রীদের অভিমত গুটিকয়েক ছাত্রীর জন্য গোটা

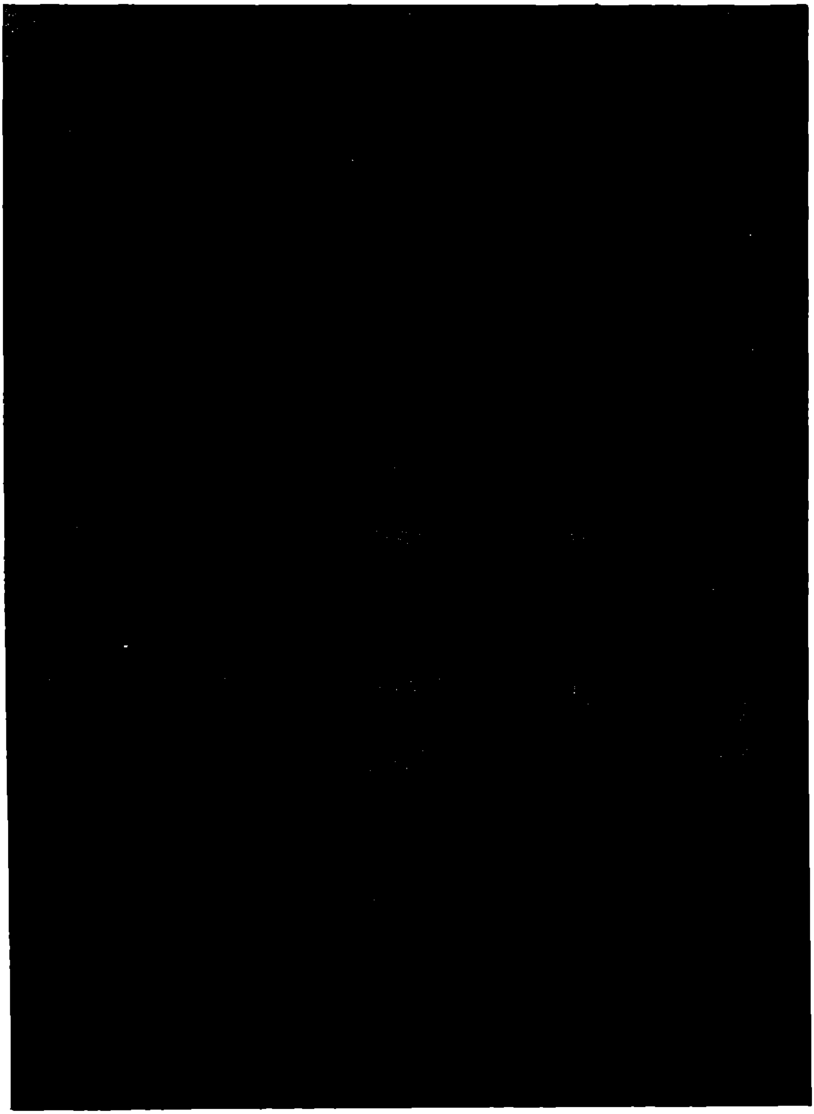

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সূর্যাস্ত আইন বাতিলের দাবিতে মহানগরীতে মিছিল বের করে। ফেব্রুয়ারী '৯৫

www.pathagar.com

ইনস্টিটিউশনে অশালীন কার্যকলাপের ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে না। ছাত্রীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা দানকারী আইনমালা বহাল রাখার পক্ষে অধিকাংশ ছাত্রীর এবং সচেতন অভিভাবকের একান্ত কাম্য ছিলো।

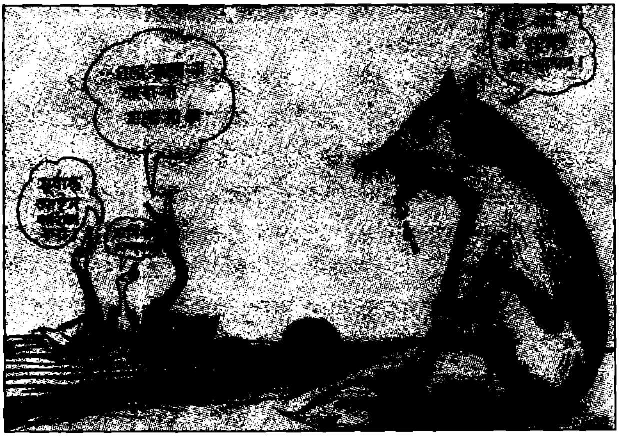

কিন্তু সচেতন অভিভাবক ও ছাত্র/ছাত্রীদের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও 'সূর্যাস্ত আইন' বাতিল করা হয়েছে। পরবর্তীতে এর কু-প্রভাব অত্যন্ত দুঃখের সাথে জাতি লক্ষ্য করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে। এছাড়া ইসলাম ধর্মই নারী শিক্ষার জোর তাগিদ দিয়েছে। কিন্তু সহশিক্ষা নয়। এই সহশিক্ষার কুফল ইতোমধ্যেই জাতি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। সহশিক্ষার নামে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছে, একটি পবিত্র উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে যে নৈতিক স্খলনের মহড়া হয়েছে তা আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানায়।

ভারতের রামপুরার মহারাজার নাকি একবার এক কুৎসিৎ খেয়াল চেপেছিল যে, তার রাজ্যে কুমারী মেয়েদের ধর্ষণের প্রতিযোগিতা হবে। এই প্রতিযোগিতায় যারা যোগ দেবে তাদের প্রমাণ হিসেবে ধর্ষিতার নাকের নথগুলো জমা দিতে হবে। যেই কথা সেই কাজ, মহারাজের সাঙ্গ-পাঙ্গরা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে পাখি শিকার করার মতো কুমারী মেয়ে শিকার করে ধর্ষণ করতে লাগলো আর রাজার কাছে নথ জমা দিতে লাগলো। শেষে দেখা গেলো রাজার নিজের সংগৃহের নথের সংখ্যাই বেশি।

আমাদের দেশে এখন রাজা নেই। কিন্তু গণতন্ত্রের নামে এখন দেশে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট পোষ্যরা ভারতের রামপুরার মহারাজার মতো পবিত্র শিকক্ষাঙ্গনসহ দেশটাকে বানিয়েছে ধর্ষণের স্বর্গরাজ্য।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দূর থেকে প্রচ্ছন্নভাবে দেখলে মনে হয় যেন নৈস্বর্গিক পরিবেশ, কিন্তু যার কক্ষের বিছানায় লেগে আছে লিপস্টিকের চিহ্ন ও বীর্যের দাগ, ফ্যাকাল্টির দেয়ালের কিংবা করিডোরের কোণায় স্মৃতিচিহ্ন লেখা আর গাছগাছালির আড়ালে পরিত্যক্ত অবস্থায় বৃষ্টিতে ভিজে আছে কারো ছেড়া নোটখাতা কিংবা ভাঙা সানগ্লাস বা কলম। এসব হচ্ছে সংক্ষেপে দীর্ঘ ঐতিহ্যভরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকালীন অবয়ব। আধুনিকতার এ যুগে বন্ধুত্বের সম্পর্ক কোনো সীমাবদ্ধ সীমানার প্রাচীরে আবদ্ধ থাকছে না। তরুণ-তরুণী তথা ছাত্র-

www.pathagar.com

ছাত্রীরা বন্ধুত্বের বিনিময়ে পরস্পরের সাথে হৃদয়িক থেকে দৈহিক সম্পর্ক করছে অবলীলায়, কখনও কখনও শর্তহীন। বন্ধুত্বের নিবিড়তা সৃষ্টি হলেই ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে যৌন মিলন তো আজকাল খুব স্বাভাবিক ঘটনা কিংবা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মোশাররফ হোসেন হোস্টেলে আমি দেখেছি– অনেক ছাত্রীকে তার ছাত্র বন্ধুর সাথে রাত যাপন করতে। স্বামী-স্ত্রীর মতো ভোরে উঠে গোসল করতেও আমি দেখেছি অনেককে। লেডিস হোস্টেলের কোনো কোনো ছাত্রীকে রাতে জানালা দিয়ে তার উন্নত বক্ষের ব্রা খুলে স্তন প্রদর্শন করে ছাত্রদের কামোত্তেজিত করতে দেখা যায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন ভিসি প্রফেসর জিল্লুর রহমান এ প্রসঙ্গে ক্ষোভের সাথে মন্তব্য করেছেন– 'যেখানে ছাত্রীরা স্বেচ্ছায় ছাত্র বন্ধুর হোস্টেলের একই রুমে রাত কাটায় বা মিউচুয়াল সহবাস করে, সেখানে আলাদা হোস্টেলের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।' লাইব্রেরীতে পড়ার নামে সূর্যাস্ত আইন বাতিল করে ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ ও উন্মুক্ত স্বাধীনতা প্রকৃতার্থে নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় তথা নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রতিক প্রকাশিত ঘটনাই তার প্রমাণ ও সাক্ষী। একজন ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশিত হবার পর তদন্তে উন্মোচিত হয়েছে আরো কয়েক শতাধিক ছাত্রী ধর্ষিতা হয়েছে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। চিহ্নিত্ত কিছু ছাত্র যারা সব সময় রাজনৈতিক ও অস্ত্র শক্তির আধিপত্য বিস্তার করে আছে– তারাই নিকৃষ্টতম বর্বর পন্থা মানবতা বিরোধী ধর্ষণে লিপ্ত। তবে ছাত্রীদের অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত পদচারণা নারী শিকারী তথা রেপিস্টদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে সব সময়, সমাজের প্রতিটি স্তরে ঐ নারী শিকারী বা রেপিস্টরা ওঁৎ পেতে থাকে সময় ও সুযোগের অপেক্ষায়।

উল্লেখ্য, ধর্ষণ হচ্ছে– কোনো নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সাথে যৌন মিলন করা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে– ছাত্র-ছাত্রীর অবাধ মেলামেশায় যেখানে রয়েছে অবাধ উন্মুক্ততা আর নিয়ন্ত্রণহীনতা, সেখানে জোর করে যৌন মিলন কেনো? আজ অনেকের মনে আরো প্রশ্ন জেগেছে– জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কি পতিতালয়, না ধর্ষণালয়? কারণ সেখানে জনৈক রেপিস্ট ছাত্রী ধর্ষণে সেঞ্চুরী করেছে এবং অনেকে করেছে হাফ সেঞ্চুরী। রেপিস্টরা তা আবার সেলিব্রেটও করেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে ৩টি খাসি জবাই করে আর মদের আসর বসিয়ে! সে রেপিস্টকে ওয়ার্ল্ড গিনিচ বুকের পাতায় স্থান দেয়া উচিত নয় কি? জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর সংখ্যাইবা কতো? তাহলে কি প্রায় সব ছাত্রীই ধর্ষিতা? ধর্ষণ বা যৌন মিলনের মতো সামাজিক বর্বরতা যদি ওখানকার স্বাভাবিক ঘটনা হয়, তাহলে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রীদের মাঝে নন-প্রফেসনাল পতিতাবৃত্তি গড়ে উঠেছে। কিংবা কোনো এক অজানা কারণে কারাগারের মতো ধর্ষণালয়ে দিনাতিপাত করছে। ভিসি থেকে প্রশাসনের সবাই এসব যৌনচর্চাকে মেনে নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিপত্যবাদী কিছু ছাত্র ও তাদের সহযোগী বাইরের যুবকেরা পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে ধর্ষণালয়ে পরিণত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সবাই এদের সমীহ করে চলে, কারণ এদের

www.pathagar.com

অস্তিত্ব রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু দ্বারা সমর্থিত। এমতাবস্থায় কোনো তরুণী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তা জানলে সামাজিকভাবে তাকে গ্রহণ না করার অনভিপ্রেত অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে। অচিরেই এর সামাজিক প্রভাব সংশ্লিষ্ট অভিভাবকমহল অসহায়ের মতো হয়তো দেখতে পাবে। সমগ্র জাতি তথা অভিভাবক মহল আজ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা প্রবাহ তথা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে স্তম্ভিত, শংকিত, ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। কিন্তু সেখানকার ছাত্রীদের হৃদয়ে সে শংকা ও ব্যথার অনুভূতির জন্ম দিয়েছে কিনা তাও একটা প্রশ্ন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বা প্রশাসনের জড়িতদের কন্যারা ওখানে পড়ছে কিনা জানি না। তবে পড়লে তারাও নিশ্চয়ই বাদ পড়েনি তাঁদের সুযোগ্য প্রিয় ছাত্রদের যৌন অস্ত্রের উদ্ধ্যত ছোঁয়া থেকে।

প্রশাসনিক ক্ষমতার সাথে সমর্থিত বা জড়িতরাই ধর্ষণ করছে- এদেশের নারীদের। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণে জড়িতরা যেমন ক্ষমতাসীন দলের চিহ্নিত সদস্য আর অন্যদিকে পুলিশ বাহিনী তো আছেই- যারা ধর্ষণ করছে ২ বছরের শিশু থেকে ৬০ বছরের বৃদ্ধাকে। এদেশে ধর্ষণকারীর সঠিক বিচার হচ্ছে না। অথচ 'ধর্ষণ হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ'- একথা ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদভানীর সাম্প্রতিক মন্তব্য। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বহীন বক্তব্য ছুড়ে দিয়ে বলেছেন, 'সবার বেডরুম তো আর পাহারা দেয়া যাবে না।' তিনি কি পত্রিকার পাতায় দেখছেন না- ধর্ষণ বেডরুমে হয়, নাকি রাস্তায় কিংবা থানায় হয়? তিনি ধর্ষণ প্রসঙ্গে আরো বলেছিলেন- 'পত্রিকায় প্রতিদিন ধর্ষণের ঘটনা বেশি বেশি ছাপাবার কারণে মানুষের মধ্যে এই সুপ্ত ইচ্ছা জাগ্রত হয়।' উল্লেখিত মন্তব্য সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ করলে অবশ্য মানাতো। কারণ কোনো সুন্দরী তন্বী কিংবা নারী তার দিকে তাকালেই তার সুপ্ত ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তিনি নিজেই বলেছেন- খোদা তার চেহারাটা সুন্দর দিয়েছেন বলে সব নারীই তার প্রেমে পড়ে যায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অধিকাংশ ধর্ষণ ঘটনাতেই দেখা যাচ্ছে যে, ছাত্রীরা তাদের পুরুষ বন্ধুর সাথে বসে গল্প করছিল কিংবা নির্জনতার পথিমধ্যে একা ছিলো এবং সেখান থেকে উঠিয়ে তাদেরকে ধর্ষণ করা হয়েছে। একটি ঘটনায় দেখা যায় যে, একজন ছাত্রী তার পুরুষ বন্ধুর হোস্টেল রুমে ছিলো। একজন রেপিস্ট ঐদিক দিয়ে যাওয়ার সময় ঐ কক্ষে প্রবেশ করে এবং দাবী করে, 'তুই একাই ভোগ করবি কেনো? আমাকেও শেয়ার দিতে হবে।'

অনুসন্ধান রিপোর্টে অপরাধীদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. মহিলাদের ওপর বলাৎকার।

২. রাজনৈতিক কর্মীদের দখলে অবৈধ অস্ত্র।

৩. ছাত্রাবাসের বিভিন্ন কক্ষে বেশ্যা আনয়ন।

৪. ছাত্রাবাসের রুমসমূহে মদ্যপান ও মাদক সেবন।

৫. মাদকের কালো ব্যবসা।

www.pathagar.com

যৌন হয়রানির প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুখোশ পরিধান করে ছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিল

৬. সহপাঠীদেরকে প্রহার।

৭. বিভিন্ন হলে পতিতা আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ব্যবহার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করা।

৮. টেন্ডার ফর্ম দাখিলের সময় গোলযোগ সৃষ্টি করা।

৯. বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল চাঁদা আদায়ের জন্য, তাদেরকে সারাদিন ধরে আটকিয়ে রাখা।

১০. হল প্রশাসনকে অমান্য করা।

১১. ছাত্রীদেরকে হয়রানি করা।

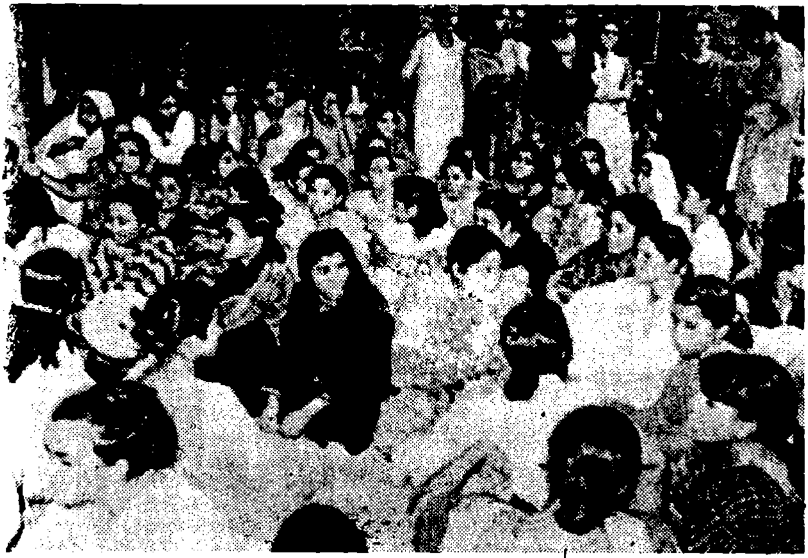

ধর্ষণের প্রতিবাদে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অনশন ধর্মঘট

www.pathagar.com

১২. চাঁদাবাজি।

১৩. জুয়া।

১৪. ভার্সিটি দোকান এবং ক্যান্টিনে বাকিতে খাওয়া।

১৫. বিভিন্ন হলে শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্মিত 'এক্স-গ্রেডের' সিনেমা দেখা।

১৬. বহিরাগতদেরকে হলে আশ্রয় দেয়া।

১৭. হল ক্যান্টিনে বাকিতে খাওয়া এবং তার মাত্র ২০ শতাংশ পরিশোধ করা।

১৮. নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বহিরাগতদেরকে আশ্রয় দেয়া এবং এই ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে কারো মুখ না খোলা।

১৯. ঢাকা-আরিচা রোড ব্লক করা এবং ট্রাক ড্রাইভার ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়।

২০. প্রতিটি ঠিকাদার কর্তৃক সম্পূর্ণ কাজের দুই শতাংশ অর্থ সশস্ত্র ক্যাডারদের জন্য সংরক্ষণ করা। ঠিকাদার প্রতি ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা আদায়।

২১. নিজেদের লোকরা যাতে ঠিকাদারী পায় সেটা সুনিশ্চিত করা।

২২. প্রায় প্রতি রাতেই বহিরাগত সশস্ত্র ক্যাডারগণ কর্তৃক মাতাল অবস্থায় সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া এবং গঞ্জিকা সেবন।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টের একটি টেবিল দেয়া হয়েছে। কোন্ কোন্ স্থানে কতবার ধর্ষণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত ফিরিস্তি রয়েছে।

স্থানের নাম ঃ

১.	লাইব্রেরীর কাছে	ঃ	৩১ বার
২.	নাটকের সাজঘর	ঃ	২৯ বার
৩.	জিমনাসিয়ামের কাছে	ঃ	১৬ বার
৪.	ডেয়ারী ফার্মের কাছে	ঃ	১৬ বার
৫.	এম এইচ হলের মাঠ	ঃ	১২
৬.	ভাসানী হল	ঃ	৮ বার
৭.	অনির্দিষ্ট এলাকায়	ঃ	৭ বার
৮.	প্রকাশ্য মাঠে	ঃ	২ বার
৯.	মিলনায়তন এলাকা	ঃ	১২ বার
১০.	শহীদ মিনার চত্বর	ঃ	৮ বার
১১.	মহসীন হল এবং জিমনাসিয়ামের মধ্যবর্তী এলাকা	ঃ	৮ বার
১২.	পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সামনে	ঃ	৬ বার
১৩.	সমাজবিজ্ঞান এবং এনএফ হল রোড	ঃ	৮ বার
১৪.	এভিনিউ	ঃ	৪ বার

www.pathagar.com

১৫.	কামালুদ্দিন হল	ঃ	২ বার
১৬.	প্রীতিলতা হল এবং সন্নিহিত এলাকা	ঃ	২ বার
১৭.	পারিজাত নার্সারী	ঃ	৩ বার

ছাত্রী হলে পুলিশের উপস্থিতিতে একজন বহিরাগত ছাত্রী কর্মীর সন্ত্রাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হল তল্লাশিকালে পুলিশের সামনেই ওই কর্মী ছাত্র সংগঠনের একজন সাধারণ সমর্থকের ওপর চড়াও হয়। কিন্তু পুলিশ নির্বিকার। অসহায় ছাত্রীটিকে উদ্ধারের জন্য মহিলা পুলিশ হয়েও তারা এতটুকু এগিয়ে যায়নি। হয়তো তাদের উপর থেকে কোন বিশেষ নির্দেশ ছিল। নিরীহ আবাসিক ছাত্রীটির ওপর হামলাকারী বহিরাগত এই কর্মীর নাম হেলেন (ক্রস চিহ্নিত)। সে অবৈধভাবে শামসুন্নাহার হলে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করে

www.pathagar.com

১৮.	আল-বেরুনী হল	ঃ	১ বার
১৯.	সুইমিংপুল	ঃ	১ বার
২০.	২০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে	ঃ	১ বার
	মোট ২০টি স্থানে	ঃ	১৭৭ বার।

এরপরও একশ্রেণীর ছাত্র নামের কলঙ্ক অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শ্লোগান দিয়েছে ঃ

"এ্যাকশন এ্যাকশন
ডাইরেক্ট ধর্ষণ।
আন্দোলন করে যারা
দেহ ব্যবসা করে তারা।"

শ্লোগানের পাশাপাশি ধর্ষণ বিরোধী ছাত্রদের লক্ষ্য করে অভিযুক্ত ছাত্ররা চীৎকার করে বলেছে-"যারা আন্দোলন করেছে তাদেরকে খুঁজে বের কর। পরে এদেরকে গণধর্ষণ করা হবে। আগে তোমাদেরকে আমরা রাতের আঁধারে ধর্ষণ করতাম। এখন প্রকাশ্যে দিবালোকে করবো। এরূপ ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য রাখার পরও মানবতার বিরুদ্ধে চরম ঘৃণ্য অপরাধীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত নারীবাদী শিক্ষকেরা অভিযুক্ত ছাত্রদেরকে রহস্যজনক কারণে লঘু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেয়। এ নিয়ে সচেতন মহলে নানা প্রশ্নের উদ্রেক হয়েছে।

গত ৪-৩-৯৮ তারিখে একটি নতুন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ, ঢাকাসহ কয়েকটি নগরীতে সমকামীরা এখন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করছেন। বিভিন্ন পাড়ায় মহল্লায় ওদের রয়েছে যৌন মিলন কেন্দ্র ওদের ভাষায় যার নাম হলো 'ওপেন হাউস'। হাইকোর্ট মাজারে প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এবং অন্যান্য দিনে পিজি হাসপাতালের বটতলায়, রমনা ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ক্রিসেন্ট লেক, চন্দ্রিমা উদ্যান প্রভৃতি স্থানে তারা নিজস্ব আড্ডা জমায়। রাজধানীতে নাকি একটি 'সমকামী দার্শনিক গোষ্ঠীও তৈরী হয়েছে। ইতোমধ্যেই তারা 'সমকামী সাহিত্য' ধারাও তৈরীর প্রয়াস পাচ্ছেন। এদের যৌন মিলন কেন্দ্রের মধ্যে বর্তমানে মোহাম্মদপুর, হাজারীবাগ, শাজাহানপুর, ধানমন্ডি, গুলশান ও বনানী উল্লেখযোগ্য। প্রশ্ন হলো, যেই দেশে শতকরা ৯০ জন মুসলমান এবং যেই দেশের লোকেরা আজানের ধ্বনিতে ঘুম থেকে উঠে এবং আযানের মাধ্যমে ঘুমের বিছানায় অগ্রসর হয় সেই দেশে ইউরোপ-আমেরিকার অশ্লীলতা এভাবে আমদানি করার হেতু কি? বিশ্ব মোড়ল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যৌন কেলেঙ্কারীতে জড়িত বলে সমকামিতার মতো বেহায়া ও নির্লজ্জ কাজকে স্বাগত জানাতে পারে এবং সমকামিতাদের অনুষ্ঠানে উৎসাহ উদ্দীপনামূলক বক্তব্য রাখতে পারে। কিন্তু বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্ত, মুসলিম প্রধান দেশ বাংলাদেশের সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী কি এমন নির্লজ্জ কাজ করার জন্য স্বাগত জানাতে পারেন! আমেরিকার আগাগোড়া পচে গিয়েছে, সমগ্র বিশ্বকে তাই তার পচা গন্ধকে আতরের ঘ্রাণ বলে প্রকাশ করতে এবং রফতানী করতে চায়। তাই বলে মিস্ বেহায়া (সুন্দরী) প্রতিযোগিতা, মমতা কুলকার্নির মতো

www.pathagar.com

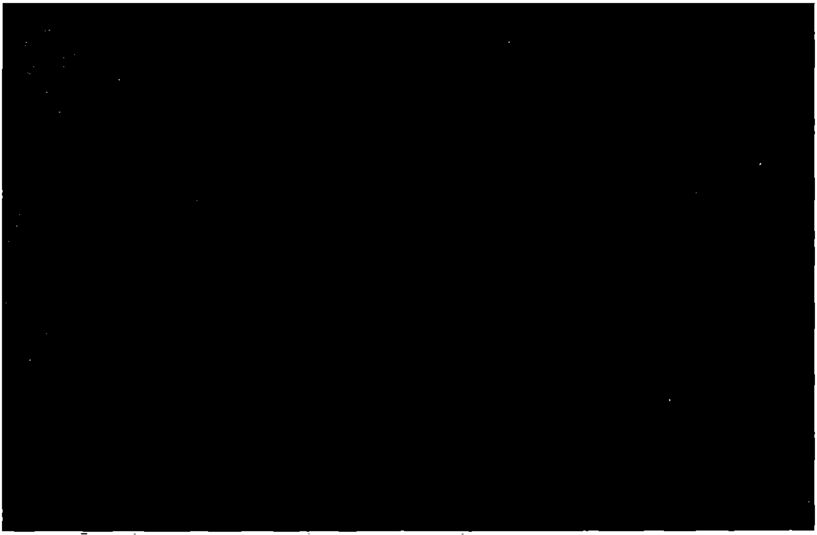

ইডেন কলেজে সংঘর্ষ চলাকালে ছাত্রদলের এক কর্মীকে এভাবে চুল টেনে মাটি থেকে ওঠানো হয় (বামে)। চুল ধরে মাটিতে আছাড় দিয়ে ফেলে আবার টেনে তুলে পা দিয়ে মাড়াচ্ছে সন্ত্রাসী ছাত্রীরা একজন নিরীহ ছাত্রীকে

বেহায়াদের উলঙ্গপনা, দেশের সর্বত্র জালের মতো বিস্তার করা পতিতালয়, শেষ পর্যন্ত ইহুদী, খৃস্টান ও নাসারাদের রফতানী করা সমকামিতা প্রভৃতির জোয়ারে আমাদেরকে ভাসিয়ে দেয়া হবে? নাউজুবিল্লাহ! বাংলাদেশে যদি মুসলমান বলতে কেউ থাকে, মুসলমান কোন প্রধানমন্ত্রী ও শাসন ব্যবস্থা থাকে, তাহলে নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা ও যাবতীয় অশ্লীলতার জোয়ারে ভাসতে চায় কারা?

সচেতন মহলের অভিমত, শয়তানের বড় শিষ্য তো শত ধর্ষণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করলো পত্র দ্বারা আমন্ত্রণ জানিয়ে রীতি মতো মিষ্টি বিতরণ করে ও ককটেল ফাটিয়ে। এমন রেকর্ড পৃথিবীর অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ করেছে বলে আমাদের জানা নেই। বাংলাদেশের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই রেকর্ড সৃষ্টি হলো। এই রেকর্ডের তালিকার শীর্ষে যে ১৩ জনকে পাওয়া যায় তারা সেই রাজনৈতিক দলের ছাত্র ফ্রন্টের সদস্য যে দলের নাম থেকে প্রায় চার যুগ আগে মুসলিম নাম কর্তন করা হয়েছিল। কি অপূর্ব ঐতিহাসিক মিল।

পাশ্চাত্য স্টাইলে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'র‍্যাগ ডে' নামক একটি কুৎসিত উৎসব পালন করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে শিক্ষা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বিদায় মুহূর্তে শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত রাখার কথা ছিলো, কিন্তু সেখানে শৃঙ্খলার পরিবর্তে বর্বরতা উচ্ছৃঙ্খলার কুৎসিত দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছে সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারীরা। এই কুৎসিত উচ্ছৃঙ্খলতার কুপ্রভাব কর্মজীবনেও প্রতিফলিত হচ্ছে যা জাতি বর্তমানে দিয়ে যাচ্ছে।

গত ৫ নভেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাপনী '৯২ উপলক্ষে 'র‍্যাগ ডে' উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। গত ৯/১২/৯৫ তারিখে দৈনিক সংগ্রামে প্রত্যক্ষদর্শী এক ছাত্রীর

www.pathagar.com

আন-কালচার্ড এর ছদ্মনামে 'এ কোন উন্মাদনা' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সমাপনী '৯২ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ প্রতিবেদনে বলা হয়–

৫ নভেম্বরের প্রায় সপ্তাহখানিক আগে থেকে র‍্যাগ ডে'র মহড়া শুরু হয় ভার্সিটির ১২টি হলে। শেষ বর্ষের ছাত্র/ছাত্রীদের অনেকের ফাইনাল পরীক্ষা প্রায় ঘাড়ের উপর ছিলো তবুও কেউ যেন থেমে থাকেনি। তাদের অবস্থা ছিলো 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে'। হলের ছেলেরা প্রতি বিকেলে ঢোল-তবলাসহ নকল রাজা রাণী সেজে সারা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে মেয়েদের হলের গেটে এসে শুরু করতো অশ্লীল নাচ-গান আর কুরুচীপূর্ণ দেহভঙ্গি যা দেখলে ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। অনেক জুনিয়র ছাত্র/ছাত্রী মন্তব্য করেছে সিনিয়ররা যেভাবে শিক্ষা দিচ্ছে আমাদের মনে হচ্ছে পড়াশুনা করে বাড়ি ফিরে যাই। এসব দেহভঙ্গির দর্শক ছিলো হলের অনেক কৌতুহলী মেয়েরা যারা বিকেল হলে অপেক্ষা করতো প্রতিদিন।

র‍্যাগের পূর্বরাতে প্রায় সারারাত ক্যাম্পাস ছিলো আনন্দে মুখর। হলে হলে লাইটিং মাইকিং-ড্যান্সিং আরও কতো কি! শোনা কথা– সেদিন ছেলেদের অনেক হলেই নেশার আসর জমেছে। নেশাগ্রস্ত র‍্যাগের দল মেয়েদের হলের পিছনে এসে অকথ্য ভাষায় যেসব কথাবার্তা বলেছে তা কোনো অভিভাবক শুনলে তার সন্তানকে মুহূর্তের জন্য ভার্সিটিতে পাঠাতে চাইবে না। আমার হলেই এবারও সেন্ট্রাল রাণী মনোনীত হয়েছে। র‍্যাগের নিয়মানুযায়ী র‍্যাগের পূর্ব রাতে মেয়েরা মিলে হলের ভিতর গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করে। আয়োজনটি ভালোই ছিলো। তাইতো জুনিয়র মেয়েরাও ভিড় করেছিলো এ অনুষ্ঠান দেখতে। হঠাৎ ঘোষণা হলো এ অনুষ্ঠান জুনিয়রদের জন্য নয়। শুধুমাত্র শেষ বর্ষের মেয়েদের জন্য। কিন্তু সেখানেও অকথ্য নাচ-গান আর অশ্লীল কর্তাবার্তার ফোয়ারা। রাগে দুঃখে রুমে চলে এলাম। মেয়েরাও যে এতো অসভ্য হতে পারে তা এবার দেখলাম।

৫ নভেম্বর সকাল থেকেই সাজসাজ রব। মেয়েদের তিনটি হলের তিন কালার শাড়ী পরে উন্নত সাজসজ্জায় র‍্যাগের র‍্যালীতে চলে যায়। তারপর রাণীর যাবার পালা। সকালে সাড়ে নয়টার দিকে সেন্ট্রাল রাজা বিশাল এক বাহিনীর সেনাপতি, পাইক-পেয়াদাসহ সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে রাণীকে নিতে এলো। রাণীকে একটু দেরীতে হল থেকে বের হতে দেখেই শুরু হলো অকথ্য ভাষায় শ্লোগান যার মাত্র কিয়দংশ হলো– "সেন্ট্রাল রাণীর দেরী হলে.... হবে দলে দলে' নাউজুবিল্লাহ। তবে রাজা-রাণী পূর্ণ নিরাপত্তায় ছিলো সারাটা দিন। সকালের অধিবেশনে তেমন অপ্রীতিকর

বর্তমানে পার্কগুলোতে যা হচ্ছে

www.pathagar.com

এটা কোনো নাটক বা সিনেমার দৃশ্য নয়। বাস্তব জীবনে প্রায়শই ঘটে যাওয়া নারী নির্যাতনের একটি খন্ড চিত্র।

কিছু ঘটেনি। সেদিনের সেন্ট্রাল রাজা রাণী শালীনতা বজায় রেখে বক্তৃতা দিয়েছিলো। কিন্তু হল রাজা-রাণীর বক্তব্য ছিলো অশ্লীল। রক্তদান কর্মসূচিও শেষ হলো সকালে। বিকেলে শুরু হলো মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেন্ট্রাল রাণীকে রাজা বিকেলেই হলে ফিরে আসতে বলেছিলো, হয়তো এমন অপ্রীতিকর কিছু ঘটতে পারে রাজা পূর্বেই জেনেছিল। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুনতে ও দেখতে 'সাবাস বাংলাদেশ' চত্বর ছিলো লোকে লোকারণ্য। তিল ধারনের জায়গা ছিলো না সেদিন। ভার্সিটির ২৪ হাজার ছাত্র/ছাত্রীই নয় রাজশাহী শহরের গোটা তরুণ সমাজ যেন সমবেত হয়েছিলো সেদিন ক্যাম্পাসে। স্টেজের সামনে ছিলো মেয়েরা যারা দুপুর থেকেই জায়গা দখল নিয়েছিলো। আবার অনেক মেয়ে হলেও চলে এসেছিলো সন্ধ্যে হবার ভয়ে। এক এক করে প্রতিটি হলের অনুষ্ঠান শেষ হচ্ছে। প্যারোডি গান-অশ্লীল উক্তির ছাড়ছড়িতে দর্শকরা উন্মত্য যেন। সিনিয়র কয়েকজন শিক্ষকও উপস্থিত ছিলেন সেদিন। জানিনা তারা সেদিন মজা পাচ্ছিলেন, না দুঃখ পাচ্ছিলেন; এমন উদ্ভট অনুষ্ঠান উপভোগ করতে এসে। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনীও ছিলো। কিন্তু তার মধ্যে থেকে রাত ৮টার দিকে ঘটে গেলো অপ্রীতিকর ঘটনা। যাকে বলে 'মৌ-মাছির চাকে ঢিল'। হৈ হৈ রৈ রৈ অবস্থা। ধর ধর মার মার আর কি। মাইকে ঘোষণা- দু'টি মেয়ে কিডন্যাপ হয়েছে। আর যায় কোথা? সব মেয়েরা একযোগ্যে স্টেজে উঠতে চাচ্ছে নিরাপত্তার জন্য। ছেলেরা অনুষ্ঠান বন্ধ করে হাত ধরে টেনে টেনে উঠাচ্ছে আর যে যেদিকে পারছে প্রাণভরে দৌড়াচ্ছে। মাইকে শিক্ষক সমিতির সভাপতি বিনয় করে আবেদন করছে শান্ত হবার জন্য। কে শোনে কার কথা। স্যার প্রায় কেঁদে ফেলছেন যেন। আমার ধারণা সেদিন গুটি কয়েক শিক্ষক ওঝা বেশে স্টেজে বসে বিষধর সাপ ছেড়ে খেলা দেখছিলেন। কিন্তু বিষধর সাপগুলো হঠাৎ এমন হিংস্র মনোভাব নিয়ে মেতে উঠবে তা টের পাননি। স্যারের আহাজারিতে শুধু

www.pathagar.com

আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিল যেন। মাত্র পনের কি বিশ মিনিট, অনুষ্ঠান ভন্ডুল। মেয়েরা যে যেভাবে পেরেছে হলে ফিরবার জন্য দৌড়ে পালাচ্ছে। একাত্তরে মা-বোনেরা যেভাবে জানমাল নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল '৯৫-এর র‍্যাগের সন্ধ্যায়ও ভার্সিটির শিক্ষিতা মেয়েরা শিক্ষিত ছাত্রদের ভয়ে যে যেভাবে পেরেছে দৌড়িয়েছে। ধিক্ এ দেশের স্বাধীনতা! ধিক্ এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরে অবশ্য জানা গেছে, কোনো মেয়ে কিডন্যাপ হয়নি। তবে নিখোঁজ মেয়ে দু'টিকে পাওয়া গেছে। কি হয়েছিল সেদিন সন্ধ্যায়? কেনো হৈ হুল্লোড়, দৌড়াদৌড়ি? এ সবের উত্তর কে দেবে? রাতে মেয়েদের হল সুপার হলের খালাদের সাথে নিয়ে প্রতিটি রুমে রুমে খোঁজ নিয়েছে মেয়েরা সবাই রুমে ফিরেছে কিনা। তা দেখে মহিলাবাদী (তথাকথিত) লেখিকা তসলিমা নাসরিনের সেই কথা মনে আসছিল- এদেশের মেয়ে হলগুলো যেন মুরগীর খোপ (বাসা)। আমি তাই রসিকতা করে বলেই ফেললাম, 'খালা, সব মুরগী পেয়েছেন তো?' তসলিমা- তুমি এদেশে নেই। কিন্তু একবার যদি সেদিনের অনুষ্ঠানে আতঙ্কগ্রস্ত মেয়েদের চেহারাটা দেখতে। কিভাবে তারা হলে ফিরেছিল, তাদের কারো হাতে স্যান্ডেল কারো বা...। তাহলে তখনও কি তুমি বলতে এ দেশের মেয়েদের স্বাধীনতা নেই। মুরগীর খোপের মতো সন্ধ্যার পরপরই হলগুলো বন্ধ করা হয় বলে আক্ষেপ করতে কি? ঢাকা ভার্সিটির মেয়েরা 'সূর্যাস্ত আইন' বাতিল করবার জন্য মিছিল করতে সাহস পেতো কি?

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ফলাও করে প্রচার করেছে র‍্যাগের অশ্লীল আচরণের কথা। ভার্সিটির শিক্ষক থেকে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারিরা আজ ভার্সিটির ছেলেমেয়েদের বাঁকা চোখে দেখতে শুরু করেছে। অথচ মাত্র গুটি কয়েক ছেলেমেয়ের জন্য তথাকথিত চরম সভ্যতার জন্য ভার্সিটির প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী সমাজে তথা অভিভাবক মহলে হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছে। ভার্সিটির মেয়েদের পুত্রবধূ করতে অনেক অভিভাবক নারাজ হচ্ছে। গুটি কয়েক ছাত্র/ছাত্রীর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কলুষতায় ভরে যাচ্ছে। এ লজ্জা গোটা বাংলাদেশের, গোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। জানি না কবে শুভবুদ্ধির উদয় হবে। অনেকে মন্তব্য করেছে এ দেশের তরুণ সমাজ ডিসের কালো ছোবলে আক্রান্ত হয়ে বিপথগামী হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিসের ব্যবহার গোটা ছাত্র সমাজকে কলুষিত করছে। সেদিনের র‍্যাগের নীল নক্শা ছিলো ডিসের মরণ ছোবলের অনুকরণে অংকিত। তাইতো দেখেছি ছাত্রদের মেয়ে সেজে অশ্লীল দেহভঙ্গি।

নগ্নতা ও অশ্লীলতার ব্যাপক প্রচার নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার চাইতে কোনো অংশে কম নয়। যৌন উত্তেজনামূলক প্রচারণাই মানুষকে ব্যাভিচারের কর্দমাক্ত খাদে নিপতিত করে। যে সমাজের মানুষ দিন রাত, ঘরে বাইরে, জন সমাবেশে সভা-সমিতি তথা সকল ক্ষেত্রে লালসা চরিতার্থের আহবান জানায়, সে সমাজে নারীগণ পাশবিকতার স্বীকার হবে এটা বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই। আল্লাহ্ প্রদত্ত রাসূল (সঃ) প্রদর্শিত জীবনাদর্শ আল ইসলাম তাই নগ্নতা ও অশ্লীলতা বন্ধের নির্দেশ দিয়ে নারী সমাজকে করেছে সম্মানিত। ফলে ব্যাভিচারের সম্ভাব্য সকল পথ রয়েছে বন্ধ। নারীগণ পেয়েছে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয় ঃ

"যেসব লোক ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রচার পছন্দ করে,

www.pathagar.com

রাজধানী ঢাকার নিশিকন্যা

তাদের জন্যে রয়েছে ইহকাল ও পরকালে কষ্টদায়ক শাস্তি। (কোনটা নির্লজ্জতা ও অশ্লীল) তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন, তোমরা তা জান না। (১৩৭)

মহানবী (সঃ) তাই নারী সমাজের উন্নয়নে নর-নারীর অবৈধ যৌন সম্পর্ক চিরতরে নিষিদ্ধ করে। নির্ধারণ করেন শাস্তি বিধান। তিনি ঘোষণা করেন– "আত্ম সম্মান ও লজ্জাশীলতা হচ্ছে নারীর বড় সম্পদ। এই গুণ থেকে নারী বঞ্চিত হলে তারা পরিণত হবে এক জঘণ্যতম প্রাণীতে।" সুতরাং অবাধ যৌনাচার বন্ধকরণ মহানবী (সঃ) এর নারী জাতির উন্নয়নের অন্যতম অবদান। Prevention is better than cure এ নীতির উপর ভিত্তি করে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাক ও মহানবী (সঃ) নারী জাতিকে সামাজিক অবক্ষয় থেকে রক্ষার জন্য ব্যাভিচারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, এর জন্য কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করেন।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "ব্যাভিচারকারী পুরুষ ও নারী উভয়কে একশত করে বেত্রাঘাত করো।"

ফিলিপাইনে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। কিন্তু নারী-পুরুষের ফ্রি মিক্সিং-এর কারণে এ কঠোর আইন দ্বারাও ধর্ষণকারীদের প্রতিহত করা যাচ্ছে না এই পৈশাচিক অপরাধ থেকে। তাই সে দেশের এক মাননীয় সদস্য এই অপরাধ দমনের জন্য এক অভিনব শাস্তির প্রস্তাব করেছেন একটি বিলে। আর সে শাস্তি হচ্ছে লিঙ্গ কর্তন করে দেয়া। অর্থাৎ ধর্ষণ অপরাধের শাস্তি হবে অতঃপর পুরুষাঙ্গ কেটে দেয়া। তার মতে ফিলিপিনো পুরুষেরা লিঙ্গ হারিয়ে সমাজে লজ্জিত ও একঘরে হতে চাইবে না। এ কারণে তারা ধর্ষণের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে।

অথচ পবিত্র কোরআন আজ থেকে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে যৌন অপরাধের শাস্তি

www.pathagar.com

কে বলে নারী অবলা

হরতালে মহিলা পিকেটার

হরতালে রিকশা চালানোর অপরাধে একজন নারী একজন রিকশা চালককে কান ধরে উঠ্-বস্ করাচ্ছে

www.pathagar.com

হরতালে মহিলা পিকেটার

হরতালে রিকশায় আরোহণের অপরাধে একজন নারী রাজনৈতিক কর্মী একজন রিকশা আরোহীকে লাঞ্ছিত করছে

www.pathagar.com

বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখেছে। এটাকে এ যুগের কৃষ্ণকলি বুদ্ধিজীবীরা বর্বর আইন হিসেবে আখ্যায়িত করে বিদ্রুপ করছে। ইসলামী আইনের এই কঠোরতা আমাদের সমাজে নেই। তা সত্ত্বেও শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এই বাংলাদেশে ধর্মীয় আইনের প্রতি বিশ্বাসের কারণে অন্যান্য বিধর্মীয় দেশের তুলনায় এখানে যৌন অপরাধ সবচেয়ে কম। যে সব দেশে ইসলামী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে সে সব দেশে যৌন অপরাধ একেবারেই নেই। বাংলাদেশে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণের কারণেই পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিলো। কিন্তু আজকে প্রগতি ও তথাকথিত সভ্যতার নামে ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যেই তার আলামত দেখা যাচ্ছে।

১৯৮৪ সালের ২২শে নভেম্বর ইউপিআই পরিবেশিত একটি সংবাদ ছিলো এরকম- উটাই এর আলপাইন কর্তৃপক্ষের ফরমান ঃ নিজ নিজ মর্দা কুকুর সামলান। মাদী কুকুর দেখলেই যাতে তারা ক্ষেপে না যায় সে ব্যবস্থা নিন। যদি এটা না করতে পারেন তাহলে সাকুল্য খেশারত মর্দা কুকুরের মালিককেই দিতে হবে। যারা তাদের মর্দা কুকুর রাস্তা-ঘাটে অবাধে ঘোরা-ফেরার সুযোগ দেবেন, নগর কর্তৃপক্ষ তাদের জরিমানা করতে পারবেন। গত ২১শে নভেম্বর বুধবার (১৯৮৪) নগর পরিষদ এ আইন পাস করেছে। এর আগে মাদী কুকুরের অবাধ ঘোরা-ফেরা বন্ধ করে আইন পাসের ব্যাপারটি আলোচনায় আসে। মাদী কুকুরের মালিকগণ অভিযোগ করেছেন, রাস্তায় ছেড়ে দেয়া মর্দা কুকুর তাদের বাড়ীর প্রাচীর টপকিয়ে বেঁধে রাখা মাদী কুকুরের ওপর চড়াও হয়।

মর্দা কুকুরের যন্ত্রণা থেকে মাদী কুকুর ও শহরবাসীকে রক্ষা করার জন্য আল-পাইন কর্তৃপক্ষ আইন পাস করলেও আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের মনুষ্য নামের মর্দা কুকুরদের কবল থেকে নারীদেরকে রক্ষা করার জোরালো কোনো পদক্ষেপ নেই। কাগজে-কলমে আইন থাকলেও এর প্রয়োগ নেই। তাইতো ধর্ষণের সেঞ্চুরী পালন করেও স্বীকৃত অপরাধীরা রেহাই পেয়ে যায়। দুর্ভাগ্য এদেশের, দুর্ভাগ্য এ জাতির।

আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি বিধি-নিষেধ পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং মানব জাতির শারীরিক ও মানসিক কল্যাণের অনুকূল্য বলে আজকের বিজ্ঞানীরা সুস্পষ্ট রায় দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে দু'বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ শিশুদেরকে পান করার নির্দেশ দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা সমীক্ষা করে দেখেছেন যে, সব মায়েরা শিশুদেরকে মায়ের দুধ পান করায় তাদের বুকের ক্যান্সার হয় না। এ ছাড়া শিশুর সুস্বাস্থ্যের সহায়ক। মুসলমানদের খাৎনা করার ফলে পুরুষাঙ্গে ক্যান্সার হয় না। মদ পানকে আল্লাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এই মদপানে আর্থিক, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষতি ছাড়াও স্বাস্থ্যহানীও ঘটে। যেমন মুসলমানদের মধ্যে মদ্যপানের সংখ্যা কম থাকায় লিভার সংক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এ সম্প্রদায়ে সবচেয়ে কম। অথচ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তা সবচেয়ে বেশি। ফ্রী মিক্সিং ও অবাধে অবৈধ যৌন-সম্ভোগও মানব কল্যাণে আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা যিনার নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল ও অশুভ পন্থা।" আল্লাহর এ নির্দেশকে উপেক্ষা করার কারণেই পৃথিবী আজ প্রাণঘাতি এইডস ব্যাধিতে ভরে গেছে। সম্প্রতি ভারতের এক বিশেষজ্ঞ, মুসলিম ও হিন্দু নারীদের উপর এক সমীক্ষা চালিয়েছেন। এ সমীক্ষায় দেখা

www.pathagar.com

যায় যে, অবাধে যৌন সম্ভোগের কারণে জরায়ুর ক্যান্সারে ভোগেন মুসলিম নারী হাজারে ৩ জন এবং হিন্দু নারী হাজারে ৬ জন। অর্থাৎ ধর্মীয় কারণে মুসলমানদের মধ্যে অবৈধ যৌন সম্ভোগের হার কম থাকায় জরায়ুর ক্যান্সারে আক্রান্ত তুলনামূলক মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের সংখ্যা দ্বিগুণ।

খোদায়ী গজব

১৯৯৯ সালের ১৭ আগস্ট তুরস্কে স্মরণকালের এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিলো। এই ভূমিকম্প সম্পর্কে জর্দানের 'শাইহান', কাতারের 'আল ওয়াতান', বাহরাইনের 'আননুখবাহ' এবং তুরস্কের বেশ কয়েকটি পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী তুরস্কের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে পঞ্চাশ হাজারের মতো লোক নিহত হয়েছিলো, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিলো অনেক শহর-জনপদ। ঐ ভূমিকম্পের উৎপত্তি ও সূচনা সম্পর্কে ইন্টারনেটে এবং উল্লেখিত পত্রিকাগুলো যে রোমহর্ষক বিবরণ পেশ করেছে এর উদ্ধৃতি দিয়ে দৈনিক ইনকিলাবের উপসম্পাদকীয়তে লেখা হয় ঃ

সাগরপারের তুরস্কের এক বিখ্যাত নৌঘাঁটি। অবসরপ্রাপ্ত কিছু সংখ্যক তুর্কী জেনারেলদের সংবর্ধনা উপলক্ষে সেখানে আয়োজন করা হয়েছে এক জাঁকালো অনুষ্ঠান। টঢ ধথর্দ এর্ধশটফ বা উন্মত্ত রজনী উৎসব নামের সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছেন ত্রিশজনেরও বেশি ইসরাইলী কর্নেল, ত্রিশজনেরও অধিক আমেরিকান জেনারেল এবং ত্রিশজনেরও অধিক স্বাগতিক দেশ তুর্কী জেনারেল। আমদানী করা হয়েছে ইহুদী-খৃস্টান ও ধর্মনিরপেক্ষ তুর্কী উচ্ছল যৌন আবেদনময়ী সুন্দরী তন্বী নর্তকীদের। যথাসময় শুরু হলো মদ্যপান আর উদ্দাম নৃত্য। জেনারেলদের ঘিরে নাচছে নর্তকীরা। চলছে মদের সয়লাব। উন্মত্ত রজনীর উন্মত্ততা তখন তুঙ্গে। সুরার নেশায় উন্মাদ, অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মদ্রোহী জেনারেলের মাথায় এলো এক শয়তানী পরিকল্পনা। চিৎকার দিয়ে তিনি ডাকলেন এক ক্যাপ্টেনকে। আনতে বললেন আল্লাহর পবিত্র কালাম কোরআন শরীফ। ধর্মপ্রাণ ক্যাপ্টেন শিউরে উঠলেন। তবু উপায় নেই জেনারেলের হুকুম অমান্য করার। পবিত্র কোরআন উপস্থিত করা হলো। জেনারেল নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেনকে, খোল কোরআন, পাঠ কর ১৪ পারার সুরা হিজরের ৯ নং আয়াত। ভয়ে ভয়ে পাঠ করলেন ক্যাপ্টেন ঃ "ইন্না নাহ্নু নায্যালনা-জ্জিকরা ওয়াইন্না লাহু লাহাফিজুন"– 'আমিই (আল্লাহ্) কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমি নিজেই এর সংরক্ষক'। বললেন জেনারেল ব্যাখ্যা কর এই আয়াতের। শংকিত ক্যাপ্টেন বলেন, আমি জানি না এর ব্যাখ্যা। ব্যাঙ্গাত্মক হাসি ফুটে উঠল জেনারেলের মুখে। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ বলছে আল্লাহ নাকি নাজিল করেছে এই কিতাব আর সে নিজেই নাকি রক্ষা করবে এই কুরআনকে! বিদ্রূপাত্মক অট্টহাসির সঙ্গে উন্মত্ত জেনারেল ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলল পবিত্র কুরআন, ছড়িয়ে দিলো তা মদের আসরে নৃত্যরত নগ্ন নর্তকীদের পায়ের তলায়। আর দম্ভভরে উচ্চারণ করলেন, কোথায় সে কুরআন নাজিলকারী আর কোথায় সে এর হেফাজতকারী? এই পৈশাচিক উন্মত্ত দৃশ্য দেখে ভয়ে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার চিৎকার দিতে দিতে

www.pathagar.com

হল রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। পরিত্যাগ করলেন ঘাঁটি। আর তখন, ঠিক তখনই সমুদ্র বক্ষ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এলো প্রচন্ড এক অগ্নিস্তম্ভ। কমলা রঙের প্রবল আলোর বিচ্ছুরণে ধাঁধিয়ে গেলো চোখ। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ এক মহাশব্দ মহানাদ। সবকিছু এক নিমিষের মধ্যে। নেমে এলো খোদায়ী মহাগজব। আর সেই গজবে মুহূর্ত মধ্যে সবকিছু লন্ডভন্ড মিসমার হয়ে পুরো নৌঘাঁটি প্রোথিত হয়ে গেলো। বিলীন হয়ে গেলো মৃত্তিকাগর্ভে। কারো চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট রইলো না। প্রচন্ড ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো পার্শ্ববর্তী অন্যসব এলাকা। (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২১/১/২০০০)

সম্প্রতি ভারতের এলাহাবাদে গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে কুম্ভমেলা হয় ৪৩ দিনব্যাপী। ২৩ জানুয়ারী ছিলো মহাপবিত্রতম মাহেন্দ্রক্ষণ। এই মাহেন্দ্রক্ষণ চলছিলো ২৪ জানুয়ারী বিকেল পর্যন্ত। এই মাহেন্দ্রক্ষণে রাজস্নানে প্রায় এক কোটি পুণ্যার্থী সমবেত হয়েছিলো। এই রাজস্নান সম্পর্কে ইলেকট্রিক মিডিয়ায় যা দেখেছি এবং লোক মুখে যা শুনেছি তা ছিলো সভ্যতা বৈভ্যতার পরিপন্থী। আর এই কুম্ভমেলা শেষ হতে না হতেই গত ২৬ জানুয়ারী ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রায় লক্ষাধিক নর-নারীর প্রাণহানি ঘটেছে।

এদিকে এই ফেব্রুয়ারি মাসেই ভারতের মাটিতে নজিরবিহীন নৈতিকতা ও সভ্যতা বিরোধী যৌনকর্মী সম্মেলন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এই বাংলাদেশ থেকেও নাকি যৌনকর্মীদের একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হচ্ছে। শংকা হয় সভ্যতা ও নৈতিকতা বিরোধী এরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য না জানি আবার কোন্ ধরনের ভয়ংকর খোদায়ী গজব অবাধ্য মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে।

সুতরাং বিজাতীয়দের অনুসরণে এই অবাধ ফ্রী মিক্সিং, অবৈধ যৌন সম্ভোগ, সমকামিতা, নারী সমকামিতা, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদির কারণে খোদায়ী গজব ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক এইডস নামক মহামারীর ভয়াল তরঙ্গে কোটির অধিক মানুষের জীবনতরী আজ নিমজ্জিত প্রায়। লাখো লাখো জীবন প্রদীপ ইতোমধ্যেই নির্বাপিত হয়েছে। প্রত্যহ প্রবল থাবায় আক্রান্ত হচ্ছে অগণিত বনী আদম। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক এইডস-এর জীবাণু বহন করছে। বাংলাদেশেও এই মহামারীর কালো থাবা আঘাত হানতে এগিয়ে আসছে। প্রতিটি জেলাতে এ মরণব্যাধি আক্রান্ত হওয়ার ভয়াবহ খবর পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৮ লাখ মহিলার গর্ভপাত ঘটে বা ঘটানো হচ্ছে। এর মধ্যে বৈধ ও অবৈধ উভয় শ্রেণীই অন্তর্ভুক্ত। বিবাহ-পূর্বকালীন যুবতীদের গর্ভ সংক্রান্ত সংখ্যা ক্রমান্বয়েই আশঙ্কাজনকহারে বাড়ছে জন্মরোধের এতো ব্যবস্থা থাকার পরেও। আর আমাদের দেশের কোনো বৈধ বা অবৈধ সন্তান প্রসব করে ক্লাবে যায় না, সোসাইটিও করতে যায় না। কিন্তু মাঝে মাঝে ডাস্টবিনে জীবন্ত বা মৃত সদ্য ভূমিষ্ট সন্তান পাওয়া যায় বলে পত্র-পত্রিকার সংবাদে দেখা যায়। যদি আমরা এ অবৈধ যৌন সম্ভোগ হতে আমাদের সমাজকে রক্ষা করতে না পারি তবে ভারত ও পাশ্চাত্যের ন্যায় অশুভ পরিণাম আমাদেরও ভোগ করতে হবে।

আরবী ভাষার বিখ্যাত মরমী কবি ইবনে আল্ আরাবী বলেছেন ঃ তার মতে, স্রষ্টার

www.pathagar.com

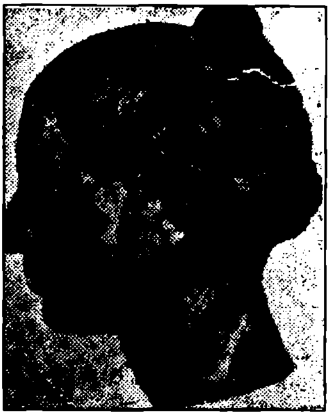

ক্লিওপেট্রা

ক্লিওপেট্রার প্রেমিক মার্ক এন্টনী

ক্লিওপেট্রার প্রেমিক সম্রাট জুলিয়াস সিজার

এই ব্যভিচারিণী ক্লিওপেট্রা আত্মহত্যার পূর্বমুহূর্তে আপন কৃতকর্মের জন্য নিজকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। প্রিয় বিচ্ছেদ বেদনায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। হাতের কাছে ছিলো একটা ভান্ড। আস্তে আস্তে ভান্ডটার মুখ খুললেন। হাতের মুঠিতে ধরে বের করলেন একটা বিষধর সাপ। তারপর সেটাকে উত্তেজিত করে ছোঁয়ালেন তিনি নিজের বুকে। একটা ক্রুদ্ধ ছোবল দিলো সাপটা সেখানে। আর একটা সাপ বের করে তাকে উত্তেজিত করার পর ছোঁয়ালেন আপন কমনীয় সুটৌল বাহুতে। তারপর খুব কষ্টে যেয়ে শুয়ে পরলেন এন্টনির রক্তাক্ত বুকের উপর উপুর হয়ে। আস্তে আস্তে তিনিও ঢলে পড়লেন মরণের হীম শীতল কোলে।

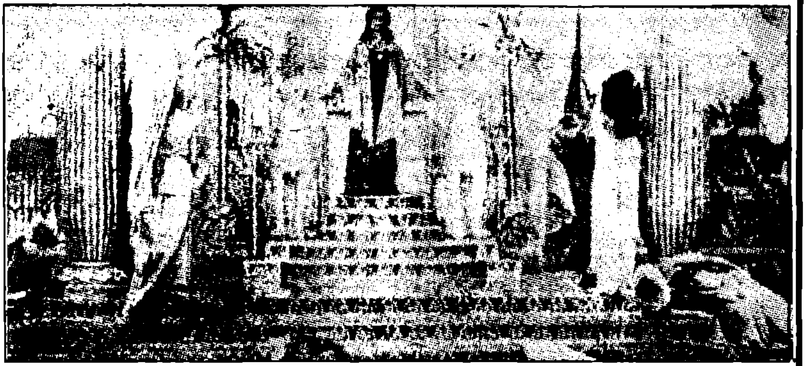

ক্লিওপেট্রার অতিথিশালা

সম্প্রতি সাগরের ২০ ফুট নিচ থেকে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ খৃষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে নির্মিত আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের প্রতিষ্ঠিত শহরের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেছেন। রানী ক্লিওপেট্রার আগুন ঝরা রূপের ডালিতে জুলিয়াস সিজার, মার্ক এন্টনীসহ অনেক রূপ পিয়াসী পুরুষ পাগল হয়েছে। প্রেমের অভিনয়ে ক্লিওপেট্রা অনেকের সাথে প্রতারণা করে শারীরিক সম্পর্ক শেষে ছেঁড়া জুতার মতো অনেক পুরুষকে ছুঁড়ে ফেলেছে। আর অনেক পুরুষ তার বিরহে আত্মহত্যা করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ব্যভিচারের কারণে অনেক বিপর্যয় ঘটেছে। যেমন ৯ হাজার বছর আগে আটলান্টিস নামের একটি মহাদেশ একরাতে আটলান্টিক মহাসাগরে তলিয়ে গিয়েছিলো। মাত্র ১০ বছর আগে ১৯৮৫ সালে আগ্নেয়গিরির লাভার মধ্যে একরাতে অর্ধলক্ষাধিক অধিবাসীসহ কলম্বিয়ার আরথেরো শহরটি ডুবে গিয়েছিলো।

www.pathagar.com

কোন মনোরম ছবি আমরা যখন কল্পনার ক্ষেত্রে অবলোকন করতে চাই, তখন কেবল তা ফুটে উঠতে চায় নারীর ছায়া মূর্তি নিয়ে। মুসলমান সমাজে কবিরা, বিশেষ করে মরমী কবিরা যেভাবে মেয়েদের সৃজনী শক্তির প্রতীক হিসাবে চিত্রিত করতে চেয়েছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। মুসলিম সমাজে কবিরা অন্ততঃ মেয়েদের ছোট করে দেখতে চাননি। বিশেষ করে মুসলিম চিন্তার স্বর্ণযুগে। কেবল মুসলমান সমাজে নয়, সব সমাজেই মেয়েদের অনেক অসম ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়েছে। শারীরিক শক্তির ন্যূনতার অনেক কারণে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পুরুষের হাতে হতে হয়েছে লাঞ্ছিত। কিন্তু সেটাই সব সত্য নয়। পুরুষ পেতে চেয়েছে নারীর ভালোবাসা। পেতে চেয়েছে ঘরকন্নার সাধারণ আনন্দ। এই ইতিহাস ভুলে যাবার নয়। পুরুষ ও নারী একে অপরকে বাদ দিয়ে চলেনি কোনদিন। এর সুন্দর উপমা রয়েছে মুসলিম সমাজের মরমী কবি রুমির একটি কবিতায়। তিনি তার কবিতায় বলেছেন ঃ

যদিও তুমি তোমার স্ত্রীকে শাসন করতে পার বাহ্যিকভাবে
তথাপি তুমি শাসিত হও তার দ্বারা
তোমার নিজের অন্তর থেকে।
কারণ তুমি তাকে কামনা কর
অন্তরের অন্তরস্থল হতে।
এইটাই স্বভাবধর্ম সৎ মানুষের।
মানুষ নয় অন্য প্রাণীদের মত
কারণ অন্য প্রাণী ভালবাসতে জানে না
কিন্তু মানুষ তা জানে।
ভালবাসাতেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, অন্য প্রাণীর থেকে।

নবী বলেছেন ঃ

জ্ঞানীদের উপর কাজ করে চলে নারীর প্রভাব
কিন্তু মূর্খদের প্রভাব পড়ে
নারীদের উপর।
নারীরা পরাভূত হয় তাদের হিংস্রতার কাছে।
কারণ মূর্খদের মধ্যে থাকে কেবল জান্তব প্রবৃত্তি।
ভালবাসা ও অনুরাগ হলো মানবিক গুণ
কাম ও ক্রোধ হল পশুদের ধর্ম।
মূর্খদের মধ্যে যা প্রকাশ পায় ভয়ঙ্কর রূপে।
নারীদের মধ্যে ফুটে ওঠে স্রষ্টার দীপ্তি
বলা যায়, মেয়েরাই সৃজক শক্তি
সৃষ্টির পরিচয় তারা নয়।

www.pathagar.com

নারীশিক্ষার অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার রচনা থেকে-

বেগম রোকেয়া শুধু অনৈসলামী অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ ও মুসলিম নারী শিক্ষারই অগ্রদূত ছিলেন না, তিনি বাঙালী মুসলমানের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যও মজবুত হাতে কলম ধরেছিলেন এবং অংশ নিয়েছিলেন বিকাশমুখী বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে। ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন কল্যাণমুখী সমাজ গঠনই ছিলো তাঁর আদর্শ। বাঙালী মুসলমান সমাজের যে মূল্যায়ন তিনি করেছিলেন- ৭০-৭৫ বছর পরেও রাজনৈতিক স্বার্থে বিভিন্ন গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। জনমনে তাঁর সম্বন্ধে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতিও সাহিত্যের বিষয়বস্তুই তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে নারী জাগরণে তাঁর মূল দর্শন কি ছিলো। আমি বেগম রোকেয়া লিখিত কয়েকটি নিবন্ধ ও ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

মাননীয় সভাপতি ও সভ্য মহোদয়গণ।

আমি সর্বদা আপনাদের এই স্কুলের বিষয় নিয়ে বিরক্ত করে থাকি। এমনকি অনেকে আমাকে এজন্য একটা nuisance বিশেষ মনে করেন। আমি যদি পৌত্তলিক হতুম, আর আমার কোন দেবতা থাকতেন, তবে তিনিও নিশ্চয় বিরক্ত হয়ে বলতেন, "প্রার্থনার সময়ে ধনং দেহি, মানং দেহি" এসব কিছু না বলে এ মেয়েটা কেবল একঘেয়ে- "সকলের জন্য গৃহং দেহি, স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি দেহি" বলে। দাও বেটিকে লাথি মেরে তাড়িয়ে।"

আজ আমি আপনাদের নিকট খানিকটা সময় ভিক্ষা চাই যে, আপনারা দয়া করে ধৈর্য্যের সহিত আমার দু'টি কথা শুনুন। আপনারা সকলেই জানেন যে, এই 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল'টা না থাকলে আমি মরে যাব না। এমনটি নিশ্চয় হবো না যে-

ঘুঘু চরবে আমার বাড়ী,
উনুনে উঠবে না হাঁড়ী,
বৈদ্যেতে পাব নাড়ী
অন্তিম দশায় খাব খাবি।

এই স্কুলটা না থাকলে আমার তিলমাত্র ক্ষতি নাই। তবে এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই? চাই নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়; চাই স্বামীর স্মৃতি রক্ষার জন্য, চাই বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের জন্য। 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল' শব্দ দু'টির জন্য যদি স্কুলের অকল্যাণ হয়, তবে সাইনবোর্ড থেকেও শব্দ দু'টি মুছে ফেলা যাক। অবশ্য মুসলিম সমাজটাও টিকে থাকলে বা গোল্লায় গেলে আমার নিজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কারণ আমার কোন বংশধর নাই যে তাদের ভাবী দুর্দশার আশঙ্কায় আমি শঙ্কিত হব; কিংবা তাদের দুষ্ক্রিয়া দেখে লজ্জিত হব। সুতরাং বুঝতে পারছেন, এই স্কুল সম্বন্ধে মাথাব্যথায় আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই। যাঁদের বংশধর আছে, যাঁদের ভবিষ্যৎ আছে, তাঁরা যদি সমাজটাকে রক্ষা করতে চান, তবে সমাজের মাতৃস্থানীয়া এই বালিকা স্কুলটাকে একটা আদর্শ বিদ্যালয়রূপে গঠিত করুন।

একবার ইতিহাসের পাতা উলটিয়ে দেখুন- এমন একদিন এসেছিল, যখন বাঙ্গালী

www.pathagar.com

হিন্দুদের আঁধার ঘরে জ্ঞানের আলোক এসে উঁকি মারল, তখন তাঁরা চোখ খুললেন, পরে পাখির কলরব শুনে বুঝতে পারলেন, 'আর রাত্রি নাই ভোর হইয়াছে, তখন তাঁরা অলস-শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু হিন্দু উঠে যাবেন কোথায়? এটা করলে জাতি যায়, সেটা খেলে জাতি যায়, সুতরাং তখন তাঁরা দলে দলে খ্রীস্টান হতে আরম্ভ করলেন, ক্রমে বন্দোপাধ্যায় নাম বদলে 'ব্যানার্জী' হলেন, আর সরকার হলেন 'সিরকার'! সেই ঘোর সঙ্কটের সময়ে রাজা রামমোহন রায় এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি সমাজহিতৈষী লোকেরা ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তন করে হিন্দুকে সবংশে খ্রীস্টান হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। তখন তাঁদের নিজ স্কুল, কলেজ হল, তাঁদের ছেলেমেয়েরা আর খ্রীস্টানের স্কুলে পড়তে যায় না। তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রক্ষা পেলেন।

অপরদিকে মোসলেম সমাজ তখন 'ঝোঁপড়ী মে শুয়ে মহলের খাব' দেখছিলেন, সেই সময়ে আলোক এসে মোসলেমের ঝোঁপড়ীর ভাঙ্গা চালের ভিতরও উঁকি মারল। তখন তাঁরা আর কেবল 'পন্দেনামা' আর 'শাহনামা' পাঠ করেই তৃপ্ত থাকতে পারলেন না,- তাঁরা ছুটলেন হিন্দু আর খ্রীস্টানের স্কুলে। তাঁরা কিন্তু নিজেদের জন্য স্কুল-কলেজ কিছুই করলেন না। তাঁরা খ্রীস্টানের কলেজে লেখা-পড়া শিখে দিব্যি সাহেব হয়ে গেলেন,- বলেন বিলাতি বুলি ঃ চাকরকে বলেন বেহারা, আর আর মুটেকে বলেন কুলি।

তখন পর্যন্ত মোসলেম সমাজের ততো বেশি অপকার হয় নাই; কারণ বাপ ক্লাবে গিয়ে চা খান, না চুরুট খান, ছেলে-মেয়েরা তা দেখতে পেত না,- তারা বাড়ীতে নামাজী মুসুল্লী মাকে সর্বক্ষণ দেখত,- সেই আদর্শে তারা খেলা করত, নামাজ নামাজ খেলা, আর পূব, দক্ষিণ যে কোন দিকে মুখ করে আজানের অনুকরণে 'আল্লাহ আকবর' বলে আজান দিত।

ক্রমে শিক্ষিত বাপ মেয়েকে আর শুধু 'রাহে-নাজাত' এবং 'সোনাভান; পুঁথি পড়িয়ে ক্ষান্ত থাকতে পারলেন না,- তাই তাঁরা মেয়েদের দিলেন Convent এবং হিন্দু স্কুলে পড়তে। Convent-এ পড়তে গিয়ে লায়লার নাম বদলে হল 'লিলা' আর জয়নব হল; 'জেনী'। হিন্দু স্কুলে গিয়ে আয়শার নাম হল 'আশা', আর কুলসুম হয়ে গেল 'কুসুম'! ঐ পর্যন্ত হয়ে থাকলেও ক্ষতি ছিলো না, আমাদের অধঃপতনের ঐখানেই শেষ নয়।

পরবর্তী যুগে জেনীর ছেলে-মেয়ে মানুষ করবার জন্য দরকার হল খ্রীস্টান আয়ার, যাতে ছেলেমেয়েরা শৈশব থেকেই ইংরাজী কথা বলতে শিখে। আর তার মেয়ের নাম হলো 'বারবারা আরীফ'। এখন বারবারা ঘরে তো আর মাকে নামাজ পড়তে দেখে না; সুতরাং তার খেলার আদর্শ হল গীর্জা। আর Convent থেকে গান শিখে বাড়ীতে এসে গায় ঃ

"Jesus saves me this I know
For the Bible tells me so.

কিংবা ঃ

"মুসলমান বে-ইমান,
মারো জুতা, পাকড়ো কান!"

অপরদিকে আমাদের কুসুমের মেয়ের নাম হয়েছে 'সৌদামিনী বেগম'। সৌদামিনীর খেলার আদর্শ হয়েছে পূজা,আর মাটি দিয়ে ঠাকুর গড়া। আর সে গান করে-

www.pathagar.com

"যমুনার মাটি অঙ্গেতে লেপিয়া
হরিনাম লিখ তায়;
সব সখী মিলে বল হরি হরি,
যখন পরাণ যায়।"

অথবা ঃ

"নেড়ে মুসলমান–
তার না আছে ধন, না আছে মান।"

সেদিন Bengal Women's Educational Conference উপলক্ষে জনৈক উচ্চশিক্ষিতা 'মুসলমান ব্রাহ্ম' মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি স্পষ্টই বললেন যে, যেহেতু তার বাল্যকালে মুসলমান সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিলো না, তাই তার বাবা ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়ে গিয়ে তাকে উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন। তার শিক্ষাদীক্ষা যেভাবে হয়েছে, তাতে তিনি কুরআন, হাদীস আলোচনা করার সুযোগ পাননি। সুতরাং তিনি নিজেকে মোসলেম সমাজের উপযোগী করতে পারেন নি।

ঐরূপ একটি সুশিক্ষিতা মহিলাকে তার পিতামাতা এবং এবং ভ্রাতাসহ মোসলেম সমাজ খরচের খাতায় লিখতে বাধ্য হলো। স্ত্রী-শিক্ষার অভাবে আমাদের খরচের খাতা নানা প্রকারের খরচ লিখতে লিখতে ক্রমশঃ ভারী হয়ে চলেছে। আমাদের সমাজের খরচের খাতা কিরূপে বেড়ে যাচ্ছে তার একটু আভাস দিচ্ছি। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে, কোন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম যুবক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন যে, গ্র্যাজুয়েট পাত্রী না পেলে তারা বিয়ে করবেন না; মোসলেম সমাজে যদি একান্তই গ্র্যাজুয়েট মেয়ে না পাওয়া যায়, তবে তারা খৃস্টান হয়ে যাবেন।

কেউ আবদার করে কাঁদেন যে, "মা আমাকে একটা নিরক্ষর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন; এখন তিনিই বউ নিয়ে থাকুন; ও কাঠের পুতুল নিয়ে আমি ঘর করতে পারবো না।" কোন ভদ্রলোক বায়না ধরেছেন যে, আইএ পাস পাত্রী চাই। কেউ চান অন্তত ম্যাট্রিক পাস, তা না হলে তারা খৃস্টান বা ব্রাহ্ম হয়ে যাবেন। এসব বিকৃত রুচির প্রধান কারণ বর্তমান ধর্মহীন শিক্ষা। এলাহাবাদের কবি আকবর সাহেব বেশ বলেছেন–

"তিফিল মে বু আয়ে কেয়া মা বাপ কে আতওয়ার কী?
দুধ ত ডিব্বে কা হায়, তা'লীম হায় সরকার কী।"

উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রলোকের ঘরে এখন এমএ পাস বউ না হলে আলো হয় না। কিন্তু এ জন্যে সে বেচারাদের গালাগালি না দিয়ে বরং যাতে তারা আমাদের হাতছাড়া না হয়, তারই ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের আরো জানা আছে যে, অনেক বিকৃত-মস্তিষ্ক ধর্মহীন লোক উপযুক্তা বিদুষী ভাষার হাতে পড়ে শুধরে গিয়ে চমৎকার পাক মুসল্লী হয়েছেন।

এই বিংশ শতাব্দীকালে যৎকালে অন্যান্য জাতি নিজেদের প্রাচীন প্রথাকে নানা রকমে সংস্কৃত, সংশোধিত ও সুমার্জিত করে আঁকড়ে ধরে আছেন; আমাদেরই উত্তরাধিকার 'তালাক', 'খেলা' প্রভৃতি সামাজিক প্রথা নিজেদের মধ্যে সংযোগ করে, 'পিতার সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার বিল', 'পত্নীত্যাগ বিল', 'পরিত্যাগ বিল' ইত্যাদি নানা রকমের বিল পাস করে নেবার চেষ্টা করছেন, তৎকালে আমরা নিজেদের অতি

www.pathagar.com

সুন্দর ধর্ম, অতি সুন্দর সামাজিক আচার-প্রথা বিসর্জন দিয়ে এক অদ্ভুত জানোয়ার সাজতে বসেছি। 'সুরেন্দ্র' সলিমুল্লা, স্যামুয়েল খাঁ' গোছের নাম শুনতে কেমন লাগবে?

ফল কথা, উপরোক্ত দূরাবস্থার একমাত্র ওষুধ একটি আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়, যেখানে আমাদের মেয়েরা আধুনিক জগতের অন্যান্য সম্প্রদায় এবং প্রদেশের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলার মতো উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যান্য সুসভ্য সম্প্রদায়ের এবং এই ভারতবর্ষেই অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান মেয়েরা ডাক্তার, ব্যারিস্টার, কাউন্সিলার এবং গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্য হচ্ছেন; আমাদের মেয়েরা কোন পাপে ঐসব সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত থাকবে? আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়ে আদর্শ মোসলেম নারী গঠিত হবে, যাদের সন্তান সন্তুতি হবে হযরত ওমর ফারুক, হযরত ফাতেমা জোহরার মতো। এর জন্য কুরআন শরীফ শিক্ষার বহুল বিস্তার দরকার। কুরআন শরীফ অর্থাৎ তার উর্দু এবং বাংলা অনুবাদের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক।

ছেলেবেলায় আমি মার মুখে শুনতুম, "কুরআন শরীফ ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করবে।" সে কথা অতি সত্য। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, খুব বড় আকারের সুন্দর জেলদ বাঁধা কুরআনখানা আমার পিঠে ঢালের মতো করে বেঁধে নিতে হবে। বরং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি এই বুঝি যে, কুরআন শরীফের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানা প্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কুরআন শরীফের বিধান অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।

মাসিক মোহাম্মদ
জৈষ্ঠ, ১৩৩৮

★ ★ ★

'মুসলমান বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে কোরআন শিক্ষাদান করা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। কোরআন শিক্ষা অর্থ শুধু টিয়া পাখির মতো আরবী শব্দ আবৃত্তি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় কোরআনের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হইবে সম্ভবতঃ এই জন্য গভর্নমেন্ট বাধ্যতামূলক আইন পাস না করিলে আমাদের সমাজ মেয়েদের কোরআন শিক্ষাও দিবে না। যদি কেউ ডাক্তার ডাকিয়া ব্যবস্থাপত্র (রেপ্রেডরধর্যধমভ) লয় কিন্তু তাতে লিখিত ঔষধ পথ্য ব্যবহার না করিয়া সে ব্যবস্থাপত্রখানাকে মাদুলিরূপে গলায় পড়িয়া থাকে, আর দৈনিক তিনবার করে পাঠ করে, তাতে সে কি উপকার পাইবে। আমরা পবিত্র কোরআন শরীফের লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন কার্য করি না, শুধু তা পাখির মতো পাঠ করি আর কাপড়ের থলিতে (জুযদানে) পুরিয়া অতি যত্নে উচ্চস্থানে রাখি। কিছুদিন হলো মিসর হতে আগত বিদূষী মহিলা মিস সাফিয়া সুলেমান এলাহাবাদে এক বিরাট মুসলিম সভায় বক্তৃতা দানকালে বলেছিলেন, "উপস্থিত যে যে ভদ্রলোক কোরআন এর অর্থ বুঝেন, তারা হাত তুলুন।" তাতে মাত্র তিনজন ভদ্রলোক হাত তুলিয়াছিলেন। কোরআন-জ্ঞানে যখন পুরুষদের এরূপ দৈন্য, তখন আমাদের দৈন্য যে কতো ভীষণ তা না বলাই ভালো। সুতরাং কোরআন-এর বিধি ব্যবস্থা কিছুই আমরা অবগত নই।

[বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতির সভায় সভানেত্রী হিসাবে প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত]

www.pathagar.com

"যাক, আমাদের প্লেন বোঁ বোঁ করে রওয়ানা হলো। তাতে আরো অনেক যাত্রী ছিলো ইরানী, তুরানী, তুর্কী, আলবেনিয়ান, ইরাকী, কাবুলী ইত্যাদি ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এখানে যাত্রীদের সবাই মুসলিম দেশের অধিবাসী। আর এদের মধ্যে কেবল তরুণ নয়, তরুণীরাও ছিলো। সবাই নওজোয়ান, বুড়ো (আমি ছাড়া আর) একটাও না। আমার মাথার ভেতর কেবলই গুঞ্জন করছিলো–

নগ্নশির, সজ্জা নাই লজ্জা নাই ধড়ে,
কাছা কোঁচা শত বার খসে খসে পড়ে–

কখনো ঐ গানটাই উলট-পালট হয়ে মনে ভেসে বেড়াচ্ছিলো–

পাগড়ী নাই, টুপি নাই, লজ্জা নাই ধরে ইত্যাদি।

ও বাবা! কতক্ষণ পরে দেখি কি, সত্য সত্যই তরুণদের কাছা-কোঁচা একেবারে খসে পড়ে গেছে আর–

রোদ বৃষ্টি হিম হতে বাঁচাইতে কায়,
একমাত্র হ্যাট তার রয়েছে মাথায়!
শেষে দেখি, সোবহান আল্লাহ! তরুণীরা অর্ধ-দিগম্বরী!!

যাক, হ্যাট দিয়ে লজ্জা যদি নাও নিবারণ হয়, তবু রোদ বৃষ্টি হিম হতে মাথাটা বাঁচাতে কিন্তু তরুণীদের মাথায় যে হ্যাটও নেই। আর চেপে থাকতে না পেরে বলে ফেললুম– ভাই তরুণ, উন্নতির পথে চলেছো, তা উলঙ্গ কেন?

সে বললো, আমরা এখন দেশোদ্ধার করতে চলেছি, আমাদের কি আর কাছা কোঁচা জ্ঞান আছে? তুচ্ছ বেশভূষা, তুচ্ছ ব্যাস সব বিসর্জন দাও স্বাধীনতা পাবার আশায়। আমরা চাই কেবল উন্নতি আর উন্নত। ... বোঁ বোঁ করে প্লেন উন্নতির পথে ছুটছে। এখন দেখি কি, সেই তরুণী-তরুণের কথাই সত্য, অর্থাৎ প্লেনটা চক্রাকারে পথে ঘুরে ক্রমে কালিদাসের বর্ণিত শকুন্তলার যুগে যখন মুনি-কন্যারা গাছের বাকল পরতেন, তাও আবার সবসময় লম্বায় চওড়ায় যথেষ্ট হতো না বলে টেনে টুনে পড়তে হতো সেই যুগে এসে পড়েছে। তরুণীদের দিকে আর চাওয়া যায় না।

... আমি কাকুতি করে বললুম, দোহাই ভায়া তরুন। আর না। আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা এখন আদি মাতা হযরত হাওয়ার যুগে এসে পড়বে। আদি পিতা অভিশপ্ত হয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে গাছের তিনটা পাতা চেয়ে নিয়ে একটায় তহবন্দ, একটা দিয়ে জামা আর একটা দিয়ে মাথা ঢাকবার টুপি করেছিলেন। আর আদি মাতা তার লম্বা চুল খুলে দিয়ে সমস্ত গা ঢেকেছিলেন। কিন্তু এখনকার তরুণীদের মাথায় তো চুলও নেই, এরা কি দিয়ে গা ঢাকবে? (মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ ১৩৩৫)

★ ★ ★

তিনি "ভারতীয় পর্দার সহিত শাস্ত্রীয় (অর্থাৎ ইসলামী) পর্দার কোনো সম্বন্ধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।" (কেন্দ্রিয় নারী শিক্ষা সমিতি, রোকেয়া রচনাবলী, পৃঃ ২৮১)। তিনি আরো বলেন, "আমাদের 'শরিয়ত' অনুযায়ী অন্তঃপুর এবং ভারতীয় 'অবরোধ' ইহা সম্পূর্ণ দুইটি ভিন্ন বস্তু।.... 'শরিয়ত' আমাদিগকে 'পর্দায়' (বস্ত্রাবৃতা)

www.pathagar.com

থাকিতে বলে 'অবরোধ' এ বন্দিনী থাকিতে কখনো বলে না।"

★ ★ ★

বিকৃত রুচির প্রধান কারণ বর্তমান ধর্মহীন শিক্ষা। ফরজ নারী শিক্ষার প্রসারে তিনি অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন। "আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়ে আদর্শ মোসলেম নারী গঠিত হবে হযরত ওমর ফারুক হযরত ফাতেমা জোহরার মতো। এর জন্য কুরআন শরীফ শিক্ষার বহুল বিস্তার দরকার। কুরআন শরীফ অর্থাৎ তার উর্দু এবং বাংলা অনুবাদের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক। কুরআন শরীফের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানা প্রকার কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে।" (মাসিক মোহাম্মদী, জৈষ্ঠ ১৩৩৮)

★ ★ ★

"আমাদের উত্তরবঙ্গে দেখছি, গৃহস্থ শ্রেণীর মধ্যে সর্বদা তালাক হয়, অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীকে সামান্য অপরাধে পরিত্যাগ করে। মেয়েটির কোনো ত্রুটি হলেই স্বামী-স্ত্রীকে দম্ভভরে প্রচার করে, "আমি ওকে তালাক দেব, আজই দেবো।" (রোকেয়া রচনাবলী, পৃঃ ৩১৪, নারীর অধিকার)।

★ ★ ★

"আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে, আমার জঘন্য অবরোধ প্রথা নাকি আমাদের উন্নতির অন্তরায়। উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ভগ্নীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলে তারা প্রায়ই আমাকে 'বোরকা' ছাড়িতে বলেন। বলি উন্নতি জিনিসটা কি? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাই হয় তাহলে বুঝিবে যে, জেলেনী, চামারানী, কি ডুমুনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করেছে।" (রোকেয়া রচনাবলী)

★ ★ ★

স্বামী স্ত্রীর সমতা সম্পর্কে বেগম রোকেয়া বলেন, "There is a saying, Man proposes, God dispoos," but my better experience shows that God gives, Man , Robs. That is, Allah has made no distinction on the general life of male and female-both are equally bound to seek food, drink, sleep, etc, Necessary for animal life. Islam also teaches that male and female are equally bound to say their daily prayers five times, and so on." ('God gives, man robs', দি মুসলমান পত্রিকায় রোকেয়া প্রসঙ্গ, পৃঃ ২৩)

★ ★ ★

তিনি জান্নাতবাসী হবার পূর্বরাতে অসমাপ্ত এ লেখাটি পেপার ওয়েটের নিচে রেখে গিয়েছিলেন।

বেগম রোকেয়ার হাতে গড়া রত্ন, লেখিকা শামসুন নাহারের উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি। মিসেস নাহার তাঁর, 'রোকেয়া জীবনীতে বলেন, "কিন্তু সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে ধর্মের সত্যতার শিক্ষার দিকে বারে বারে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইসলামের নির্দেশকে কুরআনের পাতায় আবদ্ধ না রাখিয়া বাস্তব জীবনে কাজে লাগাইবার জন্য তিনি পাগল হইয়াছিলেন।" (রোকেয়া জীবনী, শামসুন নাহার, পৃঃ ১১১-১১২)।

www.pathagar.com

ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে নও-মুসলিম নারীদের ইসলাম গ্রহণের প্রতিক্রিয়া এবং আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতি ও সাক্ষাৎকার

[আমাদের দেশের কতিপয় বুদ্ধিজীবী নামের বৃত্তিজীবী ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে এলার্জি থাকলেও ইসলামের সৌন্দর্য আজ ভোগ বিলাসী বস্তুতান্ত্রিক অশান্ত অপরিতৃপ্ত অনেক পাশ্চাত্যবাদী তথা অমুসলিম বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছে, তাদেরকে আকর্ষণ করছে ইসলামের দিকে। ইসলামের বিরুদ্ধে বৈরী প্রচারণায় অনেক অমুসলিম নারী-পুরুষকে কৌতূহলবশতঃ এই ধর্মকে জানতে সহায়তা করেছে। বৈরী প্রচারণায় বুমেরাং হয়ে ইসলামের সুমহান মর্ম বাণীর যথার্থতা উপলব্ধি করে বিপুল সংখ্যক নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন। এখানে অসংখ্য নও-মুসলিম নারীদের থেকে মাত্র কয়েকজনের প্রতিক্রিয়া উদ্ধৃত হলো।]

ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ ইয়াসমিন পাতিল সৌদি আরবের দৈনিক 'ওকায'-এর জেদ্দা প্রতিনিধি মিনা মুরাদকে বলেন, ... *আল্লাহর শুকুর যে আজ আমি মুসলমান, একজন মুসলিম নারীর যোগ্য মর্যাদা ও প্রাপ্য অধিকার নিয়ে আমি জীবন যাপন করছি। ইসলাম নারীদের পূর্ণ মর্যাদা দেয়।*

...ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, সর্বক্ষেত্রে সর্বযুগে সমভাবে প্রযোজ্য। ইসলামী শরীয়তের বিধান ঐতিহ্যের গৌরবে উজ্জ্বল। ইসলাম নারী সমাজকে যে অধিকার দিয়েছে তা অন্য কোনো ধর্ম দেয়নি। আমার দৃষ্টিতে নারী মর্যাদার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিই অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের তুলনায় ইসলামকে শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিয়েছে।

★ ★ ★

জার্মানী নার্স মিসেস আনা বলেন, তার জীবনের অনেকগুলো বসন্ত যে দেশে কেটেছে সে দেশে ইসলামকে জানার কোনো সহজ উপায়ও ছিলো না বা এ সম্পর্কে তিনি যতটুকু জানতে পারেন, তার অনেকটাই জার্মানীর কোনো অমুসলিম গবেষক, প্রাচ্যবিদ বা ইহুদী তাত্ত্বিকের মাধ্যমে। অতএব, সৌদি আরবে চাকরি করতে আসার সময় ইসলাম সম্পর্কে তার জ্ঞানের পরিধি ছিলো এই– *"ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক একজন রাখাল ছিলেন। লেখাপড়া জানতেন না। মুসলমানেরা এ লোকটিরই পূজা করে। এ ধর্মে একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করতে পারে। এ ছাড়া ইসলামে নারী স্বাধীনতা বলতে কিছুই নেই। পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসেবেই এখানে নারীদের বড় পরিচয়। তবে এ ধর্মে মদ্যপান ও শূকোরের মাংস ভক্ষণ সম্পূর্ণ অবৈধ। যীশু খৃষ্টকে এরা একজন নবী মনে করে। তার শূলিতে চড়ে জীবন দানের ঘটনা এরা মানে না।"* ব্যস, এ পর্যন্তই জানতেন আনা ইসলাম সম্পর্কে।

আর মুসলমানদের সম্পর্কে তার ধারণা ছিলো আরো বেশি অস্পষ্ট। মুসলমানদের জীবনধারা তার কাছে মনে হতো খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন। একজন জার্মান চিকিৎসকের কন্যা হিসেবে তার জীবন যাপন যথেষ্ট উন্নত ও আধুনিক ছিলো। আর চিকিৎসার সাথে যোগসূত্র থাকার কারণে তিনিও ব্যক্তিগত জীবনে একজন নার্স হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হন এবং পেশাগত কারণেই তার সৌদি আরব আগমন।

আধুনিক সৌদি আরবের ঝকঝকে তকতকে রাস্তাঘাট, প্রাসাদোপম অট্টালিকার সারি, আকাশচুম্বী দালান কোঠা আর অত্যাধুনিক জীবন যাত্রা দেখে তার মনে হলো, কই, ইউরোপের গর্বিত নগর সভ্যতার চেয়ে তো এদের নগর সভ্যতা বিন্দুমাত্রও পিছিয়ে নেই। এরা বরং অনেকাংশে এগিয়ে আছে পশ্চিমাদের চেয়ে। আর অর্থ সম্পদের সব উৎস মূলইতো এদের হাতের মুঠোয়।

www.pathagar.com

এদেশে এসে আনার বিস্ময় আরো বেশি বেড়ে যায়। তিনি দেখেন, এ দেশেও বহু সংখ্যক মহিলা ডাক্তার রয়েছেন। মুসলমান মহিলারা ডাক্তার। ওরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় দ্রুত উন্নতি করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী সৌদি মহিলাদের সংখ্যা এখন খুবই উৎসাহব্যঞ্জক।

নগর সভ্যতার উন্নতি, উচ্চ শিক্ষা-দীক্ষা আর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্যই সৌদি আরব আনাকে প্রভাবিত করেনি। এখানে এসে সৌদি মুসলমানদের জীবন-যাপন প্রণালী, পারিবারিক সংহতি, বড়দের প্রতি ছোটদের শ্রদ্ধা ও সম্মান, ছোটদের জন্য বড়দের স্নেহ-মমতা, পারস্পরিক আচার-ব্যবহার ইত্যাদি দেখে আনা খুবই আকৃষ্ট হন। মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা, পারিবারিক আন্তরিকতা ও সমাজ জীবনে হৃদ্যতাপূর্ণ পারস্পরিক আচার-আচরণ আনাকে ইসলামের আরো একধাপ কাছে টেনে আনে। (সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)

আমেরিকার ইস্টার্ন মিসিগান ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছাত্রী নও-মুসলিম মিস সুরাইয়া ইসলাম পত্রিকা মাসিক 'ইউনিটা টাইম'-এর মার্চ ১৯৯০ সংখ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ... *একজন ধার্মিক মহিলার মনোভাব, অনুভূতি সর্বদা যেমন থাকে, আমার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। আমি তো মাথা ঢেকে রাখার কারণে অর্ধ উলঙ্গ মেয়েদের ভীড়ে একটি স্বতন্ত্র নিরাপত্তাবোধ করি। সাধারণত আমেরিকার মেয়েরা অর্ধ উলঙ্গ থাকার কারণে সর্বদাই একটা আশঙ্কা ও আতঙ্কের মধ্যে সময় কাটায়। যে কোনো মুহূর্তে তারা ধর্ষিতা ও অপহৃত হতে পারে। কিন্তু আমাকে সে শংকা পোহাতে হয় না। তাছাড়া চুল ঢেকে রাখা একটি ঘোষণাও বটে যে, আমি একজন মুসলমান। আসল কথা হলো– এ ব্যাপারে আল্লাহপাকের যা হুকুম রয়েছে তাই পালন করছি।*

.... আজকে অগণিত মানুষ ইসলামের দিকে ধাবিত হওয়ার কারণ একটিই যে, পশ্চিমা জগতের জীবন-সংগ্রামে না আছে সভ্যতার নামগন্ধ, না আছে সেখানে কোনো ভারসাম্য ও পবিত্রতা। অথচ ইসলাম এগুলোর সমন্বয়ে একটি উন্নত জীবনের পথ নির্দেশ দিয়েছে। উন্নত চরিত্র ইসলামী শিক্ষার একটি বড় গুণ। পশ্চিমা দুনিয়ার সঙ্কটপূর্ণ জীবনাচার থেকে ইসলাম বহু উন্নত ও উঁচুমানের।

...প্রকৃতপক্ষে ইসলামে যে নারী অধিকার রয়েছে তা আমেরিকানরা জানে না। এ অপবাদ সাধারণত ওরাই বেশি দেয় যারা ইসলাম সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানও রাখে না, পড়াশোনা করে না। ইসলাম সম্পর্কে ওরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তারা মনে করে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যেহেতু মেয়ে-পুরুষদের কর্মক্ষেত্র পৃথক পৃথক, তাই মেয়েরা সেখানে জুলুমের শিকার। অথচ বিষয়টি এর সম্পূর্ণ উল্টো। আমি আমার দেশের বাস্তব অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছি। এখানে নারী অধিকার বলতে এটাই বুঝাতে চান যে, পুরুষরা যে কাজ করবে নারীদেরও সে কাজ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, মেয়েরা পুরুষের ন্যায় সারাদিন কর্মক্ষেত্রে কাজ করে আয়-উপার্জন করেন। তারপরও তাদেরকে বাড়ীতে এসে ঘরের যাবতীয় কাজ-কর্ম, রান্না-বান্না, বাচ্চাদের সেবা-যত্ন, স্বামীর খেদমত সবকিছুই করতে হয়। অথচ তখন পুরুষরা তাদেরকে কোনো সাহায্য করে না। সুতরাং সমান অধিকার কোথায়? বিশেষ করে যে ঘরের স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকরি করে, তাদের বাড়ির সন্তানদের যে কি পরিমাণ দুঃখ-দুরাবস্থা হয় তা দেখলে করুণা হয়। উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলো বর্তমান মুসলিম-বিশ্বের আচার-আচরণ দেখে মনে করে যে, এটাই বুঝি ইসলামী শিক্ষা-সভ্যতা। অথচ বিষয়টি তাদের ধারণার বিপরীত। তাই আমাদের জন্য ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ করা উচিত।

★ ★ ★

আমেরিকার মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সমাজ কল্যাণ' বিভাগের ছাত্রী নও-মুসলিম মিস

www.pathagar.com

এমিলি (মুসলিম নাম হাজেরা) বলেন, ... *আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে এটাই বুঝেছি যে, যুদ্ধ বিগ্রহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও কষ্ট মুসিবত হতে মানবতাকে মুক্তি দেয়ার জন্য একটিই রাস্তা আর তা হলো ইসলাম।*

তিনি বলেন, ইসলামই হচ্ছে এক মাত্র দ্বীন যা আমাদের বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সমস্ত সমস্যারই সমাধান দিতে পারে। এটিই হচ্ছে জীবনের একমাত্র পরিপূর্ণ ব্যবস্থা যা রুহানী চাহিদা ও শারীরিক চাহিদা উভয়েরই সমাধান দিয়েছে। এর মধ্যে কোনো অসম্পূর্ণতা নেই। ঐ সমস্ত প্রশ্নাবলী, যা আমাকে রাতের পর রাত নিদ্রাহীন রাখতো, তার সঠিক ও পরিপূর্ণ জবাব ইসলামের মধ্যেই পেয়েছি। (ইসলামী দিক নির্দেশনা, মুহম্মদ বিন জামীল যাইনু, মক্কা মুকাররামা, পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯)

★ ★ ★

জাপানী নারী মিস ফাতিমা কাজু তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, *"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই আমি পর্যবেক্ষণ করছি– ধর্মের প্রতি আমাদের (জাপানীদের) বিশ্বাস ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে। আমি গভীরভাবে অনুধাবন করলাম আমরা যতই আমেরিকান ধাচের জীবন যাত্রায় অভ্যস্থ হয়ে পড়ছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল– আমরা কি যেন হারিয়ে ফেলছি। আমাদের কি হারিয়ে যাচ্ছে– প্রথম দিকে আমি তা' বুঝতে পারিনি। আর এ বুঝতে না পারাটাই আমার জন্যে মর্মন্তুদ অন্তর্যাতনার কারণ হয়ে দেখা দিলো।*

এ সময় টোকিওতে কিছুদিন ধরে অবস্থানরত একজন মুসলমানের সাথে সৌভাগ্যক্রম আমার সাক্ষাত হলো। তাঁর ব্যবহার এবং উপাসনা-পদ্ধতি আমাকে মুগ্ধ করলো। আমি তাঁকে অনেকগুলো প্রশ্ন করলাম। তাঁর উত্তরগুলো এতোই সন্তোষজনক ছিলো যে, সেগুলো শুনে আমি আমার অন্তরে শান্তি অনুভব করলাম। আল্লাহপাকের নির্দেশিত পন্থায় জীবন যাপন করার পদ্ধতি তিনি আমায় শিক্ষা দিলেন। আমার জীবনের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি যে এতো তাড়াতাড়ি পরিবর্তিত হয়ে যাবে, তা আমি ইতোপূর্বে কল্পনাও করিনি!

মুসলমানদের অভিবাদন প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করুন। তারা 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলে অভিবাদন জানায়। এর অর্থ হলো– 'আল্লাহপাক আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত নাজিল করুন'। *"Good morning"* ও *"Good afternoon"*-এর চাইতে মুসলমানদের এই অভিবাদন কতই না সুন্দর অর্থবহ! *"Good morning"* বা *"Good afternoon"* বলে অভিবাদন জানিয়ে শুধুমাত্র সকাল বা বিকালের ভালো কামনা করা হয়। এগুলো নিছক বস্তুবাদী সম্বোধন– আল্লাহর রহমত ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য প্রার্থনার নামগন্ধও এ অভিবাদনে নেই।

আমার ঐ মুসলিম বন্ধুর সহায়তায় মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস ও কাজকর্ম সম্পর্কে অনেক কিছু শিখলাম। মুসলমানদের নিষ্কলঙ্ক, সাধাসিধা ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাত্রা আমার পছন্দ হলো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো– একজন মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন শুধুমাত্র ইসলামই প্রকৃত শান্তি এনে দিতে পারে। শান্তির অন্বেষায় অধীর *(eager)* বিশ্ব মানবতাকে একমাত্র ইসলামই প্রকৃত শান্তির সন্ধান দিতে পারে। ইসলামরূপ শান্তি অর্জন করতে পেরে আমি আনন্দিত। আমার পরিচিতজনদের মাঝে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেবার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি।" (সূত্র ঃ Islam- Our Choice, P. 67)

★ ★ ★

নিউইয়র্ক পোস্ট অথরিটির কর্মচারী আমেরিকান নও-মুসলিম মহিলা সাদী মুহাম্মদ বলেন, *ইসলামে নারীর মর্যাদা এবং পারিবারিক সুব্যবস্থাপনা তাকে সবচাইতে বেশি আকৃষ্ট করেছে।*

www.pathagar.com

মুসলিম মহিলাদের সম্পর্কে তিনি বলেন, "We are the most protected women in America". (সূত্রঃ ফারইস্ট প্রেস ফিচার)

★ ★ ★

মার্কিন সমাজে যদি কোনো শ্রেণী সর্বাধিক নিরাপদ ও স্বস্তিতে থেকে থাকে, তবে তারা হলো মুসলমান স্ত্রী শ্রেণী। অনেকে একথা শুনে বিস্মিত হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারিণী সেসব মহিলার কণ্ঠে একথা বহুবার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে যাদের বিয়ে মুসলমান পুরুষদের সাথে হয়েছে। সেখানে একটা সাধারণ ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, মুসলমান স্বামীরা বিশ্বস্ত এবং নিজেদের পরিবার পরিজনের দেখা-শোনার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন হয়ে থাকে।

ইসলামী পারিবারিক জীবনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সম্প্রতি ৩৯ বছর বয়স্কা হাসপাতালের নার্স আমেরিকান তরুণী হাদীয়া ফিলিপ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি জোর দিয়েই বলেন যে, *'ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তিনি অত্যন্ত সুখী দাম্পত্য জীবন লাভ করেছেন।'* (সৌজন্যে ফারইস্ট প্রেস ফিচার)

★ ★ ★

লন্ডনে কর্মরত একজন ইটালীয় নও-মুসলিম মহিলা আইনজীবী মিসেস রবার্টা এক বক্তৃতায় বলেন, *'তিন বছর ধরে আমি ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি এবং অন্যান্য ধর্মের সাথে এর তুলনা করেছি। তিন বছর গভীর অনুসন্ধান চালানোর পরে আমি লন্ডনের এই ইসলামী সেন্টারে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি।*

অন্যান্য ধর্মে আমি দেখেছি- মানুষকে নিছক একটি উৎপাদন যন্ত্র হিসাবে গণ্য করা হয়। সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে মানুষ সম্পূর্ণ আলাদা। অপরদিকে, ইসলাম ধর্মে মানুষের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় দিকগুলো সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে, যা আমাদের নিজেদের তুলনায় আমাদের শিশুদের অধিক ইখতিয়ারাধীন।' (মাসিক দ্বীন দুনিয়া, সেপেটম্বর '৯৫)

উনচল্লিশ বছর বয়স্কা মাইমুনাহ্ একজন উচ্চ শিক্ষিত খৃষ্টান বৃটিশ মহিলা। ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। *'লন্ডন টাইমস'* কর্তৃক গৃহীত তার এক সাক্ষাতকারে বলেন, *তিনি খৃষ্ট ধর্মের সমস্ত ফের্কা নিয়ে গবেষণা চালান। ইহুদীবাদ, বৌদ্ধবাদ ও হরেকৃষ্ণের মতবাদ সম্পর্কে গভীর পর্যালোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইসলামকেই ধর্ম হিসাবে মনোনীত করেন।* (সূত্র ঃ লন্ডন টাইমস)

নও-মুসলিম ইটালী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ বিয়ানকো মালিয়া স্কারসিয়া বলেন, ... *মুসলিম নারীদের আমি চিনি সেই তরুণী কাল থেকে। আমার মত হলো মুসলিম নারীদের চিন্তার স্বাধীনতা রয়েছে। ইউরোপীয় কনফারেন্সে প্রদত্ত আমার বক্তৃতায় আমি বলেছি, ইসলামে দুটো বিশ্ব বিদ্যমান, যার একটি পুরুষের বিশ্ব, অন্যটি নারী-বিশ্ব। কিন্তু পশ্চিমে বিশ্ব একটিই- সেই বিশ্ব হলো নারী ও পুরুষের। আমাদের এখানে নারী তার চিন্তার ব্যাপারে পুরুষের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। শিক্ষিতা নারী পুরুষের চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী। কারণ নারী পুরুষকে বুঝতে পারে, কিন্তু পুরুষ নারীকে বুঝতে পারে না।*

... ইসলামের একটা দিক হলো চিন্তা, ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং অন্য একটি দিক হলো মানুষের জন্য দিক-নির্দেশনা। আমি মনে করি অন্য ধর্মের নারীগণ অত্যন্ত অগ্রগতি অর্জন করেছে, কিন্তু বিভিন্ন সমাজে এই অগ্রগতি একই রকম নয়।

ইসলাম প্রসঙ্গে বললে বলতে হয় সেখানে অন্য অনেক বিবেচ্য বিষয় রয়েছে, যেমন- আচরণ, অভ্যাস, রীতি-নীতি ইত্যাদি যা আপনাকে কিছু করার শক্তি যোগায়। ধর্ম হলো বিশ্বাস

www.pathagar.com

ও সংস্কৃতির সুনির্দিষ্ট এক পদ্ধতি। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বললে আমি বলবো– অন্য কোনো ধর্মই ইসলামের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারে না।

★ ★ ★

জার্মানী নও-মুসলিম রমণী যয়নাব কারীন বলেন, যেসব মুসলিম পরিবারের সাথে আমার যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিলো তারা ছিলো গতানুগতিক ধরনের মুসলমান। তারা ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী ছিলো না এবং এ কারণে ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দানে সক্ষম ছিলো না। ফলে আমি ইসলাম নির্দেশিত ধর্মীয় কার্যাবলীর অন্তরালে নিহিত দর্শন সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাতে বাধ্য হই। উদাহরণস্বরূপ, আমি একবার এক মুসলিম মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি ওড়না দ্বারা মাথা ঢাকছেন কেনো? জবাবে তিনি বললেন যে, একজন মুসলিম নারীকে ভালো মুসলমান হতে হলে তাকে অবশ্যই মাথা ঢাকতে হবে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তার এ জবাব আমার নিকট সন্তোষজনক ছিলো না। অগত্যা আমি বিভিন্ন বই-পুস্তক পড়ে হিজাবের দর্শন সম্পর্কে জানতে পারি। এ অধ্যয়ন থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, হিজাবের পেছনে নারীর নিরাপত্তার দর্শন নিহিত রয়েছে। কেননা হিজাবের কারণে নারী সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে অধিকতর উপস্থিতির স্বাধীনতা লাভ করে এবং খুব সহজেই স্বীয় সামাজিক তৎপরতা চালাতে সক্ষম হয়, অথচ বাহ্যিক মূল্যবোধসমূহ সেক্ষেত্রে কোনোই ভূমিকা পালনে সক্ষম হয় না। নারী হিজাবের কারণে যে নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হয় আমি স্বীয় কর্মস্থলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তা পুরোপুরি অনুভব করি। আমি প্রতিদিনই দেখতে পাই, যেসব নারী বাহ্যিক সাজগোজের ব্যাপারে চাপের মুখে থাকে তারা কিভাবে অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে এবং লাঞ্ছিত হচ্ছে। বিভিন্ন পত্রিকা-সাময়িকী সব সময় তাদেরকে উপদেশ বিলায়– তোমাকে এভাবে বা ঐভাবে পোশাক পরতে হবে এবং এভাবে বা ওভাবে সাজগোজ করতে হবে।

মোদ্দা কথা, বাহ্যিক সৌন্দর্য ও মনোহারিত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে নারীদের ওপরে বিভিন্ন ধরনের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এর পেছনে যে বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হয় সে কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু মানসিক ও আত্মিক দিক থেকে তারা কোনোরূপ নিরাপত্তাই অনুভব করে না, এমন কি কেউ যদি এর বিরোধীও হয়, তথাপি পরোক্ষ চাপের মাধ্যমে তাকেও এতে শামিল হতে বাধ্য করা হয়। কেননা অন্যথায় তাকে বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যাখ্যাত হতে হয়।

অবশ্য আমার নিকট সব সময়ই এই ফ্যাশন পূজা একটা দুঃসহ বোঝা বলে মনে হতো। আমি সব সময়ই নিজেকে এ জিঞ্জির থেকে মুক্ত করার পথ খুঁজছিলাম। অবশ্য ইতোমধ্যেই যেসব সমস্যার কথা উল্লেখ করেছি, সেসব কারণে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত আমিও সমাজের এ চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতাম, কিন্তু এ কারণে আমার খুবই খারাপ লাগতো।

শেষ পর্যন্ত এসব কারণে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। ২০ বছর বয়সে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করলাম।

অবশ্য ইসলাম গ্রহণের ফলে আমার অনেক আত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা ও মানসিক শূন্যতা দূর হলো। কিন্তু একই সাথে আমি কতোগুলো নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতে লাগলাম। কেবল ঈমানের বদৌলতেই আমি এসব সমস্যার মোকাবিলায় টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছি। অবশ্য সমস্যাবলীর বিরুদ্ধে আমার মধ্যে যে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে উঠেছিলো তা ছিলো খোদাপ্রেমের ফসলমাত্র। ফলে এতে না আমি কোনো চাপ অনুভব করেছি, না তা আমার কাছে কঠিন মনে হয়েছে।

★ ★ ★

আমেরিকার রেডিও-টেলিভিশনের অনুষ্ঠান পরিচালিকা নও-মুসলিম আমিনা আসলামী।

www.pathagar.com

তিনি কুয়েতে প্রকাশিত "আল মুজতামা" পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকার দেন।

প্রশ্ন ঃ *আপনার ইসলাম গ্রহণের মূল কারণটি কি? অর্থাৎ ইসলামের কোন দিকটি আপনাকে খৃষ্ট ধর্ম বর্জনে উৎসাহিত করেছে?*

উত্তর ঃ পশ্চিমা নারীদের জীবন হচ্ছে কাজের ভারে নুয়ে পড়া এক কঠিন ও চ্যালেঞ্জমুখর জীবন। এখানকার সকলেই চায় নারী হবে একজন আধুনিকা মা, উত্তম চাকুরে, উত্তম অফিসার। এক কথায় একজন আধুনিকা নারী। এরা হবে স্বাধীন। তারা কি ধরনের স্বাধীন হবে তা শিখানোর উদ্দেশ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত স্কুল-কলেজ। প্রতিটি স্কুল-কলেজই স্ব-স্ব আঙ্গিকে নারীদের স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। যেগুলোর মধ্যে থাকে উৎকণ্ঠ স্ববিরোধিতা। চতুর্মুখী আবেদনের শিকার নারীরা দিশেহারা হয়ে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত তারা ভাবতে বাধ্য হচ্ছে এসব আবেদনের বাইরে নারীর স্বকীয় সত্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছুই নেই। এমতাবস্থায় যখন তারা কুরআন অধ্যয়ন করে, ইসলামে দেয়া নারীর অধিকার সম্পর্কে অবহিত হয়, তখন তাদের কাছে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, ইসলামই নারী জাতিকে দিয়েছে সত্যিকার স্বাধীনতা। আর তা দিয়ে রেখেছে আজ থেকে সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছর আগে। যখন নারীরা এ ব্যাপরে কোনো ধারণাও রাখতো না। আজ পাশ্চাত্য জগতের নারীরা সমাজে নারীদের অধিকার কতোটুকু, করণীয় কতোটুকু, পরিবার পরিচালনায় তাদের ভূমিকা কি, মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়েদের উপর কি অধিকার, তাদের উপরই বা ওদের অধিকার কি, প্রভৃতি জটিল ও কঠিন প্রশ্নসমূহের উত্তর খুঁজছে। কিন্তু তাদের ধর্ম, তাদের সমাজ, তাদের বিজ্ঞান এসব প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে পারছে না অপরদিকে তারা ইসলামের এসব প্রশ্নের সুন্দর ও সঠিক উত্তর পেয়ে যাচ্ছে। আর এ জন্যেই ...। চিরন্তন সুখের অন্বেষায় আপন ধর্ম, আপন মা-বাবা-স্বামী-স্বজনকে ফেলে ইসলামের ছায়াতলে চলে আসতে দ্বিধা করছে না।

প্রশ্ন ঃ *পাশ্চাত্য ঘেঁষা কিছু আরব দেশসহ উন্নয়নশীল মুসলিম দেশসমূহে জোরালো প্রচারণা পাচ্ছে যে, পাশ্চাত্যের নারীরা স্বাধীন। আপনার মতে এ প্রচারণার সারসত্তা কতোটুকু?*

উত্তর ঃ পশ্চিমা নারীরা আদৌ স্বাধীন নয়। বরং তারা স্বাধীনতার নামে তৈরি প্রতারণার একশ' একটা শিকল দিয়ে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা। তারা স্বাধীনতার দাবী পূরণে এমনই ব্যস্ত যে, স্বাধীনতা কি ও কয় প্রকার তা নিয়ে ভাববার ফুরসতটুকুও পাচ্ছে না। তারা স্বাধীনতার ছদ্মাবরণে এমন সব বিধানের তারে শৃংখলিত, যেসব বিধানে রয়েছে পুরুষের একতরফা প্রাধান্য এবং তারা প্রকারান্তরে পুরুষের অধীনস্থ দাস। কেননা বিধান তাদেরকে বাধ্য করছে পুরুষের অধীনে থেকে নারী-স্বাধীনতা অন্বেষণ করতে এবং নারীর জীবনকে পুরুষের জীবনের ছাঁচে গড়ে তুলতে। বলুন, এটা কি নারী স্বাধীনতা হতে পারে? এহেন স্বাধীনতার ফলাফল হচ্ছে নারীরা পুরুষের কর্মক্ষেত্রে চলে যাবার দরুন প্রাণ প্রতিম বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারছে না। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলো– স্নেহ বঞ্চিত এই বালকেরা খুব ছোটকাল থেকেই আওয়ারা হয়ে উঠছে এবং পরিণত বয়সে পৌছার আগেই অপরাধ প্রবণতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। অপর প্রতিক্রিয়া হলো– মায়েরা সন্তানের এহেন পদস্খলন দৃষ্টে অন্তরে অন্তরে আহত হচ্ছে। তাদের মানসিক শান্তি তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে। নিজেদেরকে তারা অপরাধী ভেবে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এরপরও তাদের করার কিছু নেই। কেননা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বাইরে এসে যদি কোনো নারী তার সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ত হয় তাহলে সমাজ তাকে নিয়ে উপহাসে মেতে উঠে।

বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের নারীরা মিডিয়ার তৈরি অদ্ভুত নারীবাদী মানসিকতার শিকার। অথচ এ মানসিকতা বাস্তবের ঘোর বিরোধী। এ মানসিকতা নারীত্বের সাথেও প্রবল সাংঘর্ষিক।

www.pathagar.com

কিন্তু স্বাধীনতার অক্টোপাশে বন্দী নারীদের জন্যে পিছনে ফেরারও অবকাশ নেই। ফলে তারা অসহায়ভাবে নিজেদেরকে মিডিয়ার তৈরী নারীর আদলে গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। কিন্তু এটাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। কেননা মিডিয়ার তৈরী নারী হচ্ছে রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জাহীন কল্পনার ঔরসে ভূমিষ্ঠ অদৃশ্য আকৃতির নারী। আর বাস্তবের নারীর মধ্যে রয়েছে রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জার পাশাপাশি একটা খেয়ালী মন, একটা শক্তিশালী ইচ্ছা শক্তি। এটা পৃথক চাওয়া-পাওয়া। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা অধৈর্য হয়ে ওঠে এবং প্রকৃত স্বাধীনতার জন্যে উন্মুখ হয়ে খোঁজাখুঁজি করে।

প্রশ্ন ঃ *মুসলিম বিশ্বের তথাকথিত নারী স্বাধীনতাকামীদের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?*

উত্তর ঃ বেশ কিছুদিন ধরেই আমি ভাবছি কুয়েতসহ আরো কটা আরব রাষ্ট্রে ভ্রমণে যাবো এবং সেখানকার আমার বোনদেরকে এই ধ্বংসাত্মক শ্লোগান ও ষড়যন্ত্র থেকে দূরে থাকার আহবান জানাব। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি নিজেও ছিলাম প্রচলিত ধারায় স্বাধীনতা অর্জনের একজন উৎসাহী আহবায়ক। অতএব এক্ষেত্রের ভালো-মন্দ, করণীয় বর্জনীয় সম্পর্কে আমার স্পষ্ট একটা ধারণা আছে। আমি চাই আমার মুসলিম বোনেরা যেন এ কথাটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, পাশ্চাত্যে নারী স্বাধীনতা নামে যা চলছে তা আদৌ স্বাধীনতা নয় বরং স্বাধীনতার নামাবলী গাড়ে চড়ানো এই ব্যবস্থা মূলত নারীকে নিরূপদ্রব ভোগ করারই একটি কৌশল। আমি তাদেরকে বলতে চাই, যে স্বাধীনতার জন্যে তারা উন্মুখ সে স্বাধীনতা তাদের একমাত্র ইসলামই দিতে পারে। অন্য কোনো বাদ-মতবাদ নয়।

আসলে কথা হলো মুসলিম বিশ্বের যে ললনারা আধুনিকতার তাড়া খেয়ে নারী-স্বাধীনতার দিকে দৌড়াচ্ছেন, তারা যেমন পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতার প্রকৃতির খোঁজ রাখেন না, তেমনি ইসলাম সম্পর্কেও তাদের ধারণা নেই।

প্রশ্ন ঃ *আপনি তো অনেক দিন ধরেই আমেরিকান ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে জড়িত ছিলেন। অতএব, ইসলামের প্রশ্নে আমেরিকান মিডিয়ার দর্শনটা একটু খুলে বলবেন কি?*

উত্তর ঃ আমেরিকান মিডিয়া সাধারণতঃ বিষয়ভিত্তিক হয়ে থাকে। কিন্তু মুসলমানদের বড় দুর্বলতা হচ্ছে তারা সমকালীন মিডিয়ার চাহিদাটাই বুঝে উঠতে পারছে না। তাদের মিডিয়া আছে কিন্তু সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে তাকে পরিচালনা করতে জানে না। বড় ত্রুটি হলো কৌশলের অভাবে তাদের ভাষ্যকারদের বর্ণনায় থাকে সূত্রহীনতা ও স্ববিরোধিতা। অনেক সময় এই স্ববিরোধীতা টিভি পর্দায় ভেসে উঠে হাস্যকর পরিস্থিতির অবতারণা ঘটায় এবং এর বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরতার মারাত্মক হানি ঘটায়। এর ফলে যেসব আমেরিকান ইসলামের প্রতি উৎসাহী হন এবং ইসলামী মিডিয়ার মাধ্যমে কিছুটা ফায়দা-হাসিল করতে চান, তারা স্বাভাবিকভাবেই পিছিয়ে যান। মিডিয়ার দুর্বল উপস্থাপনা তাদেরকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। তাছাড়া অনেক সময় এমনও হয় যে, ইসলামের প্রতি আগ্রহীরা এমন সব মুসলমানের দ্বারস্থ হয়ে ইসলামকে বুঝতে চান যাদের নিজেদের মাথাটাই ইসলামের ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন নয়। তারপরও এরা তাদেরকে অভিজ্ঞ কারো শরণাপন্ন করার পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া বক্তব্য দিয়ে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিতে সহায়তা করে থাকেন। অতএব বলা যায়, এতে আমেরিকান মিডিয়ার তুলনায় মুসলমানদের ভুল প্রসেস এবং অবহেলাই অধিক দায়ী।

প্রশ্ন ঃ *পশ্চিমা দুনিয়ায় ইসলামের ভবিষ্যৎ কেমন?*

উত্তর ঃ মুসলমানদের কাজের সমন্বয়হীনতা, শত দুর্বলতা এবং পারস্পরিক দুঃখজনক অনৈক্যের পরও বলা যায়, পশ্চিমা দুনিয়ায় ইসলামের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। বর্তমানে খাস ইউরোপীয় পরিবারে এমনও মুসলমানদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে যারা ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থায়

www.pathagar.com

বসবাস করার পরও নিজেদেরকে ইসলামের সত্যিকার আদর্শে গড়ে তুলছেন। অনেক শিক্ষিত মুসলমান দাওয়াত দেয়ার কায়দা-কানুনও রপ্ত করে ফেলেছেন। তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে ইসলাম প্রগতির সিঁড়ি বেয়ে দিন দিন উর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে। তবে হাল্কা একটা বাধা হলো ওখানকার মানুষের ধারণা হচ্ছে দরিদ্র এবং নিঃসীম সমস্যায় জর্জরিত দিশেহারা লোকেরাই কেবল ইসলাম গ্রহণ করছে। কিন্তু এদের এ অনুভবটা আপাদমস্তক ভুলে ভরা। বরং প্রকৃত সত্য হলো শিক্ষিত, ডিগ্রীধারী, জ্ঞানী-গুণী সমাজই অধিক হারে ইসলাম গ্রহণ করছেন এবং তাদের অনেকে রাজনীতি সাংবাদিকতা এবং আইন ব্যবসার মতো সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত। এটাও পাশ্চাত্যে ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটা মাধ্যম হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আপনার ধারণায় ইউরোপে ইসলামী দাওয়া কাজের কোন্ পদ্ধতিটা সাফল্য বয়ে আনতে পারে?

উত্তর ঃ প্রথমেই যেটির প্রয়োজন অনস্বীকার্য তাহলো আমাদের ইসলামী জ্ঞানের আয়না হতে হবে দাগহীন, উজ্জ্বল। এরপর প্রয়োজনীয় বিষয়টি হলো দাওয়া কর্মীদের সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে হতে হবে ওয়াকেবহাল এবং এগুলোর সন্তোষজনক উত্তর দেয়ার জন্যে তাদের মধ্যে থাকতে হবে বিপুল প্রজ্ঞা। কেননা আমাদের মুসলিম সমাজের বড় অংশটা এখনো দ্বীনি এলেমে একেবারে বঞ্চিতই বলা যায়। তাছাড়া আমাদের মধ্যে বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী লোকের অভাবও খুব প্রকট। আমাকে প্রায়ই এ দিকটা ভাবিয়ে তুলে যে, কিভাবে ব্যক্তিত্ববান একদল লোক গড়ে তোলা যায়। কিভাবে আমাদের অজ্ঞদের কাছে ইসলামের বাণী তুলে ধরা যায়।

প্রশ্ন ঃ এই কিছুদিন আগে সমাপ্ত বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনের ব্যাপারে আপনার অবস্থানটা কি ছিলো?

উত্তর ঃ আমি সম্মেলনে যাইনি। যেতে অস্বীকার করেছিলাম। বলতে পারেন আমি সম্মেলন বয়কট করেছিলাম। এর অর্থ কিন্তু এটা নয় যে, আমি সেখানে উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ পাইনি। বরং একাধিক পত্র পেয়েছিলাম। তবে বয়কট করেছিলাম এই জন্যে যে, সম্মেলনের আলোচ্যসূচীতে ইসলামী ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী কতিপয় বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এ ব্যাপারে তারা কোনোই ভ্রূক্ষেপ করেননি। এই অন্যায় একগুয়েমি আমাকে আহত করেছিল। আর এ জন্যেই উপস্থিত হইনি।

আমি সম্মেলনের বেশ ক'জন আয়োজকের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তাদের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিলো। তাদের চরিত্র এবং ধ্যান-ধারণাও আমার অজানা ছিলো না। তাদেরকে বলেছিলাম, আমার সম্মেলনে অংশগ্রহণের অর্থ হবে এহেন মানবতা বিরোধী সম্মেলনকে ব্যক্তিগতভাবে না হোক নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছি, তবে আফসোস হচ্ছে এই যে, আমাদের কিছু সংখ্যক মুসলিম বোনেরা ওখানে উপস্থিত হওয়াকে নিজেদের গর্বের কারণ মনে করেছিলেন। আসলে তারা এই সম্মেলনের সুদূরপ্রসারী অসৎ উদ্দেশ্যের কিছুই জানতেন না। পাশাপাশি ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কেও তারা ছিলেন একেবারে রিক্ত।

প্রশ্ন ঃ এক সময় তো আপনি ছিলেন প্রচলিত ধারায় নারী স্বাধীনতার একজন উদ্যোগী আহবায়ক। অতএব এ পথে আপনার কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলুন?

উত্তর ঃ তখনকার সময়ে আমি পুরুষকে নারী জাতির প্রতিপক্ষ ছাড়া কিছু ভাবতেও রাজি ছিলাম না। আমার একমাত্র উদ্যোগ ও শ্লোগান ছিলো পুরুষের পিছনে থাকা যায় না। আমাকে তার মতো শক্তির অধিকারী হতে হবে। আমি মনে করতাম তারা যা পারে তার একটিও আমার দ্বারা অসম্ভব নয়। তারপরেও যখন তারা কোনো ব্যাপারে আমাকে ছাড়িয়ে যেতো তখন আমি

www.pathagar.com

তাদেরকে আমার শত্রু ভেবে বসতাম। কিন্তু অর্থহীন গর্ব করার নিরর্থক এ প্রয়াস চালানোর সময় যখন জানতে পারলাম নারীত্বই নারীর প্রধান গর্বের বিষয়, যা হওয়াই নারীর শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার প্রতীক, তখনই আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ঝেড়ে মুছে ইসলাম গ্রহণ করে নেই। অবশ্য প্রথম প্রথম নিজেকে অবরুদ্ধ খাঁচায় বন্দী এক প্রাণীর মতোই লাগছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সেটা কেটে গেছে। এখন আমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারি– আমি আর কোনো বসের কোনো অফিসারের অধীন নই। আমি এখন একটি স্বাধীন পরিবারের সম্মানিত নিরাপদ ও গর্বিতা সদস্যা। (আল মুজতামা, কুয়েত)

★ ★ ★

আমেরিকান মহিলা মেরি এলিজাবেথ কুইলিসি এখন সাবা। তিনি পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সাবা নাম গ্রহণ করেছেন। সাবা তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কাহিনী বিবৃত করেন সৌদি পত্রিকা 'আরব নিউজ'-এ। তিনি বলেন, *"এক গ্রীক পুরুষের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পর ১৯৮০ সালে আমার তিন সন্তানকে নিয়ে আমি পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করি।" তিনি বলেন, "ইসলাম সেই পবিত্র ধর্ম যা মানুষকে কখনো আঘাত দেয় না। আর সেখানে প্রতারণার কোনো স্থান নেই।"*

তিনি আরব নিউজ পত্রিকাকে জানান, *"আমি পাঁচ বছর ধরে ইসলামের উপর গভীরভাবে অধ্যয়ন করে জেনেছি যে, ইসলাম একটি শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। সেখানে পবিত্র জীবনাচরণের সাথে স্রষ্টার সান্নিধ্য গভীরভাবে অনুভব করা যায়। প্রতিবেশীদের সাথে ইসলামের জীবন ব্যবস্থা অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ এবং সুন্দর। এই সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে।"*

সাবা বলেন– *"আজ থেকে একশ' বছর আগের আমেরিকা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের কাছে গভীরভাবে ঋণী ছিলো। ইসলামের নীতি নৈতিকতা দ্বারা আমেরিকা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলো। কিন্তু এখন তা সম্পূর্ণ বিপরীত। বাস্তবিকই ইসলাম দিয়েছে এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম বড়কে সম্মান ও ছোটকে স্নেহ করার শিক্ষা দেয়। ইসলামের পারিবারিক বন্ধন খুবই পবিত্র ও সুন্দর। এ মূল্যবোধের কোনো তুলনা নেই। আমেরিকা পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে গেছে। মার্কিন সমাজে পারিবারিক বন্ধন খুবই শিথিল। সেখানকার মানুষেরা সর্বদাই পার্থিব সুখ লাভের সন্ধানে ফিরছে, ধর্ম পালনের ন্যায় পবিত্র কর্তব্যকর্ম তারা যেন একেবারে ভুলে গেছে।"*

★ ★ ★

পোল্যান্ডের এক মহীয়সী খৃষ্টান জীবনের আলো খুঁজে পেয়েছেন ইসলামে। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বলেছেন, *"আমি আঁধারের সাথে বেশিদিন সমঝোতা করতে পারিনি। আঁধারের সাথে সমঝোতা হয়ও না। আমি আলোর সন্ধান পেয়েছি। ইসলাম আমাকে আলো দিয়েছে। আলোকময় জীবনের সন্ধান দিয়েছে।*

ইসলামের সুশীতল ছায়ায় দাঁড়িয়ে নিজের অতীতের কথা বলছেন এইভাবে– ...মুহূর্তে সকল স্বজন বিজন হলো। কিন্তু আমার বাবা ধরলেন ভিন্ন পথ। তিনি আমাকে বললেন, তুমি মুসলমান হলেও আমারই মেয়ে। তুমি তোমার পছন্দ মতো থাকার জায়গা দেখতে পারো। আমার আপত্তি নেই। আমার বাবার চারিত্রিক বোধ ও মানবিক আচরণে আমি অনেকটা সান্ত্বনা পেলাম। তিনিও আমাকে প্রবোধ দিতে লাগলেন মেয়ের মতোই। তারপর থেকে আমি আলাদা আছি। আমার প্রতিটি মুহূর্ত এখন ইসলামের ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত। আমি কেবল সেই কৃতজ্ঞতা নিয়েই ব্যস্ত। আর তাঁর শুকরিয়া করবোই না কেনো। তিনিই তো আমাকে কোরআনের

www.pathagar.com

নেয়ামত দিয়েছেন। ঈমানের মতো সম্পদ দিয়েছেন। যে দিন থেকে আমার পারিবারিক দরোজা রুদ্ধ হয়েছে সেদিন থেকে করুণাময়ের দরোজা খুলে গেছে। রহমত অবিরত বর্ষিত হচ্ছে। সুখের পুলকে আমার ভেতরটায় সদা অনাবিল তৃপ্তির মৃদু বায়ু বয় আর স্বপ্ন জাগে– আহা! পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যদি সাক্ষাৎ পেতো এ সুখের, এ তৃপ্তির। আঁধারের পর্দা পেরিয়ে তারাও যদি বেরিয়ে আসতে পারতো ভোরের নির্মল আলোক মেলায়– ইসলামের সকাশে।"

★ ★ ★

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে একটি চাঞ্চল্যকর এবং সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনার জন্ম দিয়েছেন মার্কিন নও-মুসলিম মহিলা আনজুম স্মিথ। তিনি ওয়াশিংটনে মার্কিন সিনেট কমিটিতে ঐতিহ্যবাহী ইসলামী পোশাক পরিহিত হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন– 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' বলে। সাথে সাথে তিনি ইংরেজি অনুবাদ দেন– "In the name of Allah..." অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি অসীম দয়ালু অতীব কৃপাবান। তারপর তিনি তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন এবং জোর দাবী করেন যে, মার্কিনী মুসলিম মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা পালনের স্বপক্ষে আইন পাস করতে হবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন বিমান কোম্পানীতে যে সব মুসলিম বিমানে কাজ করেন তাঁদের বিমানের ইউনিফর্মের সাথে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও মাথায় স্কার্ফ ব্যবহারের দাবী মানতে হবে। তাঁর এ প্রস্তাব সিনেটের লেবার ও হিউম্যান রিসোর্স কমিটির বহু সংখ্যক সদস্যের দ্বারা সমর্থিত হয়। ভার্জিনিয়ার বিমান কর্তৃপক্ষ তাঁর এ দাবী মেনে নেয়ার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে। মার্কিন বিমান কর্তৃপক্ষ তাঁর দাবী প্রথমে মানতে অস্বীকার করে। পরে শর্ত সাপেক্ষে তাঁর দাবী মানার কথা বললে আনজুম স্মিথ বলেন, এ দাবী নিঃশর্তভাবে মানতে হবে। আনজুম স্মিথ আরো বলেন, মার্কিনী বিমান সংস্থাগুলোতে প্রার্থনাদি করার জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। আনজুম স্মিথের এ দাবী মার্কিন সমাজে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে।

★ ★ ★

স্কটল্যান্ডের নও-মুসলিম মহিলা মাবা সারা বলেন, বৃটিশ সমাজ এতো দ্রুত খারাপের দিকে গিয়েছে যে, জনগণ নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানে না। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব এবং পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে যাওয়াই এর কারণ বলে তিনি মনে করেন। *মারে বলেন, তুলনামূলকভাবে ইসলাম আশার বাণী শোনায়। এই ধর্মাবলম্বীদের পারিবারিক কাঠামো অটুট এবং নৈতিক নীতি নিয়মগুলো সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত রয়েছে। এটি জীবনে চলার পথে কষ্টিপাথর হিসেবে কাজ করে। সমাজতত্ত্ববিদরা বলেছেন, মারে অনেকানেক বৃটিশ মহিলাদের মনোভাবই প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, অনেকেই নতুন একটি নীতিমালার সন্ধান করছেন এবং ইসলামের মধ্যে এর সন্ধান পেয়েছেন। ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজের পরিচালক মাশুক আলী বলেন, ধর্মান্তরিত হবার পর ইসলাম পথভ্রান্ত পরিবারকে নিরাপত্তার সন্ধান দেয়। তিনি বলেন, যারা গির্জার প্রতি আস্থা হারায় তারা জীবন পথে চলার জন্য পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট নির্দেশ লাভের জন্য ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ে।*

একটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের যুবতী শ্রীমতি দিপালী রাণী সরকার মুসলিম নাম সুফিয়া আক্তার নামে ১৯৯১ সাল ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে তাঁর একটি সাক্ষাৎকার স্থানীয় মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারটি নিম্নরূপ ঃ

প্রশ্ন ঃ *একটি শিক্ষিত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও আপনি কেনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন?*

উত্তর ঃ আমি একজন শিক্ষিতা মেয়ে। সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা আমার

www.pathagar.com

আছে। অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ইসলাম ধর্ম শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে বলে আমি ১৯৯১ সালের ১১ আগস্ট ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি।

প্রশ্ন ঃ *হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে কি পার্থক্য আপনি লক্ষ্য করছেন?*

উত্তর ঃ আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্যটি লক্ষ্য করেছি, তা হচ্ছে হিন্দু ধর্মে লোকেরা নানা দেব-দেবীর উপাসনা করে, যার কোনো অস্তিত্ব নেই। আর ইসলাম ধর্মে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করে না বা স্বীকার করে না। এর চেয়ে বেশি জানার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

প্রশ্ন ঃ *কখন থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সিদ্ধান্ত আপনি নিয়েছিলেন?*

উত্তর ঃ এসএসসি পরীক্ষার পর থেকে আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং ১৯৯১ সালের ১১ই আগস্ট ইসলাম গ্রহণ করি, তার সাথে সাথে আমার বিয়েও হয়ে যায় একটি মুসলিম পরিবারের এক নবীন যুবকের সাথে।

প্রশ্ন ঃ *আপনি ইসলাম গ্রহণ করে নিজেকে কেমন মনে করছেন?*

উত্তর ঃ ইসলাম গ্রহণ করে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করছি এবং নরক থেকে স্বর্গের সন্ধান পেয়েছি। আল্লাহর হুকুমে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও মহাগ্রন্থ আল-কোরআন তেলাওয়াত করতে পারছি বলে নিজেকে ভাগ্যবান রমণী বলে মনে করছি।

প্রশ্ন ঃ *আপনার বর্তমান জীবন সুখের মাধ্যমে চলছে তো? স্বামীর পরিবারের লোকজন আপনাকে আদর করেন নিশ্চয়ই?*

উত্তর ঃ সুখ-দুঃখ তো আল্লাহর দান, সম্পূর্ণ সুখ কি এই নশ্বর পৃথিবীতে কেউ পায়? তথাপি বলা যায়, পূর্বের চেয়ে বর্তমানে আমি মহাসুখী। আর স্বামীর পরিবারবর্গ যে আমাকে কতোটুকু আদর স্নেহ করেন তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। তাদের কাছ থেকে যে আদর স্নেহ আমি পাচ্ছি তার শুকরিয়া আদায় করার ভাষাও আমার নেই। (মাসিক দাওয়াতুল হক)

★ ★ ★

আমেরিকার মডেল কন্যার ইসলাম গ্রহণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলেন, মুসলমানদের হিংস্র, গোঁয়ার মূর্খের মতো কতো অসভ্য ভাষণে দুষ্ট করছে। কিন্তু কোথায়? এই আমেরিকান সমাজে বেড়ে উঠা এই সমস্ত কালো চামড়ার মুসলমান যুবকদের ভিতর তো আমি কোনো ত্রুটি, কোনো মন্দই খুঁজে পাচ্ছি না; বরং অন্য সমস্ত ছাত্রদের তুলনায় তারা ছিলো স্বতন্ত্র। তাদের আচার-ব্যবহার চাল-চলন সবই ছিলো মার্জিত, ভদ্র ও সুনিয়ন্ত্রিত। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, আমি ইসলামের উপর পড়াশুনা করবো। ইসলাম ধর্মের শক্তির উৎস কোথায় তা জানার চেষ্টা করব। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি সর্বপ্রথম কোরআন শরীফের ইংরেজী অনুবাদ পড়তে শুরু করলাম। আমার আশ্চর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো যখন দেখলাম পবিত্র কোরআন শুধু আমার মনেই নয়, আমার মস্তিষ্কেও করাঘাত করতে শুরু করেছে। খৃষ্টান ধর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা এবং বাইবেলের পড়াশুনার মাঝে মাঝে আমার মনে এমন অনেক প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে, যার সুদত্তর আজ পর্যন্ত কোন পাদ্রী, ধর্মীয় কোনো গুণীজনের কাছ থেকে পাইনি। এই অপূর্ণতা বোধ আমার আত্মার জন্য একটি সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কোরআন পড়ার পর আমার সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। যা জ্ঞান বুদ্ধি এবং বিচার বিবেচনার নিক্তিতে সম্পূর্ণ সঠিক। কৌতুহল দমন করার জন্য আমি আমার ক্লাশের মুসলিম যুবকদের সাথে আলোচনা শুরু করলাম এবং ইসলামের ইতিহাস পড়তে লাগলাম। মনে হলো আমি এতোদিন তিমির আঁধারে নিমজ্জিত ছিলাম। আলোর হাতছানি ভেবে সারাজীবন শুধু অন্ধকারেই

www.pathagar.com

হাতড়িয়েছি। ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে আমার ধারণা, আমার মনোভাব আগাগোড়াই ভ্রান্ত ছিলো।

আরো বেশি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী এবং তাঁর পথ নির্দেশনা পড়তে আরম্ভ করলাম; তখনই জানতে পারলাম যে, আমেরিকান লেখকদের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব মানবতার সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী একজন সত্যিকার মহামানব ছিলেন। বিশেষ করে নারী জাতিকে তিনি যে মর্যাদা এবং সম্মান দান করেছেন তার কোনো দৃষ্টান্ত পূর্বেও ছিলো না পরেও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পরিবেশ পরিস্থিতি মানুষকে অনেক সময় অনেক কিছু করতে বাধ্য করে যা প্রকৃতপক্ষে তার মনের বিপরীত হয়। সেই পরিবেশেই আমাকে মডেলিং পেশায় জড়িয়েছে। আমাকে খোলামেলা চলতে অভ্যস্ত করে তুলেছে। অন্যথায় জন্মগতভাবেই আমি অত্যন্ত লজ্জাবতী মহিলা, স্বামী ছাড়া কারো সাথে মেলামেশা পছন্দ করি না। তাই যখন দেখলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন, বিশেষতঃ মহিলাদেরকে লজ্জা এবং পবিত্রতার ভিতর অবস্থান করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন তখন আমি নিজের ভিতর এক পরিবর্তন অনুভব করতে পারলাম।

মহিলাদের মর্যাদা তিনি কি পরিমাণ সমুন্নত করেছেন একটি হাদীস দ্বারাই তার কিঞ্চিত অনুমান করা যায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত" এই বাণী আমার মনের ভিতর এক নতুন সুবাতাস প্রবাহিত করতে লাগলো। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি- যে নিজের স্ত্রী এবং পরিবারের লোকজনের সাথে ভালো ব্যবহার করে।

পবিত্র কোরআন, নবীর শিক্ষা-দর্শন জেনে আমি যখন তৃপ্ত হয়ে গেলাম, ইসলামী ইতিহাস পড়ে এবং আমার ক্লাশের যুবকদের আচরণে যখন মুসলমানদের সম্পর্কে আমার ভ্রান্তি কেটে গেলো, আমার আত্মা যখন সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলো তখনই আমি মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। আমি যখন এই সিদ্ধান্তের কথা সেই মুসলিম ছাত্রদের জানালাম তখন তারা চারজন দায়িত্বশীল লোক নিয়ে আসলো। তাদের ভিতর একজন ছিলেন মসজিদের ইমাম। আমি তাদের কিছু প্রশ্ন করলাম এবং মুসলমান হয়ে গেলাম। (মাসিক মদিনা, ৩৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৩১-৩২ পৃঃ)

আমেরিকান খৃষ্টান কে রোল এল এনওয়ে-এর গবেষণা "আমাদের মেয়েরা কেনো ইসলামের প্রতি অনুরক্ত"

যখন আমাদের এক মেয়ে এক মুসলিম যুবককে বিয়ে করলো তখন আমাদের এ মর্মে কোনো ধারণাই ছিলো না যে, মুসলমান হওয়ার অর্থ কি। তবে একথা সত্য যে, গীর্জার স্কুলে পড়ালেখার সময় কখনো কখনো আমরা ইসলাম সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছিলাম। আমাদের ধারণা ছিলো যে, ছেলেটি মুসলিম পরিবারের সদস্য আর আমরাও একটি ধর্মীয় পরিবারের সদস্য, তাই সে হয়তো খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হবে।

তারা (স্বামী-স্ত্রী) একটি কলেজে ভর্তি হলো। টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগের দ্বারা এবং মাঝে মধ্যে সংক্ষিপ্ত সফরের সময় আমরা আমাদের মেয়ের মধ্যে একটি পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করলাম।

ঠিক এভাবেই তাদের বিয়ের দেড় বছর পর একবার সপ্তাহান্ত দিনে আমাদের মেয়ে

www.pathagar.com

আমাদেরকে একটি নতুন সংবাদ শুনিয়ে দিলো অর্থাৎ সে মুসলমান হয়ে গেছে। সে এও ব্যাখ্যা দিলো যে, সে তার স্বামীর কথায় পড়ে মুসলমান হয়নি, বরং সে বুঝে শুনেই ইসলাম কবুল করেছে। তবে আমাদের কন্যা এ মর্মে আশ্বস্ত করলো যে, সে আমাদের প্রত্যাখ্যান করবে না। আমরা তাকে যতটুকু শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েছি সেটাকে সে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করলো এবং বর্তমানে সে তার জীবনকে এই নতুন পথেই পরিচালিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এখন আমাদের জগত তার জগত থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে হলো এবং আমরা গভীর দুঃখ ও হারিয়ে যাবার বেদনায় কাতর হয়ে পড়লাম। ইতোমধ্যে সে ধন্যবাদযোগ্য সপ্তাহান্ত দিনের পর ১২টি বছরই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, আমরা সে বিচ্ছেদ-বেদনার মর্মদাহ থেকে উপশম লাভ করলাম। আমরা আমাদের কন্যা এবং তার স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করলাম এবং আমাদের মেয়ে যেটা পছন্দ করেছে তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করলাম।

আমেরিকা বা অন্য সব দেশের যেসব মেয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে এবং যারা আমার মেয়ের বান্ধবীরূপে ইতোপূর্বে পরিচিত হয়েছে– তাদের আচরণে আমি বিশেষভাবে মুগ্ধ হলাম। মেয়েরা যে কতো দৃঢ় ও মজবুত শৃঙ্খলার অধিকারী হতে পারে এবং তা লালন করতে পারে তা আমি প্রত্যক্ষ করলাম। আর এ কারণেই আমি এ ধরনের মুসলিম মেয়েদের সম্পর্কে জানতে এবং তাদের কথা শুনতে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠলাম।

আমেরিকা ও কানাডার যেসব মেয়ে ইতোমধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য গত দু'বছর আগে আমি একটি জরিপ-প্রকল্প তৈরী করি। বিভিন্ন ইসলামী সম্মেলনে আমি প্রশ্নমালা বিতরণ করলাম এবং ইসলামিক সিস্টার ইন্টারন্যাশনাল বিজ্ঞাপন দিলাম এবং যারা প্রশ্নমালা ফাইলবন্দী করলো তাদের পরামর্শ অনুযায়ী বাছাইকৃত নামগুলোকেই গ্রহণ করলাম।

মোট ৩০০টি প্রশ্নমালা বিতরণ করা হলেও ১টি প্রদেশ এবং ১৬টি অঙ্গরাজ্য থেকে ৫৩টি ফেরত পাওয়া গিয়েছিল। এদের সকলেই সে কাহিনী বলতে আগ্রহী ছিলো– যে কারণে তারা মুসলিম হয়েছিল। তারা খৃষ্ট ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ের পর্যালোচনা করলো, ইসলামী জীবনাদর্শ কিভাবে তাদের জীবনে অনুশীলন করছে তার ব্যাখ্যা দিলো। এছাড়া তারা একজন স্ত্রী, একজন মা, একজন ছাত্রী অথবা একজন কর্মজীবী হিসাবে কিভাবে সম্ভাব্য ভূমিকা পালন করছে তার বর্ণনাও দিলো। ইসলামের মধ্যে তারা যে মনোবল ও শক্তি খুঁজে পেয়েছে সে সম্পর্কেও ব্যাখ্যা দান করলো। এদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট থেকে ডাক্তার পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের মেয়েই ছিলো। যখন তারা আমার এ প্রশ্নমালার উত্তর দিয়েছিল (সেপ্টেম্বর '৯৩–জুলাই '৯৪) তখন এদের মধ্যে এমন সাতজন মেয়ে ছিলো যারা উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কাজ করছিল। তারা ছিলো ২১ থেকে ৪৭ বছর বয়স্কা মহিলা। এদের অনেকেই ৬ মাস থেকে ২১ বছরের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।

আনুমানিক এদের শতকরা ৪০ জনই ঘরের বাইরে পূর্ণ সময় অথবা খন্ডকালীন সময়ে কাজ করে থাকে। এদের মধ্যে দু'জন মহিলা এমন যারা বাড়ীতেই গৃহকর্মে নিয়োজিত থাকে। এদের শতকরা ১২ জন কলেজ ডিগ্রী অর্জন করা পর্যন্ত কাজ করে থাকে। এসব মেয়ে ইসলামের সাধারণ বিধানগুলোকে যথারীতি পালন করে এবং তাদের সকলেই হিজাব পরিধান করে; এদের মধ্যে দু'জনকে এমন পাওয়া গেছে যারা সর্বক্ষণই হিজাব ধারণ করে। এ জরিপ থেকে এটা পরিদৃষ্ট হয়েছে যে, এরা সকলেই দৈনিক নির্ধারিত নামাজ আদায় করছে, রমজানের রোজা রাখছে এবং ইসলাম সম্পর্কে নিয়মিত লেখাপড়া করছে। পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমসমূহে ইসলাম সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক ও বিরূপ কাহিনী শ্রবণ করা সত্ত্বেও ইসলামী জীবনাদর্শের আলোকে জীবন যাপন করার মধ্যে তারা শান্তি খুঁজে পাচ্ছে।

www.pathagar.com

জরিপে এটাও প্রত্যক্ষ করা গেছে যে, এসব মহিলার শতকরা ৯০ ভাগই বিবাহিতা।

আমি যখন আমার এ গবেষণাকর্ম শুরু করি তখন এটা ধারণা করা হয়েছিল, যেসব মেয়ে মুসলিম পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তারা হয়তো চাপের মুখেই ইসলাম গ্রহণ করছে; কিন্তু পরে আমার এ ধারণা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। কারণ আমি দেখেছি, অনেক মেয়ে বিয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইসলামের সঙ্গে পরিচিতি লাভের পর অনেক মহিলাই মুসলিম পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তবে আমাদের জরিপে এমন একজন মহিলার সন্ধান পাওয়া গেছে, যে ধর্মান্তরিত হয়েছে বটে, তবে একজন অমুসলিমকে বিয়ে করেছে।

একজন আমেরিকান মুসলিম কন্যার মাতা-পিতা হিসাবে আমি ও আমার স্বামী এটা অনুভব করতে পারছি যে, এ দু'টি পথের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের কন্যা একটি উত্তম মূল্যবোধই গ্রহণ করেছে, সে একজন ভালো মুসলমান ও সংসারী হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তার রয়েছে চমৎকার শিক্ষা-দীক্ষা এবং অন্যের সেবা করার জন্য তার সদিচ্ছাও রয়েছে।

★ ★ ★

লন্ডনভিত্তিক একটি পত্রিকা 'আল কুদস'-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বৃটেনের উচ্চ শিক্ষিতা ইংরেজ নও-মুসলিম নারী বুশরা বলেন, "ইসলামে শক্তিশালী নৈতিক মূল্যবোধ এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রয়েছে। ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যকে আমি পছন্দ করি। ইসলামে ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতা রয়েছে। সে জানে তার অবস্থান কোথায় এবং তার অধিকার ও কর্তব্য কি কি? বিবাহপূর্ব যৌন সম্পর্ক নিয়ে ক্যাথলিকরা বিরাট সমস্যার সম্মুখীন। কিন্তু ইসলামে এই সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান রয়েছে। সেটা হলো- কোনো নারী তার স্বামী ছাড়া অন্য কারো সাথে যৌন সম্পর্ক গড়তে পারবে না।

ইসলামে একজন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি যত্নশীল। স্ত্রীর দেখাশোনার দায়িত্ব তার। বিশেষ করে যে বিষয়টার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে সেটা হলো আমার সম্পত্তির অধিকার আমার নিজের। খুশীমতো আমি এর ব্যবহার করতে পারি। স্বামীর মতো স্ত্রীর ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষিত থাকার ফলে দাম্পত্য জীবনে একটি সমঝোতা সৃষ্টি হয়, সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।" (ইরানী পত্রিকা অবলম্বনে)

★ ★ ★

লন্ডনের একটি বিনিয়োগ কোম্পানীর কর্মকর্তা 'বাশিরা ওয়েন' ২৩ বছর আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, *"আপনি যদি বর্ণশ্রেণীর (অশ্বেতাঙ্গ) হন, তাহলে নিজের অধিকার রক্ষার্থে বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে আপনি প্রতিবাদ করতে পারেন। কিন্তু বৃটিশ শ্বেতাঙ্গ মুসলমানদের এই অধিকার নেই। উদাহরণ স্বরূপ আমার কথাই বলা যায়। আমি অনেকবার একটি চাকরীর জন্যে দরখাস্ত করেছি। কিন্তু শুধু মুসলিম হওয়ার অপরাধে আমি বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছি।"* (ইরানী পত্রিকা অবলম্বনে)

স্কটল্যান্ডের ছত্রিশ বর্ষীয়া নও-মুসলিম মহিলা 'ন্যুরিয়্যাহ' পাশ্চাত্য মহিলাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে বলেন, *"Most of the women in this country are traitors to their sex. Its almost as if we have been defeminised."*

অর্থাৎ *"এদেশে অধিকাংশ মহিলা নিজেদের কামনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। আর এ আচরণটি অনেকটা সে রকম যেমন আমাদের কাছ থেকে আমাদের নারীত্বই কেড়ে নেয়া হয়েছে।"*

নুরিয়্যার অন্য এক বান্ধবী হাসসানাহ ১৯৮৮ সালে মুসলমান হন। তিনি পর্দা ব্যবস্থা মেনে

www.pathagar.com

চলেন এবং বলেন, "আমি অন্ততঃ নিজের সেক্স-এর বিদ্রোহী নই।"

পর্দা ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, *'এর দরুণ আমরা নিরাপত্তা অনুভব করি এবং আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।'* নুরিয়্যাহ বলেন, *'এখন পর্যন্ত পাশ্চাত্যে এ বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে যে, বিয়ের সময় এবং তার পরে মহিলাদের নামটি পর্যন্ত পুরুষদের অধীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইসলাম আমাদেরকে সম্পূর্ণ পৃথক অধিকার দান করেছে।'* এ প্রসঙ্গে তিনি সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, সন্তানদের অভিভাবকত্ব প্রভৃতির ব্যাপারে ইসলামী বিধানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, *অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়– এদেশে (বৃটেনে) মহিলাদের কোনো ভবিষ্যত নেই। মহিলাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত করুণ।*

"Scratch any 'new man' and you find an old man trying to get out, men will always be the same, Women are changing much faster, but they are not trying to get that they want. Everything the feminist movement is aiming for, except abortion and lesbianism wine got."

অর্থাৎ *"যে কোনো একজন নতুন পুরুষ মানুষকে খুঁটিয়ে দেখুন, ভেতর থেকে পুরনো পুরুষটি বেরিয়ে আসবে। পুরুষরা সব সময়ই এক রকম, নারীরাই শুধু দ্রুত বদলাচ্ছে। কিন্তু যা কিছু তাঁরা পেতে চাইছে, তা অর্জন করতে তাঁরা চেষ্টা করছে না। 'নারীত্ব' (Feminism)-এর আন্দোলন যে উদ্দেশ্যে প্রয়াস চালাচ্ছে। তার মধ্যে গর্ভপাত এবং সমকামিতা ছাড়া অন্য সবকিছুই আমরা প্রথম থেকেই 'ইসলামে' পেয়ে গেছি।"* (সূত্র ঃ London Times)

★ ★ ★

জার্মানী থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত পত্রিকা 'দের শাপ্পীল'–এর সাম্প্রতিক তিনটি সংখ্যায় ধারাবাহিক তিন কিস্তিতে "জার্মানীতে ইসলাম" শীর্ষক এক গবেষণা নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিগত কয়েক মাসে আট হাজার জার্মান মহিলা ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করে নিয়েছে। এতো অল্প সময়ে এহেন বিপুল সংখ্যক লোকের ইসলাম গ্রহণের কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে পত্রিকাটি লিখেছে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক এবং এতে প্রত্যেকটি কাজের জন্য একেকটি বিধি-বিধান এবং দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে। এতে যেমন এবাদত উপাসনার রীতি-নীতির বর্ণনা রয়েছে, তেমনি পোশাক-পরিচ্ছদের ধরন-ধারণ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। এতে যেমন জীবনাচার সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তেমনি খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, চলাফেরা ও বিয়ে-শাদীসহ অন্যান্য যাবতীয় মানবিক চাহিদাদি পূরণ করারও দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

★ ★ ★

জনৈক জার্মান স্কলার জিজালিভা মোর্স জার্মান মহিলাদের ব্যাপক ইসলাম গ্রহণের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা নৈতিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে, মানুষ হিসাবে মানুষের পরস্পরের উপর কিছু অধিকার নির্ধারণ করেছে এবং জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের জন্য বলিষ্ঠ নীতিমালা ও সুষ্ঠু আইন প্রণয়ন করে দিয়েছে। সুতরাং এ কারণেই জার্মান মহিলারা নিজেদের জন্য ইসলামকেই অপরিহার্য ধর্মমত বিবেচনা করেছে। তারা এরই আলোকে নিজেদের যাবতীয় সমস্যা ও জটিলতার সমাধান অন্বেষণ করতে চায়।

জার্মানী থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত এই পত্রিকা 'দের শাপ্পীলে' ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন বিশিষ্ট জার্মান মহিলার দৃষ্টিভঙ্গীও তুলে ধরা হয়েছে। পত্রিকাটি লিখেছে ঃ

জনৈক নও-মুসলিম মহিলা বলেছেন, মানব জীবনের সাথে যে সুগভীর সম্পর্ক ইসলামের রয়েছে তেমনটি অন্য কোনো ধর্মের নেই। মহিলাটি বলেছেন, ইসলাম কবুল করার পরই প্রথমবারের মতো আমি অনুভব করতে পেরেছি যে, আমিও একজন মানুষ।

www.pathagar.com

অপর এক নও-মুসলিম মহিলা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় নিজের ইসলাম গ্রহণের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, একজন মুসলমান 'দায়ী' অর্থাৎ ইসলামের দা'ওয়াত দানকারী যখন নিতান্ত সরল-সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে আমার সামনে ইসলামকে তুলে ধরলেন, তখন তার সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করার মতো কোনো কারণ আমি দেখতে পেলাম না। তারপর ইসলামের সাথে পরিচিত হওয়ার পর মনে-প্রাণে নিষ্ঠার সাথে আমি তা গ্রহণ করে নিলাম।

অন্য আরেক নও-মুসলিম মহিলা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের উপর নিজের অনুবর্তিতার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, আমি ইসলামী ফরজসমূহের উপর গুরুত্ব সহকারে আমল করে থাকি, অফিসেও সাথে জায়নামাজ রাখি যাতে কাজের ফাঁকে নামাজ আদায় করে নিতে কোনো অসুবিধা না হয় এবং কিছুতেই যেন নামাজ কাজা না হয়।

জার্মানীর বিখ্যাত এক নও-মুসলিম গায়িকা তার ইসলাম গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা নারীদের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত, তাদের অধিকারের সংরক্ষক এবং তাদের সম্মানের জামানতদার। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে নারীদের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আইন প্রণয়ন করেছে এবং তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নীতি নির্ধারণ করেছে।

এ ছাড়া মুসলমান হননি এমন জার্মান মহিলারাও স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন মুসলমান যুবককেই সবচাইতে বেশি কামনা করে থাকেন। তাদের যুক্তি হলো- মুসলমান যুবকদের নৈতিক চরিত্র, আচার-আচরণ, পৌরুষ সবদিক থেকেই তারা খ্রীষ্টান ও অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক উন্নত। ইউরোপ, আমেরিকার প্রায় ৬০% পুরুষই মাতাল, দুরাচারী ও পুরুষত্বহীনতায় ভোগে বলে এদের পারিবারিক জীবনে চরম অশান্তি বিরাজমান।

★ ★ ★

যদিও বলা হয় যে, পাশ্চাত্য মহিলারা পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে এবং নিজেদের এ আগ্রহ থেকে সরে আসা তাদের জন্য কঠিন ব্যাপার, কিন্তু বৃটেনের যেসব নও-মুসলিম মহিলার সাথে 'লন্ডন টাইমস' কথাবার্তা বলেছে, তারা বলেছে- আমাদের জন্য ইসলামের সবচেয়ে বড় আকর্ষণই এটা যে, ইসলাম পুরুষ ও মহিলাদের উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক বলয় সাব্যস্ত করে দিয়েছে, যা উভয় শ্রেণীর মনো দৈহিক গঠনের একান্ত উপযোগী। তাদের মতে, পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলন (Feminism) প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের মাঝে বিদ্রোহেরই নামান্তর ছিলো। "নারী স্বাধীনতা আন্দোলন" সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সেসব মহিলা বলেন, "এর উদ্দেশ্য এছাড়া আর কিছুই নয় যে, Women Coping men and exercise in which womenhood has no intrinsic value.

অর্থাৎ মহিলাদের জন্যে পুরুষদের অনুকরণ এমনি কাজ যাতে নারীত্বের নিজস্ব কোনো মান-মর্যাদাই অবশিষ্ট থাকে না।"

লন্ডন টাইমস লিখেছে, বহু নও-মুসলিম মহিলা ইসলাম ও পাশ্চত্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেছে, ইসলামী শিক্ষায় মহিলা সম্প্রদায়কে অধিকতর পবিত্রতা ও সম্মান দেয়া হয়েছে যা পাশ্চাত্যে তারা পায় না। তাছাড়া তাদের দৃষ্টিতে নারীদেরকে দ্বিগুণ বোঝার তলায় দাবিয়ে দেয়া ছাড়া পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের ফল আর কিছুই হয়নি। পত্রিকার ভাষায় ঃ

"Many Muslims contrast the status of women in Islam with what they see as the dismal plight of women in the west. They note that here women work full-time out of financial necessity, remaining lumbered with the house work and children care. It is a puzzling version of emancepation."

অর্থাৎ *"অনেক মুসলমানই ইসলামে নারীর মর্যাদাকে পাশ্চাত্যে পরিদৃষ্ট নারীদের দুঃখজনক*

www.pathagar.com

দুরবস্থার সাথে তুলনা করেন। তাতে দেখা যায়, এখানে (পাশ্চাত্যে) নারীরা নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য সার্বক্ষণিক বৈষয়িক পেশা অবলম্বন করা সত্ত্বেও গৃহকর্ম ও শিশু পরিচর্যার দায়-দায়িত্বের বোঝাও যথারীতি তাদেরই ঘাড়ে চেপে থাকে। এটা 'নারী স্বাধীনতা আন্দোলন'-এর একটি লক্ষণীয় বিষয় বটে।'"

'লন্ডন টাইমস' এমনি ধরনের বেশ কিছু সাক্ষাতকার প্রকাশ করেছে। তাতে বৃটেনের মুসলিম মহিলারা পাশ্চাত্য জীবন ধারার প্রতি তাদের অতিষ্ট হয়ে ওঠা এবং সে তুলনায় ইসলামের প্রশান্তি ও স্বস্তির কথা স্বীকার করে নিয়েছে। (সূত্র ঃ লন্ডন টাইমস)

USA Today পত্রিকার ২৭ জানুয়ারী, ১৯৯৪ ইং সংখ্যার ভাষ্য– ***"ইসলাম আমেরিকানদের জোয়ারের টানের মতো প্রবল শক্তিতে কাছে টেনে নিচ্ছে। আমেরিকানরা এই সার্বজনীন বিশ্বধর্মের প্রতি ক্রমশঃই ঝুঁকে পড়ছে।"***

লন্ডনের বিখ্যাত দৈনিক 'টাইমস' তার ৯ নভেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যায় বৃটেনে ইসলামের বিকাশ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। তার শিরোনাম ছিলো– "বৃটিশ মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করছে কেনো?" নিবন্ধটিতে উপ-শিরোনাম দেয়া হয়েছিল "পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলোর বৈরী আচরণ সত্ত্বেও ইসলাম পাশ্চাত্য মানসকে জয় করে চলছে।" নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে– "ইদানিং যে বিপুল সংখ্যায় বৃটেনবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করছে, তার কোনো দৃষ্টান্ত অতীতে আর দেখা যায়নি।"

লন্ডন টাইমস লিখেছে, পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলো যদিও মুসলমানদের ব্যাপারে বরাবরই নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরে, তা সত্ত্বেও বৃটিশ অধিবাসীদের মাঝে ইসলাম গ্রহণের মাত্রা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। আরও মজার ব্যাপার হলো এই যে, এসব বৃটিশ নও-মুসলিমদের বেশির ভাগই মহিলা। পত্র-পত্রিকার খবর অনুসারে মার্কিন নও-মুসলিমদের মধ্যেও পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা চারগুণ বেশি। পত্রিকার মতে, ***"It is even more ironic that most British converts should be women, given the widespread view in the west that Islam treats women poorly."***

অর্থাৎ ***"এটা আরও দুঃখজনক বিষয় যে, অধিকাংশ বৃটিশ নও-মুসলিমই মহিলা। অথচ এ মতবাদ গোটা পাশ্চাত্যে বিস্তৃত যে, ইসলাম মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে।"***

পাশ্চাত্যে ইসলাম বিস্তারের এই দ্রুত গতির কারণ সম্পর্কেও পত্রিকাটি বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছে। এর মতে, যখন থেকে সালমান রুশদীর ব্যাপারটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়, তখন থেকেই মানুষের মাঝে ইসলাম নিয়ে গবেষণা করার একটা প্রেরণা সৃষ্টি হয়। অপরদিকে উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং বসনিয়ায় মুসলমানদের দুরাবস্থাও মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টির একটা কারণ হয়। তাছাড়া পাশ্চাত্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মে ধর্মে তুলনা বিষয়ে পড়াশুনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে কারণেও অনেকে মুসলমান হয়েছে। এ ছাড়া বৃটিশ প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে লাগামহীন প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে প্রত্যেকটি ইসলামী বিষয়কেই মন্দ বলার যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে অনেকের মনে তারও একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে তারা ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। পত্রিকাটি লিখেছে ঃ ***"Westerns despairing of their own society rising crime, family breakdown, drugs and alcoholism have come to admire the discipline and security of Islam."***

অর্থাৎ ***"পাশ্চাত্যের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের সমাজের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়ছে। তাতে ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা, পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস, মদ্যপান ও মাদকাসক্তি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। শেষ পর্যন্ত তারা ইসলাম প্রবর্তিত নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছে।"***

www.pathagar.com

সংযোজন

বিআইডিএস পরিচালিত গবেষণার এক জরিপে দেখা গেছে, গার্মেন্টস শিল্পে শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী যেমন মজুরির ভিন্নতা রয়েছে ঠিক তেমনি কারখানা ভেদেও একই পদে ভিন্ন ভিন্ন মজুরি চালু আছে। জরিপে সর্বনিম্ন ৭০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৭০০ টাকা মাসিক আয়ের নারী শ্রমিক দেখা গেছে। শতকরা ৫৫ জন শ্রমিকের মজুরি মাসে ৮০০ থেকে ১২০০ টাকার মধ্যে। ওভারটাইমসহ ১৮০০ টাকার কম মজুরি পায় এমন নারী শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ৮৬ ভাগ। ১৯০০ টাকা থেকে ২৭০০ টাকা মজুরি পায় শতকরা ৪ ভাগ নারী শ্রমিক। এই সামান্য বেতন পাওয়ারও নির্দিষ্ট কোন দিন ধার্য থাকে না। মালিকপক্ষ তাদের ইচ্ছামতো বেতন দিয়ে থাকেন। কোন গার্মেন্টসেই সাপ্তাহিক বা জরুরি কোন ছুটি নেই। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণেও একদিন অনুপস্থিতির অপরাধে চাকরি চলে যায়। এসবই গার্মেন্টস কারখানার অলিখিত বিধান। অনেক ক্ষেত্রে নারী শ্রমিককে কারখানার মালিক পক্ষের চাপে বাধ্যতামূলকভাবে ওভারটাইম করতে হয়। ওভারটাইমের ক্ষেত্রেও আইন মানে না কোন কোন মালিকপক্ষ। শ্রমিকের ইচ্ছা, অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। জরিপে দেখা গেছে, একজন নারী শ্রমিক দৈনিক তিন থেকে সাত ঘন্টা পর্যন্ত ওভারটাইম শ্রম বিক্রি হয় তিন টাকা থেকে সাত টাকা চল্লিশ পয়সা পর্যন্ত। অনেক গার্মেন্টস কারখানায় নারী শ্রমিকদের ওভারটাইম পারিশ্রমিক বকেয়া রাখা হয়।

আইএলও সনদ অনুযায়ী ৮ ঘন্টা শ্রম দিবসের আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দেশের অধিকাংশ গার্মেন্টস শিল্প কারখানার মালিকপক্ষ ১২ ঘন্টা থেকে ১৬ ঘন্টা কখনও ১৮ ঘন্টা থেকে ২০ ঘন্টা পর্যন্ত নারী শ্রমিকদের খাটায়। ইপিজেডে/ গার্মেন্টসে ন্যূনতম নারী শ্রম মজুরি মাসিক ভিত্তিতে নবিস ১৫ ইউএস ডলার, অদক্ষ ২১ ইউএস ডলার, আধাদক্ষ ৩৫ ইউএস ডলার, দক্ষ ৪৮/৫০ ইউএস ডলার।

কারখানায় সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টা (ওভারটাইম ছাড়া), কারখানা সপ্তাহে ১২-১৬ ঘন্টা (ওভারটাইমসহ) কার্যদিবস; সপ্তাহে ৬ দিন, ছুটিঃ ১০ দিন ক্যাজুয়াল লিভ, ১৭ দিন বার্ষিক ছুটি।

৭০-এর দশকে এ দেশে গার্মেন্টস শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অর্থাৎ বিজিএমইএ প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ২৫০৩। বর্তমানে গার্মেন্টস শিল্পে মোট শ্রমিকের মধ্যে ৯০ শতাংশই নারী। অন্য দেশের গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকরা প্রতি ঘন্টায় যে মজুরি পায় তার তুলনায় আমাদের দেশের গার্মেন্টস শিল্পের নারী শ্রমিকদের অনেক বৈষম্যের শীকার হতে হয়। ১৯৮১-৮২ সালের এক হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন গার্মেন্ট শিল্পে কর্মরত শ্রমিকের প্রতি ঘন্টা মজুরি ছিল ২৪০ টাকা, সিঙ্গাপুরে ৫১ টাকা, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৪৯ টাকা, তাইওয়ানে ৪৫ টাকা, হংকং-এ ৪৪ টাকা, চীনে ২৪ টাকা, ভারতে ২১ টাকা, শ্রীলংকায় ১১ টাকা এবং বাংলাদেশে মাত্র ৮ টাকা। তবে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি ঘন্টায় গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের মজুরি এখনও ৮ থেকে ১৩ টাকার মধ্যে। (তথ্যসূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর ১৫/২/২০০১)

বিভিন্ন দাবি আদায়ে সমবেত হয়েছেন নারী শ্রমিকেরা

www.pathagar.com

উপসংহার

আল্লাহর অপরূপ পবিত্র সৃষ্টি নারী। তাই নারীর উচিত আল্লাহ্‌পাক নারীর কল্যাণে যা নিষেধ করেছে তা মেনে চলা। আল্লাহ্‌পাক নারীর উপর কিছুটা পুরুষের প্রাধান্য দিয়েছে বটে; কিন্তু নারীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ যাবতীয় ন্যায়ানুগ প্রয়োজন মিটানোর আদেশ করা হয়েছে পুরুষকে। আর সেখানে সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণে নারীকে বলা হয়েছে পুরুষের অনুগত থাকতে।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বন্ধু। সে তার অধীন কর্মচারী, প্রভু বা দাসী নয়। তাই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌পাক বলেছেন, "মুমিন নর-নারী পরস্পরের বন্ধু, তারা ভালো কাজ করতে আদেশ দেয় (বাধ্য করে) এবং মন্দ কাজ করতে (বাধা দেয়) নিষেধ করে, তারা নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আদেশ মেনে চলে।" (তওবা, ৭১)। নর ও নারীর সাথীকে কেমন হতে হবে এ একটি আল্লাহ্‌র বিধানই সে হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজের স্ত্রীর কাছে উত্তম।" (ইবনে মাজা)

অপরপক্ষে কুলাঙ্গার, চরিত্রহীন, নারী জাতির কলঙ্ক দুনিয়াতে নরক বানাবার হাতিয়ার, শয়তানের বাহন কুলটা নারী ও তার সাথীদের পরিচয় বৈশিষ্ট্য ও কাজ কাম শিশির বিন্দুতে সীমাহীন আকাশ দর্শনের মতো একটি মাত্র চুম্বক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। "মুনাফেক নর-নারী সকলেই একই স্বভাবের। তারা অসৎ-কুকাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে, আহবান জানায়, সহযোগিতা দেয় এবং ভালো কাজ করতে বাধা দেয়। নিষেধ করে, নিরুৎসাহিত করে, আর দান খয়রাতের ব্যাপারে তাদের হাত বন্ধ করে রাখে।" (তাওবা ঃ ৬৭)। সঙ্গী বাছাই এর নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "অসতী নারীগণ চরিত্রহীন পুরুষদের জন্য এবং অসৎ পুরুষগণ চরিত্রহীনা নারীদের জন্য উপযুক্ত।" (নূর ঃ ২৬)। নারীদের নিজেরা এবং তাদের অভিভাবকদের, ইসলামী সমাজ প্রধান ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের এ নিরিখেই অসৎ নর-নারীর জন্য পাত্র-পাত্রী বাছাই করা ওয়াজিব। এর বিপরীত কিছু করলে হয় সতী নারী অথবা সৎপুরুষের জন্য জাহান্নাম তৈরি করা হবে। কেননা- তাদের জন্যে নির্দেশ হলো "সতী রমণীগণ সৎ চরিত্রবান পুরুষের জন্য এবং সৎ ও ভদ্র পুরুষেরা সৎ চরিত্রবতী মহিলাদের জন্য উপযুক্ত।" (নূরঃ ২৬)

বিশ্বের অনেক অমুসলিম লেকক, বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, দার্শনিক ইসলামকে নিয়ে অনেক গবেষণা করেছে। সে সব অমুসলিম পন্ডিতেরা পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের রীতি-নীতির পক্ষে ইতিবাচক বক্তব্য রাখতে বাধ্য হচ্ছে। যেমন ফরাসী বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী বলেছেন, "মোহাম্মদ (সঃ) আনীত কোরআনের মধ্যে আমি এমন একটা বাক্য খুঁজে পাইনি যা আধুনিক জ্ঞানে-বিজ্ঞানের পরিপন্থী। সুতরাং ইসলাম একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্ম। মহান আল্লাহ্‌র প্রতিটি বিধান, নির্দেশ ও সৃষ্টির পিছনে লজিক বা যুক্তি রয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় আইনগুলো অধিকাংশই প্রবর্তিত হয়েছে পাদ্রী, মুনি-ঋষিদের দ্বারা। আর ইসলামের প্রতিটি রীতি-নীতি পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক এবং বিজ্ঞানসম্মত।"

যেসব কুবুদ্ধিজীবী আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানে (যা বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত) বৈসাদৃশ্য তালাশ করে নারী জাতির মুক্তির জন্য তা সংশোধনে সোচ্চার তাদের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

একটি গল্প বলছি। গল্পটি হলো ঃ

এক ব্যক্তি একটি টিয়া পুষতো। অতি চালাক এই ব্যক্তিটি চিন্তা করলো আল্লাহ্ টিয়া পাখির প্রতি অবিচার করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। এই লোকটি ভাবলো টিয়া পাখির উপরের ঠোঁটটা কিছুটা বড় আর নিচের ঠোঁটটা কিছুটা ছোট হওয়ায় হয়তো এর খুব অসুবিধা হচ্ছে। এই অসুবিধাটা দূর করে দেয়ার জন্যে টিয়া পাখির উপরের ঠোঁট খানিকটা কেটে নিচের ঠোঁটের সমান করে দিলো, ফলে পাখিটি আর খাবার খেতে না পেরে মরে যায়। সে মনে করতো, আমার পাখিটাকে আল্লাহ যতোটুকু ভালোবাসেন আমি তার চাইতে বেশি ভালোবাসি। এই অতি ভালোবাসা হিতে বিপরীত হয়েছে। ঠিক তদ্রুপ বর্তমান এই আধুনিক যুগে অতি নারীবাদীদের ক্ষেত্রেও এই গল্পটির দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য। আল্লাহ'র বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে যারা নারী কল্যাণের প্রত্যাশা করছেন তারা বিশ্বে নারী জাতির বর্তমান অবস্থা নিরপেক্ষভাবে নিরক্ষণ করলে এই গল্পটির দৃষ্টান্ত যথার্থতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে।

বৈদ্যুতিক লাইনে নেগেটিভ-পজেটিভ দু'টি ভাগে বিভক্ত। একটি ছাড়া অপরটি অকার্যকর। সুতরাং নেগেটিভ-পজেটিভ একে অপরের পরিপূরক। বিদ্যুৎ-ধর্মে নেগেটিভ ও পজেটিভ এর নির্ধারিত সীমারেখা বেধে দেয়া আছে। কেউ এ সীমা অতিক্রম করে গায়ের জোরে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু রাখতে চাইলে বাতিতো জ্বলবেই না বরং স্পার্ক করবে, দুর্ঘটনা ঘটাবে। ঠিক তেমনি আল্লাহ্র সৃষ্টি মানব জাতি দু'ভাগে বিভক্ত। একটি নর ও একটি নারী। নর ও নারীর গঠন প্রণালী ভিন্ন; জীবন-যাপনের পদ্ধতিও ভিন্ন। পবিত্র কোরআন ও হাদিস এ ক্ষেত্রে নির্ধারিত সীমারেখা বেধে দিয়েছে। এ সীমা-রেখার ব্যত্যয় ঘটলে নারী জাতির উন্নয়ন তো হবেই না বরং সমাজে দুর্ঘটনাই ঘটবে। আল্লাহ্ প্রদত্ত এ সীমারেখাকে যারা গায়ের জোরে ভঙ্গ করছে তারাই সমগ্র নারী জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সুতরাং সাবধান। নারীর শালীনতাই নারীর মুক্তি, নারীর অধিকারের একমাত্র গ্যারান্টি।

নারীর অধিকার, মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার নামই নারীমুক্তি। ইসলামে নারী-পুরুষের মৌলিক অধিকারে কোনো পার্থক্য নেই। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের অধিকার দু'জনেরই সমান। নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার মূলত এক। সম্পত্তি অর্জন, ভোগ, ব্যবহার, বিনিময়, বিক্রি, দানের অধিকারে পুরুষ-নারী এক। তারা একইভাবে চুক্তি করতে পারে। তারা সমানভাবে ভোটাধিকার প্রাপ্ত। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সমানভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকারী। তাদের শিক্ষার অধিকারও সমান। আল্লাহর আইন সম্পর্কে মুসলমানদের উদাসীনতা এবং অজ্ঞতার কারণে মুসলিম নারীরা অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

সুতরাং সমগ্র জাতির ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে হলে ইসলামের ধর্মীয় বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে সমাজে প্রয়োগ করা একান্ত জরুরী। আর কঠোর আইন করলেই চলবে না। সাথে সাথে নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম, প্রচারণা নিষিদ্ধ করতে হবে।

হে আমাদের সম্মানিতা বোনেরা, হে আমাদের মহা সম্মানিতা বিশ্ব নারী সম্প্রদায়। আসুন আল কোরআনের বিধান অনুযায়ী নিজেদেরকে গৌরবময় আসনে সমাসীন করুন। আত্মগঠন করে প্রকৃত মানবী হোন; হাসিল করুন দোজাহানের অফুরন্ত শান্তি ও যুক্তি। সমাজ ও জগতকে করুন বেহেশতের বাগান। বিশ্ব মানবতাকে দান করুন উন্নতি কল্যাণ ও সমৃদ্ধি। আল্লাহ্পাক আমাদের সহায় হোন।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট—১

নারী সমাজের নেপথ্যে

গোলাম আহমদ মোর্তজা

তথাকথিত আধুনিকবাদীরা মুসলিম নারী সমাজের প্রতি নানাভাবে কটাক্ষ করেন, মুসলমান নারীরা নাকি অনুন্নত, অসভ্য অথবা অসামাজিক আর তার মূলে নাকি আছে তাদের সংকীর্ণতা আর ধর্মের গোঁড়ামি। এ কথাও বলতে বাধে না যে, মুসলিম পুরুষ সমাজও নারী জাতিকে উন্নত করতে স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর নন। কোনো কোনো আধুনিকবাদী মনে করেন মুসলমান নারীদের ভেতর যারা শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত হয়েছেন সে অবদান হিন্দু সমাজ বা অমুসলিম সমাজ সংস্কারকদেরই। যাঁরা ইতিহাসের সূক্ষ্ম সংবাদ রাখেন না তাঁরা মনে করতে পারেন হিন্দু সমাজ বরাবরই শিক্ষিত, উন্নত ও প্রগতিবাদী। অন্যদিকে মুসলমান সমাজ অশিক্ষিত, মৌলবাদী ও সংরক্ষণশীল। আর মুসলমানদের অবনতির মূল কারণ নাকি তাদের ধর্ম।

হিন্দু সমাজ তাদের নারী সমাজকে মর্যাদা দেয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে, ১৮৪০ হতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ঐ সমাজের নারীদেরকে মানুষের মর্যাদা দেয়ার কথা হাল্কাভাবে বলতে বা লিখতে শুরু করেন যাঁরা, তাঁরা হচ্ছেন অক্ষয় কুমার দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ রায় প্রমুখ। ১৮৫০-এর পর থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত মদনমোহন, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, দ্বারকানাথ প্রমুখ পন্ডিতগণ স্পষ্ট করে বললেন, "মহিলাদের অবস্থা উন্নত না হলে সভ্য জাতি হিসেবে গণ্য হওয়া অসম্ভব।"

আমাদের সমগ্র বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম চুঁচুড়ায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এক ইংরেজ পাদ্রী, যাঁর নাম মিঃ রবার্ট মে। তার পরের বছর তখনকার ভারতের রাজধানী কলকাতার পাদ্রীরা এটার উপর আরও ভাবনা-চিন্তা করেন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তারপর আরও ৩০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অবশ্য নিজেদের জন্যই তাঁরা সেগুলো করেছিলেন। তবে সেগুলোতে কিছু বঙ্গীয় বালিকাও লেখাপড়া করতো। [M. A. Liard Fr Missioneries and Education in Bengal : Oxford University Press London, 1972 এবং 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা ৮ মার্চ, ১৮২৩ দ্রষ্টব্য]

রাধাকান্তদেব ছিলেন তখনকার হিন্দু সমাজের খুব বড় মাপের নেতা। তিনি তাঁর ভাষায় বলেছিলেন, "মিস্ কুকের স্কুলে কন্যাদের পাঠানোকে সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দুই অসম্মানজনক বলে বিবেচনা করেছিলেন" [Deb to Bethune; J. C. Bangal, P. 103]। ফলে ভদ্রলোকদের বাদ দিয়ে ছোটলোকদের(?) ভিতর হতে কিছু দেশীয় ছাত্রী স্কুলে আসতো। এইসব বিদ্যালয়ে তাই কেবল বাগ্দী, ব্যাধ, বৈরাগী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এবং বেশ্যা কন্যারাই পড়তে যায়। তাও এরা অর্থ পুরস্কারের লোভেই পড়তে যেত [তথ্যঃ বঙ্গদূত, সমাচার দর্পণ এবং W. Adam-এর Reports on the State of Eucation; p. 452-53]। তবে ভদ্রলোকেরা ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শাসকদের আদেশ ও ইঙ্গিতে বুঝতে পেরে তাঁরা তাঁদের বাড়িতে খৃষ্টান মহিলাদের দিয়ে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের স্ত্রী-কন্যারা এভাবেই ইংরেজী শিখতে পেরেছিলেন। [কৈলাসবাসিনী দেবীর লেখা 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস' পৃষ্ঠা ৩০]।

এইভাবে শিবচন্দ্র রায়ের কন্যা ও রাজা বৈদ্যনাথের ভাইঝি হরসুন্দরী, চন্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের কন্যা দ্রবময়ী, আশুতোষ দেবের কন্যা প্রভৃতি নামজাদা মহিলাদের লেখাপড়া

www.pathagar.com

শিক্ষার ব্যবস্থা বাড়িতেই হয়েছিলো। অর্থাৎ ইংরেজদের তৈরি করা ঐ সব গার্লস স্কুলে হিন্দু মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো তখন ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতার অনুকূল ছিলো না। [দ্রষ্টব্য ঃ সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকা, ৩১/৫/১৮৪৯ এবং ১৯/৪/১৮৫১]।

১৮৪৯ সাল পর্যন্ত হিন্দু সমাজে মহিলাদের লেখাপড়া শেখার কল্পনা করাও অসাধ্য ব্যাপার ছিলো। ১৮৪৮ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির একজন মেধাবী পন্ডিতকে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছিলো যাঁর নাম ছিলো মিঃ কিটন। বেথুনের তৈরি স্কুলের উন্নতির জন্য তিনি অর্থ, শ্রম ও চিন্তা-ভাবনা দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বৃটিশ সরকার স্কুলটির দায়িত্ব পুরোপুরি গ্রহণ করে। ঐ ভিক্টোরিয়া স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে বেথুন গার্লস স্কুল করা হয় এবং তার পরিচালনায় যে সব বিশিষ্ট লোকদের নিয়োগ করা হয়েছিলো তাঁরা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কালীকৃষ্ণ দেব ও হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ [সম্বাদ ভাস্কর ৩ জানুয়ারী, ১৮৫৭। ইংরেজদের পলিসি অনুযায়ী এই বিদ্যালয় ব্রাহ্মধর্মের ভারতীয় লোক ও বর্ণহিন্দুদের জন্য ছিলো নির্ধারিত। বৃটিশের পরিচালনায় এ রকম স্কুলগুলোতে খৃস্টান ধর্মীয় সাহিত্য এমনভাবে পড়ানো হতো যাতে স্বাভাবিকভাবে ছাত্রীরা হয়ে উঠতো খৃস্টান মনোভাবাপন্ন।

রাজা রামমোহন রায় যে ধর্মটির প্রবর্তন করেছিলেন সেটিই ছিলো ব্রাহ্মধর্ম। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা ছিলেন মূর্তি পূজার বিরোধী। সুতরাং দেবদেবী ও মূর্তিপূজার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতেন না তাঁরা। মদ মাংস এমনকি গো-মাংস পর্যন্ত লোককে দেখিয়ে দেখিয়ে তাঁদের বাহাদুরী ও বৈশিষ্ট্য মনে করে খেতেন।

অনেকে মনে করেন ইংরেজদের ভারতে আসার উদ্দেশ্য ছিলো, শোষণ, শাসন ও খৃস্টধর্মের প্রচার। তাই বৃটিশ হিন্দু সম্প্রদায় হতে একটি বর্ণ হিন্দু বা উচ্চ হিন্দু শ্রেণী তৈরি করে নিয়েছিলো যারা ইংরেজদের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে মিলে যাবে, কিন্তু প্রকাশ্যে তারা নিজেদেরকে খৃস্টান বলবে না। সেই জাতিই ছিলো ব্রাহ্ম জাতি– যারা ইংরেজদের সহায়তায় উন্নত হবে আর সরকারি মদদ পাবে অঢেলভাবে। তাদের উন্নতি দেখে অন্যান্যরা নিজেদের উন্নতির জন্য ব্রাহ্মধর্মের প্রতি এগিয়ে যাবে। আবার ওই ব্রাহ্মজাতিকে যে কোনো মুহূর্তে খৃস্টান বলে ঘোষণা করতে কষ্টকরও হবে না। এখনকার ঐতিহাসিক ও লেখকদের অনেকেই ব্রাহ্ম তথ্যটি এমন কায়দায় গোপন তথ্য হিসেবে পরিবেশন করেছেন যাতে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা ব্রাহ্মপন্ডিতদের হিন্দু বলেই মনে করতে থাকে। আসল সত্য এটাই যে, হিন্দুদের মধ্য হতে ধর্মান্তরিত হয়ে কেউ যেমন মুসলমান হয়েছেন, কেউ খৃস্টান হয়েছেন, কেউ জৈন বা কেউ বৌদ্ধ হয়েছেন ঠিক তেমনি হিন্দু ধর্ম ও বৈদিক ধর্ম থেকে বেরিয়ে এসেই কেউ কেউ ব্রাহ্মধর্মী বা অহিন্দু হয়েছেন। তবুও ছলে বলে কৌশলে তা চেপে রাখার চেষ্টা আজও অব্যাহত।

.....আমাদের দেশের হিন্দু মহিলারা যখন থেকে কাগজ ও অক্ষরের সাথে পরিচিত হলো সেই সময়কার শিক্ষিতা মহিলাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করলে দেখা যাবে, লেখাপড়া জানা মহিলাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নিস্তারিনী দেবী, ব্রহ্মময়ী, মনোরমা মজুমদার, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, রাজকুমারী দেবী, অরুদত্ত, তরুদত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, সৌদামিনী দেবী, কুমুদিনী, বামাসুন্দরী, কৈলাসবাসিনী প্রমুখ; এঁরা বেশিরভাগই বাড়িতে লেখাপড়া শিখেছেন। এঁরা কেউই তখন হিন্দু ধর্মের মধ্যে ছিলেন না, বরং সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের মহিলা। শুধুমাত্র অরুদত্ত ও তরুদত্ত দুই বোন খৃস্টান ছিলেন। তাঁদের খৃস্টান পিতা তাঁদেরকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে।

ঠিক এই সময়ের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তখন মুসলমান সমাজে বালিকা হতে বৃদ্ধা পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকে কোরআন পড়তে অভ্যস্ত ছিলো। তখন ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিলো ফার্সী। এমনকি ইংরেজ আমলের প্রথমদিকেও ফার্সী ভাষা ছিলো ভারতের রাষ্ট্রভাষা; আর ফার্সী ও

www.pathagar.com

আরবীর অক্ষর একই। ফার্সীতে কয়েকটি অক্ষর বেশি আছে মাত্র। মুসলিম মহিলাদের পড়বার লেখবার অধিকার বিগত ষষ্ঠ শতাব্দীতেই দিয়ে গেছেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। তাঁর পরলোকগমনের সাল ছিলো ৬৩২ খৃষ্টাব্দ। সেই সময় থেকে কোনো সময়েই এই পদ্ধতির ছেদ পড়েনি। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে যা চালু করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেও আমাদের দেশে অমুসলমান মহিলাদের ক্ষেত্রে তা কল্পনা করা সম্ভব হয়নি। একটি হিসেবে তা প্রমাণিত হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে অবিভক্ত বঙ্গদেশে বালিকা ও মহিলাদের সংখ্যা যেখানে কয়েক কোটি সেখানে স্কুলে পড়ুয়া ছাত্রী ছিলো ২,৪৮৬ জন মাত্র। ১৮৭১ সালে তা উন্নীত হয় ৬,৭১৭-তে। ১৮৮১-তে তা বেড়ে হয় ৪৪,০৯৬। আর ১৮৯০-এ সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৭৮,৮৬৫-তে, যা সমগ্র বালিকা-সমুদ্রের কণামাত্র [General Report on Public Instruction in Bengal for the years 1863-1864, 1871, 1881-1882 and 1890-1891]। লুকিয়ে লাভ নেই, ইউরোপের শ্বেতাঙ্গদের গগনচুম্বী যত প্রশংসাই করা হোক ইংল্যান্ডের ছাত্রীদের ইউনিভার্সিটিতে পড়ার অনুমতি দেয়া হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। অথচ অপ্রচারিত সত্য এটাই যে, সেই ষষ্ঠ শতাব্দীতে হযরত মুহাম্মদের (সঃ) সময় কিন্তু প্রায় ৯৫% মুসলিম মহিলা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। কারণ কোরআন পড়া শৈশবেই বাধ্যতামূলক ছিলো। কোরআন আরবী ভাষায়– আর তাঁদের মাতৃভাষাও আরবী। সুতরাং খুব সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগ পেতেন– কেউই প্রায় নিরক্ষর ছিলেন না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা এ নিয়ে প্রথম চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের পরে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী একটি সাব-কমিটি তৈরি করে অনেক ভেবে-চিন্তে মহিলাদের পরীক্ষা দেয়ানোর পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে গবেষণা শুরু হয়। ইংল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১৮৭৮ সালে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এখানেও ১৮৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, হিন্দু মহিলারাও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পারে। [100 Years of the University of Calcutta (Calcutta : University of Calcutta 1957) p. 121-22]

হিন্দু সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা থাকার কারণ অনেকের মতে ধর্ম। কেননা, বৈদিক ধর্মে ব্রহ্মার পুত্র মনু যা বলেছেন, তার সারমর্ম হলোঃ মহিলা জাতি বিশ্বাসঘাতক, যে কোনো মুহূর্তে তাদের মতিগতি বদলে যেতে পারে, সুতরাং তাদের স্বাধীনতা দেয়া যায় না। "মনু বলেছেন যৌন বিষয়ে মহিলাদের বিবেক বিবেচনা নেই, যুবক অথবা বৃদ্ধ, শিক্ষিত অথবা মূর্খ, সুশ্রী অথবা কুৎসিত যে কোনো ধরনের পুরুষ পেলেই তারা তাদের সঙ্গে শয্যায় যেতে রাজী।" [মনুসংহিতা, ভরতচন্দ্র শিরোমণি সম্পাদিত, কলিকাতা অরুণোদয় প্রেস, ১৮৬৬, নবম অধ্যায়, শ্লোকসংখ্যা ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮, পৃষ্ঠা ৫২২-২৪]

মুসলমানদের পর্দাপ্রথা সম্বন্ধে অনেকে বিরূপ মন্তব্য ও কু-ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু প্রগতিশীল মহাঋষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, রবীন্দ্রনাথের মা সারদাদেবীর যখন নদীতে স্নান করার ইচ্ছা হতো তখন তাঁকে পাল্কি করে চড়িয়ে গঙ্গা নদীতে নামিয়ে দিয়ে "পাল্কিটি পুরোপুরি গঙ্গায় চুবিয়ে নিতে আসতো আর তিনি পাল্কিতে বসে থাকতেন।" [স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার'– প্রদীপ, ভাদ্র, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ]

বড় দুঃখের বিষয় অনেক লেখক একটা মিথ্যা প্রচার করতে চেয়েছেন যে, হিন্দুদের পর্দা প্রথা প্রচলিত হয়েছে মুসলমানদের অত্যাচারের হাত হতে বাঁচার জন্যই। কিন্তু প্রকৃত সত্য এটাই, ভারতে মুসলমান আগমনের পূর্বে এবং মুসলমানদের ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার পরেও এই নিয়ম অব্যাহত ছিলো। আসলে ওটা ছিলো সনাতন ধর্মকেন্দ্রিক সংবিধান।

www.pathagar.com

মক্কার অল্প সংখ্যক মুসলমান যখন ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রচন্ড আগ্রাসী আক্রমণে মার খাচ্ছিলেন তখন মায়া, মমতা, দয়ার মূর্ত প্রতীক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কি যে করবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। সেই সময় তাঁর প্রতি বাণী অবতীর্ণ হয়, যার মর্মার্থ ছিলো– তোমরা বিদ্রোহী বিধর্মীদের আক্রমণের মোকাবিলা কর এবং তাদেরও আঘাত কর যতক্ষণ না তারা বশ্যতা বা পরাজয় স্বীকার করে। সুতরাং আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে বহু পুরুষ মুসলমানকে আহত ও নিহত হতে হয়েছিলো। এখনকার মতো তখন আধুনিক হাসপাতাল বা নার্সিংহোম ছিলো না। তাই নবীর নির্দেশে মুসলিম মহিলাগণ বিনা দ্বিধায় আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করেছিলেন সহোদরা বোন অথবা কন্যার মতোই।

হযরত মুহাম্মদের (সঃ) পরলোকগমনের পর তাঁর অসংখ্য ভক্তজনের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে যে অভাব সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ করতে হযরতের (সঃ) সুযোগ্য সঙ্গীগণ এগিয়ে এসেছিলেন। সে সকল যোগ্য সাহাবী বা সঙ্গীদের মধ্যে যিনি উল্লেখযোগ্য পান্ডিত্যপূর্ণ অধিক সমাধান দিয়ে গেছেন জাতিকে, তিনি একজন মহিলা যাঁর নাম হযরত আয়েশা (রাঃ)।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর ভক্তবৃন্দ ভ্রমণে যাবার সময় তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। মুসলিম ভাগ্যান্বেষী ধর্মপ্রচারক, ব্যবসায়ী প্রভৃতিরূপে যাঁরা ভারতে এসেছিলেন, তাঁরা অনেকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের স্ত্রীদের। কিন্তু তদানীন্তন ভারতে হিন্দুসমাজে পুরুষের জন্যও সমুদ্র পার হওয়া ছিলো কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। স্বার্থের খাতিরে যাঁরা ঐ অপকর্মটি(?) করেছিলেন তাঁদের ফিরে এসে শুদ্ধ হতে হয়েছিল প্রায়শ্চিত্ত করে আর মহিলাদের ক্ষেত্রে তো সমুদ্র পার হওয়া ও বিদেশে যাওয়া ছিলো অকল্পনীয় ব্যাপার।

আমাদের দেশে যিনি সর্বপ্রথমে দুঃসাহস দেখিয়ে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন ঠাকুর পরিবারের শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রথম দেশীয় সদস্য তিনি। দেশে ফিরে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। তার পূর্বে যখন একাকী ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন, তখন ইংল্যান্ড থেকে তাঁর স্ত্রীকে যেসব পত্র লিখেছিলেন তার একটির অংশ এখানে পরিবেশন করছি ঃ "তোমাদের হৃদয়, মন এখন অন্তঃপুরে প্রাচীরের মধ্যে শুষ্ক প্রায় হইয়া রহিয়াছে। তুমি ইংল্যান্ডে আসিয়া আর এক নতুন ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে।" [দ্রষ্টব্য ঃ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১ নভেম্বর, স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের পত্র]

অনেক কান্ড করে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া স্থির করলেন এবং জাহাজে চড়েই বিলেত যাবেন স্থির হলো। কিন্তু জাহাজের বন্দর পর্যন্ত পৌঁছাবেন কি করে? ভদ্র হিন্দু মহিলাদের তখনও গাড়ি চড়া ছিলো কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। শেষ পর্যন্ত জাহাজ পর্যন্ত উঠতে দরজাবন্ধ পাল্কি করে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। [জ্ঞানদানন্দিনীর লেখা 'আমার স্মৃতিকথা', পৃষ্ঠা ২৯]

জ্ঞানদানন্দিনী যখন বিলেত থেকে ফেরেন তখন তিনি বেশ আধুনিকা হয়ে উঠেছিলেন; তাই একটি পুরুষ ভোজসভায় যোগদান করেছিলেন তিনি। ঠাকুর পরিবারের প্রসন্ন কুমার ঠাকুর স্ত্রী শিক্ষার সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন বলে প্রচারিত। কিন্তু তিনি যখন তাঁদের বাড়ির বউ জ্ঞানদানন্দিনীকে ভোজসভায় দেখলেন তখন ঐ রকম অসভ্যতা(?) বরদাস্ত করলেন না। তাই ঘৃণায় ও ক্রোধে অধীর হয়ে সভা ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর' পুস্তকের পৃষ্ঠা ১৮ দ্রষ্টব্য]

মুসলিম ইতিহাসে দেখা যায়, যে কোনো বিচারে বিচারকের সামনে মহিলারা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আসামী, বিচারপ্রার্থী ও সাক্ষী হিসাবে হাজির হওয়ার অধিকার রাখতেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী সর্বপ্রথম ব্রাহ্ম সমাজের মহিলারা সামাজিক হওয়ার অধিকার পেয়ে তাঁদের প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হয়ে ভক্তিমূলক গীত গাওয়ার সুযোগ

www.pathagar.com

পেয়েছিলেন।

প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন নারীমুক্তির একজন প্রধান প্রবক্তা ও নেতা। কিন্তু কাজের বেলায় দেখা গেছে, রামতনু লাহিড়ী যখন কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে কেশব সেনের প্রার্থনা সভায় উপস্থিত, তখন অসন্তুষ্ট হন তিনি এবং সমালোচনা করেছিলেন কেশব সেনের। [শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ']

ব্রাহ্মধর্মের মহিলারা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রার্থনা সভার সঙ্গে জড়িত। তাঁরা হিন্দু ধর্মের ক্ষমতা অনেক আগেই বাদ দিয়ে অর্জন করতে চেয়েছিলেন নতুন ক্ষমতা ও স্বাধীনতা। খাঁটি হিন্দু সমাজের একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখযোগ্য। বেশিদিনের কথা নয়, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজকুমার যখন কলকাতায় এলেন তখন হাইকোর্টের হিন্দু উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্মানে আয়োজন করেছিলেন একটি ভোজসভার। তাতে সাহেবদের অভ্যর্থনা জানাতে উকিলবাবুর বাড়ির মেয়েরা সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে এগিয়ে আসেন। সে জন্য হিন্দু সমাজে তাঁকে কঠোরভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিলো। তাঁকে অপমান করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে একটি নাটক করা হয় যা ছিলো অত্যন্ত অরুচিকর ও অশ্লীল। উকিল জগদানন্দের নামটি পরিবর্তন করে নাটকটির নাম দেয়া হয়েছিলো 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। [দ্রষ্টব্য ব্রজেন্দ্রনাথের লেখা 'নাট্যশালার ইতিহাস' চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬১-তে ছাপা]

সাধারণ যাত্রা থিয়েটার ও রঙ্গমঞ্চে বাঙালী মহিলারা প্রথম অভিনয় করেন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট। মহিলারা যেদিন প্রথম নাট্যমঞ্চে অভিনয় করলেন, সেদিন সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও সমাজ সংস্কারক প্রগতিবাদী শিবনাথ শাস্ত্রী দু'জনেই খুব অসন্তুষ্ট হন। তারপর থেকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাটক দেখতে কখনও আসেননি ঐ বিখ্যাত ব্যক্তিদ্বয়। [দ্রষ্টব্য ঃ 'আত্মচরিত', শিবনাথ শাস্ত্রী ও ইন্দ্র মিত্রের লেখা 'সাজঘর', ১৯৬০ সালে ছাপা]

হিন্দু ধর্ম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মরা মূর্তি পূজা বর্জন করে প্রার্থনা সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সে সভায় মহিলারা বসে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও উপদেশ শুনতেন। কিন্তু মহিলা ও পুরুষদের মাঝে একটি মোটা কাপড়ের পর্দা টাঙ্গানো থাকতো, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পর্দার আড়ালে থেকে উপদেশ শোনাতেন। ঠাকুর বাড়ি থেকে মেয়েরা ব্রাহ্ম ধর্ম সভায় পর্দার আড়ালে উপদেশ শোনার অধিকার প্রাপ্ত হন ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ঠিক তার পরের বছর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মহিলাদের এতোটা অধিকার দেয়া ঠিক হয়নি মনে করে আবার তা নিষিদ্ধ করা হয়। [কলকাতা হতে প্রকাশিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকার ১২৭৩ সনের মাঘ সংখ্যা, ৪৪৪ পৃষ্ঠা]

ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিলেত থেকে ফিরে এসে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য দু'টি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। একটির নাম দেন 'ভারত সংস্কার সভা' আর মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো 'সামাজিক সমিতি'। ঐ 'সামাজিক সমিতির' তিনি নিজেই হলেন প্রেসিডেন্ট। আর নামকরা সদস্যাদের মধ্যে ছিলেন স্বর্ণলতা ঘোষ, ব্রহ্মময়ী, হেমাঙ্গিনী দেবী প্রমুখ। কিন্তু রহস্যময় ঘটনা হলো এই, ঐ মহিলা সমিতির ভেতরে দু'জন বিলেতী মহিলা বিলেতী আভিজাত্য ও সংস্কৃতি বজায় রেখেই নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। একজনের নাম লেডি ফেয়ার এবং অপরজনের নাম মিস্ পিগট।

হিন্দুধর্ম হতে বেরিয়ে আসা ব্রাহ্ম সমাজ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এক বিশেষ ইঙ্গিতে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্রত্যেক ভাগ হতেই নিজস্ব মহিলা সমিতি সৃষ্টি হয়। আর হিন্দুধর্ম হতে বেরিয়ে আসা বাঙালী খৃস্টান মহিলারা পৃথক মহিলা সমিতি সৃষ্টি করেন। এতো কান্ড ঘটতে থাকলেও হিন্দু নারীরা তখনও পর্যন্ত এগিয়ে আসতে পারেননি। ঠিক ঐ সময় বৃটিশের নিয়োগ করা যুদ্ধ সচেতন উচ্চশিক্ষিত পন্ডিত কর্নেল H. S. Olcot মহিলাদের মাঝে উদ্ভূত হয়ে আধ্যাত্মিক

www.pathagar.com

আন্দোলন শুরু করেন। তার পেছনে কোনো গোপন কৌশল থাকলেও অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ তা বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে আরেকটি উল্লেখযোগ্য মহিলা সংস্থার সৃষ্টি হয়। সেটির নাম 'সখী সমিতি'। ঐ সংস্থা দু'টি কাজের দায়িত্ব নিয়েছিল– একটি মহিলাদের হাতের কাজ শিখিয়ে সাবলম্বী করা এবং অপরটি ধর্ষিতা মহিলাদের ফিরিয়ে এনে তাদের মর্যাদা দেওয়া। সরলাদেবী চেয়েছিলেন ঐ পতিতা ধর্ষিতাদের আইনের অনুকূলে সমাজে স্থান দেয়ার ব্যবস্থা করাতে।

মেয়েরা পুরুষদের মতো লেখাপড়া শিখে চাকরি করবে এটা হিন্দু সমাজে কল্পনা করতে বড়ই বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ব বিখ্যাত ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো কবিও ১৯৩০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত নারীদের চাকরি করা সহজে সমর্থন করতে পারেননি।

১৮৩৫ খৃস্টাব্দে কলকাতায় ডাক্তারি পড়বার জন্য মেডিকেল কলেজ খোলা হয়; তা হিন্দু সমাজে গৃহীত হতে পারলো না। কারণ মৃতদেহ কাটাকাটি করা ছিলো অসম্ভব ব্যাপার। আর মহিলাদের জন্য ব্যাপারটা ছিলো আরো কঠিন। যাই হোক, হিন্দু সমাজ হতে ধর্মত্যাগীরা সাহস করে আস্তে আস্তে ঐ কাজে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু নারী সমাজকে এগিয়ে দিতে অনেক সময় লাগলো। ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে মেডিকেল কলেজ খোলা হলেও ১৮৮৯ সালে কাদম্বিনী দেবী ডাক্তারী পড়ার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার সময় কলেজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত হয়, কাদম্বিনী পাস করলেও তাঁকে ফেল করিয়ে দেওয়া হবে। ঘটলোও তাই। তাঁকে পরীক্ষায় ফেল করিয়েই দেয়া হলো। অবশ্য তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাঁকে চিকিৎসা করার একটা অনুমতিপত্র লিখে দেওয়া হয় যাতে তিনি চিকিৎসা করতে বাধা না পান। কিন্তু তাঁর নামের পাশে M.B. লিখবেন সে সৌভাগ্য হয়নি তাঁর।

গর্ভবতী হিন্দু নারীরা প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করলেও ডাক্তার দেখানোর প্রথা ছিলো কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। ফলে প্রসবকালে প্রচুর মহিলা ও শিশু মারা যেতো। এটাই ছিলো তখনকার হিন্দু সমাজের অবস্থা। প্রথমে বঙ্গের যে দু'জন মহিলা M.B. পাস করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে বিধুমুখী বসু ও ভার্জিনিয়া মেরী। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন খৃস্টান। পূর্বে উল্লিখিত কাদম্বিনী গাঙ্গুলী কিন্তু হিন্দু ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে শিক্ষিত হিন্দু সমাজে এমন কুৎসা রটানো হয়েছিলো যা তাঁর চরিত্রের উপর প্রচন্ড আঘাত হানে। অবশেষে তা পৌঁছে গিয়েছিলো আদালত পর্যন্ত। ['বামাবোধিনী' পত্রিকার ১২৯৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা, পৃঃ ১০৬ দ্রষ্টব্য]

সর্বপ্রথম যে বাঙালী মহিলা চাকরি করেন তাঁর নাম ছিলো রাজরাণী দেবী। তাঁর মাসিক বেতন ছিলো মাত্র ৪০ টাকা। তখন ইংরেজরা খুব অবাক হয় এবং তাঁর একটি ছবি পাঠিয়ে দেয় ইংল্যান্ডে যাতে বিলেতের মানুষও অবাক হয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছিলো ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে। অর্থাৎ ১৮৬৫ পর্যন্ত কেমন অন্ধকার যুগ ছিলো একমাত্র ইতিহাসই তার সাক্ষী। এমনি আর একবার খুব হৈ চৈ হয়েছিল যখন বাঙালী মহিলা সর্বপ্রথম চশমা পরেছিলেন। তাঁর নাম রাধারাণী।

হিন্দু সমাজে মহিলাদের চারিদিকে এমন অবরোধের বেড়া দিয়ে রাখা হয়েছিল যে, তাদের বাইরের উল্লেখযোগ্য কোনো জিনিস দেখবার অধিকার প্রায় ছিলোই না। এগুলো প্রমাণ হয় তখনকার প্রকাশিত লেখা হতে। উদাহরণে বলা যায়, যখন হাওড়ার বিখ্যাত ব্রীজটি তৈরি হয় তখন তা দেখবার জন্য পুরুষেরা দলে দলে ভিড় জমায় ও বিস্ময়ে হতবাক হয়। পুরুষদের কাছ হতে হাওড়ার পুলের কথা শুনে মহিলাদেরও দেখার সাধ হয়েছিল, কিন্তু সাধ্য ছিলো না। তাই কলকাতার মায়াসুন্দরী দেবী ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিলেন, "স্ত্রী লোকদের কিছু দেখিবার হুকুম নেই। কলকাতায় গঙ্গার উপর পুল নির্মাণ হইল, লোকে তাহার কত প্রশংসা করিল, কিন্তু আমাদের শোনাই সার হইল। একদিনও চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারিলাম না।" [দ্রষ্টব্য শ্রীমতি

www.pathagar.com

মায়াসুন্দরীর লেখা 'নারীজন্ম কি অধর্ম?', 'বঙ্গমহিলা' পত্রিকা, ১৮৮২'র শ্রাবণ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৯৪]

১৪০০ বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পুরুষ ও নারীর পোশাকের যে ছক তৈরি করে দিয়েছেন তা আজও সারা বিশ্বে মুসলমান সমাজে অনুসৃত হচ্ছে তাই নয় বরং পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি ও দেশে সে প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে। আরবীয় মহিলাদের ছিলো ফুলহাতা জামা, কোমর হতে পা পর্যন্ত পাজামা কিংবা সায়ার মতো পোশাক, মাথার চুল ও বক্ষ আচ্ছাদনের জন্য অস্বচ্ছ কাপড়ের ওড়না আর পুরুষদের জন্য ছিলো নিম্নাঙ্গে লুঙ্গি বা পাজামার মতো পোশাক আর উর্ধ্বাঙ্গে ছিলো পাঞ্জাবী, পিরহান বা কামিজ, মাথায় ছিলো টুপি এবং তার উপর পাগড়ি। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পায়ে পরতো চামড়ার মোজা, তার উপর চামড়ার জুতো।

ভারতে মুসলমান আগমনের পূর্বে গোঁড়া রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজে পুরুষদের পোশাক যা ছিলো তা অত্যন্ত সীমিত। শুধু ছোট এক টুকরো কাপড় যা ল্যাংটের মতো ব্যবহৃত হতো। এমনকি সাধু-সন্ন্যাসী, মুনি-ঋষিরা পর্যন্ত ঐ অত্যাল্প পোশাককেই যথেষ্ট মনে করতেন। গায়ে ভস্ম মাখার প্রচলন ছিলো। বেশির ভাগ মহিলা এবং পুরুষদের খালি পায়েই ছিলো হাঁটার অভ্যাস। কিছু কিছু সাধু সন্ত ফিতেবিহীন কাঠের পাদুকা ব্যবহার করতেন। পোশাকের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গামছার মতো ছোট ধুতি, খালি গা এবং শীতকালে একটা ছোট্ট চাদর ব্যবহৃত হতো। আর মহিলাদের পোশাক ছিলো আরো করুণ। শুধু একটি শাড়ি মাত্র। ভারত একটা বিষয়ে গৌরবের অধিকারী– পাতলা কাপড় সৃষ্টিতে শিল্পীরা ছিলেন পরম প্রশংসিত। আর মহিলাদের পাতলা পোশাক পরিধান ছিলো আভিজাত্যের প্রমাণ। কিন্তু মহিলাদের কোনো জামা, ব্লাউজ, সায়া, সেমিজ, জুতো, মোজা ব্যবহারের নিয়ম ছিল না; বরং তা ছিলো নিষিদ্ধ। অন্যদিকে মহিলাদের জন্য নিয়ম করা হয়েছিল তারা জলাশয়ে স্নান করে ঐ ফিনফিনে পাতলা ভিজে কাপড় পরেই বাড়ি ফিরবে। ঐ পাতলা ভিজে কাপড় কাঁচের মতো স্বচ্ছ লাগতো ফলে কাপড় ভেদ করে গোটা দেহ উলঙ্গ দেহের মতোই মনে হতো [শ্রী রাজকুমার চন্দ্রের লেখা 'দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম' পুস্তকের ৬ ও ৭ পৃষ্ঠা]। ফ্যানি পার্কাস একজন ইউরোপীয় মহিলা; এই ঘটনার কথা তাঁর লেখা বইতেও লিখে গেছেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল– 'লম্বা শাড়ী পরলেও বাঙ্গালী মহিলারা প্রায় উলঙ্গই থাকতেন এবং এরূপ পোশাক প্রকাশ্যে জনসমক্ষে পরিধান করার জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়' [দ্রষ্টব্য 'সূক্ষ্মবস্ত্র', বামাবোধিনী পত্রিকা, কার্তিক, ১২৭৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১২৪-১২৬]। কেশব সেনের কন্যা সুচারু দেবী মুসলমান, পারসিক ও শিখদের পোশাক লক্ষ্য করে আধুনিকভাবে পোশাক পরার প্রচলনের প্রতিষ্ঠাত্রী বলা যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু মহিলা সমাজ এবং ব্রাহ্ম ও বাঙালী খৃষ্টানেরা পর্যন্ত পাঁচমিশালী পোশাক পরতেন। তারপর ক্রমে ক্রমে পোশাকের উন্নত সংস্করণ বের হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একচেটিয়াভাবে কোনো এক বিশেষ পোশাক পরার নিয়ম চালু হয়নি। সুন্দর আধুনিক পোশাক সৃষ্টির গোড়াতে হিন্দু মহিলাদের মধ্যে যখন নানা বাধা বা দ্বিধা আসছিল, তখন প্রথম এগিয়ে আসে 'বারাঙ্গানা' বা বেশ্যা সমাজ। তাতে ভদ্রলোকেরা একটু মুশকিলে পড়ে যান। বেশ্যাদের প্রচলিত ঐ পোশাক পরলে তাঁদের মেয়েদেরও হয়তো কেউ কেউ বেশ্যা ভাবতে পারে, সেইজন্য শাড়ীর ওপর একটি বাড়তি চাদর গায়ে দেয়ার নিয়ম চালু হয়; যেটা ১৪০০ বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ওড়না হিসেবে ব্যবহার করতে মুসলমান নারী সমাজকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

নারী সমাজের প্রতি পুরুষের অত্যাচারের ইতিহাস অদ্ভুত ধরনের ছিলো। যেমন তাদের বাইরে বের হতে না দেয়া, কোনো ভদ্রমহিলাকে গাড়ি চড়তে না দেওয়া, হাওড়া ব্রীজের মতো দর্শনীয় অনেক কিছুই দেখতে না দেয়া, স্বামী সঙ্গে থাকলেও তাঁর কর্মক্ষেত্রে স্ত্রীকে যেতে না

www.pathagar.com

দেয়া, ছেলেদের সঙ্গে বৌমাদের প্রকাশ্যে কথা বলতে, গল্প করতে বা হাসিঠাট্টা করতে না দেয়া ইত্যাদি। অথচ তাঁদের অত্যন্ত মিহি কাপড় পরিয়ে ব্লাউজ, বডিস, সায়া, সেমিজ, ওড়না না পরিয়ে, পুকুরে বা নদীতে স্নান করিয়ে ভিজে কাপড়ে বাড়ি আসতে দিতে কোনো বাধা ছিলো না– বরং তা সাধারণ নিয়মই ছিল।

১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে বসু এ্যান্ড কোম্পানী নামে এক পোশাক ব্যবসায়ী বামাবোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয় এইভাবে– "বাঙালী মহিলাদের জন্য এই কোম্পানী নতুন ধরনের 'সংস্কৃত' পোশাক তৈরি ও সরবরাহ করতে প্রস্তুত আছে। এই পোশাক 'প্রগতিশীল' ও সভ্য সমাজের সম্পূর্ণ উপযোগী হবে।"

তা সত্ত্বেও মনে রাখা ভালো যে, সেই সময় শাড়ী পরার আধুনিক প্রচলন করতে গিয়ে যাঁরা অনেক বিদ্রূপ ও বিরোধিতা সহ্য করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা প্রগতিমনা সুচারু দেবী।

মানুষ জাতি অনুকরণপ্রিয়। সুতরাং যা ভালো, যা মানবকল্যাণ বা মানব উন্নতির পথে সহায়ক তা গ্রহণ করা, অন্ততঃ স্বীকার করা মানবিক বৈশিষ্ট্য। মুসলমান সমাজে শাড়ী পরার নিয়ম ছিলো না। ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান ও দু'একটি দেশ ছাড়া পৃথিবীতে এই নিয়ম নেইও। বস্তুত শাড়ী এ দেশীয় সভ্যতার অবদান।

এতো তথ্য সম্বলিত আলোচনায় বেশ বোঝা গেলো হিন্দু সমাজ ব্রাহ্ম সমাজের নিকট ঋণী। আর ব্রাহ্ম সমাজ সরাসরি অনুসরণ করেছে ইউরোপকে। কিন্তু যে সত্য কথাটুকু মেনে নেয়া কঠিন, সেটা হচ্ছে ইউরোপীয় দেশগুলো সভ্যতা শিখেছে মুসলমানদের কাছ হতে। আরব, তুরস্ক, পারস্য, মিশর, স্পেন প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলো তখন সভ্যতার বিকাশ কেন্দ্র ছিলো বিশ্ববাসীর জন্য। পৃথিবীর মানুষ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতো, যেমন আজ এই চলন্ত শতাব্দীতে মানুষ তাকিয়ে আছে আমেরিকা, ফ্রান্স, বৃটেন, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি দেশের দিকে। মুসলিম সভ্যতাই যে ইউরোপীয় দেশগুলোকে সভ্য করেছে, এ তথ্য স্বীকার করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর লেখা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পুস্তকে। পৃথিবীতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে মুসলিম জাতি, যেটার নাম কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় যা স্পেন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো– 'যেখানে ইতালি, ফ্রান্স, সুদূর ইংল্যান্ড হতে বিদ্যার্থী বিদ্যা শিখতে এলো; রাজা রাজড়ার ছেলেরা যুদ্ধ বিদ্যা আচার কায়দা সভ্যতা শিখতে এলো।' [দ্রষ্টব্য স্বামী বিবেকানন্দ ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পৃষ্ঠা ১১০]

ভারতের প্রাচীন সমাজে পুরোহিতদের অন্ধতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা মানুষকে উন্নতির পথে এগোতে দেয়নি। বৈদিক সভ্যতাকে যদি উন্নতি বিকাশের চাবিকাঠি ধরা হয় তাহলে সেই বেদ বা বেদের বাণী বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার সদিচ্ছা তখনকার নেতাদের ছিল না, বরং অনিচ্ছাই ছিলো। কারণ কোনো অনুন্নত সমাজের ছোট লোকেরা(?) যদি বেদের বাণী শুনতেন বা বেদ পড়বার চেষ্টা করতেন তাহলে তাঁদের অনধিকার কর্মের জন্য জিভ কেটে দেয়া হতো এবং কানে তপ্ত সীসা গলিয়ে ঢেলে দেয়া হতো। [তথ্য ঃ বাঙলা দেশের ইতিহাস ঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার]

মিলন মৈত্রীর পথে এমন প্রাচীর তোলা হয়েছিল যা সত্যিই বিস্ময়কর। ভারতীয় অনুন্নত দুর্বল সমাজের মানুষকে ছোটলোক বলে অচ্ছুত মনে করা হয়েছিল। তাঁদের থুথুতে রাস্তা অপবিত্র হতে পারে, তাই তাঁদের প্রত্যেকের গলার সামনের দিকে একটি ভাঁড় ঝোলানো থাকতো। আর তাঁদের ছায়াতে মাটি অপবিত্র হবে– সেই জন্য পাটের ঝাঁটা কোমরের পিছন দিকে ঝুলিয়ে রাখতে হতো, যেটা মাটিতে ঠেকতে ঠেকতে যেত। [তথ্য ঃ ভারতবর্ষ ও ইসলামঃ সুরজিৎ দাশগুপ্ত]

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারত ত্যাগ করে। তার মাত্র ৩০ বছর পূর্বে মহিলাদের কতোটা শিক্ষিত ও উন্নত করা হয়েছিল তার খতিয়ান দেখলে অবাক হতে হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গ সমাজে মাত্র ৪৯ জন মহিলা বি.এ পাস, ৮ জন এম.এ আর ছিলো দু'জন পাস করা ডাক্তারের অস্তিত্ব।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জুতো পরার প্রথা হিন্দু সমাজে ছিলো না। বাঙালী মহিলাদের মধ্যে প্রথম যিনি জুতো পড়েছিলেন তিনি ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। শুধু তাই নয়, তিনিই প্রথমে ব্লাউজ ও পেটিকোট পরার স্পর্ধা(?) প্রদর্শন করেছিলেন। ফলে কবিগুরু রবি ঠাকুরের পরিবারে তিনি বিরাগভাজন হন। বাধ্য হয়ে স্বামী-স্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, পৃথক বসবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

মুসলমান সমাজে একান্ত প্রয়োজনে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিলো না। অভিভাবকদের ইচ্ছায় তা হতে পারতো। কিন্তু স্বামীর বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বালিকা বধূ পিতা-মাতার বাড়িতেই থাকতো। যেমন হযরত মুহাম্মদের (সঃ) বালিকা বধূ আয়েশা (রঃ) বিবাহের পরেও কয়েক বছর পিত্রালয়ে ছিলেন। যখন তিনি বরালয়ে গিয়েছিলেন তখন তিনি ছিলেন উন্নত অপূর্ব স্বাস্থ্যের অধিকারিণী; তাঁর বয়স চলছিল দশ। এই নিয়ে অনেক বিরুদ্ধ আলোচনা করতে অনেক ঐতিহাসিকও কলম চালিয়েছেন। সেটা ছিলো সপ্তম শতাব্দীর কথা। অথচ ইতিহাসের খবর লুকিয়ে লাভ নেই, আমাদের দেশে হিন্দু সমাজে মাত্র কয়েক বছর পূর্বেও যে সমাজ ব্যবস্থা ছিলো তা বড়ই বিস্ময়কর– দুগ্ধপোষ্য শিশুকন্যার অবাধে বিয়ে হতো, যাদের বয়স ছিলো কয়েক মাস মাত্র। [অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা 'ধর্মনীতি ও কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজ' ১৮৫৬, পৃষ্ঠা ৬৯]

হিন্দু সমাজে স্ত্রী জাতিকে মনে করা হতো যেন ক্রীতদাসী বা চাকরানী। তাই বিয়ে করতে যাবার সময় বরকে মা, বাবা ও অভিভাবকদের নিকট প্রতিশ্রুতি দিতে হতো– 'আমি দাসী আনতে যাচ্ছি।' [ভুবনমোহন সরকারের লেখা 'পারিবারিক সংস্কার', বঙ্গ-মহিলা, মাঘ ১২৮২, পৃষ্ঠা ২৩৬]। তাছাড়া স্বামী নিজের স্ত্রীকে প্রকাশ্যে ভালোবাসতে, গল্প করতে, হাসি ঠাট্টা, আমোদ আহ্লাদ করতে পারতো না, করলে তাকে নষ্ট ও স্ত্রৈণ আর সেই বধূকে পেতে হতো- 'ডাইনি' উপাধি [স্বর্ণলতা চৌধুরীর লেখা 'বৌমা', অন্তঃপুর ১ম বর্ষ, ১৮৯৮, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭]। দাসী মনে করেই বাড়ির কর্তা কর্ত্রীরা বাড়ির বৌদের অনেক কাজকেই অনধিকার মনে করতেন এবং কথায় কথায় তাদের অমানুষিক শাস্তি দেওয়া হতো; শেষ পরিণতিতে অনেকেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হতো। এভাবেই শ্যামাসুন্দরী বন্দোপাধ্যায় এবং মানিক্যময়ীর মর্মান্তিক আত্মহত্যার কাহিনী ছাপা হয়েছিল 'বামাবোধিনী পত্রিকার ১৮৮১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় [পৃষ্ঠা ১৩০-৩১ দ্রষ্টব্য]।

একজন লেখিকা তৎকালীন সমাজের সত্যচিত্র তুলে ধরতে লিখেছেন, "প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও পতির দোষ অন্যকে বলা উচিত নহে" [হেমাঙ্গিনী চৌধুরীর লেখা 'স্ত্রীলোকের কর্তব্য' দ্রষ্টব্য]। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি বই থেকে তথ্য তুলে দিচ্ছিঃ জানা যায় নম্র, ভদ্র, বিবাহিতা মহিলারা তাঁদের স্বেচ্ছাচারী, মাতাল স্বামীদের দ্বারা কেমনভাবে প্রহার ও লাথি খেতেন আর ঐ প্রহার ও লাথি খাওয়াকে 'দেবতার আশীর্বাদ' মনে করা হতো। তবু স্বামীর দুর্নাম করার অধিকার ছিলো না। তাঁরা তখন লাথি মারাতেও 'পতির দোষ না দেখিয়া দেবতাজ্ঞানে তাঁহার চরণপূজা করিয়া নারীধর্মের অক্ষয়তা লাভ করিতেছেন" বলে বিশ্বাস করতেন। [গিরীবালা দেবীর 'সাধ্বী' বইয়ের ১৭৪-১৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।

ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হলেও ইংরেজ সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন ছিলো না; বরং

www.pathagar.com

বলা যায় আকণ্ঠ তাদেরকে অনুসরণ করার চেষ্টা অব্যাহত ছিলো। তাতে সুফল ও কুফল দুইই হয়েছিল। খৃস্টান মহিলাদের অনুসরণে অনেক আধুনিক শিক্ষিতা বিয়ে করেননি, আর যাঁরা করেছেন বেশ বেশি বয়সেই করেছেন। যেমন কামিনী সেনের বিয়ে হয়েছিল ৩০ বছর বয়সে। ঠাকুর পরিবারের সরলাদেবী বিয়েই করতে চাননি। তাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ খুব রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন, সরলার বিয়ে কোনো মানুষের সঙ্গে না দিয়ে একটি তরবারি সঙ্গে দেওয়া হোক [সরলাদেবীর লেখা 'ঝরাপাতা' পৃষ্ঠা ১০৭]। ঠাকুর বাড়ির মেয়ে হিরন্ময়ী দেবী ফনীভূষণ বাবুর সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করেন এবং তাঁরই মামাতো বোন ইন্দ্রিরা দেবী প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে প্রেম প্রণয়ে লিপ্ত ছিলেন।

ঐ সময়ে বিলেতের মেয়েরা তাদের বক্ষ সৌন্দর্য নষ্ট হবে বলে শিশুকে স্তন পান করাতেন না। সুতরাং আমাদের দেশের যাঁরা ভদ্রলোক বা বাবুদের বাড়ির দুগ্ধবতী মহিলা তাঁরাও শিশুদেরকে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেন। বিকল্প হিসেবে গরীব লোকদের বাড়িতে শিশুকে পুষতে দিতেন অথবা ধাত্রী বা আয়াদের দিয়ে বাচ্চা মানুষ করাতেন। ঠাকুরবাড়ির স্বর্ণকুমারীর মতো মহিলাও বাড়ির সকল মহিলার 'মতোই কোনো সন্তানকে স্তন্যদুগ্ধ পান করাননি।' [সরলাদেবীর লেখা 'জীবনের ঝরাপাতা' পৃষ্ঠা ১]

শরৎকুমারীর লেখা হতে ভদ্র ও বাবু পরিবারের মহিলাদের আলেখ্য ধরা পড়ে। তাঁর মতে, তখনকার হিন্দু সমাজের মহিলারা যেভাবে থাকতেন আজকের দিনের আধুনিক পুরুষেরা মোটেই তাঁদের গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারতেন না। মহিলারা বিনা ব্লাউজে শুধু শাড়ী পরে থাকতেন, আর সারাদিন কাজকর্ম করে যতবার প্রয়োজন কাপড়েই হাত মুছতেন। সুতরাং সারা কাপড়ে ময়লা, রান্নার কালি, হলুদের দাগ, নাক মোছার চিহ্ন লেগে এক বিশ্রী রূপ ধারণ করতো। শরৎকুমারী পুরুষদেরকে অভিযুক্ত করে তাদের কুরুচি প্রমাণ করতে গিয়ে লিখেছেন, পুরুষদের রুচি অনুযায়ীই মেয়েদের সাজসজ্জা ছিলো। তখন মেয়েরা দাঁতে মিশি ব্যবহার করতো, যা ছিলো নস্যির মতো এক প্রকার পাউডার যাতে মহিলাদের দাঁতগুলো একেবারে আতার বীজের মতো কালো হয়ে থাকতো, এমনকি মিশি ব্যবহারের কারণে ঠোঁট পর্যন্ত কালো হয়ে যেতো। লেখিকা নিজের ভাষায় যা লিখেছেন তা হলো এই– "আমাদের বাঙালী যুবকদের রুচি, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার অনুসারেই এ কালের মেয়ে গঠিত হইতেছে। লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি পরা মাথায় চওড়া সিঁদুর, কপালে বৃহৎ সিঁদুর-টিপ, নাকে নথ, দাঁতে মিশি, কৃষ্ণবর্ণ ঠোঁট, হাতে শাঁখা, পায়ে দু'গাছা মল– ঝোঁটন করিয়া খোঁপা বাঁধা স্ত্রীর সহিত বোধ করি এ কালের স্বামী বাক্যালাপ করা দূরে থাকুক, ঘরে ঢুকিতে দিবেন না।" [তথ্য ঃ শরৎকুমারী চৌধুরাণীর লেখা 'একাল ও একালের মেয়ে'র ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯৩ ও ৫৬৬ পৃষ্ঠা]

আমাদের দেশের কেউ কোনোদিন জন্মদিন পালন করতে জানতেন না। এই ইউরোপীয় নিয়মের সর্বপ্রথম প্রচল করেন জ্ঞানদানন্দিনী, নিজের জন্মদিন পালন করে। তাছাড়া এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখে 'এপ্রিলফুল' পালন করা– এই রীতিও বিলেত থেকে আমদানি। [জ্ঞানদানন্দিনীর লেখা 'সমাজসংস্কার ও কু-সংস্কার' পৃষ্ঠা ১৩১-১৩৫]

ব্রাহ্মধর্মীরা হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করতে, ঠাকুর দেব-দেবীদের গালি দিতে, মদ্যপান বিশেষ করে গো-মাংস খাওয়া প্রভৃতি কাজগুলোকে বাহাদুরি মনে করতেন। ১৯১০ খৃস্টাব্দের পরেই কোনো অদৃশ্য প্রভুর আদেশে হঠাৎ হিন্দুধর্মত্যাগী ব্রাহ্মনেতারা হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগে যান। হিন্দুধর্ম বিরোধী ব্রাহ্ম নেতা রাজা রামমোহন উপনিষদের কিছু বাছাই করা অংশকে নিয়ে তার এমন নতুন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলেন যাতে বনেদী ব্রাহ্মণ সমাজ অবাক হন। দেশের শিক্ষিত যুব সমাজ বা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, বিশেষত ইয়ং বেঙ্গল দলের

www.pathagar.com

শিক্ষিত সদস্যরা বেশিরভাগই এমনভাবে হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁরা বলতেন, 'হিন্দুধর্ম ধ্বংস হোক'। আর প্রকাশ্যে লোকদের শুনিয়ে বলতেন 'আমরা গোরু খাই! গোরু খাই! গোরু খাই!' আর হঠাৎ এই শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যরা এমন সব বই লিখতে লাগলেন, যার উদ্দেশ্য ও সারমর্ম ছিলো হিন্দু সভ্যতাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সভ্যতা, তাতে যা কিছু আছে সবই ঠিক; সুতরাং ভারতবর্ষের সকলেরই হিন্দুধর্মে আবার ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। অথচ এতোদিন ধরে ব্রাহ্মধর্মীরা এবং ইয়ং বেঙ্গলের শিক্ষিত সদস্যবৃন্দ যা বলে আসছিলেন সেটা হচ্ছে এই, "তাঁরা যদি অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে কিছু ঘৃণা করেন তবে তা হিন্দুত্ব"। [মাধবচন্দ্র মল্লিকের লেখা, 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকার ১৮৩১ এবং ৩০শে অক্টোবর সংখ্যা দ্রষ্টব্য]

১৮৬০ খৃস্টাব্দে কোনো গোপন ইঙ্গিতে মহিলাদের উন্নত করার যে চলমান গতি তা থামিয়ে বা বন্ধ করে দিয়ে শুরু হলো নতুন দৃশ্য 'দেশপ্রেম'। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নাটক, যাত্রা যতকিছু প্রদর্শিত হয়েছে সবকিছু ছিলো হিন্দু সমাজের সংস্কারের উপর। কোন্ ইঙ্গিতে কোন্ ব্রেনের বুদ্ধিতে ১৮৭৬-তে শুরু হয়ে গেলো আর এক নতুন পালা– হিন্দু গৌরব, পুরাণ নির্ভর সভ্যতার আবিষ্কার। প্রচার করা হলো প্রাচীন ভারতে সবই ছিলো ইত্যাদি। দেশাত্মবোধক নাটকের স্রোত বইয়ে দেওয়া হলো আমাদের দেশে।

ব্রাহ্ম সমাজের বিখ্যাত নেতা বা প্রেসিডেন্ট রাজনারায়ণ বসু ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্ম এবং পুরোপুরিভাবে হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী। প্রমাণ করতে গিয়ে বলা যায় তিনি গোঁড়ামি প্রদর্শন করতে সকলের সম্মুখে গরুর মাংস ও বিস্কুট খেয়ে বীরত্ব(!) দেখালেন। সেই রাজনারায়ণ বসুই আবার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কোন্ ইঙ্গিতে, কাদের অঙ্গুলী হেলনে খৃস্টান ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে, হিন্দুধর্ম খৃস্ট ও ইসলাম ধর্ম হতে শ্রেষ্ঠ। শুধু বক্তৃতা নয় একটি বইও লিখেছিলেন, যেটির নাম হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ব্রাহ্ম অবস্থাতেই ঐ স্রোতেই সাঁতার কাটলেন। বোধহয় এসব বৃটিশ ব্রেনের বাহাদুরি। হিন্দু বিরোধীদের মুখ দিয়ে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচারে হিন্দু সমাজ যেন নতুন করে পুঁজি পেয়ে গেলো হাতে। ঐ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঘৃণাভরে বেশ কিছুদিন পূর্বেই তাঁর পৈতে ত্যাগ করেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বিধবা বিবাহ শুধু মুখেই সমর্থন করেননি, তিনি যাঁকে প্রথম বিবাহ করেছিলেন তাঁর নাম খাদিজা (রাঃ); তিনি ছিলেন একাধিক সন্তানের জননী ও বিধবা। আর তাঁর সময় হতে আজও পর্যন্ত মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে ব্যাপকভাবে। বিধবা নারীর বৈধব্য যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ষষ্ঠ শতাব্দীতে। ভারতীয় হিন্দু সমাজে নারী কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো পন্ডিতদের প্রচেষ্টায় আইন তৈরি হলো যে বিধবারা বিবাহ করতে পারবেন; সেটি হয়েছিলো ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যা ষষ্ঠ শতাব্দীতে করলেন, ভারতে তা আইনে পরিণত হলো উনবিংশ শতাব্দীতে। আইন পাস হলেও কিন্তু আজও [একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায়] হিন্দু সমাজের পুরোপুরি তা কাজে পরিণত হয়নি। সরকারি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল ১৮৫৬-তে আইন পাস হলেও ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অবিভক্ত বিশাল ভারতবর্ষে মাত্র ৫০০ জন বিধবার বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। [দ্রষ্টব্য Report on the Administration of Bengal for 1882-83, p. 497]

মুসলমান সমাজের উপর একটা অসত্য অভিযোগ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যেটা হচ্ছে ইসলাম ধর্মে নাকি চারটি বিয়ের নির্দেশ আছে। কিন্তু এটা সত্য নয়। আসলে নির্দেশ নয়, চারটি বিয়ের অনুমোদন আছে মাত্র। নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাতের মতো নির্দেশ হলে তা পালন করা

www.pathagar.com

অবশ্য কর্তব্য হতো। সে জন্যই মুসলমান সমাজে চারটি বিয়ে করার দৃষ্টান্ত সচরাচর খুঁজেই পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে সেন আমলে অর্থাৎ লক্ষ্মণ সেন, বল্লাল সেনদের সময় কুলীন প্রথার প্রচলন হয়, তাতে কুলীন ব্রাহ্মণেরা এক এক জন বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, আশি এবং তারও বেশি বিয়ে করেছিলেন অবাধে। এভাবে শতাধিক পুত্রকন্যাদের জন্মও দিয়েছিল [দ্রষ্টব্য অধ্যাপক বিনয় ঘোষের লেখা 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর']। এসব প্রাচীনকালের কল্পলোকের গল্প নয়, বিগত ১৮৮৪ খৃস্টাব্দেও বরিশালের ঈশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং বর্ধমানের কিশোরী মোহন মুখোপাধ্যায়ের মতো বহু বিবাহকারী কুলীনের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১০৭টি বিবাহ করেছিলেন এবং কিশোরী মোহনের ৬৫টি স্ত্রী তখনও বেঁচেছিলেন। [দ্রস্টব্য 'বামাবোধিনী' বাংলা ১৩০০ সনের পৌষ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৮৬]

মুসলিম সমাজে চিরদিন বিধবা রমণীরা পেয়ে আসছেন সম্মান ও স্বাধীনতা। যে কোনো মুসলিম বালিকা বয়োপ্রাপ্ত হলেই সে নিজের পিতামাতা বা অভিভাবক বাদ দিয়েও স্বামী পছন্দ করে বিয়ে করার অধিকার রাখে। সেই সময় হিন্দু সমাজে বিধবাদের এই অধিকার ও সম্মান পাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে [১২৭৭ বঙ্গাব্দ] একটি মূল্যবান তাত্ত্বিক লেখা 'বামাবোধিনী' পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেটা থেকে হিন্দু সমাজের বিধবাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হতো তার পরিচয় পাওয়া যায়। "বিধবা যদি উত্তম বস্ত্র পরিধান করে এবং সমবয়স্ক রমণীদের সঙ্গে হাস্য করে তাহলে অনেক গৃহিনী খড়্গহস্ত হইয়া ওঠেন।.... আমরা অনেকবার অনেকের মুখে শুনিয়াছি ও অনেক স্থানে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি যে, অমুক তাঁহার বিধবা ভগিনীর নাসিকা কর্তন করিতে গিয়াছেন, অমুক তাঁহার বিধবা কন্যাকে প্রত্যহ পাদুকা প্রহার করিতেছেন, অমুক তাঁহার বিধবা পুত্রবধূকে ধানে ভাতে খাওয়াইতেছেন।"

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বালিকা বধূর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাত্র কয়েকমাস বয়সের কন্যাদের বিয়ে আমাদের ভারতের হিন্দু সমাজে সহজেই হতো। এসব অভিযোগগুলো খন্ডন করতে বলা যেতে পারে যে, ঐ প্রথা অশিক্ষিত সমাজেই সম্ভব; শিক্ষিত সমাজে নয়। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাসখ্যাত শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত নেতারা কে কতো বছরের বধূকে বিবাহ করেছিলেন, তাঁদের দু'চারজনের নাম স্মরণ করা যেতে পারে।

পূর্বে উল্লিখিত বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও প্রগতিবাদী নেতা রাজনারায়ণ বসু বিয়ে করেন এগারো বছরের বালিকাকে। সমাজসেবক, সমাজ সংস্কারক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক শিবনাথ শাস্ত্রী বিয়ে করেছিলেন দশ বছরের বালিকাকে। ধর্মীয় নেতা, মহাপন্ডিত কেশবচন্দ্র সেন বিয়ে করেছিলেন নয় বছরের বালিকাকে। বিলেত ফেরত বিরাট মানুষ, ইতিহাসখ্যাত পুরুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ে করেছিলেন আট বছরের বালিকাকে। বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত, মহাপন্ডিত, নারী সমাজের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও বিয়ে করেছিলেন আট বছরের বালিকাকে। বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট, ঠাকুর বাড়ির বিশেষ ব্যক্তি শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ে করেছিলেন সাত বছরের বালিকাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা শুধু ঋষি নন– মহাঋষি; সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ে করেছিলেন ছয় বছরের বালিকাকে। তাঁর যুগের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণকারী পন্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও বিয়ে করেছিলেন ছয় বছরের বালিকাকে। সরকারের পুরস্কার, পদক, উপাধি ও সৌজন্যপ্রাপ্ত, হিন্দু সমাজের পুনরুত্থানের জন্মদাতা, বঙ্গ সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠতম গুরু, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথমা স্ত্রীর বয়স ছিলো পাঁচ বছর মাত্র। [দ্রস্টব্য Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization 1849-1905]

৬৩২ খৃস্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পরলোকগমণ করেন। কিন্তু নারীজাতিকে যে মর্যাদা ও

www.pathagar.com

অধিকার দিয়ে গেছেন তা আজও বিশ্বের বিস্ময়। যে কোনো মহিলা তাঁর পিতামাতা ও স্বামীর সম্পত্তির অংশ পেতে বাধ্য। কিন্তু হিন্দু সমাজে কত বড় বড় পন্ডিত, মহাপন্ডিত, সিদ্ধপুরুষ, স্বামীজী, গুরুজি জন্মালেও তাঁদের নজর পড়ল না কন্যা শিশুদের প্রতি। অনেকেই ভাবলেন না যে তারাও মানুষ, তাদেরও অধিকার বলে একটা পাওনা আছে। যখন এই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করা হলো তখন পৃথিবীর বয়স অনেক বেড়ে গেছে এবং বহু বঞ্চিতা, রিক্তা, নির্যাতিতা ও অবহেলিতা নারী দুঃখের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে শেষ হয়ে গেছেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত মহিলারা তাঁদের মৃত বাবা-মা'র পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পত্তির অংশ পাওয়ার অধিকার রাখতেন না। মুসলমান মহিলারা যে অধিকার ভোগ করে আসছেন, হিন্দু মহিলাদের সেই অধিকার পাওয়া শুরু হলো সুদীর্ঘ ১৩০০ বছর পর।

কিছু আধুনিকবাদীদের মত হচ্ছে, মুসলমান সভ্যতা সারা পৃথিবী তথা ভারতেও প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম সমাজের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তুলনামূলক হিসেবে অনেক পিছিয়ে থাকার কারণে বলা যায়, হিন্দু সমাজের কু-সংস্কারগুলো মুসলমানরা গ্রহণ করেছে এবং এখনও অনেকে সেগুলো আঁকড়ে ধরে আছে। আজকের মুসলিম মহিলা সমাজের অবনতি ঘটেছে না বলে বরং অবনতি ঘটানো হয়েছে বলা ভালো। অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে গেছে তাদের। খেতে না পাওয়া কিলবিল করে পোকামাকড়ের মতো বেঁচে থাকা সমাজে চোখে পড়ার মতো কিই বা দেখাবার আছে তাদের? হিন্দু সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি আজকের আধুনিকতা বিকাশের প্রধান কারণ। নতুবা মাত্র কয়েক বছর পূর্বে ঠাকুরবাড়ির মতো পরিবারে রবীন্দ্রনাথের সহোদর ও পিতৃ দেবের ইতিহাস আলোচনা করলে আমাদের সমাজের পরিস্থিতি অনুমান করা সহজ হবে। রবীন্দ্রনাথের ভাই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রীকে পত্রে যা লিখেছিলেন সেটা হিন্দু সমাজের ও তাঁর বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেই বলা যায়– "তোমাকে ইংল্যান্ডে পাঠাইবার কোনো উপায় করিয়া দেন, বাবামহাশয়কে লিখিলাম। কিন্তু আমার সমুদয় যত্নই ব্যর্থ হইল। বাবামহাশয় চান আমি যেন অন্তঃপুরের মান-মর্যাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি অর্থাৎ তোমাকে চিরজীবনের মতো চারি প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ রাখি। আমি তো তাই বুঝিতে পারি না বাবামহাশয়ের এই ইচ্ছা কেমন করিয়া রক্ষা করি। তোমাকে আমি কারাবদ্ধ রাখিয়া কখনই সুখী থাকিতে পারিব না, এবং তাহা হইলে শরীর ও মন কখনই স্ফূর্তি লাভ করিতে পারিবে না। লোকেদের মনে এরূপ কেনো হয় যে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেয়া মহান অনর্থের মূল? আমার বিশ্বাস স্ত্রীলোকদিগকে অজ্ঞান ও পরাধীন করিয়া রাখাই অশেষ অনর্থের মূল।... তুমি যদি পঁচিশ বছর অন্তঃপুরে যেমন আছ এইরূপে বাস কর আর যদি দুই বৎসর আসিয়া ইংল্যান্ডে যাপন কর, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, ইংল্যান্ডে দুই বৎসর অন্তঃপুরের পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা বুদ্ধি-মনের উন্নতিকর ও বিকাশ কর দেখিতে পাইবে" [১৮৬৪ সালের জুলাই মাসের ২ তারিখে জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা তাঁর স্বামী সত্যেন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ৮ দ্রষ্টব্য]। মজার কথা হচ্ছে এই, জ্ঞানদানন্দিনীর যখন বিবাহ হয়, তিনি ছিলেন নিরক্ষর, পরে তাঁকে লেখাপড়া শেখানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিলো সাত বছর।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিবাহের সময় তাঁর স্ত্রী ছিলেন ১১ বছরের বালিকা এবং তিনিও ছিলেন নিরক্ষর। পরে তাঁকে খানিকটা বাংলা ও ইংরেজী শেখানো হয়েছিলো। বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ যতো আধুনিকবাদীই হোন তাঁর কন্যা রেণুকা দেবীর বিয়ে দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নামক এক পাত্রের সঙ্গে। পাত্রের বয়স ছিলো রবীন্দ্রনাথের কন্যার চেয়ে আড়াই গুণ বেশি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিন জামাতাকেই কয়েক সহস্র করে টাকা যৌতুক দিয়েছিলেন। কন্যাদের তিনি স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করেননি। কবি তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী

www.pathagar.com

দেবীকে স্কুলে পাঠিয়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি তাঁকে নিজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন বলে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নেই।

১৮৮৩ থেকে ১৯১০- এই সাতাশ বছরের শিক্ষিতা মহিলাদের তালিকা তৈরি করলে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ মহিলাই ছিলেন হিন্দুধর্ম বহির্ভূত। ঐ সময়ে মাত্র সাত জন্য এম.এ পাস করেছিলেন। মিস্ ভি. মুখার্জী, হৃদয়বালা বসু, রাজকুমারী দাস, মার্গারেট গুপ্তা, চন্দ্রমুখী বোস, হেমপ্রভা বসু ও নির্মলা সোম- এঁরা সকলেই ছিলেন খৃস্টান। শুধু হেমপ্রভা বসু ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা বি.এ. পাস ছিলেন তাঁরা হলেন ঃ প্রিয়ম্বদা বাগচী, ইন্দিরা ঠাকুর, জীবনবালা দত্ত, সরলা ঘোষাল, কুমুদিনী খাস্তগীর, কাদম্বিনী বসু, কামিনী সেন, জ্যোতির্ময়ী দত্ত, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, বাসন্তী মিত্র, কুমুদিনী মিত্র, শিশিরকুমারী বাগচী, প্রেমকুসুম সেন ও শশীবালা ব্যানার্জী। এঁরা প্রত্যেকেই হিন্দুধর্ম বহির্ভূত ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। প্রিয়তমা দত্ত, লীলা সিন্‌হা, এলেন চন্দ্র, ম্যাবেল সিংহ, রোসাবেল সিংহ, হৃদয়মোহিনী মিত্র, মেরী ব্যানার্জী, সুনীতি ঘোষ প্রমুখ-এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন খৃস্টান। তবে সুপ্রভা গুপ্তা শরৎ চক্রবর্তী, সুরবালা ঘোষ, সরলাবালা মিত্র, হিরন্ময়ী সেন, কমলা বসু, চারুবালা মন্ডল, সুরবালা সিন্‌হা, রমা ভট্টাচার্য, বনলতা দে, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ, শোভনবালা রক্ষিত, বিভা রায়, শিশির কুমারী গুহ- এঁরা বি.এ পাস করা হিন্দু মহিলা ছিলেন। এই সময়ের পরিধিতে তিনজন মাত্র এম. এ পাস ডাক্তার ছিলেন। বিধুমুখী বসু, ভায়োলেট মিত্র ও রেচেন কোহেন- এঁরা তিনজনেই ছিলেন খৃষ্টান। একজন মাত্র L. M. পাস করা মহিলা ছিলেন যাঁর নাম যামিনী সেন। ইনিও ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। [দ্রস্টব্য Calcutta University Calender, 1911]

১৮৬৩ হতে ১৯০৫- এই ৪২ বছরে যাঁরা লেখিকা ছিলেন, যাঁদের লেখা বাংলা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তাঁদের সংখ্যা ছিলো ঊনআশি। তাঁদের মধ্যে ৩৪ জন ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী, দু'জন খৃস্টান, দু'জন মুসলমান এবং অবশিষ্ট ৪১ জন ছিলেন হিন্দু। সুতরাং একথা সত্য নয় যে, শত সহস্র বছর ধরে হিন্দু সমাজের নারী প্রগতি ও উন্নতি একইভাবে চলে আসছে। অনুরূপভাবে একথাও সত্য নয় যে, মুসলিম নারী সমাজ শত সহস্র বছর ধরে এই রকম অনুন্নত এবং অবহেলিত। বরং সত্য তথ্য এটাই যে, হিন্দু নারী সমাজ ক্রমান্বয়ে যখন উন্নত হয়ে চলেছে, মুসলিম নারী সমাজের তখন হচ্ছে ক্রমাবনতি। এর পেছনেও আছে ঐতিহাসিক কারণ।

পুরুষ শাসিত সমাজে মুসলমান উপার্জনশীল পুরুষজাতি অর্থনৈতিক মেরুদন্ড যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তখন স্বাভাবিকভাবেই নারী সমাজও তাদের ছায়ার মতো হয়ে উঠলো অনুন্নত, অশিক্ষিত ও সংস্কৃতি বিবর্জিত।

হযরত মুহাম্মদের (সঃ) ইসলাম ধর্ম প্রচারের পর থেকেই আরবদেশে শতকরা পঁচানব্বইজন মুসলিম মহিলা জ্ঞান রাখতেন তাঁদের মাতৃভাষায়। অর্থাৎ তাঁরা মাতৃভাষায় কোরআন পড়তে পারতেন। হযরতের কন্যা ফাতিমা, স্ত্রী খাদিজা ও আয়েশা (রঃ) প্রমুখ মহিলাগণ শুধু শিক্ষিতই নন, বরং ছিলেন বিদূষী। হযরত আয়েশা ছিলেন কবি, রাজনীতিবিদ এবং যুদ্ধ বিশারদ। এমনিভাবে হযরত হাফ্সা, হযরত খাওয়ালা প্রভৃতি মহিলারাও শিক্ষিতা ছিলেন। শুধু আরবে নয়, তুরস্কেও হযরতের প্রভাবে শিক্ষার উন্নতি ছিলো বর্ধমান। তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় সেখানে মহিলা ডাক্তার ছিলেন সাত হাজার। ইরাকেও মুসলমান মহিলারা প্রায় পুরুষদের মতো সর্ববিভাগেই অংশীদার ছিলেন। নির্বাচনে তাঁরা শুধু ভোটারই ছিলেন না, বরং নির্বাচিত প্রার্থীও হতেন। ম্যাডাম আহমাদ ফরিদ, ইসমত সিররী প্রমুখেরা ছিলেন বিখ্যাত ও শিক্ষিতা মহিলা। এমনিভাবে তুরস্কে নেজহী মোহিউদ্দিন খানুম শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। নাইগার, লায়লা ও পেরিসেক খানুমও এমনিভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

ইরানের কথা বলতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয় এই কথা জেনে যে, ১৩১৬ খৃষ্টাব্দেও সেখানে ছিলো 'লেডিজ এসোসিয়েশন'। তার সব সদস্যাই ছিলেন সুশিক্ষিত। [তথ্য.ঃ The Muslim Womenhood in Revolution; M. H. Zaidi, Calcutta 1937]

এমনিভাবে সিরিয়ার নাজুক বেহাম ছিলেন একজন শিক্ষিতা মহিলা এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। চীনে যখন নারী ও পুরুষ সমাজ আফিমের নেশার ঘোরে বুঁদ হয়েছিল, মুসলমান সমাজ তখন এর থেকে মুক্ত ছিলো। মুসলমান মহিলাদের একজনকেও তদানীন্তন পর্যটকরা নেশাগ্রস্ত দেখেননি, বরং তাদেরকে উন্নত এবং শিক্ষিতই দেখেছিলেন। তিব্বতের মুসলিম মহিলারা শুধু শিক্ষিতই ছিলেন না, বেকার না থেকে তাঁরা তাঁদের স্বামীদের বড় বড় আমদানী রপ্তানীর ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করতেও পারতেন। [ঐ, পৃষ্ঠা ৬৮]

মাইজিয়েন, রুহিজে এবং মাকসীদে- আলবানিয়ার এই তিনজন মহিলা এবং ইরানের খানম ইখতিয়ার আজম ও ডক্টর খাদিজা কেজাবার্জ যে অত্যন্ত শিক্ষিত ও উন্নতমনা ছিলেন তা সর্বজনবিদিত।

মিশরে যুদ্ধের পূর্বে সমীক্ষকরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, সেখানকার মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩,০০০ শুধু ছাত্রীই ছিলো। সেটা বেড়ে পরে সংখ্যাটা তিন লাখে দাঁড়িয়েছিলো। হিলমি পাশা, ফাউজিয়া, নাজলী বেগ, ফাইজি, ফাইকা, মিসেস ফরিদা এবং ফাতিহা- মিশরের এই সাতজন দেশবিখ্যাত শিক্ষিতা নেতৃবৃন্দের মধ্যে পরিগণিত। [ঐ, পৃষ্ঠা ৮৯]

ভারতের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, চাঁদবিবি, রাজিয়া সুলতানা, নূরজাহান ও হযরতমহল বুদ্ধিমতী এবং শিক্ষিতা হিসেবে সর্বজনবিদিত। পন্ডিত মহিলা সুগ্রা হুমায়ুন মির্জা ছিলেন একজন সাংবাদিক এবং যশস্বী লেখিকা। আর একজন শিক্ষিতা মহিলা হলেন আশরাফুন্নিসা বেগম। মাইমুনা সুলতান শাহবানুও এক উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি পার্শী, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। সুলতানা জাহান বেগম ছিলেন বৃটিশের উপাধিপ্রাপ্ত শিক্ষিতা মহিলা। বাই-আম্মা আবেদাবানু, রোকেয়া খাতুন, করিমুন্নিসা, নুরুন্নিসা, দৌলতুন্নিসা, হোসনে আরা বেগম, রাবিয়া সুলতানা, মাহবুবুন্নিসা, আফজালুন্নিসা, মিস বুরহান, মিস সঈদ, আবিদা লতিফ, মিস সরওয়ার করিমুল্লাহ ও কারিমা বেগম- এঁরা সকলেই ভারতীয় বিদূষী ছিলেন এবং ভারতে বৃটিশ বিরোধী রাজনীতিতে এঁদের উপস্থিতি থাকলেও ইতিহাসে তাঁদের করা হয়েছে অনুপস্থিত।

খাদিজা বেগম লন্ডনের ডিগ্রীপ্রাপ্ত এবং আটটি ভাষায় পন্ডিত একজন ভারতীয় মহিলা। হালিমা খাতুন, প্রফেসর খুরশিদারা বেগম, মিসেস জুম্মান খাঁন, মিসেস কাসেম আলি, মিসেস নাজরুদ্দিন এবং শিরীন- এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সুশিক্ষিতা।

মিস জাকিয়াহ, রাজিয়া, বেগম এফ. এস. মুওয়ায়িদজাদা, মিসেস হাসিনা মুরশিদ- এঁরাও ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত মহিলা বুদ্ধিজীবী।

মিসেস হাসিনা মুরশেদ ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। শামসুন্নাহার মাহমুদ ছিলেন অধ্যাপিকা। মিসেস আসিয়া হাসান ছিলেন লন্ডনের ডিগ্রীপ্রাপ্ত একজন বিদূষী। মিসেস ইকবালুন্নিসা ছিলেন বিএ পাস এবং ডিপ.এড (লিডস)। বিদূষীদের মধ্যে এরা ছিলেন সফুরা খানম, সাহেরা খাতুন, কাজী সদরুন্নিসা, মিসেস আমিনুল হক, সৈয়দা ফাতেমা, সৈয়েদা শাহজাদী, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, আক্কিকুন্নিসা, তৈয়েবুন্নিসা, কাজী লুতফুন্নিসা, হোসনে আরা, হোসনা বানু, রওশন আরা, লায়লা হক, মিস্ নূরজাহান, চিকিৎসক ডাঃ কে. এন. খানম, মিস্

www.pathagar.com

বিরজিস আবদুল্লা, বিবি মুলুক, মিস্ শিরীন সুজাত আলী, মিসেস হিলালী, মিসেস রহীম, এডিনবার্গের ডিগ্রীপ্রাপ্ত শল্যচিকিৎসক কুমারী মাহমুদা, মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ।

ভারতের নেতৃস্থানীয়া শিক্ষিত মহিলাদের অনেকের মধ্যে আরো আছেন যেন পাটনার লেডী ইমাম, মহীশূরের লেডী মির্জা ইসমাঈল, ডঃ মিস্ সিরাজুদ্দিন এম.এ, পিএইচ.ডি, ইঞ্জিনিয়ার মিস্ আগা মুসতাফা খাঁন, লেডী মহম্মদ শফী, মহিলা উকিল মুওয়াইদজাদা সকিনা ফারুক সুলতান, বেগম মীর আমীরুদ্দিন, লেডি আব্বাস আলি বেগ, মিসেস কাসেম আলি, মাদ্রাজের হাসুরুন্নিসা বেগম, এম.এ, লেডী করিমভৈ, উকিল মিসেস হামিদা মোমেন, লক্ষৌর ওয়াসিম বেগম, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট বেগম হবিবুল্লা, লন্ডন থেকে পাস করা ব্যারিস্টার বেগম এম.এ ফারুকী প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের আরো বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন লেখিকা ও পত্রিকা সম্পাদিকা রোকেয়া মুওয়াইদজাদা কমর সুলতান, অর্থনীতি ও আরবীতে এম.এ সৈয়েদা ফাতেমা খাতুন, নাজমুন্নিসা খাতুন, কুমারী জাকিয়াহ মনসুর– বি.এ.বি.টি, বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখ।

ভারতের আরও কিছু খ্যাতনামা মহিলাদের মধ্যে আছেন বেগম শাহনাওয়াজ, আতিয়া বেগম, লেডি আব্দুল কাদির, বেগম হামিদ আলি, 'হার হাইনেস' উপাধিপ্রাপ্তা দুররে শেহবার, 'হার রয়াল হাইনেস' প্রিন্সেস নিলুফার, ইউরোপ পর্যটনকারী 'হার হাইনেস' বেগম রামপুরী, 'হার হাইনেস' ভূপালের বেগম সাহেবা, 'হার হাইনেস' মন্ডির রাণীসাহেবা, সাহেবজাদী নসিফুন্নিসা বেগম, 'হার হাইনেস' কারওয়াই'র বেগম সাহেবা প্রমুখ।

মাফরূহা চৌধুরী, কাজী লতিফা হক, জুবাইদা গুলশান আরা, সৈয়দা লুতফুন্নিসা, জেবুন্নিসা জামাল, হামিদা হাফেজ, সৈয়দা কানিজ ফাতিমা হোসেন বুলবুল, শেরিফা নারগিস আখতার রেখা, আখতার বানু বেলা, আলেয়া ফেরদৌসী, অধ্যাপিকা সাহেরা খাতুন, সালমা শহীদ চৌধুরী, দিল আফরোজ ছবি, শাহানা বেগম মলি, আসুরা খাতুন, লায়লা বিলকিস বানু, মাহবুবা সুলতানা, ফ্লোরা নাসরীন খান, মাহবুবা করিম, লিন্ডা রহমান, রেশমী আহমেদ রাসু, চৌধুরী মাহমুদা মঈন, নাসিমুন্নেসা নাসিম, ফরিদা আখতার খান, খোশনূর আলমগীর, সুরাইয়া চৌধুরী, কামরুন্নাজ সিদ্দীকা, সাবেরা শহীদ হাই, সৈয়দা মালেকা আকবরী, রীনা ইয়াসমিন খাঁন, নাসরিন মাহমুদ, সাহিদা আহমদ, মাহমুদ সুলতানা নুরুন্নিসা, নাহরিন জান্নাত জুবিলী, রোমিতা আহমেদ, রাবেয়া বেগম রুবী, মরিয়ম রহমান, মোহসিনা আকবর, সৈয়দা শামসুননাহার জামী এঁরা সকলেই ছিলেন শিক্ষিতা ভারতীয় মহিলা।

আজকের বাংলাদেশ নেত্রী শেখ হাসিনা, বেগম খালেদা জিয়া এবং পাকিস্তান নেত্রী বেনজির ভুট্টোকে দেখে একথা মনে করার কারণ নেই যে, মুসলমানরা জগতে শুরু করেছে অমুসলিমদের প্রভাবে। বরং সারা পৃথিবীর মহিলা সমাজের স্বাধীনতা, অধিকার, শিক্ষা ও চেতনার নেপথ্যে রয়েছে মুসলিম তথা ইসলামী সভ্যতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব। কারণ হযরত মহম্মদ (সঃ) আসার পর প্রত্যেকটি দেশেই কোরআন এবং হাদীসের নির্দেশমতো শুধু পুরুষরাই শিক্ষিত হননি, মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের চাপে তারা ক্রমশই পিছিয়ে পড়েছে, বঞ্চিত হয়েছে শিক্ষা এবং উন্নতির আলো থেকে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-২

বাংলাদেশে শিশু পতিতাবৃত্তি দেড়শ' বছর আগে

মুনতাসীর মামুন

এখন যেমন, তেমনি দেড়শ' বছর আগেও বালিকা অপহরণ, পতিতাবৃত্তি, শিশু পতিতাবৃত্তি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি কম হয়নি। অধিকাংশ লেখকই এর নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বৃটিশ সরকার এ ব্যাপারে কি করবেন তা ঠিক করতে ঢের সময় লেগেছে। পতিতাবৃত্তির প্রতি সামাজিক সম্মতি, শক্তিশালীর পৃষ্ঠপোষকতা যেমন ছিল তেমনি এর বিপরীতে পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের পক্ষেও জনমত ছিল। কলকাতার বাবু কালচারের একটি উপাদান তো· ছিল পতিতা। তবে, বালিকা অপহরণ এবং পরবর্তীতে তাকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ মধ্যশ্রেণী সমর্থন করেনি। পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠানো হয়েছে যে, এক বড় সংখ্যার বালিকার খোঁজ পাওয়া যায় না, তারা যায় কোথায়? তারা কি হারিয়ে গেছে? তাদের কি কোনো কারণে অপহরণ করা হচ্ছে? এবং এই অপহরণ বা অপহৃত বালিকারা কি পতিতাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে? যদি তাই হয়ে থাকে সরকারের কি তাহলে কিছুই করার নেই? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা ও করণীয় জানার জন্য সরকার ১৮৭২ সালের দিকে একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশন সারা বাংলা থেকে মতামত আহবান করে রিপোর্ট পেশ করে। নিম্নবঙ্গের যে সব এলাকা (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল তারই ভিত্তিতে রচিত হয়েছে এ প্রবন্ধ।

একথা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না যে, উনিশ শতকে বিশেষ করে মধ্যভাগের পর বাংলাদেশের শহর-বন্দর, গ্রামে-গঞ্জে পতিতাবৃত্তি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। বাবু কালচারের কারণে রাজধানী কলকাতা যে পতিতাবৃত্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল তা বলাই বাহুল্য। সেই ১৮৫৭ সালে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল– "এই কলিকাতা রাজধানীর প্রজাদিগের বসতি শৃঙ্খলা কিছুই নাই যেখানে বাজার সেইখানেই ভদ্রলোকের বাস, বিশেষত বেশ্যারা ইচ্ছানুসারে সকল স্থানে বাস করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়াতে আরো মন্দ হইয়াছে, তাহাতে অনেকে সুপথ পরিহার পূর্বক তাহার দিগের কুহক-চক্রে পতিত হইয়া কুমার্গে কলঙ্ক এই রাজধানীতে ক্রমে যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বিজ্ঞলোক মাত্রেরই অন্তঃকরণে ভয় জন্মিয়াছে, এমন পল্লীপথ বা গলি নাই যে স্থানে বারবিলাসিনীদিগের আবাসস্থান দৃষ্টিগোচর না হয়, মদ্যপান, ধূম্রপান গুলি গাঁজা হুররা টান ইত্যাদি টান-পানের ব্যাপার বারাঙ্গনা ভবনেই অধিক হইয়া থাকে, দুই দুরাত্মা তস্কর প্রতারক ঠক ইত্যাদি অসদ্বৃত্তোপযোগী কুলোকেরা বেশ্যাগারেই বাস করে.... ।"

কলকাতার কথাই বাদ দিই। নিম্নবঙ্গের প্রধান শহর ঢাকার অবস্থা কি ছিল? ১৯৬৪ সালে ঢাকার একটি পত্রিকা লিখেছিল–

"... ঢাকায় ক্রমেই বেশ্যার সংখ্য অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। বিগত ১০ বৎসর পূর্বে এখানে যে পরিমাণ বেশ্যা ছিল এক্ষণে তাহার চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বে উত্তম উত্তম যে সকল একতলা ও দোতলা দালান আছে, তাহার সমুদয়ই প্রায় বেশ্যাপূর্ণ হইয়াছে। বেশ্যাবাস সংশ্রব নাই, রাজপথের উভয় পার্শ্বে এরূপ উৎকৃষ্ট দালানই নাই বলিলে হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলেও অসংখ্য বেশ্যাবাস লক্ষিত হয়। পূর্বে যে সকল স্থলে বেশ্যার নাম গন্ধও ছিল না, এক্ষণে তাহার কোনো কোনো স্থান কলিকাতার মেচো বাজারের প্রতিযোগী হইয়া উঠিয়াছে।..."

www.pathagar.com

১৯০১ সালে, সরকারী হিসাব মতে, ঢাকায় বারাঙ্গনার সংখ্যা ছিল ২১৬৪ জন। আর শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৯০,৫৪২ জন।

পূর্ববঙ্গে পতিতার সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে ১৮৬৫ সালে পূর্ববঙ্গের একটি পত্রিকা লিখেছিল–

"এক্ষণ স্থানে ২ বেশ্যার সংখ্যা যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, যদি কতিপয় বৎসর এই নিয়মে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কালে স্থান বিশেষের গৃহস্থ বা স্ত্রীর সংখ্যা প্রায় শূন্য হইয়া যাইবে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় নহে। অতএব, গভর্নমেন্ট এক্ষণ হইতেই লোকের বেশ্যাশক্তি ও বেশ্যা হওয়ার প্রবৃত্তি মন্দীভূত করিতে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনীয়।" গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিটি গঞ্জে পতিতালয় ছিল। অনেক সময় জমিদার বা যিনি গঞ্জের মালিক তিনিই কয়েক ঘর পতিতা এনে বসাতেন গঞ্জে; যাতে তার টানে হাটে লোক আসে।

সরকার যে রিপোর্ট তৈরি করেছিল তাতে উপরোল্লিখিত চিত্রটি অবশ্য আসেনি। সরকার আলোচনা নির্দিষ্ট রাখতে চেয়েছিল পতিতাবৃত্তি, শিশু পতিতাবৃত্তি এবং বালিকা অপহরণ বিষয়ে। বিভিন্ন জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বালিকা অপহরণ সম্পর্কে তারা তেমন কিছু জানেন না। আবার তারা এও স্বীকার করেছেন যে, পতিতালয়ে বালিকা (শিশু) আছে। এর অর্থ বালিকা অপহরণের সঙ্গে পতিতালয়ের যোগ আছে। অপহৃত না হলে পতিতাবৃত্তির জন্য বিভিন্ন উপায়ে বালিকা সংগ্রহ করা হতো। কারণ, উল্লিখিত সংবাদগুলোতে দেখছি, পতিতাবৃত্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং চাহিদা থাকলে সরবরাহ থাকবেই। সরকারি রিপোর্টে এসব বিষয়গুলো আসেনি।

এবার দেখা যাক বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সরকার এ বিষয়ে কি রিপোর্ট পেয়েছিলেন? অধিকাংশ রিপোর্টের ধরন অবশ্য একই রকম।

চট্টগ্রামের কমিশনার এইচ হ্যাংকির রিপোর্ট অনুসারে সারাদেশেই এই কুপ্রথা চলিত তবে, চট্টগ্রামে তা খুব প্রচলিত নয়। অর্থাৎ শিশু পতিতাবৃত্তি। আইন করে শিশু পতিতাবৃত্তি রদ করা যায় বটে কিন্তু তাতে ঝামেলা প্রচুর। সে ক্ষেত্রে এসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাই ভালো।

বালিকারা যারা পতিতাদের খপ্পরে পড়ে বা আশ্রয় পায় তারা প্রধানত নিম্নবর্গের এবং হিন্দু। পতিতাদের বাড়ি এসব (হারিয়ে যাওয়া) বালিকাদের এক ধরনের আশ্রয়। বয়স হলে তারা ব্যবসায় যোগ দেয়; না হয় গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ পায় অথবা ভবঘুরে হয়ে যায়।

মুসলমান পতিতারাও হিন্দু নাম নেয়। এর কারণ দু'টি।

১. হিন্দু নাম হলে মক্কেল বিশেষ করে হিন্দু মক্কেল পাওয়া যায়। মুসলমান হলে তা পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। অবশ্য মুসলমানদের নিকা-বিবাহ-এ তাতে অসুবিধা হয় না।

২. হিন্দুদের আচার-আচরণ মক্কেলরা পছন্দ করে। এ কারণে, মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায়ও হিন্দু পতিতাদের সংখ্যা বেশি। পতিতাবৃত্তি বংশবৃত্তিক নয়। তবে পতিতাদের সরবরাহে ভাটা পড়ে না। গরিব কৃষক থেকে বালিকা ক্রয় করা হয়, অনাথ বালিকাদের পোষ্য নেয়া হয়। বিধবারা যোগ দেয়। মক্কেলদের কারণে পতিতারা প্রায় তাদের বর্ণ (Caste) পরিবর্তন করে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতার স্বাদ'-এ এক হিন্দু বারাঙ্গনা মুসলমানকে ঘরে নেয়ার জন্য জাত যাবার ভয়ে আকুল হয়ে উঠেছিল– এ কথা পড়ে এক সময় বেশ আশ্চর্য লেগেছিল। কিন্তু দেড়শ' বছর আগেও একই বিষয় প্রচলিত ছিল। কেন? সমাজতত্ত্ববিদরা হয়তো এর উত্তর দিতে পারবেন। ১৮৯৭ সালের দিকে সিলেটের এক ছোটখাটো জমিদার গনিউর রাজা ঢাকার এক পতিতার কাছে নিশি যাপন করেছিলেন। তাঁর রোজনামচায় লিখেছিলেন, সরলা (পতিতা)

www.pathagar.com

তাকে এক পর্যায়ে বলেছিল– 'যদিও সে তোমাকে হিন্দু বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল, কিন্তু তুমি যে মোসলমান তাহা আমি পূর্বেই বুঝিয়াছি। আমরা হিন্দু রমণী মোসলমানকে জায়গা দেই না, সমাজে দূষিত হইতে হয়, আমি বলিলাম, তোমাদের আবার সমাজ আছে নাকি? সে বলিল, থাকিবে বই কি যদিও আমরা নাম লিখাইয়াছি তথাপি আমাদের হিন্দুয়ানী সবই বজায় আছে। এই যে আমাদের পাড়া দেখিতেছ, এই পাড়ায় হিন্দু ভিন্ন অন্য কোনো মেয়েমানুষ নাই, অন্যান্য পল্লীতে মোসলমান ইত্যাদি অন্যান্য জাতি মেয়েমানুষ আছে। কিন্তু আমাদের পাড়াতে ও কতওয়ালীর ধারে ও শাঁখারী পট্টিতে হিন্দু জাতি ছাড়া অন্য জাতি মেয়েমানুষ নাই। তাহারাতে ও আমরাতে ঐ এক সমাজ বটে।' হিন্দু নাম নেয়ার আরেকটি কারণ থাকতে পারে। হয়তো হিন্দু মক্কেল অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল কারণ, তারা ছিল অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী। মুসলমানদের অবস্থা তেমন ছিল না। এবং হয়তো হিন্দু মক্কেলরা হিন্দু রমণীই পছন্দ করত বেশি।

ঢাকার কমিশনার এবারক্রম্বি জানিয়েছিলেন, সারা ভারতেই পতিতারা বালিকা প্রতিপালন করে তাদের পেশায় নিয়োগের জন্য। পতিতাদের অধিকাংশই হিন্দু। বিধবা বিবাহে প্রতিবন্ধকতা, হিন্দু সমাজের কঠোর আইন, কুলিনপ্রথা– এসবই এর কারণ। পতিতাদের কাছে যেসব বালিকা আছে তা হয় তাদের নিজের অথবা গরীব কোনো পিতামাতা থেকে ক্রয় করা। তবে, অপহরণ করে প্রায় সব বালিকা আনা হয় তা বোধ হয় ঠিক নয়। আইন করে বিষয়টি রদ করা যায় বটে কিন্তু সমাজ এসব বালিকাদের গ্রহণ করবে না। যে সব বালিকা পতিতালয়ে থাকে তারা তা বিধিলিপি হিসেবেই মেনে নেয়। এবং প্রথম সুযোগেই পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করে।

প্রায় সব পতিতাদের মতোই অচিরে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে, বিপজ্জনক ঔষধ বা ড্রাগ সেবন করে এবং যৌন রোগেই মৃত্যুবরণ করে। যারা বেঁচে থাকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তারা যেসব বালিকা আশ্রয় নিয়েছিল তাদের নিয়োগ করে পতিতাবৃত্তিতে এবং তাদের রোজাগারে চলে। অনেকে বোস্টমী হয়ে যায় বা ভিক্ষা করে। মুসলমান মেয়েরা পরিচারিকার কাজ লাভ করে।

ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডি. আর. লায়াল জানিয়েছেন, বালিকাদের পতিতাবৃত্তির জন্য অপহরণ করা হয় এ বিষয়ে তিনি অবগত নন। দু'একটি ক্ষেত্রে অবশ্য বালিকা বিক্রির ব্যাপারটি জানা যায় যখন বিক্রেতা রেজিস্ট্রারের কাছে আসে রেজিস্ট্রি করতে। এ ধরনের বিষয় অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করা হয়। তিনি জানিয়েছেন, শিশু পতিতাদের অধিকাংশ পিতৃমাতৃহীন হিন্দু বালিকা। আইন করে এটি বন্ধ করা যায় বটে, কিন্তু তাতে লাভ হবে না বরং ভ্রূণ হত্যা বাড়বে মাত্র।

ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লিউ. এস. ওয়েলসের রিপোর্টটি ভিন্নতর। তিনি জানাচ্ছেন, বালিকাদের পতিতা হিসেবে তৈরি করার প্রক্রিয়াটি বেশ চালু, শহর থেকে অনেককে ক্রয় করা হয়; কিন্তু যোগাড় হয় পোষ্য গ্রহণের মাধ্যমে। পতিতাদের কাছে কোনো পুত্র সন্তান পাওয়া যাবে না। এর অর্থ শিশু হত্যা প্রচলিত। তিনি আরো জানিয়েছেন স্থানীয় ভূস্বামীরা পতিতাবৃত্তিকে উৎসাহিত করে। কোনো গঞ্জ বা হাট বসালে তারা সেখানে কয়েকঘর পতিতা বসাবেই। কারণ এতে খদ্দেরের সংখ্যা বাড়বে। ওয়েলস লিখেছেন তার জেলায় এ বিষয়ে একটি মামলা চলছে। মামলাটি হলো স্থানীয় এক জমিদার এক বালিকাকে পঁচিশ টাকায় বিক্রি করেছেন এক পতিতার কাছে।

রাজশাহীর কমিশনার রবিনসন, দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট লোইসের রিপোর্ট চাটগাঁ বা ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটের মতোই। তবে রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট জে. এস. কার্স্টারস জানিয়েছেন, নাটোরে ৪১ জন হিন্দু পতিতা আছে এবং এর মধ্যে ৩১ জন তাদের সন্তান। ম্যাজিস্ট্রেট এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি এই ৩১ জনের অধিকাংশই সংগৃহীত।

সিরাজগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট পি. নোলানের রিপোর্টটিও ভিন্ন রকম। তিনি বলেছেন, সিরাজগঞ্জে পতিতাবৃত্তির জন্য বালিকা বিক্রয়ের প্রথাটি চালু এবং প্রত্যেকেই একটি বালিকা পোষ্য নিতে

www.pathagar.com

চায় যাতে বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের সময় বালিকার কোনো অভাব হয় না। স্বাভাবিক সময়ে সংগ্রহের ব্যাপারটি একটু কঠিন হয়ে উঠলেও তারা তাদের প্রয়োজনীয় বালিকা সংগ্রহ করে নেয়। নোলান চমকপ্রদ একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। এক কৃষকের ছিল মেয়ে, এক পতিতার ছেলে। দু'জনেই সন্তান হাত বদল করলো কারণ নিজ নিজ সন্তান তাদের জন্য ছিল বোঝা স্বরূপ। সংক্ষেপে যে কোনো বালিকা যে অনাথ বা অবিবাহিত সে পতিতালয়ে আশ্রয় পাবেই।

রিপোর্টগুলো বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পতিতাবৃত্তি প্রসারিত হচ্ছিল এবং বালিকাদেরও সংগ্রহ করা হতো পতিতাবৃত্তির জন্য। এ ছাড়া সমাজচ্যুত বা বিধবা রমণীরাও স্থান পেত পতিতালয়ে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং এর কারণ হিন্দু ধর্মের মধ্যেই ছিল নিহিত। বাংলাদেশের যে সব অঞ্চলে নদী ভাঙতো, কৃষক গৃহহীন হতো সে সব অঞ্চল থেকে বালিকা সংগ্রহ ছিল সহজ যা এখনও প্রযোজ্য।

সরকারী কমিশন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে, শিশু পতিতাবৃত্তি নিয়ে আইন পাস করা উচিত, কিন্তু এক্ষেত্রে বালিকাদের ভার সরকারকে নিতে হবে কারণ সমাজ এদের গ্রহণ করবে না। সামাজিক বাধাও আসতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের সম্পর্কেও সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। কমিশনের ভাষায় সাংবাদিকরা– Very dangerous political advisers, and hypocritical into the bargain. They have just learnt enough of our principles to throw them into our face, and they in one way represent real native opinion by which we might in these matters be guided.

পূর্ববঙ্গের লে. গভর্নর অবশ্য লিখেছিলেন পতিতাবৃত্তির জন্য বালিকা বেশি বিক্রি হয় উড়িষ্যা এবং বিহারে। পূর্ববঙ্গে তেমন নয়। এবং হিন্দু বিধবারাই বিভিন্ন কারণে পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং হিন্দু বিধবাদের যাতে পুনর্বিবাহ হয় সে বিষয়ে জোরদার ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এসব বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে তারপর দীর্ঘ সময় লেগেছে।

তথ্য সূত্র ঃ Proceeding of the Government of India, Home Judicial, 1873.

পরিশিষ্ট—৩

ইসলাম এবং নারী

মুহাম্মদ কুতুব

নারীর অধিকার নিয়ে উদগ্র এক উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে আজ প্রাচ্য জগৎ। তোলপাড় চলছে পুরুষের সঙ্গে তার নিখাঁদ সমতার দাবীতে। নারীর অধিকারের অতি হুজুগে প্রবক্তাদের মধ্যে আছে এমন এক শ্রেণীর পুরুষ এবং নারী যারা বিকারগ্রস্ত বাতুলের মতো কথার তুবড়ি ফোটাচ্ছে ইসলামের নামে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম নারী এবং পুরুষের মধ্যে বজায় রেখেছে পরিপূর্ণ সমতা এমন বল্গাহীন ফতোয়াও দিচ্ছে এদের কেউ কেউ দুষ্টবুদ্ধি তাড়িত হয়ে। আর একদল আছে ইসলাম সম্পর্কে যাদের বক্তব্য চরম মূর্খতার নামান্তর। কিংবা কোনো কিছু না জেনেই তারা উদ্গার করছে বাষ্প। এদের জ্ঞানের বহর দেখে করুণার উদ্রেক হয়। এই বাচালের দল বলছে ইসলাম নারীর শত্রু। বুদ্ধির ক্ষীণতার অজুহাত দেখিয়ে ইসলাম নাকি খাটো

www.pathagar.com

করেছে নারীর মর্যাদা, তাকে নামিয়ে এনেছে অধঃস্তন প্রাণীর সমপর্যায়ে। এদের মতে, নারীকে অবনত করে তাকে কেবলমাত্র পুরুষের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উপকরণ আর মানব বংশবৃদ্ধির যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে এই অনুশাসনে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী কি পরিমাণে পুরুষের আজ্ঞাবহ আর কিভাবে পুরুষ তার ওপর সর্বাত্মক আধিপত্য ভোগ করছে এটা প্রমাণ করার জন্যে এ ধরনের খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে এরা।

এই উভয় শ্রেণীর লোকই ইসলাম সম্পর্কে সমান অজ্ঞ। কিংবা বলা যায়, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদের প্রতারিত করে সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অশুভ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যেই এরা সত্যকে এভাবে মিথ্যার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ঘোলা করতে নেমেছে পানি।

ইসলামে নারীর স্থান কতখানি তার ওপর বিশদ আলোচনা শুরু করার আগে প্রথমে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু আলোকপাত করতে চাই ইউরোপের নারী মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে। কেননা আধুনিক প্রাচ্য জগতের সব বিভ্রান্তি আর অশুভ প্রবণতার মূল উৎস এই একটি জায়গায়।

গোটা ইউরোপে এবং বলতে গেলে তাবৎ দুনিয়ায় চরম উপেক্ষিত ছিল নারী। তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হতো। অস্বীকার করা হতো তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। 'পন্ডিত' এবং 'দার্শনিক' সমাজে বহু অনুসন্ধিৎসা, মুখরোচক আলোচনা আর বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল নারী। এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিতন্ডা করতেন সেকালের ইউরোপের তথাকথিত জ্ঞানী ব্যক্তিরা ঃ নারীর কি আদৌ কোনো আত্মা আছে? যদি সত্যি থেকে থাকে তাহলে সে আত্মার স্বরূপটা কি? ওটা কি মানুষের, না জন্তুর? মানুষের আত্মা হয়ে থাকলে পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিভাবে নির্ণীত হবে তার সামাজিক কিংবা মানসিক স্থান? পুরুষের সেবাদাসী হিসেবে কি জন্ম হয়েছে তার? কিংবা দাসীর চাইতে কিঞ্চিত ওপর নারীর স্থান?

ইতিহাসের যুগ-পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত একটি পরিসরে নারী যখন কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলো সামাজিক পটভূমিতে, তখনো কিন্তু অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটলো না। আমরা এখানে গ্রীক এবং রোমান সাম্রাজ্যের সেই বহু কথিত চরম উৎকর্ষের যুগের কথা বলছি। এ যুগের নারীর সব মহিমা এবং আধিপত্যকে সাধারণভাবে নারী সমাজের উৎকর্ষ কিংবা প্রতিষ্ঠা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না কোনো মতেই। রাজধানী নগরীগুলোতে বাস করতেন এমন কিছু সংখ্যক অসামান্য রূপবতী এবং অভিজাত পরিবারের মহিলাই প্রতিষ্ঠার চূড়ায় উঠেছিলেন গ্রীক আর রোমান যুগে। সামাজিক জৌলুস আর অনুষ্ঠানের শোভা বাড়াতেন এই রমণীকূল। ইন্দ্রিয়পরায়ণ শৌখিন ধনপতিদের এরা ছিলেন লীলা সঙ্গিনী, তাদের চিত্তবিনোদনের উপাচার। নিজেদের ঐশ্বর্য এবং কৌলিন্যের প্রতাপ জাহির করবার জন্যেই সামাজিক উৎসব আর ক্রিয়াকলাপে রূপবতী এসব মহিলার উপস্থিতিকে নন্দিত করতো ধনবান আত্মগর্বী পুরুষরা। কিন্তু এর থেকে এটা বোঝা যায় না, মানুষ হিসেবে নারী কোনো সম্মান এবং শ্রদ্ধার আসন পেয়েছে। আসলে আনন্দের খোরাক হিসেবেই লোক সমাজে বিচরণের সুযোগ দেয়া হয়েছিল তাকে।

ভূমিদাস প্রথা আর সামন্ত আধিপত্যের যুগেও নারীর এ সামাজিক অবস্থা ছিল অপরিবর্তিত। নিজের অজ্ঞতার কারণে সে কখনো বিলাসের স্রোতে, কখনো উদ্দাম বলগাহীনতায় দিয়েছিল গা ভাসিয়ে। আবার কখনো পশুর মতো তৃপ্ত থাকলো পান-ভোজনে আর সন্তান উৎপাদনে। তৃপ্ত থাকলো অন্যের ভোগের সামগ্রী হয়ে, রাতদিন গতর খেটে।

এরপর ইউরোপে এলো শিল্প-বিপ্লব। কিন্তু এ পরিবর্তন নারীর জন্যে আনলো আরো বেশী দুর্গতি, গ্লানি এবং যন্ত্রণা। মানব জাতির ইতিহাসে আগাগোড়া যে লাঞ্ছনা সে ভোগ করে এসেছে

www.pathagar.com

তার সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায় এ তিক্ততম নতুন অভিজ্ঞতা।

সব ক'টি যুগে ইউরোপ নারীর প্রতি দেখিয়ে এসেছে এমন রূঢ় অনীহা, উপেক্ষা এবং ঘৃণা। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে উদারতা এবং প্রশস্তচিত্ততা দুইয়েরই চরম অভাব। ইউরোপীয় সমাজের প্রকৃতিগত এই মনোভঙ্গীর ফলে পুরুষদের কঠোর শ্রম করতে হয়েছে কোনো প্রত্যক্ষ কিংবা বস্তুগত ফায়দা ছাড়াই। অবশ্য সামন্ত যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং কৃষি-বৃত্তিতে পরিবর্তন নারীর ভরণপোষণে বাধ্য করলো পুরুষকে। এটা ছিল যুগের ধারার সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। তাহলেও সেকালে একদম অলস বসে থাকলো না মেয়েরা। সব কৃষি সমাজে দেখা যায় এমন সব ছোটখাটো কুটীর শিল্পের কাজ করতো তারা। এভাবে পুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতার মূল্য শোধ করলো তারা নিজেদের শ্রমের কড়ি দিয়ে।

ইউরোপের গোটা সামাজিক দৃশ্যপট বদলে যায় শিল্প বিপ্লবের অভিঘাতে। শহরের মতো গ্রামীণ জীবনেও সূচিত হয় এক আমূল পরিবর্তন। পুরোপুরি ভেঙ্গে যায় পারিবারিক জীবনের ভীত। নারী এবং শিশুরা বাধ্য হয় ঘর ছেড়ে কল-কারখানায় কাজ করতে। আগে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্নেহ-মমতার যে একটা গভীর বন্ধন ছিল, এই পরিবর্তনের ধাক্কায় তা একদম শিথিল হয়ে পড়ে। যৌথ দায়িত্ববোধ আর সমবায়িক নীতিতে এতকাল সুসংবদ্ধ ছিল গ্রামীণ জীবন। শ্রমিক শ্রেণী আস্তে আস্তে এই জীবন ছেড়ে শহরে এসে ওঠে। শহরের জীবন ছিল একটি বদ্ধ নিঃসঙ্গ জীবন। এখানে কেউ কারো ধার ধারতো না। খবর রাখতো না ঘরের কাছের পড়শীর। এই আত্মকেন্দ্রিক জীবনে অন্যের প্রতি দাক্ষিণ্যের এবং উদার সহানুভূতির মনোভাব হারিয়ে ফেলে মানুষ। তারা একা কাজ করতো এবং রোজগার করতো শুধু নিজেকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে। নিজের ভরণপোষণের জন্যে। স্বার্থপর এই পরিবেশে পুরাতন সব মূল্যবোধ গেলো উবে। উপেক্ষিত হলো সাবেক যুগের নৈতিক অনুশাসন এবং চারিত্রিক নীতিবোধ। এসবের প্রতি আর কারো কোনো রকম শ্রদ্ধা ছিল না। উচ্ছৃঙ্খল আর অনাচারী হয়ে পড়লো পুরুষের মতো নারীরাও। বিসর্জিত হলো চরিত্র গৌরব। নৈতিকতার আর কোনো তোয়াক্কা রাখলো না তারা। সুযোগ পেলেই হন্যে হয়ে তৃপ্ত করতো জৈবিক ক্ষুধা। অশুভ এই প্রবণতার ফলে বৈবাহিক জীবন এবং পরিবার প্রতিপালনে চরম রকমের একটা অনীহা সৃষ্টি হলো এ শ্রেণীর লোকের মধ্যে। কারো কারো মনে সংসারী হওয়ার ইচ্ছা থাকলেও সেই ইচ্ছাকে অন্তত আরো কয়েক বছরের জন্যে এই উদ্দামতার ভেতর চাপা দিয়ে রাখলো তারা।*

ইউরোপের ইতিহাস নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করতে চাই না। যেসব কারণ এবং ঘটনা প্রবাহ ইউরোপীয় ইতিহাসে নারী জীবনকে প্রভাবিত করেছে, আমরা কেবল সে ব্যাপারেই আগ্রহী। শিল্পবিপ্লব কি সাংঘাতিকভাবে ইউরোপের নারী এবং শিশু সমাজকে শ্রমভাবে ন্যুব্জপৃষ্ঠ করেছেন তার আভাস দেয়া হয়েছে আগের পৃষ্ঠাগুলোতে। পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল এবং গ্রন্থিচ্যুত করেছে এই পরিবর্তন। যার পরিণামে টুকরো টুকরো হয়ে একেবারে ভেঙ্গে-গুঁড়িয়ে

* *বস্তুবাদ আর মার্কসীয় দর্শনের প্রবক্তাগণ এসব তথ্যের ভিত্তিতেই দাবী করছেন : অর্থনৈতিক অবস্থাই পুরোপুরী দায়ী সামাজিক অবস্থার জন্যে এবং শুধুমাত্র অর্থনৈতিক পরিবেশই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে মানুষের যৌথ বা পারস্পরিক সম্পর্ক। মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক কর্মধারার গুরুত্বকে আমরাও অস্বীকার করি না। কিন্তু কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণই মানুষের চিন্তা, অনুভূতি এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, এ ধারণা ভুল। আসলে কোনো উচ্চতম নৈতিক আদর্শ না থাকার ফলেই ইউরোপীয় জীবনে এতটা প্রচন্ড প্রভাব ফেলেছে অর্থনৈতিক ঘটনা প্রবাহ। ইসলামী জগতের মতো কোনো মহৎ নৈতিক অনুশাসন থাকলে আত্মিক দিক থেকে সমুন্নত হতে পারতো ইউরোপ। আর এর ফলে ইউরোপীয়রা পারতো খাঁটি মানবিক আদর্শে তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে সংহত করে তুলতে। এতে করে সে কেবল তার অর্থনৈতিক চাহিদাই অনুধাবন করতে পারতো না, বাদবাকী দুনিয়ার মানুষকে রেহাই দিতে পারতো তার শোষণ এবং বিত্ত-লালসা সঞ্জাত চরম পীড়ন আর দুর্গতি থেকে।*

www.pathagar.com

যায় পারিবারিক জীবন। কিন্তু এর জন্যে সবচেয়ে বেশী মূল্য দিতে হয় নারীকে। আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় তাকে শিকার হতে হলো কঠোরতম শ্রমের। হারালো সে তার সামাজিক মর্যাদা। কিন্তু বিনিময়ে তেমন কিছুই জুটলো না তার ভাগ্যে। মানসিক কিংবা বস্তুগত কোনো দিক থেকেই সুখী এবং তৃপ্ত হতে পারলো না সে। পুরুষ কেবল নারীর অভিভাবকের দায়িত্ব থেকেই সরে দাঁড়ালো না, নারীর ওপর চাপালো নারীর নিজের প্রতিষ্ঠার এবং ভরণপোষণের দায়িত্ব। স্ত্রী কিংবা জননী সবার ক্ষেত্রেই চাপানো হলো এই বোঝার গুরুভার, কারখানার কাজে তাকে নির্মমভাবে শোষণ করলো কারখানার মালিকগণ। অনেক বেশী সময় ধরে তাকে কাজ করতে হলো সেখানে। কিন্তু একই কারখানায় একই ধরনের কাজের জন্যে যে পারিশ্রমিক দেয়া হতো পুরুষকে, তাকে দেয়া হতো তার চেয়ে অনেক কম।

কেন এসব ঘটলো সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। কেননা ইউরোপের কৃপণতা, অনুদারতা এবং নির্মমতার কথা কম-বেশী সবারই জানা। মানুষকে কখনো মানুষ হিসেবে সম্মান দিতে শেখেনি এই মহাদেশে। মানুষের ক্লেশ এবং দুর্গতি মোচনের জন্যে স্বেচ্ছায় তাকে কোনো মহৎ কাজে আত্মনিবেদিত হতেও দেখা যায়নি সে পরিমাণে যতোটা সে মুক্তকৃচ্ছ হয়ে যন্ত্রণাক্লিষ্ট করেছে মানব সমাজকে। এর সাক্ষ্য দেবে ইউরোপের অতীত, এমন কি তার বর্তমানও। অনাগত বছরগুলোতে, এ অবস্থার পরিবর্তন হবে এমন কোনো লক্ষণ স্পষ্ট নয় দৃষ্টি-দিগন্তে। একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যদি তাকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করেন এবং আলোকিত করেন তার আত্মাকে, তবেই কেবল সম্ভব হতে পারে বাঞ্ছিত পরিবর্তন।

অবশ্য এমন কিছু বিবেকমান মানুষও সেখানে ছিলেন যাঁরা নীরবে সহ্য করতে পারেননি জনসংখ্যার দুর্বল অংশের প্রতি এই ন্যক্কারজনক অবিচার। শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতার অবসান ঘটানোর জন্যে সংগ্রাম করলেন তাঁরা। এখানে লক্ষ্যণীয়, এ সংগ্রামটা স্রেফ শিশুদের জন্যে–নারী মুক্তির জন্যে নয়। অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েদের শ্রমিক হিসেবে কারখানায় নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুললেন সমাজ সংস্কারকরা। যুক্তি দেখালেন, অল্প বয়সে কাজের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে রুদ্ধ করে দেয়া হচ্ছে তাদের দেহের স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি। তাছাড়া রুক্ষ এবং কষ্টসাধ্য কাজের জন্যে তাদের দেয়া হচ্ছে নগণ্য পারিশ্রমিক। সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে উচ্চারিত এই প্রতিবাদ ব্যর্থ হয়নি শেষ পর্যন্ত। পাওয়া গেলো এর সুফল। আস্তে আস্তে বাড়ানো হলো মজুরীর হার। আর সে সঙ্গে সংকুচিত করা হলো শ্রমের মেয়াদ বা শ্রম-ঘন্টা।

কিন্তু তখন পর্যন্তও কেউ এগিয়ে এলো না নারীর অধিকার আদায়ের দাবী নিয়ে। এর জন্যে যে উদারতা আর মানসিক উৎকর্ষের প্রয়োজন, ইউরোপীয়দের তা ছিল না। ফলে অস্তিত্ব রক্ষার অনিবার্য প্রয়োজনে কঠিন এবং দুঃসহ শ্রমের এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে আপন পথ করে নিয়ে চলতে হলো নারীকে। একই কাজ ও মেহনত করেও সহপুরুষ শ্রমিকের চেয়ে অনেক কম মজুরী পেয়ে তৃপ্ত থাকতে হলো তাকে।

ঘটনার নাটকীয় পরিবর্তনের সূত্রপাত হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে। লাখ লাখ ইউরোপীয় আর আমেরিকান তরুণ নিহত হলো এই আগ্রাসী যুদ্ধে। বিধবা হলো অগণিত নারী। চরম এক বিড়ম্বনার শিকার হলো এই ভাগ্যহীনার দল। এদের প্রতিপালনের ভার নেয়ার মতো কেউ থাকলো না। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো না কেউ। বেশীর ভাগ পরিবারেরই রোজগারী পুরুষ নিহত হলো যুদ্ধে কিংবা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে থাকলো সারা জীবনের জন্যে। যুদ্ধের আতংকে স্নায়ুবিক উত্তেজনায় আর বিষাক্ত গ্যাসের শিকার হয়ে উন্মাদ এবং অকর্মণ্য হলো অনেকে। যুদ্ধ বন্দী শিবির থেকে একটানা চার বছর নির্যাতন ভোগ করে ফিরে এলো যারা তাদেরও আর থাকলো না কাজের উদ্যম। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে তারা নিলো বিশ্রাম। বিয়ে করে পরিবার প্রতিপালনের মনোবল হারালো এরা প্রায় সবাই। এদের দৈহিক

www.pathagar.com

এবং আর্থিক সঙ্গতির ওপর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো এই মানসিক আড়ষ্টতা।

জনশক্তির এক প্রকান্ড ঘাটতি দেখা দিলো যুদ্ধের ধ্বংসলীলার অবধারিত বড় পরিণাম হিসেবে। যারা বেঁচে ছিল তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না এতো একটা শূন্যতা ভরাট করা। শ্রমিকের অভাবে নতুন করে চালু করা সম্ভব হলো না কলকারখানা। সম্ভব হলো না যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে ওঠা। চরম এই অচলাবস্থা নারীকে বাধ্য করলো পুরুষের শূন্যস্থান পূরণ করতে। এ দায়িত্ব নিতে এগিয়ে না এলে না খেয়ে থাকতে হতো তাদের। দুর্ভিক্ষে ধুকে ধুকে মরতে হতো বৃদ্ধা মহিলা আর অনাথ শিশুদের, যারা ছিল তাদের পোষ্য।

জীবন যাত্রার দুয়ার প্রশস্ত হলেও প্রকৃতিগত কমনীয় বৈশিষ্ট্য বিরাট এক অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো এখন নারী শ্রমিকদের সামনে। কারখানায় রাতদিন কাজ করে, ঘরের বাইরে পড়ে থেকে নৈতিকতা কিংবা নারীসুলভ স্বভাব রক্ষা সম্ভব ছিল না তাদের কারো পক্ষেই। কেননা কারখানা মালিকগণ শুধু তাদের শ্রম নিয়েই তুষ্ট থাকতো না, সে সঙ্গে তাদের ভোগ করতেও চাইতো। যুদ্ধ বিড়ম্বিতা নারী সমাজের অসহায় অবস্থা এমন একটা অবাধ সুযোগই এনে দিল এই ইন্দ্রীয় বিলাসীদের জন্যে।

এভাবে পাশাপাশি দু'রকমের দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা হলো নারীকে। কারখানায় গতর খাটুনীর পর মালিককে খুশী করতে হতো তাকে সাধ্যমত। আকেরটি কথা, কেবলমাত্র পেটের ক্ষুধাই গ্রাস করলো না নারীকে, যৌন কামনাও নিজের হিস্যা দাবী করলো তার কাছ থেকে। যুদ্ধ নিদারুণভাবে ছাঁটাই করলো পুরুষের সংখ্যা। এ অবস্থায় বিয়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক যৌনতা তৃপ্ত করা সম্ভব হলো না সব নারীর পক্ষে। এরকম জরুরী সংকটের মোকাবিলা করেছে ইসলাম একাধিক বৈধ বিবাহের স্বীকৃতি দিয়ে। কিন্তু ইউরোপের প্রচলিত ধর্মে ছিল না একের বেশী স্ত্রী প্রতিপালনের অনুমোদন। ফলে, যৌবনের তাড়নায় জর্জরিত হতে হলো নারীকে। অবদমিত ইন্দ্রিয় ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্যে তাকে বেছে নিতে হলো অবাধ বিচরণের পথ। উচ্ছৃঙ্খলতার পথ। পেটের ক্ষুধার সঙ্গে যুক্ত হলো অতৃপ্ত যৌনতা, দামী পোশাক আর প্রসাধনীর প্রতি প্রচন্ড মোহ। এসব কিছু একাকার হয়ে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো অধঃপতনের শেষ প্রান্ত সীমায়।

উদ্দেশ্যহীন অসুন্দর এ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে থাকলো পাশ্চাত্য নারী। ভোগ আর বিলাসের কাম্য সামগ্রী পাওয়ার জন্যে পুরুষের মনোরঞ্জন করে চললো সে। ঘানি টানতে থাকলো কলে, কারখানায় আর পণ্যশালায়। কিন্তু এতেও সে তৃপ্ত থাকতে পারলো না। পাওয়ার মোহ আরো তীব্র এবং উদ্দাম হয়ে উঠলো। অতৃপ্ত এই চাহিদা পূরণের জন্যে আরো বেশী করে খাটতে হলো তাকে। নারীর এ দুর্বলতার সুযোগ পুরোমাত্রায় নিলো কারখানা মালিকগণ। তারা আদায় করে নিলো তার থেকে বাড়তি শ্রম। কিন্তু বঞ্চিত করলো তাকে ন্যায্য মজুরী থেকে। একই কাজের জন্যে পুরুষ শ্রমিক যে মুজরী পেতো নারী শ্রমিককে দেয়া হতো তার চেয়ে অনেক কম। এ ছিল এক অবমাননাকর বৈষম্য। যুক্তি কিংবা বিবেক কখনো সমর্থন করতে পারে না এ গর্হিত অন্যায়কে।

সর্বাত্মক একটা বিপ্লবকে অনিবার্য করে তুললো দুঃসহ এই সামাজিক পরিস্থিতি। শেষ পর্যন্ত ঘটে গেলো বিপ্লব। তার কূলপ্লাবী স্রোতে ধুয়ে মুছে গেলো শতাব্দীর প্রাচীন বৈষম্য আর অন্যায়ের গ্লানি।

কিন্তু কি পেলো এই বিপ্লব থেকে ইউরোপীয় সমাজের নারী? অতিরিক্ত দৈহিক শ্রমে সে ক্লান্ত, ন্যুজপৃষ্ঠ এবং হতশ্রী। বিসর্জিত তার নারীত্ব এবং মর্যাদা। সন্তানের গর্বিতা জননী হয়ে সংসার ধর্ম পালনের স্বাভাবিক আনন্দ থেকে সে বঞ্চিতা। সন্তান, স্বামী আর পরিবারের সবার সঙ্গে সুখ-দুঃখের সমান ভাগী হওয়ার মধ্যে ঘটে নারীত্বের এবং মাতৃত্বের গভীর উপলব্ধি। তার হৃদয় বিকশিত হয় করুণায়, মমতায় আর কল্যাণবোধে। অধিষ্ঠিত হয় সে মহিমার চূড়ায়।

www.pathagar.com

কিন্তু ইউরোপীয় নারী সংসার জীবনের এ গৌরব পেলো না সমাজে রূপান্তর ঘটে যাওয়ার পরও। কেবল জয়ী হলো সে একটা জায়গায়। পেলো পুরুষের সমান মজুরীর অধিকার। এর বেশী প্রাপ্য মর্যাদা তাকে দিতে পারলো না ইউরোপ।

কিন্তু খুব একটা সহজে ইউরোপের আত্মগর্বী পুরুষ সমাজ ছাড়েনি নারীর ওপর তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী। বিনা বাধায় মেনে নিতে রাজি হয়নি কোনো অধিকারই তাকে ছেড়ে দিতে। এর জন্যে লড়াইতে নামতে হয়েছে নারীকে। সে লড়াই ছিল সুদীর্ঘ এবং উত্তেজনাময়। প্রচলিত এমন কোনো হাতিয়ার ছিল না যা ব্যবহার করা হয়নি এতে। প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েই ইউরোপীয় পুরুষ সমাজ শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলো নারীর সমান অধিকার মেনে নিতে। মুক্তি আন্দোলনকে সফল করার জন্যে নানা উপায়ে আশ্রয় নিতে হলো নারীকে। ধর্মঘট করা হলো কলে-কারখানায়। শুরু হলো অসহযোগ। সভা-সমিতি করে বলা হলো সমান অধিকারের কথা। একটানা লেখালেখি চললো সংবাদপত্রে নারী মুক্তির সপক্ষে। এরপর সে বুঝলো পুরোপুরি অধিকার আদায় করে নিতে হলে তাকে অংশ নিতে হবে আইন রচনায়। প্রথমে সে দাবী করলো ভোটের অধিকার। তারপর আন্দোলনে নামলো পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্যে। শিক্ষা-দীক্ষায় পুরুষের সমকক্ষ হওয়ায় সরকারী চাকরি আর সরকার পরিচালনায়ও সে তুললো সমান শরিকানার দাবী।

ইউরোপের নারী মুক্তি সংগ্রামের এই হলো মোটামুটি চিত্র। বহিঃপ্রকাশে বিভিন্নতা থাকলেও সবটাই একই কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ঘনিষ্ঠভাবে। এই সংগ্রামে সফলতার সঙ্গে পুরুষকে বহিষ্কৃত করলো নারী সমাজের কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্বের আসন থেকে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক এই পরিবর্তন মেনে নিতে হলো পুরুষকে। না মেনে তার উপায়ও ছিল না। কিন্তু অচিরেই নারী বুঝলো, নতুন বিবর্তন ভাঙনমুখী যে সমাজের জন্ম দিয়েছে সেখানে পুরুষের মতো সে-ও অসহায়।★

এতকিছু সত্ত্বেও অনেক অসমতার আজো কিন্তু অবসান ঘটেনি। পাঠকরা জেনে অবাক হবেন, গণতন্ত্রের জন্মস্থান খোদ ইংল্যান্ডেই টিকে আছে পুরাতন এই বৈষম্য। সেখানে সরকারী দফতরগুলোতে কাজ করেন যেসব মহিলা তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে কম মাইনে পান পুরুষ চাকুরেদের চেয়ে। অথচ বৃটিশ পার্লামেন্টে সম্মানিতা মহিলা সদস্যের সংখ্যা এখন অনেক।

এর প্রেক্ষিতে ইসলামে নারীর স্থান কোথায়, তার একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই আমরা। দেখতে চাই ইসলামে এমন কোনো ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক কিংবা আদর্শগত বা আইনগত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কিনা যার ফলে নারী বাধ্য হতে পারে তার পাশ্চাত্য সহগামিনীর মতো অধিকার আদায়ের জন্যে সংগ্রামের ময়দানে নামতে। অথবা এটা কি কোনো হীনমন্যতা কিংবা পাশ্চাত্যের অনুকরণের ফল যার দরুন নারী মুক্তির প্রতীচ্য প্রবক্তারা তার অধিকারের জন্যে গলা উঁচিয়ে সরগরম করে তুলছে বাতাস? ঝড় তুলছে সভা মঞ্চে?

★ *এসব তথ্য-প্রমাণ সামনে রেখে মার্কসবাদীরা দাবী করেন, অর্থনৈতিক কারণই হচ্ছে একমাত্র বাস্তব কারণ যা নিয়ন্ত্রণে করে জীবনের গতিধারাকে। তাঁদের মতে, ইউরোপীয় নারীর সমস্যাও এই অর্থনৈতিক কার্যকারণেরই ফল। জীবনে অর্থনৈতিক ঘটনাক্রমের গুরুত্ব রয়েছে, একথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ইসলামের মতো আদর্শ এবং জীবন ব্যবস্থা থাকলে ইউরোপের চেহারা অন্য রকম হতো। কেননা, ইসলাম পুরুষকে বাধ্য করেছে সর্বক্ষেত্রে নারীর পৃষ্ঠপোষকতা করতে। কোনো পরিস্থিতিতে নারী যদি আদৌ দৈহিক শ্রমের কাজ বেছে নেয়, সেক্ষেত্রে সমমর্যাদা হিসেবে পুরুষের সমান মজুরী পাবে সে। যুদ্ধের মতো জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে সংকটের সঠিক, সফল এবং নিষ্কলুষ সমাধানের জন্যে একাধিক বিয়ের ব্যবস্থা রেখেছে ইসলাম। ফলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত অবস্থার শিকার হয়েও নারীকে নিতে হয় না কঠোর পরিশ্রমের কাজ। স্বাভাবিক যৌন চাহিদা পূরণের জন্যে আশ্রয় নিতে হয় না নোংরা পথের।*

www.pathagar.com

মৌল আদর্শ হিসেবেই ইসলাম পুরুষের মতোই নারীকে গণ্য করে মর্যাদাবান মানবিক সত্তা হিসেবে। তফাৎ করে না পুরুষের আত্মায় আর নারীর আত্মায়। মহাগ্রন্থ কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, "হে মানবগণ! তোমাদের স্রষ্টা-প্রভুর বিষয়ে (তাঁর প্রতি তোমাদের কর্তব্যের ব্যাপারে) সতর্ক থেকো। যিনি একক অস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সবাইকে। একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সহচরকে এবং এই দুই থেকে বিস্তৃত করেছেন অসংখ্য পুরুষ আর নারীকে। (কোরআন ৪ঃ১)

এভাবে জন্মগতভাবেই ইসলামে নারী এবং পুরুষের মর্যাদা সমান। ইহলোকে এবং পরলোকেও তাদের মর্যাদা অভিন্ন। সুতরাং একই এবং সমান অধিকারের দাবীদার তারা। ইসলাম নারীকে দিয়েছে জীবনযাত্রার পরিপূর্ণ অধিকার আর সম্মান। দিয়েছে সম্পত্তিতে পুরুষের মতো অধিকার। সমাজে সর্বোচ্চ তার আসন। সবার শ্রদ্ধার পাত্রী সে। তাকে অপমানিত করার কিংবা তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার অধিকার দেয়া হয়নি কাউকেই। নারীধর্ম পালনের জন্যে তাকে খাটো করে দেখারও অধিকার নেই অন্য কারো। এই অধিকারগুলো সমানভাবে ভোগ করবে নারী-পুরুষ উভয়েই। সামাজিক মর্যাদা এবং অধিকারের প্রশ্নে কোনো পার্থক্য নেই তাদের মধ্যে। এ ব্যাপারে যে আইন রয়েছে তা উভয়ের জন্যে প্রযুক্ত। উভয়কে অবশ্য কর্তব্য হিসেবে পালন করতে হবে এই আইনের বিধান। আল কোরআনের ভাষায় ঃ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমার মধ্যে কেউ যেন অন্যের প্রতি কটাক্ষ (বিদ্রুপ) না করে। কেননা, হয়তো সে-ই শ্রেষ্ঠ (শেষের জন) আগের জনের চাইতে। তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না, (কুৎসাসূচক) ছদ্ম নামে একে অপরকে বিদ্রুপ করো না। (কোরআন ৪৯ঃ১১)। ..."কেউ কাউকে ঘৃণার চোখে দেখো না। আড়ালে অন্যের বদনাম করো না। (কোরআন ৪৯ঃ১১)। ..."হে বিশ্বাসীগণ! আগে অনুমতি না নিয়ে এবং গৃহবাসীদের অভিবাদন (সালাম) না জানিয়ে তোমাদের নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে প্রবেশ করো না।" (কোরআন (৪ঃ২৭)। মহানবী বলেছেন, একজন মুসলমানের প্রাণ, সম্মান এবং সম্পদ হরণ অন্য মুসলমানের পক্ষে হারাম। (বুখারী, মুসলিম)।

সৎ কাজের পুরস্কার তথা প্রতিদান নারী-পুরুষের জন্যে সমান। আল-কোরআনের ঘোষণা ঃ "এবং তাদের প্রতিপালক শুনেছেন তাদের কথা। (এবং বলেছেন) দেখ! আমি কোন কর্মীরই, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক কোনো কাজ নিরর্থক যেতে দেই না। আমরা একটি থেকে উৎপাদন করি অন্যটি (অর্থাৎ ভালো কাজের সুফল প্রদান করি)।" (৩ঃ২৮৫)

ইহজগতে বস্তুগত চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেও অভিন্ন নারী-পুরুষের অধিকার। সম্পত্তির ভোগদখল করতে পারে তাহা ইচ্ছা মতো। সম্পত্তি ভোগদখল করতে পারে যখন খুশী। পারে নির্বাধে সম্পত্তি বন্ধক দিতে ইজারা দিতে কিংবা কাউকে দান করতে। নিজেদের স্বার্থে তারা সম্পত্তি কেনাবেচা করতে এবং তার থেকে ফায়দাও ওঠাতে পারে সমান অধিকার নিয়ে। ঐশী গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "পিতা-মাতা এবং নিকট স্বজনরা কিছু রেখে যায় তার একটা হিস্যা পাবে পুরুষরা এবং একটা হিস্যা পাবে নারীরা যা কিছু রেখে যায় তাদের পিতা-মাতা আর নিকট স্বজনরা।" (৪ঃ৭)। পুরুষরা যা অর্জন করেছে তার একটা অংশ তাদের প্রাপ্য, এবং নারীরা যা অর্জন করেছে তার একটা অংশ তাদের প্রাপ্য।" (৪ঃ৩২)।

সম্পত্তির মালিকানা এবং ইচ্ছামতো সম্পত্তি ভোগ কিংবা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলামে স্বীকৃত নারীর এই অধিকার আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের দিকে। প্রথমে আসা যাক ইউরোপের প্রসঙ্গে। এই সেদিনও সভ্য ইউরোপের বিধিবদ্ধ আইন সম্পত্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো একটি অধিকারও দেয়নি নারীকে। বড় জোর একজন পুরুষের মাধ্যমে কেবল পরোক্ষভাবেই সে পারতো এ সব অধিকার ব্যবহার করতে। সে পুরুষ হলো তার স্বামী, পিতা এবং অভিভাবক। এরাই ছিল তার ইচ্ছার নিয়ামক। এ থেকে প্রমাণিত হয়, ইসলামে নারীর

www.pathagar.com

এসব অধিকার স্বীকৃত হওয়ার এগারো শ' বছর পরও ইউরোপের নারী বঞ্চিত ছিল এই প্রাপ্য অধিকার এবং মর্যাদা থেকে, শেষ অবধি অধিকার আদায় করে নিলেও সহজে তা আসেনি তার নাগালে। আবার অধিকার অর্জনের কঠিন লড়াইতে নামতে গিয়ে চরম মূল্য দিতে হয়েছে তাকে। খুইয়েছে সে তার নারীসুলভ চরিত্র এবং কমনীয়তা। হারিয়েছে সম্মান এবং ব্যক্তিগত মহত্ব। এতকিছু হারানোর পরও আরো মূল্য দিতে হলো তাকে। কঠোর শ্রমের শৃঙ্খলে বন্দী হতে হলো। শিকার হতে হলো চরম দুর্গতির দৈহিক ক্লেশের এবং মৃত্যুর। ইসলাম নারীকে যা দিয়েছে, এত সংগ্রাম এবং ভোগান্তির পরও সে পেলো তার তুলনায় অতি সামান্যই। অথচ ইসলাম কোনো অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে পড়েনি কিংবা কোনো সামাজিক শ্রেণী সংঘাতেরও মুখোমুখি হয়নি নারীর অধিকারের প্রশ্নে। মৌলিক মানবিক অধিকার হিসেবেই নারীকে সমতার এই গৌরব দিয়েছে ইসলাম। মানবিকতার দু'টি প্রাণবস্তু হলো সত্য এবং ন্যায়। স্বপ্নের রাজ্যে নয়, বাস্তবেই ইসলাম এই দুই আদর্শকে রূপ দিয়েছে নারীকে পুরুষের সমমর্যাদা দিয়ে।

এবার আসা যাক সাম্যবাদী দর্শন এবং সাধারণ পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসঙ্গে। এ প্রশ্নে এই দৃষ্টিভঙ্গীতে তেমন একটা তফাৎ নেই। এদের ধারণা, পুরুষের অর্থনৈতিক অস্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত মানব জীবন। সুতরাং সম্পত্তির মালিকানা এবং ইচ্ছামতো সম্পত্তির ভোগদখল ও ব্যবহারের অধিকার অর্জন না করা পর্যন্ত আদৌ নারীর কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল না। স্বাধীন অর্থনৈতিক অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই কেবল নারী অর্জন করলো মানবিক মর্যাদা। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত যখন সে সম্পত্তি ভোগদখলের অধিকার আদায় করতে পারলো এবং কোনো পুরুষের ওপর নির্ভর না করে নিজের ইচ্ছামতো প্রত্যক্ষভাবে সম্পত্তি ব্যবহারের সুযোগ পেলো, তখনি কেবল স্বীকার করে নেয়া হলো তার মানবিক মর্যাদা।

মানব জীবন সম্পর্কে এ ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থনযোগ্য নয়। আমরা মেনে নিতে পারি না শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অস্তিত্বের স্বার্থে মানব জীবনে এমন অবনয়ন এবং অবমাননাকে। কিন্তু তা হলেও নীতিগতভাবে আমরা একটা বিষয়ে একমত এই মার্কসবাদী এবং পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের সঙ্গে। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা মানুষের মধ্যে আত্মচেতনা এবং আত্মমর্যাদাবোধ সঞ্চারে সহায়তা করে, একথা আমরা স্বীকার করি। আর এ ক্ষেত্রটিতে ইসলামের অবদান অসামান্য। কেননা ইসলামই প্রথম নারীর স্বাধীন অর্থনৈতিক সত্তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সম্পত্তির মালিকানার এবং ভোগদখলের অখন্ড অধিকার দিয়েছে নারীকে। কোনো মধ্যবর্তী ছাড়াই নারী পারে নিজের এ অধিকার ভোগ করতে, প্রয়োগ করতে। এর জন্যে কোনো অছি, মধ্যস্থ কিংবা অভিভাবকের প্রয়োজন নেই তার। শুধু তাকে অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি ইসলাম। নারী জীবনের সব থেকে বড় যে সমস্যা সেই বৈবাহিক প্রশ্নেও ইসলাম দিয়েছে তার স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি। দিয়েছে তাকে স্বাধীন মতামতের নিরংকুশ অধিকার। বিয়েতে কনের অনুমোদন একটি অপরিহার্য শর্ত। বিয়ে বৈধ কিংবা আইনসিদ্ধ হয় না তার মত ছাড়া।

মহানবীর একটি বাণী স্মরণযোগ্য এ প্রসঙ্গে। মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ "কোনো বিধবাকে বিয়ে দেয়া যাবে না তার সঙ্গে আলোচনা না করে। কোনো কুমারীকে বিয়ে দেয়া যাবে না তার মত না নিয়ে এবং তার নীরবতা হলো (এ ব্যাপারে) তার সম্মতি।" (বুখারী এবং মুসলিম)। এখানে 'নীরবতার' মানে বিয়েতে কনের নীরব সায়। এমন কি আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও যদি ঘোষণা করে বিয়েতে তার মত ছিল না, তাহলে তখুনি বাতিল হয়ে যাবে বিয়ে।

নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আগে অবস্থা কেমন ছিল তা একবার খতিয়ে দেখা দরকার। এক কথায় বলতে গেলে, নারী ছিল তখন আমৃত্যু স্বামী নামক একটি পুরুষের স্বেচ্ছাচারের শেকলে বাঁধা। অত্যাচারী স্বামীর নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে

www.pathagar.com

নানান ছলনার এবং কখনো পাপ-কুটিল পথের আশ্রয় নিতে হতো নারীকে। স্বৈরিণী হতে বাধ্য হতো সে। তখনকার সমাজ ব্যবস্থা কিংবা প্রচলিত আইনে কোনো অবস্থাতেই স্বামী বর্জনের অধিকার ছিল না নারীর। ইসলামই প্রথম নারীকে দিলো স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের সরাসরি আইনগত অধিকার। এ অধিকার স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। আইনের এই অধিকার বলে যখন ইচ্ছা সে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পারে।* কেবল এখানেই থেমে থাকেনি ইসলাম। নারীকে সমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার আরো এক পা বাড়িয়েছে সামনে। নিজের পছন্দমতো যে কোনো পুরুষকে স্বামী হিসেবে বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছে ইসলাম তাকে। মাত্র আঠারো শতকে বহু চড়াই-উতরাই পার হয়ে ইউরোপীয় নারী অর্জন করলো এই অধিকার। তারপরও এর সপক্ষে গাল-গল্পের অন্ত নেই সেখানে। আজো ইউরোপে এই কৃতিত্ব অতীত অচলায়তনের বিরুদ্ধে নারীর এক মহাবিজয় হিসেবে নন্দিত।

নারীকে শিক্ষার পথে সমানতালে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও একইভাবে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে ইসলাম। এমন একটা যুগে জ্ঞানচর্চাকে মানব জাতির জন্যে অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছিল ইসলাম যখন তাবৎ দুনিয়া অবলুপ্ত অন্ধতা আর অজ্ঞানতার তিমিরে। সেই গাঢ় তমসায় যেন কি এক অলৌকিক সংকেতে খুলে গেলো আলোর মুক্ত দুয়ার। সুবিধাভোগী কোনো বিশেষ শ্রেণীর জন্যে নয়– সবার জন্যে, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের জন্যে প্রথম উন্মুক্ত হলো জ্ঞানের সুবিশাল সড়ক। ব্যক্তি জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হলো জ্ঞানচর্চা। মৌলিক অধিকার হিসেবে নারীও সমান মর্যাদা পেলো শিক্ষার আঙ্গিনায়। সেই প্রথম পুরুষের পাশাপাশি অজস্র গোলাপ হয়ে ফুটে উঠবার সুযোগ পেলো নারী সমাজ। প্রকৃত মু'মেন এবং নিষ্ঠাবান আদর্শচারী হিসেবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মুসলমানের জন্যে, তাদের বিশ্বাস আর আনুগত্যের শর্ত হিসেবে জ্ঞানচর্চাকে বাধ্যতামূলক করলো ইসলাম। এখানেও ইসলাম নারীকে দিয়েছে তার স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন মানবিক মর্যাদা। নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করেছে ইসলাম ঃ জ্ঞান ছাড়া পূর্ণাঙ্গতা অর্জন সম্ভব নয় নারীর পক্ষে। ইসলামী অনুশাসনে পুরুষের মতোই শিক্ষার সাধনা নারীর একটি পবিত্র কর্তব্য। কেননা, নারীকে আত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য হিসেবেই ইসলাম এমন বিরাট গুরুত্ব দিয়েছে নারীর দৈহিক সত্তার বিকাশের পাশাপাশি তার বিবেকী এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের উপর। অথচ এই সেদিনও শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার স্বীকার করেনি ইউরোপ। শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক সমস্যার চাপে পড়েই কেবল বাধ্য হলো ইউরোপীয় সমাজ নারীর জন্যে শিক্ষাঙ্গনের দুয়ার খুলে দিতে। এক্ষেত্রে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাই প্রথম নতুন পথের দিশা দিল গোটা মানব জাতিকে। মানব সভ্যতার জন্যে এই অবদানের মূল্য কতখানি, তা আঁচ করা যাবে বিষয়টাকে নির্বিকার মন নিয়ে বিচার করলে সংস্কারমুক্ত হয়ে সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করা হলে।

কিন্তু এরপরও ইসলামকে শিকার হতে হয়েছে বিকারগ্রস্তদের মিথ্যা এবং কুৎসিৎ সমালোচনার। তাদের অভিযোগ ঃ "ইসলামে নারীর স্থান দ্বিতীয় স্তরে। তাকে পুরুষের দাসী হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। নারীর কোনো ভূমিকা নেই জীবনে কিংবা জীবনযাত্রায়।" এদের আরো

---

* *প্রাচ্য জগতের বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নারীর এ অধিকারকে আপাত দৃষ্টিতে হয়তো বিভ্রমত্মাক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ইসলামী শিক্ষা কিংবা তার আইন বাস্তবায়নের পথে যেসব বাঁধা সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে ইসলামকে দোষ দেয়া যায় না। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পত্তনের প্রথম যুগে নারী নির্বাধে ভোগ করেছে এ অধিকার। ইসলামের আইন প্রণেতা মহানবী মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর উত্তরাধিকারী প্রথম যুগের খলিফাগণ স্বীকৃতি দিয়েছেন নারীর এই স্বাধীন মতামতকে। আজকে আমাদের দাবী হলো,এসব আইনের বাস্তবায়ন। সে সঙ্গে আমরা চাই অন্যের অন্ধ অনুকরণ থেকে সংক্রমিত অনৈসলামী রীতি, কুপ্রথা এবং যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এই আইনগত বিধান বাস্তবায়নের পথে বাঁধা সৃষ্টি করছে সে সবের অপসারণ।*

www.pathagar.com

ধারণা ঃ "ইসলামের দৃষ্টিতে নারী একটি গৌণসত্তা। তার কোনো গুরুত্ব নেই সমাজে।" এ সব অভিযোগের মধ্যে এক বিন্দুও যে সত্য নেই, তার প্রমাণ ওপরের বর্ণিত তথ্য। নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত না হলে নারী শিক্ষার ওপর কেনো এমন অসাধারণ গুরুত্ব দিলো ইসলাম? এ থেকে কি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, ইসলামে নারীর আসন কতোখানি উঁচুতে? প্রকৃতপক্ষে এসব বাস্তব সত্য থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় ইসলামের দৃষ্টিতে জীবনে, সমাজে এবং আল্লার কাছে নারীর আসন এক মহিমান্বিত মর্যাদার আসন।

মানবিক সত্তা হিসেবেই নারী-পুরুষের অভেদ মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে ইসলাম। তাদের অধিকার সমান, মর্যাদায় তারা অভিন্ন। কিন্তু তাহলেও নারী-পুরুষের জীবনের একটি সার সত্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখতে পারেনি ইসলাম। সে হলো তাদের জীবনাচার এবং কর্মাঙ্গনের স্বাতন্ত্র্য। দায়িত্ব ও কর্তব্যের এই সুনির্দিষ্ট পরিধিকে সামনে রেখেই নারী-পুরুষের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের একটা সীমারেখা টানছে ইসলাম। এ স্বাতন্ত্র্য বাস্তব কর্মক্ষেত্রের, অসমতার নয়। অথচ এই বাস্তবতার বিরুদ্ধেই সোচ্চার কিছু মহিলা সংগঠন। এদের সমর্থন যোগাচ্ছে এক শ্রেণীর লেখক, 'সংস্কারক' ও তরুণ।

প্রথমেই প্রশ্ন করতে হয় ঃ পুরুষরা এবং নারীরা কি একই লিঙ্গ বা যৌন সত্তার অন্তর্গত? না, তারা আলাদা যৌনসত্তা? তাদের জীবনধারা কি অভিন্ন? অথবা নারী এবং পুরুষ হিসেবে স্পষ্ট কোনো স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তাদের জীবন ধারায়? জীবনচারণায়? এখানেই আছে সমস্যার জট এবং তার মূল শিকড়। আধুনিক নারী আন্দোলনের অগ্রচারিণীরা, তাঁদের সমর্থক লেখক, সংস্কারক এবং নব্য তরুণরা এ প্রশ্নের জবাব কি করে দেবেন জানি না। তাঁরা যদি মনে করে থাকেন দৈহিক গঠন, আবেগ-অনুভূতি, ইন্দ্রিয়-চেতনা আর জৈবিক প্রবৃত্তির দিক থেকে কোনো রকম পার্থক্য নেই নারী-পুরুষে, তাহলে তাঁদের কিছু বলবার থাকে না আমাদের। যদি তাঁরা কেবল এটুকু স্বীকার করেন নারী আর পুরুষে এবং উভয়ের জীবনধারায় একটা পার্থক্য আছে, তাহলে ইসলামের বিধানকে মেনে নিতেই হয়। (অনুদিত) [ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

পরিশিষ্ট-৪

বহু বিবাহ ঃ রসূল (সাঃ)'র দৃষ্টিতে

আবদুল খালেক

ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ সমালোচকরা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে, বহু বিবাহ প্রথা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রবর্তন করেন। এ অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন ও অজ্ঞতাপ্রসূত। কারণ, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই সমগ্র জগতে বহু ধরনের বহু বিবাহ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো।

বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে বহুবিবাহ

প্রাচীনকালে অনেক রকম বহুবিবাহ প্রচলিত ছিলো। একজন পুরুষ একই সময়ে একাধিক স্ত্রী এবং একই নারী একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণ করতো।

বহু স্বামী গ্রহণের প্রথা পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রচলিত ছিলো। বিভিন্ন ধরনে ইহা এখনো

www.pathagar.com

ভুটান, আসাম ও ভারতে প্রচলিত আছে। বহু স্বামী গ্রহণের প্রচলিত নিয়ম এই ঃ

বড় ভাই এক নারীকে বিয়ে করলে সে গোটা পরিবারের স্ত্রী হয়ে পড়ে। স্বামীর অন্যান্য ভাই ও অতি নিকট-আত্মীয়রা তার উপর স্ত্রীত্বের অধিকা লাভ করে। স্ত্রী সঙ্গলাভের অগ্র-পশ্চাৎ প্রশ্নে তাদের মধ্যে কখনো কোনোরূপ মতানৈক্য, হিংসা-বিদ্বেষ ও মন কষাকষির উদ্রেক হলে সকলের কল্যাণ কামনায় তারা তা বিসর্জন দিয়ে থাকে। পরস্পরের সহনশীলতা ও সমঝোতার মাধ্যমেই তারা স্বামীত্বের অধিকার ভোগ করে। তবে এ স্ত্রী সন্তান প্রসব করলে কখনো কখনো বিবাদ বাঁধে। কারণ, প্রত্যেকেই শিশুকে নিজ সন্তান বলে দাবি করে। অনেক সময় শিশুর আকৃতির সাথে তাদের আকৃতি মিলিয়ে দেখা হয়। সন্তানটির পিতা কে, এ সিদ্ধান্তের ভার কোনো কোনো সময় স্ত্রীর উপর অর্পণ করা হয়ে থাকে। পূর্বকালে এ প্রথা আরবেও প্রচলিত ছিলো। বহু বিবাহের অপর প্রথা হলো, একই পুরুষের একই সময়ে বহু স্ত্রী গ্রহণ করা। এর নিয়ম এই ঃ একজন পুরুষ যখন কোনো পরিবারের বড় কন্যাকে বিয়ে করলো তখন সে তার ছোট সব বোনের উপর স্ত্রীত্বের পূর্ণ অধিকার পেলো। কেউ যদি পরিবারে কোনো ছোট বোনকে বিয়ে করে তবে সে তার পরবর্তী ছোট বোনদের উপর স্ত্রীত্বের অধিকার পাবে; কিন্তু তার বড় বোনদের উপর নয়। এ রীতি চীন ও ভারতে প্রচলিত ছিলো।

পাশ্চাত্যের কেউ কেউ বহু বিবাহকেই উত্তম শ্রেণীর বিয়ে বলে মনে করে। সম্ভ্রান্ত ও ধনীদের মাঝেই ইহা বেশি প্রচলিত। অর্থনৈতিক কারণে এবং গার্হস্থ্য কার্যের সুবিধার জন্যই তারা অনেক সময় এটা পছন্দ করে থাকে।

অপর এক প্রকার বিবাহ সর্বত্র প্রচলিত আছে। ইহা হলো, একজন পুরুষের একই সময়ে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ। (সূত্র ঃ Every Man's Encyclopaedia, Vol. 16, Said Abdullah Saif Al Hatimy, Woman's in Islam, 55-58 P)

চীন দেশে

পুরাকাল হতেই চীন দেশে কোনো না কোনো ধরনের বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো। একজন প্রধান মহিষীর পর স্বামী যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো। তাদের সকলের গর্ভজাত সন্তানই পিতার বৈধ সন্তান বলে পরিগণিত হতো। দরিদ্র পরিবারের কারো কোনো কন্যা-সন্তানকে আপন পরিবারভুক্ত করে লওয়া সাধারণ রীতিরূপে প্রচলিত ছিলো এবং এ কন্যাই পরিশেষে পরিবারের কোনো ছেলের স্ত্রীরূপে পরিগণিত হতো। (সূত্র ঃ Encyclopaedia Britanica, Vol 4, p. 400)।

ভারতে

বৈদিক যুগে এবং এর পরবর্তীকালেও ভারতে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিলো। একজন পুরুষ একই সময়ে যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো। (সূত্র ঃ Status of Woman in Ancient India, p. 66)।

মনুর যুগেও বহু বিবাহ প্রচলিত ছিলো। একজন ব্রাহ্মণ চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো– একজন ব্রাহ্মণ গোত্রের এবং অপর তিনজন বাকী তিন গোত্রের। ক্ষত্রীয় তিন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো– একজন নিজ গোত্রের এবং অপর দুইজন পরবর্তী দুই গোত্রের। বৈশ্য দুই স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো। একজন তার নিজ গোত্র হতে এবং অপর একজন শূদ্র গোত্র হতে। একজন শূদ্র কেবল তার গোত্র হতে একজন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো। (সূত্র ঃ Manu—III, 12)

হিন্দুদের মধ্যে একজন নারী একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারতো। পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের একই স্ত্রী এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

www.pathagar.com

ইয়াহুদী ধর্মে

একই সময়ে একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী রাখতে পারবে, ইয়াহুদী ধর্মে এর সংখ্যা নির্ধারিত ছিলো না। তবে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের রীতিই সাধারণতঃ প্রচলিত ছিলো। (সূত্র ঃ Said Abdulah Saif Al Hatimy, Woman in Islam, p. 61)।

খৃষ্টধর্মে

খৃস্টানদের মধ্যে এক স্ত্রী গ্রহণের রীতি প্রচলিত থাকলে লুথারের যুগে চার্চ ও লুথারের অনুমতিক্রমে ফিলিপ ও দ্বিতীয় ফ্রেডারিক উইলহেম একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন।

১৬৫০ খৃস্টাব্দে নুরেনবার্গ কনফারেন্সে যুদ্ধের কারণে পুরুষের সংখ্যা হ্রাস জনিত সমস্যার সমাধান কল্পে জনগণকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড জনগণকে একাধিক বিবাহের অনুমতি প্রদান করে আইন প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাদ্রীদের বিরোধিতার কারণে এটা তখন সম্ভব হয়নি।

বর্ণিত আছে, হিটলার একাধিক বিবাহের অনুমতি প্রদান করে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য তিনি সময় পাননি।

দেশের অবিবাহিতা নারীদের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে জার্মানীর বনের লোকেরা ১৯৪৯ খৃস্টাব্দে বহু বিবাহের অনুমতি প্রার্থনা করে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানায়। (ঐ, পৃঃ ৬৫)।

ইংরেজ মহিলার প্রতিবেদন

১৯০১ খৃস্টাব্দের ২০ এপ্রিল Lagos Weekly Record-এ লন্ডন ট্রুথে প্রকাশিত জনৈকা ইংরেজ মহিলার একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ইহার সার সংক্ষেপ এই ঃ ভবঘুরে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমাদের সমাজে ইহা উৎপাতের সৃষ্টি করেছে। আমি নিজে মেয়েলোক বলে এ হতভাগিনী মেয়েদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে অবলোকন করে থাকি। কিন্তু আমার এ করুণা ও সহানুভূতি কি অবস্থার কোনোরূপ পরিবর্তন সাধন করতে পারবে অথবা এ রোগ উপশমে কোনো সাহায্য করবে? টমাস উত্তম কথাই বলেছিলেন। তিনি রোগ নির্ণয় করেছিলেন এবং রোগের উপযুক্ত ব্যবস্থা-পত্রও দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি প্রদানই সমস্যার একমাত্র সমাধান। এর মাধ্যমেই এ দুর্বিপাক দূরীভূত হতে পারে। কিন্তু ইউরোপের দুর্দশা হলো– একজন পুরুষ মাত্র একজন স্ত্রীই গ্রহণ করবে এবং এর সাথে থাকবে বহু অবৈধ সন্তান যারা সমাজের কলঙ্ক ও বোঝাস্বরূপ। বহু বিবাহের অনুমতি থাকলে এরূপ দুঃখজনক ঘটনা ঘটতো না। (সূত্র ঃ Dr. Mustafa as-Sibaa'iy, Al Mar'a Bima al-Fiqh wal Qanun)।

এ প্রবন্ধ লেখার সময় কেবল লন্ডনেই আট লাখ হতে দশ লাখ বেশ্যা ছিলো। গত দু'টি বিশ্ব যুদ্ধে যখন বহু সংখ্যক পুরুষ নিহত হয় তখন হতে অদ্যাবধি অবস্থা কি আকার ধারণ করেছে, একবার চিন্তা করুন।

আফ্রিকা

আফ্রিকায় বহু বিবাহ সাধারণভাবে প্রচলিত। ইসলামের বিরূপ সমালোচক পাশ্চাত্য লেখকরা হয়তো বিস্মিত হবেন, যেসব এলাকায় মুসলমান বাসিন্দা কম, সেসব এলাকায়ই বহু বিবাহ খুব বেশি প্রচলিত।

আফ্রিকার শতকরা বিশজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। ইথিওপিয়া, বারবোরি রাষ্ট্রসমূহ ও সাহারার উত্তর-পশ্চিমে অঞ্চলের লোকজন এবং শিকার করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে এমন বেদুঈনরা সাধারণতঃ একাধিকবার বিয়ে করে না। ইউরোপের মিশনারীরা আফ্রিকার বহু বিবাহ

www.pathagar.com

প্রথা বন্ধের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তারা কোনো কোনো স্থানে কিছুটা সফলতা লাভ করে থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীতে তারা এটি পুনর্বহাল করতে বাধ্য হন।

আমেরিকার সরমন

সরমনরা মনে করে, প্রটেস্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের কেউই যীশুখৃস্টের ধর্মের সার্বিক মর্ম বুঝতে পারেনি। সরমনরা বহু বিবাহের পক্ষপাতী। বহু বিবাহ তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে বলেই পুরোহিতবাদে তারা সফলতা অর্জন করেছে। তাদের এক নেতা ইয়াং-এর প্রায় বিশজন স্ত্রী ছিলো।

তাদের একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে– এর কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই। তাদের এক বিবাহিতা মহিলাকে 'বহু বিবাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ উপপত্নী হওয়ার চেয়ে একজন খ্যাতিসম্পন্ন পুরুষের দশম স্ত্রী হতে বরং আমি অধিক পছন্দ করি।

বহু বিবাহ সম্পর্কে সরমনদের অভিমত এই ঃ একাধিক বিবাহে, এমনকি একই সময়ে পাঁচ-ছয়জন মেয়ে বিয়ে করাতে কোনো দোষ নেই। আমেরিকায় প্রায় প্রতিটি পুরুষের বহু নারীর সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক রয়েছে। গৃহগুলো নিকৃষ্টতম বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। বেশ্যাবৃত্তি অবাধে সর্বত্র চলেছে। জারজ সন্তানে দেশ ভরে গেছে। কলঙ্ক রাখবার আর স্থান নেই। এমতাবস্থায় আইনসঙ্গতভাবে বিবাহ-বন্ধনের মাধ্যমে একাধিক স্ত্রী রাখাতে কি দোষ? আমরা নিকৃষ্টতম বেশ্যালয়গুলো আর দেখতে চাই না। (সূত্র ঃ Said Abdullah Saif Al-Hatimy, Woman in Islam, p. 68-70)।

জোরোয়াস্ট্রিয়ান ধর্মে

জোরোয়াস্ট্রিয়ান ধর্মে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিলো। কিন্তু একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে, এর কোনো সংখ্যা নির্ধারিত ছিলো না।

জার্মানীতে

ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত একজন পুরুষের জন্য জার্মানীতে বহু স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ছিলো এবং এ অনুমতি ছিলো একেবারে লাগামহীন। কারণ সে যতো ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো, এর কোনো সীমা নির্ধারিত ছিলো না। রাজা কনস্টটেনাইন ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের বহু স্ত্রী ছিলো।

রোম ও ফ্রান্সে

খৃষ্টধর্মের অধীনে আসার পূর্ব পর্যন্ত রোম ও ফ্রান্সে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিলো। তারপর রোমান আইন-প্রণেতা জাস্টিনিয়ান এক স্ত্রী গ্রহণের আইন প্রণয়ন করেন।

ইরান, গ্রীস, ব্যাবিলন ও অস্ট্রিয়ায়

ইরান, গ্রীস, ব্যাবিলন ও অস্ট্রিয়ায় বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো। নিউ টেস্টামেন্ট এক বিবাহ সমর্থন করলেও বিশপ ও পাদ্রীদের ছাড়া অপর কারো জন্য এটি বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করেনি। খৃষ্টান রাজারাও বহু স্ত্রী গ্রহণ করতেন। চার্লেমেনের দুই স্ত্রী ও বহু উপপত্নী ছিলো। (সূত্র ঃ Fida Hussain Malik, Wives of the Prophet, p. 65-sh. Muhammad Ashraf, Lahore, Pakistan, 1983)।

আরবে

প্রাক-ইসলাম যুগে আরবে বহু বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিলো এবং একজন পুরুষ নিজ খুশী মতো যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো। এর কোনো সংখ্যা নির্ধারিত ছিলো না। তখন নারীও একই সময়ে বহু পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক রাখতে পারতো। নারী সন্তান প্রসব করলে সে তার অবৈধ স্বামীদেরকে ডেকে বলতো– এই যে দেখো, আমি একটি সন্তান প্রসব করেছি। এ সন্তান

www.pathagar.com

তোমার। এ বলে সে তাদের কারো নাম বলতো। কোনো কোনো সময় তারা সন্তানের দৈহিক অবয়বের সাথে তাদের নিজেদের অবয়ব যাচাই করে দেখতো এবং এরূপে কে সন্তানের পিতা, তা ঠিক করে নিতো। তবে এ ব্যাপার নিয়ে সাধারণতঃ তাদের মাঝে কোনো ঝগড়া-বিবাদ ঘটতো না।

একই সময়ে একজন পুরুষ চারজনের অধিক স্ত্রী রাখতে পারে না ঘোষণা করে যখন আয়াত নাযিল হয় তখন কোনো কোনো মুসলমানের চারজনের অধিক স্ত্রী ছিলো। তখন তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ প্রার্থনা করেন। চারজন রেখে অবশিষ্ট স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ দেন এবং তাঁরা এ নির্দেশ পালন করেন।

ইসলামে বিবাহ নিয়ন্ত্রণ

উল্লিখিত আলোচনা হতে প্রমাণিত হয়, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব হতেই দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্মে ও জাতিতে বহু ধরনের বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো এবং এখনো আছে। ইসলাম বিদ্বেষী লোকেরা নিন্দায় পঞ্চমুখ যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বহু বিবাহ-প্রথা চালু করেছেন। তিনি বহু বিবাহ প্রথার প্রবর্তন করেন নি; বরং দৃঢ় হস্তে তিনি তা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। অতি কড়া শর্ত সাপেক্ষে একজন পুরুষের জন্য চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ তিনি জায়েজ রেখেছেন।

ইসলাম এর অনুসারীদেরকে বহু বিবাহে বাধ্য করে না। বিশেষ বিশেষ কারণ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটি অনুমতি প্রদান করেছে মাত্র। শারীরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ না করে যদি কোনো পুরুষ একই স্ত্রী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে তবে কেউ তাকে মন্দ বলে না বা তাকে অপর স্ত্রী গ্রহণে বাধ্যও করে না। তদ্রূপ কোনো পুরুষের অন্য স্ত্রী আছে বলে কোনো মেয়ে যদি তার সাথে বিবাহ না-পছন্দ করে বা বিবাহে অসম্মত হয় তবে কেউই তার নিন্দা করে না অথবা তাকে এ বিবাহে বাধ্য করে না। বিবাহের পূর্ণ অধিকার নারীর রয়েছে এবং তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ জায়েজ নয় বলে ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে। এমতাবস্থায় ভালোরূপে না বুঝে, না শুনে বহু বিবাহ-প্রথার বিরুদ্ধাচরণ ও বিরূপ সমালোচনা কারো পক্ষে সঙ্গত নয়। বরং এর যৌক্তিকতা উপলব্ধির চেষ্টা করা উচিত।

বহু বিবাহের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মুসলমান জনগণ সাধারণতঃ এক স্ত্রী নিয়েই জীবন যাপন করে থাকে। লক্ষ্যের মধ্যে পনর-বিশজন একাধিক বিয়ে করে কিনা সন্দেহ। এক স্ত্রী নিয়ে জীবন যাপনে যারা সন্তুষ্ট তাদের জীবনে ইসলাম কোনোরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতেও চায় না। তবে এক স্ত্রী গ্রহণের রীতি বলপ্রয়োগে বাধ্যতামূলক করে রাখলে মানব-সমাজে যে যৌন অরাজকতা, দুর্নীতি, দুঃখ-দুর্দশা, দুর্ভোগ ও বিপদাপদ নেমে আসে, ইসলাম এর উপশম করতে চায়। এক স্ত্রী গ্রহণের নীতি অনুসারী ইউরোপ মানব-সমাজে সমস্যার পর সমস্যার সৃষ্টি করেই চলেছে, এটি হ্রাস করতে পারেনি। যে স্থানে নানাবিধ কারণে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নারীরা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই স্বামীর প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করে অথচ স্বামীর অভাব রয়েছে, এমতাবস্থায় এ নারীদেরকে নিয়ে কি করতে হবে? যেসব পুরুষ ও নারী নিজ নিজ গৃহে শান্তির সাথে বিবাহিত জীবন যাপন করছে, এসব নারীকে কি তাদের সৌন্দর্য ও রূপলাবণ্য প্রদর্শন করে তাদের সুখের জীবনে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য লাগামহীন ছেড়ে দিতে হবে?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানের বহু যুবক পুরুষ নিহত হয়। ফলে বিধবা, ইয়াতীম বালিকা ও কন্যাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাদেরকে বিয়ে করার মতো পুরুষের অভাব প্রকট হয়ে উঠে।

www.pathagar.com

তখন সেখানকার নারীরা বহু বিবাহ-প্রথা চালু অথবা ধার-করা স্বামী সরবরাহের দাবিতে শ্লোগান দেয়। (সূত্র ঃ Said Abdullah Saif Al-Hatimy, Ibdi-92 p.)।

অতএব, খোলা মনে বহু বিবাহ-প্রথার উপকারিতা বুঝবার চেষ্টা করুন।

একই সময়ে একাধিক বিয়ের অনুমতি প্রদান ও চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা বৈধ নয়, ঘোষণা করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেন ঃ তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে থাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইয়াতীম বালিকাদের উপর তাদের অভিভাবকরা নানারূপ অবিচার করতো। তখন লোকেরা বহু স্ত্রী গ্রহণ করতো এবং তদুপরি উপপত্নী রাখতো। অথচ তাদের উপর অবিচার চালাতো। এ আয়াত স্ত্রীর সংখ্যা চার-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে এবং ইয়াতীম বালিকা ও নারীদের উপর অবিচার নিষিদ্ধ করেছে।

আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে ইয়াতীম বালিকাদের অভিভাবকরা তাঁদের ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যের লোভে অথবা তাদের খোঁজ-খবর নেয়ার কেউ নেই বলে নিজেদের খেয়াল-খুশীমতো তাদেরকে বশীভূত করে রাখতে পারবে ধারণায় তারা নিজেরাই তাদেরকে বিয়ে করে নিতো এবং তারপর তাদের উপর অবিচার চালাতো। এ জন্যই নির্দেশ দেয়া হয়েছে– ইয়াতীম বালিকাদের উপর সুবিচার করতে পারবে না বলে যদি তোমাদের আশংকা হয় তবে দুনিয়াতে বহু নারী মজুদ আছে। তাদের মধ্য হতে যাকে পছন্দ হয়, তাকেই বিয়ে করে নও।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাঁর শাগরিদ হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে একজন পুরুষ কয়জন নারী বিয়ে করতে পারবে– এর কোনো সীমা নির্ধারিত ছিলো না। এক একজন পুরুষ দশ দশজন স্ত্রী গ্রহণ করতো। কিন্তু অধিক স্ত্রী গ্রহণের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে নিরুপায় হয়ে তারা নিজেদের ইয়াতীম ভ্রাতুষ্পুত্রী, বাগিনী এবং অন্যান্য নিকট-আত্মীয়দের ধন-সম্পদে অনধিকার হস্তক্ষেপ করতো। এ জন্যই চারটি পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে– এ সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে আল্লাহতাআলা বলেন ঃ অত্যাচার ও অবিচার হতে অব্যাহতি লাভের উপায় এই– এক হতে চার পর্যন্ত এমন সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ কর যাতে তুমি তাদের সাথে ন্যায় বিচারে দৃঢ়পদ থাকতে পার। সাঈদ ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ ও পবিত্র কুরআনের কতিপয় ভাষ্যকার বলেন ঃ ইয়াতীমদের সাথে অবিচার করাকে জাহিলিয়াতের যুগের লোকেরাও ভালো মনে করতো না। কিন্তু নারীদের প্রতি সুবিচার করতে হবে, এ ধারণাও তাদের ছিলো না। তারা যতো ইচ্ছা বিয়ে করে নিতো এবং তারপর তাদের উপর জোর-জুলুম চালাতো। এ জন্য নির্দেশ দেয়া হলো, ইয়াতীমদের প্রতি অবিচার করাকে যদি তোমরা ভয় করে থাকো তবে স্ত্রীদের প্রতি অবিচার করাকেও ভয় কর। চারজনের অধিক তো বিয়ে করবেই এবং চারজনের মধ্যেও যে কয়জনের সাথে তুমি সুবিচার করতে পার, সে কয়জনই বিয়ে করবে।

উম্মতের ফিক্হ-শাস্ত্রের সব ইমাম অভিন্ন মত পোষণ করেন যে, এ আয়াত দ্বারা স্ত্রীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং একই সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীস দ্বারাও এটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, ইসলাম গ্রহণের সময় তায়েফ-প্রধানের নয়জন স্ত্রী ছিলো। চার স্ত্রী রেখে অবশিষ্টদেরকে তালাক দেয়ার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দেন। তদ্রূপ নওফেল ইবনে মুআবিয়ারও পাঁচজন স্ত্রী ছিলো। তন্মধ্যে একজনকে তালাক দেয়ার জন্য তিনি তাঁকেও নির্দেশ দেন।

www.pathagar.com

তদুপরি কথা এই, ন্যায়বিচার রক্ষার শর্তেই এ আয়াত বহু বিবাহের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এ শর্ত পূর্ণভাবে পালন করে না, অথচ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, যে আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করে। যে স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা হয়, স্বামী হতে তার অধিকার আদায়ের পূর্ণ ক্ষমতা ইসলামী রাষ্ট্রের আদালতের রয়েছে।

পাশ্চাত্যের মতামত দ্বারা বশীভূত এবং প্রভাবান্বিত কিছু লোক প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যে, বহু বিবাহ-প্রথা (যা তাদের মতে মূলতঃই মন্দ) রহিত করাই কুরআনের আসল উদ্দেশ্য ছিলো। কিন্তু এ প্রথা বহু প্রচলিত ছিলো বলে এর উপর কেবল কতিপয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এরূপ উক্তি একমাত্র গোলামী মনোভাবেরই ফল। নিরেট একটা প্রথা হিসেবে বহু বিবাহের রীতি মন্দ, এটা কিছুতেই স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে না। কারণ, কোনো কোনো অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে এটি সামাজিক ও নৈতিক প্রয়োজনে পরিণত হয়ে পড়ে। বহু বিবাহের অনুমতি না থাকলে যারা এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তারা বিবাহ-বন্ধনের বাইরে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা বিস্তার করবে। আর এর কুফল বহু বিবাহের যে অনিষ্টের কথা লোকে বলে থাকে, সভ্যতা ও নীতির ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশি হবে। এ জন্যই যারা বহু বিবাহের আবশ্যকতা অনুভব করে তাদেরকে এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ সত্ত্বেও বহু বিবাহ প্রথাই যাদের কাছে মন্দ, কুরআনের বিরুদ্ধাচরণে এর নিন্দা করা এবং একে রহিত করার পরামর্শ দেয়ার অধিকার তাদের আছে। কিন্তু তাদের নিজস্ব অভিমতকে কুরআনের অভিমত বলে প্রকাশ করার অধিকার তাদের মোটেই নেই। কারণ, কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একে জায়েজ বলেছে এবং ইশারা-ইঙ্গিতেও এর নিন্দাসূচক এমন কোনো শব্দ এতে ব্যবহৃত হয়নি, যাতে বহু বিবাহ-প্রথা রহিত করার উদ্দেশ্য ছিলো বলে বোঝা যেতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে বাঁদী-দাসীকেও স্ত্রীরূপে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বাঁদী-দাসী বলতে সেসব নারীকেই বোঝায়, যারা যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসে এবং সরকারের পক্ষ হতে লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। সুতরাং এর অর্থ হলো– স্বাধীনা সম্ভ্রান্ত বংশের নারীকে বিবাহের ভার তুমি যদি বরদাশ্‌ত করতে না পার তবে বাঁদী-দাসীকেই স্ত্রীরূপে গ্রহণ কর অথবা তুমি যদি একাধিক স্ত্রীর আবশ্যকতা অনুভব কর এবং স্বাধীন সম্ভ্রান্ত বংশের স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করা তোমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে বলে মনে কর তবে বাদী-দাসী গ্রহণ কর। কারণ সম্ভ্রান্ত বংশের স্বাধীনা স্ত্রীদের প্রতি তোমার দায়িত্ব হতে তাদের প্রতি তোমার দায়িত্ব তুলনামূলকভাবে কম হবে। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা নিসার টিকা ৪-৬)

বহু বিবাহ সম্পর্কে মাওলানা মুফতী মুহম্মদ শফী (রঃ) কি বলেন ঃ

বহু বিবাহ প্রথা ইসলাম-পূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সব ধর্মমতেই বৈধ বলে বিবেচিত হতো। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, মিসর, ব্যাবিলন প্রভৃতি সব দেশেই এ প্রথার প্রচলন ছিলো। বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত।

বর্তমানকালে ইউরোপের একশ্রেণীর চিন্তাবিদ বহু বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আসছেন বটে; কিন্তু তাতে কোনো সুফল হয়নি। বরং এতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফল রক্ষিতার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থার বিজয় হয়েছে। তাই আজকে ইউরোপের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এটি পুনঃপ্রচলন করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন।

ইউরোপের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মিঃ ডিউন পোর্ট বহুবিবাহের একজন বড় প্রবক্তা। এর সমর্থনে তিনি পবিত্র ইনজীল কিতাবের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন, এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বহু বিবাহ কেবল পছন্দনীয়ই নয়, বরং এতে আল্লাহতাআলা বিশেষ উপকারিতাও

www.pathagar.com

রেখেছেন।

এভাবে ইউরোপের পাদ্রী নিকলসন, জন মিল্টন এবং আইজাক টেইলর প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তি বহু বিবাহ-প্রথা চালু করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এমনকি পন্ডিত ডিরাক অসংখ্য স্ত্রী রাখার পক্ষপাতি। তাঁর মতে, এক ব্যক্তি দশ হতে সাতাশটি বিয়েও করতে পারবে একই সময়ে। কৃষ্ণকে হিন্দুরা পরম দেবতা বলে স্বীকার করে। তাঁরও দশ হাজার স্ত্রী ছিলো বলে বর্ণনা করা হয়।

ধর্মীয় পবিত্রতা ও সামাজিক কাঠামো সুবিন্যস্ত রাখার তাকীদে এবং সমাজ হতে যেনো-ব্যভিচার ইত্যাদি অসামাজিক কার্যকলাপ নির্মূল করার স্বার্থে বহু বিবাহ-প্রথা একান্তই প্রয়োজন। এ ছাড়া অনেক সমাজে দেখা যায়, পুরুষের তুলনায় মেয়ের সংখ্যাই বেশি। বহু বিবাহের মাধ্যমে এ সমস্যারও সমাধান হতে পারে। বহু বিবাহের সুযোগ না থাকলে সমাজে গণিকাবৃত্তি ও প্রমোদ-বালাদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাওয়াই খুব স্বাভাবিক। আর সত্য কথা এই যে, যেসব সমাজে বহুবিবাহের অনুমতি নেই, সেসব স্থানে ব্যভিচার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই। আজকের ইউরোপীয় সমাজের দিকে লক্ষ্য করলেই আমরা এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে পারি। সেখানে বহু বিবাহের উপর তো বিধি-নিষেধ রয়েছে ঠিকই; কিন্তু পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও নর-নারীর অবাধ মেলামেশার আবরণে যেনা ও এ জাতীয় অসামাজিক কার্যকলাপ চরমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এ জন্য তাদের কোনো বাধেও না, বরং এর প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

মোটকথা, ইসলাম-পূর্ব যুগে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিলো। বিভিন্ন ধর্ম ও দেশের ইতিহাস থেকে জানা যায়,এর প্রতি কোনো প্রকার বাধা-নিষেধও ছিলো না। ইয়াহুদী, খৃস্টান, হিন্দু ও পারসিকদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও কোনো সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই এ ব্যবস্থা চালু ছিলো। সে সময় অগণিত বহুবিবাহের জন্য অনেকের লোভ-লালসার অন্ত ছিলো না। অপরদিকে এ থেকে উদ্ভূত-দায়িত্বও তারা সঠিকভাবে পালন করতে পারতো না। বরং এসব স্ত্রীকে তারা রাখতো দাসী-বাঁদির মতো এবং তাদের সাথে যাচ্ছে-তাই ব্যবহার করতো। তাদের উপর কোনো ইনসাফ করা হতো না। পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বিরাজ করতো। অনেক সময় পছন্দসই একজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাকিদের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হতো। (মা'আরিফুল কুরআন-২, ২৬৮-২৭০, বাংলা সংস্করণ- ইফাবা ১৯৯০)

আলোচ্য আয়াতে বাঁদী-দাসীদের অধিকারীকে তাদের উপর স্বামীত্বের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এ নিয়ে ইসলাম-বিদ্বেষীদের সমালোচনার অন্ত নেই। এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে অগণিত ও অবাধ নারী-ভোগের সুযোগ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়ে থাকে। মুসলমানদের মধ্যেও কারো কারো এ বিষয়ে বিস্তর ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম অসহায় ও বিপদে নিপতীত নারীদেরকে নারীসুলভ ও সামাজিক মর্যাদা প্রদান করেছে, তাদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং নারী পুরুষ সংক্রান্ত ব্যাপারে উদ্ভূত সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান প্রদান করেছে। এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা দরকার।

ইসলামে বাঁদী-দাসীদের সামাজিক মর্যাদা

যেসব নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে আসে, তাদের অমুসলমান স্বামী অনৈসলামী রাষ্ট্রে জীবিত থাকলেও তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন অবৈধ নয়। কারণ অনৈসলামী রাষ্ট্র হতে ইসলামী রাষ্ট্রে আগমনের পর তাদের বিবাহ ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ রকম নারী বিবাহ করা যেতে পারে এবং যার অধিকারে সে আছে, সে ব্যক্তি তার সাথে সহবাসও করতে পারে। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বন্দী হয়ে আসলে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে কিনা, এ

www.pathagar.com

বিষয়ে ফিকহ শাস্ত্রের ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও তাঁর শাগরিদগণের মতে তাদের বিবাহ ভঙ্গ হবে না। কিন্তু হযরত ইমাম শাফি (রঃ) ও হযরত ইমাম মালিক (রঃ)-এর মযহাব মতে তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

বাঁদী-দাসীদের সাথে সহবাসের ব্যাপারে লোকের মধ্যে অনেক ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ভালোরূপে বুঝে নেয়া দরকার।

১. যুদ্ধে বন্দী হওয়া মাত্রই বন্দিনীদের সাথে সহবাসের অধিকার প্রতিটি সিপাহী লাভ করে না। বরং ইসলামী আইন অনুসারে এ বন্দী নারীদেরকে সরকারের নিকট সোপর্দ করে দিতে হবে। সরকার ইচ্ছা করলে তাদেরকে কোনো বিনিময় ছাড়াই মুক্তি দিতে পারে বা মুক্তিপণ গ্রহণে মুক্তি দিতে পারে; ইচ্ছা করলে শত্রুর হাতে মুসলমান বন্দীদের সাথে তাদের বিনিময় করতে পারে অথবা তাদেরকে সৈন্যদের নিকট বন্টন করে দিতে পারে। একজন সৈন্য কেবল সেই নারীর সাথেই সহবাস করতে পারে, সরকারের পক্ষ হতে যাকে আইনতঃ তার অধিকারে দেয়া হয়েছে।

২. এ প্রসঙ্গে আইনসঙ্গত উপায়ে কোনো বন্দিনীকে কারো অধিকারে দেয়ামাত্র সে তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। বরং একটা মাসিক ঋতু অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, বন্দিনী গর্ভবতী নয়। এর পূর্বে সহবাস করা হারাম। গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেও তার সাথে সহবাস বৈধ নয়।

৩. যুদ্ধবন্দিনী নারীদের সাথে সহবাসের ব্যাপারে এমন কোনো শর্ত নেই যে, তারা আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হতেই হবে। বরং তারা যে কোনো ধর্মাবলম্বী হোক না কেনো, যখন তাদেরকে বন্টন করে দেয়া হয় তখন যে বন্দিনী যে ব্যক্তির অংশে পড়ে, সে তার সাথে সহবাস করতে পারে।

৪. যে বন্দিনী নারীকে বন্টনে যে ব্যক্তির অংশে দেয়া হয়, কেবল সে-ই তার সাথে সহবাস করতে পারে। তাকে স্পর্শ করার অধিকার অপর কারো নেই। তার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে তারই বৈধ সন্তানরূপে পরিগণিত হবে যার অধিকারে সে নারী আছে। এ সন্তান সেসব আইনগত অধিকারই লাভ করবে যা সম্ভ্রান্ত বংশের স্বাধীনা বিবাহিতা স্ত্রীদের গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ সন্তানদের জন্য শরীয়তে নির্ধারিত আছে। সন্তান প্রসবের পর এ নারীকে বেচা-কেনা করা যায় না এবং যে পুরুষের অধিকারে সে আছে, তার মৃত্যুর পরই সে আজাদ হয়ে পড়ে।

৪. আইনগতভাবে যে বন্দিনী যে ব্যক্তির অধিকারে আসে, সে যদি তাকে অপর কারো সাথে বিয়ে দেয় তবে এ নারীর সব রকম সেবা পাওয়ার অধিকার অবশ্যই তার থাকে বটে; কিন্তু তার সাথে যৌন সম্পর্কের কোনো অধিকারই তার থাকে না।

৬. স্বাধীনা নারীদের মধ্য হতে যেমন চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে না বলে শরীয়ত নির্ধারিত করে দিয়েছে, বন্দিনী নারীদের বেলায় এরূপ কোনো সংখ্যা নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি। কিন্তু এ সংখ্যা নির্ধারণ না করার পিছনে শরীয়তের এমন কোনো উদ্দেশ্য নেই যে, ধনীরা বহু বাঁদী-দাসী খরিদ করে জমাবে এবং নিজেদের গৃহকে ভোগ-সম্ভোগের আড্ডায় পরিণত করবে। বরং প্রকৃত প্রস্তাবে এ ব্যাপারে সংখ্যা নির্ধারণ না করার কারণ হলো, পরবর্তীকালে কতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হবে এবং এর ফলে কতো নারী বন্দিনী হয়ে আসবে, এর কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই।

৭. মালিকানা স্বত্বের যাবতীয় অধিকারের ন্যায় কোনো যুদ্ধবন্দীর উপর সরকারের পক্ষ

www.pathagar.com

হতে কোনো ব্যক্তি আইন মুতাবিক যে অধিকার লাভ করেছে, তারও হস্তান্তর করা যেতে পারে।

৮. বিবাহ যেমন আইনসঙ্গত একটি কাজ, সরকারের পক্ষ হতে মালিকানা স্বত্ব আইনানুগভাবে প্রদানও তেমনি একটি আইনসঙ্গত কাজ। সুতরাং যে ব্যক্তি বিবাহে ঘৃণা বোধ করে না, যুদ্ধবন্দিনীর সাথে সহবাসেও তেমনি অনর্থক ঘৃণা অনুভব করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ তার থাকতে পারে না।

৯. যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য হতে কোনো নারীকে কারো মালিকানা স্বত্ব প্রদানের পর তাকে ফিরিয়ে নেয়ার কোনো অধিকার সরকারের থাকে না। কোনো নারীর আইনানুগ অভিভাবক তাকে কারো সাথে বিয়ে দেয়ার পর যেমন সে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে না তেমনি সরকারও বন্দিনীকে কারো নিকট অর্পণ করলে তাকে আর ফিরিয়ে নিতে পারে না।

১০. কোনো সেনাপতি যদি নিজ সৈন্যদেরকে যুদ্ধবন্দিনী নারীদের সাথে যৌন বাসনা পূরণের কেবল সাময়িক অনুমতি প্রদান করে এবং কিছু সময়ের জন্য তাদেরকে সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেয় তবে ইসলামী আইন মতে এটি সুস্পষ্ট হারাম কাজ হবে। এতেও ব্যভিচারে কোনো পার্থক্য নেই এবং ইসলামী আইনে ব্যভিচার দন্ডনীয় অপরাধ। (সূত্র ঃ তাফ্হীমুল কুরআন, সূরা নিসা-৪৪)

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা, একবার ধীরস্থির চিত্তে চিন্তা করে দেখুন। অসহায় বিপদে নিপতিত নারীদের পুনর্বাসন ও সামাজিক মর্যাদা প্রদানের এটি অপেক্ষা অধিক সহানুভূতিশীল ও সুন্দর ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? বন্দী নারী ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় স্বাধীন বিবাহিতা স্ত্রীদের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য রইলো কি? বন্দী অসহায় নারী স্ত্রীর মর্যাদাই লাভ করেছে; অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় প্রচলিত উপপত্নী স্বরূপ সে নয়। পাশ্চাত্য এরূপ কোনো ব্যবস্থা দিতে পেরেছে কি? অথচ ইসলাম এর অনুসারীদেরকে নারী উপভোগের অবাধ ও লাগামহীন অধিকার দিয়েছে বলে নিন্দা প্রচারে তাদের কমতি নেই। তাদের জ্ঞান ও সুবুদ্ধি জাগ্রত হোক– এটিই কামনা করি।

বাঁদী-দাসীদের উপর স্বামীত্বের অধিকার প্রদান করে ইসলাম দাস-প্রথা টিকিয়ে রাখতে চায়– এ অভিযোগ এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে। বস্তুতঃ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব হতেই জগতে দাস-প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো। বিশেষতঃ আরবে এর বহুল প্রচলন ছিলো। ইসলাম দাস-দাসীকে সামাজিক মর্যাদা প্রদান করেছে এবং ক্রমান্বয়ে এ প্রথা রহিত করবার পরিকল্পনা পেশ করেছে। এখানে এ আলোচনার অবকাশ নেই।

বহু বিবাহ ও পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দ

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বাসনা মানুষের প্রকৃতিতে নিহিত রয়েছে। স্বভাব-ধর্ম ইসলাম এ অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তির স্বীকৃতি দিয়েছে এবং শর্তাধীনে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছে। আর একমাত্র এ ব্যবস্থা বিবাহ-বন্ধনের বাইরে গোপন যৌন সম্পর্ক, সামাজিক অশ্লীলতা ও নৈতিক অপরাধ সফলতার সাথে দমন ও প্রতিরোধ করতে পারে। স্বভাবের গতিকে অস্বাভাবিকভাবে রুদ্ধ করে দিতে গেলে এর কুফল প্রচন্ডরূপে দেখা দেবে। সুতরাং দেখা যায়, বহু বিবাহ নিষিদ্ধকরণের সাথে সাথে সমাজে বেশ্যাবৃত্তি, নারী-ধর্ষণ, নারী হরণ, ব্যাভিচারের ন্যায় অপরাধ প্রসার লাভ করে। এর ফলে বহু বিবাহের বিরোধী পাশ্চাত্য ও এর অনুসারীরা আজ চরম বিপদ ও সংকটের সম্মুখীন। এসব স্থানে বেশ্যাবৃত্তি বহু বিবাহের স্থান দখল করে নিয়েছে। কেবল নিউইয়র্কেই পঞ্চাশ হাজার উপপত্নী রয়েছে এবং প্রতি বছর এক কোটি পঞ্চাশ লাখ গর্ভপাত করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া প্রতি মিনিটে একটি করে নারী ধর্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

(সূত্রঃ Ben Linsey, Revolt of Modern Youth.)।

বহু বিবাহের বিরোধীরা অবৈধ যৌন আচরণে কোনো প্রকার নৈতিক সংকোচ বোধ করে না এবং বৈবাহিক জীবনের দায়িত্ব বহনে তারা নারাজ। এ জন্যই অবৈধ যৌন মিলন তাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসার লাভ করেছে। নারী-মুক্তি, নারী-স্বাধীনতা, নারী-প্রগতি ও নারী-পুরুষের সমান অধিকারের মুখরোচক প্রচারের মাধ্যমে পাশ্চত্যের ধুরন্ধরেরা নিজেদের ঘৃণ্য স্বার্থে নারীদেরকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে নিজেদের দৈহিক উপভোগের সামগ্রী বানিয়ে নিয়েছে। আর অবোধ নারীরা তাদের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু ইযযত হুরমত বিনষ্ট করছে। নারী স্বাধীনতার প্রচারের পিছনে নৈতিকতাবোধ শূন্য হীনচরিত্র পুরুষদের লেলিহান লম্পটতা যে কাজ করছে, পূর্ব বিকারহীন মন নিয়ে চিন্তা করলে নারীরা তা অনায়াসেই বুঝতে পারবে।

বহুবিধ কারণ ও অবস্থা পুরুষকে বহু বিবাহে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের প্রকৃতি সাধারণতঃ বহু স্ত্রীর সঙ্গ লাভ করতে চায়। এ সত্য অস্বীকার করা যায় না।

উইল ডুরান্ট বলেন ঃ পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই বহু বিবাহ কামনা করে। একমাত্র ধর্মের নীতি পালনের দৃঢ়তম অনুপ্রেরণা, বহু বিবাহের বাসনা দমন করে রাখার মতো দারিদ্র্য, কঠোর সাধনা এবং স্ত্রীর অবিরাম তত্ত্বাবধানই তাকে এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে প্রবৃত্ত করতে পারে। (সূত্র ঃ The Story of Civilization, Vol 375 p.)

ডঃ এ্যানি বেসান্ত বলেন ঃ পাশ্চাত্যে এক বিবাহের প্রহসন আছে। কিন্তু বাস্তবে তথায় বিবাহ বন্ধনের দায়িত্ব ছাড়া বহু নারী-সঙ্গম অবাধে চলেছে। নারী-পুরুষের কাছে ক্লান্তি ও বিরক্তিকর হয়ে উঠলে সে তখন তাকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং নারী তখন নিরূপায় হয়ে পথে দাঁড়ায়। কারণ তার প্রেমিক তার ভবিষ্যতের জন্য কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করে নি; কেবল সাময়িক সম্ভোগই ছিলো তার একমাত্র উদ্দেশ্য। বহু বিবাহ প্রচলিত আছে এমন গৃহে সসম্মানে সংরক্ষিত একজন গৃহবধূ ও মাতা অপেক্ষা এ ধরনের নারী শতগুণে নিকৃষ্ট। রাত্রিকালে পাশ্চাত্যের শহরগুলো রাস্তায় রাস্তায় যখন ঘৃণ্য ও দুঃস্থ হাজার হাজার নারীর ভিড় দেখতে পাই তখন আমরা ইসলামের বহু বিবাহ প্রথার প্রতি পাশ্চাত্যের নিন্দার অসারতা উপলব্ধি করতে পারি। একমাত্র একজন পুরুষের স্ত্রীরূপে বৈধ সন্তান কোলে নিয়ে সসম্মানে গৃহে অবস্থানকারী একজন মহিলা সেই রমণী হতে অনেক উৎকৃষ্ট, অনেক সুখী ও অনেক সম্মানার্হ, যাকে অবৈধ সন্তানসহ আইনের সীমার বহির্ভূত, রজনী অবসানে আশ্রয়হীনা, মাতৃত্বে যোগ্যতাশূন্য ও সকলের ঘৃণ্য অবস্থায় রাস্তায় বের করে দেয়া হয়। (সূত্র ঃ Fida Hussain Malik, Wives of the Prophet-Ph, 74-75)।

ইসলামের বহু বিবাহ প্রথার উপযোগ, কার্যকারিতা ও কল্যাণ সম্পর্কে পাশ্চাত্যের এ সমাজবিজ্ঞানীর উপলব্ধি কতো সুন্দর! তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন, পাশ্চাত্য জগত এক বিবাহের কথা বললেও কার্যতঃ এ প্রথা পাশ্চাত্যেও প্রচলিত নেই। বরং সেসব দেশে বিবাহ-বন্ধনের বাইরে লোকেরা বহু নারী সম্ভোগ অবাধে করে থাকে। নারীকে উপভোগের পর তাকে বিতাড়িত করা হয় এবং সে তখন কলংকের বোঝা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে বাধ্য হয়। এর চেয়ে আরো স্ত্রী আছে এমন স্বামীর অধীনে বিবাহিত জীবন যাপন করা কতো সুন্দর ও উৎকৃষ্ট! পাশ্চাত্যের শহরগুলোতে রাত্রিকালে হাজার হাজার নারী রাস্তায় রাস্তায় প্রেমিক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভিড় জমায়। ইসলামের বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকলে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। যে সকল পুরুষ এক স্ত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তারা একাধিক বিয়ে করতো এবং নারীদেরকেও এতো দুর্গতি ভোগ করতে হতো না। এটা হতেই ইসলামের বহু বিবাহ প্রথার বিরোধিতার অসারতা অনায়াসেই বোঝা যায়।

www.pathagar.com

গোটা দুনিয়া আজ ইসলামের বহু বিবাহ-প্রথার উপকারিতা স্বীকার করতে বাধ্য হতে চলেছে। এমনকি এর চরম বিরোধী চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজের প্রফেসর মিশ নাবিয়া এবটও বলতে বাধ্য হয়েছেন– এক বিবাহ-প্রথা প্রচলিত সমাজের নিকৃষ্টতম দিক এই, এটি বেশ্যাবৃত্তি, রক্ষিতা প্রণয়নী অথবা প্রবাদের 'কুকুর-বিড়াল'-এর পারিবারিক জীবন হতে মুক্ত নয়। (সূত্র ঃ Fida Hussain Malik, Wives of the Prophet-ph, 75)।

ক্লেয়ার ক্যাকফারলেন বলেন ঃ সমাজ, নৈতিকতা বা ধর্ম, যে কোনো দৃষ্টিকোণ হতেই বিবেচনা করা হোক না কেনো, এটা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যেতে পারে যে, বহু বিবাহ সভ্যতার উন্নততম মানের পরিপন্থী নয়। অসহায় ও পরিত্যক্ত পাশ্চাত্য নারীদের সমস্যা সমাধানের এটিই একমাত্র উপায়। বহু বিবাহ প্রথা গ্রহণ না করলে বেশ্যাবৃত্তি অবিরতভাবে বৃদ্ধিই পাবে এবং অবৈধ প্রণয়নী ও অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা মর্মান্তিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (সূত্র ঃ Clare Mc Farane, The Case for Polygamy)।

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মহিলা চিন্তাবিদ ডঃ এ্যানি বেসান্ত সম্পর্কেও ম্যাক ফারলেন বহু বিবাহ প্রথা সম্পর্কে বলেন ঃ এটি একটি কল্যাণজনক প্রথা যা নারীত্বকে অসহায়তা ও বেশ্যাবৃত্তি হতে রক্ষা করতে পারে। (সূত্র ঃ Fida Hussain Malik, Wives of the Prophet, p. 76)

উচ্ছৃঙ্খল যৌন জীবন হতে বিবাহিত জীবনই যে নারীদের জন্য উত্তম, এ প্রসঙ্গে এন্থনি এম লুড়ভিসি (Anthony M. Ludovici) বলেন ঃ নির্ধারিত বয়স পর্যন্ত প্রত্যিটি নারীর জন্যই বিবাহের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে আমরা অতীতে জোরের সাথে বলে এসেছি তার চেয়ে অধিক জোরের সাথে এটি প্রকাশ করার আবশ্যকতা আমরা অনুভব করছি এবং মাতা-পিতাকেও তেমনিভাবে অবহিত করা প্রয়োজন মনে করি যে, বিবাহ এমন এক জিনিস যার প্রতি কন্যাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা তাদের একান্ত কর্তব্য।... অন্য যা কিছু কন্যা করুক না কেনো, তন্মধ্যে এটিই তার জন্য সর্বোত্তম। মর্যাদায় অন্য সব এর পরবর্তী স্তরের। আর তার যৌবনকালে ভুল তথ্য পরিবেশন এবং আত্মমর্যাদার প্রতি আবেদন জানিয়ে প্রেমিকদের আহবানে সাড়া দেয়া মাতৃত্ব বরণ অপেক্ষা তার জন্য উৎকৃষ্ট বা এর সমকক্ষ বলে যারা তাকে প্ররোচিত করেছিল তারা কেবল নারীদেরই শত্রু নয়, বরং সমগ্র মানব-জাতির শত্রু।

Wester Maeck তাঁর Futue of Marriage in the Western Civilization গ্রন্থে এমনি অনেক লেখকের উল্লেখ করেন যাঁরা বহু বিবাহের অনুমতি দিয়ে আইন প্রণয়নের দাবি করেছেন। তারপর তিনি বলেন ঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে পুরুষ যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে চায় বা নারী একাধিক স্বামী গ্রহণের ইচ্ছা করে তবে এর অনুমতি প্রদানে কোনো আপত্তি আছে বলে ডঃ কোপ মনে করেন না। তিনি বলেন ঃ সাধারণ অবস্থায় এরূপ বিবাহে খুব কম লোকই সম্মত হবে। কিন্তু এমন অনেক দুঃখ-কষ্ট আছে যা বহু বিবাহের অনুমতি বিদূরিত করবে। উদাহরণ স্বরূপ যেমন, পুরুষ বা নারী দুরারোগ্য স্থায়ী রোগে আক্রান্ত থাকতে পারে কিংবা অনেক আকস্মিক সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ঘটতে পরে। সুতরাং বহু বিবাহের পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু না বলাই উত্তম।

মিঃ সাউদানের অভিমতও এই– লোকে এক বিবাহ-প্রথা পছন্দ করে বলেই এর পক্ষে বলপ্রয়োগের যুক্তসম্মত কোনো কারণ রাষ্ট্রের নেই।

ঃ নরমেন হেয়ার অভিমত পোষণ করেন– আইনসিদ্ধ বহু বিবাহ অধিকাংশ লোকের প্রভূত মঙ্গল সাধন করবে। তিনি বলেন ঃ সরকার যদি সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে আইনানুগ স্ত্রী গ্রহণের কোনো সংখ্যা নির্ধারণের আবশ্যকতা নেই।

www.pathagar.com

ফ্রান্সে ডঃ লি বন ভবিষ্যৎ বাণী করেন– আগামীতে ইউরোপের আইন বহু বিবাহকে স্বীকৃতি দান করবে।... নারী পুরুষের প্রকৃতিগত সম্পর্ক বহু বিবাহে প্রত্যাবর্তন বহু মন্দ ও অনিষ্ট হতে রক্ষা করবে– যেমন বেশ্যাবৃত্তি, যৌন ব্যাধি, গর্ভপাত, জারজ সন্তান-সন্ততির দুর্ভোগ-দুর্গতি, নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে লাখ লাখ মহিলার দুঃখ-কষ্ট, ব্যভিচার, এমনকি হিংসা, যেহেতু অবহেলিতা স্ত্রী এ বলে সান্ত্বনা পাবে যে, তার স্বামী তাকে গোপনে নিরাশ করেনি।

প্রফেসার ক্রিশ্চিয়ান ডন এহরেন ফেল্‌স বহু বিবাহের একজন চরম সমর্থক। তিনি বহু বিবাহকে আর্যজাতির সংরক্ষণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক বলে মনে করেন।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় উপরে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হলুম। এসব উদ্ধৃতি প্রমাণ করে, পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদগণ সমাজ হতে বেশ্যাবৃত্তি, যৌন ব্যাধি, গর্ভপাত, লাখ লাখ অবিবাহিতা নারীর দুঃখ-কষ্ট ও ব্যভিচার নিরসন এবং আরো বহুবিধ সামাজিক জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য বহু বিবাহের আবশ্যকতা কতো তীব্রভাবে অনুভব করেন। আর এ সকল উক্তি এটিও প্রমাণ করে, জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, তাঁরা ইসলামের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছেন। আমরা তাঁদেরকে ইসলামের দিকে সাদর আহ্‌বান জানাই।

বহু বিবাহ কেনো

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামের আবির্ভাবের আগেই দুনিয়ার সব ধর্ম ও জাতিকে বহু বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিলো। ইসলাম এর উর্ধ্ব সীমা চার-এ নির্ধারণ করে দিয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে সব স্ত্রীর সাথে সুবিচারের শর্তে একজন পুরুষ একই সময়ে চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে। সুবিচার করতে পারবে না বলে আশংকা হলে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আবার স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সামর্থ্য যার নেই তাকে বিবাহ হতে বিরত থেকে রোজা রেখে কাম-বাসনা সংযত করতে বলা হয়েছে। এটি অপেক্ষা সুন্দর ও বাস্তবধর্মী ব্যবস্থা আর কি হতে পারে?

মানবিক, নৈতিক ও সামাজিক কারণে বহু বিবাহ আবশ্যক। উপরের আলোচনায় এটি প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। তবু এটি আরো একটু বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তাই এখানে আমরা এর বিভিন্ন দিকের প্রতি একটু ইঙ্গিত করে যাবো। এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল সমস্যা আছে, বহু বিবাহ ছাড়া যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। সমস্যাগুলো এইঃ

১. পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বেশি হওয়া। দ্বিবিধ-কারণে এটি হতে পারে।

   প্রথমতঃ স্বাভাবিক জন্মহার অনুযায়ীই দেখা যায়, দুনিয়ার অধিকাংশ দেশেই আনুপাতিক হিসেবে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক। নারীর সংখ্যা শতকরা চারজন বেশি হলেও একটি দেশের মোট লোকসংখ্যার মধ্যে এটি একটি বিরাট সংখ্যায় গিয়ে দাঁড়ায়। ধরুন, কোনো দেশের মোট লোক-সংখ্যা পনর কোটি। এক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা শতকরা চারজন বেশি হলেও অতিরিক্ত নারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ষাট লাখে। এসব নারীর কেউ কেউ হয়তো প্রচুর ধন-সম্পদ, পার্থিব উপভোগের সামগ্রী এবং বাড়ি-গাড়ি লাভে সমর্থ হবে। কিন্তু তাদের দেশে বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত না থাকলে তাদের একটি প্রকৃতিগত অত্যাবশ্যক অভাব কিছুতেই পূরণ হবে না। এ অভাবের কোনো বিকল্প নেই। এ অভাবের তাড়না কতো তীব্র, এর যন্ত্রণা কতো দুর্বিষহ, ভুক্তভোগী ছাড়া তা কেউই বুঝতে পারবে না। এ অভাবটি হলো– মধুর স্বামী। বহু বিবাহে যাঁরা বিরোধিতা করেন, এই অশান্ত নিঃসহায় নারীদের প্রতি একবার করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে তাঁদের কাছে আকুল আবেদন জানাই।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ স্বাভাবিক জন্মহার অনুসারেই পুরুষের সংখ্যা অল্প। (এতে প্রতীয়মান হয়, বহু বিবাহই প্রাকৃতিক নিয়ম)। তদুপরি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অপরাপর দৈব-দুর্বিপাকে পুরুষের সংখ্যা অত্যন্ত কমে যেতে দেখা যায়।

গত দু'টি মহাযুদ্ধে বহু সৈন্য নিহত হওয়ায় পুরুষের সংখ্যা খুব কমে যায়। ফলে যুবতী, বিধবা ও অসহায় অবিবাহিতা বালিকাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পূর্বে বলা হয়েছে, জার্মানীর মহিলারা তখন বহু বিবাহ-প্রথা অথবা ধার করা স্বামী সরবরাহের দাবিতে শ্লোগান দেয়।

যাদের সব অভাব মিটলো, কিন্তু স্বামীর অভাব মিটলো না, তাদের কি গতি হবে? একবার গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। নারী-স্বাধীনতা ও নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা যতই বলুন না কেনো, অবলা নারী পুরুষের দৃঢ় আবেষ্টন ও আশ্রয় ছাড়া কিছুতেই শান্ত থাকতে পারে না। মানবাধিকারের ধ্বনিতে ময়দান মুখরিত করেন। কিন্তু এই অবলা নারীদেরকে স্বামী পাওয়ার অধিকার হতে বঞ্চিত করেন কেনো? স্বামীর অভাবে শেষ পর্যন্ত তারা হয়তো ঘৃণ্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করবে, না হয় উপপত্নী ও গোপন প্রণয়নী হবে অথবা সতীত্ব অটুট রেখে নিঃসহায় আশ্রয়হীনভাবে, অর্ধাহার-অনাহারে ও অতি দুঃখ-কষ্টে জীবন নিপাত করবে।

একমাত্র বহু বিবাহ প্রথাই এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান।

২. কোনো কোনো পুরুষ অসাধারণ শৌর্য-বীর্যের অধিকারী হয়ে থাকে। ইহা সর্বজনবিদিত সত্য। এমতাবস্থায় তাকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি না দিলে সে নিজ স্ত্রীর স্বাস্থ্যের অনিষ্ট করবে। তথাপি সে তার উত্তপ্ত ও উদ্দীপনাময় কামনা পরিতৃপ্ত করতে না পেরে বিবাহ-বন্ধনের বাইরে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উদ্বিগ্ন থাকবে। তদুপরি পুরুষ প্রকৃতিগতভাবেই (Polygamous) একাধিক স্ত্রী কামনা করে। কিন্তু নারী সাধারণতঃ এর বিপরীত (Monogamous)। জীববিদ্যায় এটি প্রমাণিত সত্য। এটিও জীববিদ্যায় প্রমাণিত সত্য যে, রতিক্রিয়ার প্রভাব পুরুষের উপর যতটা হয়ে থাকে, নারীর উপর এর চেয়ে অনেক বেশি ও অধিক প্রবল হয়। এ কারণেই দুনিয়ার সর্বত্র সর্বকালে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত রয়েছে।

৩. দূরারোগ্য স্থায়ী ব্যাধি ও বন্ধ্যাত্বের কারণে স্ত্রী সন্তান জন্মদানের অযোগ্য থাকতে পারেন। অথচ সন্তান লাভ মানুষের চিরন্তন কামনা। ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রী স্বামীর কাম-বাসনাও সম্যকরূপে পূরণ করতে পারবেন না। এমতাবস্থায় স্বামী কি করবেন? তিনি কি পূর্ব স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অপর স্ত্রী গ্রহণ করবেন? তা হলে এই তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে তো কেউই স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চাইবে না। তিনি একেবারে নিরুপায় ও নিরাশ্রয় হয়ে পড়বেন। তার ভরণ-পোষণেরও কেউ থাকবে না। সুতরাং এটিই কি উত্তম ব্যবস্থা নয় যে, স্বামী নিঃসঙ্কোচে অপর স্ত্রী গ্রহণ করবেন এবং তাঁর পূর্ব স্ত্রীও স্ত্রীরূপেই তাঁর আশ্রয়ে সসম্মানে বসবাস করতে থাকবেন? বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকলেই এটি সম্ভব।

৪. স্বামীর কামভাব নিত্য, অবিরতভাবেই থাকে। কিন্তু স্ত্রীর রয়েছে প্রতিমাসে তিন হতে দশ দিনের ঋতুস্রাব এবং সন্তান প্রসবের পর অনধিক চল্লিশ দিনের নিফাস। এ উভয় সময়ে সহবাস নিষিদ্ধ। নিফাসের পরও স্বামী-সঙ্গ বরদাশতের শক্তি সামর্থ্য অর্জনে তার কিছু সময় লেগে যায়। আবার গর্ভকালে বিশেষতঃ পরিণত অবস্থায় সহবাসে গর্ভধারিণী ও গর্ভস্থিত সন্তানের অনিষ্ট হয় বলে অনেকেই মনে করেন। প্রতিমাসে দশ দিন, সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিন এবং গর্ভাবস্থায় বিরতি, এই দীর্ঘকাল যদি আপনার

www.pathagar.com

স্বামী সংযম রক্ষা করে থাকতে না পারেন তবে তাঁকে বিপথে যেতে দেয়া কি, তাঁর প্রতি আপনার ভালোবাসার পরিচয় হবে? বরং তাঁর একান্ত প্রয়োজন হলে তাঁকে অপর স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি প্রদানই কি তাঁর প্রতি আপনার ভালোবাসার নিদর্শন নয়?

৫. নারী বছরে মাত্র একবার গর্ভধারণ করতে পারে। অপরদিকে পুরুষ সব সময়ই বীজ বপনের কার্য সমাধানে সক্ষম। আবার নারীর কামভাব থাকে মাত্র ৪০/৫০ বছর পর্যন্ত। কিন্তু পুরুষের কামভাব থাকে তার সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত। এমতাবস্থায় ৪০/৫০ বছর বয়সে স্ত্রী যখন অক্ষম হয়ে পড়েন, তারপর ২০/৩০ বছরের দীর্ঘকাল স্বামী কিরূপে অতিবাহিত করবেন?

তদুপরি আরো লক্ষ্য করুন– সন্তান জন্মদানের উপযোগী এবং অধিক সংখ্যক সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা আছে, এমন নারীকে বিয়ে করার নির্দেশ হাদীস শরীফে রয়েছে, যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অপরাপর উম্মতের উপর হাশরের দিন ফখর করতে পারেন। আবার কোনো কোনো সময় দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির আবশ্যকতাও দেখা দেয়।

এসব কারণে সঙ্গতিসম্পন্ন স্বামী যদি তার পূর্ব স্ত্রী রেখেই অপর স্ত্রী গ্রহণ করতে চান তবে তার দোষ কোথায়? আর আপনারই বা এতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? অপরপক্ষে বহু বিবাহ প্রথা চালু না থাকলে স্বামী যদি অপরিহার্য কারণে পূর্ব স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অপর স্ত্রী গ্রহণে বাধ্য হন তবে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার কি অবস্থা হবে?

৬. অধিকাংশ লোকেই বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, এমনকি দরিদ্র কুমারীকে বিয়ে করতে চায় না। বরং উচ্চবংশীয়া ধনবতী কুমারীকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করে। এমতাবস্থায় সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের পূর্ব স্ত্রী রেখেই এসব বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা ও দরিদ্র নারীদেরকে বিয়ে করতে রাজী হলে তাদেরও কুল হয়ে পড়ে এবং এর ফলে নানাবিধ সমস্যারও উদ্ভব হয় না। এটাই কি উত্তম ব্যবস্থা নয়?

৭. সৎপাত্রে কন্যাদানই সব মাতা-পিতার একান্ত কামনা। অবিবাহিত সৎপাত্র পাওয়া না গেলে অনুপযুক্ত অবিবাহিত পাত্র অপেক্ষা পূর্ব-স্ত্রীসহ সৎপাত্রই তাঁরা অধিক পছন্দ করে থাকেন। কিন্তু বহু বিবাহের অনুমতি না থাকলে অনুপযুক্ত পাত্রেই কন্যা দান করতে হবে। এটা কি শ্রেয়?

অতএব, এ আলোচনা হতে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, একমাত্র বহু বিবাহ প্রথাই বেশ্যাবৃত্তি, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নারী-পুরুষ সংক্রান্ত নানাবিধ জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এবং এর মাধ্যমেই সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

বহু বিবাহ প্রথা প্রবর্তিত হলে নারীর অভাব দেখা দেবে এবং পুরুষেরা বিয়ের জন্য মেয়ে পাবে না, এরূপ আশংকার কোনো কারণ নেই। কেননা, নিতান্ত ঠেকায় না পড়লে পুরুষেরা সাধারণতঃ একাধিক বিয়ে করে না। বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, এমন দেশগুলোই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একাধিক বিয়ের আগেই তাদের অর্থনীতিতে এর কি প্রভাব পড়বে এবং কোনো প্রকার পারিবারিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে কিনা, এসব বিষয়ে তারা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখে। তদুপরি এক স্ত্রী আছে, এমন ব্যক্তিকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে সম্মত, এরূপ মেয়েও সহজে মিলে না। আর আগেই বলা হয়েছে, নারীর জন্মহার পুরুষের জন্মহারের চেয়ে অধিক। (অগ্রপথিক, সীরাতুন্নবী (সাঃ), ১৪১৬ হিজরী সংখ্যা)

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৫

নারী

আবু জাফর

একটি অতি মর্মস্পর্শী রসিকতা দিয়ে শুরু করি। এক ভদ্রলোকের পঁচিশতম বিবাহ বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে সাড়ম্বরে। কিন্তু উৎসবমুখর গৃহে অতিথি-অভ্যাগতরা ভদ্রলোকের দেখা না পেয়ে বিস্মিত। অবশেষে পাওয়া গেল, কোনো এক প্রান্তবর্তী কক্ষে খুবই চিন্তাক্লিষ্ট, খুবই বিষণ্ন বদনে তিনি বসে আছেন। বন্ধুরা জানতে চাইলেন, এমন আনন্দোজ্জ্বল দিনে তার এই বিষাদের হেতু কী? ভদ্রলোক বললেন, 'একটি অতীত ভুলের কারণে আজ বড় কঠিন আত্মদংশন অনুভব করছি। বিবাহের কিছুদিন পরই স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করতে চেয়েছিলাম; এক উকিল বন্ধু পঁচিশ বছর কারাদন্ডের ভয় দেখিয়ে আমাকে নিরস্ত করেছিল। তখন ভয় না পেয়ে কাজটা করলে আজ অন্তত মুক্তি পেতাম'।

নিতান্তই কৌতুক, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে সমগ্র পুরুষজাতির যে অন্তর্দাহী অভিব্যক্তি, তার যথার্থ অস্বীকার করা কঠিন। নারীর মোহিনীশক্তি যত প্রবলই হোক, এটা সত্য যে, তার লঘু মস্তিষ্ক এবং ততোধিক লঘু হৃদয়ের কারণে, যে কোনো পুরুষের জন্যেই নারী যুগপৎ বিরক্তিকর ও বিব্রতকর। আসলে বহুনন্দিত নারীপ্রেম দুর্বলচিত্ত পুরুষভৃঙ্গের একটি গুরুতর ও ক্ষণস্থায়ী ব্যসন মাত্র। সমূহ দুঃখের বিষয়, নারী নিজে এটা বোঝে না, অনেকে বুঝেও বোঝে না; প্রগলভ মধুমক্ষিকাদের নিতান্তই জিহবানিঃসৃত চাটুবাক্যকেই তারা মনে করে সত্য। তবু ভালো, নারী ওই একটি ক্ষেত্রে অন্তত অবোধ ও সরল, যে কারণে অনেক পুরুষই, অন্তরে যা-ই থাক, অন্তত কথায় মধু মিশিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয় না। না হলে গৃহে গৃহে অশান্তির আগুন কণামাত্র স্তিমিত হতো না, এটা সুনিশ্চিত। পাঠক ক্ষমা করবেন, নারীর বিরুদ্ধে বর্তমান লেখকের, সহজাত কি অর্জিত, কোনো ধরনেরই কোনো ক্ষোভ নেই, বর্তমান লেখক বরং একটু বেশিই রমণীদুর্বল। এবং অনেক নারীই যে নানা শিকরস্পর্শী অবদানে মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছেন, বর্তমান নিবন্ধকারও তা অবগত; কিন্তু সে অন্য কথা। সত্য যে, কেউ কেউ নিরন্তর শ্রম ও সাধনা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নিজেকে নির্মল ও মেঘমুক্ত করে তুলেছেন; সত্য যে, এক-দু'জন মাদাম কুরি কি মাদার তেরেসা কি নাইটিঙ্গেলের আবির্ভাবও ঘটে, কিন্তু সেটা নারীবিজ্ঞানের ব্যতিক্রম। আসলে নারীজাতির স্বাভাবিক যে ধর্ম ও প্রবৃত্তি ও প্রবণতা, তা খুবই নৈরাশ্যকর ও মানববংশের প্রকৃত সুখের বড় অন্তরায়।

নারী আসলে চাঁদের মতো, এবং চাঁদের মতোই অনেক দূরে থেকে অবলোকন করার বস্তু, নিকটে আসা মাত্র হতাশ হতে হয়। এবং ঠিক চাঁদের মতোই নারী সংস্পর্শে পুরুষের ওজন প্রায়শ হ্রাস পায়; কিন্তু সেটা আনন্দে হাল্কা হওয়া নয়, অন্তঃসারহীন অপদার্থ বায়ুভর্তি বেলুনে পরিণত হওয়া। এবং এই কারণেই অতি বড় বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ও সদ্বিবেচকও প্রেমে পড়ামাত্র একেবারেই লঘুচিত্ত এক বালকে পরিণত হন। অথচ নারীর কোনো বুদ্ধিবিভ্রাট কি ভাবান্তর ঘটে না, তার লক্ষ্যবিদারক তরবারি বরং হয়ে ওঠে আরো অধিক সতর্ক ও শাণিত। সম্রাট আকবর নূরজাহানকে তুলে দিয়েছিলেন শের আফগানের হাতে। কিন্তু তার আগে এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা, জীবন বাজি রেখে হিংস্র ব্যাঘ্রের সঙ্গে মুখোমুখি রণে নামতে হয়েছিল আফগানকে। ভাগ্য যে তিনি পরাস্ত হননি। বলাই বাহুল্য, শুধু বীরত্ব প্রদর্শন নয়, নূরজাহানকে পাওয়ার জন্যই তাঁর এই অসাধ্য সাধন। তারপর সম্রাট আকবর তাকে সস্ত্রীক পাঠিয়ে দিলেন বর্ধমানে। কিন্তু

www.pathagar.com

যথাসময়ে জাহাঙ্গীর যখন নূরজাহানকে প্রত্যর্পনের আদেশ দিয়ে দূতরূপী জল্লাদ পাঠালেন, শের আফগানকে আবার 'ডুয়েল' লড়তে হলো। দু'জনেই নিহত হলেন, 'ডুয়েল' লড়ার সেই জায়গাটিতে এখন বর্ধমান জেলা সার্কিট হাউস। অথচ নূরজাহানের কিন্তু কখনোই কণামাত্র ভাবান্তর কি চিত্তবিক্ষেপ ঘটেনি। তাকে নিয়ে দুই জন্মান্ধের মূঢ় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তিনি কেবল স্মিতহাস্যে উপভোগ করেছেন এবং অবশেষে সদম্ভে প্রবেশ করেছেন কাঙ্ক্ষিত কিন্নরলোকে। এরকমই হয়, নারীর এই দূরদর্শিতা সর্বজনবিদিত। শের আফগানদের ত্যাগ কি জাহাঙ্গীরদের স্মৃতিময় অনুরাগ উপভোগের বস্তু বটে, কিন্তু আদৌ গুরুত্ববহ নয়। নূরজাহানদের কাছে একমাত্র বিষয় হলো ক্ষমতা ও রাজকীয় বৈভব। যিনি তা দিতে পারেন তিনিই নারীর আরাধ্য দেবতা, নারীর সর্বচিত্তমথিত তরল প্রেম ও পক্ষপাত সেই সচ্ছল মহাপুরুষের দিকেই প্রবল নদী স্রোতের মতো ধাবমান। যদি কোথাও এর অন্যথা ঘটে, যদি কাউকে মনে হয় একমুখীনতার নিষ্ঠাবতী, তাহলে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট নারী দ্বিতীয় কোনো যোগ্যতর পুরুষের সন্ধান এখনো পাননি।

নারী যে সত্যই কী ভয়ঙ্কর বস্তু, তা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করেছিলেন যাযাবরে চারুদত্ত আধারকার। পৃথিবীতে বহু ধরনের নির্বুদ্ধিতা আছে, কিন্তু আসলেই সর্বাধিক ও চরম নির্বুদ্ধিতার দৃষ্টান্ত নারীর প্রতি আস্থা স্থাপন। বর্তমান নিবন্ধকারের জানা মতে পৃথিবীর কোনো মনীষী কখনো এই কথা ব্যক্ত করেন নি যে, নারীকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা চলে; বরং নারীর মৌল স্বভাবদৃষ্টে সর্বদা সতর্ক থাকারই পরামর্শ দিয়েছেন। বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি প্রবন্ধে প্রবাদসদৃশ দু'টি পংক্তি উদ্ধৃত হয়েছে– A dog, a wife and a walnut tree, The more You beat them the better they be; রাসেল অবশ্য অভব্য নিগ্রহের উদাহরণ হিসেবেই এটা তুলে ধরেছেন। কিন্তু ওয়ালনাট বৃক্ষের ক্ষেত্রে 'প্রহার' কিভাবে ফলদায়ক হয় তা তিনি বুঝতে অক্ষম, অথচ অন্য দু'টি বিষয়ে যথেষ্ট জোর দিয়ে কিছু বলেন নি। অর্থাৎ স্ত্রী জাতিকে পথে রাখবার জন্যে 'প্রহার' একটা অব্যর্থ ও উপযুক্ত চিকিৎসা বটে, কিন্তু যেহেতু এই ব্যবস্থাপত্র একটু বর্বরোচিত এবং মধ্যযুগীয়, বার্ট্রান্ড রাসেল একেবারে নাকচ করে না দিয়ে শুধু বলেছেন, সভ্য মানুষের পক্ষে এমন নির্দয় চিকিৎসার শরণাপন্ন হওয়া শোভন নয়। কিন্তু শোভন-অশোভনের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন রোগ নিরাময়ের; রোগের প্রতিকারকল্পে প্রয়োজনবোধে যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ সমিচীন ও জরুরী। রাজা তৃতীয় জর্জ যখন উন্মাদ হয়ে যান, দুষ্ট আত্মার কবলমুক্ত করতে তাকেও নির্দয়ভাবে প্রহার করা হতো। উন্মাদ রাজা অবশ্য তাতে আরোগ্য লাভ করেননি, কিন্তু যা উল্লেখ করা জরুরী তা হলো, রোগীর পদমর্যাদা কি সামাজিক অবস্থান কি অন্য কোনো কারণে চিকিৎসা-বিধানকে পরিবর্তন অথবা লঘু করা অসমিচীন।

মহানবী (সাঃ) সমগ্র জীবনে কখনো ব্যক্তিগত কারণে ক্রুদ্ধ হননি, কারো বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভও প্রকাশ করেননি। এবং তিনি নারী জাতির মর্যাদাকে এমন সুউচ্চে তুলে ধরেছেন, যে তুলনায় বৃটেন-আমেরিকার নারী স্বাধীনতাকে মনে হয় বায়ুস্ফীত বেলুনমাত্র। প্রেম ও সহিষ্ণুতার সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টান্ত, সমগ্র পৃথিবীর জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরিত, নারীর মূল্য ও মর্যাদা বিধানের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা ও রূপকার এই মহানবী (সাঃ)ও বলেছেন, 'প্রয়োজনবোধে প্রহার করো, কিন্তু মুখমন্ডলে আঘাত করো না।' এই কথা অবশ্য নবী (সাঃ)-এর নিজের কথা নয়। কারণ তিনি নিজে থেকে কিছু বলেন না; তাঁর সব কথা আল্লাহরই কথা। নারীদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক কী বলেন? কোরআন শরীফ তো আসলে মানুষের জন্যে পুরোপুরি সতর্কতাজ্ঞাপক এক মহাগ্রন্থ। এই গ্রন্থে আল্লাহপাক কুখ্যাত ইবলিস সম্পর্কে বলেন, 'শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল'; পক্ষান্তরে নারীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, 'তোমাদের চক্রান্ত অতীব জটিল'। অর্থাৎ নারী ইবলিসের থেকেও ভয়ঙ্কর ও অহিতসাধক ও চক্রান্তবয়নে পারঙ্গম। অনেকে জানেন, নবী (সাঃ)কে যাদু করে যে পাষন্ড কষ্ট দিয়েছিল তার নাম লবীদ ইবনে

www.pathagar.com

আসাম, কিন্তু সর্বকালের এই সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবকে ঠান্ডা মাথায়, নিষ্কম্প হস্তে প্রাণহরণের নিমিত্ত সরাসরি বিষপ্রয়োগ করেছিল এক ইহুদী রমণী। খলিফা হযরত আলী (রাঃ) যে পাষন্ড মুলজেমের হাতে শহীদ হয়েছিলেন সেই মুলজেমের অন্যতম প্রধান প্ররোচক ছিল এক রূপসী রমণী। অবশ্য এই সকল ঘটনাকে এক-একটি দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা বলেও করুণা করা যায়; কিন্তু নারী যে প্রকৃতিগতভাবেই খল ও সরিসৃপধর্মী, এই ঘটনায় তারও প্রমাণ মেলে। সত্যই, নারীর স্বভাবগত বিপজ্জনক কুশলতা নিয়ে একটি সুদীর্ঘ মহাকাব্য রচনা করা যায়; এবং পৃথিবীর জন্যে এই জাতীয় একটি উপকারী মহাকাব্যের বিশেষ প্রয়োজনও আছে। ধারণা হয়, ভবিষ্যতের কোনো জেমস জয়েস কি পাস্তারনাক কি কোনো বিমল মিত্র নিশ্চয়ই এই কাজে কখনো আত্মনিয়োগ করবেন।

অবশ্য কোনো কোনো নারী যে বিস্ময়করভাবে আপন ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে যান তার কারণ, এই বিরল মহীয়সীরা উদ্ধত আত্মমুগ্ধ নার্সিসাসে পরিণত না হয়ে নম্রভাবে আত্মসংশোধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু বলাই বাহুল্য, এঁদের সংখ্যা এতো কম যে, কোনোরূপ গণনাতেই আসে না।

কিছু কিছু বিখ্যাত উক্তির কারণেও নারীরা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ গ্রহণ করেছে, আর উক্তিগুলো যেহেতু পুরুষের, নারীকে বুঝানো প্রায় অসম্ভব যে, সেসব আসলে অত্যুক্তি অথবা দ্ব্যর্থক। জন্ম প্রক্রিয়া, বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ, দৈহিক দক্ষতা ও শক্তি– এই রকম দু'একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকৃতির কিছুটা 'পক্ষপাতদুষ্ট' আনুকূল্য না পেলে পুরুষের কপালে নারীর কারণে আরো যে কতো ক্লেশ ও নিগ্রহের কারণ ঘটতো তা অনুমান করা কঠিন। নজরুল ইসলাম বলেছেন, বিশ্বের কল্যাণকর সকল সৃষ্টির পঞ্চাশ শতাংশ কৃতিত্ব নারীদের প্রাপ্য। নেপোলিয়ান বলেছিলেন, তাঁকে আদর্শ জননী উপহার দিলে তিনি একটি আদর্শ জাতি উপহার দেবেন। এবং এই কথা তো প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে যে, 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। সবই সত্য; এবং অসঙ্গত নয় যে, এই সকল কথায় নারীর আত্মশ্লাঘা বৃদ্ধি পাবে এবং নিজেকে সে দেখতে চাইবে নির্বিকল্প দেবীর মহিমান্বিত আসনে। কিন্তু নারীদের সদয় জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করা আবশ্যক, নজরুল যা বলেছেন তার দ্বিতীয় অর্থ ঃ পৃথিবীময় সকল অকল্যাণের অর্ধাংশও নারীরই কৃতিত্বপ্রসূত। এবং বুঝতে কষ্ট হয় না, অসংখ্য অযোগ্য জননীর গুরুভারে ভারাক্রান্ত হয়েই নেপোলিয়ন ব্যক্ত করেছিলেন এই খেদোক্তি যে, উপযুক্ত সন্তান উপহার দেবার মতো মায়ের বড় অভাব। আর রমণীর গুণেই যদি সংসার সুখময় হয়ে ওঠে তাহলে গৃহে গৃহে জ্বলন্ত কি ধূমায়িত নরকাগ্নিরও প্রকৃত কারণ এই মহিমান্বিত দেবীরই সার্বক্ষণিক লীলা।

বলা বাহুল্য হবে না, নারীও এমনকি নারীর প্রতি প্রসন্ন নয়। এবং এক্ষেত্রে তার বিদ্বেষভাব এতো প্রকট যে, প্রায় রাণী-মৌমাছির মতোই একটি মৌচাকে একক ও নিরঙ্কুশ আধিপত্যই তার কাম্য। এই কারণেই শাশুড়ি-পুত্রবধূর দ্বন্দ্ব একটি সর্বজাগতিক সমস্যা; শিক্ষা, রুচি, আভিজাত্য কোনো কিছুতেই এই পারস্পরিক হননেচ্ছা প্রশমিত হয় না। স্মরণ করতে পারি, ইন্দিরা গান্ধীর মতো বিশ্ববিখ্যাত মহিলাও তাঁর পুত্রবধূর প্রতি সঙ্গত আচরণ ও সুবিচার দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং মানেকাও, যিনি ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবার যোগ্যতা রাখেন, শাশুড়ির প্রতি শরবর্ষণে অক্লান্ত। অতএব অন্যসব সাধারণ গৃহ যে এক-একটি কী ভয়াল রণক্ষেত্র, তা কোনো গৃহবাসী বঙ্গীয় পুরুষের অজানা নয়, যিনি নিরপেক্ষ থাকতে গিয়ে সততই উভয় শিবিরের নির্দয় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। নারী যদি এই একটি ক্ষেত্রেও কিছুটা অন্তত সদ্বিবেচনার পরিচয় দিতো, বহু ক্ষত-বিক্ষত জীবন্মৃত পুরুষের রক্তক্ষরণ ও যন্ত্রণার উপশম ঘটতো। অবশ্য কখনো কখনো শাশুড়ি-পুত্রবধূর মধ্যে সখ্যভাবও বিরাজ করে, কিন্তু তা দেখে আশ্বস্ত হওয়া মূঢ়তা; সেই সখ্য আসলে, নবোদ্যমে পরবর্তী যুদ্ধ সূচনার পূর্বে প্রয়োজনীয় বিশ্রামগ্রহণ ও শক্তি সঞ্চয়। শুধু শাশুড়ি-পুত্রবধূ নয়, নারীর কলহপ্রবণ ঈর্ষাকাতরতা পর-আপন, চেনা-অচেনা, দূর ও নিকট সর্বত্রই সমানভাবে ব্যাপ্ত। এবং এই একটি ক্ষেত্রে নারী জগজ্জয়ী প্রতিভার অধিকারিণী, ঈর্ষায়

www.pathagar.com

তাকে পরাভূত করতে পারে এমন কোনো প্রাণী ঈশ্বর সৃষ্টিই করেননি। টোকিও শহরের সাতো নাম্নী এক মহিলা শুধু ঈর্ষাবশত তার প্রতিবেশিনীকে আট বছরে দেড় লক্ষাধিক বার টেলিফোন করেছে। করেছে এই জন্য যে তার এই সুখী প্রতিবেশিনী যেন টেলিফোনের অত্যাচারেই শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে যায়। ভাবাই যায় না, এমনকি বিশ্বত্রাস কার্লোসও এই সাতো'র কাছে একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু। নারীদের অভিযোগ, তারা নির্যাতিত হচ্ছে এবং এই নারী নির্যাতনের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অভিযোগ অত্যন্ত দুর্বল, কারণ এমন নারী নিগ্রহের ঘটনা একেবারেই কম যার জন্যে এককভাবে কোনো পুরুষ দায়ী। প্রকৃত চিত্র হলো, নব্বই শতাংশ নারী-নির্যাতনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কোনো না কোনো নারী জড়িত। শাশুড়ি, পুত্রবধূ, ননদ কি গোপন প্রেমিকা– এরাই প্রতিপক্ষ; এবং নারী-নির্যাতন আসলে নারীদেরই পারস্পরিক যুদ্ধচিত্র।

পাঠক জানেন, হৃদরোগ একটা মহাবিপজ্জনক মৃত্যু সংকেত। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, স্ত্রী জাতির মধ্যে এই রোগের আক্রমণ একেবারেই কম এবং আরো কম বিপত্নীক পুরুষদের ক্ষেত্রে। জরিপে ধরা পড়বে, সস্ত্রীক পুরুষেরাই এই রোগের প্রিয়তম শিকার। শুধু রক্তচাপ কি হৃদরোগ নয়, মনঃসমীক্ষকরা জানেন, স্ত্রী-সঙ্গ পুরুষের অন্তর্জগতে সৃষ্টি করে এমন দাহ যে, পুরুষ পরিণত হয় কখনো প্রায় নপুংসক ও ভোঁতা ও গৃহপালিত থলথলে পাতিহাঁসে, কখনো স্বপ্নহীন ও বালুকাকীর্ণ সততক্রুদ্ধ এক শুষ্ক বিশীর্ণ মরুভূমিতে। এবং আমাদের এই নাতিশীতোষ্ণ উপমহাদেশে কোনো পুরুষই যে কাব্যে কি বিজ্ঞানে কি অন্য কোনো ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতার উপযুক্ত পরিচয় দিতে পারছে না তার অন্যতম প্রধান হেতু সার্বক্ষণিক স্ত্রী-সঙ্গ। এই সঙ্গ এতোটাই স্নায়ু বিধ্বংসী ও উৎপীড়ক যে, পুরুষের জীবনীশক্তি ও কর্মস্পৃহা বিশেষ অবশিষ্টই থাকে না। রবীন্দ্রনাথের অমানুষিক শক্তি ও প্রতিভার কথা স্বতন্ত্র, সেই তিনিও যে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হতে পেরেছিলেন তার একটি বড় কারণ, তার স্ত্রী তাকে অধিককাল বিব্রত করেন নি; রবীন্দ্রনাথের শেষ চল্লিশটি বছর ছিলো স্ত্রীমুক্ত নির্ভার ও ক্লেশহীন। মৃনালিনী যদি দীর্ঘায়ু পেতেন, রবীন্দ্রনাথের আকাশচুম্বি প্রতিভারও কতদূর কী হতো বলা কঠিন। অথচ ইউরোপ-আমেরিকাতে সৃষ্টিশীল প্রতিভার কী বিপুল সমারোহ! ভাবতে ঈর্ষা হয়, শুরু থেকে অদ্যাবধি প্রদত্ত পাঁচ শতাধিক নোবেল পুরস্কারের মধ্যে পনর-বিশটা বাদে সবগুলোই জমা হয়েছে ইউরোপ-আমেরিকার তহবিলে। এটা সম্ভব হলো এই জন্য যে, ওখানে পুরুষেরা নারীর কাছ থেকে শান্তি ও আনন্দ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করে না, করতেও হয় না; অন্তর্জগতে অন্তত নারীর কারণে কোনো ক্ষোভ কি বিবমিষা জমতেই পারে না, উৎপাতের লক্ষণ দেখা দেয়া মাত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পশ্চিমা দেশগুলোতে নারী যে স্বাধীন ও স্বনির্ভর জীবনযাপনের সুযোগ লাভ করেছে তা এই হেতু যে, কোনো পুরুষকে যাতে আমৃত্যু ত্রিপদী দৌড়ে সময় ও শ্রম ও মেজাজ নষ্ট করতে না হয়। এই নারী-স্বাধীনতা নারীকে কী দিয়েছে তা তর্কসাপেক্ষ, কিন্তু পুরুষ যে সত্যিই দুর্বহ গ্লানির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে খুবই লাভবান হয়েছে, এটা অনস্বীকার্য। মীর্জা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব তখন সদ্যপরিণীত তেরো বছরের কিশোর, কিন্তু আসন্ন দুঃসময়ের কথা অনুধাবন করে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ামাত্র এই মেধাবী কবি কিশোর দুঃখিত ও ভয়ার্ত কণ্ঠে না বলে পারলেন না, 'সাতই রজব, ১২২৫ তারিখে আমার যাবজ্জীবন কারাবাসের বিধান হলো'। বস্তুতই স্ত্রী যে বহু যন্ত্রণার আধার এক নির্মম কারাগার, ১৯৯২-এ তেলআবিবের একটি আদালতেও তার প্রমাণ মেলে। উক্ত আদালতের সুবিজ্ঞ বিচারক জনৈক আসামীকে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, সপ্তাহে অন্তত একবার তাকে স্ত্রীর সঙ্গে নাচতে হবে। লোকটি উচ্চ আদালতে আপীল করেছিল কিনা জানা নেই, সম্ভবত করেছিল, কারণ, অপরাধ যত গুরুতরই হোক, এমন নির্মম গুরুদন্ড সত্যিই পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

এই নিবন্ধটি ১৯৯৭ সালে রম্য রচনা হিসাবে 'পালাবদল' পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট—৬

ফ্রয়েডীয় যৌনবাদ ও পাশ্চাত্য সমাজ

এ. জেড. এম. শামছুল আলম

ডারউইন সাহেব অপেক্ষা ফ্রয়েড সাহেবের থিওরী প্রাচ্যে নৈতিকতার দিক থেকে আরও মারাত্মক। তার মতে যৌন ক্ষুধাই হলো মানুষের সকল ধ্যান ধারণা, কাজ ও লক্ষ্যের প্রেরণা।

বাবা মেয়েকে বেশি ভালোবাসে। ফ্রয়েড সাহেব এতে আবিষ্কার করলেন পিতার যৌন ক্ষুধা। মা ছেলের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। এখানেও ফ্রয়েড সাহেব আবিষ্কার করলেন স্নেহময়ী মায়ের যৌন তৃষ্ণা। তার পর্যবেক্ষণ শক্তি অতি প্রখর।

ফ্রয়েড সাহেব লক্ষ্য করলেন যে শিশু-সন্তান মায়ের এক স্তন যখন চুষে, তখন আর একটি স্তন ধরে রাখে। মায়ের স্তন ধরে রাখা ফ্রয়েডের মতে শিশুর যৌন ক্ষুধা।

মেয়েরা পুরুষের চেয়ে বেশি ধর্মপ্রবণ। এর কারণ ফ্রয়েড সাহেব খুঁজে পেলেন।

গীর্জায় উঁচু চূড়াসমূহ নাকি পুরুষাঙ্গের প্রতীক। বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন ক্ষ্যাপাটে দার্শনিকের ভীমরতি আর কাকে বলে!

রঙিন চশমা দিয়ে দেখলে সবকিছুই কাচের রং ধারণ করে। ফ্রয়েড সাহেব লক্ষ্য করলেন না যে শিশুপুত্র মায়ের একটি স্তন চোষার সময় আর একটি স্তনই শুধু ধরে রাখে না বরং বিস্কুট আপেল একটি এক হাতে পেলেও আর এক হাতে অন্যটি ধরে রাখতে চায়। মায়ের অন্য স্তন ধরে রাখা একই প্রবণতারই প্রতিফলন। সে একটি স্তন শেষ করে আর একটি স্তনের দুধ খেতে চায়। ফ্রয়েড সাহেবের যুক্তি বিশ্বাসকারীরা হয়তো বলবেন যে, আপেল আর বিস্কুটের প্রতিও রয়েছে শিশুদের যৌনক্ষুধা।

বাবা মেয়েকে এবং মা ছেলেকে খানিকটা বেশি আহ্লাদ করে। কারণ তাদের কর্মক্ষেত্র, সেবাপরায়তা পরস্পরের পরিপূরক। নারী শারীরিক থেকে পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল। আর্থিকভাবে নারী পুরুষের উপর নির্ভরশীল। মেয়ে বিয়ে হলে স্বামীর বাড়ি চলে যায়। মাকে বিভিন্ন কারণে এবং ছেলের উপর নির্ভরশীল হতে হয়। তাছাড়া মেয়েকে সার্বিকভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব মায়েরই। কন্যার মা শুধু মা নন, তিনি প্রশিক্ষকও।

প্রকৃতিগতভাবে ছেলেরা মেয়েদের থেকে বেশি বহির্মুখী। কর্মক্লান্ত শরীরে ঘরে ফিরে এলে পিতার সেবার জন্যে পুত্র দৌড়ে আসে না। মেয়েই এগিয়ে আসে। ছেলেতো তখন ফুটবল নিয়ে দৌড়াচ্ছেন, টেনিসের কর্ক বা বল পিটাচ্ছে বা বন্ধু-বান্ধবসহ আড্ডা দিচ্ছে।

তাছাড়া বাবার ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক ঐতিহ্য সুনাম পুত্রকেই রক্ষা করতে হয়। তাই সার্বিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে পিতাকেই পুত্রের প্রতি অধিকতর কঠোর হতে হয়। এখানে পিতা হয় পুত্রের প্রশিক্ষক। কড়াকড়ির ফলে পুত্র হয়ে উঠে পিতার প্রতি অপেক্ষাকৃত বিদ্রোহী এবং মায়ের প্রতি অধিকতর অনুগত। এরূপ কারণে বাবা কন্যার প্রতি এবং পুত্র মায়ের প্রতি বেশি দরদী হতে দেখা যায়।

ফ্রয়েড সাহেব মাতা পুত্র কন্যা পিতার পারস্পরিক সম্পর্ক সামাজিক নির্ভরশীলতার আলোকে না দেখে দেখলেন যৌন প্রয়োজনের আলোকে। কুচিন্তা এবং খারাবীর দিকে মানুষের মন তীরের থেকে বেশি দ্রুত গতিতে ধাবিত হয়। ফ্রয়েড সাহেব পাশ্চাত্যের নর-নারীকে যৌন যথেচ্ছারের সমাজতান্ত্রিকতা যৌক্তিকতা দিয়ে দিলেন। আর যায় কোথায়। বল্গাহারা কামকেলীতে ভেসে গেলো পাশ্চাত্যের সমাজ।

www.pathagar.com

বিবাহ বন্ধনের মধ্যে সীমিত যৌন ভোগের পরিবর্তে শুরু হলো সারমেয় সম্ভোগ। ভ্রাতা-ভগ্নি, জনক-দুহিতা, জননী-পুত্র বাছবিচার অনেক ক্ষেত্রে ঘুচে গেলো। রোম সম্রাট নিরো পিতাকে হত্যা করে মাকে বিয়ে করেছিলেন। এরূপ সমাজে ফ্রয়েডের জন্ম।

ফ্রয়েড সাহেবের তত্ত্ব বিশ্লেষণের বদৌলতে যৌন সম্পর্কীয় দ্বিধা, সংকোচ, লজ্জা শালীনতা যা ছিলো সবই ক্রমশঃ দূর হতে লাগলো। পাশ্চাত্যে পারমিসিভ সোসাইটির ভিত মজবুত হলো। যৌন মিলন পায়খানা পেশাবের মতো স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেলো।

যে যেভাবে পারে শারীরিক উন্মাদনা উপশমের পথ খুঁজে বার করতে লাগলো। পশুর মধ্যে যেটুকু পরিমিতি জ্ঞান থাকে তাও অনেকের মধ্যে থাকলো না। প্রাণী জগতে দুই জাতীয় প্রাণীর মধ্যে যৌন মৈথুন দেখা যায় না। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে পশু মৈথুন চালু হয়েছে। কুকুর জাতীয় সরমেয়ে জীবন প্রেমের আড়ালে যৌন বিকৃতি চাপা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চলছে। আজকাল পাশ্চাত্যের গীর্জায় সমকামীদের বিয়ে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

যৌন সংক্রান্ত বিষয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি চরম বর্বরতা এবং পশুত্বের নামান্তর। এই বর্বর সংস্কৃতির প্রতি আমাদের বেশ কিছু অবুঝ অর্বাচীন তরুণ ঝুঁকে পড়ছে। তার চেয়ে আরো বেশি দুঃখের বিষয় কিছু সংখ্যক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী পত্র-পত্রিকায় সভা-সমিতিতে মতামতের মাধ্যমে সনাতন ধর্মীয় মূল্যবোধকে ব্যঙ্গ এবং পাশ্চাত্যের অমানবিক পশু সংস্কৃতির স্তবস্তুতি করে যাচ্ছেন। তাদের পীড়াদায়ক মতামতে সনাতনীদের বহুজন ক্ষুব্ধ। কেউ কেউ ব্যথিত হয়ে রাগে ঘৃণায় হাত কামড়ান। কিন্তু হাত কামড়ালে হৃদয়ে ব্যথা বাড়ে বৈ কমে না।

আমাদের রাসূল (সঃ) অত্যধিক লজ্জাশীল ছিলেন। অনাবৃত শরীরে তাঁকে কোনো সাহাবী দেখেছেন বলে বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি এতো লাজুক ছিলেন যে, অট্টহাসি দূরের কথা, তাঁকে উচ্চস্বরে হাসতেও কেউ কখনও শুনেনি। আনন্দিত হলে তিনি স্মিত হাসতেন। হাসি ছিলো তার মুখের ভূষণ। স্নিগ্ধ হাসি তার মুখে লেগেই থাকতো। রাসূল (সঃ) বলেছেন, "প্রত্যেকটি হাসিই একটি ছাদাকা।" যাদের দান করার মতো বিত্ত সম্পদ নেই, তারা অন্ততঃ হাসিমুখে অন্যদের সাথে কথা বলুক, তা তিনি আশা করতেন।

লজ্জা মানুষকে বহু লজ্জাজনক কাজ থেকে হেফাজত করে। বেহায়া নির্লজ্জ লোক অনায়াসে নানাবিধ অপকর্মে লিপ্ত হতে পারে।

মুসলিম পরিবারে ছেলেমেয়েরা অতীতে বয়স্কদের সামনে থাকতো ভদ্র, লজ্জা-বিনম্র। তাদের আদব লেহাজ ছিলো নয়ন-প্রীতিকর। আজকাল আধুনিকতার সয়লাবে লাজ-লজ্জা ভেসে যাচ্ছে। শরীফ মুসলিম পরিবারে নারী পুরুষ সংক্রান্ত প্রসঙ্গের অবতারণা হলে কনিষ্ঠরা সম্মুখ থেকে উঠে চলে যেতো।

বাবা-মা দূরের কথা, বড় ভাই, বড় বোনের সম্মুখেও ছোট ভাই-বোনেরা অপর পরিবারের কারো লজ্জাজনক আচরণের আলোচনা শুনতো না। পাশ্চাত্য পশু সভ্যতার প্রভাবে মুসলিম সমাজে মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছে।

লজ্জাশীলতার কারণে অবিবাহিতা মেয়েরা যৌন বিষয়ে নিজেরা আলোচনা করা দূরের কথা, আলোচনা শুনতোও না। অনেক ক্ষেত্রেই তারা থাকতো যৌন বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বিবাহ নির্ধারিত হলে তাদেরকে দাদী, নানী যৌন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতেন এবং বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতার তালিম দিতেন।

এসব আলোচনাও হতো দিনের আলোতে নয়, দাদী-নানীর শয়নকক্ষে, অন্যেরা নিদ্রা মগ্ন হওয়ার পর। বিবাহযোগ্য মেয়েরা সাধারণতঃ দাদী-নানীর সাথেই ঘুমাতো।

উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের যৌন ক্ষুধা থাকে মধ্যবয়সীদের থেকে অনেক বেশি।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যে ৮-৯ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড প্রথা সামাজিকভাবে স্বীকৃত। ইসলাম বিষয়টির সমাধান করতে চেয়েছে বাল্য বিবাহের মাধ্যমে। শুধু বাল্য বিবাহ নয়, শিশু বিবাহ ইসলামে স্বীকৃত। ছেলে মেয়ে সাবালক হলেই তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া বাবা মার জন্যে ফরজ।

পাশ্চাত্যে শিশু বিবাহ বা বাল্য বিবাহ নিন্দিত। কিন্তু যৌন সম্ভোগের ক্ষেত্রে মানুষকে তারা শৃগাল-কুকুরের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। শূকোর-পাঠা যেরূপ বাছ-বিচার না করে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হয়, পাশ্চাত্যে আদম সন্তানও সে পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

ইসলাম শুধুমাত্র জেনাকেই নিষিদ্ধ করেনি, বরং জেনার সম্ভাবনামূলক কার্যকেও নিষিদ্ধ করেছে।

পঞ্চাশ বছর আগে বাবা-মা ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে নাচ-গান বিচিত্রানুষ্ঠান এবং যাত্রা দেখতে যেতেন না। স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে নির্দোষ নাট্যানুষ্ঠানেও নারী-পুরুষ প্রসঙ্গ থাকলে পিতা-পুত্র পাশাপাশি বসতো না। সিরাজ-উদ-দৌলা নাটকে সিরাজ এবং আলেয়ার সংলাপে নারী-পুরুষ সম্পর্কিত কিছু কথা থাকতো বলে এ নাটকটিও পিতা-পুত্র পাশাপাশি বসে দেখতে লজ্জাবোধ করতো। তাই তারা পৃথক পৃথক স্থানে বসতো।

৯-১০ বছর বয়স থেকেই মেয়েদের মধ্যে যৌনানুভূতির সৃষ্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ৯ বছর বয়স্কা বালিকার গর্ভে ১১ বছর বয়স্ক ছেলের ঔরসে জীবন্ত শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। এ বয়স থেকে শুরু করে ২৫ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক আকর্ষণ থাকে চুম্বকের মতো। চুম্বক যেমন লৌহকে টেনে নিয়ে আসে, বালিকারাও বালকদেরকে তেমনিভাবে আকর্ষণ করতে পারে।

এই আকর্ষণ প্রক্রিয়ায় বিকর্ষণের শক্তি হলো লজ্জা। লজ্জার কারণে একজন আরেকজনের কাছে এলে মনের ভাব ভাষায় বা অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে না পারলেও তা পরস্পরের নিকট লুকায়িত থাকে না।

নির্লজ্জ বালক-বালিকা শুধু অঙ্গভঙ্গি নয়, চাহনির মাধ্যমেও নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে ফেলে। নির্লজ্জতা এবং নগ্নতা পরিণতির দিক দিয়ে জময সন্তানসম। একটি থেকে আরেকটির কোনোই পার্থক্য নেই।

আধুনিকতার চাপে আজকাল মুসলিম পরিবারে ছেলেমেয়ে, বাবা-মা এক সঙ্গে টেলিভিশন দেখেন। শিল্পদ্রব্যের প্রচারের জন্য শিল্পপতিগণ নারীদেহকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। বিজ্ঞানে প্রদর্শিত নারীটি যেভাবে যে কোনো পুরুষকে যৌন তৃপ্তি দান করতে পারে, বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করা হয় যে, শিল্প দ্রব্যটিও সেরূপই তৃপ্তি দিতে পারে।

টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন দেখতে দর্শকদের নয়ন যুগল থেকে লজ্জার পর্দাটুকু ক্রমশঃ দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে। টেলিভিশনের নাটক, বিদেশী এবং দেশী বাণিজ্যিক ছবিগুলো লজ্জা দূরীকরণে কম অবদান রাখছে না।

অনুন্নত দেশসমূহে আধুনিক বিজ্ঞানের জঘন্যতম অভিশাপ হচ্ছে ভিডিও ফিল্ম। টেলিভিশন, সিনেমায় তবুও কিছুটা সেন্সরশীপ আছে। ভিডিও ফিল্মে সেন্সরশীপ নেই।

অন্ধকার শয়নকক্ষে স্বামী-স্ত্রী অথবা নারী-পুরুষ যৌন কর্মে লিপ্ত হয়। তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু যৌন দৃশ্য অবলোকন করার সুযোগ তেমন থাকে না। ভিডিও ফিল্মের মাধ্যমে নগ্ন যৌনকর্মের বাস্তব ছবি দেখানো হয়। শুধু নারী-পুরুষ নয়, মানুষ এবং পশু বিশেষ করে সারমেয় কুকুরের সঙ্গে মানুষের যৌনকর্মের দৃশ্য বিশেষভাবে প্রদর্শিত হয়।

পশুর উলঙ্গ যৌন দৃশ্য মানুষ দেখে। কিন্তু তা দেখে মানুষের মধ্যে কোনো যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না। মানুষের যৌন দৃশ্যে মানুষের যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বাস্তব যৌন দৃশ্য দেখার

www.pathagar.com

পর মানুষের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় যা, তাহলো লজ্জানুভূতির বিলুপ্তি।

যৌন ভিডিওগুলো দেখতে দেখতে মানব হৃদয়ে বিশেষ ধরনের যৌন বিকৃতি ঘটে। কোনো লোকই ৭-৮ ঘন্টার মধ্যে কয়েকবার যৌনকর্মে লিপ্ত হতে পারে না। যৌনাঙ্গের ক্ষুধা অতি সহজে মিটে যায়। কিন্তু যৌন দৃশ্য দর্শন করে নয়নে যে যৌন ক্ষুধার সৃষ্টি হয়, তার কোনো তৃপ্তি হয় না। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে যৌন দৃশ্য বার বার দেখতে ইচ্ছে হয়।

যে বিচিত্রানুষ্ঠানে সুন্দরী মেয়েদের বা গায়িকার অংশগ্রহণের সম্ভাবনা থাকে, ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে ছেলেরা ভিড় করে। এর উদ্দেশ্য তাদের যৌন অঙ্গের তৃপ্তি নয়। উদ্দেশ্য হলো নয়নের যৌন ক্ষুধার তৃপ্তি।

নয়নের যৌন ক্ষুধা যৌন অঙ্গের ক্ষুধার থেকেও অনেক দিক দিয়ে ভয়ঙ্কর। যৌন অঙ্গের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য একটি দু'টি নারী হয়তো যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু শত শত সুন্দরী মেয়ে দেখেও নয়নের যৌন ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। আরো দেখতে ইচ্ছে করে।

নয়নের যৌন ক্ষুধা তৃপ্তির জন্যে আধুনিক সংস্কৃতিকে বিজ্ঞজনের সম্বর্ধনার জন্যে স্কুল কলেজের মেয়েদের সাজিয়ে পথে দাঁড় করান হয়।

নয়নের যৌন শুধু সৃষ্টি নিরোধের জন্য ইসলাম অত্যাধিক তাগিদ দিয়েছেন। স্ত্রী যৌনাঙ্গের দিকে না তাকাতে আমাদের রাসূল (সঃ) অত্যন্ত কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু স্ত্রীর যৌনাঙ্গ নয়, নিজের যৌনাঙ্গের দিকে তাকাতেও তিনি নিষেধ করেছেন। হযরত উসমান (রাঃ) বলেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কখনও ডান হাত দিয়ে তার যৌনাঙ্গ স্পর্শ করেননি।

নয়নের যৌন ক্ষুধা সৃষ্টি প্রতিরোধের জন্য না-মহরম নারী-পুরুষের পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কথা বলাও নিষেধ রয়েছে। প্রথম দৃষ্টিতে কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকানো নিষেধ করা হয়েছে।

নারী-পুরুষের কথাবার্তা নিষেধ করা হয়নি। কিন্তু চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে নিষেধ আছে। এই নিষেধাজ্ঞার বড় কারণ হলো স্বলজ্জতা সংরক্ষণ।

পাশ্চাত্যে পিতা-পুত্র, মা-বাবা এক সঙ্গে যৌন ভিডিও এবং যৌন বিষয়ে আলোচনা করেন। বর্বর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে তথাকথিত আধুনিকতা এবং লজ্জাশীলতা বিলোপের মাশুল পাশ্চাত্যের মানুষকে দিতে হচ্ছে।

লজ্জার আবরণ বিদূরিত হলে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, পিতা-কন্যার যৌন সম্পর্কের হার শতকরা ১৮%।

মানুষ এবং কুকুরের মধ্যে যে সমাজে যৌন সম্পর্ক হতে পারে সে সমাজে পিতা-পুত্রীর যৌন সম্পর্ক ততো দূষণীয় মনে করা হয় না। বরং বিষয়টি মেয়েদের নিকটই অধিকতর উপাদেয়। কারণ পিতা স্বীয় কন্যাকে যৌন তৃপ্তি দানে অধিকতর সহানুভূতিশীল। ছেলেদের মতো নিজের মেয়ে যে অর্থ রোজগার করে, পিতার থেকে প্রাপ্ত সম্মানী তার কয়েক গুণ বেশি হয়। পিতাও মনে করে অর্থ তো নিজের পরিবারেই থেকে গেলো।

আমাদের সমাজে মা-বাবা কঠোর পরিশ্রম করে সম্পদ অর্জন করে। আর এ সম্পদ মৃত্যুর সময় সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে ছেলেমেয়ের জন্য রেখে যায়। পাশ্চাত্যে পিতা-মাতার সম্পদের শতকরা দশ ভাগের বেশি সন্তানদেরকে দেয়া হয় না। বাকিটুকু দেয়া হয় স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, চার্চ, বিদেশের ত্রাণ সাহায্য ইত্যাদিতে।

ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার অবস্থাতেই নিজেরা অর্থ রোজগার শুরু করে। অনেকেই অর্থ রোজগার করে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে। প্রাচ্যের এবং মুসলিম সমাজের ন্যায় কম ছেলেমেয়েই

www.pathagar.com

পিতামাতা থেকে লেখাপড়ার সমস্ত খরচ প্রাপ্ত হয়।

মেয়েরা দেহ দান করে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করে। স্ত্রীরা অন্যকে দেহ দান করে সংসারের আয় বৃদ্ধি করে। এটা আজকাল আর তেমন দূষণীয় নয়। কুমারীরাও বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচারে বেশ অর্থ ব্যয় করে। স্ত্রীরাও যদি অন্যকে দেহ দান করে বেশ কিছু অর্থ সংসারে আনতে পারে, তাহলে পারিবারিক আয়-ব্যয়ের সমন্বয় হয়ে যায়।

পাশ্চাত্য সমাজে শুধুমাত্র যে পিতা-পুত্রীর মধ্যেই যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয় না নয়। মাতা-পুত্রের মধ্যেও এ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তবে অপেক্ষাকৃত কম। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে তা ৪%। আমাদের দেশে অতি সাধারণ গালি হলো– 'হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা'।

পাশ্চাত্য সমাজে অনুরূপ সাধারণ গালি হলে– 'সান অফ এ বীচ (কুত্তীর বাচ্চা)' এবং মাদার ফাকার (মাতৃ যৌন সম্ভোগী)'। শেষোক্ত গালিটি এতো কমন যে নারীরা পর্যন্ত পুরুষকে হাসি ঠাট্টার ছলে এ গালি দিয়ে থাকে। যেমনভাবে আমাদের দেশেও অনেক সময় দেখা যায় আদর করে কেউ কেউ আদরের জনকে বলে 'এই হারামজাদা' এই দিকে আয়।

হারামজাদা শব্দটি গালি হিসেবে ব্যবহার হলেও এটা এখনও গালি পর্যায়েই আছে। বাস্তবে বিরল। পাশ্চাত্যে মাতৃ সম্ভোগী বিল নয় বরং ব্যাপক। তবে কন্যা সম্ভোগীর থেকে অপেক্ষাকৃত কম। লজ্জা বিলুপ্তির পাশ্চাত্য সমাজ যে কতো অভিশপ্ত তা আলোচনা করাও এদেশের অতি আধুনিক পরিবারেও শুধু কুরুচিকর নয়, অসম্ভবও বটে। প্রবন্ধ লেখকরাও স্বীয় নামে এ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে লজ্জা বোধ করেন।

আমরা যদি এখন থেকে সাবধান না হই, আমাদেরকেও এ পরিণতি ভোগ করতে হবে। পশুত্বের দিকে এক পা এক পা চলা শুরু হলে এমন একটা পর্যায় এসে যায়, তখন নভোযানের গতিতে চলা শুরু হয়।

আমাদের দেশে সিনেমা দেখার জন্য আগে সিনেমা হলে যেতে হতো। অনেকেই মাসে একবার দু'বার সিনেমা দেখতে সিনেমা হলে যেতো। ভিডিও ফিল্ম চালু হবার পর শহরের সিনেমাগুলো মার খাচ্ছে। এখন পারিবারিক ড্রইং রুমটি বা টেলিভিশন কক্ষটিই সিনেমা হলে পরিণত হয়েছে। পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্ভোগ এতো বেশি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, এখন আর যৌন প্রয়োজনের জন্য বাইরে না গিয়ে গৃহেই প্রয়োজন মেটাতে চায়।

পাশ্চাত্যের বহু দেশে গীর্জাতে সমকামীদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। আল-কুরআনে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আহছানে তাকবীম' এবং 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সুন্দরতম অবয়বে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে। কিন্তু এই মানুষ পরিবেশগত এবং অন্যান্য কারণে 'আসফালুস সাফেলীন' বা সর্বনিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত হয়। আধুনিক সভ্যতার পাদপীঠে অনুষ্ঠিত একটি ঘটনার বিচারের উদাহরণ দিলেই মনুষ্যত্বের অবনতি পাশ্চাত্যে কতটুকু হয়েছে তা কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে।

চার বছরের একটি শিশু পুত্রকে ফেলে রেখে মা চলে গেছে তার নাগরের হাত ধরে। শিশুটি বাবার কাছেই থাকে। আমাদের দেশে শিশুদেরকে নানী, দাদী, মা বাবা যত আদর যত্নে কোলে কাঁখে রেখে মানুষ করেন, পাশ্চাত্য শিশুর সে সৌভাগ্য হয় না। আদর কম পায় বলে তারা অবশ্য শিশুকাল থেকেই অধিকতর পরিশ্রমী এবং স্বনির্ভর হয়ে উঠে।

পাশ্চাত্যে শিশুকে কোলে নেয়ার অর্থ হলো গায়ের সাথে মিশানো বা বুকে নেয়া নয়। তথায় কোলে নেয়া বলতে দু'হাতের বাজুর উপর তুলে একটু নাড়ান বুঝায়। রাতের বেলা শিশুকে বাবা মা সাথে রাখে না। শিশু ঘুমায় আলাদা বিছানায় এবং আলাদা কক্ষে। বাপ মায়ের বুকের সঙ্গে লেগে বা বুকের উপর শুয়ে ঘুমাবার আনন্দ এবং অনুমতি পাশ্চাত্যে শিশুরা পায় না।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট–৭

ইরানের সংবিধানে পরিবার ও নারীর অধিকার

এনায়েত উল্লাহ্ ইয়াযদানী

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে পরিবার ও নারীকে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে। কোনো কোনো ধারায় পরিবার ও নারী সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে (যমন ১০ ও ১২ ধারা)। আর কিছু কিছু ধারায় নারী-পুরুষ অথবা সাধারণ মানুষ ও জনগণকে শামিল করা হয়েছে।

সংবিধানে পরিবার প্রসঙ্গ

পরিবার হচ্ছে একটি সামাজিক ইউনিট বা একক। অবশ্য তার বিস্তৃত দিক বিভাগ রয়েছে, যেমন পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আইনগত ও মনস্তাত্ত্বিক। পরিবার গঠিত হয় দাম্পত্য জীবনের ওপর ভর করে। এতে পরস্পরের মাঝে রক্ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, ভাই-বোন প্রমুখের পারস্পরিক সম্পর্কে একটি অভিন্ন বন্ধন ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমন্ডলেই পরিবারের বসবাস।

পরিবার সংগঠন হচ্ছে একটি সামাজিক প্রয়োজন। মনস্তাত্ত্বিক, সদ্ভাবগত প্রবণতা, শৃঙ্খলা বিন্যাস, অর্থনীতি, চরিত্র, আবেগ, অনুভূতি ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনের নিরিখে পরিবার এমন এক সংগঠন যা সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ও বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যদি এ সংগঠনের প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়া না হয় এবং কোনো কারণে এর পতন ঘটে, তাহলে পুরো সমাজও ধ্বংস ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এ জন্যই পরিবারের সংরক্ষণ ও শক্তিশালীকরণ এবং এর মূল্যমান ও শক্তি সম্পর্কে ইসলাম অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে। কুরআন মজীদে বিষয়টির প্রতি একাধিক জায়গায় ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন (সূরায়ে রূম, আয়াত ২১)

অনেক সামাজিক মতাদর্শও পরিবারকে সমাজ জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ও সমাজের উন্নতি-অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করে। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে যেমন তেমনি অন্যান্য সমাজ-দর্শনের আলোকেও সকল সামাজিক সংস্থা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবার এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। সবাই পরিবারের ভাগ্য নির্ধারণী গুরুত্বের কথা স্বীকার করেন।

অতএব, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সরকার ব্যবস্থা যেহেতু সংবিধানের দ্বিতীয় ধারা অনুযায়ী এমন একটি সরকার ব্যবস্থা যার মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তার সম্মুখে আত্মসমর্পণ, আল্লাহর ওহী ও আইন-কানুনের ক্ষেত্রে ওহীর বুনিয়াদী ভূমিকা, কাজেই সমাজ জীবনের মৌল স্তম্ভ হিসাবে পরিবারের প্রতি ইসলামের গভীর দৃষ্টি ও মনোযোগ রয়েছে, এ সমাজ ব্যবস্থার সনদ হিসাবে যে সংবিধান বিদ্যমান তাতেও পরিবারকে অতিশয় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যেমন সংবিধানের ভূমিকায় পরিবারকে সমাজের বুনিয়াদী স্তম্ভ ও উন্নতি-অগ্রগতির আসল ঘাঁটি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে আদর্শের ও মনের মিল হচ্ছে মানব জীবনের উন্নতি-অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রস্তুতকারী মৌলিক উপাদান। কাজেই এ পরিবার গঠনের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করা ইসলামী হুকুমতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

সংবিধানের ১০ম ধারায় এ বিষয়টির ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাতে পরিবারকে ইসলামী সমাজের বুনিয়াদী ইউনিট বা একক বলে উল্লেখ করে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে দায়িত্ব বর্তানো হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী বলে যৌন প্রয়োজন ছাড়া পাশ্চাত্যে এক বিছানায় দু'জন শোয় না। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত চার বছরের শিশুটি বাবার কাছ থেকেই মাতৃস্নেহের ক্ষুধা মিটাতে চাইতো। কাজে যাওয়ার সময় বাবা ঘরে বেবী সীটার বা আয়া রেখে যেতো। অফিস হতে ফিরে এলে বেবী সীটার বিদায় হয়ে যেতো। বিকেল বেলা বাবা বাইরে যাওয়ার সময় শিশুটি তার সঙ্গে যাওয়ার আবদার ধরতো। ফেলে গেলে কান্নাকাটি করতো। ফলে বাবাকে অবসর সময় ঘরে ভিডিও ফিল্ম দেখেই কাটাতে হতো। এমনকি নির্লজ্জ যৌন ভিডিও ছবিও।

শিশুটি বাবার সঙ্গে যৌন ভিডিও ছবি দেখে বাবাকে জিজ্ঞেস করতো তারা কি করে। বাবা বলতো যৌন সঙ্গম। শিশু শুনে বলতো সেও যৌন সঙ্গম করবে। বয়স্করা যা করে শিশু না বুঝেই তা করতে চায়। এ শিশুটি যৌন সঙ্গম কি না বুঝেই বলতো সে যৌন সঙ্গম করবে।

তিন চার বছরের শিশুকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, সে বিষ খাবে কিনা, সে না বুঝেই বলবে- 'খাবো'। খুন করবে কিনা জিজ্ঞাসা করলেও বলবে 'করবো'। খুন হবে কিনা জিজ্ঞেস করলেও 'হ্যাঁ' সূচক জবাবই দেবে।

কিছুদিনের মধ্যেই পিতাও চার বছরের শিশুর সঙ্গে যৌন কর্ম শুরু করে। শিশুর মধ্যে তখনও কোনো যৌনানুভূতির সৃষ্টি হয়নি। সে পিতার সঙ্গে যৌন কর্মকে একটি খেলা হিসেবে প্রথমে ধরে নেয়। কিন্তু পিতা চাইতো সত্যিকার যৌন তৃপ্তি। যা ছিলো চার বছরের শিশুর নিকট অবোধ্য এবং বিরক্তিকর। শেষ পর্যন্ত ঘুমন্ত শিশুর সাথেই সমকামে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। জেগে উঠলে জোর করেও। এমনকি শিশুর ব্যাথাজনিত কান্না সত্ত্বেও।

বাবা, মা-এর অত্যাচার হতে শিশুদের আত্মরক্ষার জন্য পাশ্চাত্যে দুই তিন সংখ্যার টেলিফোন নাম্বারে টেলিফোন করে অভিযোগ করার পদ্ধতি টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। এই শিশুও একদিন টেলিফোন করে পুলিশের নিকট পিতার বিরুদ্ধে নালিশ করে। পুলিশ তদন্ত করে পিতার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে।

বিচারে চার বছর বয়স্ক শিশু পুত্রের সঙ্গে জোরপূর্বক সমকামের অপরাধে পিতার চল্লিশ বছর কারাদন্ড হয়।

শিশুটি চল্লিশ বছর এবং কারাদন্ড কি তা বুঝতে পারেনি। কারাদন্ড বুঝাতে মাননীয় আদালত শিশুকে বুঝিয়েছেন তার পিতাকে কুকুর-বিড়ালের বা পাখিকে যেভাবে খাঁচায় রাখা হয় সেভাবে রাখা হবে। বাবাকে খাঁচায় ঢুকানো হবে শুনে শিশুটি হেসে উঠলো।

মাননীয় আদালত শিশুটিকে ৪০ বছর কতো দীর্ঘ সময় তা বুঝাতে চাইলেন। কিন্তু শিশুটি তা কিছুতেই বুঝতে পারছিলো না। যদিও সে জানে তার বয়স ৪ বছর। আদালতে উপস্থিত একজন আইন কৌসুলী ৪০ বছর বুঝাবার কৌশল আবিষ্কার করলেন। তিনি বললেন যে, তার বাবাকে ততোদিন খাঁচার মধ্যে আটকিয়ে রাখা হবে যতদিন না ছেলেটি তার বাবার মতো বড় হয়ে যায়। এবার শিশুটি বুঝলো ৪০ বছরের দৈর্ঘ্য। তখন শিশুটি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলো এই বলে যে, 'তাহলে তো খুব ভালো হবে। ড্যাডি যদি আমাকে ব্যথা দিতে চেষ্টা করে আমি তখন তাকে ঘুষি দিতে পারবো। ও আমাকে জোর করে ব্যাথা দিতে পারবে না।'

এই হলো আমাদের বর্তমানকালের আদর্শ, বর্বর পাশ্চাত্য পশু সভ্যতার স্বরূপ।

মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করে পশুত্বে অবতরণের বহু কারণে মধ্যে যৌন ক্ষেত্রে অন্যতম প্রদান কারণ হলো পারস্পারিক সংকোচ, শ্রদ্ধাবোধ, এবং লজ্জাশীলতার বিলুপ্তি। এই লজ্জাশীলতার বিলুপ্তির বহুবিধ কারণ এবং উপায়ের মধ্যে অন্যতম হলো পরিবারের সকল সদস্য মিলে এক সঙ্গে বসে নারী-পুরুষের পারস্পরিক যৌনাভূতি সূচক ছবি, বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, টেলিভিশনে সিনেমা, নাটক এবং ভিডিও ফিল্ম দর্শন। (তথ্য সূত্র ঃ সাপ্তাহিক গণভাষ্য, ৫/৭/৯৬)

www.pathagar.com

১. পবিরার গঠন সহজতর করা

২. পরিবারের পবিত্রতার হেফাজত করা

৩. আইন ও ইসলামী চরিত্রের আলোকে পারিবারিক সম্পর্কের বিন্যাস।

প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে সরকারের ওপর দায়িত্ব হলো পরিবার গঠন প্রক্রিয়া সহজতর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন-বিধি ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে এ পর্যন্ত মজলিসে শূরায়ে ইসলামীসহ বিভিন্ন বিপ্লবী ও সামাজিক সংগঠন, যেমন ব্যাংক ও গণসংস্থার পক্ষ হতে বেশ কিছু বস্তুগত ও নৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

তবে সমাজে বিয়ে ও পরিবার গঠনের গতিধারা সম্পর্কিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, দৃশ্যত গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ও প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাসমূহ পরিবার গঠন প্রক্রিয়া পুরোপুরি সার্বজনীন করতে সক্ষম হয়নি। কারণ একদিকে সুযোগ-সুবিধা প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশী, অন্যদিকে মানগত দিক থেকে কেবল বস্তুগত প্রয়োজন মেটানোই দাম্পত্য প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং এর সাথে নানা মানসিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও আবেগ-অনুভূতি সংক্রান্ত বিষয় জড়িত। তাতে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক সংস্থা হতে গ্রহীত পদক্ষেপসমূহ যথেষ্ট নয়। কাজেই এক্ষেত্রে আরো কিছু বাস্তবমুখী পদক্ষেপের প্রয়োজন, বিশেষত সমাজে বিবাহ বন্ধন সম্পর্কিত সংস্কৃতি যেখানে অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত। যেমন বিরাট অঙ্কের মোহরানা, বিয়ে অনুষ্ঠানের বিরাট পরিমাণের ক্ষয়-খরচা, ঘরের আসবাবপত্র খরিদের বিরাট খরচ। এসব ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক পরিবর্তন আসা প্রয়োজন। তার জন্য সমাজের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের যাঁরা অভিভাবক তাঁদেরকে অবশ্যই বিয়ে-শাদী সংক্রান্ত সমাজে বিদ্যমান চিন্তা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

পরিবারের পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে বলতে হয় যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা ও এর নেতৃত্বের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ কাঠামোর বুনিয়াদী ভিত পরিবারের মর্যাদা ও পবিত্রতার পুনরুজ্জীবন। এটি মূলত ইসলামের শিক্ষারই ফলশ্রুতি। কেননা ইসলাম সর্বদা পরিবারের পবিত্রতা রক্ষার বিষয়ে যত্নশীল রয়েছে। এজন্য ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে সংবিধানের ২১তম ধারায় পরিবারের কাঠামো ও স্থায়ীত্ব রক্ষায় উপযুক্ত আদালত গঠনের জন্য সরকারের ওপর ন্যস্ত করেছে। সামগ্রিকভাবে সংবিধান, ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থা ও এর নেতৃত্বের সর্বাত্মক মনোযোগ হচ্ছে পরিবারের প্রতি গুরুত্বারোপ ও তার মর্যাদার হেফাজত করা।

ইসলামী আইন ও চরিত্রের আলোকে পারিবারিক সম্পর্ক বিন্যাস সম্পর্কে বলতে হয় যে, যে কোনো সমাজই যদি তা অসুস্থ পরিবার নিয়ে গঠিত হয়, তাহলে সে সুস্থ সমাজ বলে দাবী করতে পারবে না। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধান পরিবার ও পারিবারিক জীবনকে সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে সরকারের ওপর দু'টি বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। একটি হলো ইসলামী আইনের ভিত্তিতে পরিবার গঠন, দ্বিতীয়টি হলো ইসলামী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহের উৎকর্ষ সাধন করা। পারিবারিক আইন বলতে বোঝায়, ইসলামের পক্ষ হতে আরোপিত বিভিন্ন দায়িত্ব কর্তব্য, যা পরিবারের স্থিতি ও স্থায়ীত্বের জন্য ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। এসব আইন অতিশয় উন্নত ও প্রগতিশীল, কোনো মতাদর্শ বা সমাজ ব্যবস্থার সাথে যার তুলনা হতে পারে না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে এসব মৌলিক নীতিমালার কয়েকটি হচ্ছে ঃ

১. সমানাধিকার ঃ পরিবারে নারী ও পুরুষের মধ্যে অধিকারের সমতা।

২. শান্তি ঃ পরিবার হচ্ছে শান্তির নীড়, নারী ও পুরুষ এবং অপরের শান্তিরই সহযোগী।

৩. প্রেম-ভালোবাসা ঃ প্রেম ও ভালোবাসার ওপরই পরিবারের বুনিয়াদ স্থাপিত।

www.pathagar.com

৪. সহানুভূতি ঃ পরিবারের অভ্যন্তর যেন প্রেম ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকে।

৫. ভালো ব্যবহার ঃ পরিবারের সদস্যদের পরস্পরের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে।

৬. ইনসাফ ঃ পরিবারে আচার-আচরণ ইনসাফের ভিত্তিতে হতে হবে।

৭. আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতি ঃ নারী ও পুরুষের মধ্যে বিয়ে বন্ধনের যে প্রতিশ্রুতি তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি।

৮. তাকওয়া ঃ পরিবারের লোকদের আচার-ব্যবহারের মানদন্ড হবে তাকওয়া।

কুরআন মজীদ ছাড়াও শরীয়ত ও ফেকাহশাস্ত্র পরিবার সংগঠনকে মজবুত রাখার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এগুলোও ইসলামের সামগ্রিক নীতিমালা ও কল্যাণ চিন্তা থেকেই উৎসারিত। উদাহরণস্বরূপ ঃ

১. স্ত্রীর ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য পুরুষের অনুমতি।

২. স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলা।

৩. স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর ভরণপোষণ, বাসস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা।

৪. স্ত্রীর অধিকারের প্রতি স্বামীর কোনোরূপ জুলুম বা সীমা লংঘন না করা।

৫. ছেলে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা। পরিবার যেহেতু চরিত্র, সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদ সেহেতু পরিবারের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের বিষয়টি ইসলামী প্রজাতন্ত্রী সরকার ব্যবস্থা ও তার নেতৃত্বের চোখে বিরাট গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন সংবিধানের তৃতীয় ধারার প্রথম উপধারায় বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে চারিত্রিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশ সাধন এবং চারিত্রিক অনাচার রোধ করার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি হচ্ছে পরিবার। বিষয়টির গুরুত্ব তখনই পরিষ্কার হবে, যখন আমরা দেখব যে, চরিত্র-বিজ্ঞানী, মনীষী ও আলেমদের দৃষ্টিতে পরিবার এমন একটি মাহফিলের সমতুল্য যা চারিত্রিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক উৎসর্গের বিরাট কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম। এ পর্যায়ে তাঁরা পরিবারের বিভিন্ন কার্যকারিতার কথা উল্লেখ করে থাকেন। যেমন ঃ

ক. পারিবারিক পরিমন্ডলে মানুষ গড়ার পাঠশালা

নীতিগতভাবেই ইসলাম ঘরের উষ্ণ পরিবেশ ও পরিমন্ডলকে মানুষ গড়া ও চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের সর্বোত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে। কাজেই পারিবারিক পরিমন্ডল পরিবারের লোকদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অগ্রগতির কেন্দ্রভূমি হওয়া চাই। আত্মগঠন, অন্যকে গঠন ও নফসের সংশোধনের জন্য পরিবারের কার্যকর ভূমিকা থাকা চাই।

খ. পারিবারিক পরিমন্ডল আল্লাহর রহম অবতরণের কেন্দ্র

কুরআন মজীদ পরিবারকে এমন এক পরিবেশরূপে চিত্রিত করেছে, যার আগাগোড়া দয়া, মায়া ও প্রেম-প্রীতিতে ভরা। কাজেই পরিবারকে হতে হবে শান্তির নীড়, অনাচার দূর করার কেন্দ্র। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা রোধের নিবাস এবং আল্লাহর রহমত নাযিল হবার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

গ. পরিবার হবে ত্যাগ ও স্বার্থ বিসর্জন দেয়ার আঙ্গিনা।

নৈতিক চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ত্যাগ ও স্বার্থ বিসর্জন।

www.pathagar.com

পরিবারে এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে যেন প্রত্যেকে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে শেখে।

ঘ. প্রেম-প্রীতির প্রাণকেন্দ্র ঘর ও পরিবার। পরিবারকে এমনভাবে গড়তে হবে যেন তা সদস্যদের মাঝে প্রেমপ্রীতির বন্ধন গড়ে তোলা ও সুসংহত করার লালনক্ষেত্র হয়।

বস্তুত পরিবারকে এমন কারখানা বলে অনুমান করতে হবে যেখানে ভালোবাসা, ত্যাগ, আন্তরিকতা, সহযোগিতা, সংহতি, ক্ষমা, হাসিখুশি ও অন্যান্য মানবীয় সুন্দর গুণের সৃষ্টি ও পরিচর্যা হয়। একটি সভ্য ও উন্নত সমাজের অনিবার্য অনুষঙ্গ এসব সুকুমার বৃত্তি পরিবার থেকেই উৎসারিত হতে হবে।

তা যদি হয়, তবে পরিবারে নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ, পরিবারের সুস্থতা ও পরিণামে সমাজের সুস্থতা ও বিকাশ গ্যারান্টিযুক্ত হবে। ছেলেমেয়েরা সুন্দর চরিত্র ও গুণাবলীতে আকীর্ণ একটি পরিবেশে বড় হবে। সঠিক মানবীয় কাঠামোতে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং পুরো পরিবার হবে সুখ, স্বচ্ছতা, আন্তরিকতা ও সততার উষ্ণ ও মনোজ্ঞ পরিমন্ডল।

সংবিধানে নারী প্রসঙ্গ

পারিবারিক জীবনের দুই গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে নারীর গুরুত্ব ও ভূমিকা অনস্বীকার্য। কাজেই আইন, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারের তাদের এ গুরুত্ব ও ভূমিকার নিশ্চয়তা বিধান করা চাই। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে সত্যিকার অর্থেই নারীরা বিভিন্নভাবে যথার্থ গুরুত্ব পেয়ে আসছেন। তাঁরা নারীর প্রকৃত মান ও মর্যাদা উদ্ধার এবং মানবীয় পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরকারী সহায়তার অধিকারী। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানেও নারীকে বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াতের অক্টোপাশ হতে মুক্তি দিয়ে তাকে সত্যিকারের মানবীয় মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্বের দিকে অগ্রসর হওয়ার ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে।

সংবিধানের উনিশতম ধারায় (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) যে কোনো গোত্র ও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ইরানী নাগরিকদের অধিকারের সমতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশতম ধারায় বলা হয়েছে যে, দেশের প্রত্যেক মানুষ নারী হোক বা পুরুষ, সমানভাবে আইনের পৃষ্ঠপোষকতা পাবে এবং ইসলামী মানদন্ডের ভিত্তিতে সব রকমের মানবিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ভোগ করবে। কাজেই দেখা যায় যে, নারী পুরুষের সমান অধিকারের সাম্যের মূলনীতির প্রতি সংবিধানে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

নারীদের ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব

নারীদের প্রকৃত মর্যাদার হেফাজত ও সমাজে তাদের অবস্থান ও ভূমিকা ফলপ্রসূ করার জন্য ইরানের সংবিধানে কতিপয় বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং তা দু'ভাবে। প্রথমত কিছু মূলনীতিতে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত পুরুষদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব দায়িত্বের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হচ্ছে ঃ

১. মানুষের সুমহান মর্যাদা, মূল্য ও দায়িত্বের সাথে পরিপূরক তার স্বাধীনতার হেফাজত করা। (মূলনীতি ২, ধারা-১৬)

২. যোগাযোগ ও প্রচার মাধ্যমের সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে সর্বক্ষেত্রে সচেতনতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা। (ধারা ৩, উপধারা-২)

৩. সর্বক্ষেত্রে অবৈতনিক শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং উচ্চতর শিক্ষা সার্বজনীন ও সহজতর করা । (ধারা-৩০)

www.pathagar.com

৪. নির্ধারিত সীমার মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। (ধারা-৩, ধারা-৭)

৫. সমাজের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাগ্য নির্ধারণে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। (ধারা-৩, উপধারা-৮)

৬. (নারীদের জন্য) যথাযথ কর্ম ও পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। (ধারা-২৮)

৭. স্বাস্থ্য ও বিশুদ্ধ খাদ্যের ব্যবস্থা করা। (ধারা-৩, উপধারা-১২)

৮. ধর্ম বিশ্বাস অনুসন্ধানের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং ধর্ম বিশ্বাসের কারণে আক্রান্ত হওয়া থেকে নিরাপত্তা দান। (ধারা-২৩)

সরকারের ওপর বর্তানো কিছু দায়িত্ব এমন আছে যেগুলো সরাসরি নারীদের সাথে জড়িত। সংবিধানের একশ'তম ধারায় এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। সংবিধান সরকারকে এ মর্মে দায়িত্বশীল করেছে যে, ইসলামী নীতিমালা মেনে চলা সাপেক্ষে সর্বক্ষেত্রে নারীদের অধিকার সংরক্ষণ করতে সরকার বাধ্য। এ ধারার আলোকে যে সব বিষয়ের দায়িত্ব সরকারের ওপর বর্তায় তাতে রয়েছে ঃ

১. নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং তার বৈষয়িক ও নৈতিক অধিকার সংরক্ষণ।

২. মায়েদের, বিশেষত গর্ভাবস্থায় দুগ্ধদানরত অবস্থায় মায়েদের সহায়তা দান।

৩. পরিবারের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যথাযোগ্য আদালত গঠন।

৪. শরীয়তসম্মত অভিভাবকের অবর্তমানে উপযুক্ত মায়েদের হাতে সন্তানদের অভিভাবকত্ব প্রদান।

৫. বিধবা, বয়োবৃদ্ধ ও পৃষ্ঠপোষকহীন মহিলাদের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

সামগ্রিকভাবে সংবিধানে নারীদের ব্যাপারে যে সব বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

১. নারীর স্বভাব, প্রকৃতি, মনস্তত্ত্ব ও আবেগ-অনুভূতির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দান।

২. নারীর সম্মান ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার এবং তার ইসলামী ও মানবীয় পরিচয় ফিরিয়ে দেয়া।

৩. রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক অঙ্গনে নারীর উপস্থিতি ও অংশদারিত্ব নিশ্চিত করা। পরিবারকে মৌলিক বিবেচনা করে এবং ঘর ও স্বামী ও মাতৃত্বকে সামলানোর গুরুদায়িত্বকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা এবং পরিবারের মৌলিক গুরুত্বকে খর্ব না করে নিজের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য চেষ্টা করা।

৪. নারীর ব্যাপারে সর্বপ্রকার জুলুম, বেইনসাফী, অন্যায়, বৈষম্য প্রতিরোধ এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিরক্ষা।

৫. পুরুষকেন্দ্রিক সমাজের সাংস্কৃতিক আধিপত্য খর্ব করে সমাজে নারী-পুরুষের অধিকারে সমতা আনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী অনূদিত

www.pathagar.com

বিংশ শতাব্দীতে বাংলার নারী সমাজের কালপঞ্জি

☆ সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর পরাধীন বৃটিশ আমলে ভারতবর্ষে ১৮১১ সালে নারী শিক্ষার যাত্রা শুরু হয় মিশনারীদের উদ্যোগে।

☆ ১৯০০ সাল পর্যন্ত ৩৭ জন নারী বি.এ ডিগ্রী লাভ করেন

☆ নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পুরুষদের প্রতিকিয়া। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক লিলিয়ান পালিত অসুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য স্বামীকে পরিত্যগ করেন। পরে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। এই ঘটনায় নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে একজোট হয়েছিলেন পুরুষদের দল। সেই বাধার মুখোমুখি হয়েছিল নারী আন্দোলনের নেতৃত্ব।

☆ ১৯০১ আদমশুমারের তথ্যে জানা যায় পশ্চিম বাংলা ও ভারতের ৪০০ মুসলমান মেয়ের ইংরেজি ভাষা ও লেখাপড়া শিখে। বাঙালী ছাত্রীর সংখ্যা তখন পূর্ব বাংলায় ছিলো ৫৫৬৪ জন।

☆ ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ২০০ জন নারী প্রতিনিধি যোগ দেন। এদের মধ্যে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ও সরলা দেবী চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

☆ ১৯০১ সালের আদমশুমারীর তথ্যে জানা যায় যে, সেকালে কলকাতায় চাকুরি করতেন ৭২৫ জন নারী। শিক্ষকতায় ৫৮৭জন, প্রশাসন ও পরিদর্শক ৬ জন, চিকিৎসায় ১২৪ জন, ফটোগ্রাফার ৪ জন ও লেখক ছিলেন ৪ জন।

☆ ১৯০২ ন্যাশনাল 'স্যোশাল' কনফারেন্সে প্রতিষ্ঠানের সম্মেলনে ৫০ জন নারী যোগ দেন।

☆ ১৯০২ ছোট গল্পকার ও কবি হিসেবে এই সময় লেখাশুরু করেন অনুজা সুন্দরী দাসগুপ্ত, নির্ঝরনী ঘোষ, আমোদিনী ঘোষ, নিস্তরিনী দেবী, তরুলতা দত্ত প্রমুখ।

☆ ১৯০২ রোকেয়া সুলতানার নারী মুক্তির বই 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রকাশিত হয়।

☆ ১৯০৩ নারী শিক্ষার প্রসার ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে প্রচার আন্দোলন চালায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি।

☆ ১৯০৪ বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সাহিত্যিক পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। এই সালে 'স্ত্রী জাতীর অবনীতি' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

☆ ১৯০৫ ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির প্রতাপাদিত্য ব্রত-র দ্বিতীয় অধিবেশনে সরলা দেবী চৌধুরানী সভাপতিত্ব করেন এবং ঐ অধিবেশনেই প্রথম জাতীয় শ্লোগান হিসাবে 'বন্দে মাতরম' উচ্চারিত হয়।

☆ এই সালে বেগম রোকেয়ার মতিচুর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

☆ শহীদ সোহরাওয়ার্দির মা সমাজকর্মী খুজিস্তা আখতার বানুর উদ্যোগে স্থাপিত হয় মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়।

☆ ১৯০৬ ঢাকায় ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীদের প্রশিক্ষন শুরু হয়। এর ফলে পূর্ব বাংলার শিক্ষয়িত্রীর অভাব দূর করার ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি হয়।

☆ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ নেত্রী দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার ঘোষনা দেন এবং নারী সমাজকে মুক্ত হতে আহবান জানান। বৃটিশের লাঠি, জেল, জুলুম, গুলি উপেক্ষা করে হাজার হাজার নারী সভা, সমাবেশের কাজে যুক্ত হন।

☆ ১৯০৮-৯ পূর্ব বাংলায় ৮১৯টি নতুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

☆ ১৯১০-১১ পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা প্রদেশে ৪৫৫০টি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ছিলো ১,৩১,১৩৯ জন।
কলকাতায় ১৬ মার্চে রোকেয়ার সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্টা।

☆ ১৯১৭ ভারতীয় নারীদের ভোটাধিকার দাবি; জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সভাপতি।

☆ ১৯২১ নারী সমাজের ভোটাধিকারের আন্দোলনের চাপে বৃটিশ সরকার নারীর ভোটাধিকার দেয়ার বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের বিবেচনায় অর্পন করেন। এই সালে মাদ্রাজে আইন সভায় প্রথম মেয়েদের ভোটাধিকারের প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে উড়িষ্যা ও বিহারবাদে ১৯২৯ সালে বাংলার নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করেন এবং ১৯৩৫ সালে ভারতের ৬০ লক্ষ নারীর ভোটাধিকার দেন বৃটিশ সরকার।

☆ ১৯২২ সুলতানা বেগম কলিকাতা থেকে আইন বিষয়ে এম,এ ডিগ্রি লাভ করেন।

☆ নারী সংগঠন "ন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন্স ইন ইণ্ডিয়া" প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

☆ ১৯২৫ এই সালে প্রকাশিত হয় নারীদের মুখপত্র "স্ত্রী ধর্ম" পত্রিকা।

☆ ১৯২৭ বাঙালী মুসলমান নারী ফজিলাতুন্নেসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এম,এস,সি পাশ করেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার কৃতিত্বসহ।

☆ ১৯২৮ সিলেটের প্রথম মহিলা মুসলমান মহিলা

www.pathagar.com

জোবেদা চৌধুরানী রাজনীতিতে যোগ দেন। তিনি ১৯৫০ সাল পর্যন্ত রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন।

☆ ১৯২৯ সারদা এ্যাক্ট পাস করা হয় বাল্য বিবাহ রোধ করার জন্য। ছেলের বিয়ের বয়স ১৮ ও মেয়ের ১৪ বছর নির্ধারন করা হয়।

☆ ১৯৩০ সওগাত মহিলা সংস্থা বের হয়।

☆ ১৯৩০-৩২ সালে রাজিয়া খাতুন ও হালিমা খাতুন ময়মনসিংহে বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগ দিয়ে কাজ করেছেন।

☆ সওগাত মহিলা সংখ্যায় লেখিকাদের ছবি ছাপার জন্য মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনকে মুসলিম গোঁড়া সমাজের বিরুদ্ধতা ও লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে। অলবেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়ন (১৯৩২) গঠিত হয় নারী ও বালিকা পাচার সমস্যার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ণের দাবীতে। নারী সত্যাগ্রহ সমিতি (১৯৩৩) গঠিত হয় বিলাতি পণ্য বর্জন, মদ পান বন্ধ, নারী সমাবেশ করার জন্য। ১৯৪২ সালে বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধে অবিভক্ত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির নারী নেতৃত্ব গড়ে ওঠে 'বঙ্গীয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। কৃষক শ্রমিক-মধ্যবিত্ত নারী সদস্যরা যুক্ত হন আন্দোলনে।

☆ বেগম রোকেয়া ৯ ডিসেম্বর মৃত্যুর রাতে ১২ টা পর্যন্ত লিখেছেন। তাঁর শেষ অসম্পূর্ণ লেখার শিরোনাম "নারীর অধিকার"।

☆ ১৯৩২ কবি হোসেন আরা বেগম স্বাধীনতা দিবসে কলকাতা ময়দানে শোভাযাত্রা পরিচালনা এবং পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি জেলও খেটেছেন।

☆ ১৯৩৯ সালে মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে।

☆ ১৯৪২ অরুনা আসফ আলী বোম্বেতে বৃটিশ পুলিশের জুলুম উপেক্ষা করে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। এর পর তিনি আত্মগোপন করেন।

☆ ১৯৪৪ এই সালে 'রাও বিল' উত্থাপিত হলে হিন্দু ও মুসলিম নারীর ধর্মভিত্তিক অধিকার দেয়ার দাবী তোলা হয় রাজনৈতিক কারণে। তবে নারী সমাজ এই আইনের সুফল পাবার জন্য কিছু কিছু সংস্কারের সুপারিশ দেয়। শেষ পর্যন্ত হিন্দু নারী সমাজের পারিবারিক আইনী অধিকার অর্জিত হয়। যার ভিত্তিতে দেশ বিভাগের পর শুধু দৌলতুন্নেসা খাতুন গাইবান্ধায় স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। কয়েকবার তিনি কারাবরণ করেন।

☆ সালে Immoral Traffic Bill সংশোধিত হয়েছে।

☆ ১৯৪৬ সেপ্টেম্বরের পর থেকে তেভাগা আন্দোলন শুরু হলে দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, নীলফামারী, যশোর, নড়াইল, ময়মনসিংহ, চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় নারী কর্মীদের অকুতোভয় অংশগ্রহণ ও শহীদ হওয়ার ঘটনা ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩৫ সালের নির্বাচন পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রিয় আইন সভার নির্বাচন ঘোষিত হয় ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে। কয়েকজন বাঙালী নারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। চট্টগ্রাম থেকে নেলী সেনগুপ্তা এবং ঢাকা থেকে আশালতা সেন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচিত হন।

☆ ১৯৪৮ ঢাকার ইডেন স্কুল ও কামরুন্নেসা স্কুল বন্ধ হবার উপক্রম হয়। প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ১৫ নভেম্বর প্রায় ৫০০ ছাত্রী ধর্মঘট ও বিক্ষোভ করে। ৬ ডিসেম্বর দাবী মেনে নেয়া হলে ধর্মঘট বন্ধ হয়। মাতৃভাষা উর্দু হবে-ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে নাদেরা বেগম কারাদণ্ড ভোগ করন ১৯৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত।

☆ ১৯৫০ সাল থেকে নতুন নতুন মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠেছে। পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা সমিতি নতুনভাবে গড়ে ওঠে। কামরুননাহার লাইলীসহ তরুণী ছাত্রীরা যোগ দেন। সুফিয়া কামাল, নুরজাহান মুরশিদ, রোকেয়া রহমান কবির, বেগম মহিউদ্দিন, রাইসা হারুন, দৌলতুননেসা প্রমুখ নারী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

☆ ১৯৫১ সালের শেষ দিকে কবি সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী ও দৌলতুননেসাকে সাধারণ সম্পাদিকা নির্বাচিত করে ঢাকা শহর শিশু রক্ষা সমিতি গঠিত হয়েছিল।

☆ ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু হয়। সিলেটে মহিলা মুসলিম লীগের জেলা কমিটির সভানেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধুরানী, সৈয়দা নাজিবুন্নেসা ও রাবেয়া খাতুন প্রমুখ নেতৃত্ব দেন এই আন্দোলনে।

☆ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণ ও ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে ঢাকায় নারী সংগঠনের সদস্যরা ও সাধারণ নারী সমাজ সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল করে প্রতিবাদ জানান। নুরজাহান মুরশিদ, লায়লা সামাদ, সনজিদা খাতুন প্রমুখ শোক সভায় যোগ দেন। ভাষা আন্দোলনে নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। নারায়নগঞ্জের মর্ডান স্কুলের প্রধান শিক্ষয়েত্রী মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার করা হয়।

www.pathagar.com

☆ ১৯৪৭-১৯৫০ সালে কলকাতায় ও ১৯৫৪ সালে ঢাকায় মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত বেগম পত্রিকা নারী আন্দোলন ও প্রগতির ধারায় ভূমিকা রেখেছে। বর্তমান সময়েও পত্রিকাটি চালু আছে। কবি সুফিয়া কামাল ছিলেন প্রথম সম্পাদক। পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সম্পাদক আছেন নুরজাহান বেগম। বেগম ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। শামসুন্নাহার মাহমুদ নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশের সাহিত্যিক, সমাজসেবী, নারী প্রগতির জন্য সমাজ সংস্কারক, আন্দোলনকারী নেত্রী ও কর্মী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বেগম ক্লাবের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

☆ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আইন ছিল পৌরসভা এলাকার নারীদের ভোটে নারী প্রার্থী নির্বাচিত হবেন। সেসময় দৌলতননেসা, নুরজাহান মুরশিদ, বদরুন্নেসা আহমেদ, আমেনা বেগম, সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, তফতুন্নেসা, মেহেরুননেসা খাতুন, নেলী সেন গুপ্তাসহ ১৪ জন নির্বাচিত হন। নারী সমাজের মধ্যে অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

☆ ১৯৫৪ সালে ওয়ারী মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

☆ ১৯৫৫ সালে বেগম দৌলতননেসা, নুরজাহান মুরশিদ ও বেগম রাজিয়া বানু প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হিসাবে নিযুক্ত হন।

☆ ১৯৫৫ সালে তেল ও নুনের দাম বাড়ানো হলে কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে সরকারী সংগঠন আপওয়ার মহিলারা ছাড়া সব সংগঠনের মহিলারা মন্ত্রী আতাউর রহমানকে রাজপথে ঘেরাও করেন। পূর্ব-পাকিস্তানে এই প্রথম রাজপথে মহিলাদের ঘেরাও আন্দোলন হয়।

☆ অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে নারী সমাজের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠিত হয় ১৯৫৫ সালে। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনের ফলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়।

☆ ১৯৫৬ সালে হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাস হয়।

☆ '৬০-এর দশকে নারী সমাজ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ১৯৬১ সালে পারিবারিক আইন প্রণীত হলো। ১৯৬৩ সালে আইনটি গৃহীত হয়। নারী সমাজের অধিকার অর্জনের ইতিহাসে এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জাতীয় পরিষদে প্রত্যেক প্রদেশ থেকে ৩টি করে ৬টি ও প্রাদেশিক পরিষদে ৫টি করে ১০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

☆ ১৯৬০ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মৃতি কমিটি গঠিত হয় কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে।

☆ ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারি ও পরে সংশোধিত আইন হয়।

☆ ১৯৬২ সালের ৮ মার্চ সুফিয়া কামাল সোভিয়েত ইউনিয়ন নারী সংগঠনের আমন্ত্রণে সোভিয়েত রাশিয়ায় যান। এই প্রথম বাংলাদেশের নারী সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রতিনিধিত্ব করেন।

☆ আইয়ুব খানের '৬২'র শিক্ষানীতিতে বলা হয় মা ও গৃহিণী হিসেবেই নারীকে গড়ে তুলতে হবে। এর বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্র-ছাত্রী ও নারী আন্দোলন হয়।

☆ ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিরোধী 'পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাঁড়াও' আন্দোলনে রোকেয়া রহমান কবিরসহ বহু মহিলা যোগ দেন।

☆ মিস ফাতেমা জিন্নাহ প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হওয়ায় নারী সমাজ স্বেচ্ছাসেবী হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। সামরিক সরকার আইয়ুব বিরোধী নির্বাচনী জোট করে ইসলামী দলগুলোসহ এদেশের সব রাজনৈতিক দল ১৯৬৪ সালে নির্বাচনী ৯ দফা ঘোষণায় 'মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১' বাতিল করার ধারা যুক্ত করে। কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে রোকেয়া রহমান কবিরসহ সকল নারী সমাজ তীব্র প্রতিবাদ করায় শুধু কমিউনিষ্ট পার্টি আত্মগোপন অবস্থায় ৮ নং ধারাটির বিরুদ্ধে মতামত দেয়। অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠন আপত্তি করেনি।

☆ ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে নারী সমাজ যুক্ত হয়। গড়ে তোলে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ। রাজবন্দী মুক্তির জন্য তহবিল সংগ্রহ প্রচার আন্দোলন ও মিছিল সমাবেশে যোগ দেয় নারী সমাজ।

☆ ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল কবি সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী ও মালেকা বেগমকে সাধারণ সম্পাদিকা করে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ'। এদেশের প্রথম রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরানী সে সময় ৭০ বছর বয়সে এই সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। কবি সুফিয়া কামাল আজীবন সভানেত্রী ছিলেন ১৯৯৯-এর ২৯নভেম্বরপর্যন্ত।

☆ ১৯৭১এর ২৫মার্চ পর্যন্ত এদেশের নারী সমাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ন হয়।

☆ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর সমান অধিকারের দ্বারা মৌলিক অধিকার

www.pathagar.com

অর্জিত হয়।
☆ ১৯৭৪ সালে মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজিস্ট্রীকরণ আইন প্রণীত হয়।
☆ ১৯৭৬ সালে পুলিশ ও আনসার বাহিনীতে নারীদের নিয়োগ করার অধ্যাদেশ জারী হয়।
☆ মহিলা মন্ত্রনালয় ও মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ হয় ১৯৭৮ সালে।
☆ ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন পাস হয়।
☆ নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধের আইন হয় ১৯৮৩ ও ১৯৯৫।
☆ ১৯৮৪ সালে আন্তর্জাতিক নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদে (সিডও) সংরক্ষিত ধারাসহ সরকারের স্বাকৃতি দান।
☆ ১৯৮৫ সালে পারিবারিক আদালতে অধ্যাদেশ হয়।
☆ ১৯৯৫ সালে এসিড নিক্ষেপ বিরোধী অধ্যাদেশ জারি হয়।
☆ নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষিত হয়েছে মার্চ, ১৯৯৭।
☆ সিডও সনদের ১৩.এ এবং ১৬.১.(এফ) ধারা প্রত্যাহার করা হয় ১৯৯৭ সালে।
☆ বেইজিং নারী উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন (১৯৯৫) ও বাংলাদেশে তা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।
☆ নারী উন্নয়ন পরিষদ দেশের সর্বোচ্চ নারী উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষিত হয়েছে ১৯৬৬ সালে।
☆ নারী উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতার জন্য মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ইউনিট 'PLAGE' নামে গঠিত হয়েছে।
☆ শিশু অধিকার ও নারী অধিকার বিষয়ে আন্ত র্জাতিক প্রায় সব সনদে সরকার স্বাকৃতি দিয়েছেন।
☆ নারী অধিকার আন্দোলনের প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশের নারী সমাজের অগ্রগতিতে যে নারী নেত্রীবৃন্দ অবদান রাখছেন তাঁদেরকে 'রোকেয়া পদক' দেয়ার আইন প্রবর্তিত হয়েছে।

আধুনিক বিশ্বে প্রথম নারীর কৃতিত্ব

১৯০৮ ঃ
☆ এলিজাবেথ গেরেট এণ্ডারসন যুক্তরাজ্যের প্রথম নারী মেয়র। গ্রাজুয়েট নারীদের ভোটাধিকারের দাবী জানিয়ে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে প্রথম নারী বক্তা ছিলেন ক্রিষ্টাল ম্যাকমিলান।
☆ জুলিয়া ওয়ার্ড হোয়ে আমেরিকার শিল্পকলা একাডেমীর প্রথম মহিলা সদস্যা।

১৯০৯ ঃ
☆ সেলমা লেগারলফ সাহিত্যে নোবেল পুরুষ্কার অর্জন করেন।

১৯১১ ঃ
☆ হ্যারিয়েট কুইম্বি প্রথম লাইসেন্সপ্রাপ্ত মহিলা পাইলট।

১৯১৬ ঃ
☆ জেনেট র‍্যাঙ্কিন আমেরিকার কংগ্রেসের প্রথম মহিলা প্রতিনিধি।

১৯১৮ ঃ
☆ মহিলা এমপি হিসাবে নির্বাচিত হবার আইন যুক্তরাজ্যে পাস হবার পর প্রথম নির্বাচিত মহিলা এমপি হলেন কনষ্ট্যান্স মার্কিভিজ। কিন্তু তিনি সংসদে বসেননি।

১৯১৯ ঃ
☆ ন্যান্সি এ্যাসটর হাউস অব কমনস-এ আসন গ্রহণকারী প্রথম মহিলা এমপি।

১৯২০ ঃ
☆ স্কটল্যান্ডের শান্তির জন্য ন্যায় বিচারক পদে প্রথম মনোনীত মহিলা এলিজাবেথ হলডেন।

১৯২১ ঃ
☆ কানাডার পার্লামেন্টে প্রথম নারী সদস্য ছিলেন এ্যাগনেস ম্যাকফেইল।

১৯২৩ ঃ
☆ যুক্তরাজ্যের প্রথম মহিলা মন্ত্রী ক্যাথরিন এ্যাথল। স্কটল্যান্ডের প্রথম নারী বার সদস্য ছিলেন মাগারেট কিড।

১৯২৯ ঃ
☆ মার্গারেট বন্ডফিল্ড যুক্তরাজ্যের প্রথম মহিলা ক্যাবিনেট মিনিষ্টার।

১৯৩৩ ঃ
☆ আমেরিকার প্রথম মহিলা ডিপ্লোম্যাট রুথ রোড।

১৯৩৯ ঃ
☆ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা অধ্যাপক ডরোথী গ্যারেড।

১৯৪৩ ঃ
☆ সোভিয়েট রাজনীতিবিদ আলেকজান্দ্রা কোলোনটাই বিশ্বের মধ্যে প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত।

১৯৪৪ ঃ
☆ ফ্লোরেন্স টিম ওই লি হংকং এ্যাঙ্গলিকান চার্চের প্রথম মহিলা বিশপ।

www.pathagar.com

১৯৫১ ঃ
☆ এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল আমেরিকার প্রথম মহিলা ডাক্তার হিসেবে পেশা শুরু করেন।

১৯৫৩ ঃ
☆ ভারতের বিজয় লক্ষ্মী পন্ডিত জাতিসংঘের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৫৭ ঃ
☆ ইয়েকাতেরিনা ফুরত্তেভা সোভিয়েট পলিটব্যুরোর প্রথম মহিলা সদস্য ছিলেন।

১৯৬০ ঃ
☆ শ্রীলংকার শ্রীমাভো বন্দরনায়ক ছিলেন পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

১৯৬৩ ঃ
☆ প্রথম মহিলা মহাশূন্য যাত্রী সোভিয়েট নারী ভেলেন্তিনা তেরেশকোভা।

১৯৬৫ ঃ
☆ এলিজাবেথ লেন যুক্তরাজ্যের প্রথম মহিলা বিচারক।

১৯৬৬ ঃ
☆ ডেন এলাবেলে র‍্যাঙ্কিন অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

১৯৭৫ ঃ
☆ যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক দলের প্রথম মহিলা প্রধান মার্গারেট থেচার।

১৯৭৮ ঃ
☆ হানা গ্রে আমেরিকার প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা প্রধান-কর্মকর্তা।

১৯৭৯ ঃ
☆ মার্গারেট থেচার বৃটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

১৯৮০ ঃ
☆ ডোমিনিকার ইউজিনিয়া চার্লস ক্যারিবিয়ান দেশগুলোর মধ্যে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।
☆ আইসল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট ভিগডিস ফিন বোগাডোটির বিশ্বের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান।

১৯৮১ ঃ
☆ নরওয়ের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী গ্রো হারলেম ব্রুন্ডটল্যান্ড।
☆ ইটা বাটারোজ অস্ট্রেলিয়ার দৈনিক পত্রিকার প্রথম মহিলা সম্পাদক।

১৯৮৭ ঃ
☆ দিয়ানে এবট বৃটিশ সংসদের প্রথম কৃষ্ণ নারী সদস্য।
☆ মেরী গডরন অস্ট্রেলিয়ার উচ্চ আদালতের প্রথম মহিলা বিচারক।

১৯৮৮ ঃ
☆ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো সমসাময়িক মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ছিলেন প্রথম মহিলা নেত্রী।

১৯৮৯ ঃ
☆ বারবারা হ্যারিস আমেরিকার এ্যাঙ্গলিকান চার্চের প্রথম মহিলা বিশপ।

১৯৯১ ঃ
☆ এডিথ ক্রেসন ফ্রান্সের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।
☆ খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

১৯৯৩ ঃ
☆ তুরস্কের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী তানসু সিলার।
☆ ইংল্যান্ডের ব্যাংকের প্রথম মহিলা পরিচালক ফ্রান্সেস হিটন।

www.pathagar.com

নারী উন্নয়নে বিশ্ব কার্যক্রম

বিশ্বব্যাপী নারীর ওপর দারিদ্রের চাপ চরম দারিদ্রের মধ্যে বসবাসরত বিশ্বের ১০০ কোটিরও বেশি মানুষের বড় অংশই নারী। সব ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ও সমন্বয়ের প্রক্রিয়া সত্ত্বেও বেকারত্ব, আধা-বেকারত্ব বেড়েছে। এর বিশেষ চাপ পড়েছে নারীর ওপর। গৃহযুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদ, সশস্ত্র সংঘাত পৃথিবীতে অব্যাহত থাকায় নারীর মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। এসবের মধ্যে আছে হত্যা, নির্যাতন, নিয়মিত ধর্ষণ, গর্ভধারণ ও গর্ভপাতের বাধ্য করানো। জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণ নীতির আওতায় এসব ঘটছে।

বিশ্বের সব-পরিবারের মধ্যে ৪ ভাগের ১ ভাগ নারী প্রধান ঃ পরিবারে, সমাজে, সম্প্রদায়ে, কর্মক্ষেত্রে সবেতনে/বিনা বেতনে কাজ করে নারীরা অর্থনীতিতে ও দারিদ্র দূর করার প্রক্রিয়ায় অবদান রেখেছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করছে ব্যাপক নারী। পৃথিবীর সব পরিবারের মধ্যে ৪ ভাগের ১ ভাগ নারী প্রধান। এসব পরিবার/নারীর উপার্জনের ওপর-নির্ভরশীল।

নারীর স্বাস্থ্যজীবন হুমকির মুখে ঃ ২০০০ সাল নাগাদ ১ কোটি ৩০ লাখেরও বেশি নারী যৌন রোগে সংক্রামিত হবে এবং ৪০ লাখ নারী এইডস জাতীয় রোগে মারা যাবে। বিশ শতকের শেষে নারীর স্বাস্থ্য জীবন এই হুমকির মুখে দাঁড়িয়েছে।

৬ কোটি মেয়ে ও ৪ কোটি ছেলে শিশু প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত ঃ আঞ্চলিক পর্যায়ে মেয়ে এবং ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষার সমান অধিকার পেয়েছে। আফ্রিকার কোন কোন অংশ সাবসাহারান আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ায় শিশুরা এখনো শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। পৃথিবীর ৬ কোটি মেয়েসহ ১০ কোটি শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায় না। পৃথিবীর ৯৬ কোটি বয়স্ক নিরক্ষর লোকের ৩ ভাগের ১ ভাগের বেশী নারী। সাবসাহারান আফ্রিকা ও কয়েকটি আরব রাষ্ট্রে নারী উন্নয়নের বাধা হয়ে আছে নিরক্ষরতার উঁচু হার।

মেয়েদের শিক্ষার জন্য বরাদ্দ কম ঃ অনেক দেশে শিক্ষায়, বিশেষ করে মেয়ে ও নারীদের শিক্ষায় সম্পদের বরাদ্দ অনেক কম। এর ফলে নারী উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

মেয়েরা পুষ্টি ও স্বাস্থ্য যত্ন পাচ্ছে অনেক কম ঃ পুষ্টি ও স্বাস্থ্য যত্ন সেবাসমূহের ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য ঘটছে ছেলের প্রতি পক্ষপাত থেকে। এর ফলে মেয়েদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিপন্ন হচ্ছে। নারী বিশেষ ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকির শিকার হচ্ছে।

নারী নির্যাতন নারী উন্নয়নের প্রধান বাধা ঃ নারী উন্নয়নের প্রধান বাধা হিসাবে বিশ শতক জুড়ে নারী নির্যাতন, মানবাধিকার হরণ ও লংঘন চিহ্নিত হয়েছে।'

বাস্তুহারাদের ৮০% নারী ও শিশু ঃ যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংঘাত নারীকে বাস্তুচ্যুত করছে। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুতসহ অন্যান্য বাস্তুহারাদের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ হচ্ছে নারী ও শিশু।

শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে ঃ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারে সচেতন কাজে নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। কৃষি, মৎস খাত ছাড়াও মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীরা কাজ করছে এবং পরিচালক পদেও যোগ দিচ্ছে।

নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে ঃ অর্থনীতির আন্তর্জাতিকীকরণের ফলে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি কমে গেছে।

আইন সভায় ও মন্ত্রী পর্যায়ে নারী প্রতিনিধি কমছে ঃ বিশ্ব পর্যায়ে, আইন সভার সদস্যদের শতকরা মাত্র ১০ ভাগ আসনে এবং মন্ত্রী পর্যায়ে আরো কম হারে এখন নারী রয়েছে। যেসব দেশে সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন চলছে সেখানে আইনসভাগুলোতে নারীর প্রতিনিধিত্ব কমে গেছে।

নারী উন্নয়নে প্রচার মাধ্যমের গুরুত্ব বেড়েছে ঃ তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। এর প্রভাব পড়ছে সকলের ওপর। নারীর অগ্রগতিকে অনেক বেশী অবদান রাখছে প্রচার মাধ্যম।

মেয়ে শিশু নির্যাতন ও বৈষম্য উদ্বেগজনক ঃ পৃথিবী জুড়ে মেয়ে শিশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি খুবই নেতিবাচক। প্রায়ই মনে করা হয় মেয়েরা নিকৃষ্ট জীব। ফলে ঘটছে নবজাতক হত্যা, মাতৃগর্ভে সন্তান ছেলে না মেয়ে তা যাচাই করা, বাল্যবিবাহ, শিশু বিবাহ, সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন, নানা রকম বৈষম্য যেমন খাদ্য বরাদ্দ, স্বাস্থ্য সুযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্য। ফলে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় কম বাঁচে। প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হতে মারা যায় বেশী মেয়েরা। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে পুরুষের সংখ্যা নারীর চেয়ে প্রতি ১০০ জনে ৪ জন বেশী।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রক্ষমতা নারীর অংশগ্রহণের বিশ্বচিত্র ঃ রাষ্ট্রক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান সবার ওপরে। বিভিন্ন দেশের জাতীয় আইনসভার প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশ্বিক সংস্থা ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক জরিপে এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বার্তা সংস্থা এপি প্রকাশিত এক জরিপে বিশ্বের দেশসমূহের আইন সভায় নারীদের প্রতিনিধিত্বের শতকরা হার দেখানো হয়েছে। মোট ১৪৭টি দেশের এই জরিপের তালিকায় বাংলাদেশের ওপরে নেই। তালিকায় বাংলাদেশের পার্লামেন্টে নারীর অংশগ্রহণের হার দেখানো হয়েছে ৯ দশমিক ১ শতাংশ। তালিকার শীর্ষ ৫টি স্থানই দখল করে নিয়েছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলো। পার্লামেন্টে ৪২ দশমিক ৭ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে প্রথম স্থানটি অধিকার করেছে সুইডেন। ৩৭ দশমিক ৪ শতাংশ হার নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ডেনমার্ক। ৩৭ শতাংশ নিয়ে তৃতীয় হয়েছে ফিনল্যান্ড। পরের দুটি দেশ যথাক্রমে নরওয়ে এবং নেদারল্যান্ড।

আফ্রিকান দেশগুলোর মধ্যে তালিকায় সর্বশীর্ষে ৮ নম্বরে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এখানকার ক্ষমতাকাঠামোয় নারীর অংশগ্রহণ ৩০ শতাংশ। মূল তালিকায় ১০ম স্থান নিয়ে এশীয় দেশগুলোর মধ্যে প্রথম হয়েছে ভিয়েতনাম। দেশটির পার্লামেন্টে নারীর অংশগহণের হার ২৬ শতাংশ। ফিদেল কাস্ট্রো কমিউনিস্ট রাষ্ট্র কিউবাতে ক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণ হয়েছে ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ হারে। তালিকায় কিউবার অবস্থান নবম। তালিকায় ২৬তম স্থান নিয়ে মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে আছে এশিয়ার দেশ তুর্কমেনিস্তান।

প্রতিবেশী দেশ ভারতের স্থান ৮৫ নম্বরে। সেখানে নারীর অংশগ্রহণের হার ৮ দশমিক ৪। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ নেপাল, শ্রীলংকা ও ভুটানের অবস্থান যথাক্রমে ১০৯, ১১৮ এবং ১৩৮।

বিশ্বের সবচেয়ে প্রতাপশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান তালিকার ৪৩ নম্বরে। অন্যতম ধনী দেশ জাপানের অবস্থান একেবারে শেষের দিকে ১২২ নম্বরে।

নারীর সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগ ঃ নারীর আইনগত সমতা নিশ্চিত করার লক্ষে ১৯৪৫-১৯৬২ পর্যন্ত জাতিসংঘের প্রথম পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কাজ মানবাধিকার কমিশন ও নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন প্রতিষ্ঠা। ১৯৬৩-১৯৭৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কাজ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদ (সিডও সনদ) প্রণয়ন ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতি অর্জন, ১৯৭৫ সালকে বিশ্ব নারী বর্ষ ঘোষণা, প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন করা।

১৯৭৬-১৯৮৫ পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়ে বিশ্ব নারী দশকের দুটি সম্মেলন কোপেন হেগেনে ও নাইরোবিতে উদযাপিত হয়। ১৯৭৯ সালে সিডও সনদটি নারীর মানবাধিকারের বিল হিসেবে আন্ত-র্জাতিক দলিল রূপে গৃহীত হয়।

১৯৮৬-২০০০ সালের চতুর্থ পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কাজ সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, ১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ সকল রাষ্ট্র কর্তৃক বিনা আপত্তিতে বেইজিং কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হওয়া এবং দেশে দেশে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া। বেইজিং পরবর্তী ৫ বছরের কাজের পর্যালোচনা।

নারীর ভোগাধিকার ঃ নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৮ শতকে। ১৯ শতকে এই আন্দোলন তীব্র রূপ পায়। বিশশতকে ভোটাধিকার কার্যকরী হয়। ১৮৯৩ সালে নিউজিল্যাণ্ডে মেয়েদের সীমিত ভোটাধিকার দেয়া হলেও ১৯২৮ সালের আগে বাস্তবে তা কার্যকরী হয়নি। তার আগেই ১৯১৭ সালে সোভিয়েট দেশের নারীর সার্বজনীন ভোটাধিকার পেয়েছেন। আমেরিকার নারী সমাজ ভোটাধিকার পেয়েছেন ১৯২০ সালে। ১৯১৪ সালে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংগঠনের সভানেত্রী চ্যাপম্যান ক্যাট রিপোর্টে উল্লেখ্য করেন ঃ ৫২ বছর ধরে ভোটাধিকারের আন্দোলনে ৫৬ বার প্রচার চালাতে হয়েছে পুরুষ ভোটারদের সমর্থন চেয়ে, ৪৮০ বার প্রচার চলেছে সংশোধনীর দাবীতে, ৩০ বার দাবী উঠেছে আন্তর্জাতিক সংগঠনে এই দাবী অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ১৯৫২ সালে জাতিসংঘে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের সনদ গৃহীত হয়েছে। ১৯৮৭ সালের সর্বশেষ তথ্যে জানা গেছে ১১৫টি দেশের নারী ভোটের ও নির্বাচিত হবার অধিকার পেয়েছে।

ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে নারী সমাজ ঃ ১৯৩০ সালে ইউরোপের কয়েকটি দেশ ফ্যাসিবাদ বিষাক্ত ফণা তুলেছিল। এর বিরুদ্ধে সেসব দেশের প্রগতিশীল নারীরা ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে ১৯৩৪ সালের আগষ্ট মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক নারী কমিটি। ম্যাক্সিম গোর্কি, রোমা রোঁলা এবং পল লজভ্যাঁর মত বিশিষ্ট

www.pathagar.com

ব্যক্তিবর্গ এই ঐক্যবদ্ধ নারী কমিটির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৯৩৬-১৯৩৯ পর্যন্ত এই কমিটির উদ্যোগে স্পেনের বীর নারী লা প্যাসিওনারিয়া ডলারেস ইবারুবির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত যোদ্ধাদের প্রথম সারিতে ছিলেন।

আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন ঃ বিশ শতকের শুরুতে আন্তর্জাতিক কয়েকটি নারী সংগঠন গড়ে উঠেছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ ক্যাথলিক মহিলাদের সংস্থাসমূহের বিশ্ব ইউনিয়ন (১৯০১), শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য আন্তর্জাতিক নারী লীগ (১৯১৫), ফেডারেশন অব ইউনির্ভার্সিটি উইমেন (১৯৩০), ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স কাউন্সিল (১৯৪০), ডব্লুআইডিএফ (১৯৪৫)। নারীদের সমঅধিকার, সমমজুরি, মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য, কর্মজীবী নারীদের প্রসূতিকালীন ছুটি, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করার আন্দোলনে সারা পৃথিবী জুড়ে এইসব সংগঠন এখনও কাজ করছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হাজার হাজার নারী ইউরোপের দেশগুলিতে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন বন্দী শিবিরে ও জেলখানায়। সে সময় দেশে দেশে নারীদের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ঐক্য হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ২৬ নভেম্বর প্যারিস শহরের মিচুয়ালি হলে সভানেত্রী ইউজিন কটোন এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশন (WIDF)।

জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্বকারীদের মধ্যে পুরুষের একাধিপত্য ঃ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি ব্যারোমিটার হচ্ছে উঁচু নারীর অবস্থান। ১৯৯০ সালের তথ্যে জানা যায়, জাতিসংঘের ১৫৯ সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধানদের মধ্যে মাত্র ৬ জন নারী এবং ১০০ টি দেশের সকল উঁচু পদ মন্ত্রী, ডেপুটি মন্ত্রীর পদে পুরুষের আধিপত্য রয়েছে।

নারী বৈষম্যের প্রতিকারে প্রটোকল ঃ বৈষম্য বিরোধী লড়াইয়ে নারীদের সহায়তার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ১০ ডিসেম্বর বিশ্বের ২৩টি দেশ একটি আইনগত প্রটোকলে সই করেছে। এই প্রটোকলের আওতায় নারীরা বৈষম্য, যৌন হয়রানি এবং অন্যান্য নিপীড়নের বিষয়ে নিজ দেশে প্রতিকার না পেলে সরাসরি জাতিসংঘে অভিযোগ জানাতে পারবে। এই প্রথমে বিশ্বের নির্যাতিত নারীরা এই সুযোগ অর্জন করলেন।

বিংশ শতাব্দীর তথাকথিত নারী অধিকার ও সমঅধিকারের(?) নমুনা

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। তরজমায়ে কুরআন মজীদ, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯০
২। তাফহীমূল কোরআন (১ম ও ২য় খণ্ড) মাওলানা আবুল আলা মওদুদী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।
৩। কোরআন সূত্র, মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।
৪। হাদীসে রসুল, অধ্যক্ষ আলী হায়দার চৌধুরী অনুদিত ও সংকলিত, ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা।
৫। বাংলা বোখারী শরীফ, সম্পাদনা হাফেজ মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, বাংলাদেশ লাইব্রেরী, ঢাকা। ১৯৯৩
৬। ধর্ম ও নারী, সৈয়দ শাহজাহান, গতিধারা, ১৯৯৪
৭। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও প্রতিরোধ, আরিফুল হক, দেশজ প্রকাশন, জুলাই ২০০০
৮। কোম্পানী আমলে ঢাকা, 'জেমস টেলর' অনুবাদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮
৯। খবরের খবর, জহুরী, আলহেরা প্রকাশনী, ১৯৯০
১০। ইতিহাসের পাতা থেকে, সৈয়দ আশরাফুল আলী, ১৯৯৭
১১। উজ্জীবন, সৈয়দ আশরাফ আলী, ১৯৮৮
১২। ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, মুহাম্মদ কুতুব, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪
১৩। সূর্যাস্ত আইন, আবদুল গনি মাহমুদ, ১৯৯৫
১৪। A Pictorial History of Love by Paul Tabori, Spring Books, London. 1966
১৫। ইতিহাসের খেরো পাতা, (১ম ভাগ) মুনতাসীর মামুন, কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৮
১৬। মোঘল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী, শাহরিয়ার ইকবাল, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫
১৭। হাজার বছরের বাংলাদেশ, ডঃ মোহাম্মদ হান্নান, সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৯৫
১৮। ব্রজকণ্ঠ, গোলাম আহমাদ মোর্তজা, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলিকাতা, পশ্চিম বঙ্গ, ১৯৯৬
১৯। ইসলামে নারীর মর্যাদা, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-বাংলাদেশ, ১৯৮৭
২০। হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা, মুনশী মুহাম্মদ মেহেরউল্লাহ, ১৯৯৭
২১। রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা, আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ (তৃতীয় খন্ড) অনুবাদ ঃ আঃ মান্নান তালিব, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন ও ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট্স ১৯৯৪
২২। সিরাজাম মুনীরা, দশম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা মার্চ-মে, ১৯৯২ (হাইকোর্ট মাজার কমিটির মুখপত্র) মোঃ রুহুল আমিন, প্রবন্ধ নারী জাতির উন্নয়নে মহানবী (সাঃ) এর অবদান
২৩। যুগে যুগে নারী, ইসহাক ওবায়দী, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ,
২৪। নারী মুক্তি, শায়েখ তাজুল ইসলাম, পালক, ১৯৯৮
২৫। ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত, সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৮
২৬। অন্যপথের কন্যারা (Another Path. by Carol An way) অনুবাদঃ মোঃ এনামুল হক, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০০
২৭। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিদের পোষ্টমর্টেম -১, বদরুল ইসলাম মুনীর, চেতনা প্রকাশনী, ঢাকা।
২৮। মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ, সম্পাঃ দিলওয়ার হোসেন, বাংলা একাডেমী '৯৪

www.pathagar.com

২৯। মুক্তির সংগ্রামে ভারত, পশ্চিম বাংলা এ্যাকাডেমী, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৬
৩০। ইব্রাহীম খাঁ রচনাবলী, প্রথম খন্ড, সম্পাদনা আঃ মজিদ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪
৩১। বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ডঃ এম,এ, রহিম। 'দ্বিতীয় খন্ড' মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনুদিত। বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬
৩২। ইতিহাস অভিধান (ভারত), যোগনাথ মুখোপাধ্যায়, এম,সি, সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা
৩৩। রবীন্দ্রনাথ কিশোর জীবন, শিশু সাহিত্য বিতান, চট্টগ্রাম, তৃতীয় সংকলন, ১৩৮৩ বাংলা
৩৪। বাংলা নাটকের ইতিহাস, তৃতীয় সংকলন, অজিত কুমার ঘোষ, জেনারেল প্রিন্টার্স পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৩৬৮
৩৫। বাংলার মুসলমানের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, বাংলাদেশ ইসলামী সেন্টার ঢাকা, ১৯৯৪
৩৬। বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, ১৯৮৫
৩৭। জাহানারার আত্মকাহিনী, শ্রী মাখনলাল চৌধুরী, কলিকাতা ১৩৫৭
৩৮। উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ- সাময়িক পত্র (১৮৪৭-১৯০৫) দ্বিতীয় খন্ড, মুনতাসীর মামুন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৩৯। নারী, হুমায়ূন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ১৯৭৯, ১৯৯২ ও ১৯৯৫
৪০। ছোট গল্প, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৭
৪১। শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা
৪২। শামসুর রাহমানের প্রকাশিত অন্যান্য কবিতার বই সমূহ
৪৩। শামসুর রাহমানে নিঃসঙ্গ শেরপাঃ হুমায়ূন আজাদ, বাংলা একাডেমী
৪৪। ইসলাম প্রসঙ্গ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৩
৪৫। কেন মুসলমান হলাম ? মাওলানা আবুল বাশার জিহাদী, কুরআন- হাদীছ রিসার্চ সেন্টার ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড।
৪৬। সওয়াল জওয়াব, খন্দকার আবুল খায়ের, জামেয়া প্রকাশনী ১৯৯৩
৪৭। নষ্ট দর্শন, আব্দুল মবিন, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ১৯৯৬
৪৮। লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ, আব্দুল হাফিজ, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪
৪৯। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, আধুনিক প্রকাশনী '১৯৯৭
৫০। পর্দা ও ইসলাম, সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, আধুনিক প্রকাশনী '২০০০
৫১। ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা, সম্পদনায় আবদুল ওয়াহিদ, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ১৯৯৬
৫২। দি গ্রেট মোঘল, বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন, মুক্তধারা ১৯৯৮
৫৩। সাপ্তাহিক অন্যদিন, ঈদ সংখ্যা ১৯৯৭
৫৪। সাপ্তাহিক রোববার, ঈদ সংখ্যা ১৯৯৭
৫৫। মাসিক সফরের বিভিন্ন সংখ্যা
৫৬। সাপ্তাহিক বিক্রমের বিভিন্ন সংখ্যা
৫৭। সাপ্তাহিক কলমের বিভিন্ন সংখ্যা
৫৮। মাসিক মদীনার বিভিন্ন সংখ্যা
৫৯। সাপ্তাহিক বিচিত্রার বিভিন্ন সংখ্যা
৬০। নতুন ঢাকা ডাইজেষ্ট, বিভিন্ন সংখ্যা
৬১। দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক প্রথম আলো সহ দেশী ও বিদেশী দৈনিক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা।
৬২। Monthly Evidence (Speacial Issue) June-July - 2000.
৬৩। নিউজ লেটার, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মাসিক মুখপত্র।

www.pathagar.com

নারী পুরুষের ভোগের জিনিস নহে, তাহারা আদরের পুতুল নহে, পুরুষকায়ার ছায়া নহে। জীবন যুদ্ধে নারী পুরুষের সহযোগিনী, জীবনের লক্ষ্যপথে নারী পুরুষের সহযাত্রিণী। নারী যদি পুরুষের দাসী হয়, তবে পুরুষও নারীর দাস, ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এইরূপ স্বীকার করে।

পুরুষের আত্মপ্রসাদী নীতির ফলে নারীর স্বত্ব খর্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু সেদিন আসিবেই যেদিন মুসলিম মহিলা কুরআনের দোহাই দিয়া, হাদীসের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহার ন্যায্য স্বত্ব অধিকার করিবে। যে ইসলাম হযরত আয়েশা, হযরত ফাতিমা, খাওলা, [illegible], [illegible], সুলতানা রাযিয়া, চাঁদ সুলতানা, গুলবদন বেগম, জেবুন্নিসা প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], ঐতিহাসিক [illegible] জন্ম দিতে পারে, তাহা ভবিষ্যৎ [illegible] হইতে পারে না।

— ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ ১৯৪৮ সালের ১১ অক্টোবর তৎকালীন ঢাকা জেলা বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত গজারিয়া থানায় অবস্থিত আড়ালিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নদী ভাঙ্গনের ফলে ১৯৬৪ সালে তাঁর পিতা দাউদকান্দি থানার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পিতার নাম তোতা মিয়া সরকার। পারিবারিক অর্থনৈতিক দীনতার কারণে তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি বটে; কিন্তু নিজ যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভাবলে দেশের সর্ববৃহৎ ঐতিহ্যবাহী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান বুক প্রমোশন প্রেস এবং জাতীয় দৈনিক মিল্লাত পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে ২৬ বছর যাবত অত্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৬ থেকে '৯৮ পর্যন্ত তিন বছর উক্ত পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। দৈনিক মিল্লাত ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় স্বনামে এবং "ইবনে কাশিম," ও "রাজহংসে" ছদ্মনামে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিনি জাতিসত্তা পরিষদের আহবায়ক এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি তিন কন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জনক। বর্তমানে তিনি লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত দিন কাটাচ্ছেন।

লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ

- রাহুর কবলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি (১ম খণ্ড)
- ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র-নজরুল চরিত
- বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুসলমান (যন্ত্রস্থ)

প্রকাশের অপেক্ষায়

- রাহুর কবলে বাংলাদেশের সংস্কৃতি (২য় খণ্ড)
- সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা : সেকাল-একাল
- ইতিহাস বিকৃতির ইতিবৃত্ত
- শাসন-শোষণ ও আত্মঘাতী রাজনীতির তিনকাল দর্শন
- বাংলাদেশের ইতিহাস অভিধান
- বিবিধ সংলাপ (নির্বাচিত কলাম)
- ছহি বড় বুদ্ধিজীবী জঙ্গনামা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com